৪৮-শ বর্ষ] [বৈশাখ, ১৩৩১



ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী

সম্পাদিত

ভারতীর বিনিময়পত্র ও প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবার

ঠিকানা—৩নং সানি-পার্ক বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কার্য্যালয়

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৪৲] [প্রতি সংখ্যা ।৵০

ভারতীর-সূচী বৈশাখ ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী আষাঢ় ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী শ্রাবণ ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী ভাদ্র ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী আশ্বিন ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী কার্ত্তিক ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ ১৩৩১

Reg. No. C. 523

৪৮-শ বর্ষ] [বৈশাখ, ১৩৩১



ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী
সম্পাদিত

ভারতীর বিনিময়পত্র ও প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবার

ঠিকানা—৩নং সানি-পার্ক বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কার্য্যালয়

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৪৲] [প্রতি সংখ্যা ।৵০

ভারতীর নিয়মাবলী

গ্রাহক

১। বৈশাখ হইতে ভারতীর বর্ষ আরম্ভ হয়। কেহ ইচ্ছা করিলে যখন ইচ্ছা গ্রাহক হইতে পারেন, কিন্তু বৈশাখ হইতেই কাগজ লইতে হইবে। বার্ষিক মূল্য ৪৲ চার টাকা অগ্রিম দিতে হয়। পত্র পাইলে গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া ভি, পি,ডাকেও বার্ষিক মূল্য আদায় করিয়া থাকি। যিনি লোক মারফৎ বা মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন,তিনি অনুগ্রহ করিয়া—ম্যানেজার "ভারতী" ২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন।

২। ভারতীর প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য সাত আনা। নমুনা বিনামূল্যে দেওয়া হয় না। প্রতি মাসের ভারতী নগদ বিক্রয়ের জন্য—ভারতী কার্য্যালয়, ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং কলিকাতার অন্যান্য বুকষ্টলে রাখা হয়।

৩। ভারতী প্রতি বাংলা মাসের পহেলা তারিখে বাহির হয় ১০ই তারিখের মধ্যে কোনো গ্রাহক ভারতী না পাইলে ডাকঘরে ও আমাদিগকে সে কথা জানাইবেন; নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

৪। অল্পকালের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পোষ্ট অফিসের সহিত বন্দোবস্ত করিলে সুবিধা হয়; দীর্ঘকালের জন্য হইলে আমাদিগকে মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে জানাইবেন।

৫। আমাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় চিঠিতে গ্রাহকের নম্বরের উল্লেখ থাকা এবং নাম ও ঠিকানা খুব স্পষ্ট করিয়া লেখা দরকার। রিপ্লাই-কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

প্রবন্ধাদি

১। ভারতীতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি অনুগ্রহ করিয়া ভারতী-সম্পাদকের নামে ৩নং সানিপার্ক, বালিগঞ্জ ঠিকানায় পাঠাইবেন।

২। প্রবন্ধের সঙ্গে ডাকটিকিট ও ঠিকানা থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় এবং রচনা মনোনীত হইলে তাহাও লেখককে জানানো হয়।

বিজ্ঞাপনের মূল্য

১। ভারতীর বিজ্ঞাপনের মূল্য মাসিক এক পৃষ্ঠা ১২৲ বারো টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা, এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা। বিজ্ঞাপন সিকি পৃষ্ঠার কম হইলেও সাড়ে তিন টাকা মূল্য দিতে হয়। সাড়ে তিন টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিশেষ জায়গার দর

২য় কভারের সামনের পৃষ্ঠা	...	১৮৲
ঐ আধ পৃষ্ঠা	...	১০৲
৩য় কভারের		
সামনের পৃষ্ঠা	...	১৬৲
ঐ আধ পৃষ্ঠা	...	৯৲
পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠার		
সামনের পৃষ্ঠা	...	২০৲
সূচীর পার্শ্বে		
আধ পৃষ্ঠা ...	...	৯৲
সূচীর নীচে আধ পৃষ্ঠা	...	৯৲
তিন রঙের ছবির		
আগের পৃষ্ঠা ...	...	২০৲

২। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যাঁহারা এক বৎসর কিংবা ছয় মাসের বিজ্ঞাপনের মূল্য এক-সঙ্গে অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের বিজ্ঞাপন মাসিক এক পৃষ্ঠা ১০॥০ সাড়ে দশ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা, এবং সিকি পৃষ্ঠা তিন টাকায় লওয়া হয়।

৩। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে ভারতীর ম্যানেজারকে চিঠি লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। নূতন বিজ্ঞাপন দিতে হইলে কিম্বা বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়; পরে জানাইলে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন কিংবা বন্ধ করা সম্ভব হয় না।

ম্যানেজার ভারতী—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতীর সূচী বৈশাখ ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

ভারতীর সূচী আষাঢ় ১৩৩১

ভারতীর সূচী শ্রাবণ ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী ভাদ্র ১৩৩১

ভারতীর সূচী

বাণী-বিতান—

আর, লগিন এণ্ড কোং

হিলিংবাম

সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের জগদ্বিখ্যাত মহৌষধ। হিলিংবাম ২৯ বৎসরের পুরাতন ঔষধ জগদ্বিখ্যাত এ ঔষধের ন্যায় স্থায়ী ও আশুফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। হিলিংবাম একমাত্রা সেবনে উপকার অনুভব করিবেন। হিলিংবাম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেহ ও প্রমেহ রোগের যাবতীয় যন্ত্রণা দূর করিবে। হিলিংবাম এক সপ্তাহে জটিল যন্ত্রণাদায়ক রোগ উপশম করে। অসরল যন্ত্রনাসহ প্রস্রাব, জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে অক্ষমতা, স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য ধারণাশক্তির হীনতা, মস্তকঘূর্ণন শারীরিক ও মানসিক জড়তা হিলিংবাম সেবনে আরোগ্য হয়।

গণকোকাই নামক কীটাণু মেহ ও প্রমেহ রোগের মূল কারণ। উক্ত কীটের বিনাশোপযোগী উপাদান হিলিংবামে আছে বলিয়াই হিলিংবাম স্থায়ীরূপে আরোগ্যকারী মহৌষধ। হিলিংবাম তিন সাইজে বিক্রীত হয়—বড় শিশি ৩৲ মাঝারি ২৷৷৹ ও ছোট ১৸৹ ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রশংসা-পত্র

১। ইণ্ডিয়ান ল্যানসেট নামক চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র বলিয়াছেন এই ঔষধ অনেকগুলি রোগীকে পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সমধিক আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, প্রত্যেক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হইয়াছে।

২। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, আই, এম, এস, এম-এ এম ডি, এফ-আর-সি, এস; (এডিন) এস, এস সি, ডিগ্রী (কেম্ব্রিজ), পি, এইচ, ডি, (ক্যাণ্টাব), ভারতের ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারী কমিশনার বলিয়াছেন,—"হিলিংবাম মেহ প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কষ্টকর এবং দুশ্চিকিৎস্য মেহ ও প্রমেহ-রোগাক্রান্ত লোকদিগকে আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

৩। ডাক্তার টি, ইউ, আমেদ, এম, আর, সি, এস, এল, এস, এ, (লণ্ডন) ভারত সম্রাটের ভাইস্-কনসল বলেন,—মেহ ও প্রমেহে হিলিংবাম প্রশস্ত।

আর, লগিন এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

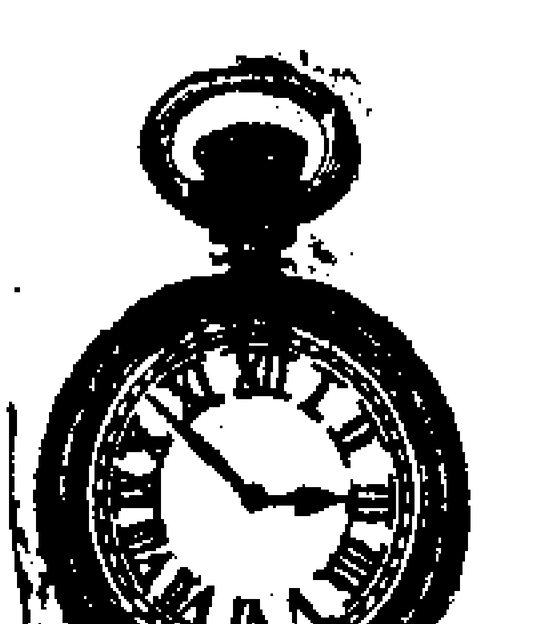
১৪৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলিকাতা।

---

২১০ দফা উপহার সহ—৪৲ টাকায়

ইনভেণ্টিক লিভার ওয়াচ

এই ঘড়ি দেখিতে সুন্দর একদমে ৩৬ ঘণ্টা চলে কল কব্জা মজবুত, মুখ খোলা নিকেল কেশ,



গ্যারাণ্টি ১ বৎসর উপহার যথা—ব্লু ব্লাক কালির বড়ি ১৪৪, সূচ ২৫, সিগারেট কেশ একটি, সূতা ১ বাণ্ডিল নিব ১২ সেপ্‌টিপিন ১২, ক্লিপ ১২, সুগন্ধ এসেন্স ১ শিশি, রবারের বল ১টী, নিকেল চেন ১ গাছা, ডাঃ মাঃ ৷৷৹। মোট ৪৷৷৹।

আর সি, মুখার্জ্জি ১২৷২ হরিপাল লেন,

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক গার্হস্থ ঔষধাবলী

মূল্য—মাত্র ৭টী ঔষধ, পুস্তক ও কেস সহ ৪৲ টাকা মাত্র, মাশুল স্বতন্ত্র। ইহা দ্বারা সকল ব্যাধি অতি সহজে আরোগ্য হইবে। চিকিৎসা আবশ্যক হইবে না গৃহলক্ষ্মীগণও পুস্তক দেখিয়া পারিবারিক সমস্ত চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন। চিকিৎসকের ত কথাই নাই—পত্র লিখিলে চিকিৎসা প্রণালী বিনামূল্যে পাঠান হয়।

ইলেক্‌ট্রো-আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, রুম নং ২১ কার্ট ফ্লোর;

কলিকাতা।

ভারতীর সূচী আশ্বিন ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী কার্ত্তিক ১৩৩১

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী

ভারতীর সূচী অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ ১৩৩১

ভারতী

৪৮শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩১ { প্রথম সংখ্যা

মন-রথী

এক সূর্য্য করে আলো সকল সংসার
গহন তিমির নাশি' !
এক তুমি কর আলো সকল হৃদয়
হে সূর্য্যবাসি !
অবিনাশি !

রাত্রিশেষে তোমাপানে চাহি ঊর্দ্ধবাহু !
প্রজ্ঞাকিরণ রথে
তুলে লও মোরে, হিরণ্ময় জীবনের
কর রাজপথে !
হে ভূপতে !

চলা মম সত্য হোক, প্রেমল, সুন্দর !
রাখ তোমার সম্মতি
ধ্বজা সম আগে, বাঁচাইয়ে প্রতিপদে
প্রমাদ-দুর্গতি !
মন-রথি !

শ্রীমতী সরলা দেবী।

প্রত্যাগমন

আমি যেন রিপ্-ভ্যান্-উইঙ্কলের মত কোন পর্ব্বতগুহায় এতদিন শয়ান ছিলাম,—বাঙ্গলার সাহিত্যজীবন-কল্লোলে বধির। আজ সুপ্তিভঙ্গ কিরূপে হইল? যে তরুণ কুমারের হাতে কর্ম্মভার সমর্পণ করিয়া আমি পঞ্চধারার প্রপঞ্চে অভিভূত ছিলাম এবং সপ্তসিন্ধু হিন্দের হিন্দোলায় দোল খাইয়া সহসা দোল থামাইয়া আত্মসম্বরণের সাধনায় নিভৃতের আশ্রয় লইয়াছিলাম, আজ সেই কুমার যৌবনের সঙ্গিনীহীন জীবনে অবসাদগ্রস্ত। যে দেবীর প্রতি নিষ্ঠায় তাঁহারই বরপুত্ররূপে সংসারে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছে তাঁর সেবার মাদকতা আর তাহার রক্তকে মাতায় না। তাই দেবীর আবার আমাকে ডাক পড়িল। একজনকে তন্দ্রালস্যে ঘিরিয়া দিয়া আর একজনকে জাগ্রত করিলেন। আনন্দ তাঁর সেই তরুণ সেবকটীর সব চেয়ে। সে আমায় লিখিতেছে ;—

"আপনি যদি 'ভারতী'র ভার আবার গ্রহণ করেন তাহলে আমার যে কত আনন্দ হয় সে কথাটা চিঠি শেষ করবার আগে আর একবার বলতে ইচ্ছে করছে। বাংলা সাহিত্যকে আপনি যা দিতে পারতেন, তা দেন্‌নি এবং আমার বরাবরের বিশ্বাস, যে কীর্ত্তি অর্জ্জন আপনার অতি সহজ ছিল তাকে আপনি অবহেলা করেছেন। 'ভারতী' ত্যাগ করা আপনার জীবনের একটা মস্ত বড় ভুল। আপনি অন্য ক্ষেত্রে অনেক কিছু করেছেন জানি, কিন্তু তার কথা কতদিন কে স্মরণ রাখবে জানি না, কিন্তু সাহিত্যে যা করতেন তা যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকত সন্দেহ নেই। আমার জীবনের একটা মস্ত দুঃখ যে আপনি সাহিত্যকে আমোল দিলেন না। এখন যদি আবার নূতন করে আরম্ভ করেন, এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে, তবে দুঃখ এই যে আমি একেবারে উৎসাহ ও উদ্যমহীন হয়ে পড়েছি, আমি নিজেই জোর পাই না, তা আপনাকে জোর করে এ কাজে নাবাবো কি ?"

নামিলাম। নিভৃত সাধনার শান্তিভুবন হইতে কর্ম্মময় যজ্ঞক্ষেত্রের কোলাহলে বাহিরিলাম। যিনি প্রাণীমাত্রের হৃদ্দেশে থাকিয়া যন্ত্রারূঢ়ের মত সকলকে অবশভাবে চালান, মানুষের সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা তার স্বধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া দেন, বিবিক্তসেবী থাকিয়াও লোকসেবারূপ যজ্ঞের আদেশ করেন তাঁহারই প্রেরণায় নামিলাম। তিনিই শুনাইলেন কর্ম্মের সময় আসিয়াছে। 'ভারতী'র সম্ভাবিতমৃত্যুর সম্বাদে আমার প্রাণে যখন চমক

আনিলেন, 'ভারতী'র আধারে বঙ্গের ৪৮ বৎসরের সাহিত্য-জীবন-প্রবাহ সহসা রুদ্ধ হইবে এ আশঙ্কায় যখন আমার অন্তরে তাহাকে বাঁচাইবার স্পষ্ট প্রবৃত্তির স্ফুরণ করিলেন তখনই তিনি কহিলেন···

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদম্ ততম্
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

তাঁহার সহিত যোগেরই জন্য, আত্মশুদ্ধিরই জন্য স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মের অগ্নিকুণ্ডে নামিবার আদেশ করিলেন। সূত্রধারী তাঁরই সূত্রের চালনায় বঙ্গের বাণীযজ্ঞে আবার নামিলাম। কিন্তু নামিয়া সেই মার্কিণ মানুষটীর মত অনুভব করিতেছি আমার দেশে আমার ঘরে আমায় অনেকে চেনে না, আমি অনেককে চিনি না। আমার মার্গদর্শী গুরুরা ও সহযোগীরা অনেকে প্রবীণতার বিশ্রান্তিনিমগ্ন, বা লীলাশেষিত। আমার হাতে গড়া সাহিত্যিক কুমারগণের মধ্যে কেহ কেহ উন্নতশীর্ষ বটে, কিন্তু 'ভারতী'র ছত্রচ্ছায়ের বাহিরে, এবং অনেকেই নিরুদ্দিষ্ট। নূতন লেখকতালিকায় তাঁহাদের নাম পাইলাম না। যাঁদের নামের ফেরিস্ত আমার হাতে দেওয়া হইয়াছে তাঁদের প্রায় সকলকেই কালের স্রোতে উজান বহিয়া আমার সঙ্গে এবং আমাকে স্রোত ধরিয়া তাঁদের সঙ্গে পরস্পর-পরিচয় সাধন করিতে হইবে। বাণীর বক্ষে এই নবীন কিশলয়গুলির প্রাণের বার্ত্তা শুনিবার সুযোগে আমার মন প্রীতি-প্রফুল্ল।

যেদিন আমি প্রথমে পঞ্চনদতীরে বাসা বাঁধি সেদিন সে প্রদেশে আমিই একমাত্র বঙ্গসাহিত্যিক ছিলাম। আজ পঞ্চধারায় জাহ্নবীস্রোত মিলিত হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্য-রসে রসিক ও সাধকের একটী যূথ সেখানে প্রবাসীজীবন যাপন করিতেছেন। তাঁদের উৎসাহ, উদ্যম ও আনন্দও আমাকে ঘিরিয়াছে। তাঁরা দেশে এখনও অজানা। তাঁদের সাধনালব্ধ ফলের স্বাদ দেশবাসী এ সংখ্যা হইতেই লাভ করিবেন। সমগ্র উত্তরভারতে বঙ্গ-সাহিত্যসঙ্ঘ উত্তরোত্তর দলপুষ্ট হইতেছে। আশা করি সে পুষ্টি 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় ক্রমশঃ প্রতিফলিত হইবে।

পূর্ব্বে আমি যখন 'ভারতী' পরিচালনা করিতাম ৺রানাডে-প্রমুখ তদানীন্তন ভারতনেতারা আমার সম্পাদকীয় অনুরোধের নির্ব্বন্ধে স্বলিখিত প্রবন্ধের দ্বারা ভারতীর পৃষ্ঠা ভূষিত করিতেন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তখন তাঁহার কীর্ত্তি জগৎব্যাপী হয় নাই, এবং তাঁহার উক্তি আপ্তবাক্যতুল্য হয় নাই। তিনি এবং অন্যান্য ভারতনেতারা এবারও ভারতীকে তাঁদের বক্তব্যের আধার করিয়া স্নেহের পরিচয় মধ্যে মধ্যে দিবেন এ বিশ্বাস রাখি।

এইখানে একটী কথা বলি। সাহিত্যকলা ও চিত্রকলা দুয়ের যুগপৎ সাধনার চেষ্টায় যে পরিমাণ শক্তির আবশ্যক তাহার অভাবে একের অবহেলা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। হয়, যা-তা চিত্র বাহির হয়, কিম্বা যা-তা লেখা ছাপা হইয়া যায়। এই উভয়সঙ্কট বাঁচানর জন্য

হীরা-মোতির অলঙ্কার পরাণর চেষ্টা হইতে নিরস্ত থাকিব। বাণী বীণাপাণির যে স্বাভাবিক সজ্জা, চিন্তা ভাব ও ভাষার গরিমা, লালিত্য ও কমনীয়তা—সেই সাজে তাঁকে সাজাইবার চেষ্টার ক্রটী হইবে না। সাহিত্য-সাধনার প্রয়োজনমত কখন কখন চিত্র থাকিবে, অপ্রয়োজনে নহে।

একটী শেষ কথা আছে। অনেকে আশা করিতেছেন আমি যখন নামিলাম, যখন সাহিত্যের সেবকতা আবার গ্রহণ করিলাম তখন পুরাণ-আহ্বান-গীতি আবার গাহিব। জানি না কি গাহিব! এই জানি, অহোরাত্রি বর্ষ-মাস কালচক্রে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, তবু যেটী যায়, ঠিক সেটী আসে না, যুগ হইতে যুগান্তরে পদার্পিত হইয়া কালধর্ম্মে ভাবান্তরিত হইয়া আসে। বাঙ্গলার মেয়ে বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আমারও সম্পাদনে কালের রঙ ফলিবে। বিশবর্ষ আগে 'ভারতী'র ভেরীতে যে ভাবের লহরী বহিয়াছিল, নটরাজের যে তাণ্ডব নৃত্যের আগমনী বাজিয়াছিল, সম্পাদকীয় তূর্য্যে যে বীররাগের আলাপে বঙ্গ অঙ্গন ছাইয়া গিয়াছিল হয়ত তাহা আজ শান্ত ধীরোদাত্ত ছন্দে মিলিয়া কালের বক্ষে নব রাগের তরঙ্গ তুলিবে। কিন্তু অস্থিরের মধ্যে যাহা স্থির, পরিবর্ত্তনশীলের মধ্যে যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, অনিত্যের মধ্যে যাহা নিত্য, সেই সত্য, শিব ও সুন্দর আমার শরীর, মন ও আত্মার স্তরে স্তরে যদি অধিষ্ঠিত থাকেন তবে আমার কণ্ঠে যে গীতই গাওয়াইবেন, আমার লেখনী-মুখে যে বার্ত্তা শুনাইবেন, তাহা লোক-মঙ্গলময় হইবে, এই দৃঢ় আশ্বাসে যজ্ঞক্ষেত্রে নামিয়াছি। যিনি সর্ব্বযজ্ঞের অনুমন্তা ও সাক্ষী, ভোক্তা ও প্রভু তাঁহাকে নতি।

লাহোর
চৈত্র, ১৩৩০।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বন্দনা-হার

কণ্বমুনির তথৈব তাঁহার
পদানত দীনদ্বিজের

আশীর্ব্বাদ



ভারতীর আদি-সম্পাদক। ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাত বৎসর পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুজদ্বয়ের সাহচর্য্যে পরিচালিত করেন। আজ ইনি পঞ্চোত্তর অশীতি বর্ষ বয়স্ক।

কণ্বমুনি শকুন্তলাকে বিদায়কালে, যেরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, আমিও ভারতীকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

কালিদাস-ভারতীর চরণামৃত
নালা কাটিয়া আনি,
সেবিকা ভারতীর নবমালঞ্চে
সিঞ্চিনু—কি তাহে হানি?

রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিশ্‌
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক ময়ূখ তাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজো মৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূল পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

নলিনী শোভিত সরোবর মাঝে মাঝে
হরুক্‌ মন।
ছায়াতরুরাজি সূর্য্যতাপ করুক প্রশমন॥
ছিটাক মকরন্দ বায়ু মৃদু মন্দ,
প্রশান্ত, অনুকূল।
চরণপরশে নবমালঞ্চে ফুটুক
রাশি রাশি ফুল॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নববর্ষে



৮ম ভাগ হইতে ১৮শ ভাগ পর্য্যন্ত এবং পুনর্ব্বার ৩১শভাগ হইতে ৩৮ ভাগ পর্য্যন্ত—প্রথমবার শেষদিকে কন্যাদ্বয়ের সাহায্যে সম্পাদন কার্য্য পরিচালন করেন, এবং দ্বিতীয়বার শ্রীমান মণিলালের উদ্যমে অনুপ্রাণিত হন।

হে ভারতি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-রাণি,
নববর্ষে দাও বর, শোনাও মা সুখকর
সৌভাগ্যসূচিত মহাবাণী !
অয়ি দেবি অনাদি প্রবীণা,
কালাতীত ত্রিকালনবীনা,
ছাড়ি দীনা তপস্বিনী সাজ
কিরীটিনী রূপ ধর আজ
ভূপতিতা বীণা তুলি করে
ত্রিলোকনন্দন সুরে স্বরে—
গাও নব রাগিণী কল্যাণী
যুগে যুগে লও পূজা বীণাপাণি !

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

অর্ঘ্য

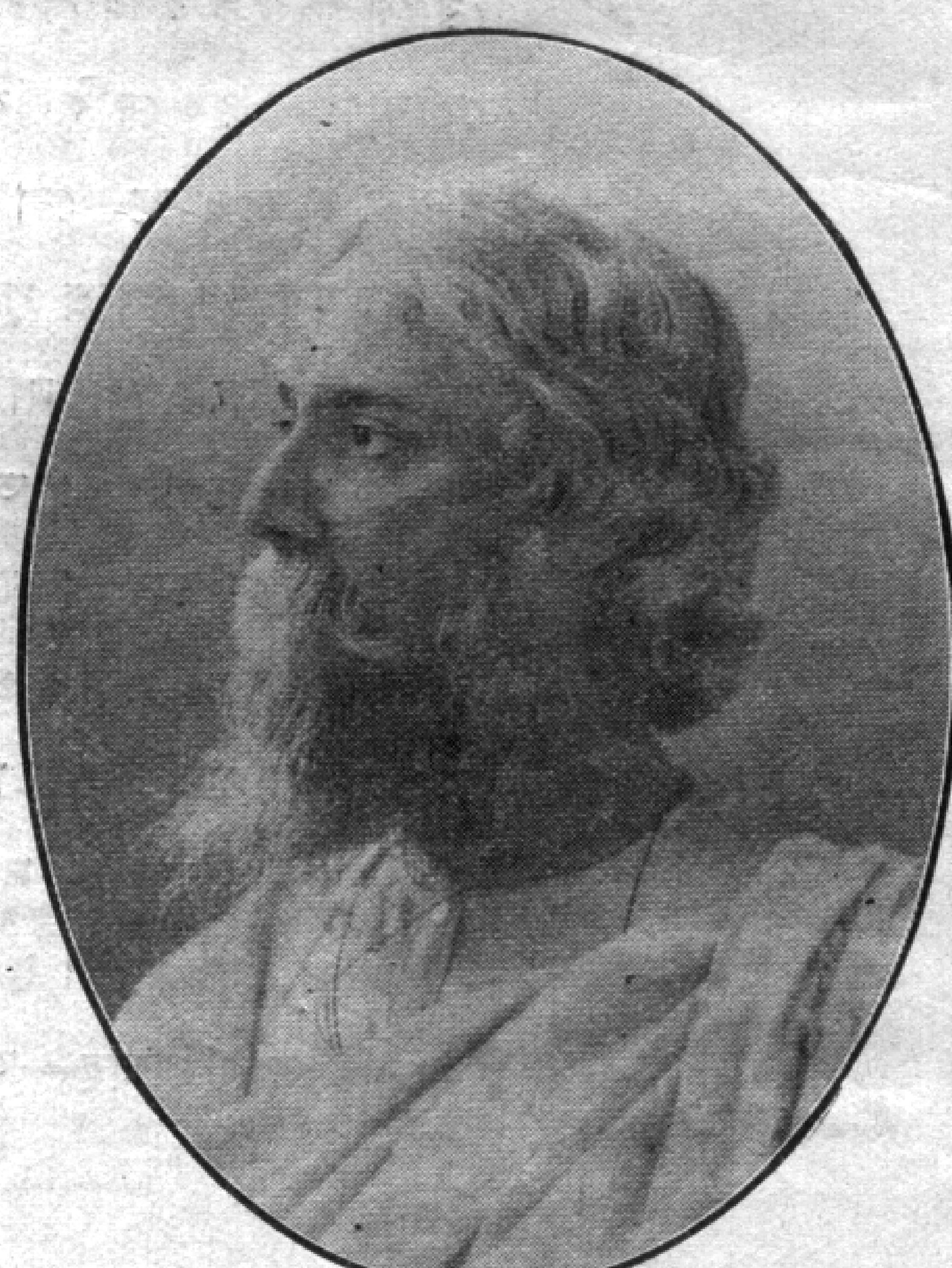


১৯ ভাগ হইতে ২১ ভাগ পর্য্যন্ত তিন বৎসর শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত যুক্ত সম্পাদক।

বহুদিন পরে আসি আহ্বান করেছ আজি,
কি দিয়ে পূজিব রাণি, ফুলহীন শূন্য সাজি।
রোগে শোকে ক্ষীণ দেহ, আনন্দবিহীন প্রাণ
তোমারে করিব দেবি, কিবা উপহার দান।
বাসনা হতেছে মনে যোগ্য আয়োজন ক'রে
চরণ-কমল তব আজি পূজিবার তরে।
নাহিক বাগানে ফুল, নাহি রত্ন অলঙ্কার
ভকতি শকতিহীন শুধু আকিঞ্চন সার।
বড়ই ব্যাকুল চিত্ত গাহিতে বন্দনা-গীতি
ঢালিতে বিশ্বের প্রাণে প্রাণের মধুর প্রীতি।
অন্তরে জাগিছে দীপ্ত ভাবভরা ভালবাসা
বীণা কিন্তু ছিন্নতন্ত্রী—নাহি তাহে সুর ভাষা।
ধোয়াতে চরণ মাগো শুধু তপ্ত-অশ্রুধার
এনেছি ভারতি লহ—অর্ঘ্য দীন সেবিকার।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।

মধ্যমণির শূন্যস্থান



২২ ভাগের সম্পাদক।

প্রাণ-বাহিনী

জ্ঞানীর তুমি হে জ্ঞানদা মাতঃ
প্রাণীর প্রাণের উৎস জননি !
ঋতু-বসন্ত-পঞ্চমী তব
রটায় জীবন-কুহক-কাহিনী !
নিত্য-প্রাণবাহিনী !

মায়াময়ী তুমি হে বীণাবাদিনি,
সুরে সুরে কিবা রচিলে ধরা !
কারণ-সলিল-কমল-বাসিনি
প্রকৃতি তোমার পরা ও অপরা !
ঋতু-বসন্ত-পঞ্চমী তব
রটায় জীবন-কুহক-কাহিনী !
নিত্য-প্রাণবাহিনী !

জীবভূতা তুমি, দেহমাঝে দেহী,
চিদ্‌রূপিণী শিখাটি অরূপ !
মাটি নভ জল পবন অনল
তোমারি মধুর বিকশিত রূপ !
ঋতু-বসন্ত-পঞ্চমী তব
রটায় জীবন-কুহক-কাহিনী !
নিত্য-প্রাণবাহিনী !

সুখ হাহুতাশ, ভয় প্রেম আশ
কত রীতি বহে জীবনের ধারা !
অযুত প্রাণের দরদে ডুবায়ে
মহাপ্রাণ পারে লও হে অপারা !
ঋতু-বসন্ত-পঞ্চমী তব
রটায় জীবন-কুহক-কাহিনী !
নিত্য-প্রাণবাহিনী !

শ্রীমতী সরলা দেবী ।*

* ১৯ ভাগ হইতে ২১ ভাগ পর্য্যন্ত যুক্ত-সম্পাদক এবং ২৩ ভাগ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত সম্পাদক ।





৩৯ ভাগ হইতে ৪৭ ভাগ পর্য্যন্ত যুক্ত-সম্পাদক ।

চরিতার্থ

থাক্ তারা সুখে থাক্ রত্নাসনে বসি দিনরাতি—
আরামে বিলাসে যারা জ্বালাইছে জীবনের বাতি !
তাদেরে চাহিয়া হিংসা ক'রিনিকো,ফেলিনিকো শ্বাস ।
আমি রিক্ত ! পেয়েছি যা জীবনের চরম উল্লাস ।
সে চরণপদ্মে নিতি নব ছবি, নূতন মাধুরী—
নেহারি আমার চিত্ত কি সার্থকতায় গেছে ভরি,
আমি যা পেয়েছি, তায় কি পুলক, সে যে কি অমূল
আমিই তা জানি ভালো, ধনরত্নে নাহি তার তুল !
ধনের কাঙাল নই কোনদিন—চাহিনিকো ধন,—
ও মঞ্জীর রবে মুগ্ধ শান্ত তৃপ্ত এ আমার মন !
চাহিবার থাকে যদি কিছু মোর, ভারতি, নন্দিতা,
শুনো শুনো চিত্ত মোর রহে যেন তোমাতে বন্দিতা !
অপরাহ্ণ পরে যবে ধীর পায়ে আসিবে নিশীথ,
তোমার বীণার সুরে নব ছন্দে নব নব গীত—
আমার শ্রবণে প্রাণে ছেয়ে রেখো বিরামবিহীন—
তারি মাঝে পূর্ণ-তৃপ্ত আত্মা মোর হয়ে যাবে লীন ।

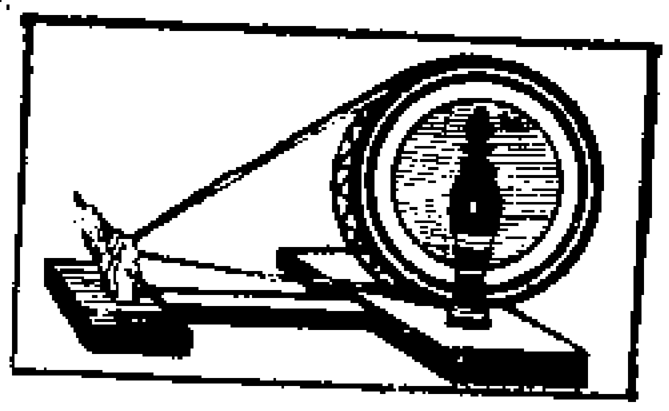
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ।

আবেদন

শতেক ভক্ত কত উপচারে,
করিছে তোমার আরতি,
এ অযোগ্য দিলে ব্যর্থতা শুধু
তোমার চরণে ভারতি !

রিক্ত আজি যে সেবক তোমার
কোথা পাবে কনকাঞ্জলি ?
অক্ষমতার ব্যথাটুকু তার
তুলুক ও বীণা চঞ্চলি' !

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ।



দুর্ব্বলের বল

(ভারতীর জন্য লিখিত)

রক্ষকহীন দুর্ব্বলতম জাতিরও মানরক্ষার অস্ত্র অহিংস আন্দোলন। স্ত্রীলোকদিগকে দুর্ব্বলতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই ধার্য্য করিয়া আসা হইয়াছে। দেহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দুর্ব্বল হইলেও আত্মা ও মনের দিক দিয়া তাঁহারা বলবত্তমের অপেক্ষাও বলবতী হইতে পারেন। চরকা তাহার যাবতীয় ফলিতার্থের সহিত আধুনিক ভারতীয় পুরুষ ও নারীর অহিংস বলের মূর্ত্তিমান্ প্রতিভূ। এই আশ্চর্য্য চক্রকে অস্ত্ররূপে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিলে গ্রেট্‌বৃটেন্ ভারতের সহিত তাহার কেবলমাত্র স্বার্থপর সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইবে। তখনই ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের সংযোগ পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য হইবে। ভারতীয় নরনারী বিশেষ করিয়া নারীগণ চরকায় সূতা কাটাকে নিজেদের দৈনিক কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশের দুর্ব্বলতম যে মানুষটী তাহারও স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁহারা নিজেদের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিলেন ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

এম্, কে, গান্ধী।

চরকার গানের স্বরলিপি

[খাম্বাজ কীর্ত্তন—দাদ্‌রা]

কথা সুর ও স্বরলিপি—নজরুল ইস্‌লাম।

কোরাস্ { ঘোর্—
ঘোর্‌রে ঘোর্ ঘোর্‌রে আমার সাধের চরকা ঘোর।
স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর

(১)

ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুন্‌তে যেন পাই
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহ-দুয়ার আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে আসল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর॥

(২)

ঘর ঘর তুই ঘোর্‌রে জোর
ঘর্ঘর্ ঘর্ ঘুর্ণীতে তোর ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুর্-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ কামানের টুটুক জোর॥

(৩)

তুই ভারত-বিধির দান
এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার ঘরের লক্ষ্মী আস্‌বে ঘরে শুনে তোর ঐ গান।
আর লুটতে নারবে সিন্ধু-ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোর॥

(৪)

হিন্দু মুস্‌লিম দুই সোদর
তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে রচ্‌লি চক্রে তোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।

(৫)

ভারত　বস্ত্রহীন যখন
কেঁদে　ডাক্‌ল নারায়ণ !
তুমি　লজ্জাহারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ।
তাই　দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হর্‌তে পার্‌ল না দুঃশাসন চোর ॥

(৬)

এই সুদর্শন চক্রে তোর
অত্যাচারীর টুট্‌ল জোর রে ছুট্‌ল সব গুমোর
তুই ঘোর্‌ ঘোর্‌ ঘোর
তুই　জোর-জুলুমের দশমগ্রহ বিষ্ণুচক্রে ভীম কঠোর !

(৭)

হয়ে　অন্নবস্ত্রহীন
আর　ধর্ম্মে কর্ম্মে ক্ষীণ
দেশ　ডুব্‌ছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন　আন্‌লে অন্ন পুণ্য-সুধা খুল্‌লে স্বর্গ-মুক্তি-দোর ॥

(৮)

শাস্‌তে জুলুম নাশ্‌তে জোর
খদ্দর বাস ধর্ম্ম তোর রে অস্ত্র সত্য ডোর
তুই　ঘোর্‌ ঘোর্‌ ঘোর।
মোরা ঘুমিয়ে ছিলাম জেগে দেখি চল্‌ছে চরকা, রাত্রি ভোর ॥

(৯)

তুই　সাতরাজারই ধন,
দেশ-মার পরশ-রতন,
তোর　স্পর্শে মেলে ধর্ম্ম অর্থ কাম্য মোক্ষধন।
তুই　মাথার মাণিক মায়ের আশীষ, চোখ ছেপে বয় অশ্রু-লোর ॥

(খাম্বাজ কীর্ত্তন—দাদ্‌রা)

II পা র্সা ণা I ধা^ণা পা -া I II পা ধা পা I র্সা ণা ণধা I পা ধা পা I
ঘো ০ ০ ০ ০ র্ ঘো র্ রে ০ ঘো র্ ঘো র্ রে

গা মা -া I পা -া -া I না -া -া I র্সা -া -া I -া -া -া I
আ মা র সা ধে র চ র্ কা ঘো ০ র্ ০ ০ ০

র্সা II র্সা র্সা র্রা I র্রা র্রা -া^র্গা I র্রা -া র্গা I র্মা র্গা -া I
ঐ স্ব রা জ র থে র আ গ ০ ম নী ০

র্রা -া -া^র্গা I র্সা -া না I ধা ধা না I র্সা -া -া I II
শু নি ০ চা কা র শ ব্‌ দে তো ০ র

পা -া II পা ধা ধা I পা র্সা না I ধা -া -া I ধা ধা না I
তো র ঘো রা র শ ব্‌ দে ভা ০ ই স দা ই

পা পা পা I না না না I র্সা -া -া I -া -া -া I র্সা র্রা া I
শু ন্‌ তে যে ০ ন পা ০ ই ০ ০ ঐ খু ল্‌ ল

র্রা -া -া I র্রা -া র্গা I র্মা র্গা -া I র্রা র্গা র্রা I র্সা নধা না I
স্ব রা জ সি ং হ দু য়া র আ র বি ল ম্‌ ব

র্সা -া -া I -া -া -া I র্সা র্রা -া I র্রা -া র্গা I র্রা -া র্গা I
না ০ ই ০ যু ঙ্গে আ স্‌ ল ভা র ত ভা ০ গ্য

র্মা র্গা -া^র্মা I র্রা র্গা র্রা I র্সা না র্সা I ধা ধা না I র্সা -া -া I II
র বি ০ কা ট্‌ ল দু খে র রা ০ ত্রি ঘো ০ র

II পা ধা ধা I ধা র্সা^র্রা না I ধা ধা ধা I ধা -া -া I র্সা র্সা র্সা I
ঘ র্ ঘ র্ তু ই ঘো র্ রে জো ০ র ঘ র্ ঘ

র্সা র্সা র্সা I না না র্সা I ধা ধা না I পা পা ধা I মা মা পা I
র্ ঘ র্ ঘু র্ নী তে তো র ঘ চ ক ঘ মে ব

পা পা পা I -া -া -া I পা -া -া I ধা নর্সা র্সনধা I ধা নধা নধপা I
ঘো • র　ও তু ই　ঘো ◦ র্　ঘো ◦ র্　ঘো • ◦

ঋা -া পা I র্সা -া I র্সা র্রা র্রা I র্রা -া -া I র্রা র্রা র্গা I
◦ • র　তো র　ঘু র্ চা　কা তে •　ব ল দ

র্মা র্গা র্গার্মা I র্রা র্গা র্রা I র্সা না র্সা I ধা ধা না I র্সা -া -া I II
র পী র　তো প কা　মা নে র　টু টু ক　জো • র

(১) (৩), (৫), (৭) ও (৯) একই রকম সুর

এবং

(২), (৪), (৬) ও (৮) একই রকম সুর।

কবির দীপিকা

[চীনপ্রয়াণোন্মুখ কবি একখানি পত্রের উত্তরে, এই আলোটুকু দিয়া যান। পত্রখানি এই:—

"আমি কিছুকাল থেকে সংসার-রঙ্গভূমির নেপথ্যে সরে পাঠ মুখস্থ করছি। ষ্টেজ-ম্যানেজার আবার যখন ডাকবেন যেন অপ্রতিভ হতে না হয়, এ জীবনেই জীবনের পড়াটা যেন শেষ করতে পারি। তোমার হাতের সরল টীকায় আমার পাঠ্য সুবোধ ও সরস করার লোভে যখনই সুবিধে পাই তোমার টুকিটাকি যা-কিছু হাতে পড়ে তাতে কবির দীপিকা সাগ্রহে খুঁজি। "যৌবন রসে উচ্ছল দিনগুলি" পড়লুম। "বৈরাগ্য-বিলাস"এর বিরোধী তুমি। পাঞ্জাবের আধুনিক কবি ইক্‌বাল সম্বন্ধেও একজন মন্তব্য করেছে—The abnegation of desire seems to him a fatal blunder—কিন্তু একথাও বলছে—"He preaches self-realisation as opposed to self-abnegation"-আমাকে বুঝিয়ে দেবে "self-abnegation বা বৈরাগ্য-বিলাস ব্যতীত self-realisation সম্ভব কিনা? দ্বিধায় ভ্রাম্যমাণদের কবির আলোয় পথ দেখিও। বেশী সময় না থাকে দু-চারটি কথায় লিখো।"

কবি যাহা লিখিয়াছেন সেটি এ বিষয়ে শেষ কথা কিনা তার জন্য আলোচনার পথ [illegible]]

আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলে চিঠির সম্পূর্ণ জবাব দেওয়া সম্ভব হবে না। আমার নিজের মত এই যে, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই মন্ত্রটির দ্বারাই সৃষ্টির চরম তাৎপর্য্য প্রকাশ হয়েছে। আনন্দরূপই হচ্ছে সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যই হচ্ছে অমৃত, অর্থাৎ মৃত্যুহীন, নিত্য ; বাহ্য তিরোধানের দ্বারাও তার নিত্যতা বিলুপ্ত হয় না। যদি শক্তি এবং কর্ম্মরূপই চরম হত, তাহলে আমাদের স্নায়ু মাংস পেশী পাকযন্ত্র হৃদ্‌পিণ্ড বিধাতা কায়ার আবরণে এমন করে ঢাকা দিতেন না। শক্তিকেই যদি দেখাতেন তাহলে নক্ষত্রলোক দেখে আমরা মূর্চ্ছা যেতুম। সৌন্দর্য্যকে যারা চাপল্য বলে, তারা জানে না যে সে অপবাদ তারা অনন্তের উপরে আরোপ করে। সৌন্দর্য্যের মধ্যেও ত্যাগের সাধনা আছে, বিকৃতি থেকে নিজেকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে সুন্দরের তপস্যা আছে। কিন্তু আমাদের বৈরাগ্য-বিলাসী দৈন্য-মদমত্তরা সে তপস্যার কথা জানে না। তারা বলে লড়াই কর। লড়াই করতে হলে কড়া হতে হয় এবং তার কৃত্রিম সাধন দেখে লোকে বাহবা দেয়। আমরা বলি আপোষ কর—আপোষও কখনো বিনা ত্যাগে হয় না, কারণ আপোষ সত্যের পূর্ণতার উপরেই সম্ভব—এক পক্ষের দাঁতখিঁচুনির উপর নয় ;—সৌন্দর্য্যের এই সংযমকে দেখা যায় না, কারণ সংযমই সেখানে লক্ষ্য নয়, সৌন্দর্য্যই লক্ষ্য ;—এই জন্যে যারা জীবনের রঙ্গক্ষেত্রে মেড়ার লড়াই না দেখলে বাহবা দিতে জানে না, তারা সে ক্ষেত্রে ফুল ফোটানো দেখলে সেটাকে বলে বিলাস। ভগবান নিজে মেড়ার লড়াইয়ের বাহবা চাননি, তিনি আনন্দরূপ প্রকাশ করে আমাদের আনন্দকেই উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন এই কথা বলবার জন্যে কবির প্রয়োজন।

রবিমামা—

বুর্‌কা

বন্ধুটীর প্রকৃত নাম ধাম আপনাদের কাছে কিছুই বল্‌তে পার্কো না। তাঁকে আমি 'রজত' বলেই ব'লে যাব। কিছুদিন আগে এই ভদ্রলোককে নিয়ে যে এক বিষম বিপদে পড়েছিলাম সেই কথাই আপনাকে বল্‌তে চাই।

রজতের সঙ্গে আমার অনেক দিনের জানাশোনা। জীবনের প্রথম বসন্তে আমার ফাল্গুনী-চয়নের মধ্যে পাওয়া বন্ধুদের ভিতর রজতকে আমি আজ অবধি ভাল ক'রে বুঝে উঠতে পারিনি। তার চোখ দুটীর মধ্যে দুপুর রাতের আকাশের মত কেমন ধারা একটা অতলস্পর্শতা লক্ষ্য ক'রে কলেজে প্রথমেই তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম। তারপর থেকে তার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি ও আমাদের দুজনেরই অনেক গুলো বছর নানা রকমের সুখ দুঃখের মাঝ দিয়ে কেটে গেছে। রজত বরাবরই একটু বেশী রকমের রোমান্টিক প্রকৃতির যুবক। তার প্রাণটী যেমন নরম তেমনি ভাবপ্রবণ। ছাত্র জীবনে অনেক সময় লক্ষ্য করেছি যে অতি সামান্য কারণে কখনও বা তার সমস্ত অন্তর রাঙ্গা অশোক গুচ্ছের মত কেঁপে কেঁপে উঠত আবার কখনও বা বর্ষারাতের মেঘের মত জলভরা নীরবতায় থমথমে হয়ে থাকৃত। কিন্তু সব জিনিষের চেয়ে আশ্চর্য্য ছিল তার হাসি। মানুষের হাসির মধ্যে এত তরলতা এত স্বাধীনতা এত উচ্ছাস যে থাকৃতে পারে তা আমি এর আগে কখনও দেখিনি। কত বড় বড় আঘাত যে তার এই পাহাড়ে ঝড়ের মত হাসির সুমুখে কোথায় উড়ে গেছে—সহপাঠীদের কত দাম্ভিকতা যে এই হাসির স্রোতে ঐরাবতের মত ভেসে গেছে তার আর ইয়ত্বা কর্ত্তে পারা যায় না। সমস্ত জীবনটা তার যেন কবিত্বের ভাবে ভরা ফানুষের মত ছিল। আমাদের চারিদিকে ছড়ান ছোটো খাটো জিনিষের মধ্যে যে এতখানি কাব্য রয়েছে—কুমোরের গড়া নতুন মাটির কলসীটি যে কোন অদেখা গ্রাম্যবধূটির জন্যে বিরহচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—মা বসুন্ধরা যে ছেলেমেয়ের বেশে দোকানে সাজান পুতুলের মধ্যে রূপান্তরিত হ'য়ে শিশুদের ডাকৃছে,—"আয়, আয় আয়"—রাস্তায় ছড়ান অভ্রের চিক্‌চিকে কুচিগুলি যে বিরহী যক্ষের প্রথম আষাঢ়ের জমাট চোখের জল—এ সব কথা রজত যখন অনুভূতির সঙ্গে শুকতারার মত চোখ দুটি তুলে বল্‌ত তখন এমন কি আমার মত গদ্যময় মানুষেরও ভিতরে যেন একটু কাব্যের কাঁপন ধ'রে উঠত—আর মনে মনে সঙ্কল্প কর্ত্তাম যে আজ রাত্রে নিশ্চয়ই কবিতা লিখবো। কিন্তু এদিকে যাই হোক্, রজতের চিন্তার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য, সমাজতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়েই ফুটে উঠেছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সে প্রায় আগনষ্টিক্ ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে পুরো সভার্ণ ছিল। একদিন আমাদের ভাগবৎ-রত্ন মশায় চৈতন্যের তিরোধানের বিষয়

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি, রজত কেঁদেই আকুল। বাইরে এসে সকলে তাকে চেপে ধরলুম, বললুম, "কি হে তুমি না আগনষ্টিক? ও সব কিছু বিশ্বাস কর না?" বাঁধভাঙ্গা নদীর জলকল্লোলের মত একটা হাসি হেসে রজত বল্লে,—তোমরা ভাবছ বুঝি আমি ধর্ম্মের ভাবে গ'লে গিয়ে কাঁদ্‌ছিলাম? আমি অস্থির হ'য়েছিলাম এই ভেবে যে চৈতন্য লোকটা কত বড় প্রেমিক, কতবড় কবি ছিলেন। কালো মরণ যখন ঢেউ হয়ে এসে দেখা দিল তখন তিনি তাকে বুকে ধ'রে প্রাণ থেকে বুঝি বল্লেন "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।" এই রকম আরো অনেক ঘটনার মধ্যে দেখেছি যে রজত অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণ অসাধারণ।

এই রকম করে ছাত্রজীবন রজতের সঙ্গে কেটে গেছলো। তারপর সে এম, এ, পাশ ক'রে কিছুদিনের জন্যে পশ্চিমে কোনো সহরে চাকরী নিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে চিঠি পত্র লিখত, কোনও কোনও চিঠি বুঝতাম কোনটা বা বুঝতাম না। অনেকদিন পরে সে আবার কলকাতাতে ফিরে এলো। আমি বল্লাম "কিরে ফিরে এলি যে?"

সে বল্লে, "সেখানে কাজ ভাল লাগলো না। দেশেই কোথাও চেষ্টা কর্ব্ব।" কিন্তু তার ভিতর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। সে কিছু ম্লান হয়ে গেছে মনে হলো। তবে আমাদের আড্ডাতে সে প্রায়ই আসত ও আমাদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করতো। কেন যে চাকরী ছেড়ে এলো তা কারুর কাছে বলেও নি আর কেউ জিজ্ঞাসা কল্লে সে একটু অভিভূত হয়ে পড়ত বলে মনে হয়। কাজেই আমরা সে বিষয়ে কেউ কোনও কথা কইতুম না। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য কল্লাম যে তার আর কোনও কাজের চেষ্টা করবার কোনও আগ্রহই নেই। ছেলেবেলা থেকেই সে মাতৃহীন। বাড়ীতে তার বাবা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। অবস্থা তাদের বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু তাই বোলে যে একজন যুবক কোনও কাজ না করে জীবনটা কাটাচ্ছে তাও কেমন বিশ্রী দেখাত। তাছাড়া ক্রমেই দেখা যেতে লাগল যে তার সংসারের কোনও বিষয়েই যেন কোনও আসক্তি নেই। কেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা ভাব। পাহাড়ে দেশের হাওয়ায় ওড়া মেঘের টুকরোর মত দৈনিক জীবনের ঘটনাগুলোর চুড়োয় চুড়োয় ক্ষণিকের জন্যে নির্লিপ্ত হয়ে থমকে থেকে আবার নিরুদ্দেশে ভেসে যাওয়ার মত কেমনতর একটা ভাব তার দেখতে লাগলুম। বিশেষ আর একটা জিনিষ চোখে পড়ল যে তার কাব্যপ্রবণতা আর তেমন নেই। একদিন তাকে বল্লুম—"হ্যাঁরে তোর দেখছি যে অমৃতে অরুচি হলো। কবিতার সঙ্গে তোর যে একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছে।" সে ডাইনে থাওয়া চাঁদের ম্লান আলোকের মত কেমনতর একরকম আধমরা হাসি হেসে বল্লে "ভাল লাগেনা আর।" একটু পরে চোখ দুটোর মধ্যে কেমন একটা ব্যর্থ জিজ্ঞাসা ঘসা কাঁচের ঘোলা রঙের মত ঘনিয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে কি বল্লে প্রথম বোঝাই গেলনা। কিন্তু স্বরটা মনে হোলো যেন কবরের মধ্যের কোনও অদেহী গায়িকার প্রেতরাগিণী ভিজে

অন্ধকারের ভেতর থেকে গুমরে গুমরে বেরিয়ে আসছে। ভাঙ্গা গলায় আস্তে আস্তে বল্‌ছে, শোনাগেল—"জীবনটা কাব্যের একটা নরকঙ্কালের মত। একটা যেমন বীভৎস অন্যটা সেই রকম মিথ্যা—আর দুটো নিয়ে একটা ভোজবাজী মাত্র।" আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। এ সব বড় বড় হেঁয়ালি আমার মোটেই মাথায় ঢোকে না। আমি বুঝি যে খেয়ে দেয়ে যেটা ধারণ করি সেইটেই জীবন আর মাষ্টার মশায়রা কেতাব থেকে ছন্দে মেলান যে লেখাগুলো স্কুলে কলেজে পড়ান তাই হলো কাব্য। আমি বল্লুম, "তোর হেঁয়ালী রাখ। এসব কি বাঁদরামি হচ্ছে তোর? একটা কাজকর্ম্ম দেখ, একটা বে যোগাড় করে দি বাস্। তারপর যা ইচ্ছে কর।" ও তো কোনও কথাই কয় না—খালি হাসে—কিন্তু সে কি হাসি—সে যে হাসির অনেক দিন মরে যাওয়া একটা প্রেতাত্মা। ভয়ও হলো, ভাবনাও হ'লো। ছেলেটার মাথা বিগড়ে গেলনা ত? সেই দিন বিকেলে তার বাবার কাছে গেলুম। বুড়োত আমি যেতে প্রায় কেঁদে ফেল্লেন বল্লেন, "কি জানি বাবা ওর যে কি হ'লো কিছু বুঝিনে। আমি ওর হাতে ধরে পর্য্যন্ত বলেছি ওকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে কিন্তু ও কোন কথাই কয় না। কেউ যাদুটাদু কল্লেনাত? ছেলেটা যেন আধপাগলা গোছের হয়ে যাচ্ছে। বাবা, তোমরা ওর বন্ধু যদি বলে কয়ে ওকে বিয়ে করাতে পার তবে এই বুড়োর শুক্‌নো শেষজীবনটাতে একটু আনন্দ ফুটিয়ে তুল্‌তে পার। আহা, আজ যদি ওর মা বেঁচে থাকতেন তাহ'লে বোধ হয়"—বুড়ো ভদ্রলোক আর বল্‌তে পাল্লেন না—গলা ধরে এল। তাইত আমি এ কাজে হাতে দিলুম। স্থির কল্লুম ওর বিয়ে যে ক'রেই হোক দিতেই হবে। বন্ধু বান্ধব সকলে মিলে ওকে অনুরোধ উপরোধ অনেক করলুম। আমি ওর সঙ্গে অনেক তর্ক কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তে লাগলুম কিন্তু ওর নাগাল পায় কে? একবার মনে কল্লুম, "ছোঁড়াটা প্রেমে ট্রেমে পড়ে নি ত? বলা যায় না, আজ কালকার সব মডার্ণ ছেলে, হোতেও পারে।" কিন্তু কোনও আভাস ইঙ্গিত পেলুম না। একটা জিনিষ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য কচ্ছিলাম যে রজত মেয়েদের সঙ্গ একেবারেই পরিত্যাগ করেছে। আগে ত আমাদের বাড়ীর কি অন্য বন্ধুদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব ছিল। শেলী, রবীন্দ্রনাথ, সুইনবার্ণ চর্চ্চা করে সময় নষ্ট করবার লোক মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পেত—অবশ্য তাঁদের ঘরের কাজকর্ম্মের অবসরে। কিন্তু আজকাল সে যে মেয়েদের সঙ্গে শুধু মিশতনা তাই নয় সে তাদের ছায়াও মাড়াতনা। বিশেষ ভয় ছিল তার আমাদের মত লোকের বাড়ীর ঘোমটাপরা মেয়েদের। আগে আগে রজত ঘোমটার উপর কত কবিত্বই করেছে। তখন বল্‌ত, এই যে ঘোমটার রীতিটা এটা যেমন একদিক থেকে একটা অতি সূক্ষ্ম মনোবৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির ফল আবার অপর দিক থেকে তেমনি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব জ্ঞানের ও কবিত্বের প্রকাশ। উঁচুতীরের বালির পাহাড়ের ফাঁক থেকে সমুদ্রের জলের কালো ইঙ্গিতটুক চকিতে দেখতে যেমন মনোরম সাদা কাপড়ের পর্দ্দায় থেকে কালো চোখের তরল

আভাসও তেমনি বিস্ময়কর।" এমনি আরও কত কি। এখন কিন্তু ঘোমটা দেখলেই ছুটে পালিয়ে যেত। আমি বিশেষ এইটে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছলুম। এই সবের জন্যে আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে তাকে বিয়ে করান কত শক্ত হবে। অনেক চেষ্টা করেও কিছু কর্ত্তে পাল্লুমনা। এক বছর কেটে গেল। তারপর একদিন আমরা সকলে মিলে অনেক বলাকওয়া কল্লুম, বল্লুম,—"তোমার বাবার বুক ভেঙ্গে গেছে—তিনি, এ রকম কল্লে শীঘ্রই মারা যাবেন, সে পাপ তোমার লাগবে।" বাপের ওপর তার অসীম ভালবাসা ছিল। এই কথা শুনে সে হঠাৎ খুব গম্ভীরভাবে বল্লে, "আচ্ছা বিয়ে কর্ব্বো।" আমরা সব লাফিয়ে উঠলুম উৎসাহে। একজন গরীব ভদ্রলোকের একটি চন্দ্রমল্লিকার মত সুন্দর মেয়ের সঙ্গে সব ঠিক করে ফেল্লুম। সে ভদ্রলোক বাড়ীঘর বিক্রী করে একজনদের এক এল্, এ, ফেল ছেলের সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক করেছিলেন। আমি তাকে বলাতে তিনি আশাতীত প্রস্তাবে আনন্দে সেখানের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেন। এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল। মেয়ে দেখে রজত পছন্দ কল্লে। আশীর্ব্বাদী হয়ে গেল। ভাবী শ্বশুর সমস্ত ঠিকঠাক কল্লেন। বিয়ের আগের দিন আমাদের আড্ডাতে সকলে বসে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে। রজতও আছে। আজকে সে কতকটা প্রফুল্ল। আমি পুরানো বিবাহিত, ভাবলুম "বিয়ের নামে মরা গাছেও মঞ্জরী হয় তা রজততো কবি।" আমাদের বন্ধু হারিৎ বলে উঠল,—"ওহে রজত, পাকা দেখার দিনে তোমার বউকে দেখলুম, খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার ভাইরা যখন হাত ধরে নিয়ে এল মনে হোলো সেই রূপ-কথার পারুল বোন্টী। গাছের ডগার ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে অনেকদিন পরে মাটিতে পা-দিয়ে যেন কেমন কেমন করে পৃথিবীটাকে দেখতে লাগল। তখন তার রূপ যেন রূপ-কথার মতই সরল অথচ রহস্যময়।" নগেন বল্লে, "কিন্তু বিয়ের দিন যখন ঘোমটার মধ্যের থেকে তাকে দেখবে রজত তখন মনে হবে যেন তোমার পারুলটী রূপ-কথার পাঁপড়ি গুলির মধ্যে মুখ লুকিয়ে মিটিমিটি চোখে উঁকি দিচ্ছে।" যেই এই কথা শোনা অমনি রজত চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল—পোড়ো-বাড়ীর ভাঙ্গা জানালার ভেতর থেকে যেমন করে ঝোড়ো বাতাস সোঁ সোঁ করে ঝলকে ঝলকে বেরোয় তেমনি করে ভাঙ্গা গলাতে বল্লে,—"ঘোমটা ঘোমটা !! না না ঘোমটা পরা মেয়ে সইতে পার্ব্বনা।" আমি কিছু বুঝতে না পেরে একটু রসিকতা করে বল্লুম—"ওরে বিয়ে করে না হয় মেমসাহেব করিস্ সে ত সুখের কথা। আমরাও আলাপ সালাপ কর্ত্তে পার্ব্বো।" কিন্তু রজত কেমন একরকম করে চেয়ে দুবার চা'র বার 'ঘোমটা' কথাটা আবৃত্তি ক'রে বেরিয়ে চলে গেল। তার পরদিন সর্ব্বনাশ। রজত কোথায় চলে গেছে। কোনও সন্ধান পেলুম না। মেয়ের বাপের মাথায় বজ্রাঘাত। রজতের বাপ ত বসে পড়্‌লেন। পাড়ার ডাক্তার গিরীন বাবুর কাছে গেলুম। তাঁর সঙ্গে রজতের বরাবরই খুব ভাব ছিল। প্রায় সে সেখানে যেত। তিনি সব শুনে বল্লেন, "তোমাদের আগে আমাকে বলা উচিত ছিল।

রজতের এখন বিয়ে হ'তে পারে না।" আমরা কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বল্লেন—"সে ভয়ানক হিষ্টেরিক্।" আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, "তাতে কি? হিষ্টেরিক্ হ'লে বিয়ে হবে না কেন?" তিনি বল্লেন, "সকল বলতে গেলে অনেক ল্যাঠা। তা ছাড়া তোমরা বুঝবেও না। আমি তাকে অটো সাজেস্‌সন্ ও ফ্রি সাজেস্‌সন্ ট্রিটমেণ্টে রেখেছিলুম। অনেকটা শুধ্‌রেও এনেছিলুম। তোমরা আবার সব মাটি কল্লে।" আমি তখন তাঁকে গোপনে নিয়ে গিয়ে বল্লুম,—"মশায় ব্যাপার কি খুলেই বলুন না। মেয়ের বাপের যে সর্ব্বনাশ।" তিনি তার উত্তরে বল্লেন—"আচ্ছা, এই তার ডাইরী নাও—খুব গোপনে পড়ো। তুমি তার বিশেষ বন্ধু তাই দিলুম। এর থেকেই তার কিউরিয়াস্ হিষ্টিরিয়া ও বিয়ে না করার কারণ বুঝতে পার্ব্বে। রজত এখন অ্যাবনর্ম্মাল। তাকে এখন জোর করে বিয়ে দিলে বড়ই কুফল হবে।

ঘোমটা জিনিষটা প্রথমে nervous shock ও পরে Repression এর ফলে complex হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ complexটাকে যতদিন তার অচেতনের অন্ধকার গুহার ভেতর থেকে টেনে বের ক'রে ওর চেতনার স্পষ্ট আলোর মধ্যে ধরানো না যাবে ততদিন ওর অসুখ সারবে না।" ডাক্তার বাবু আর বেশী কিছু বল্লেন না।

আমি কিছু না বুঝে এবং আর কিছু না ব'লে ডাইরী খানা নিয়ে চলে এলুম। পড়লুম— আশ্চর্য্য—কিন্তু ডাক্তার বাবুর কথার অর্থ এই ডাইরীর সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পাচ্ছিনে। তাই আপনাদের কাছে পাতা কখানা নিয়ে এসেছি। আশা করি আপনারা আমাকে এই ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট ক'রে নিতে সাহায্য কর্ব্বেন। আপনারা বোধ হয় মেয়ের বাপের জন্য একটু চিন্তিত আছেন। তাই বলে রাখি আমাদের বন্ধু হারিৎ যিনি মেয়েটিকে সাত ভাই চম্পার পারুল দিদির মত দেখেছিলেন—তিনি যেন পরোপকারের জন্য খুব নিস্বার্থ ভাবে বিয়ে করে আমাকে ও মেয়ের বাবাকে বাঁচিয়েছেন আর তিনিও নিশ্চিন্ত হয়েছেন কতকটা বোধ হয়।

রজতের ডায়েরী।

(প্রথম পাতা)

লিখতেই হবে জীবনের এ অধ্যায়টা। আমারি আঙিনাতে যে মহোৎসব হয়ে গেল তার বিদায় রেশ এখনও আমার সমস্ত শিরার মধ্যে রিণি রিণি কচ্ছে। বুকের গরম রক্ত আজ আমার কলমের মুখের কাছে এসেছে। প্রকাশের উন্মাদনা আজ রক্তমুখী হয়ে আমার অপ্রকাশের দরজায় আঘাত কচ্ছে। আজকের অক্ষর ক'টা ধূমকেতুর মত আমার ডাইরীর পাতাতে জ্বলতে থাক্ কেন না আমার কেবলই ভয় হচ্ছে পাছে স্মরণের এই পৃষ্ঠাটুকু পরে ঝাপসা হয়ে যায়। এখন থেকেই সব ঘুলিয়ে যেতে সুরু হয়েছে। সবটাই সত্য না সবটাই স্বপ্ন এখন যেন কিছুই ঠিক কত্তে পাচ্ছিনা। আর কোনটা

সঙ্গে স্বপ্নের বিপুল অস্পষ্টতা আর প্রচুর রঙীন নেশা এমন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশে গেছে কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা অসত্য বিশ্লেষণ ক'রে বোঝবার উপায় নেই। তবে আমি বাইরের ঘটনা দিয়ে সত্য অসত্য বিচার করি না। আমার অন্তরের আনন্দ বেদনাই আমার সত্যের মাপকাঠি। তাই বলি এই যে আমার মধ্যে প্রচুর সুখতরা ব্যথা সেইটেই যেন আমার কাণের কাছে বল্‌ছে—"সত্য, সবই সত্য। আমি অদেহী রূপের সাধক'—সাধনা আমার পূর্ণ হয়েছে—দেবী আমার এসেছেন আমার ঘন আনন্দ বেদনের মধ্যে। পঞ্চমুণ্ডী সাধক যেমন সার্থকতার আগে বিভীষিকা দেখে আমিও একবার তাই দেখেছি। তাতে আমার সাধনার কিছু ক্ষতি হয় নি। আজ আমি সব কথাই বলে যাব। দেবী এসেছেন।

দ্বিতীয় পাতা

কল্‌কাতার জীবনের একঘেয়ে ঝনঝনানিতে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছলো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের রুদ্ধ বাতাসে হাঁফ ধরে উঠেছিল। পড়বার ঘরের জানালার ধারে বসে মাঝরাত্রে অনেক সময়ে নিশির ডাকের মতন সুদূরের ডাক শুনেছি। মনে হয়েছে যেন বাড়ীর পাশের পোড়ো বাগানে বিশ্বমাতা সমস্ত বিশ্বের খোলা আকাশ, খোলা হাওয়া নিয়ে পরদেশীসুরে আমার জন্যে আহ্বানবীণা বাজাচ্ছেন। সুর শুনে কতবার আনমনে ব'লে উঠেছি—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও মোহন বাঁশরী,
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি।"

সেই বিশ্বমাতার আমন্ত্রণলিপি যেদিন প্রথম এল, চাকরীতে বাহালি পরওয়ানার রূপ ধরে সেদিন তাকে আনন্দে বরণকরে নিয়েছিলুম। প্রথম এসে সুদূর পশ্চিম বড় চমৎকার লাগল। মনে হোলো যেন এখানে জীবনপুঞ্জের প্রকাশ বাঙ্গলা দেশের চেয়ে অনেক বেশী চঞ্চল ও লীলাময়। এখানকার লোকদের এগিয়ে চলার গতি এত চপল ও বিচিত্র বলে বোধ হ'তে লাগল যে মনে হোলো এরা যেন প্রকৃতির কারখানা থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসে আপনাদের রক্তের বেগ সাম্‌লা'তে না পেরে নাচের ভঙ্গীতে খেলার মধ্যে দিয়ে কাজ খুঁজতে ছুটে চলেছে। কলরবে ভরা ছটকটে মানুষগুলি যেন জীবনের ফোয়ারা। ভেতরের রঙিণ আনন্দ ঝরঝর করে বেরিয়ে ওপরে ছিটিয়ে প'ড়ে যেন নানা রংএ তাদের পোষাক পরিচ্ছদের একটা উপন্যাসিক বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। মেয়েরা দেখলুম খুব স্বাধীন ও সবল। একটা সহজগতিকে সহজভাবে লীলায়িত করে তারা বেশ বেপরোয়া হয়ে যেন জীবনের রাস্তায় হোলিখেলা কর্ত্তে বেরিয়েছে। দেখে শুনে সব লাগল মন্দ নয়। আমার বাংলাটী সহরের শেষের দিকে ছিল। একলাই থাকতুম। কাজের অবসরে রাস্তার লোক চলাচল দেখতুম। কখনও কখনও বাঙালীদের আড্ডাতে গিয়ে একটু আধটু গল্পগুজব

পর ঘণ্টা রাস্তার দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিতুম। জনস্রোতের পরিবর্তনশীল ধারাবাহিকতা এক এক সময় অন্তরের ভেতরে গ্রহণ করে, তার সঙ্গে অন্তর্জগতে চঞ্চলগামী ছায়ামূর্ত্তিদের বেশ গাঢ়ভাবে এক ক'রে নিয়ে ভেতর বাইরের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অথচ নিবিড় সামঞ্জস্য উপলব্ধি কর্ত্তে কর্ত্তে পরম পুলক অনুভব কর্ত্তুম। এমনি করে ভেতর বাইরের আদান প্রদানের কুটুম্বিতার মধ্য দিয়ে অচেনা রাস্তার জগতটীকে পরম-আপনার করে তুলেছিলাম। সবজীওয়ালা ব্যস্ত হয়ে যাওয়া ও ধীরে ফিরে আসা,—বুড়ো পাদরীর কুকুরটি সঙ্গে নিয়ে রোজ সকালে হাওয়া খেতে যাওয়া, টাঙ্গাওয়ালার বুক ফুলিয়ে গাড়ী হাঁকান, ঘুঁটেওয়ালীর মাথায় ঝাঁকা করে ছোট ছেলেটীর পানে মিষ্টি অভিযোগের ভাবে তাকাতে তাকাতে পথচলা, পাশের মাঠে বুড়ো মোল্লার নমাজ করা ;—এসব যেন আমার ঘটনা বিরল জীবনের দরজার কাছে ভিড় করে এসে তাদের দৈনিক পাওনা আদায় করে নিয়ে বিশ্বজীবনের সার্থকতা দিয়ে আমাকে পূর্ণ ও সার্থক করে দিত। এমনি করে খুব অচিন অথচ পরম আত্মীয় রাস্তাটির সঙ্গে নীরবে আলাপ আপ্যায়িত করে আমার দিনের পর দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। এক এক সময় যখন বড় একলা একলা ঠেকত আর মনে হতো বুকটা বড় খালি খালি তখন তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতুম, আর হাজার লোকের পায়ের শব্দের মধ্যে আমার এই পরমআত্মীয় পথ-বন্ধুটির বুকের প্রীতিস্পন্দ যেন শুনতুম ও অনুভব কর্ত্তুম। মনে হতো, এই পথটী যেন বিশ্বের ভেতর থেকে সমস্ত আদর ও আহ্বানটুকু আহরণ করে নিয়ে বিশ্বপ্রিয়ার মত আমার কাছে অভিসারে আস্‌ছে। আমার বুকের খালি জায়গাটা পূর্ণ হয়ে উঠত। এমনি করে দিনগুলি বেশ কাটছিল।

তৃতীয় পাতা

সেদিন ছুটীর দিন। ফাল্গুন মাসটা সবে মাত্র শেষ হয়েছে। সকালে আমি লনে চেয়ারে শুয়ে আছি পথের দিকে চেয়ে। এখানে শীত একটু দেরীতে শেষ হয়। আজকের হাওয়াতে যেন একটা চঞ্চল অপেক্ষা কার জন্যে কেবলিই কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। খুব রোগের পর সেরে উঠ্‌লে প্রকৃতি যেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বপ্নেভরা সৌন্দর্য্যে কেমন এক রকম খুব নতুন অথচ প্রাণস্পর্শী বলে বোধ হয় আজও আকাশে গাছ পালাতে —তেমনি একটা সূক্ষ্ম, সবল অথচ রহস্যে ভরা রূপের ইঙ্গিত চক্‌চকিয়ে উঠ্‌ছিল। আজ যেন কার আগমনীর পালা। আমি চেয়ারেতে প্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছি—এমন সময় দেখি আমার গেটের কাছ থেকে একটু দূরে রাস্তার ওপরে একখানি টাঙ্গা এসে দাঁড়াল। টাঙ্গাওয়ালা সেখানে নেবে রাস্তার ওধারের দোকানে অনেকক্ষণ ধরে কি সব সওদা কর্ত্তে লাগল। টাঙ্গার ওপরে খুব ধবধবে বুরকা পরা একটি স্ত্রীলোক। ভাল করে চেয়ে দেখলুম তার চোখের কাছের ফুটো দুটো যেন চকচকিয়ে উঠল। মনে হোলো আমার দিকে চেয়ে আছে। খোলা চোখের কত চাহনিত জীবনের রাস্তা দিয়ে চল্‌তে দেখেছি।

কিন্তু না দেখার নিবিড় রহস্যের ভেতর দিয়ে এমন চাওয়াত কখনও জলে ওঠেনি। মনে হোলো এটা আজ আমার পথ-বন্ধুর বাসন্তী উপহার। আমি ভাল করে তাকাতেই আমার বোধ হলো যেন নীল পাথরের ভেতর থেকে আগুনের আভাস মুখের সাদা বুরকার ওপোর গোলাপী আমেজ ছড়িয়ে দিল। দৃষ্টি ফিরিয়ে চোক বুঁজে মনে মনে কতকি ভাবছি এমন সময় 'বাবুজী' শব্দ শুনে তাকালুম। দেখি সেই টাঙ্গাওয়ালা, সে আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা কল্লে—"বাবু এখানে গোলাম মহম্মদ সাহেবের বাড়ী কোথায়?" আমি বল্লুম আমি জানিনা। সে জিজ্ঞাসা কল্লে "আপনি কি বাঙ্গালী? এখানে কত দিন আছেন?" আমি বললুম—"আমি অল্পদিন এসেছি।" টাঙ্গাওয়ালা চারিদিকে তাকিয়ে বল্লে "আপনি কি এত বড় বাড়ীতে একলা থাকেন?" আমি বল্লুম হাঁ—কিন্তু তার প্রশ্নের কোনও তাৎপর্য্য বুঝলুম না। ইচ্ছে হোলো তাকে জিজ্ঞাসা করি—যে স্ত্রীলোকটি কোথায় যাবেন। কিন্তু খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও বড় অশোভন হয় বলে কোনও কথা বল্লুম না। টাঙ্গাওয়ালা একটু দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চলে গিয়ে গাড়ী হাঁকাতে আরম্ভ কল্লে। আমি আর একবার চেয়ে দেখলুম—কিছু দেখতে পেলুম কিনা এখনও ঠিক বলতে পাচ্ছিনে তবে মনে হোলো যেন একটা চপল আগ্রহ ফুলের রজ্জুতে ঢাকা কালো ভ্রমরের পাখার মত সাদা বুরকার তলায় দু' একবার চমকে চমকে উঠলো। গাড়ী চলে গেল। আমি যে কতক্ষণ সেইদিকে তাকিয়েছিলুম তা মনে নেই, তবে এইটুকু মনে আছে যে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দটা আমার কাছে বোধ হোলো যেমন ঐ কালো চোখের থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা ফুলটার তৈরী অগ্নিকাণ্ডের গুরু গুরু শব্দ। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই দেহহীন কটাক্ষের অরূপ অগ্ন্যুতপাৎ আমার চারিদিকে আরব্যরজনীর ঔপন্যাসিকত্ব দিয়ে আমায় পর্দ্দার পর্দ্দায় ঘিরে ফেল্লে। মনে হোতে লাগল যেন চারশ বছর আগের ঘুমন্ত আনারকলি বসন্তের সোনার কাঠির ছোঁয়াতে জেগে উঠে কবরের অন্ধকার আবরণ সরিয়ে দিয়ে আজকের আলোমাখা সকালে কালো চোখের আগুনভরা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তার কোন সন্ধ্যায় হারিয়ে যাওয়া যুবরাজকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বাগান থেকে মৌরী ও পুদিনার ঘন গন্ধ এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেল্লে। আমি চোখ বুঁজে মোগল বাদশাহদের রং মহলের রঙীন স্বপ্নের ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বলতে পারি না। উঠে যখন দেখলুম অনেক বেলা হয়েছে তখনও অনুভব কল্লুম অন্তরের ভেতরটা কেমন থম্‌থমিয়ে রয়েছে। নেশার আমেজ নিয়ে ভেতরে চলে এলুম।

চতুর্থ পাতা

বেশ চলেছে দিনগুলো। অন্তরের মধ্যে একটা সোনালী আগুনের কাঁপন লেগেছে। ঘরের আর রাস্তার ব্যবধানটুকু কখন স'রে গেছে। কলের পুতুলের মত কোনো রকমে হাত পা নেড়ে দিনের কাজটুকু সেরে পথের আকর্ষণে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতুম। ভুলে গেছলুম যে বিংশ শতাব্দীতে কর্ম্মক্লান্ত যুগের সাধারণ আলোর মধ্যে ইংরেজ রাজের

স্পষ্ট ও সোজাসুজি আইন দিয়ে ঘেরা হয়ে অতি গদ্যময় জীবন আমাকে যাপন করতে হবে। তিন চার শতাব্দীর কালো পর্দ্দাটা চোখের সামনে থেকে সরে গেছল আর আমার মনে হোতো যে কত অদেখা মমতাজ, নূরজাহান, লয়লি ও মেহেরুন্নিসা চিক্‌চিকে আলোর টুকরোর মতন আমার চারিদিকের গাছ পালা আকাশ বাতাসের ভিতর ঝলমলিয়ে চক্‌চকিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই পুরোণো মুসলমানীদিনের সুপ্তোত্থিত রূপ, রস, শব্দ গন্ধগুলো যখন প্রাচীন গহ্বরের অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে একটা শ্রবণাতীত তোটকের বিপুল চঞ্চলতাতে আমার চারদিক ঘুরতে থাকত তখন আমার মনে হোতো যেন এই ফেনিল আবর্ত্তের মধ্যে পাক খেতে খেতে আমার ভাঁরী ও শক্ত শরীরটা কর্পূরের মত উড়ে গেছে, আর আমি কোন সুদূর শতাব্দীর একখণ্ড প্রাচীন মোগলাই স্বপ্ন মাত্র। আমার এই স্বপ্নসাগর মন্থিত করে প্রায় দেখতাম সেই পরিচিত টাঙ্গাখানির ওপোর সেই সাদা বুরকা পরা মানুষটী। এক একদিন যখন গাড়ীটা খুব জোরে চলে যেত তখন আমার মনে হোতো যেন সে প্রবীণা কুয়াশার মেয়ে বৈশাখী ঝড়ে পথ হারিয়ে গিয়ে ছুটে শীতের দেশে ফিরে চলেছে। আবার যেদিন গাড়ী ধীরে ধীরে চলত তখন মনে হোতো যে কোনও ইরাণীর সুন্দর অতৃপ্ত আত্মা অশান্তির ভূমিকম্পের বেগে উঠে পড়ে সাদা মার্ব্বেল পাথরের ঠাণ্ডা কবর-গুদ্ধ নিয়ে প্রেতলোকী মন্দাক্রান্তাতে থমকে থমকে কোথায় চলেছে! এই দেখার নেশা আমাকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখেছিল। ইতিমধ্যে আমি উর্দ্দু ও পার্শিভাষা শিখে পারস্যকাব্যের গোলাপী সায়রে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করেছি। কয়েকমাস এইরকম করে কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যার ঠিক আগে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখলুম আমার সেই অপরিচিত বুরকা টাঙ্গার ওপরে খুব জোরে আসছে। বুকের ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি-কাঁপনি অনুভব কত্তে কত্তে সেই দিকে চেয়ে রইলুম। মনে হোলো গাড়ীখানা আমার গেটের কাছে এসে একটু যেন থেমে গেল। বুরকার ভেতর থেকে একখানা সাদা কাগজের মত কি বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ে গেল। বুরকার ফুটোর মধ্যে দেখলুম যেন একটা আকুল মিনতি ও ত্রস্ত ভিক্ষা চকিতে বেরিয়ে এসে বাতাসের বুকে একটা জলভরা ঘনগম্ভীর মায়া রচনা করে চপল গতিতে মিলিয়ে গেল। টাঙ্গা যখন চোখের বাইরে চলে গেল তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে কাগজখানা কুড়িয়ে নিলুম। দেখি একখানা চিঠি। তখন আমার বুকের রক্তের আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছিলুম। ঘরের ভেতর এসে চিঠি খুললুম। তখন কাণের মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দ হচ্ছে। পড়লুম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেয়েলি ধাঁচে উর্দ্দুতে লেখাছিল— "বাবুজি, আমার বড় বিপদ। আমায় উদ্ধার করুন এই মিনতি। বেশী লিখতে পারুমনা। আজ দুপুররাতে চৌবজ্জির কাছে যদি দয়াকরে আসেন সব খুলে বলব। আমি অতি অভাগিনী। মেহেরুন্নিসা।" চিঠি পড়ে আগুনের গরম ফুলকী চোখ থেকে বেরিয়ে

পথের চলে যাওয়া দেবতার বেশে অরূপ রূপ নিয়ে চলাফেরা করেছেন। আজ স্বরূপ হয়ে মানুষের মত বেদনা অত্যাচারের ভেতর থেকে আমাকে কোন সম্বন্ধে ডাক দিলেন? আমার মনে হোলো এ ডাক বুঝি এসেছে কঠিন মাটীর জগতের পরপার থেকে সীমাবদ্ধ বাস্তবের দরজার মধ্য দিয়ে। "হে দেবি! কোন অলৌকিক জগতের অদেহী বিপদ তোমাকে অজগর সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে? আমার ভিতর তুমি এমন কি দেখেছ যার জন্য আজ বর্ষাসন্ধ্যার বেদনার মধ্য দিয়ে আমাকে তোমার আহ্বান লিপি পাঠিয়েছ? আজ বুঝলুম যে এতদিন আমার সমস্ত প্রাণের সব শিরা উপশিরা তোমাকেই উৎসর্গ করে বসেছিলাম। আজকের শেষ আহ্বান অমান্য করবার শক্তি নাই।" উত্তেজনায় বিছানার ওপর শুয়ে পড়লুম। পাশের ঘড়ীটা আড়ষ্ট নীরবতার বুকের মধ্যে টিকটিক কত্তে লাগল। বিজলী বাতিটা আমার হৃৎপিণ্ডের মত কয়েক বার কেঁপে হঠাৎ নিবে গেল। একটা গন্ধভরা অন্ধকার জেগে রইল।

পঞ্চম পাতা

বর্ষার রাত—অন্ধকার। একলা চৌকাঠির কাছে দাঁড়িয়ে আছি। নীরবতাটা অন্ধকারের চেয়ে আরও কালো। কিন্তু আমার অন্তরে রংমশাল জ্বলছে আর ভেতরের আগুনের টুকরোগুলো যেন লোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে পাথুরে কালো আঁধারের বুকে তারাবাজী ছড়াচ্ছে। পাতার থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে—মনে হোচ্ছে যেন বিকারগ্রস্ত অন্ধকারের মাঝে মাঝে হিক্কা উঠছে। প্রতীক্ষা যে এত মধুর ও ভীষণ তা আগে জানতুম না। আমার মনে হতে লাগল যেন শিরাগুলো দৈহিক নিয়মে একস্থানে জড় সড় হোয়ে না থাকতে পেরে ছুটে ছড়িয়ে গিয়ে চরমসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। এমন সময় অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে ঘর্ ঘর্ শব্দ হোলো। আমার মনে হোলো এটা অনন্ত মুহূর্ত্ত—শেষ হবে না। মাথার ভেতরটা কাঁপতে লাগল। মনে হোলো আমি হাজার হাজার যুগ ধরে জন্ম জন্মান্ত থেকে এই এক বিরাট প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি—আর আমার প্রতীক্ষার ফাল্গুনী-স্বপন নীল হয়ে গিয়ে—ঘন অনাদি অনন্ত বর্ষার ঘন আড়ম্বরের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেছে। অন্তরের ভিতর থেকে গুঞ্জরিত হোলো—

"বহুদিন হ'ল কোন ফাল্গুনে
ছিনু আমি এক ভরসায়
এলে তুমি ঘন বরষায়
আজি— উত্তাল তুমুল ছন্দে
আজি— নবঘন বিপুল মন্দ্রে
আমার পরাণ যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করসায়

মনে হোলো টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো। অন্ধকারটা নড়ে উঠলো। সেই সাদা বুরকা নেমে এসেছে গাড়ী থেকে। যেন ঠুং ঠাং ঝিন্ ঝিন্ শব্দ শুনতে পেলুম। মনে মনে বল্লুম "হে দেবী এতদিন আমার রক্তের সঙ্গে মেশান তোমার যে তরল নূপুর-শিঞ্জিনী আমার কবিতার মধ্যে ছন্দিত হয়ে রুমুঝুমু বেজেছিল আজ তাই দেহধারী তোটক ছন্দ হোয়ে আমার চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে।" সাদা বুরকা ছায়ামূর্ত্তির মত এগিয়ে নিকটে এসে নড়ে উঠ্‌লো, মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্ধকারটা ঝনঝনিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়ে আলো জ্বলে উঠ্‌লো। আমার চোখের পাতা ফুলের পাপড়ির মত আস্তে আস্তে বুঁজে গেল। অনুভব কল্লুম যে চৌবর্জ্জির নীচেকার ভিজে মাটীর ভেতর থেকে বহুকালের জেহেবুন্নিসা হিমস্বপ্নের আবরণ টুটে ফেলে মন্থরছন্দে আমার সামনে জেগে উঠলো। তাকালুম। কি ভয়ানক। সামনে বুরকা খোলা এক ভীষণ পাঠান চোর ভয়ঙ্কর হাসি হেসে ছোরা তুলে বলছে—"বাবুজী পিয়ার করার দাম দিতে হয়।" মাথার উপরের আকাশটা পাগলা দৈত্যের মত চিৎকার করে উঠ্‌লো! তার পর আর কিছু মনে নেই।

শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য।

পুণ্যাহ

পুণ্য দিনে পুরাণ বীণা নূতন তারে বাঁধি ;
ভারত-জোড়া হাহার সুরে আবার আমি কাঁদি।
শুকায়ে গেছে চোখের জল, লুকায়ে আছে ব্যথা
আঁধার-তলে ঘুমের ছলে শায়িত শোক যথা।

জাগরে ব্যথা, ঘনায়ে মেঘ বৈশাখের তাতে ;
ঝঙ্কারিয়ে হে বীণা তুমি ঝঞ্ঝা তোল বাতে।
আঁধার চিরে রক্তে রাঙ্গা বিজুলী যাক্ খেলে ;
চমক লেগে উঠুক জেগে শয্যা সবে ফেলে।

কাঁদিয়া উঠি, মাতিয়া ছুটি, আঁধার ছিঁড়ে ছুটে ;
নূতন দিনে পুরাণ প্রাণ উঠুক ফিরে ফুটে।
ভারতি, তব দীপনে নব রুদ্র-গান গেয়ে,
জ্বালার ভয়ে জ্বলিয়ে উঠি রৌদ্র তাপ ছেয়ে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অমৃতের অন্বেষণ

"তৎ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দ রূপম্ অমৃতম্ যৎ বিভাতি" (মুণ্ডক)

ক্ষ্যাপার পরশ পাথর খোঁজার মত—অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের একটা সহজাত সংস্কার। এই অমৃত পানে প্রাচীন ভারতীয় দেবগণ অমর হইয়াছেন ;—অলিম্পস-বাসী গ্রীক্ দেবতারাও এই অমৃত ভোজ্য ও পানীয় রূপে ব্যবহার করিতেন। এই অমৃতের জন্যই সমুদ্রমন্থন ও দেবাসুরের বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অমৃতের নিমিত্তই গ্রহণকালে চন্দ্র সূর্য্যের কর্ম্ম ভোগ অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। অনাদিকাল হইতে কত দেবতা, অসুর ও মানব যে এই অমৃতের অনুসন্ধানে ঘুরিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

পুরাকালে গোরূপধারিণী পৃথিবী হইতে অমৃত দোহন করা হইয়াছিল। অমৃত দোহন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র বৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোপন স্বভাব দুর্ব্বাশা ঋষির শাপে সেই অমৃত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। দেবাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে অমৃতের পুনরুদ্ধার করেন। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার মূলে যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে তাহা নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকেরই পৌরাণিক গল্পসমূহ ভারতে কৃষি ও আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাঁহারা হয়তঃ বলিবেন ভারতে আর্য্য সভ্যতার প্রথম প্রচারক ইন্দ্র সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী ভারত ভূমিকে আবাদের উপযোগী করিয়া তাহা হইতে অমৃতময় শস্যরাশি উৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তন অথবা জলপ্লাবন প্রভৃতি দুর্দ্দৈববশতঃ সেই অমৃতোৎপাদিকা তীরভূমি সিন্ধুগর্ভে নিহিতা হয়। দেবগণ (প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য) ও অসুর সমূহের (পরবর্ত্তী আসিরিয়া বাসী ?) সমবেত চেষ্টায় বাঁধ নির্ম্মাণ অথবা অন্য কোন উপায়ে সেই সিন্ধুনিহিত অমৃত-প্রসবিনী ভূমির পুনরুদ্ধার হয়। কিন্তু অমৃতপানে বলীয়ান্ দেবগণের বুদ্ধিকৌশলে অসুরেরা অমৃতভাগে বঞ্চিত হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বর্গলোক ত্যাগ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এবম্বিধ নানা ব্যাখ্যায় তাঁহাদের মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকেন।

জ্যোতিষ—আর একদলের লোক আছেন, তাঁহারা সমস্ত পৌরাণিক আখ্যানকে আকাশ ও গ্রহ নক্ষত্রের রূপক রূপে ব্যাখ্যা করিয়া "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষগণের" মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা হয়তঃ অন্তরীক্ষ সমুদ্রে সুধাকর শশধরের প্রথম আবিষ্কারকে ক্ষীরোদসাগরমন্থনে দেবগণের অমৃতলাভ বলিয়া মনে করিবেন। পুরাণের মতে এই চন্দ্রেই নাকি সুরগণের পীতাবশেষ সুধাভাণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। এমন কি আজ

কালও দেব ও পিতৃলোকের অধিবাসীরা কৃষ্ণ পক্ষে সেই চন্দ্রক্ষরিত অমৃত পান করেন। তাই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে শশিকলার হ্রাস হয়। মাতৃদাস্য বিমোচনের জন্য বিনতা-নন্দন গরুড় রুদ্রতনয় ভুজঙ্গমগণের আদেশে চন্দ্রলোক হইতে সুধাভাণ্ড মর্ত্তে আনয়ন করেন। সেই অমৃতপানের লোভে কুশ তৃণ লেহন করায় সর্পগণ অদ্যাপি দ্বিজিহ্ব। আবার সমুদ্রমন্থনে অমৃতলাভের পর হইতেই রাহুকেতুর সহিত শশধরের শত্রুতা আরম্ভ হইয়াছে। আজও রাহুকেতু চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সেই পূর্ব্ব বৈরিতা সাধন করিয়া থাকে। পুরাণকথিত অমৃতোপাখ্যান কোন না কোন ভাবে চন্দ্রের সঙ্গে জড়িত আছে। এই সকল আখ্যায়িকার অতিশয়োক্তি বাদ দিলে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে সুধাকরে অমৃতারোপ সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ চন্দ্রকিরণ নয়ন মনের আহ্লাদকর ও ওষধিগণের পরিবর্দ্ধক, তাই তাহার সুধাকর নাম সার্থক হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক—আর এক দলের ব্যাখ্যাকার আছেন, যাঁহারা প্রতি কথায়ই আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে পান। তাঁহারা রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধকাহিনীকে প্রবৃত্তিনিবৃত্তির সংগ্রাম বলিয়া প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে দেবাসুরগণের সমুদ্র-মন্থনে অমৃতের উদ্ভব—প্রেম ও কামের সহযোগে প্রকৃতিপুরুষের মিলনে সন্তানের উৎপত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেবাসুরের দ্বন্দ্বের মত প্রেম ও কামের সংগ্রামে কামাসুর পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, সন্তানামৃতের উপর প্রেম-দেবতার একাধিপত্য স্থাপিত হয়।

'স পুত্রেণৈব অস্মিন্ লোকে প্রতিতিষ্ঠতি, অথ এনম্ দৈবাঃ প্রাণাঃ অমৃতা আবিশন্তি।' পুত্র দ্বারাই মানব ইহলোকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে—এই সন্ততিরূপ অমৃতফলই মানুষকে অমরত্ব প্রদান করিয়া চিরদিন তাহার অমৃতত্ব ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। 'প্রজাতির অমৃত আনন্দঃ' (তৈত্তিরীয়) সুতরাং পুত্রই মানুষের অমৃত।

এইরূপে বৈষ্ণব, তান্ত্রিক Theosophist প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অমৃতের অনুসন্ধান করেন।

ইউরোপীয়—পৃথিবীর নানা জাতি নানাপথে অমৃতের সন্ধানে বাহির হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অমৃতের আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রায় সকলদেশীয় সকলজাতির শাস্ত্র ও সাহিত্যে কোন না কোন প্রকারে অমৃতের কল্পনা করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক্‌জাতির দেবগণের ভোজ্য ও পানীয় ছিল অমৃত (nector ও ambrosia)। হোমারপ্রমুখ খ্যাতনামা কবিবৃন্দ গ্রীক্ সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের অনুসরণ করিয়া অমৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। "ঈশাহীবেদের পুরান নিয়মেও" (Old Testament Bible) অমৃতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণিত আছে। মিশর হইতে পলায়নকালে পথিমধ্যে 'মুশা' পরিচালিত ইহুদীগণের দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। তখন তৃণোপরি পতিত শিশিরবিন্দুনিভ সুমধুর manna—অমৃত পান ও ভোজন করিয়া তাঁহারা জীবন রক্ষা করেন। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই মান্না সম্বন্ধে অনেক গবেষণা

করিয়াছেন। তাঁহাদের আবিষ্কৃত ও বাইবেলকথিত মান্না এক হইলে অমৃতে হতাশ হইয়া বড় দুঃখে বস্তুতঃই বলিতে ইচ্ছা হয় "কিমিদম্ অমৃতম্।" বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত Pliny ও Dioscorides উদ্ভিদবিজ্ঞানে (Botany) সুপরিচিত গুল্মবিশেষকে 'Ambrosia' —অমৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন। W. H. Roscher সাহেবের মতে রোগনাশক ও শক্তিবর্দ্ধক 'মধু'ই (Honey) অমৃত।

মহম্মদীয়—কোরানে এবং পরবর্ত্তী আরবা ও পারস্য সাহিত্যে অমৃতের অন্বেষণের কাহিনী বিবৃত আছে।

মহম্মদীয় শাস্ত্রের ঋষি মানুষের পক্ষে অমৃতলাভ সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তাই তিনি অমৃতানুসন্ধানের ব্যর্থতা দেখাইতে গিয়া কোরাণের একস্থলে আব্-ই-হায় (জীবন বারি)র উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একচ্ছত্রাধিপতি ভুবন-বিজয়ী সেকান্দর অমৃতোত্থান রক্ষক মহাযোগী খিজার এর অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরিয়া ছিলেন। কিন্তু সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইলে কি হইবে—আবে-হাই জীবনের অমৃতবারি লাভ করিতে পারেন নাই। আধুনিক পণ্ডিতগণের কেহ কেহ কোরাণে উক্ত আবে-হাইয়ের এই ধারণাকে সেমিটিক জাতির নিজস্ব বলিয়া মনে করেন না। সম্ভবতঃ ইহা কোরাণের উপর সমসাময়িক পারস্য সাহিত্যের প্রভাবের ফল। সুপ্রসিদ্ধ পারসীককবি নিজামী তৎ প্রণীত 'সকন্দরদিগ্বিজয়' গ্রন্থে বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের অমৃতান্বেষণের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভাবের কবি 'হাফেজ' ও সেকেন্দরের এই ব্যর্থ প্রয়াসকে কটাক্ষ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে অমৃতের জন্য দূরদেশ যাত্রার কোনই প্রয়োজন নাই, "কক্ষে চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতংব্রজেৎ—" গৃহে মধু মিলিলে পর্ব্বতে যাওয়ার কি প্রয়োজন?

আবে-হাই জীবনের অমৃতবারি (elixir of life) তৃষিত মানবের 'রসাল নন্দনের' দ্রাক্ষা-রস, আমাদের অতি নিকটেই আছে। কস্তুরীমৃগের মত মোহান্ধ মানব নিজের হৃদ্-কমলস্থিত 'ভূমানন্দরূপ' অমৃত ফেলিয়া বাহ্য অমৃতের ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরিয়া মরে।

দেবভাষা—এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিরই ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্য অমৃতের গান গাহিয়াছে। এখন আমরা ভারতীয় দেবভাষায় অমৃত অন্বেষণের আলোচনা করিব। ঋক্‌বেদের ঋষি গাহিয়াছিলেন "অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম"—আমরা সোম পান করিয়া অমৃত হইলাম। শ্রুতির এই বাক্যে অমৃতের অর্থ অমরত্ব—মরণশূন্য অনন্তজীবন। ঋষি ও দেবতাগণ সোম পানে অমরত্ব লাভ করিতেন, সোমে তাঁহারা অমৃত পানের আনন্দ পাইতেন—তাই সোমই বৈদিক ঋষির অমৃত। কোন কোন স্থলে 'যজ্ঞশেষম্ অমৃতংস্মৃতম্' (যজ্ঞশেষই অমৃত) বলিয়া বৈদিকঋষি যজ্ঞের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই যজ্ঞীয় অমৃতের জন্য প্রাচীন ভারতে দেবতাও ঋষিদের মধ্যে কত আত্ম-কলহই না হইয়া গিয়াছে।

বেদ—মধু অতীব সুখবোধক ও ইন্দ্রিয়শক্তি-বর্দ্ধক, বলিতে গেলে একাধারে মধুতে

অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাই যজুর্ব্বেদের ঋষি "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়মিদং পরোমৃতং মধু"—(মধু ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়শক্তি,—মধুই শ্রেষ্ঠ অমৃত) এই বলিয়া মধুতেই অমৃত দর্শন করিয়াছেন। মধুর অমৃতত্ব স্মরণ করিয়াই বোধ হয় মধুচ্ছন্দের জনক-ও মধুঋকের ঋষি বিশ্বামিত্র 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্ত সিন্ধবঃ" গান করিয়া মধুর নামে এত মাতিয়া ছিলেন। বৈদিক দীক্ষাগ্রহণের সময়—অমৃত মন্ত্রে ভোজ্য ও পানীয়ে অমৃতত্ব আনয়ন করা হইত। অদ্যাপি হিন্দুগণ প্রতিদিন ভোজনকালে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সম্মুখে রাখিয়া 'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা অমৃতপিধানমসি স্বাহা' মন্ত্রে অমৃতের আবাহন করিয়া থাকেন।

উপনিষদ—উপনিষদের ঋষিগণ অমৃতের নামে মাতোয়ারা। শতাধিক উপনিষদের প্রায় সর্ব্বত্রই এই অমৃতশব্দের ছড়াছড়ি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের রচয়িতা, 'জগজ্জীবন' জলকে অমৃত নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ব্যবহারিক প্রয়োগে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে কোনও পুরুষ পঞ্চদশদিবস অনাহারে থাকিয়া কেবলমাত্র জলপান করিলে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় না। এইজন্য তাঁহার মতে 'জলস্য প্রাণহেতুত্বাৎ অমৃতত্বম্',—প্রাণরক্ষার হেতু বলিয়া জলই অমৃত।

এই উপনিষদের অন্য একস্থানে আছে যে 'দেবানাঞ্চ অমৃতদর্শনেনৈব তৃপ্তত্বম্। ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি'—দেবগণের অমৃত দর্শনেই তৃপ্তি,—দেবতারা পান অথবা ভোজন করেন না, কেবল অমৃত দর্শন করিয়াই আনন্দ লাভ করেন। এতক্ষণ আমরা অমৃতকে পানীয় ও ভোজ্যবস্তু বলিয়া মনে করিতেছিলাম। কিন্তু এই ঋষিবাক্য পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অমৃত, পানও ভোজনের অপেক্ষা রাখে না, দর্শন মাত্রেই জন্মজন্মান্তরের ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করে।

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্কপত্নী মৈত্রেয়ী "যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাং'—(যাহা আমাকে অমৃতত্ব প্রদান করিতে পারিবেনা এমন তুচ্ছ ধনরত্ন লইয়া আমি কি করিব?) বলিয়া স্বামীর নিকট এই অমৃতেরই ভিখারিণী সাজিয়া ছিলেন।

এই অমৃতত্বলাভের বাসনায় "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মাপমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বম্ ইচ্ছন্"—কোন কোন ধীর ব্যক্তি ব্যবৃত্তচক্ষু হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেন।

এই 'নিঃশ্রেয়সমমৃতম্' লাভ করিবার জন্য কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ব্রহ্মধ্যানে চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাহাদের নিকট পরমপদমোক্ষই অমৃত।

ঈশোপনিষদের 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতং বিন্দতে'—(অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করে),

কেনোপনিষদের "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতে অমৃতম্—আত্মাদ্বারা বীর্য্য এবং বিদ্যাদ্বারা অমৃত লাভ হয়। মুণ্ডকোপনিষদের 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্য এষ সেতুঃ'— অন্য বাক্য পরিত্যাগ করিয়া ...

জান,—আত্মাই অমৃতের সেতু স্বরূপ। জাবাল উপনিষদের "কিং জাপ্য অমৃতত্বং ব্রূহীতি' কি জপ করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় তাহা বল- এই সকল উপনিষদ বাক্যে জীবের ব্রহ্মপদে লয় হইয়া মুক্তি লাভই অমৃত।

আবার কোন কোন উপনিষদে পরমাত্মা ব্রহ্ম অর্থে অমৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেধব্যম্ সৌম্য বিদ্ধি— হে সৌম্য—সেই অক্ষরণীয় অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞাতব্য—তাহাকে জান— কঠোপনিষদের ঋষি 'তং বিদ্যাৎ শুক্রং অমৃতম্'—সেই শুক্লবর্ণ অমৃতময় ব্রহ্মকে জানা উচিত"—এই সকল মন্ত্রে পরমব্রহ্মকেই অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

গোপালপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের ঋষি "সকলং পরং ব্রহ্মৈতদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি। সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতীতি॥' যিনি সেই অখণ্ড পরব্রহ্মের ধ্যান গুণকীর্ত্তন ও উপাসনা করেন তিনি অমৃত হন—তিনি অমৃত হন" বলিয়া অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়'—এই চিরন্তন উপাসনা বাক্যে অমৃতের সন্ধান লইয়া আমরা উপনিষদ্ হইতে বিদায় লইব। সচ্চিদানন্দ existenee consciosness bliss এর আনন্দময়ী হ্লাদিনীশক্তি এই উপনিষদের অমৃত। মুণ্ডকের ঋষি 'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা, আনন্দরূপং অমৃতং যৎ বিভাতি'—ধীর ব্যক্তি বিজ্ঞান বলে সেই আনন্দময় অমৃতের দর্শন লাভ করেন বলিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দময় রূপেই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন। "ব্রহ্মানন্দমেবামৃতম্—উপনিষদের ঋষির চিরবাঞ্ছিত অমৃত। ভূমানন্দ লাভই মানব জীবনের অমৃতত্ব আনয়ন করে। সর্ব্বোপনিষদ্‌গাভী হইতে গোপালনন্দন যে দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ দোহন করিয়াছেন তাহা পান করিলে বাস্তবিক অমৃত পান করা যায়।

এখন আমরা উপনিষদ্ ছাড়িয়া স্মৃতিভাগে অমৃতের অন্বেষণ করিব।

স্মৃতি মনু বলিয়াছেন "মৃতংস্যাৎ যাচিতং ভৈক্ষং—অমৃতংস্যাৎ অযাচিতম্—যাচ্ঞালব্ধ ভিক্ষার নাম 'মৃত'—অযাচিত ভিক্ষাই অমৃত। আজকাল এই দুর্ভিক্ষের দিনে ভিখারীরা বাড়ী বাড়ী যাচ্ঞা করিয়াও একমুষ্টি ভিক্ষা মিলাইতে পারে না—সুতরাং অযাচিত ভিক্ষা যে অমৃতের চেয়েও দুর্ল্লভ তাহার আর সন্দেহ কি?

তৎপর আমরা পঞ্চামৃত ও অমৃতযোগে অমৃতের সন্ধান পাই। তবে অমৃতযোগে পঞ্চামৃতভক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা তাহা পুরোহিত মহাশয়ই ভাল বলিতে পারেন।

আয়ুর্ব্বেদ—আজকাল পুরোহিতঠাকুরের ব্যবস্থা অপেক্ষা ডাক্তার কবিরাজের ব্যবস্থা আমাদের নিকট অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের ঋষি কবিরাজ মহাশয়েরা অমৃত সম্বন্ধে কি বলেন তাহা দেখা যাউক। 'আয়ুর্ব্বৈ ঘৃতম্ অমৃতম্'—ঘৃত ও দুগ্ধ দেহ-ধারক ও আয়ুবৃদ্ধিকর। সুতরাং ইহাদের অমৃত নাম সার্থক হইয়াছে। কিন্তু

'অমৃতং বৈ হিরণ্ময়্'—সুবর্ণে শারীরিক ও মানসিক তেজ বৃদ্ধির ক্ষমতা আছে এবং ইহা অগ্নির উত্তাপে নষ্ট হয় না। সুতরাং সুবর্ণই অমৃত। কবিরাজদের সুবর্ণঘটিত ঔষধই তার প্রমাণ। বিশেষতঃ এই সুবর্ণরূপ অমৃত লাভের জন্য মানবজাতির চিরদিন যেরূপ ঘোরসংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে—আদিকালে অমৃতপ্রার্থী দেবাসুরের যুদ্ধও বোধহয় ইহার কাছে হার মানে। এই সুবর্ণ যদি অমৃত না হয় তাহা হইলে অমৃত আর কাহাকে বলিব?

তারপর বণমুগ, দূর্ব্বা, আমলকী, হরিতকী তুলসী, পিপ্পলী প্রভৃতি দ্রব্যের রোগ নিবারণের ক্ষমতা ও অমৃততুল্য মধুর আস্বাদন হেতু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহাদিগকে অমৃত বলা হয়। এমনকি আয়ুর্ব্বেদের প্রথমঋষি ধন্বন্তরীরও একনাম অমৃত। অমৃত প্রচারিত শাস্ত্রে এরূপ অমৃতের বাহুল্য হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অমৃতের অন্বেষণে চিকিৎসকগণ কত 'অমৃতপ্রাশ'—'অমৃ রসায়ন'—ও 'অমৃত ধারা'র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না।

রসায়ণশাস্ত্রে—বিষের প্রতিষেধক ঔষধের একনাম অমৃত এবং অভ্রক ও পারদের মিশ্রণকে—মৃত্যু ও দারিদ্র্যনাশক অমৃত বলা হইয়াছে। মহাদেব বলিয়াছেন, "অভ্রকস্তব বীজন্তু, মম বীজ পারদ। অনয়োঃ মেলনং দেবী, মৃত্যু-দারিদ্র্যনাশনম্।"

এই অমৃতের মৃত্যু ও দারিদ্র্য নাশক গুণ আছে কিনা—রসায়নবিদ্ বলিতে পারেন। সুলভে এইরূপ অমৃত প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ পৃথিবীতে লোকের হাহাকার অনেকটা কমিয়া যাইত।

যোগ, তন্ত্র— এখন আমরা যোগ, তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে অমৃতের খোঁজ করিব। যোগী ও শক্তির উপাসক তান্ত্রিক বলেন—'মূলাধার' চক্রস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তি, 'সহস্রার পদ্মে' নিদ্রিত শিবকে জাগরিত করিয়া শিবের মুখ কমল চুম্বন করিলে—এই ক্রীড়া হইতে লাক্ষারস সদৃশ অমৃতের উৎপত্তি হয়। সাধক এই অমৃত দ্বারা পরদেবতাকে পরিতৃপ্ত করেন।

"অমৃতং জায়তে দেবি, তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি!
তদুদ্ভবামৃতং দেবি লাক্ষারস সমোপমম্॥"

সুতরাং যোগ ও তন্ত্রের অমৃত—কুণ্ডলিণী ও শিবের মিলন জনিত আনন্দের ফল—লাক্ষারসের মত একরূপ তরল পদার্থ।

পরবর্ত্তী তন্ত্রশাক্ত চক্রে ব্যবহৃত শোধিত সুরাকেও অমৃত বলা হইয়াছে। হঠযোগী 'খেচরী' মুদ্রার অভ্যাস করিয়া রসনা দ্বারা তালুতে অমৃত কূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র—বৈষ্ণবশাস্ত্রে অমৃত শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছেন 'ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে"—ভগবদ্ভক্তি জীবগণের অমৃত। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রেমময় রসরাজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিকে মুক্তি অপেক্ষাও উচ্চপদ দিয়াছেন। বৈষ্ণবের অমৃত চতুর্ব্বিধ মুক্তিতে

'মধুরং মধুরং বপুরস্য' বলিয়া মধুর ভাবে অমৃতের আস্বাদন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ কলিকলুষনাশন-জগন্মঙ্গল—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিপদে "পূর্ণামৃতরসাস্বাদনম্" করিয়া থাকেন।

সংস্কৃতকাব্য নাটক—সংস্কৃত নাটক ও কাব্যে অমৃতের কল্পনায় বিশেষ নূতনত্ব কিছুই নাই। প্রায় সকলেই পূর্ব্বমনীষিগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কালিদাস রঘুবংশে "বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ ভবেৎ অমৃতংবিষমা ঈশ্বরেচ্ছয়া" ঈশ্বরের ইচ্ছায় কখন কখন বিষও অমৃত হয়—বর্ণনা করিয়াছেন। এইস্থলে অমৃত শব্দ বিষের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কালিদাসের পর ভবভূতি অমৃতের একজন গোঁড়া ভক্ত। উত্তর চরিতে রামচন্দ্র"ত্বং কৌমুদী নয়নয়োঃ অমৃতং ত্বমঙ্গে"—তুমি আমার নয়নে চন্দ্রিকা—তুমি আমায় অঙ্গে অমৃত—বলিয়া সীতাকে তাপিত অঙ্গে অমৃতপ্রলেপের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আবার 'কুমার প্রত্যভিজ্ঞান' অঙ্কে "গাত্রশ্লেষে যদমৃতরসস্রোতসা সিঞ্চতীব" বলিয়া কুশের আলিঙ্গনে গাত্রে অমৃতরসসেচনের আনন্দ অনুভব করিতেছেন। এখানে অমৃত প্রলেপ মলয়জচন্দন প্রলেপের মত স্নিগ্ধ শীতল ও আনন্দকর। এইরূপ খুঁজিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকস্থলে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়।

শিখধর্ম্মে অমৃতের দ্বারা দীক্ষা একটি প্রধান অঙ্গ।

গ্রন্থ সাহেব—বঙ্গদেশে যে সময়ে কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ-প্রমুখ তান্ত্রিকশিরোমণি তন্ত্রোক্ত "কারণানন্দে" অমৃতরস পান করিতেছিলেন, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ হরিনাম ও কৃষ্ণপ্রেমে অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, তৎকালে ভারতীয় আর্য্যগণের আদিনিবাস-পঞ্চনদ ভূমিতে শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নানকদেব "সদ্‌গুরুপ্রসাদে"——'অমৃত-নামরিদমাহিসমায়' (নামরূপ অমৃত হৃদয়ে প্রবেশ করে),—'হরিগুণগায় অমৃতরস চাখৈ'—(হরিগুণ গান করিয়া মানুষ অমৃত রসের আস্বাদন পায়),—'অমৃত বচন হরিকে গুণ-গাউ'—(হরিগুণ রূপ অমৃতকথা গান করিতে থাক)—'গুরুমুখী সেবা অমৃতরস পীজৈ'—(গুরুদত্তনাম জপরূপ অমৃতরস পান কর), এইরূপ অসংখ্য উপদেশ বাক্যে হরিনামই অমৃতের উৎস তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। শিখধর্ম্মের দীক্ষাকালে গুরু গোবিন্দ প্রবর্ত্তিত "শর্করামিশ্রিত—কৃপাণ স্পৃষ্ট"সলিলরূপ 'অমৃত' পানের যে ব্যবস্থা আছে তাহা ধর্ম্মজীবনেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় এই ভাবের ইঙ্গিত। বাঙ্গলা সাহিত্যে অমৃতের অনুসন্ধান বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিব।

শ্রীমহেন্দ্রকুমার সরকার

বাবলা

[গত বৎসরের প্রকাশিত অংশের চুম্বক ;

পূর্ণর বাড়ী চুয়াডাঙ্গার ওধারে এক পল্লীগ্রামে। সে কলিকাতায় এক ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করিত ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কাছে ভগবতীর বাড়ীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত। দেশের বাড়ীতে ছিল তরুণী পত্নী শৈল ও কচি ছেলে বাবলা। ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া যাইবার পর সে স্ত্রীকে কাছে আনিবার ব্যবস্থা করিল। দেশের একটি ছেলে বিপিন কলিকাতায় কলেজে পড়িত। গ্রীষ্মের ছুটীর পর তার কলিকাতায় আসিবার সময় বিপিন শৈলকে ও বাবলাকে শেয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে, স্থির হইল এবং পূর্ণ ষ্টেশন হইতে তাদের তার বাসায় আনিবে। শৈল বাবলাকে লইয়া এক দুর্য্যোগের সন্ধ্যায় কলিকাতায় আসিল এবং ষ্টেশনে পূর্ণকে না দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। ভগবতীর বাসার ঠিকানায় বিপিন শৈলকে পৌঁছাইয়া দিলে ভগবতী কাঁদিয়া খবর দিলেন, আগের দিন সন্ধ্যার পর পূর্ণ মোটর চাপা পড়ে ও সেইদিন সে হাসপাতালে মারা গিয়াছে। শৈল চারিদিক আঁধার দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তার পর সে ভগবতীর আশ্রয়েই ছেলেটিকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। ভগবতী তাকে মেয়ের মতই ভালোবাসেন। তাঁর একটি ভাইপো আছে লালবেহারী বা নালু। নালুর বাপ-মা ছিল না। বাবলা এই গৃহেই বড় হইল এবং ক্রমে স্কুলে ভর্ত্তি হইল। একদিন স্কুলের ছুটির পর বাড়ী ফিরিবার পথে হেদায়েৎ কোকেন-ওয়ালার ছেলে পল্টু এক পানওয়ালার সঙ্গে মারামারি করে ; নালুর মাথায় এক সোডা-ওয়াটারের বোতল পড়িয়া তার মাথা কাটিয়া যায়। তারপর সে স্কুল ছাড়িয়া খপরের কাগজ বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। বাবলার তা দেখিয়া পড়াশুনা আর ভালো লাগিল না। তার ইচ্ছা, সেও অমনি নালুর মত পথে পথে স্বাধীনভাবে কাগজ বিক্রয় করিয়া বেড়ায় ; কিন্তু শৈল তাকে স্কুল ছাড়িতে দিল না।

কলিকাতায় তাদের বাড়ীর কাছে এক নব্য তরুণ ব্যারিষ্টার বাসা লইল ; তার নাম প্রমোদ। প্রমোদের এ পাড়ায় বাসা লইবার কারণ, পিতৃবন্ধু বীরেন্দ্র-বাবু কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ পাড়াতেই থাকেন ; তিনি বিপত্নীক ; তাঁর একমাত্র তরুণী কন্যা বিভা ছাড়া আর কেহ কাছে নাই। এই বিভার সঙ্গে প্রমোদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিভা অবিবাহিতা।

দুঃখে দুর্ভাবনায় শৈলর শরীর-মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ; সে কঠিন রোগে পড়িল। বাবলার মনটা মার অসুখে হা-হা করিত। ভগবতী শৈলর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন কিন্তু ডাক্তারেরা এমন আশঙ্কা জানাইলেন যে শৈলর রোগটা যক্ষ্মা দাঁড়াইতে পারে।]

২৩

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া শৈল কেবল ভাবিত, এ কি হইয়া গেল! জীবনটাকে প্রথম যেদিন সে অনুভব করিল, প্রথম যেদিন বুঝিল, শুধু গণ্ডী-ধরা বাঁধা পথে চলাই জীবনের একমাত্র কাজ নয়, তার জীবনেও আনন্দ আছে, সুখ আছে, সেও হাসি ফুটাইতে পারে, বিলাইতে পারে—অর্থাৎ এ জীবন সুন্দর, উপভোগ করিবার মত, আর এই জীবনকে চারিদিক হইতে মধুময় করিয়া তুলিবার জন্যই বাহিরে প্রকৃতির ঐ অজস্র দান, ফুলে-ফলে,

তার চোখের দীপ্তি কোথা হইতে একরাশ কালো আঁধার আসিয়া মুছিয়া দিল,—মনের মধ্যে সাধ-আশার সাজানো বিচিত্র কুঞ্জখানি এক প্রবল দীর্ঘশ্বাসে কোথায় উড়িয়া গেল! তবু এই বাবলা—ইহাকে লইয়া সে কোন-মতে দিন কাটাইতেছিল! সে আজ রোগে ভুগিয়া যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে তার বাবলার দশা কি হইবে? ভগবতী আছেন, সত্য, কিন্তু বাবলা যে ছেলে, মাই যে ওর সব! বাবলার যা-কিছু কথা গল্প সব যে তার মার সঙ্গেই, যা কিছু আদর-আব্দার তা যে এই মাকে লইয়াই! তার বিচিত্র কল্পনার বিকাশ, সেও যে এই মাকেই কেন্দ্র করিয়া! সেই মা চলিয়া গেলে বাবলা যে পাগল হইয়া যাইবে!

বাবলা ইদানীং মাকে খোঁচাইয়া পূর্ণর কথা শুনিতে চাহিত। শৈল কম্পিত বুকে পুঞ্জিত অশ্রু রুধিয়া অতীতের পটে রক্তের অক্ষরে লেখা পুরানো কথা খুলিয়া বসিত! বাবলা তন্ময় একাগ্র চিত্তে সে সব গল্প শুনিত! তার চোখের সামনে পল্লীর সেই পথ-ঘাট, এক অজানা বাড়ীর রৌদ্রে-ছাওয়া উঠানের কোণ একেবারে সজীব হইয়া দেখা দিত! পূর্ণর চেহারার একটা আভাষও সে কল্পনার তুলি দিয়া আঁকিবার চেষ্টা করিত। এ-সব কাহিনী শুনিয়া বাবলা বলিত, বাবা যদি থাকতো মা তো কেমন হতো! বাবার হাত ধরে কত জায়গায় বেড়াতে যেতুম—চিড়িয়াখানা, সোসাইটি সব দেখে আসতুম! বাবলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকিত।

আর শৈলর স্পন্দিত বুকে সব কথা খেই হারাইয়া ঝরিয়া পড়িত। সে অতিকষ্টে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া ভাবিত, সত্যই যদি তিনি থাকিতেন, আজ! হায়রে, দুঃখীর এক ফোঁটা সাধ-আশা, তার মূলটাকেও ভগবান এমন করিয়া পাষাণে বুক বাঁধিয়া ছিঁড়িয়া দেন! সে রাজার ঐশ্বর্য্য চাহে নাই, আর-কিছুর কাঙাল সে ছিলও না কোনদিন! শুধু স্বামীর স্নেহ, স্বামীর আদর, তাও তার ভাগ্যে টিঁকিল না! এমন দুরদৃষ্ট লইয়া সে জগতে আসিয়াছিল।

তখন বাবলার স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটী! বাবলা লালবেহারীর সঙ্গে বাহির হইল, খবরের কাগজ লইয়া তার সঙ্গে থাকিয়া কাগজ বিক্রয় করিবে! এই সময়টুকু সে মার অসুখের কথা ভুলিয়া থাকিত। নালু কাগজওয়ালাদের বলিয়া দিয়াছিল; বাবলাকেও তারা কতকগুলা কাগজ দিত বিক্রয়ের জন্য। বাবলা সেই কাগজ বিক্রয় করিত, রোজ পয়সাও কিছু উপার্জ্জন করিত। সেই পয়সায় মার জন্য সে কমলা লেবু কি আঙুর কি এমনি-কিছু কিনিয়া লইয়া যাইত। মাকে গিয়া বলিত,—খাও মা…

শৈলর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিত। বাবলা বলিত,—খাও না মা!

শৈল বলিত,—ছেলের রোজগার খেয়ে যাওয়াও আমার অদৃষ্টে ছিল রে! তোর পয়সাও খেয়ে যাব—আমার আর কিছু বাকী রইল না! শৈলর দুই চোখে জল অমনি টলটল্ করিত।

এ-সব কথার মানে বাবলা বুঝিত না! তার কেনা ফল মা খাইলে তার আনন্দ ধরিত

গ্রীষ্মের ছুটী ফুরাইয়া আসিলে বাবলা বায়না ধরিয়া বসিল, সে আর ইস্কুলে যাইবে না। মার অসুখ, খরচ আছে ত—সে ঐ কাগজ বেচিয়াই পয়সা রোজগার করিবে। শৈল আপত্তি করিল না। তার অসুখে ছেলের মন একেই তো ঝিমাইয়া রহিয়াছে, পড়িতে বলিলে তার দুই চোখ ছল-ছল করিয়া ওঠে, এ দৃশ্যও শৈল অমন কতদিন দেখিয়াছে! তার উপর ছেলে কাগজ লইয়া তার কাছ হইতে দূরে থাকিয়া এ-কষ্ট কতক যদি ভুলিয়া থাকে তো থাক্—ইহা ভাবিয়া শৈল বাবলার কথায় সায় দিল। বাবলা তখন মনের আনন্দে নালুকে গিয়া বলিল,—আমিও মামা কাগজ বেচবো তোমার সঙ্গে।

নালু বলিল,—তাহলে বেশ হবে কিন্তু। তুই আর আমি দু'জনে দু' মোড় আগলে যদি কাগজ বেচি, তাহলে পয়সাও খুব পাব। আর কেউ আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

বাবলা বলিল,—তোমার কাছে থাকবো না আমি?

নালু বলিল,—দূরে নয় রে, ঐ হ্যারিসন রোডের মোড়েই। আহা, বুঝচিস্ না, আমি থাকবো একদিককার মোড়ে, তুই থাকবি অন্য মোড়ে? তারপর আমাদের দলের ঐ ভোম্বো, মোনা, শশধর, অবিনাশ আছে না? ওরা থাকবে বৌবাজারে আর ধর্ম্মতলায়—তাহলে আর আমাদের সঙ্গে পারে কে?

বাবলা খুসী মনে বলিল,—আচ্ছা।

তার পর বাবলা কাগজ বিক্রয়ের কাজে লাগিয়া গেল। কাগজ বিক্রয় করিবার সময় তার মনটি পড়িয়া থাকিত ঘরে মার কাছে। মা এখন কি করিতেছে? কেমন আছে? কাগজ বেচিয়া সে যে পয়সা পাইবে, সন্ধ্যার পর সেই পয়সা হইতে সে মার জন্য পথ্য কিনিয়া লইয়া যাইবে। এই আনন্দের আশায় সারাদিন এই রৌদ্রে ছুটাছুটি তার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগাইতে পারিত না! সে এমনি তন্ময় থাকিত যে স্কুলের পড়াশুনার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তার মন জুড়াইয়া বাঁচিল। দুপুরবেলায় পথে লোকজনের ভিড় যখন একটু কম পড়িয়া যায়, সে তখন কাগজ খুলিয়া বসিয়া রাজ্যের খপরগুলার উপর চোখ বুলাইয়া সেগুলাকে জানিয়া লইত; তার পর কাগজ বিক্রয়ের সময় সে বাছিয়া গুছাইয়া খপরগুলায় এমন রস দিয়া হাঁকিতে থাকিত যে চলন্ত পথিকেরা তার কথার তারিফ করিয়া হাসিমুখে তার হাত হইতেই কাগজ কিনিত!

সেদিন সে হাঁকিতেছিল—গেঁড়াতলায় ছুরির মার, পলটু গুণ্ডা গ্রেপ্তার; এবং পথিকের দল মহা আগ্রহে কাগজ কিনিয়া লইয়া যাইতেছিল। হঠাৎ নালু আসিয়া বলিল,—ঐ সেই পলটু!

বাবলা চাহিয়া দেখে, লুঙ্গি-পরা একটা ছোকরার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পুলিশ চলিয়াছে, মহা ব্যস্তভাবে। বাবলা চিনিল, এ সেই ছেলেটা যে একদিন পানওয়ালাকে মারিয়াছিল, তার পর তার হাত হইতে ছোড়া বোতল তাগ ফস্কাইয়া নালুর মাথায় লাগিয়া

নালু বলিল,—হ্যাঁ, তোর মনে পড়ছে না? সেই ছেলেটা রে—সেই যে আমার মাথা ফাটায়···এবার বাছাধন জব্দ হবেন।

বাবলা বলিল—ভারী জব্দ! পুলিশ তারপর ছেড়ে দেবে ত! বলবে, সাক্ষী নেই!

নালু বলিল,—এবার আর তা হচ্ছে না। যাকে ছুরি মেরেছে, তার একটা কাণই উড়িয়ে দেছে। ভারী বদমায়েস্।

বাবলা বলিল—কেন মার্‌লে মামা?

নালু বলিল—কাগজে পড়ে দেখিস্ নে? ওদের কোকেন বেচা ব্যবসা আছে! তার হিসেব নিয়ে কি গোলমাল হয়, তাতেই ও ছুরি মারে। সে লোকটা এখনো হাসপাতালে।

বাবলা বলিল,—জেল হবে পল্টুর?

নালু বলিল—হবে বৈ কি।

বাবলা বলিল,—এবারে জব্দ হবে তাহলে। যেমন পাজী, তেমনি মজা দেখবে'খন।

২

পল্টুর মামলা আদালতে বেশ জমিয়া উঠিবার মত হইল। তার বাপ হেদায়েৎ একটা পয়সাওয়ালা বদমায়েস। তার মামলায় বিস্তর উকিল প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। সে এ মামলায় একবারে উকিলের বাহার জমকাইয়া দিল। উকিলরা বিস্তর লড়ালড়ি করিয়াও পুলিশের কাছ হইতে পল্টুকে জামিনে বাহির করিতে পারিল না। হেদায়েৎ জলের মত পয়সা বাহির করিয়া দিল, পুলিশের বন্ধু-উকিল খাড়া করিল; কিন্তু তা করিয়াও কোন ফল হইল না। পুলিশ পল্টুকে কোর্টে চালান দিল আসামী করিয়া। সঙ্গে সঙ্গে দলের আরো চারজন চালান হইয়া গেল।

তার উকিলের পরামর্শে তখন হেদায়েৎ ব্যারিষ্টার প্রমোদের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাকে মোটা টাকা সেলামী দিয়া এ মামলায় খাড়া করিয়া দিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে প্রমোদের যে খুব ঘনিষ্ঠতা এবং সে যে শীঘ্র হাকিমের জামাতৃ-পদে বরিত হইবে, এ সংবাদ পুলিশ কোর্টের উকিলদের খুবই জানা ছিল। তাই হেদায়েৎ পয়সাকে পয়সা জ্ঞান না করিয়া এ মামলায় প্রমোদকেও জুড়িয়া দিল।

টিফিনের পর নূতন চালানী কেশ ডাক হইবার কথা। উকিলের দল নক্ষত্রবৃন্দের মত প্রমোদকে ঘিরিয়া এজলাসে ভিড় করিয়া বসিয়াছিলেন। হাকিম আসিয়া এজলাসে বসিলে প্রমোদ জামিনের দরখাস্ত পেশ করিল। হাকিম সেখানি পড়িলেন। পুলিশ হইতে কড়া রকমের আপত্তি উঠিল—এ কেশ জামিন দিবার নয়। তাছাড়া জামিন দিলে আসামীরা পিতা-পুত্রে মিলিয়া সাক্ষীদের শাসাইয়া দেশছাড়া করিবে, নয় টাকায় বশ করিয়া বিগড়াইয়া দিয়া মামলা নষ্ট করিয়া দিবে। পল্টু যে বাঘের চেয়েও হিংস্র ও ভয়ঙ্কর—এবং এমন মার-পিট করিয়া বহু লোককে সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে—

যুক্তির বিরুদ্ধে নানা যুক্তি খাড়া করিল। সে বলিল, আসামী না পলায়, জামিন দেওয়া না দেওয়ায় এইটুকু দেখাই আইন-কারের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে তার মক্কেল মোটা জামিন দিতে প্রস্তুত আছে এবং সে পলাইবে না, কারণ কলিকাতাতেই তিন পুরুষ ধরিয়া তার বাস; নিজের ঘর-বাড়ীও এখানে আছে। আসামী জামিন না পাইলে মামলার তদ্বির করিতে পারিবে না এবং তাকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। হাকিম বীরেন্দ্র বাবু তথাপি জামিন নামঞ্জুর করিলেন, বলিলেন, মামলার শুনানি হইলে সাক্ষীর জবানবন্দী শুনিয়া তিনি জামিনের হুকুম সম্বন্ধে মামলার তারিখে পুনরায় বিবেচনা করিবেন। আপাততঃ জামিন দিতে তিনি নারাজ।

হেদায়েৎ টাকার জোরে চিরকাল জিতিয়া আসিয়াছে; আজ এ পরাভবে সে কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল। ব্যারিষ্টারের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হাইকোর্ট করে দিন সাহেব।

উকিলরাও বলিলেন,—এখনই।

প্রমোদ অগত্যা তাহাই করিল,—কিন্তু হাইকোর্টেও পল্‌টুর জামিন মঞ্জুর হইল না। হেদায়েৎ তখন এক ফন্দী আঁটিল।

হাইকোর্টে পল্‌টুর জামিনের প্রার্থনা যেদিন নামঞ্জুর হইল, সেইদিন সন্ধ্যার পর সে গিয়া বীরেন্দ্রবাবুর বাড়ী হাজির হইল। তার সঙ্গে ছিল একটা কুলি, তার মাথায় ফলের ডালি, ও অন্য উপহার।

বীরেন্দ্র বাবু তখন উপরের ঘরে বসিয়া প্রমোদের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন—বিভাও সে ঘরে বসিয়াছিল। তাঁর ভৃত্য কুলির মাথার ডালি লইয়া উপরে আসিয়া বলিল, বাহিরে একজন লোক আসিয়াছে, সে দেখা করিতে চায়।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—এ সব কোথায় পেলি?

ভৃত্য বলিল,—সেই লোকই এনেছে।

বীরেন্দ্র বাবু তাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—কে এনেছে, খোঁজ নেই, খপর নেই, তুই এগুলো একেবারে উপরে নিয়ে এলি যে! নীচে চ, দেখি, কে লোক এসেছে।

বীরেন্দ্র বাবু নীচে নামিয়া আসিলেন। হেদায়েৎ তাঁর পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল,—হুজুর মা-বাপ।

বীরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কি চাও?

হেদায়েৎ বলিল, পল্‌টু নামে একটি ছোকরাকে পুলিশ তাঁর কোর্টে চালান্‌ দিয়াছে ছুরি-মারা অপরাধে—সেই পল্‌টুর বাপ সে। পল্‌টুর জামিন তিনি নামঞ্জুর করিয়াছেন; হাইকোর্টও নামঞ্জুর করিয়াছে; সে তাই আসিয়াছে তাঁর কাছে ছেলের জামিন ভিক্ষা চাহিতে। এ মেহেরবাণী না করিলে তার রুগ্না স্ত্রী অর্থাৎ পল্‌টুর মা মারা যাইবে। এ মামলায় হাকিমের জামাই প্রমোদ ব্যারিষ্টার সাহেবও পল্‌টুর পক্ষে আছেন—এ কথাটাও হেদায়েৎ বলিতে ছাড়িল না।

বীরেন্দ্র বাবুর মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন,—এ ফল-টল তুমিই এনেছ ?

হেদায়েৎ সেলাম করিয়া বলিল,—জী হুজুর।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—এ ঘুষ! তুমি ঘুষ দিতে এসেছ হাকিমকে! জানো, এর জন্ম সাজা হতে পারে ?

হেদায়েৎ বীরেন্দ্র বাবুর পা ছুঁইয়া সেলাম করিয়া বলিল,—হুজুর জানের মালিক!

বীরেন্দ্র বাবু ধমক দিয়া বলিলেন,—ও সব হবে না। জিনিষ নিয়ে যাও—আমার বাড়ীতে আর এসো না···এলে পুলিশে দেব।

হেদায়েৎ বলিল,—হুজুর,আমার ঐ লেড়কা, এক লেড়কা। বহুৎ দাগার পর ঐ লেড়কা পয়দা হয়েছে—আমার ভারী পেয়ারের। শুধু জামিন দিন্—তার পরে মামলায় যা হয়, হবে। হুজুর কড়া হবেন না—আপনারও লেড়কা আছে—আপনিও লেড়কার বাপ, আমিও বাপ—লেড়কার দরদে ছাতি ভরে আছে...মেহেরবাণি করুন,—খোদা ভালো করবেন আপনার। হুজুর হাইকোর্টের জজ হবেন!

বীরেন্দ্র বাবু চড়া গলায় ধমক দিলেন,—বাইরে যাও তোমার জিনিষ নিয়ে।

হেদায়েৎ জানাইল, কুলি চলিয়া গিয়াছে।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—নিজে মাথায় করে বাইরে নে যাও। তার পর পথে কুলি ডেকে নাও গে। যাও,—

হেদায়েৎ নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।

ভৃত্যকে ডাকিয়া বীরেন্দ্র বাবু হাঁকিলেন,—ওর ঝুড়ি ফিরিয়ে দে—

হেদায়েৎ পুতুলের মত তবু নিথর দাঁড়াইয়া। বীরেন্দ্র বাবু হাঁকিলেন,—নিয়ে যাও—

হেদায়েৎ তাঁর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, বলিল,—হুজুর—এই লেড়কা আমার জান্

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—কোন কথা না। নিয়ে যাও জিনিষ। কোন কথা শুনবো না আমি।

তার চীৎকারে প্রমোদ নীচে নামিয়া আসিয়াছিল—বিভাও আসিয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিল। বীরেন্দ্র বাবুর মুখে এমন চড়া কথা কেহ কোনদিন শোনে নাই,—তাই তাদের বিস্ময় কৌতূহলের আর সীমা ছিল না।

বীরেন্দ্র বাবুর ধমক খাইয়া হেদায়েৎ ফিরিয়া চাহিল। ঐ যে প্রমোদ, তার ব্যারিষ্টার সাহেব! আর ঐ তরুণী? হেদায়েৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বীরেন্দ্র বাবুর পানে চাহিল,—জামিন দেবেন না ?

বীরেন্দ্র বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন,—না, না, না। যা তোমার বলবার থাকে, আদালতে তোমার উকিলদের দিয়ে বলিয়ো—এখানে কোন কথা শুনবো না। তুমি এখনি যাও। আর যদি দেরী কর তো তোমায় ধরে এখনি পুলিশের হাতে দেব।...যাও—

—রাস্কেল···! বীরেন্দ্র বাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভৃত্যকে বলিলেন,—পুলিশ ডাক্‌।

হেদায়েৎ সেলাম করিল, বলিল,—জামিন দেবেন না তাহলে?...বেশ...পুলিশের দরকার নেই—আমি চলে যাচ্ছি।...জামিনটা দিলেই ভালো করতেন। না দিয়ে ভালো করলেন না বাবু...এর জন্যে পস্তাবেন! হেদায়েৎ কখনো হঠেনি কোথাও...

কথাটা বলিয়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার বীরেন্দ্র বাবুর পানে, পরে প্রমোদ ও বিভার পানে তাকাইল—তার পর ফলের ঝুড়ি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সে বাহিরে গেলে প্রমোদ বীরেন্দ্র বাবুর কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল,—ব্যাপার কি? ও হেদায়েৎ, না?

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—হ্যাঁ, হেদায়েৎ কোকেনওয়ালা। ওর ছেলে পল্টুর জন্যে জামিন চেয়েছিলে না? দিই নি। তাই এসেছিল কতগুলো ফলটল ঘুষ দিয়ে জামিনের হুকুম নেবার জন্যে। এর কি এতদূর আস্পর্দ্ধা হতো? এর পিছনে কারো পরামর্শ আছে। না হলে এত সাহস ওর কখনো হতো না যে...

প্রমোদ বলিল,—ভারী বদমায়েস তো!···ওর ছেলের কেসে আমি ছিলুম যে!

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—হ্যাঁ।

প্রমোদ বলিল,—এ কেশে তো আর থাক্‌তে পারি না। ওর উকিলদের বলে দেব, আজকের কথা!

বীরেন্দ্র বাবু গুম্‌ হইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া রহিলেন; কোন কথা বলিলেন না।

বিভা আগাইয়া আসিয়া ফ্যানের সুইচ্‌টা টিপিয়া দিল। তার মুখ ভয়ে ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল,—শাসিয়ে গেল, কোন হাঙ্গাম করবে না তো বাবা?

বীরেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন,—পাগল!···তবে ওর মামলা আমি করবো না—অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেব। এ ঘটনার পর পল্টুর মামলা আমার করা ঠিক হবে না।

প্রমোদ বলিল,—যা হয় হোক, আমি ও কেশ্‌ নিচ্ছি না।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—তোমায় বোধ হয় আর দেবেও না। তোমায় দেবার সময় ভেবেছিল, তোমার খাতিরে বুঝি জামিন দেব আমি!

প্রমোদ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে বীরেন্দ্র বাবুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—এ বুদ্ধি কি ওর অমনি হয়েছিল! এ বুদ্ধি আর কেউ ওর মাথায় পুরে দেছে। তাই থেকে ওর সাহস হয়েছিল ঘুষ দিতে আসবার।···বিচার বিক্রী হয়, সব ভাবে! আশ্চর্য্য!

বীরেন্দ্র বাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিভা তাঁর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল; কিয়ৎক্ষণ পরে বিভা বলিল,—আমার ভয় হচ্ছে বাবা, যে রকম বদমায়েস লোক—কি করবে শেষে!

বীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—ক্ষেপেছিস্‌. যাক্‌! ওপরে চ,—মনটা খিচড়ে দিয়ে গেল—মোদ্দা!

তুই গান গাইবি চ, তোর গান শুনলে মনটা ভালো হবে।...ভালো কথা, তোদের গানের স্কুলে না কি কি musical soiree হবে রে? মিষ্টার নাগের কাছে শুনছিলুম—সেদিন তিনি এসেছিলেন আমার কোর্টে একটা মামলায়। আমার চেম্বারে এসে তিনি বললেন। তা ছাড়া তোর বাজনার ভারী তারিফ করলেন। চ দিকিন, অনেক দিন তোর গান-বাজনা শুনিনি—গাইবি চ।...এসো হে প্রমোদ।

(ক্রমশ :

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ইস্‌লামের ধর্মগোপ্তা

খিলাফৎ ইস্‌লামের একটি খিলান। যখন সেটা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে তখনই সেটার সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের বাড়িতেছে। দেহের প্রতি অঙ্গ যখন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় স্ব স্ব কাজ করিয়া যায় তখন তাহাদের অস্তিত্ব কারও চোখে পড়েনা। বিকৃতি ঘটিলেই দেহীর সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হয়। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে 'পাঞ্জাব ও খিলাফৎ' বুলি ধরিয়া আজ চার বৎসর যাবৎ দেশের লোক দাপাদাপি করিল, জেল খাটিল, ভয় ছাড়িল, বুলি ছাড়িল না। অধিকাংশ হিন্দুই কিন্তু কথাটা ভাল করিয়া বুঝিলেন না, কেননা মুসলমান ভাইরা নিজেরাই বুঝেন নাই বলিয়া বুঝাইতেও পারেন নাই। তাই যখন তুর্কীরা খিলাফৎকে চুরমার করিয়া দিল, হিন্দুরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বালাই গেল, আর মুসলমান ভায়ারা সুদূরের পিয়াসী হইবেন না, ঘরের ভিটে মাটির দিকে তাকাইবেন, ভারত-প্রণয়ই জীবনের সার করিবেন, মহাত্মা গান্ধির হিন্দু মুসলমান-ঐক্যনীতি খিলাফতের মত একটা অনিস্‌লাম-বিদ্বেষকে অবলম্বন করিয়া উল্টা ডিগবাজি খেলিবেনা। হরি হরি! এ মানুষটাকে বোঝাই দায়। সব সোজা হিসেবকিতেব ঠিক-দেওয়া-দেখিকে বেঠিক করিয়া এ একটা যারপর নাই অদ্ভুত আঁক পাতিয়া বসে এবং কোন একটা সৃষ্টিছাড়া পথে এক পা বাড়াইলে আর তাকে পিছু হটান দায়, তখন সবায়ের যুক্তিকে সে অযুক্তি করিয়া দেয়। ফস্ করিয়া মহম্মদ আলিকে মহাত্মাজী এক চিঠি লিখিয়া বসিলেন যাতে ব্যক্ত করিলেন যদিও জগতের তাবৎ ব্যাপারের কর্ত্তা ঈশ্বর, কিন্তু খিলাফতের মামলাটা ভারতীয় মুসলমানেরই কর্ত্তৃত্বাধীন। আর কেউ এমন ভাষা ব্যবহার করিলে লোকে নানা কথা বলিত। তবে মহাত্মাজীর উক্তি সুতরাং সকলে হতভম্ব হইলেও

যে আগুণ নিবিতেছে তাকে নিবিতে না দিয়া মহাত্মাজী ভারতীয় মোস্‌লেমদের অমোস্‌লেম-বিদ্বেষ জাগ্রত করিয়া রাখিতে উৎসাহ দিতেছেন কেন? কারণ এই যে—আমি যতদূর বুঝিয়াছি—খিলাফতে হিন্দু বিদ্বেষ নাই, কেবল ইস্‌লাম-ধর্ম্মীর আত্মসংরক্ষা নিহিত আছে। তুর্কীরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও মুসলমান-জগৎ ইহাকে জুড়িতে চেষ্টা করিবেই। ভারতীয় মুসলমানেরা সে বিষয়ে অগ্রণী হইবে কারণ তাদের গরজ সব চেয়ে বেশী। সুতরাং কোন এক সম্প্রদায়ের অবশ্যম্ভাবী মর্ম্মপীড়ার সহিত সহানুভূতিই হিন্দু-মুসলমান-ঐক্যনীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এই সব তত্ত্বগুলি এক পলকে উপলব্ধি করিয়া মহাত্মাজী মহম্মদ আলিকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিজ্ঞজনোচিত হইয়াছে। আমি অল্প স্বল্প অনুশীলনে বস্তুটীর সার তত্ত্ব যেমন বুঝিয়াছি, আজ তেমনি বুঝাইব। যদি কোথাও ভুল করিয়া থাকি মুসলমান ভাইরা আমার ভুল ধরিয়া দিলে অনুগৃহীত হইব।

খিলাফৎ জিনিষটা কি? হিন্দুশাস্ত্রে আদর্শ রাজাকে বলে "ধর্ম্মস্য গোপ্তা" ধর্ম্মের রক্ষক। ধর্ম্মরক্ষা রাজার একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চাতুর্ব্বর্ণ্য যাহাতে স্বধর্ম্মানুযায়ী কাজ করেন, ব্রাহ্মণ নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন, ক্ষত্রিয় অন্তর্বহির্শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করেন, বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্য ও পশু পালনের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজার অন্নবৃদ্ধি করেন, শূদ্র প্রভুগৃহে সন্তানস্নেহে পালিত হইয়া যথোচিত প্রভুসেবা করেন ইহার তত্ত্বাবধান করা রাজার কর্ত্তব্য। ধর্ম্মচ্যুত দুষ্টের দমন ও ধর্ম্মযুত শিষ্টের পালন রাজার কর্ত্তব্য, তাই রাজা ধর্ম্মগোপ্তা। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তপস্বীগণের তপোবিঘ্ন নিবারণের জন্য বৃদ্ধ রাজা দশরথ তাঁর নয়নের মণি বালক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে রাক্ষসবধের নিমিত্ত মুনির সঙ্গে বনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা ও প্রজা যেখানে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সেখানে রাজা প্রজার ধর্ম্মগোপ্তা হইতে পারেন না।

তাই ভারতের অধুনাতন রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতে হিন্দু বা মুসলমান কোন প্রজারই ধর্ম্মগোপ্তা নহেন। যদি তিনি প্রজার ধর্ম্মগোপ্তা হইতেন তবে আকালী যথ্যুর অখণ্ডপাঠের আজ এত হাঙ্গামা বাধিতনা। ইস্‌লাম খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় এক প্রসেলেটাইজিং ধর্ম্ম। আরবের মরুপ্রদেশেই ইহা আবদ্ধ থাকে নাই। জন্ম হইতেই এ ধর্ম্ম দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তখনি দেখা গিয়াছে সব দেশের এক রাজা নহেন এবং সব রাজাই স্বয়ং ইস্‌লামধর্ম্মী নহেন। সুতরাং মুসলমানরাজাহীন দেশে মুসলমানপ্রজার ধর্ম্মগোপ্তা কে হন্? তিনি খলিফা, তাঁরই রাজ্য ও পদের নাম খিলাফৎ। এই বিপুলা পৃথ্বীর যে কোন অংশে যে কোন প্রদেশে যে কোন মুসলমান যে কোন রাজার পোলিটিকাল প্রজা হউক ধর্ম্মতঃ সে খলিফার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন।

হিন্দুরা পুরাকালে রাজ্য বিস্তৃতি করিয়াছেন, ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম গণতন্ত্রমূলক না হওয়ায় এরূপ একটি জগদ্ব্যাপী ধর্ম্মগোপ্তার অনুষ্ঠান আর্য্যহিন্দুরা কোন

দুরান্তিকে প্রক্ষিপ্ত প্রত্যেক ইংরেজ নরনারীর প্রাণগোপ্তা ও স্বার্থগোপ্তা কাজে কাজেই ধর্ম্মগোপ্তা তাদের জাতীয় সঙ্ঘ পার্লামেন্ট। সাধ্য কি কোন চীনে, কোন ইরাণী, কোন কাবুলী, কোন জাপানী, কোন নিগ্রো, কোন জার্ম্মান, কোন বল্‌সেভিক বা কোন গ্রীক বিনা বাক্যব্যয়ে কোন ইংরেজ নরপুঙ্গবের একটি কেশ উৎপাটনও করে—অমনি পার্লামেণ্ট হুহুঙ্কারে মেদিনী ফাটাইয়া দিবে। ইংরেজের পিছনে সঙ্ঘের জোর আছে এবং সেই সঙ্ঘের পিছনে সৈন্যের জোর আছে। তাই রক্ষক হইতে হইলে পরাক্রমান্বিত হইতে হইবে, সেইজন্য খলিফা যিনি মুসলমানের ধর্ম্ম সংক্রান্ত স্বকৃত ব্যভিচার বা পরকৃত অত্যাচারের প্রতিবিধানকারী তাঁর পশ্চাতেও চাই প্রতাপ। তাই খলিফা মনোনীত হওয়ায় যে সর্ত্ত গুলি আছে, তার মধ্যে প্রধান সর্ত্ত এই যে স্বাধীন মুসলমানরাজ্যের অধিবাসী না হইলে খলিফা হইতে পারেন না। কোন দরিদ্র ব্যক্তির খলিফা হওয়ায় বাধা নাই, কারণ সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানেরা চাঁদা উঠাইয়া তাকে বিভবশালী করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু দাসকে অদাস করা কাহারও সাধ্য নয়। যে নিজে স্বাধীন নয়, সে আশ্রিতের আত্মার স্বাধীনতা-হরণের প্রতিবিধান করিবে কেমন করিয়া? অন্য কোন প্রভুত্বশালী জাতির পদানত সামান্য ব্যক্তি বা তাহার অঙ্গুলি চালনায় মস্‌নদনসীনও এ পদের যোগ্য নয়, তাদের গর্জ্জন যে গলাতেই আটকাইয়া যাইবে, হুম্‌কি শুনিবে কে? তাই ভারতীয় কোন মুসলমানই খলিফা হইবার যোগ্য নহেন, না মহম্মদ আলি না হিজ এক্‌জল্টেড হাইনেস নিজাম। ইজিপশানও এখন খিলাফতের অনধিকারী কারণ ইজিপ্ট ইংরেজ প্রভুত্বাধীন। আরবে যে শরীফ হোসেন ইংরেজের হাতের কাঠপুত্তলি হইয়া নিজেকে খালিফ ঘোষণা করিতেছেন তিনি অনধিকারী কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আরব যদি স্বাধীন দেশ হয় তবে তিনিও অধিকারী, যদি ইংরেজআজ্ঞাধীন হয় তবে অনধিকারী। মোট কথা এই খলিফা স্বয়ং রাজা না হইলেও চলে, কিন্তু তাঁর স্বাধীন রাজার তুল্য শক্তি ও প্রতিপত্তির আবশ্যক। *

ক্রিশ্চানেরা খিলাফতের বিরোধী। তাঁদের বলিতে শুনিয়াছি ধর্ম্মের নামে পার্থিব সম্পদের দাবী জজীরুল আরবের আধিপত্যের সঙ্গে ইস্‌লামধর্ম্মের অঙ্গাঙ্গিভাব তাঁহাদের ধর্ম্মধারণার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না। যীশুখ্রীষ্টকেশয়তান ত্রিভুবন-পতিত্বের প্রলোভন দেখাইয়াছিল, যীশুখ্রীষ্ট সে প্রলোভনে ভুলেন নাই। তাঁহার স্বজাতি ইহুদীরা তাঁকে রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ইহুদী সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রেরণা দিয়াছিল, তিনি তাহাতে টলেন নাই—তবে মুসলমানদের ধর্ম্মের নামে দুনিয়াদারী কেমন করিয়া বরদাস্ত করা যায়? আমরা দেখাইয়াছি খিলাফৎ ধর্ম্মের নামে দুনিয়াদারী নহে, দুনিয়াবাসী ধার্ম্মিকের ধর্ম্মের অভিভাবকতা। দুনিয়ায় ভাল মন্দ সব প্রকারের লোক আছে, শত্রু মিত্র দুয়েরই সম্ভব, সুতরাং স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী দুয়েরই হাত হইতে সম্ভাবিত উৎপাত নিবারণের জন্য খিলাফতের সৃষ্টি। মধ্যযুগের য়ুরোপীয়েরা একবার

ধর্ম্মের নামে দল বাঁধিয়া তাঁহাদের এসিয়াটিকের প্রতি জাতবিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছিলেন। সে বিদ্বেষ ইতিহাসে, কাব্যে, কাহিনীতে ফাঁপাইয়া বিনাইয়া গৌরবমণ্ডিত করিয়া ক্রুসেড নামে অভিহিত হইয়াছে। ক্রুসেডের ইতিহাস অনুধাবন করিলে মূলদোষ কাহার পাওয়া যাইবে জানিনা, কিন্তু শুনিয়াছি এ কথা সত্য যে ক্রুসেডের পূর্ব্বে খিলাফৎ নিরুপদ্রবী ছিল। ক্রুসেডের ধাক্কা খাইয়া তাহাকে আত্মরক্ষার্থ সশস্ত্র ও সক্রিয় হইতে হয়। সুতরাং এক গালে চড় খাইলে অপর গালটি পাতিবার গুরুমন্ত্রধারীরাই গুরুর অবমাননাকারী ধর্ম্ম যুদ্ধ ক্রুসেড পাঠাইয়া খিলাফৎকে উদগ্র করিয়া তোলেন।

তবে তুর্কী খিলাফৎকে নির্ব্বাসিত করিল কেন? কালের অপরিহার্য্য নিয়মে খিলাফতের শিরায় শিরায় জরাজীর্ণতা ও অশুদ্ধতা প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে কুসংস্কার, জ্ঞানের নামে অজ্ঞান, স্বাধীনতার নামে পরপদানততার প্রশ্রয় দিয়া খালিফ ও তাঁর পারিপার্শ্বিকেরা মুসলমানধর্ম্মীকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতি হইতে বঞ্চিত রাখিতেছিলেন। তাই যে গোটা মানুষটার মধ্যে জীবনেরও স্বাধীনতার তীব্র তেজোময় রস ভরিয়া গিয়াছে সে নব্য তুর্কী এতদিনকার বাধাময় জড় প্রাচীন সংস্কারটাকে কুছ-পরোয়া-নেই বলিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এক ঠোকরে ভাঙ্গিয়া দিল, বাকী সব দেশের মুসলমানেরা 'আহা কি কর কি কর' বলিয়া সারা, কিন্তু তুর্কীর তাতে সাড়া নাই, ভ্রুক্ষেপও নাই। এখন বাকী দুনিয়ার মোসলেমকে খেলাফতের পুনর্গঠন করিতে হইবে। করা চাই, কিন্তু জীর্ণসংস্কার করিয়া। ভারতীয় মোসলেম ভাইরা মনে রাখিও এই নূতন বোধনের সঙ্গে শোধনেরও সময় আসিয়াছে। ধর্ম্ম তোমাদের অমোসলেম-বিদ্বেষ শিখায়না, কর্ম্ম যাহাই করাইয়া থাকুক। আজাদ শোভানি প্রমুখ তোমাদেরই ধর্ম্মাত্মাপুরুষেরা বলিতেছেন কোরানে স্বধর্ম্মানুসরণের অর্থ নয় পরধর্ম্ম-পীড়ন। যে মুল্লারা অন্যথা প্রচার করে তারা ধর্ম্মহীন, স্বার্থান্বেষী। কিন্তু এই শেষোক্তেরা নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই, ফলে শতাব্দীব্যাপী ঘটনাবলী লোকমনে একটা মিথ্যা ছায়াপাত করিয়াছে। বহু মুসলমানের নিজেরই সে বিষয়ে একটা রক্তমজ্জাগত কুসংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাই কখন কখন মৌলানা আব্দুলবরি এমন কি মহম্মদ আলির ন্যায় জননায়কদের মুখেও দৈবাৎ এমন একটা বেফাঁস কথা বা বেকায়দায় কওয়া কথা বাহির হইয়া যায় যার জন্য পরে আবার তাঁহাদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এমনটি যেন আর না হয় যে মুসলমানের তথা-কথিত ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল হইয়া উঠার নামে অন্যধর্ম্মীরা ত্রাহি ত্রাহি জপে। কোরাণ শরীফের অমৃতসলিলে অবগাহন করিয়া অভয়মূর্ত্তিতে তোমরা আত্ম-প্রকাশ করিলে তাবৎ ভারতবাসী স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তোমাদের ধর্ম্মরক্ষায় দোসর থাকিবে, কেবল গান্ধিপরতন্ত্র হইয়া নহে। যেমন বায়রন গ্রীসের স্বাধীনতাহরণ ভয়ে সমবেদনায় আকুলিত হইয়াছিলেন, যেমন ম্যাটাসিনি সেদিনের উদার ইংলণ্ডের

প্রেরণাভরিত হইয়াছিল, তেমনি খিলাফৎকে বাঁচানর প্রেরণা সকল ধর্ম্মপ্রাণেই জাগিবে।

খিলাফৎ বা ধর্ম্মগোপ্তৃত্ব এমন একটি প্রিন্‌সিপ্‌ল্ বা সত্য যার জন্য মনস্বী মনুষ্যমাত্রে সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে পারে। পার্থিব ধর্ম্মগোপ্তা সেই শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তারই প্রতিভূ

যিনি

যদা যদা ধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য

তখনই

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতা
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ সম্ভবামি
যুগে, যুগে, দেশে দেশে,
লোকে লোকে।

শ্রীসরলা দেবী।

বাণী-বিতান

সিদ্ধি

সত্য যখন আমার মাঝে ছিল
এমন ধারা পায় নি তো সে রূপ;
এমন ধারা সজীবতার বাণী
প্রাণে কভু দিত না তো আনি,
পূর্ণ করা আনন্দেরি খনি
হয় নি তো সে এমন অপরূপ।
ছিল বটে আমার বুকের মাঝ
লুকুনো কোন গুহার নীরব কোণে;
অরুণ তাহার তরুণ মুখের পরে
সোণার আলো নাহি ছিল ধরে
তুমি এসে দিলে তারে ভরে

আমার মনের সপ্ত-সুরের বীণা
ধূলার-মাঝে পড়ে ছিল লুটি।
মৌন ছিল উঠতো নাকো বাজি
বিশ্ব সাথে নবীন রূপে সাজি
তোমার হাতে উঠলো ধ্বনি' আজি
উঠলো সুরের মূর্ত্তি আজি ফুটি।
মনের বনে হাসনা-হানার ঝাড়ে
ফোটে নি কো একটীও তার ফুল।
তুমি এলে দক্ষিণ হাওয়ায় নিয়ে
বসন্তেরি কাঁপন তারে দিয়ে
চুম্বনেতে তুললে কাছে গিয়ে
রইল না আর মনে কোন ভুল।
সবই ছিল আমার বুকের-মাঝে
আগুণ শুধু ছিল নাকো সেথা।
কত বরষ অন্ধকারে ভরা
বারুদ-গাদা ছিল শীতল করা
আগুণ কণা আজকে দিলে ধরা
মৌন তাতে ফুটলো আজি কথা।

শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার

কুমারী

পূর্ণিমা-চাঁদ চমকে ওঠে রূপ হেরে তার গহন রাতে,
নিশীথিনীর নীল শাড়ীতে ফুল্‌কি-নাচন জ্যোৎস্না সাথে।
অশোক রাঙা লাল্‌ছে ঠোঁটে,
জম্‌লা মধু উথ্‌লে ওঠে!
মনের বনের ভোম্‌রা গুলো গুঞ্জরিয়া মাতায় মাতে!
তরুণ চোখে ঘুমের ঝোঁকে ভেল্‌কী লাগায় গহন রাতে!
টুনটুনিতে হার মানে তার ডাগর চোখের নাচন-দোলায়!
পাঁয়জোরে জোর ঘূর্ণী ছোটায় কাল-বোশেখীর

এলো চুলের রক্ত ফিতায়,
টগর কলির মঞ্জরী তায়,—
দোল-দোলানো ফুলের তবক অটুট বাঁধন দেহের দোলায়,
তরুণ বুকের লজ্জা সম্ভ্রম শ্রান্ত শিথিল—মন যে ভোলায়!
তার হাসিতে দিল্-দরদীর ছন্দ-ছাড়া কাঁদন হাসি।
গুল্‌গুলাবির ঢুলঢুলানি গোলাপ সরাপ বাজায় বাঁশী!
নিটোল দেহের স্বাস্থ্য জ্যোতি,
হার মেনে যায় নগ্ন রতি!
রূপের খোলে ভরিয়ে তোলে ভোর-দখিনায় কুসুম হাসি!
কণ্ঠেতে কথা বেজে ওঠে পথের মাঝে লাজুক বাঁশী!
ঐ যে গড়ন মন-ভুলানো বাহুর নীচে হাতের বাঁকে,
একই সরল তাই দেখে ঐ বন্‌-শ্যামলী নাচ্‌তে থাকে!
খুস্‌খুস্‌ তার শাড়ীর নেশায়
তরুণ বুকে কি সুর মেশায়!
ফুল-বঁধু তার অঙ্গ পানে একটানা সে চেয়েই থাকে,—
ফুটলে পরে সব ফুরালো—গুমরে মরে ঝোপের ফাঁকে!

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

সান্ত্বনাময়ী

দিন আমারে নিত্য এসে
ভুলায় সোনা হাসে,
ধরা আমায় তোষে শ্যামল
রূপের পরকাশে।

নদী আমায় মুগ্ধ করে
তার সে কলতানে,
নৃত্য করি চিত্ত ভুলায়

কাঁদলে আমি একলা বসে,
ঝরলে চোখে জল,
থেমুর ছুটো ছুটি হেরে—
মুছি নয়ন তল।

দুঃখ যবে জমাট বেঁধে
মনটা করে ভারি,
ফুলের মধু গন্ধ নিয়ে
পবন পাতে আড়ি।

নিত্য আমার চিত্তহরা
হে প্রকৃতি রঙ্গিনি।
সান্ত্বনা দাও শতেক দুখে
তুমিই চির সঙ্গিনী।

শ্রীঅমূল্য রায় চৌধুরী।

স্নানের ঘাটে

কবির মানস বেড়ায় ঘুরি
যেথায় বাজে পুকুর ঘাটে পল্লীবধুর কাঁকন চুড়ি।
চটুল চোখের বিলোল চাওয়া
শিথিল কেশে উতল হাওয়া
যেথায় পুলক ঘনিয়ে তোলে শেওলামাখা সোপান' পরে
সেথায় কবির মন বিচরে।
ঘুঙুর বাজে মুখর মলে,
সুরের মায়া স্বপন রচে আকুল বারির ছলাৎছলে।
শিউরে ওঠে শাড়ীর আঁচল
লুটিয়ে পড়ে রঙিণ কাঁচল,
যেথায় নীবির বাঁধন খানি হয়রে উদাস গাহন তরে,

জল তরঙের দাগে দাগে
যৌবনেরই বলী রেখায় পারিত পাতায় রভস-রাগে !
আধ-ডোবা বুক একটু দোলে,
আনমনা কেউ চিবুক তোলে,
যেথায় হাসির টোল-খাওয়া গাল সিনান-কেলি নিবিড় করে,
সেথায় কবির মন বিচরে।

কনকচাঁপার পায়ের ঘায়ে
কৃষ্ণজলের পাষাণ টুটে ঝর্ণা ঝরে মাথায় গায়ে !
সুডোল দেহ সাঁতার সুখে
জল কেটে যায় আকুল বুকে,
যেথায় ললাট কুচকে ওঠে অতল বারির ঘনাদরে,
সেথায় কবির মন বিচরে !

চূর্ণ-চিকুর ছড়িয়ে পড়ে—
হয়ত কোথাও পদ্মকুঁড়ির সবুজ মৃণাল জড়িয়ে ধরে !
একটু রোষে অরুণ ঠোঁটে
রক্তজবার কোরক ফোটে,
যেথায় কানের দুলদুখানি চম্‌কে দোলে হর্ষ ভরে,
সেথায় কবির মন বিচরে !

ঢেউএর তালে ছল্‌কে ভেসে
শূন্য কলস ঘা' মেরে যায় কোমল নাসায় হঠাৎ এসে ঃ
তরুণ হাতের করুণ চাপে
চপল কলস সঘন কাঁপে
যেথায় অলস প্রাণ উদাসে জল ধরিবার কলস্বরে,—
সেথায় কবির মন বিচরে !

সাঁঝের জলে তিমির-গেহ
নীল শাড়ীতে সোহাগ মাথায়,—শেষ গাহনের শীতল স্নেহ !
আঁচল ওঠে বুকের'পরে
কুম্ভ আবার কক্ষে চড়ে,
যেথায় আবার ঘোমটা খানি কৃষ্ণ কেশের লাজ আবরে,—
সেথায় কবির মন বিচরে !

ঢেউ থেমে যায় সোপান তলে !
ক্লান্ত চরণ মন্থরে ধায়—কলস ভারে কাঁকাল টলে !

বউরা ফেরে ঘরের পানে
কানন পথের রেখায় টানে,
যেথায় পিছে এলুন দিতে সিক্ত বাসের সলিল ঝরে—
সেথায় কবির মন বিচরে!
শেষ হয়ে যায় স্নানের পালা :
অথই জলের বক্ষে লুকায় ছন্দকেলির নৃত্যশালা!
পল্লী আসে ঝাপ্‌সা হয়ে,
আঁধার নামে জোনাক লয়ে
যেথায় শুধুই শব্দবিহীন জলের স্বপন পরাণ হরে,—
সেথায় কবির মন বিচরে।
যেথায় শুধুই বাতাস ফিরে,
ব্যাকুল বনে হুতাশ মাথায় স্তব্ধ গহন বক্ষ চিরে!
ঝিল্লী কাঁদে কেয়ার শাখে,
প্রতিধ্বনি ডুক্‌রে ডাকে
যেথায় গাঁয়ের দ্বারে দ্বারে—সবাই ঘুমায় রুদ্ধ ঘরে!—
সেথায় কবির মন বিচরে!

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক।

পরগাছা

আমি পরগাছা অনাদর মাঝে
তুলিয়া উঠেছি মাথা;
গোলাপ-কবরী-যবনিকা ফাঁকে
মাটীর আঁচলে গাঁথা!
ফুলের কিনারে আমার আলয়
পায়না কভু সে আলো;
আমার জীবন অতি সাধারণ

আমার আদর নেই কিছু নেই
আপনা আপনি বাঁচি,
পাই নাক জল—বেচে থাকি তবু
লুটিয়া মাটীর চাঁচী
অঙ্গে আমার নাহি কোন রঙ
নাহি শোভা নাহি আলো,
তবু বনানীর পইঠার পরে
আমি গো সবার ভালো!
রূপালি সোনালি ফুলেদের সাথে
করিগো শ্যামল খেলা,
ঝরে যদি ফুল-লয়ে ঝরা ফুল
বাঁধি গো ফুলের ভেলা।
আমি দূরগাছা রহি সব তলে
তাই বলে নহি নীচু,
আমি দূরগাছা—বাগানের রাজা—
ঘোষিতে পারি না কিছু।
ফুলবাগানের রাজত্ব মোর
অর্দ্ধ পরিধি ঘিরে,
শ্যামলের বন আমি গো বসাই
রূপালি সোনালি তীরে।
আমি মখমল চারু-উজ্জ্বল
আলো ছায়া শুধু মাখি,
ঘূর্ণি-বেঁহুস রৌশনী-মালা
কণ্ঠে আমার রাখি।
গাছপালা হায় শুষ্ক মাথায়
সবুজ টোপর পরে,
কুঞ্জ বালার সাত-নরী হার
সেত শুধু মোর তরে!
মরণের সাথে করি কোলাকুলি
হেসে খাই লুঠোলুঠি,
মরণের কোলে যদি মাথা [illegible]

আমি জীবনের হিন্দোল-রাগ
নিভৃত হৃদয়ে পুষি,
আমি অবহেলে বসি তন্মনে
মরণের কাঠি চুষি !
আমি পরগাছা নহি সামান্য
আমার পরশ লাগি',
'নীল'-'আমাজন'—পারাবার মাঝে
মহাভয় ওঠে জাগি !
আমি অকরুণ করি তাই খুন
বাগানের গাছপালা,
আমি প্রলয়ের অতি পরমাণু
আমি মালিনীর জ্বালা !
গোলাপ গরবী ঢালে গো সুরভি
বকুল ঢালে গো বাস
আমি চারিধারে ঢালি ভারে ভারে
ধ্বংসের উল্লাস !
আমি পরগাছা আপনার বলে
অর্দ্ধ বাগান ঢাকি,
হাজার আঘাতে যাই নাক মরে
সতত বাঁচিয়া থাকি !

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

নিমেষ

ফেল্‌তে নিমেষ সময় যে-টুক,
তা'র হাতে সব দুঃখ ও সুখ !
যে-কাজ করি, যা-সব বলি,—
নিমেষ ফোটায় চিন্তা-কলি !
নিমেষ যদি বজায় থাকে,

দীর্ঘ-জীবন-মাল্যগাছি,—
যত্নে নিমেষ-পুষ্প বাছি' ?
এই যে চলা,—এক নিমেষে
টান্‌ছে মন্দ-ভালোর দেশে !
এই যে আমি ফসল বুনি,—
কান্না-হাসির গান সে শুনি !
এক পলকে সুপথ বেয়ে'
হয় ত গেছি জিনিষ পেয়ে ;
নয় ত অলস-স্বপ্ন দেখি'
বাছ্‌তে আসল তুলনু মেকি !
গেল-কাল ত চলেই গেছে ;
আস্‌চে-যে-কাল আস্‌বে সে যে !
দুঃখ ও সুখ, সাঁচ্চা-ঝুটা—
এই-নিমেষেই ভর্‌চে মুঠা !
এই যে নিমেষ,—পলকপাতে
একটি আসল-মুক্তা হাতে !
কাজের মাঝেই এম্নি মোতি
জ্বায় জীবনে দিব্য-জ্যোতি

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ।

আমাদের ঘর

ফুল যেখানে নিত্য ফোটে
বালকগুলা লাফায় ছোটে,
মুক্তা ধারার ঝরণা ঝরে
সেথায় নিরন্তর,
হরিণী তার শিশুর সাথে
মুখ দেখে দিন সে আয়নাতে,
গলে পড়ে তরল রজত

আয় প্রিয়ে আয় সেই দেশেতে রচবো মোদেরঘর।

দিন দুকুরে গভীর রাতি

দূর অরোয়ার জ্বলবে বাতি

শিউলি ফুলের মতন সাদা

দুধ সাগরের চর,

আসবে মোদের ডাকটী শুনে

বন্যাহরিণ পেনগুইনে

দিন রাতেরি জ্যোৎস্নাতে

জুড়াবে অন্তর।

আয় প্রিয়ে আয় সেই দেশেতে রচবো মোদের ঘর।

রুক্ষ মরুর বক্ষ মাঝে

রাজপুতদের রাজ্য রাজে

সেথায় আছে বীরের বাড়ী

বিরাট চিতোর গড়,

পদ্মিনীরি পায়ের ধ্বনি

সেথায় বসে শুনবি ধনি,

জহরতের ভস্ম দিবি

মস্তক উপর।

আয় সখি আয় সেই দেশেতে রচবো মোদের ঘর।

যেথায় সুনীল সরিৎ কাছে

নুলিয়াদের কুটীর আছে

শুভ্রফেনের যুথীর মালা

দেয় বারিধি কর।

সূর্য্য ওঠা, সূর্য্য ডোবা

দেখবো ধরার শ্রেষ্ঠ শোভা,

জগন্নাথের অতিথ হবার

নিত্য অবসর।

আয় প্রিয়ে আয় সেই দেশেতে রচবো মোদের ঘর

বংশাবটের কাছেই প্রিয়ে

থাকবো ছোট কুটীর নিয়ে

দেখবো আহা ধীর সমীরের

আহার দেবেন রেবতীনাথ
কাজ কি আলাপ নৃপতি সাথ,
মাধুকরীর রাজ্য সেটা
সুধার নাহি দর,
আয় প্রিয়ে আয় সেই দেশেতে রচবো মোদের ঘর
কিম্বা গোদাবরীর তীরে
থাকবো মোরা ক্ষুদ্র নীড়ে
বাসন্তীরি ফুলের ডালি
আনবে বনচর ;
নির্ব্বাসন এ নয়ত সখি
নানান রকম ভাবছ নাকি ?
পুষ্পরথে ঘুরবো দোঁহে
হাওয়ায় করে ভর।
আয় প্রিয়ে আয় সেই দেশেতে রচবো মোদের ঘর
হায়রে আমি বৃথায় বকি
নড়বেনাক কোথাও সখি,
গৃহই তাহার চৌদ্দ ভুবন
বিশ্ব চরাচর,
নারায়ণকে যা চেয়েছে
একঠাঁইএতে সব পেয়েছে
দূরে যাবার নামে প্রিয়ার
গাত্রে আসে জ্বর,
কয়নে লো, এই ঠিকানাই রইলো অতঃপর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

হিংসিতের অহিংসা

আজ প্রায় তিন বৎসর হল "বাংলার কথায়" দুঃখ করেছিলুম আজকালকার এত বড় একটা হলচলে গান নেই, কবি নেই—কে প্রাণ দেবে? জ্ঞানে মানুষের কান খাড়া করে, কর্ম্মে মানুষকে কাজে জোতে, কিন্তু গানে মানুষের প্রাণটাকে জারি রাখে। কর্ম্মের সঙ্গে প্রাণের, বুদ্ধির সঙ্গে রসের যোগ না হলে ভাব স্থায়ী হয় না, শিকড় গাড়ে না।

গানহারা শুক্‌নো দেশ ছেড়ে চলে আসার মাস ছয় পরে খবর পেলুম কবি জেগেছেন—দেশের নতুন হলচলের খবর নিয়েছেন। কিন্তু সেটা নাকি উল্টা বুঝা রাম হয়েছে। দলের লোকে বলেছে কবি কষে চাব্‌কিয়েছেন। কাকে? সবাই চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করে শোনায়—"দলের নেতাকে, আর নতুন চল্‌টাকে।"

বাস্ এই পর্য্যন্তই শুনেছিলুম। তারপরে তিনবৎসরের পর হঠাৎ একখানি নাটক হাতে পড়ল। সেটি হাতে পড়ার ইতিহাসও শোনাই। "বঙ্গবাণী"তে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষার' সমালোচনাসূত্রে আমি স্বীকার করেছিলুম আজকালকার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎ চাটুয্যে মহাশয়ের আমার সময়কার ভারতীতে বেরোন ছাড়া আর একখানি উপন্যাসও পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। এ উক্তিটা তাঁর গুটিকতক ভক্তের সুখশ্রাব্য হয়নি। শরৎবাবুর সঙ্গে অপরিচয়ে নিজের অকিঞ্চিৎকরতার পরিচয় দিলুম : এই ভেবে আমায় উপেক্ষা না করে তাঁরা আমার উপর অহঙ্কারের অভিযোগ আনলেন। কিন্তু সে অভিযোগ যে অমূলক তা টের পেলেন যেদিন প্রশ্ন করলেন—"আপনি রবিবাবুর ইদানীংকার নাটকগুলি পড়েছেন?"

"নাম করুন।"

"ডাকঘর, রাজা?"

"পড়েছি; একবার কলকাতায় গিয়ে দেখি আমার নামে মায়ের ঘরে পড়ে রয়েছে।"

"অচলায়তন?"

"পড়িনি, নাম শুনেছি, পাইনি।"

"ফাল্গুনী?"

"পড়িনি, গান শুনেছি, পাইনি।"

"মুক্তধারা?"

"পড়িনি, নামও শুনিনি।"

ধরা পড়লুম। সাধে বলে এই মানুষ বনে গেলে বনমানুষ হয়! আরণ্যক হওয়া সহজ, সম্পাদক হওয়া সহজ নয়। খুঁজে পেতে জানালোকদের কাছ থেকে বই তিনখানি আনিয়ে

হুহুশ্বাসে পড়ে ফেললুম। আবার পড়লুম, আবার পড়লুম, আবার পড়লুম। মুক্তধারার ঝরণার জল অঞ্জলি ভরে ভরে পান করলুম। এখনও করছি, প্রতিদিনই করছি, প্রতি প্রভাতে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নে আমার হৃৎকমলবাসীর চরণামৃত হয়ে ওঠে সে জল। মুক্তধারায় আমিত পেলুমনা কোন উন্মত্ত দলের দ্বেষ, কোন মহান্ আত্মার অসূয়া, আমি পেলুম গান।

পাদটীকায় কবি জানাচ্ছেন—"এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রায়শ্চিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্ব্বে লিখিত।"

কবির পনেরো বছরেরও পূর্ব্বের কল্পিত চরিত্র ও তার কথোপকথনের জন্য কবিকে ধন্যবাদ। তারা যে পনেরো বছরের পরবর্ত্তী প্রকৃত চরিত্র ও তাঁর কথার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে তাতে মনটা খুসীতে ভরে উঠ্ছে। সময়ের দানের পূর্ব্বেই নিজের ভিতর থেকেই কবি যা পেয়েছেন সময়ের হাতে আজ সাধারণ্যে তাই পেলে। আজ সময়ের দান ও কবির দানে মিলিয়ে নেওয়া যাক।

সময় কি শেখাচ্ছে? হিংসিতের অহিংসা। এটা ধর্ম্মোপদেশে অনেককাল থেকেই আছে, রাজনীতিতে এই প্রথম ঢুকেছে। রাজনীতি হল মানুষের আটপৌরে জিনিষ, সর্ব্বদা ব্যবহারে লাগে। ধর্ম্মোপদেশ পাঠের জিনিষ, নিত্যব্যবহারের নয়; সেটি পাঠান্তে পাট করে রেশম মুড়ে কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে দেবার জিনিষ, দিনক্ষণবিশেষে ফের বের করে কচিৎ কখন কাজে লাগানর জন্য। কিন্তু অব্যবহারে ভালো জিনিষে সেঁতো ধরে, পোকা লাগে, মরচে পড়ে যায়, তাই ব্যবহার করে দৈনন্দিন ভোগে লাগানই বিজ্ঞতার কাজ। একজন প্রজ্ঞাবানের মুখ দিয়ে বর্ত্তমান সময় এই কথাটা প্রচার করলে। পারত্রিক অস্ত্রগুলি ঐহিকের কাজেও ফলদায়ী, যত ব্যবহার করবে তত ধারাল হবে, অক্ষয় হবে; পরীক্ষা করে দেখো! প্রজ্ঞাত বল্লে এই কথা। কিন্তু বুদ্ধি কি তাতে সায় দায়? দণ্ডনীতি আর ধর্ম্মনীতি কি একই জিনিষ? অহিংসা কি সব সময়েই প্রযুজ্য? সব সময়ে সকলেরই ধর্ম্ম? তবে গীতায় কেন শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন —"স্বধর্ম্মমাপিচাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। যুদ্ধ্যস্ব বিগতজ্বর।"

আমার ক্ষুদ্র মতে এ গুলা এক একটা ধাপের কথা মাত্র। বিশ বৎসর আগেও এই কথা বলেছি, আজও বলছি আমাদের হতে হবে অভয় মন্ত্রের উপাসক। যেখানে ভয় আছে, সেখানে ভয় দূর করাই আমাদের হবে ধর্ম্ম, প্রকাশ্য হিংসার দ্বারাই হোক্, অহিংসার দ্বারাই হোক্। অক্ষমের আবার ক্ষমা কিসের? যে অহিংসার আড়ালে ভয়ের শরণ নেয় সে মিথ্যাচারী। কিন্তু যে গুপ্তহিংসা করে-সেও ভীরু। প্রথমে নিজের ভিতরটা ভাল করে যাচিয়ে দেখার দরকার, ভয় লুকিয়ে আছে কিনা, আলস্য লুকিয়ে আছে কিনা, লোভ লুকিয়ে আছে কিনা। যদি থাকে তবে অহিংসার অধিকারী নই। তামসিক থেকে ডবল প্রোমশনে সাত্ত্বিক

উঠেছিলেন। নিষ্কর্ম্মা হওয়ার চেয়ে "কর্ম্মণাং অশম স্পৃহা" ভাল, নন্‌কোঅপারেশনের চরকী নাচনে দেশকে নাচান ভাল। ধাতটা একটু চুলবুলে হলে, ভয়টাও ধাতের থেকে বেরোবার জন্যে উসখুস করবে। তখন "বিলাতী ঘুষী বনাম দেশী কিল"টাতে প্রথম প্রথম হাত কস্ত হবে।* তার পরের ধাপে যখন চড়বে তখনই হিংসিতের অহিংসা যে কি তার রসটুকু বোধগম্য হবে। ঐ যেমন সেই বাউলের গানে কবি শেখালেন

"আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয় ভাঙা এই নায়ে।"

ওরে ভীতু মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মার্‌তে নয় পালাতে থাকিস্‌ দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখামেলে না।"

ঠিক কথা—"যে মনে মনে মারতে চায় সেই ভয় করে, যে মারতে চায় না সে ভয় করে না।" "যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।" তাই নির্ভয় হবার জন্যেই অহিংস হতে হবে। নির্ভয়তা লক্ষ্য, অহিংসা উপলক্ষ্য। যখন প্রজাদের সর্দ্দার বললে "ঠাকুর একবার হুকুম কর ঐ বণ্ডামার্কে চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই"—

ঠাকুর উত্তর দিলেন—"মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস্‌ নে? জোর বেশী লাগে বুঝি?"

জোর বেশী লাগে বটে; তার জন্যে সেকালের গাধি-সুতজয়ী বশিষ্ঠের তপস্যা চাই বা একালের গাঁধিকুল-প্রদীপের পৌরুষ চাই। সময়ের শিঙ্গায় গুরুমুখী বাণী নূতন করে শুনে যে ভয়জেতা আকালীশিখেরা যথা বেঁধে দলে দলে মার খাচ্ছে কিন্তু মার ফিরে দিচ্ছে না, তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ছেলে বুড়োরা, বিজ্ঞ প্রাজ্ঞেরা, সবাই বল দেখি ভাই সেই বাউলের সুরে

আরো, আরো, প্রভু আরো, আরো,
এম্‌নি করেই মারো মারো!

পাঞ্জাব আর গুজরাট আমাদের ছাড়িয়ে চল্‌ল শুধু গুরু মেনে, আর আমরা এত বড় জগৎ-মাতান কবিগুরুর গান শুনেও পিছিয়ে পড়ে রইলুম? গান পেয়েছ ভাই, রস পেয়েছ, আর ভাবনা কিসের? কবির সুরে সুর ধর

"ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে!

---

* ১৩০৭ সালের ভারতী দ্রষ্টব্য।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।
মোদের প্রাণ দিয়েচ আপন হাতে
মান দিয়েচ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধূলোতে ঢেকে ঢেকে!”

শ্রীমতী সরলা দেবী।

এবার তোরা সত্য বল্

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি ক’রে সত্য বল্!
ঢের দেখালি ঢাকঢাক্ আর গুড়গুড়, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল্!
পেটে এক আর মুখে আরেক এই যে তোদের ভণ্ডামী—
এতেই তোরা লোক হাসালি বিশ্বে হলি কম্‌দামী!
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হলি আপনি ফাঁকির আফ্‌সোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁইতারা তাই নাই তলোয়ার খাপ কোষে।
তাই হসি সব সেরেক্ আজ
কাপুরুষ আর ফেরেব বাজ
সত্য কথা বলতে ডয়াস্,
তোরা আবার করবি কাজ!
ফোঁপরা ঢেঁকির নেইক লাজ।
ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস্ সব রাম-ছাগল!
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল!—
এবার তোরা সত্য বল্॥

বুকের ভিতর 'ছ-পাই নপাই' মুখে বলিস্ 'স্বরাজ চাই,'
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই।
"ভারত হবে ভারতবাসীর" এই কথাটাও বল্‌তে ভয়
সেই বুড়োদের বলিস্ নেতা—তাঁদের কথায় চল্‌তে হয়!
বল্‌রে তোরা বল্ নবীন—
চাইনে এসব জ্ঞান প্রবীণ,
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব কর্‌ছে এরা দিন্‌কেদিন,
চায়না এরা হই স্বাধীন!
কর্ত্তা হবার সখ সবারই স্বরাজ ফরাজ ছল কেবল।
ফাঁকা প্রেমের ফুস্‌মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল!
এবার তোরা সত্য বল্॥

ধর্ম্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব!
"ব্যাঘ্রসাহেব হিংসে ছাড়, পড়বে এস বেদান্ত"
কয় যদি ছাগ—লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত।
থাকৃতে বাঘের দন্ত নখ
বিফল তোর ঐ প্রেম-সবক।
চোখের জলে ডুবলে গর্ব্ব বাঘও হবে বেদপাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্ম্ম-গুরু ধর্ম্ম শোনান পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল
হয়না নেশা? লে পিয়ে দেশ নিজের করার আলকোহল
এবার তোরা সত্য বল॥

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথাই বিদ্রোহ।
ধামা ধরা! জামা ধরা! সব চিনেছি, চুপ রহো।
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ,
এই তুলালুম স্বরাজ নিশান, গাড়ব কিম্বা মরব শেষ!
নরম গরম প'চে গেছে, আমরা নবীন 'চরম' দল।
ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিম্বা পাতাল তল॥
এবার তোরা সত্য বল্।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

প্রাণ-পদার্থ

বৈজ্ঞানিক জগতের একটি নূতনতম অধ্যবসায়ের ফল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগের সম্মুখে ধরিতেছি। প্রাণ জিনিষটা কি? অর্থাৎ ইহার কোন আকৃতি আছে কিনা? যদি থাকে ত তাহা দেখিতে কিরূপ? কি কি উপাদানে উহা গঠিত? ইচ্ছা করিলে মানুষ ঐরূপ প্রাণপদার্থের সৃষ্টি করিতে এবং উহার সংযোগে মানুষেরই হাতে গড়া জীব জন্তুর আকৃতিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে কি না? এই সকল বিষয়ে বহুকাল হইতে মানুষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে কিন্তু অগ্নি কটাহের অভাবে Engine চালান যেমন অসম্ভব হয়,—মানুষের চেষ্টায় প্রাণের সৃষ্টি করাও তেমনি বার বার ব্যর্থ হইয়া আসিতেছে।

জীবন্ত মানুষের শরীরের ভিতরে যে অনবরত একটা রাসায়নিক পরিস্রবন ক্রিয়া, অথবা অন্য কোন অদ্ভুত কার্য্যধারা চলিয়াছে তাহারই সহায়তায় জৈব-কোষগুলি শরীরের অভ্যন্তর ভাগে থাকিয়া অনবরত সৃষ্টির কার্য্য করিতেছে, আর এমন সব সাধারণ প্রমাণ যোগাইতেছে যাহা দেখিয়া আমরা জীবন জিনিষটার পরিচয় পাইতেছি। অথচ জীবনের রহস্য আদিমানবের নিকটও যেমন রহস্যময় ছিল, আজ একবিংশ শতাব্দির নবালোক প্রাপ্ত আমাদের নিকটেও তেমনি রহস্যাবৃতই রহিয়াছে।

ভগবানের অপূর্ব্বদান এই বিজ্ঞান শাস্ত্র যদিও বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আজিও শৈশব অবস্থায় রহিয়াছে, তথাপি সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মপ্রকাশশীল বিজ্ঞান নিত্য নব নব তথ্যের আবিষ্কারে মানবের কর্ম্ম ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

Vitamine পদার্থ বৈজ্ঞানিক জীবনের নবীনতম আবিষ্কার। ইহা এত নূতন যে দু এক সংস্করণ পূর্ব্বের অভিধানে ইহার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ নূতন ঔষধপত্রের খবর যাঁরা কতকটা নিয়মিত রূপে রাখেন তাঁহাদের সকলেরই এ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে, যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যকে উন্নত করে এবং তাঁহাকে জীবনীশক্তি দান করে—ইহা Vitamine এরই কার্য্য।

অবশ্য একথা ঠিক হইতে পারে যে বৈজ্ঞানিক নিজেও এ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এত কালের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে তাঁর যে এই যুদ্ধ এবং তাঁর এই যে প্রথম পরিচয়লাভ ও নামকরণ করা, ইহাতেই তাঁহার কার্য্যকে সফল করিয়া তুলিয়াছে। ইহার সাহায্যেই একটা আবিষ্কারের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। Vitamine সম্বন্ধে বর্ত্তমানে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে ইহা জীবনীশক্তির একটা প্রতিভূ-

টাট্‌কা ফলে বা মাংসে এমন সব Vitamines আছে যাহাকে রক্তদোষজনিত পীড়া সমূহের প্রতিষেধক স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

এই Vitaminesএর সমসাময়িক এবং প্রায় একই রূপের আর এক অভিনব আবিষ্কার হইতেছে "Bios"। Vitamine শব্দ ল্যাটিন আর Bios শব্দ গ্রীক্‌। উভয়েই সাধারণের নিকট প্রায় অপরিচিত। এবং উভয়েরই বাংলায় কি ইংরাজীতে জীবন বা Life শব্দে ভিন্ন আর কোন উপায়ে পরিচয় প্রদান করা একরূপ অসম্ভব। এই Bios এর আবিষ্কার করেন Louvin বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Wilders সাহেব। পূর্ব্বে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে Bios এবং Vitamine একই পদার্থ। কিন্তু পরে জানিতে পারা গিয়াছে যে Bios, Vitamine হইতে কিছু পৃথক, এবং কতক পরিমাণে উচ্চস্তরের জিনিষ। Bios শুধু একটা কর্ম্মশক্তি নয়। ইহা একটা বাস্তব পদার্থও বটে। যে কেহ ইহা চোখে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারে; কিন্তু সমগ্র বিশ্বে ইহা পরিমাণে এত অল্প এবং এমন বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে যে ইহা Radium অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্য।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে এই Bios হইতে প্রাণী জগতের জীবনের রহস্য জানা যায় কি? প্রাণীমাত্রের শরীরে জৈবকোষ সমূহের কর্ম্মধারা কি Bios হইতেই বোঝা সম্ভব? Bios এবং Vitamine সমভাবেই রহস্যাবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহা এইমাত্র যে—কয়েকটী ফল এবং শস্যাদির ভিতরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থায় ইহার অস্তিত্বের খোঁজ মিলিয়াছিল। অধ্যাপক Wilders, যিনি ইহার আবিষ্কারক তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ইহা কেবল একটী মাত্র পদার্থ, কিন্তু পরবর্ত্তী বিশ্লেষণে জানা গিয়াছে যে ইহা একটী নয় দুইটী পদার্থের সমন্বয়, কিন্তু ইহা এত দুষ্প্রাপ্য যে ইহার আর বিশ্লেষণ একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হইয়াছিল। Toronto বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধানতম অধ্যাপক W. Lashmiller ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই মাসের শেষ ভাগেই তিনি তাঁহার তিন বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এক চামচ মিশ্রিত Bios হইতে প্রকৃত Biosকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া দেখাইতে পারিবেন। এই বিশ্লেষণের পন্থাও নাকি তিনি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। Bios যদি এই ভাবে তার রাসায়নিক গঠনকে মানুষের নিকট দেখাইয়া দিতে বাধ্য হয়, তবে আর জীবন রহস্যের জ্ঞাতব্য কতটুকু বাকি থাকিবে?

রাসায়নিক আবিষ্কারকের কার্য্যই হইল ভাঙ্গাগড়া—যেমন একজন ঘড়ি মেরামতকারী ঘড়ীর সমস্ত কল কব্জাগুলি খুলিয়া আবার যথাযথভাবে সমস্তগুলিকেই সংযুক্ত এবং কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলে,—তেমনি, রসায়নজ্ঞকেও প্রতি পদার্থের উপাদানগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া পুনরায় গড়িয়া তুলিতে হয়। এবং এই নূতন গঠন যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিকরূপে কার্য্যক্ষম হয় তবেই তাহার পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করে। এইরূপেই রেশম, কর্পূর প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বে কেবলমাত্র প্রকৃতির সৃষ্টি শক্তির উপরে নির্ভর করিত যে

সমস্ত এখন রাসায়নজ্ঞের হাতে সৃষ্ট হইতেছে—অসম্ভবকেও সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান করিতেছে।

এইভাবে অধ্যাপক মিলার যদি Bios এর জীবন প্রণালী আবিষ্কারে সমর্থ হন এবং সেই Bios যদি প্রাণপদার্থ হয় তবে আর প্রাণী গড়িয়া তুলিতে কতটুকু বাকী থাকিবে? এ সম্বন্ধে বহুব্যক্তি নানা প্রশ্নে তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন দেখিয়া তিনি এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"এ বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান দুইএকপদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। বিশ্লেষনের জন্য এবার আমরা এই পদার্থ বহুল পরিমাণে সংগ্রহণে সমর্থ হইয়াছি, এবং শীঘ্রই ইহা কি প্রকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহা জানিতে পারিব। আমাদের অনুসন্ধান হইতে ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে ইহা সংগ্রহ করিতে ব্যয় অধিক হইবে না।"

সত্তর বৎসর পূর্ব্বে প্রবীন রসায়নজ্ঞ Liebig ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন যে,—"রসায়ন শাস্ত্র হইতে অদূর ভবিষ্যতে শরীর বিজ্ঞানের এবং জীবনীশক্তির অনুসন্ধান অভাবনীয়রূপে উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে। ইহা আমরা আশা করিতে পারি।"

আজ এই একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্যানাডানিবাসী অক্লান্ত কর্ম্মী অধ্যাপক মিলার যদি এই ভবিষ্যৎবাণী সফল করিয়া তুলিতে সমর্থ হন,—তবে আমরা এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্য জগত শুধু মানবজাতির মহদোপকারই সাধন করিবে না,—শীঘ্রই ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ে স্বরাজ লাভে সমর্থ হইবে। মানুষ সেদিন প্রকৃতই অমৃতের সন্তানও অমর হইবে।

শ্রীঅমূল্য রায়চৌধুরী।

রবি-রশ্মি

১

[চীন-অভিভাষণের পূর্ব্বাভাষ]

(রেঙ্গুন-প্রবাসী চীনেদের প্রতি)

আজ সায়াহ্নে আপনাদের এই অভিনন্দন আমার মন প্রাণকে এমন গভীরভাবে অভিভূত করেছে যে, আমার মনে হচ্ছে যেন এরি মধ্যে রেঙ্গুনে বসে আমি চীন দেশীয় মানুষের স্বাভাবিক এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সহৃদয়তার স্পর্শ অনুভব কচ্ছি। আমি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিভিন্ন অংশেই বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হয়ে গিয়েছি এবং এথেকেই পৃথিবীর

পশ্চিমাংশ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছি। ঐসব দেশের অধিবাসীরা আমাকে শুধু বক্তারূপেই গ্রহণ করেছেন এবং আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিয়েছেন। কিন্তু সে-সব স্মৃতি আজ ভুলিয়ে দিচ্ছে আপনাদের এই মানুষোচিত অকৃত্রিম আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার,—যা দেখে আমার কেবলি মনে হচ্ছে যে, আপনারা আমাকে শুধু বাগ্মীরূপেই গ্রহণ করেননি ; আমাকে আপনাদের একজন বন্ধুরূপেও গ্রহণ করেছেন বটে।

আপনারা যখন কোনও আজানা দেশে যাবেন তখন আপনাদের বক্তব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ছাড়াও, আপনাদের মতে সেই দেশের মানুষের এবং আপনাদের ভিতরে কতটা আধ্যাত্মিক সংযোগ আছে সর্ব্বাগ্রে তারই খোঁজ নিতে যে তাঁরা কত ব্যস্ত এটা আপনারা বুঝতে পারবেন। এই ব্যাপারে আপনারা অবশ্য বিশেষ কোন আনন্দলাভ করবেন না। কিন্তু সেই অপরিচিত দেশে এই ব্যক্তিত্বের অনুভবটা আপনাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান বলেই মনে হয়।

আজকের সন্ধ্যায় আপনাদের এই আতিথ্যে আমার যে একটা দাবী আছে এটা আপনারাও স্বীকার করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আর সেই জন্যেই আমার মনে হচ্ছে যে আজ শুধু আমার ভাগ্যে হোটেল বাসই ঘটবে না,—আপনাদের সঙ্গে থেকে বাড়ীর মত সুখ সুবিধা লাভ করব। এই আতিথেয়তা যা আমাদের সব চাইতে বড় সম্পদ, তাতে যে সকল মানুষেরই—এমন কি অপরিচিত অতিথিরও মানুষ হিসাবে এবং তার জন্মগত অধিকার বলে ভোগের অংশ এবং দাবী করবার অধিকার আছে এ স্বীকার করবার শক্তিকেই আমি পরম গৌরবের এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভের বস্তু বলে মনে করি। আর এ লাভ করবার জন্যে তাকে কারো নিকট থেকে পরিচয়-পত্র বা ছাড়-পত্র সংগ্রহের আবশ্যক হয় না—তা রাজনৈতিকই হউক আর সামাজিকই হউক—কারণ মানুষ ভগবানের দেওয়া ছাড়পত্র নিয়েই এ পৃথিবীতে এসেছে। (হর্ষোচ্ছ্বাস)।

যে দেশের গৃহদ্বার সব রকমের মানুষের জন্যই সব সময়ে উন্মুক্ত,—সেই দেশের অধিবাসী আমি মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহারে অভ্যস্ত, আমি ওসব দেশে যেতে হলেই একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করি ;—যে সব দেশে পৌঁছিলেই স্থানীয় লোকেরা আমাকে অভ্যর্থনা করবার আগে আমার প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকায়, আমার নাম যশ এবং ধর্ম্ম বিকাশ সম্বন্ধে খোঁজ নেয় এবং তাদের সুসভ্য পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা এমনি ধারা কত সব প্রশ্ন করতে থাকে। এমনি দেশে যাবার কথা হলেই বাস্তবিকই আমি নিজের ভেতর একটা মস্তবড় দুর্ব্বলতা অনুভব করি।

কিন্তু আজ আপনাদের দেশে যাত্রা করে আমার মনে তেমন কোন সংশয়ের উদয় হচ্ছে না। এবং আমি আশা কচ্ছি যে, আপনাদের সঙ্গে যদি কোন বিষয়ে আমার মতের অমিল হয়, তবে আপনারা সেই বিরুদ্ধ মতের অমর্য্যাদা করবেন না। আর আমি এও আশা করছি যে, এই মতানৈক্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যস্ত না হয়ে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে একটা গভীর ঐক্য

বন্ধুগণ! আমরা যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছি এ একটা মহৎ যুগ এবং আমার মনে হয় যে এটা ভারতবাসীর পক্ষে একটা বিশেষ মস্তবড় যুগ। আপনারা একথা অবশ্যই জানেন যে প্রাচীন কালে সমস্ত বৃহত্তর দেশের ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সঙ্গেই পরস্পরের একটা সম্পর্ক ছিল। তখন একটা মস্তবড় মানসিক জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। চীন দেশেও তখন এমনি ব্যাপার ঘটেছিল যখন এই ভারতবর্ষের চিন্তা থেকেই উদ্ভূত জীবনদর্শন (Life Philosophy) বা ভারতের চিন্তাপ্রসূত শ্রেষ্ঠসম্পদ্ তাই নিয়ে ভারতের অগ্রদূতগণ চীনদেশে গিয়ে চীনের জীবন-প্রণালীর সংস্পর্শে আসেন,—তখন কি মানসিক জগৎ কি কলা বিদ্যার জগৎ, কি সাহিত্যের জগৎ, কি বিজ্ঞানের জগৎ সর্ব্বত্রই একটা অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। ভারতের এবং চীনের পক্ষে সে একটা মস্তবড় স্মরণীয় যুগ এসেছিল।

ইউরোপেও ঠিক এমনি ব্যাপারই ঘটেছিল। ইউরোপীর ইতিহাসে একটা মহৎ ঘটনা ঘটেছিল, যখন ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে ইউরোপের মনের সঙ্গে প্রাচ্যের মনের মিলন ঘটেছিল। সে কথা ইউরোপ সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে না পারলেও গ্রহণ করেছিল এবং তাতেই ইউরোপের প্রাণকে জাগিয়ে তুলেছিল। প্রাচ্যের মনোভাবের সঙ্গে এই যে সম্পর্ক এর সঙ্গে যদিও মানসিক জাতির সঙ্গে বিশেষ কোনও সামঞ্জস্য নেই বটে;—কিন্তু কার্য্যতঃ তার যে বড় আবশ্যকতা আছে এও মনে হয় না। কেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিনিষটার এমন একটা শক্তি আছে, যাতে মানুষের অন্তরে শুধু ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এবং মানুষের জীবনের ইতিহাসে যখনই দুটো বিরুদ্ধ ধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তখনই এমন ব্যাপার ঘটতে দেখা গিয়েছে। সমগ্র এসিয়াতেও একদিন এমন ব্যাপার ঘটেছিল।

পাশ্চাত্যেরা আমাদের রুদ্ধদ্বার ভেঙে ফেলেছে এবং বলপূর্ব্বক আমাদের জীবনের গভীর কেন্দ্রস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমরা ওদের ভীতির চক্ষে না দেখে বরং সাদরেই গ্রহণ করবো। উহা আমাদের যুগযুগান্তরের প্রগাঢ় সুপ্তিতে নিমগ্ন ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলবে, আমাদের নিজস্ব সত্যের উপলব্ধিকে চিনিয়ে দেবে। যদিও এই সংস্পর্শ আমাদের নিকট অতীব কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হয়, তবুও, আমাদের এর সম্মুখীন হতেই হবে। এর ফলে যখন আমাদের তন্দ্রা টুটে যাবে, এবং আমরা সম্পূর্ণরূপে জেগে উঠব, তখন আমরা বুঝতে পারব যে এই পূর্ণ চেতনাই আমাদের এক মহামূল্য লাভের বস্তু। এই জিনিষটাকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে করি।

অনেকে মনে করেন যে আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণেই যেন সমুৎসুক। অবশ্য প্রারম্ভের সময় এমন হতেও পারে। কিন্তু এই অনুকরণটা নিতান্তই বাহ্যিক, আমরা তাঁদের আচার ব্যবহার, তাঁদের মতবাদ, তাঁদের বৈজ্ঞানিক মতামত সমস্তই গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু সে সমস্তই জীবনের বুকে ভেসে থাকবে। আমরা যেমনি ভগবদ্দত্ত আমাদের

পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারি না কারণ উহা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। যদিও আমরা আমাদের পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করতে পারি, কিন্তু আমাদের মনোবৃত্তি, আমাদের ব্যক্তিত্বের এবং আমাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাতে একবারেই অক্ষম। যদি তেমন কতকটা হতেই দেখা যায়, তবে উহা যে একান্তই বাহ্যিক তাহাতে সন্দেহ নেই। এবং এই ভাবে যদি আমাদের আচার-ব্যবহারে, রীতি-নীতিতে কিছু পরিবর্ত্তনও দেখা যায় তবুও সেগুলিকে তত গুরুতর বলে মনে করবার কোনই কারণ নেই।

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, কতকগুলি সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা, কি ধ্বংস ও গঠনের কতকগুলি যন্ত্রপাতি, আমাদের নিকট পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ দান নহে। তাঁদের নূতন জীবনের স্বাদ এবং তাঁদের জীবন্ত সভ্যতার পরিচয়টাই প্রাচ্যে তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার। এই পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের মধ্যে একটা তেজোময় প্রাণ আছে। তাদের সেই জীবন্ত প্রভাবেই আমাদের ভিতরকার ঘুমন্ত শক্তিগুলি—যারা হয়ত চিরকালই নিদ্রিত থেকে যেত, সেগুলিকে সচেতন করে তুলেছে। যখন আমরা সেই জীবনীশক্তিকে গ্রহণ করি এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠি, তখনি ওরূপ কতকগুলি প্রচ্ছন্ন ও ক্ষয়িষ্ণু বস্তু আমাদের সভ্যতা থেকে খসে পড়তে পারে; এবং মনকে সজাগ করে তুলবার যে একটা জীবন্ত ধারা তাতেই সমস্ত সমাজকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে।

কখন কেউ মনে করবেন না যে জীবনের এই সব লক্ষণই নিতান্ত আধুনিক। জীবনটা আধুনিকও বটে পুরাতনও বটে। জীবন চিরদিনই নূতন এবং চিরদিনই পুরাতন। অনেকে মনে করেন যে, জীবনের এই লক্ষণগুলি পাশ্চাত্য। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। জীবনের সঙ্গে জীবনের সাদৃশ্য আছে বটে। যখনই আমরা জীবনের সম্পূর্ণতা লাভে সক্ষম হব, তখন অন্য যাঁরা এমনি সম্পূর্ণ জীবন লাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষিত হবে। আমরা যে নিশ্চিতই তাঁদের সাদৃশ্য লাভ করি তা তখনই বুঝতে পারি যখন আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে তার প্রমাণ পাই। আমাদের ইতিহাসের মধ্যযুগে যে সব কবির পরিচয় আছে আমি তাঁদের কবিতা পড়ে দেখেছি যে তা অতি আশ্চর্য্যরূপে আধুনিক ভাবে লিখিত। এর একমাত্র কারণ,—আমার বিশ্বাস,—জীবন চিরকালই আধুনিক এবং আমরাও এযুগে আধুনিক জীবন নিয়েই জন্মেছি। এর একটা বিশিষ্ট গুণ হল জীবনের প্রাচুর্য্য। বন্ধুগণ! জীবনকে কখনও ভয় করবেন না! জীবন অবশ্যই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে। আপনারাও জীবনের ভুলের ভিতর দিয়েই অগ্রসর হন। সমাধি-মন্দিরের প্রস্তরের আড়ালে থেকে ঐ সব ভুলের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে কখনই চেষ্টা করবেন না—এবং নবজাগ্রত চীন তার ভুলের মধ্য দিয়েই আপন স্বত্ব লাভ করতে সমর্থ হবে। (হর্ষোচ্ছ্বাস)।

যে-সব লোক জীবনে বিশ্বাস করে না তারা বিভীষিকাময় মৃত্যুর কোলেই পড়ে থাকবে। আপনারা—যাঁরা মানসিক জাগরণ এবং যৌবনরূপ অমূল্য সম্পদের অধিকারী আছেন তাঁরা

অসীম সাহসে নির্ভীক চিত্তে বিপদসঙ্কুল গন্তব্য পথে এগিয়ে চলুন, নিজ নিজ আদর্শকে লাভ করুন। যে কেন্দ্রীভূত আদর্শকে বেষ্টন করে আমরা কার্য্য করি তাকে লাভ করবার চেষ্টাই প্রকৃত পক্ষে বিপজ্জনক নয়। যখন আমরা কোনও ভ্রান্ত ধারণার বশে অথবা কোন কার্য্যের নিমিত্তই কার্য্য করতে সমর্থ হই যাতে কেবল অতলস্পর্শ অস্বীকার বা ধ্বংসের পথেই নিয়ে যায় তখন সেই অন্ধগতি যে সব ভুলের সৃষ্টি করে সেইটাই প্রকৃতপক্ষে ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বদেশীয় আমাদের সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে জীবন দর্শন (life philosophy) বিষয়ে একটা মৌলিক বিশ্বাস আছে। আমরা যদি সেই দর্শনকে আমাদের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গন্তব্য পথে বেরিয়ে পড়ি তবে আমরা অম্লান বদনে সকল বাধা বিঘ্ন এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করে অমরতা লাভ করতে পারি।

আপনাদের এই অভিনন্দনের জন্য আমি আজ গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আপনাদের দেশে আমি যে বাণী প্রচার করব আপনাদের সমক্ষে তার আংশিক আভাষ ও আজ দিয়েছি। এই মোহতন্দ্রা নির্জ্জীব মরণ অসার অভ্যাসের প্রস্তর প্রাচীর এবং যত সব প্রবাদ-বাক্য এ-সব কিছুতেই মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। মানুষকে রক্ষা করবে একমাত্র চরম সত্যের উপলব্ধি। এইরূপে যদি আমরা জীবন্ত আদর্শকে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্তলে এবং সমাজের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হই, যদি আমাদের কার্য্য তারি সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তবে আমাদের যাই কেন ঘটুকনা তাতে আমাদের ভীত হবার কোনই কারণ নাই। এই বার্ত্তাই আমি আপনাদের দেশে বহন করে নিয়ে যাব।

২

রেঙ্গুন সাহিত্য-সভায়

কবির কথা

আমার অনেক সময়েই একথা মনে হয় যে, লোকে আমাকে ভুল বোঝে। অনেকে মনে করে, আমি একজন ঋষি, অতিমানুষ, অথবা একজন সেনাপতি গোছের লোক হব। কিন্তু আমি যে শুধু একজন কবি, এ-কথাটা কেউ বোঝে না। অমি সেই কবি হিসাবেই আপনাদের নিকট শুধু ভালবাসার দাবী কত্তে পারি, কিন্তু সম্মান নয়। কারণ মৃত মহা-পুরুষেরাই মাত্র সম্মানের অধিকারী। জীবিতেরা কেবল ভালবাসাই চায়। আর কবি বলেই যদি আপনারা আমাকে বুঝে থাকেন, তাহলে আপনাদের উচিত ছিল, আমাকে এ-ভাবে সম্মান না করে একেবারে আপনাদের মাঝখানে টেনে বসান।

তার পরে তিনি বলেন যে,—সব বড় বড় দেশই এমন অনেক সৃষ্টি করে গেছে, যার

ওপর গোটা পৃথিবীর দাবী আছে, এবং এইটাই হল পৃথিবীর সব দেশের ভেতরে সত্যিকার সম্বন্ধ। আপনারা জানেন যে, ভারতের সকল দূতেরাই আত্মত্যাগের সকল দুঃখ এবং মৃত্যুকে অবধি বরণ করে সেই মুক্তির বাণী বহন করে ভারতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ভিন্নদেশবাসীদের কাছে একদিন ডেকে বলেছিল,—তোমরাও আমাদের আত্মীয়। আমাদের এমন সম্পদ আছে যা দিয়ে আমরা তোমাদের সঙ্গেও চিরন্তন আত্মীয়তা উপলব্ধি কত্তে পারি।

দেশের সুসন্তানদের কর্ত্তব্য সবার কাছে বলে দেওয়া যে, তাদের স্বদেশ একদিন এমন আলো জ্বালিয়েছিল—যাতে কত যুগের নরনারীর আত্মিক উন্নতির পন্থা আলোকিত করে দিয়েছে। এমন যে গ্রীস, তাকেও তার পার্থিব সম্পদ বা ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারেনি, তাকে অমর করে রেখেছে—তার সভ্যতার আলো। তেমনি যে-সব দেশের ঐহিক ঐশ্বর্য্য ভিন্ন গৌরব করবার মত আর কিছুই নেই, তারা মরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং এইজন্তেই আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমির সম্পদের কথা ভাবতেই পারি না।

এদেশে বহু শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রীয় বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে—আবার সবই মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ-দেশের বিশ্ব-প্রেমের বাণী ও চিন্তার ধারা এখনও বেঁচে আছে।

সুদূর চীনদেশ থেকে আমার নিমন্ত্রণ এসেছে। আমি সেই দেশেই যাচ্ছি। আপনারা কখনই এমন ভুল বুঝবেন না যে, আমি সেই দেশে কেবল "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রই প্রচার কত্তে যাচ্ছি। আমি সেই বিশ্বমাতার পূজা প্রচার করবো—যিনি সব জাতির সমস্ত মানুষের মাতা। আমি সেখানে প্রচার করব—"আত্মানম্ সর্ব্বভূতেষু, সর্ব্বভূতানি আত্মনি, য পশ্যতি স পশ্যতি" এই মহাসত্য।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ" এইহচ্ছে আমাদের নিমন্ত্রণ। এই নিমন্ত্রণের কথাই আমি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বহন করে নিয়ে চলেছি।

আমি জানি না, নিজের সত্তাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতরে বদ্ধ করে কে কবে মুক্তিলাভ করেছে? মুক্তির আলোর পরশ শুধু তখনি মানুষের চোখে লাগে, যখন সমস্ত বিশ্বে নিজের সত্তার অনুভব কত্তে পারে। এইটেই হল মহাভারতের বাণী। বিশ্বমানবের কাছে এই বাণী পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে কবির একমাত্র সাধনার বিষয়। কোথায় আজ বিক্রমাদিত্য? কোথায় তাঁর বিক্রম, বিষয় বৈভব? তাঁর স্মৃতিটুকুও বুঝি আজ যায়-যায়! কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কবিতায়, তাঁর বাণীতে ভারতের বাণী মুক্তি পেয়েছে। কালিদাসও তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের মাঝখানে উজ্জ্বল হয়ে—অমর হয়ে আছেন।

যশ খ্যাতি লাভ করেছি বলে আজ আমার এ আনন্দ নয়। এই নবযুগে আমার জন্মভূমি আর একবার আমার ভেতর দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করবে, তাঁর বাণী প্রচারিত হবে, এই জন্তেই আজ আমার এত আনন্দ।

আমাদের দ্বারে অতিথি। সে আজ দ্বারে দ্বারে আঘাত করে বলছে—'ভাই, আমাকেও তোদের সৌভাগ্যের অংশ দে।' তাই আমি আজ দেশের এবং দেশবাসীর নামে এই বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছি। এখানে শুধু আমার স্বদেশের সন্তানেরাই পড়্‌বে না;—এখানে আমাদের যত সাগরপারের বান্ধব তাঁদের সন্তানেরাও পড়বে। কেন না আজ ভারতের ভারতী তাঁর বিশ্ব-সন্তানদের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। আজ তিনি শুধু ভারতের নন, তিনি আজ সমস্ত বিশ্বেরই ভারতী। তাই আজ আমি বলছি যে, আপনারা এই বোঝা আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে ভাগ করে নিন। আর আমাকে এমন একটু নিরালা হতে দিন, যেখানে বসে আমি আমার সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে সত্যের সাধন কত্তে সমর্থ হব।

৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

সাহিত্য-সংলাপ

(ক)

আমি অনেক দিন থেকেই প্রতিশ্রুত আছি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দিরে আমি কিছু বল্‌ব কিন্তু তা পারিনি। আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন যে বাল্যকাল হতেই আমি স্কুল পালিয়ে বেড়িয়েছি, পারত্‌পক্ষে বিদ্যামন্দিরের সীমায় ধরা দিতে চাইনি। এখন আমার এই বয়সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনা হল—তখন দিনের পরদিন কেবলি পিছিয়ে দিয়েছি—ওটা শুদ্ধ ভীরুতাবশতঃ।

আজকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার্থে লিখে বলাই উচিত। কিন্তু লিখে লিখে এখন একটা ক্লান্তি আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। তাই, বহুমানভাজন আমাদের সভাপতি মহাশয়ের (সার আশুতোষ) সম্মতি নিয়ে আমি আজ কিছু মুখে বলব মনে করেছি। এমনি দুর্দৈবক্রমে বক্তৃতাসভায় আমার ডাক পড়লে আমার রসনাকে আমার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে দিতে হয়।

আজ আমার বলবার বিষয়টি হচ্ছে সাহিত্য। অল্প কিছুদিন হল একটি ছাত্র হঠাৎ একদিন আমার প্রভাত-ভ্রমণের সময় আমার সঙ্গ ধরলেন। তিনি বলেন—Is art too good for human nature's daily food? বুঝলেম এই প্রশ্নের মূলে প্রচলিত একটি তর্ক আছে। সেটি এই যে, যে-সব সাহিত্য বা শিল্পরচনার প্রয়াস প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার আনুকূল্য করে, তার সামাজিক বা অন্য কোনো প্রকার সমস্যা-পূরণের সহায়তা করে, সেই আর্ট শ্রেষ্ঠ কি না।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের সাহিত্যের মূলতত্ত্বে যেতে হবে। মানুষের [illegible] প্রধানত তিনভাবে ভাগ করতে পারি। যথা, সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্।

সাধকেরা মানুষকে এই তিনটি রূপ দিয়েছেন। মানুষের জীবনটা তন্নতন্ন করে খুঁজলে "আমি আছি—" "আমি জানি"—"আমি প্রকাশ করি অর্থাৎ রচনা করি এই তিনটি জিনিষ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এই তিনটি জিনিষই এক, তবে একের খাতিরে অনেক সময় আমাদিগকে এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন করে দেখতে হয়। শিল্পকলা ও সাহিত্য অনেক সময় দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অনুকূল হয় বটে, কিন্তু এর সবটাই যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রাকে লক্ষ্য করবে তা আমি বলতে পারি না। মানুষ বেঁচে থাকতে চায় বটে এবং বেঁচে থাকবার একটা সার্থকতাও আছে বটে, কিন্তু এই বেঁচে থাকাটা আমাদের একটা ছোট গণ্ডি বিশেষ। মানুষের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাই, যে এই ছোট গণ্ডিতে থেকেই মানুষ সন্তুষ্ট নয়। সর্ব্বদাই মানুষ এই ছোট গণ্ডি পেরিয়ে উদ্দাম প্রকৃতিতে এক উচ্চতরভাবে বিভোর হয়ে অনন্তের পানে ছুটে যেতে চায়।

এখন আমরা বুঝতে পারি মানুষ কি জন্য বেঁচে থাক্‌তে চায়। মানুষ বেঁচে থাকতে চায়—কেননা সে বেঁচে থাকার চেয়ে আরও বড় বড় কাজ করতে আশা করে। এক কথায় বলতে গেলে বল্‌তে হয় যে বেঁচে থাকার সত্যটা আর একটা বড় সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানরাজ্যেও ঠিক একই সত্য বর্ত্তমান। ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হ'লে মানুষ জ্ঞান-রাজ্য ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর রাজ্যে যেতে চেষ্টা করে—সেটা হচ্ছে অনন্তের রাজ্য। এই রাজ্যটি চির আনন্দের সেইখানেই মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে থাকে। প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্য্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন, সেখানে কোন প্রকাশ নাই। মানুষের যে সকল ভাব নিজের প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হ'য়ে না যায়, যার প্রাচুর্য্যকে আপনার মধ্যে আপনি রাখ্‌তে পারে না, যা স্বভাবতঃ দীপ্যমান, তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব। এই যে তাজমহল—তার কারণ সাজাহানের হৃদয়ে তার প্রেম, তার বিরহ বেদনার আনন্দ অনন্তকে স্পর্শ করেছিল; তিনি তাঁহার তাজমহলকে আপন থেকে মুক্ত করে দিয়ে গেলেন। গান থাম্‌ল, তখন তারি আনন্দে মাথা ঝাঁকা দিলেন। সম—মানে ত থামা তাতে আনন্দ কেন? তার কারণ হচ্ছে আনন্দরূপ থামাতে থামে না। বসন্তে ফুলের মুকুল রাশি রাশি ঝরে যায়, ভয় নেই, কেন না ক্ষয় নেই। বসন্তের ডালিতে অমৃত আছে। খৃষ্টের মৃত্যু-সংবাদে এই কথাটাই অমৃতের শিখার মত উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশ হল নাকি? এমনি ঐশ্বর্য্য লাভ করে আপনাকে প্রকাশ করতে মানুষ অনন্তের পানে নিয়তই চলেছে। সেই আনন্দময় অনন্তই সাহিত্যের মূলতত্ত্ব। তাঁকেই বলা হয়েছে—"অনন্তম আনন্দমমৃতং যদ্বিভাতি।"

(খ)

অলঙ্কারশাস্ত্রে সাহিত্যের যে সংজ্ঞাই থাকুক না কেন, সাহিত্য বল্‌তে প্রকৃত পক্ষে স্কুল-পাঠ্য বই থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সব বইকেই আমরা বুঝে থাকি। কিন্তু আমি কল্পনায় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তাকেই প্রকৃত সাহিত্য বল্‌তে চাই। কেননা কাল্পনিক সাহিত্য মানুষকে তার সামাজিক জীবনে কোন সাহায্য করে বলে মনে হয় না। নির্ম্মল

মানসিক আনন্দদানই হচ্ছে তার কাজ। কেউ কেউ বলে' থাকেন যে কাল্পনিক সাহিত্য এবং শিল্পকলা মানুষের আন্তরিক সুখস্মৃতিরই একটা অভিব্যক্তি মাত্র।

আমি বলি, সুখস্মৃতির কতকটা অধিকার মানুষের জীবনে আছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি সাহিত্য হিসেবেই হয়ে থাকে। সাহিত্য কেবল মানুষের বাস্তবতাকেই আঁকড়িয়ে ধরে থাকে না। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সব সময়েই বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে চলা। বাস্তবতার ভেতর দিয়ে সে এমন একটা জিনিষ তৈরি করে, যাতে বাস্তবতার অস্তিত্ব একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সাহিত্যের মূলতত্ত্ব হচ্ছে আনন্দ। আর সেই জিনিষটা হচ্ছে তারি পূর্ণ প্রকাশ।

অনন্ত বিশ্ব সব সময়েই আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যস্ত। সাহিত্যকে আশ্রয় করে আমাদের আত্মাও সেই পূর্ণ আনন্দেই আপনাকে প্রকাশ কত্তে চায়। যদি আমাদের আত্মা সেই অনন্ত আনন্দের একবার সন্ধান পায়, তবে আমাদের দৈনন্দিন লাভ, ক্ষতি আত্মার সেই আনন্দপ্রকাশের ইচ্ছাকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারে না। তখন সে স্বরচিত সঙ্গীতে, শিল্পকলার সৌন্দর্য্যে নিজে ডুবে থেকে, উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে করে অনন্ত আনন্দের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌তে চায়।

এই জন্যেই কবি বাস্তবতা থেকে সত্যকে পৃথক্ করে' বুঝতে পারেন এবং এই কারণেই কবি জোর করে বলে' থাকেন যে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধু বাস্তবজীবনের ঠিক ঠিক ইতিহাস লেখা নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে রসের ভেতর দিয়ে সত্যকে প্রকাশ করা। কলাবিদ্যাতে যেমন আমরা দেখতে পাই যে, ছবিটি কোন সত্যভাবের অভিব্যক্তি কি না,—তেমনি সাহিত্যেও আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, ওতে কোন সত্য প্রকাশিত হয়েছে কি না।

(গ)

আমার পাশের বাড়ীতে আজ কেবলি সানাই বেজেছে। সেই সানাইএর সুর আজ আমার প্রাণে যে একটা মধুর ভাব জাগিয়ে দিয়েছে—যে রসের সৃষ্টি করেছে, আমি সেই রসকে অবলম্বন করেই কয়েকটি কথা বলে আমার যা-কিছু বক্তব্য শেষ করব। সাহিত্য ও শিল্পকলা মানুষকে তার স্বকৃত সঙ্কীর্ণতা থেকে অফুরন্ত রসের সাগরে নিয়ে যায়। নাটককার যদি তাঁর নায়ক নায়িকাকে শুধু ধনী করে' কি মানী করে' আমাদের সামনে হাজির করেন, তাহলে সেই নাটককারের সৃষ্টিরসের সাগরপারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মৃত্যু হয়ে থাকে। কিন্তু যখন সেই নায়ক-নায়িকা তাদের ধন, মান, যশ, রূপ সঙ্কীর্ণতাকে ছাড়িয়ে বন্ধনমুক্ত হয়ে আমাদের সামনে এসে দেখা দেয়, তখনি তার ভেতরে আমরা এক অসীম রসের স্বাদ পেয়ে থাকি; এবং এইটে দেখানই হচ্ছে প্রকৃত চিত্রকর বা কবির উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে যখন আমরা নিজের নিজের সঙ্কীর্ণতার ভেতর দিয়ে দেখি, তখনই তার এক মূল—আর যখন উজ্জ্বল আনন্দে বিভোর হয়ে দেখি, তখনি তার মূল্য অগুরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্বের সৃষ্টি থেকে মানুষ আজ পর্য্যন্ত সংসারের বন্দিশালায় থেকে থেকে কত সময় কত গান গেয়েছে। আর সেই গানের সন্ধান আমরা এই সাহিত্যের ভেতর দিয়েই পেয়ে এসেছি।

সাহিত্য ও কলাবিদ্যা এই সংসারের অন্ধকারের ভেতর আমাদের আনন্দের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে।

যে রাগিণীতে অসীমের আনন্দ উছলে উঠছে—তার কোন রূপ নেই। কিন্তু এক একটি কাব্যে এবং চিত্রে সেই অসীম আনন্দের রূপ মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ যাঁরা সঙ্গীতশাস্ত্রে দক্ষ তাঁরা গানের সময় এক একটি পদকে বার বার আবৃত্তি করে থাকেন। ওতে গানের সংযম নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা বোঝেন না যে আয়তন দিয়ে রস কখন বড় হয় না।

রূপ যখন নিজকে প্রকাশ করে, তখন যত সব অরূপ তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সুর বেঁধে আমরা যখন গান করতে চাই, তখন সুর যেন বলে,—'তোমরা আমাকে বেঁধে রাখতে চাও? তোমরা আমাকে বন্ধন-মুক্ত করে দাও,—তাহলেই ত আমি নিজকে পূর্ণভাবে প্রকাশ কত্তে পারব!'

সুন্দর একটি ফুল থেকে আরম্ভ করে যত রকমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়,—তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আনন্দকে প্রকাশ করা। শক্তি দ্বারা কখন আনন্দের প্রকাশ হয় না। বর্ত্তমান সভ্যতার যে সব নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি তা কেবল শক্তিরই অভিব্যক্তিমাত্র। এই যে লণ্ডন থেকে আরম্ভ করে টোকিও পর্য্যন্ত সব কল-কারখানা সৃষ্টি হয়েছে, ওতে আমরা কোনো রসের আভাস দেখতে পাইনে। আমরা শুধু ওতে একটা শক্তির মাংসপেশীর খেলাই দেখতে পাই।

এই সভ্যতা বিশ্বে রস দান না করে' কেবল কদর্য্যতাই বিস্তার করে' চলেছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে বর্ত্তমানের এই সভ্যতার চাপে মানুষ শুধু তৈরি কত্তেই শিখেছে, কিন্তু রসযুক্ত কিছুই সৃষ্টি কত্তে শেখেনি। বিধাতা সব সময়েই নিজেকে আনন্দের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যে মানুষ তা বুঝতে পারে, প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা পরস্পরের মধ্যে পূর্ণানন্দের প্রতিষ্ঠা কত্তে পারে, সেই ধন্য। সেই পূর্ণানন্দের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই হচ্ছে প্রকৃত কবি ও চিত্রকরের কাজ।

ভোটবাগান ও মন্দির

হাওড়া জিলার অন্তর্গত ঘুসুড়ীতে গঙ্গার ধারে উক্ত বাগান ও মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দির ব্যতীত বাগানের মধ্যে মহন্তদের কতকগুলি সমাধি আছে। নিম্নলিখিত ঘটনামূলে তিব্বৎ দেশীয় তাসী (Tashi) লামার অনুরোধে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক এই বাগান ও মন্দির স্থাপিত হয়।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভোটিয়ারা কুচবিহার আক্রমণ পূর্ব্বক তথাকার রাজাকে ধরিয়া নিয়া যায়।

অবশেষে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট প্রেরিত সৈন্য কর্ত্তৃক তাহারা পরাস্ত হইলে তাসী লামার শরণাপন্ন হয় এবং উক্ত লামার মধ্যস্থতায় যুদ্ধ নিবারিত হইয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়।

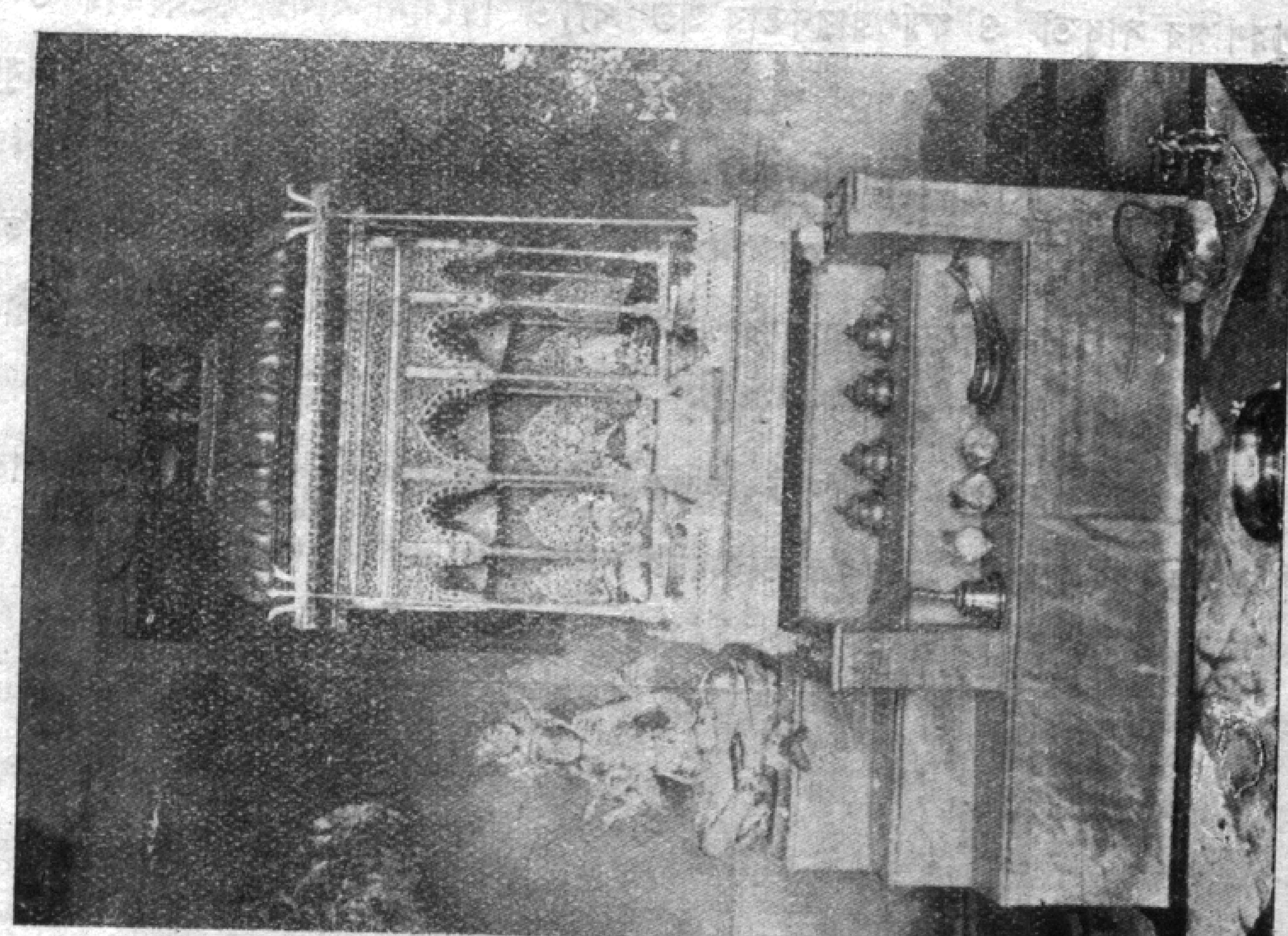
এই উপলক্ষে ভোটিয়াদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ বোগ্লে (Bogle) নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি



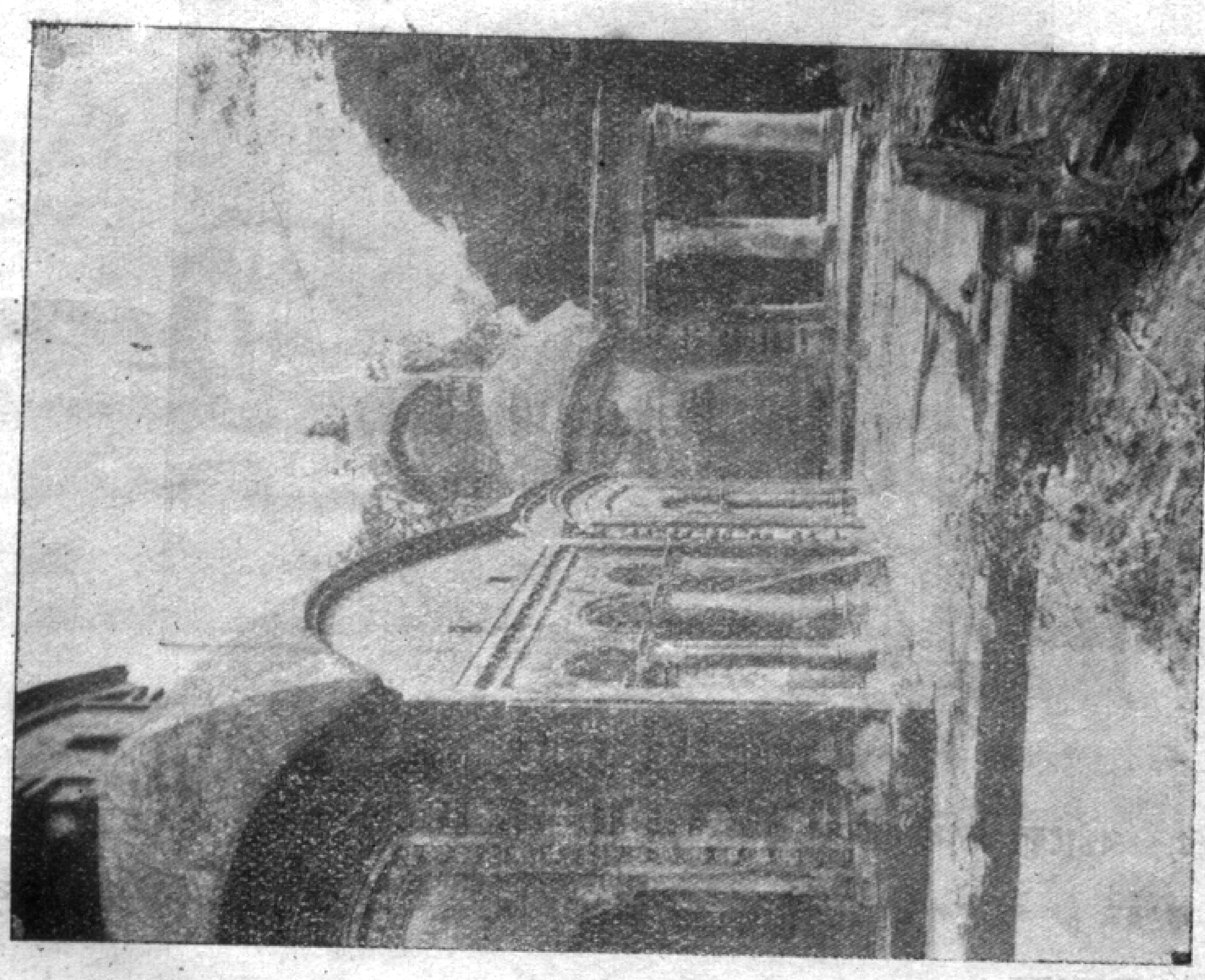
ভোট মন্দির

মিসন তাসী লামার নিকট তিব্বতে পাঠাইয়া দেন। বোগ্লে তিব্বতে পৌঁছিলে, সন্ধির অন্যান্য সর্ত্তের সহিত, তাসী লামা বঙ্গদেশে একটি ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপনের জন্য গঙ্গার ধারে কিছু স্থান চাহেন। ১৭৭৫ খৃঃ বোগ্লে তিব্বৎ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট তাসী লামার উক্ত প্রস্তাবটি জানাইলে, তিনি ঘুষুড়ীতে গঙ্গার ধারে দেড় শত বিঘা জমী দেবোত্তর প্রদান পূর্ব্বক, বোগ্লের তত্বাবধানে বর্ত্তমান বাগান ও মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। উক্ত মন্দির সর্ব্বসাধারণের নিকট ভোট মন্দির বা ভোট মঠ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

মন্দির প্রস্তুত হইলে পর, তাসী লামা পূরণগির নামক জনৈক সন্ন্যাসীকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া কতকগুলি মূর্ত্তি ও প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ তিব্বৎ হইতে পাঠাইয়া দেন। উক্ত গ্রন্থগুলি আজ পর্য্যন্তও ভোট বাগানের মঠে আছে এবং মূর্ত্তিগুলির নিত্য-নৈমিত্তিক, সেবা-পূজা হইতেছে।



তাসীলামা কর্তৃক তিব্বৎ হইতে প্রেরিত মূর্তি সমূহ

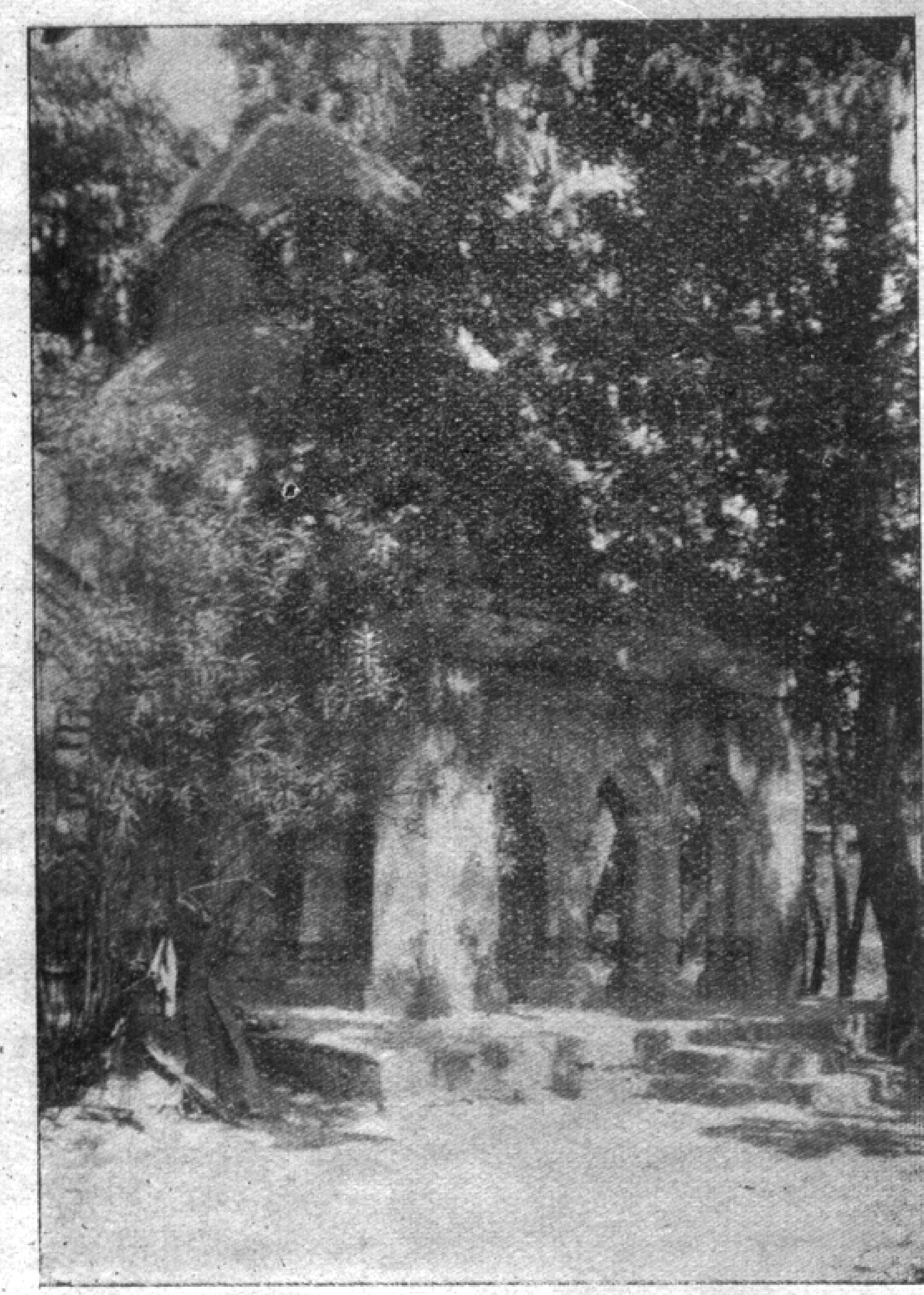


ভোট বাগানের ভিতর গঙ্গার ধারে মোহন্তদের কতকগুলি সমাধি মন্দির

পূরণগির সাধুতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য খ্যাত ছিলেন বলিয়া তিব্বতীয় ও ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তাসীলামা ভোটানীদের মধ্যস্থতায় নিযুক্ত থাকার কালে পূরণগিরই তাহার প্রতিনিধি হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন।

পর বৎসর পুনরায় তিনি বোগ্লে মিসনের সহিত তিব্বতে যাইয়া সেখান হইতে তাসী লামার সহিত চীন-সম্রাটের দরবারে গমন করেন। পিকিনে বসন্ত রোগে তাসীলামার মৃত্যু হইলে সেই সংবাদ লইয়া পূরণগির ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নূতন তাসীলামার নিকট যখন টারণার মিসন প্রেরিত হয় সেই সময় পূরনগিরও তাহাদের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন।



পূরণগিরির সমাধি মন্দির

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তাসীলামার নিকট পূরণগিরকে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। অবশেষে সেখান হইতে তিনি ভোট মঠের মহন্তপদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আইসেন।

উক্ত মঠের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতিই পূরণগিরের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই মঠ কতকগুলি দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু পূরনগির যে পর্য্যন্ত দস্যুদের বর্শাঘাতে

মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়াছিলেন সেই পর্যন্ত দস্যুদের আক্রমণে বাধা দিয়া মন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

মন্দিরটি দোতলা। পূর্ব্বে উপর তলার একদিকের ঘরে একখানা কাঠের সিঁড়ীর উপর মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত ছিল। সর্ব্বসাধারণের দেখার অসুবিধা হেতু বর্ত্তমান মহন্ত ত্রিলোকচন্দ্র-গির, নীচের তলায় তিনটি মার্ব্বল পাথরের বেদী প্রস্তুত করাইয়া তদুপরি মূর্ত্তিগুলি স্থাপন করিয়াছেন। মধ্যের বেদীতে একটি পিতলের সিংহাসনে মহাকাল ভৈরব, সম্বরচক্র, সমাজ গুহ্য ও বজ্রভ্রুকুট, এই কয়েকটি মূর্ত্তি আছে। এ সমস্তই শিবশক্তির ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি। বিগ্রহগুলি আকারে ছোট হইলেও কারুকার্য্যের জন্য প্রশংসনীয়। যে পিতলের সিংহাসনে মূর্ত্তি-গুলি আছে পূর্ব্বে তাহা ছিল না; বর্ত্তমান মহন্ত বেনারস হইতে ঐ সিংহাসন আনাইয়া ইহাতে বিগ্রহগুলি স্থাপন করিয়াছেন। সিংহাসনের নিকটেই পশ্চিম দিকে তারার মূর্ত্তি, ইহাও পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহগুলির সহিত তিব্বৎ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকের বেদীর উপর কপিলমুনি—ও বিষ্ণু মূর্ত্তি এবং বানেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত। পশ্চিমদিকের বেদীর উপর পাথরের মহিষমর্দ্দিনী অষ্টভুজা ও শীতলার মূর্ত্তি আছে। এ দুইটি বেদীর উপরিস্থ বিগ্রহগুলি তাসীলামার প্রেরিত—নহে, আধুনিক। মধ্যে মধ্যে কোন কোন সন্ন্যাসী আসিয়া এগুলি এখানে রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিলাম। মন্দিরটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ হওয়াতে বর্ত্তমান মহন্ত নূতন মন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করাইয়াছেন।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

গীতিলিপি*

ললিত-বসন্ত—দাদ্‌রা

সুর ও কথা—শ্রীমতী সরলা দেবী   স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

মা মা -া | মা মা পা I ধা ধা ধা | পা মা -া I
জ্ঞা নের ০ তু মি হে জ্ঞা ন দা মা তঃ ০

I মপা মা গা | ঋগা সা রা I মা -গমপা মা | মা মা মা I
প্রা ণী র প্রা ণে র উ ৎ স জ ন নী

মা মা মা | মপমা গা গা I মা ধা ধা | ধর্সা র্সা র্সা I না না ধা |
ঋ তু ০ স ০ ন্ত প ০ ঞ্চ মী ত ব র টায় ০

ধা ধণধা পা I পা পধপা মগা | মা -া -া I মা পা ধা |
র টায় ০ র টায় ০ ০ ০ ০ জী ব ন

র্সা র্সা র্রা I র্সর্ র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সা ধা ধা |
কু হ ক কা হি নী নি ০ ত্য প্রা ০ ণ

ধণধা পা পা I মা -া পা | মপা ধর্সা -া I -া -া -া | -া -া পা I
বা হি নী প্রা ০ ণ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ

I পা -া ধা | পধা ণা ধা I পা ধপা মা I গরা সা রা II
প্রা ০ ণ বা ০ হি নী ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্সা | র্সর্রা র্সা র্সা I না না নধা | ধা ধপা পা I
মা য়া ম য়ী তু মি হে বী ণা বা দি নী

I মা পা পা | পধা পা পধপা | মা গা গমগা | রা সা -া I
সু রে সু রে কি বা র চি লে ধ রা ০

I সমা মা মা | মা মা পা I পধা ধা ধা | পা মা মা I
কা র ণ স লি ল ক ম ল বা সি নী

I মপা মগা গা | রা সা রা I গমা মা গমপা | মা মা মা I
প্র কৃ তি তো মা র্ প রা ও অ প রা

মা মা মা | মপমা গা গা I মা ধা ধা | ধর্সা র্সা র্সা I না না ধা |
ঋ তু ব স ০ স্ত প ০ ঞ্চ মী ত ব র টায় ০

ধা ধণধা পা I পা পধপ মগা | মা -া -া I মা পা ধা |
র টায় ০ র টায় ০ ০ ০ ০ জী ব ন

র্সা র্সা র্রা I র্সর্ র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সা ধা ধা |
কু হ ক কা হি নী নি ০ ত্য প্র ০ ণ

ধণধা পা পা I মা -া পা | মপা ধর্সা -া I -া -া -া | -া -া পা I
বা হি নী প্রা ০ ণ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ

পা -া ধা | পধা ণা ধা I পা ধপা মা I গরা সা রা II
প্রা ০ ণ বা ০ হি নী ০ ০ ০ ০ ০

I সা ঋ মা | মা মা মা I মা মা মা | মা মা মা I
জী ব ভূ তা তু মি দে হ মা ঝে দে হী

I সা -া সা | -া সা সা I সা ঋা গা | ঋা সা -া I
চি দ্ রূ ০ পি নী শি খা টি অ রূপ্ ০

I ন্া সা ন্া | দ্া প্া দ্া I ন্া সা ঋসা | ন্া সা া I
মা টি ন ভ জ ল্ প ব ন অ নল ০

I সা ঋ মা | মা মা -া I মা মা মা | মা মা া I
তো মা রি ম ধুর ০ বি ক শি ত রূপ্ ০

মা মা মা | ঋপমা গা গা I মা ধা ধা | ধর্সা র্সা র্সা I না না ধা |
ঋ তু ব স ০ স্ত প ০ ঞ্চ মী ত ব র টায় ০

ধা ধণধা পা I পা পধপ মগা | মা -া -া I মা পা ধা |
র টায় ০ র টায় ০ ০ ০ ০ জী ব ন

র্সা র্সা র্রা I র্সর্রা র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সা ধা ধা |
কু হ ক কা হি নী নি ০ তা প্রা ০ ণ

ধণধ পা পা I মা -া পা | মপা ধর্সা -া I -া -া -া | -া -া পা |
বা হি নী প্রা ০ ণ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

I পা -া ধা | পধা পা ধা I পা ধপা মা I গরা সা রা II
প্রা ০ ণ বা ০ হি নী ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সা র্সা | র্রা র্সা -া I না না ধা | ধপা পধপা মা I
সু খ হা হু তাশ ০ ভ য় প্রে ম আশ্ ০

I মা পা পা | পধা পা পধা | মা গা গা | রগা রা সা I
ক ত রী তি ব হে জী ব নে র ধা রা

I সমা মা মা | মা মা পা I পধা ধা পধা | পা মা মা
অ যু ত প্রা ণে র দ র দে ড়ু বা য়ে

I ^মপা মা গা | রা সা রা I ^রমা গমপা মা | মা মা মা I
ম হা প্রা ণ পা রে ল ও হে অ পা রা

মা মা মা | মপমা গা গা I মা ধা ধা | ^ধর্সা র্সা র্সা I না না ধা |
ঋ তু ব স ০ স্ত প ০ ঞ্চ মী ত ব র টায় ০

ধা ধণধা পা I পা পধপ মগা | মা -া -া I মা পা ধা |
র টায় ০ র টায় ০ ০ ০ ০ জী ব ন

র্সা র্সা র্রা I র্সর্ র্গা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সা ধা ধা |
কু হ ক কা হি নী নি ০ তা প্রা ০ ণ

ধণধ পা পা I মা -া পা | মপা ধমা -া I -া -া -া | -া -া পা I
বা হি নী প্রা ০ ণ প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্

I পা -া ধা | পধা ণা ধা I পা ধপা মা I গরা সা রা II
প্রা ০ ণ বা ০ লি নী ০ ০ ০ ০ ০

পথের বীণা

আমাদের দেশে ফুলেরও অন্ত নেই ফলেরও পসরা চিরদিন পরিপূর্ণ কিন্তু কবিদের কাছে ফুলের হল আদর, ফল গুলোর দিকে কবিরা চেয়েই দেখলেনা। ভারতবর্ষের বাইরের কবি আঙ্গুরের গোছা আপেলের ডৌল পীচ্ ফলের বর্ণ এসব নিয়ে কত কবিতা রচনা করলে কিন্তু এদেশের কবিরা আমের মঞ্জরী দেখে মুগ্ধ, আম গেল বাদ। ফলের কথা অনেক কবি বল্লেন কিন্তু গৌণভাবে ফলের ডৌল ফলের শোভা তার উপরে কবিতা লেখা হলই না! যদি বল খাদ্য খাদক সম্বন্ধ বলেই ফল গেল বাদ কবিতায়—তবে তার উত্তরে বলতে হয় এমন অনেক জিনিষ আছে যা কেবল খাওয়াই হয় যেমন—আমের বউল, সজ্‌নে গাছ, বনের মৃগ, আকাশের বক, নূতন ধানের চিকন চাউল ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু পেটের সম্পর্ক এখানে বাধা দিলে না এই সব জিনিষকে কবিতার মধ্যে স্থান পাবার। সোণার ধানে কবিতার সোণার তরী ভরে উঠল কিন্তু ফলের পসরা নিয়ে কচিৎ কোন কবি এলেন এগিয়ে।

শুধু পেটের সম্বন্ধ নিয়ে নয় আরো কোন একটা কারণ নিশ্চয় আছে যাতে করে কবিরা নিজেদের আর্টে ফলকে প্রবেশ করাতে নারাজ হলেন।

চিত্রকরেরা পৃথিবীর সব দেশেই যেমন ফুলকে তেমনি ফলকেও নিজেদের আর্টের মধ্যে ধরে নিয়েছে—গৌণ ভাবে নয় মুখ্য ভাবে। অজন্তাগুহার ছাতে ফলের গুচ্ছ যা দেখা যায় আঁকা, তাতে কোন ফলই বাদ যায়নি। মোগল ছবিতে ফুলে ফলে বাগিচা লাগানো দেখি। চীন দেশে বাসনের গায়ে কত সুন্দর ফলের নক্সাই না করে গেছে। রূপদক্ষ তারা। এই তো গেল ফুল ফলের কথা। কবিতায় শুধু আমের বউল ধরা গেল—

"আমের বউল আসে লো লোচা লোচা
আমের বউল আসে লো বাড়ি বাড়ি"

এই পর্য্যন্ত গিয়ে যেন কবি গণ্ডী শেষ করলেন আপনার ফুলে ফুলে ভরা বাগিচার,—ফলের বাগান বাইরে রইলো অকবিদের জন্য, তারা আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা আনারস ইত্যাদি নিয়ে কবিতা করতে গেল কিন্তু পদ্যের ছন্দ দিয়ে ফলের ছাঁদের একটু ধরতে পারলে না, তারা যেমন—

"অমৃত স্বর্গেতে থাকে, লোকে এই বলে;
তাতো নয়, আমাদের আমগাছে ফলে!"

কিম্বা যেমন—　আহা! কত গুণ পেয়ারার!
কাঁচা খাই, ডাঁসা খাই পাকার তো কথা নাই
সব তাতে তৃপ্তি রসনার।

দু একজন সত্যিকার কবি দু একটা ভাল ফলের কবিতা যে লেখেননি তা বলিনে কিন্তু ফলের বাগানে অকবিদেরই অধিকার এটা এক হিসেবে তাঁরা যেন স্বীকার করে নিয়েই বসে আছেন—এটা দুচারখানা ভাল কবিতার বই উলটে পালটে দেখলেই ধরা পড়ে যায়।

কবিতায় শুধু কোকিল বুলবুল প্রভৃতিই স্থান পেলে, ঝিঁঝি পোকা বেঙ এরাও এল, কিন্তু ছবিতে এরা এবং এরা ছাড়া কাক শকুনি বলতে গেলে সারা জীব জগৎ এসে গেল। জাপানের খুব বড় চিত্রকর, তিনি কাক আঁকতে একটুও ইতস্ততঃ করলেননা, কিন্তু কোন কবি কাক চরিত্র বর্ণনা করেছেন কবিতায় বলতে পারো?

বিশ্ব-জগতের সবটা কবিদের রুচিকর তো হল না। কতকটা ছাঁকা রস তাঁরা পেলেন, আর রূপদক্ষ যারা তারা পেলে বিশ্বে জিনিষের স্বাদ বিস্বাদ সমস্তই। পাথরকেও তারা সে রসের আধার করে তুল্লে তার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয়। কবি চল্লেন নিজের মনোমত পথে কিন্তু যারা ছবি নিয়ে রইলো মূর্ত্তি নিয়ে রইলো তারা চল্লো যে পথে বিশ্বকর্ম্মার চাকা দাগ রেখে রেখে চলেছে, সেই সবাকার জন্যে যে সদর রাস্তা তাই ধরে। সুরের পথ সে আবার স্বতন্ত্র পথ! এই যে তিন পথ একই মনের দেখাতে গিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে কবিতে গায়কে না চিত্রকর প্রভৃতিতে একটা আত্মীয় সম্বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রস সমুদ্রের মুখে চলার বেলায়।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞান শিখিবার সহজ উপায়

যে বিজ্ঞান গুলিকে সূক্ষ্মতাত্ত্বিক (abstract) বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে, সেই বিজ্ঞানগুলি অজ্ঞ জনসাধারণের উপর একপ্রকার আকর্ষণ সঞ্চালিত করে। মনের যে সকল চিন্তা কল্পনা সমস্ত ভৌতিকতার বাহিরে সাক্ষাৎ মনের উপরেই কাজ করে, সেই সকল চিন্তা কল্পনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে উহাদের একটা গোলমেলে রকমের অস্পষ্ট ধারণা আছে। উহারা সংখ্যা সমূহের দিব্য কবিত্বের কথা বেশী করিয়া বলে। কিন্তু এই সকল চিন্তার উচ্চতাতেই উহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। উহাদের মনে হয় যে, জড়ের নিরেট অবলম্বন ত্যাগ করিলে উহাদের বিবেক বুদ্ধির টলমলে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে—মনের নিক্তি ঠিক রাখিতে পারিবে না। যাহা বোঝা যায় না এমন কোন জিনিসের বর্ণনা করিতে হইলে, জনসাধারণ বলিয়া উঠে "এ একটা উচ্চ বীজগণিতের সমস্যা...।" যাহারা সুশিক্ষিত, তথ্যই যাহাদের মুখ্য অনুশীলনের বিষয়—যাহারা নিজেও নির্ব্বোধ নহে, যাহারা নির্ব্বোধের কথায় বিশ্বাসও করে না—তাহারাও এই মতের পোষকতা করিয়া বেশ প্রশান্ত ভাবে বলিয়া উঠে "আমরা গণিতের কিছুই বুঝি না।" যেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই বিদ্যা অনুশীলনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও, সেই স্কুলের মধ্যেও, যে সব ছাত্র সাহিত্য ইতিহাসে খুব ভাল, তাহারাও সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞানাদির প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বেশ হাসি মুখে নীচের আসন গ্রহণ করে।

কোন মাঝারি-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে, সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞান এবং যে সকল বিজ্ঞান অ-সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাত—এই উভয়ের উপযোগিতার মধ্যে বাস্তবিকই কি একটা মৌলিক পার্থক্য আছে? যেমন মনে কর, যাহার মাঝারি রকমের বুদ্ধি, ল্যাটিন ব্যাকরণ যে বুঝিতে পারে এবং "আমি বুঝিতে পারি না" বলিয়া যে মনে করে না, শেষে কি, বীজগণিত বুঝিবার পথই তাহার নিকট রুদ্ধ হইবে?

আমি খুব সাহস করিয়া বলিতেছি:—না।

এবং শিক্ষানবীশকেও আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি আরও এই কথা বলি (ইহাতে অসম্ভব নূতন কথা কিছুমাত্র নাই)—যে, সমস্ত মানসিক অভ্যাস সাধনার মধ্যে, সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞানগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহার বিপরীতে যদি উহাদিগকে অন্যরূপ মনে রাখা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহার কারণ একটা অদ্ভুত রকমের অন্ধসংস্কার, একপ্রকার মানসিক স্নায়ু-বিকার।

*
* *

আমি যদি একটী অল্পবয়স্ক বালকের শিক্ষার ভার লইতাম, তাহা হইলে যখন হইতে তাহার বুদ্ধি একটু খুলিতে আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতেই আমি সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহার ভয় দূর করিতে চেষ্টা করিতাম—যেরূপ কোন দূরদর্শী মা সন্তানের মন হইতে অন্ধকারের ভয়, বিজনতার ভয় অপসারিত করিতে চেষ্টা করেন।

এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আমি তাহাকে কখনই বলিতাম না—"সূক্ষ্মতাত্ত্বিক জিনিষটা কি—এইবার বুঝিবার চেষ্টা করা যাক"—এই কথা না বলিয়া, তাহার নিকট সেই সমস্ত সূক্ষ্মতাত্ত্বিক ধারণার নির্দ্দেশ করিতাম, যে সব ধারণা চিন্তা করিবার সময় সে বিনা-সন্দেহে আত্মসাৎ করিয়াছে, স্থূলতথ্য হইতে বাহ্যবস্তু হইতে আপনার অন্তরে শোষণ করিয়া লইয়াছে। যে ভাষায় সে কথা কহে সেই ভাষার শব্দগুলার মধ্যেই কতটা সূক্ষ্মতাত্ত্বিকতা! "আশা করা", "মনোযোগ দেওয়া" "প্রতীয়মান হওয়া" এই কথাগুলা কতটা সূক্ষ্মতাত্ত্বিক;—ইহাদের কাছে একটা সমীকরণ অঙ্কের x ও y অপেক্ষাকৃত স্থূলতথ্য বলিলেও হয়!

সংখ্যাঘটিত সূক্ষ্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যখনই বলা হয় "দুয়ে দুয়ে চার হয়," অর্থাৎ যখনই এইরূপভাবে ঘোষিত হয় যে একটা সংখ্যার পর আর একটা সংখ্যা যুড়িয়া দিলে নূতন ধর্ম্মে সমাক্রান্ত এবং পরস্পরের মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট আর একটি তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যায়, তখনই সূক্ষ্মতাত্ত্বিক সম্বন্ধে ভোজবাজির মত একটা ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া হয়।

এখন দেখ—এই সূক্ষ্মতাত্ত্বিক জিনিস্টাকে সকলেই আত্মীয়স্বজনের মত ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবে—কেননা, উহার অনুরূপ বাস্তবতা আমাদের নিকট পরিচিত। গোড়ায় এই সূক্ষ্মতত্ত্বটা যে বাস্তবতাকে অবলম্বন করিয়া ছিল, সেই বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের মানস-নেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়াছিল। মনেকর একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, বুদ্ধিমানও বটে,—যে কখনও কোনও গণিত অধ্যয়ন করে নাই—তাহার সম্মুখে, একটা কালো-তক্তির উপর যদি এই অঙ্কটি লেখা যায়:—

$$x = \frac{p}{2} + \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

এবং ইহার অর্থ কি, যদি বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, এইকাজ একজন অসাধারণ দিগ্‌গজ অধ্যাপকেরও শক্তি সামর্থ্যে কুলাইবে না। তথাপি, একজন খুব অলস বি-এ শ্রেণীর শিক্ষার্থী একজন খুব মাঝারি যোগ্যতার অধ্যাপকের ক্লাসে, এই অঙ্কটা বুঝিতে পারে; কেননা, সাধারণ শিক্ষায়, এই সমীকরণের অঙ্কটি সূক্ষ্মতাত্ত্বিকের একটা সমস্ত শৃঙ্খলের সহিত সন্নিবদ্ধ যাহা শুধু এই অঙ্কটিতে সাদা সিধা ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া—

"দুয়ে-দুয়ে চার হয়।"

সূক্ষ্মতাত্ত্বিক কোন বিষয়ের সম্মুখে নব শিক্ষার্থী যাহাতে একেবারে বিভ্রান্তবিহ্বল না

হইয়া পড়ে, তাহা নিবারণ করিবার প্রধান উপায় স্থূলতথ্য হইতে, বাস্তব সামগ্রী হইতে যাত্রা আরম্ভ করা। বাস্তব জিনিষের সাহায্যে শিশুদিগকে, অঙ্ক শেখানো আবশ্যক। আর জ্যামিতি শিক্ষার কথা যদি বল,—জ্যামিতির প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত কোন গ্রন্থ খুলিয়া প্রথম লাইনেই এই কথাগুলি যদি দেখিতে পাই—"জ্যামিতি একটি বিজ্ঞান বিশেষ···যাহা···ইত্যাদি···"—তখনই আমি বইটা বন্ধ করিয়া আবর্জ্জনা-রাশির মধ্যে নিক্ষেপ করি.........

—কি করিয়া তবে প্রাথমিক সরল জ্যামিতির শিক্ষা আরম্ভ করিবে ?

—সত্য বলিতে কি—আমি সেকথা ভাবিয়া দেখিনাই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি কতকটা এইরূপ ভাবে বলি যথা :—

"যিশুখৃষ্টের প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, মিশর দেশে খুব বুদ্ধিমান কৃষিজীবি এক জাতি ছিল। সকল কৃষকেরই মতো, মিশরবাসীরা ন্যূনাধিক ছোট বড় ভূখণ্ডে শস্য বুনিত। জমির ছোট বড় আয়তন অনুসারে, ন্যূনাধিক মূল্যে উহারা জমি খরিদ বিক্রী করিত। তখন তাহাদের জানা দরকার হইল, একখণ্ড জমি হইতে আর একখণ্ড জমি কতটা বড়। স্পষ্টই দেখা যায়, দুই বিভিন্নবস্তা শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষা জমির মূল্য যাচাই করা আরও শক্ত। কেননা, জমির টুকরাটা হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করা যাইতে পারে না এবং উহা যে-কোন আকারের। তখন তাহাদের মনে হইল, অসমান আকারের ক্ষেত-ভূমির মধ্যে, কতকগুলা সমান রেখা আঁকিতে হইবে— এমন তিনটা রেখা যাহারা পরস্পর কর্ত্তন করিবে—যেমন মনেকর—একটা ত্রিকোণ ; এবং ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় দুইটা অদ্ভুত আকারের ভূখণ্ড তুলনা করিয়া দেখা অপেক্ষা, আর একটা ত্রিকোণের সহিত তুলনা করা ঢের সহজ......(Herodotus)

নিশ্চয়ই আমি এইরূপভাবে কোন প্রাথমিক জ্যামিতির গ্রন্থ আরম্ভ করিতে চাহি। তাছাড়া, "জ্যামিতি একটা বিজ্ঞানবিশেষ যাহা...ইত্যাদি···"—এই কথার মত তত বিরক্তি-জনক হইবে না। এজন্য আমি জেদ করিয়া বলিতেছি, উহা বুঝাও সহজ হইবে।

যাক্! এখন দেখ, প্রিয় পাঠক! ঠিক জ্যামিতির মতনই সমস্ত গাণিতিকবিজ্ঞান দৃশ্যমান, স্পর্শ্যমান বাস্তব পদার্থ হইতে যাত্রা আরম্ভ করে। অথবা এই কথাটা মনে রাখিবে জ্যামিতিই একমাত্র গাণিতিকবিজ্ঞান ; জ্যামিতিই বীজ গণিতের, যন্ত্রবিজ্ঞানের, জ্যোতির্ব্বিদ্যার—সকলেরই জননীস্বরূপ।

পণ্ডিত-শিরোমণি Montague Sainte Genevieve বলেন, যাহাকিছু x ও y যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে সে সমস্তের মূল—অগষ্টসের পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে মিশর দেশের কতকগুলি চাষা তাদের জমির উপর যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়াছিল, সেই সামান্য ত্রিকোণ। এই কথায় তোমরা আশ্বস্ত হও যে, এইসব সূক্ষ্মতাত্ত্বিকতা যাহা সাধারণ লোকে আসমানি বলিয়া মনে করে—আসলে শস্যের মতই উহাদের শিকড় নিহত।

বাস্তবের উপর শিক্ষাটা স্থাপন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। ইহাতেও ধ্রুবনিশ্চিত (exact) বিজ্ঞানসমূহের সম্বন্ধে কোন কোন শিক্ষার্থীর ভীতি দূর করিতে পারা যাইবে না। পরে, উহারা যুক্তিধারার আবশ্যকতাও সূক্ষ্মতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে ত এড়াইতে পারিবে না।

তখন এইরূপ বলা আবশ্যক হইবে। "মনেকর যদি..." এবং "এইটা মানিয়া লইলে ..." ; তাছাড়া এইরূপ বলাও আবশ্যক হইবে "এখন..." এবং অতএব...।"

সূক্ষ্মতত্ত্বের কোন কথায় ভড়্‌কিয়া না গেলেও, কখন কখন যুক্তিধারার সংস্পর্শে আসিলেই মন অসাড় হইয়া পড়ে। অসাড় হইয়া পড়ে অথবা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অন্যান্যস্থলের ন্যায় এস্থলেও, শিক্ষা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভর করে।

বরং অন্যস্থল অপেক্ষা বেশী। কেননা, নাছোরবন্দা ভাবে।

এককথা বারংবার পুনরুক্তি করিয়া কোন বিদ্রোহী বোকারাম ছাত্রকে তাহার অনিচ্ছা-স্বত্বেও, ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। যুক্তিধারা অনুসরণ করিতে অস্বীকৃত হইলে সেই বিদ্রোহী বোকারামকে, তিন ঋজু লম্বিত (perpendiculor) রেখার উপপাদ্যটা (theorem) কেমন করিয়া শেখান যাইবে? এত লোকে খোলাখুলি ভাবে যে কথা বলে, তাহার গূঢ় হেতুটা তুমি ঠিক ধরিয়াছ—সেই কথাটা এইঃ—

—"আমি অঙ্কশাস্ত্র বুঝিতে পারি না।"

ইহার অর্থ আর কিছু নহে, ইহার অর্থঃ—

—কোন একটা যুক্তিধারার উপর মনোনিবেশ করিতে যে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, সেই ইচ্ছাশক্তি আমি প্রয়োগ করিতে পারি না।

কেহ কেহ সত্যই যদি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়াও অঙ্কশাস্ত্র বুঝিতে না পারে তাহা হইলে তাহারা আপনারাই আপনাদের "বোকা" উপাধিতে ভূষিত করে। গণিতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। তাহার দৃষ্টান্ত মনে কর সেই তিন ঋজু লম্বিত রেখার উপপাদ্য; উহা সাধারণ বাক্য রচনার আদর্শেই গঠিত। উহাতে সেই কর্ত্তা আছে, ক্রিয়াপদ আছে, বিশেষণ আছে; উহার সমস্তই একটা বাচ্য পরম্পরা। "Trocadore" এর "এতোয়াল" হোটেলে যাইবার জন্য "Kleber"এর বীথি পথ ধরিয়া চলা যায়"।—এই বাক্যের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, "এ বিন্দু হইতে বী বিন্দু পর্য্যন্ত একটা সোজা রেখা টানা যাক্‌"—এই বাক্যটির ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল। "বাক্সের ঢাকাটা দিয়া বাক্সকে বন্ধ করা যাক্‌" এই কথাটা বুঝিতে যতটা বুদ্ধির দরকার,— ক খ গ ত্রিকোণটাকে ক, খ, গ, ত্রিকোণটার উপর আনিয়া ফেলা যাক্‌"—এই কথা বুঝিতে উহা অপেক্ষা বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না। উপপাদ্যটার অন্তর্ভূত প্রত্যেক বাক্যই খুব প্রাঞ্জল; যদি তুমি না বুঝিতে পার, তাহা হইলে বলিতে হইবে তুমি স্বভাবতই হীনবুদ্ধি।

স্বভাবত হীনবুদ্ধি না হইলে, এই সমগ্র উপপাদ্যটা বুঝিতে কেহই কি নিবারণ করিতে পারেন?

হয় এই প্রাঞ্জল বাক্য গুলির উপর কোন এক শিক্ষার্থী মনোযোগ দিতে পারে না, নয়, উপপত্তিকার কোন শিক্ষক যিনি এই উপপাদ্য বিবৃত করেন, তিনি নিজে এই উপপাদ্যের সত্যতা সম্বন্ধে এতটা মস্‌গুল যে, তিনি উহার মধ্যবর্ত্তী ধাপগুলা এক লম্ফে যেন ডিঙ্গাইয়া যান—কাজেই দুই একটা নিতান্ত আবশ্যকীয় ধাপ উহা হইতে বাদ পড়িয়া যায়। জ্যামিতিও অন্যান্য গণিত-গ্রন্থের অধ্যাপক প্রায়ই এইরূপ করিয়া থাকেন:—ছাত্রের বুঝিবার পক্ষে কতটা ব্যাখা করা উচিত, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। যে উপপাদ্যের প্রমাণ প্রদর্শিত হয়—সে এমন একটা রাস্তা, দুইটি পৃথক্ সত্যের মধ্য দিয়া যাহার রেখা চিহ্ন অনুসরণ করা যায়। ভাল অধ্যাপকেরা, ভাল পুস্তক সমূহ,—রেখা চিহ্ন অনুসরণ করিয়াও একখান একটানা রাস্তাটা ঠিক ধরিতে পারেন খারাপ অধ্যাপক ও খারাপ গ্রন্থ, খাবড়ো খাবড়ো জায়গাগুলা আমলে আনেন না, রাস্তায় অমুক অমুক অংশের প্রতি উপেক্ষা করেন। ইহাতে ছাত্র ভড়কাইয়া যাইবে বা আত্মহারা হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

অতএব, জ্যামিতি ও তদুৎপন্ন ধ্রুবনিশ্চিত (exact) বিজ্ঞান সমূহের সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ বাধার ইঙ্গিত করা হয় তাহা কেবল নিম্নলিখিত উপায়ে অতিক্রম করা যাইতে পারে:—

কোন উপপাদ্য সপ্রমাণ করিবার সময়, মুহূর্ত্তের জন্য যেন মনোযোগের অভাব না হয়।

প্রমাণ প্রদর্শন বেশ একটানা ভাবে চলিবে—সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়। যুক্তি ধারার মধ্যে একটা বাক্যের পর আর একটা বাক্য যেন যুক্তির নিয়মেই অগত্যা আসিয়া পড়ে। এই ক্রমাগতিটা যেন প্রমাণ লক্ষণাক্রান্ত হয়।

এই দুই বাধার মধ্যে, একটা বাধা শিক্ষার্থী সংক্রান্ত; আর একটা বাধা শিক্ষক বা পুস্তক সংক্রান্ত। শিক্ষার্থী সংক্রান্ত বাধাটা খুবই ক্ষীণ; কেননা, অন্ততঃ প্রাথমিক সরল গণিতের ভিতর, খুব খুটিনাটি করিয়া পরম্পরাক্রমে বাক্যগুলার প্রমাণ প্রদর্শিত হইলেও, এই প্রমাণ প্রদর্শনের আয়োজন-আড়ম্বর বেশী নহে। উহা অনুসরণ করিবার জন্য কয়েক মিনিট একটানা ভাবে মনোযোগ দিলেই যথেষ্ট হয়। এবং যখন উচ্চ-গণিতে উপনীত হওয়া যায়, তখন এই রকম মনোযোগ দিতে মন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তখন কোন মাঝারি বুদ্ধি সমন্বিত কোন ব্যক্তির আর একটা "দম্‌কা" রকমের প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে না। আমার খুব বিশ্বাস, গণিত শিক্ষা করা সব চেয়ে সহজ। বুদ্ধির ঘরে একেবারে "শণ্যি" না থাকিলে, গণিত শিখিতে কোন বিশেষ প্রতিভার দরকার হয় না। একটা প্রমাণে হইতে আর একটা প্রমাণ আসা যায়; এই প্রকরণের কঠোর অনম্যতাই বেশ ধারণ করিয়া রাখে।…তাছাড়া এই তথ্যের দ্বারাও এই মতটা

ব্যাপকভাবে মিশিয়াছে, এমন আর কোন বিষয় নহে। ইঞ্জিনিয়ার, প্রধান-মিস্ত্রী, ও বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক কারখানার উপর-ওয়ালা শ্রমিক, নৌ-বিভাগের ও তোপ-বিভাগের অফিসর ও সব-অফিসর সকল দেশের প্রতিভাবান ব্যক্তি—সামাজিক সকল শ্রেণীর হইতে সংগৃহীত বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি যত লোক গণিতের চর্চ্চা করে, তত লোক কি আর কোন বিজ্ঞান-ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়?

তবে যদি, মাঝারি-বুদ্ধিবিশিষ্ট কোন ছাত্র যথাসাধ্য মনোযোগ দিয়াও, গণিত বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তুমি ঠিক জানিও, সে খারাপ শিক্ষা পাইয়াছে। হয় শিক্ষক খারাপ, নয় গ্রন্থ খারাপ। তাছাড়া শিক্ষাদানে অযোগ্য হইলেও উভয়ের পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে। সেই শিক্ষক ও সেই গ্রন্থ জানে না, কি-করিয়া অন্যকে জ্ঞানদান করিতে হয়। আমরা পাঠককে আশ্বাস দিতেছি যে, প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য ভাল শিক্ষক ও ভাল গ্রন্থ অনেক আছে। গণিত যে সহজ ইহা তাহার আর একটা প্রমাণ। কোন ইতিহাস-গ্রন্থ, কোন ভূগোল-গ্রন্থ কোন ব্যাকরণ লিখিবার সময় যেরূপ গ্রন্থকারেরা বাক্য বহুল, অস্পষ্ট ও শৃঙ্খলারহিত হইয়া পড়ে, নব শিক্ষার্থীর জন্য কোন বীজগণিত কিম্বা ত্রিকোণমিতির গ্রন্থ লিখিবার সময় সেরূপ হওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রসিদ্ধ "বর্ণের সমচতুস্র" (Square of the hypotenuse) কিংবা "দ্বিতীয় ধাপের সমীকরণ" (Eqcation of the second degree) যে শিক্ষক স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে না পারে সে শিক্ষক নিতান্তই হাস্যাস্পদ।

সেইরূপ, ধ্রুবনিশ্চিত বিজ্ঞান সমূহের গোড়ার সহজ কথাগুলি শিক্ষা করা যত সহজ তত সহজ আর কিছুই নহে। ইহা-কি প্রয়োজনীয়? আমি মনে করি, ইহা অপরিহার্য্য।

যে ব্যক্তি জানে না, একটা গির্জ্জা-চূড়ার উচ্চতা দূর হইতে কেমন করিয়া নিরূপণ করা যায়, কি-করিয়া আর্কিমিডিসের মূল সূত্রতার প্রমাণ প্রদর্শন করা যায়; যে ভগ্নাংশের বিচার সিদ্ধান্ত অবগত নহে, যে ব্যক্তি তরঙ্গের উৎপত্তির ও বিস্তারের হেতু কি—তাহা সে কিছুই জানে না—সে ব্যক্তি আধুনিক কালের জীবন-পথে অন্ধের ন্যায়—শিশুর ন্যায় বিচরণ করে। বুঝিতে পারে না। দেখ, যদি আমি সঙ্গীত বুঝিতে না পারি, তাহার জন্য আমাকে আধা-আধি কষ্ট ভোগ করিতে হয়। যেখানে সঙ্গীতের রাজত্ব সেখানে না গেলেই চলে। কিন্তু এই বিংশতি শতাব্দিতে যেখানে বিজ্ঞান রাজত্ব করে সেখানে না গিয়া উপায় কি? বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান সর্ব্বত্রই; বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা আবৃত, বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা শাসিত। একথা সত্য, বিজ্ঞানের প্রয়োগস্থলেই, বিজ্ঞান আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু ইহাতে তোমরা ভুলিও না। তোমাদের চক্ষু যে সব অদ্ভুত অলৌকিক।

তোমরা অবশ্য জানো, যেসব সংখ্যা আপনাদের দ্বারা কিম্বা একের দ্বারা বিভাজ্য নহে তাহাদিগকে মৌলিক সংখ্যা বলে। ২৩ একটা মৌলিক সংখ্যা। ৭ একটা মৌলিক সংখ্যা। ৩ একটা মৌলিক সংখ্যা।

মৌলিক সংখ্যা সংক্রান্ত একটা উপপাদ্য (Theorem) এইখানে দিতেছি :—

"যে কোন মৌলিক নহে, তাহার সংখ্যা অন্ততঃ একটা মৌলিক বিভাজক সংখ্যা থাকা চাই।"

ইহার প্রমাণপ্রদর্শন এইরূপ :—

বস্তুতঃ, যে-কোন সংখ্যা মৌলিক নহে, তাহার কতকগুলি বিভাজক সংখ্যা থাকিবে। (ইহাই লক্ষণ নির্দ্দেশ (defenition।) এই বিভাজকদের মধ্যে যে সংখ্যা সব-চেয়ে ছোট, তাহা মৌলিক সংখ্যা; তাহা যদি না হয়, তাহাহইলে ঐ সংখ্যারও কতকগুলি বিভাজক থাকিবে, এবং অন্য বিভাজক থাকিলে ঐ সংখ্যা আর সব ছেলে ছোট হইবে না।

ইহা সুন্দর নয় কি? এই "বুদ্ধির খেলায়" শোভন-সুন্দর বিশেষনটি কি অযথা প্রযুক্ত হইয়াছে?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুক্রম

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের সার

[মণি মালিনী দার্জ্জিলিঙ্গে এক মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিল, সে মিসেস্ মজুমদারের বাড়ী বাস করিত—এবং যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত—গরীব দুঃখীর চিকিৎসায় ব্যয় করিত। দার্জ্জিলিঙ্গে অনুপম, হারাণ, ধীরেন প্রভৃতি অনেক ভদ্রবংশীয় যুবক তাহার গুণের জন্য মণিকে ভালবাসিত। সে অনুপমকে দাদা বলিয়া ডাকিত কিন্তু তাহার সহিত মেলামেশা দার্জ্জিলিঙ্গের হিন্দুমহিলারা পছন্দ করিতেন না। একদিন হারাণের বাড়ী এক হিন্দু তপস্বিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হারাণের স্ত্রীকে জানাইলেন যে তিনি যোগবলে হারাণের চরিত্র দোষ শোধরাইয়া দিবেন। উপায় না পাইয়া হারাণ মিসেস্ মজুমদারের শরণাগত হইল। মিসেস্ মজুমদার মণির সহিত হারাণের বাড়ী আসিলেন এবং মণি দেখিতে পাইল যে তপস্বিনীর চেলা তাহার স্বামী নিতাই সুন্দর। তপস্বিনী তপশ্চরণ চেলার সুন্দরী স্ত্রীকে দেখিয়া ঘুরিয়া গেল, তিনি অশ্লীল ভাষায় চেলার সহিত ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। নিতাই সুন্দর কিন্তু তখন গুরুকে ছাড়িয়া পত্নীকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিল। তাহার স্বামীর কলঙ্ক প্রকাশ হইয়া পড়ায় মণি দার্জ্জিলিঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, অনুপমের বাপ তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন কিন্তু অনুপম একটি আট বৎসরের মেয়ে ও ডেপুটি হালদার সাহেবের শিক্ষিতা যুবতী কন্যাকে প্রত্যাখান করিল এবং মণি দার্জ্জিলিঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে সেও তাহার সন্ধানে বাহির হইল। মণি কাশীতে আসিয়া তাহার মামা তারাপদ বাবুর আশ্রয়ে উঠিয়াছিল। তারাপদ বাবু অবসর গ্রহণ করিয়া কাশীবাস করিতেছিলেন তিনি পড়াশুনা করিয়া সময় কাটাইতেন এবং কাহারও সঙ্গে

(১৭)

হতাশভাবে বিশ্বনাথ খুড়াকে হুকায় মনঃসংযোগ করিতে দেখিয়া ধীরেন ব্যাচারা কাঁদিয়া ফেলিল। খুড়া কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন "কাঁদিস কেন বাপু বয়স কালে এমন হ'য়েই থাকে। জোয়ান গুণ্ডা ছেলে ঘরে মন বস্‌বার উপায় না থাকলেই নিজে উপায় খুঁজে নেয়। গোবিন্দ দাদাকে কতবার বল্‌লেম বাড়ান্ত গোছের একটী বৌ আন তা সে শুন্‌লেই না, টাকার সুদ গুন্‌তেই ব্যস্ত। কাঁদিস কেন বাপু নেড়া বাবাজী কচি খোকাটী নয়—যে ছেলে ধরায় নিয়ে যাবে। অমন বয়সে আমরাও অনেকবার ও রকম করেছি। দুচার দিন পরে আবার গোপনে এসে বসেছি।" অন্য সময় ধীরেন ব্যাগ্র হইয়া বিশ্বনাথ রায় নামক যণ্ডের গোশালায় প্রত্যাবর্ত্তনের কাহিনী বাহির করিবার চেষ্টা করিত কিন্তু এখন আর তাহার একথা ভাল লাগিতেছিল না, কারণ সে সত্য সত্য অনুপমকে ভাল বাসিত।

শ্রোতার নিকট উৎসাহ না পাইয়া খুড়া মহাশয় হুকায় মনঃসংযোগ করিলেন, তাহা দেখিয়া ধীরেন ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। রাত্রিতে তাহার ভাল আহার হয় নাই সুতরাং তাহার স্বভাবতঃ লম্বমাণ উদরটী তাহাকে নীরব ভাষায় তিরস্কার করিতেছিল কিন্তু বন্ধুপ্রীতি তাহাকে তখন এতটাই অন্ধ করিয়া দেখিয়াছিল যে ঔদরিক তিরস্কার অগ্রাহ্য করিয়া সে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। তখন হারান চাঁদমারীর বাঁকা রাস্তা দিয়া উপরে উঠিতেছিল তাহাকে দেখিয়া ধীরেন একটা অবলম্বন পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল "হারু কিছু খবর পেলি?" হারান বিষণ্ণ বদনে উত্তর দিল "কোথায় আর খবর পাব? কাকাকে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল তার কিছু জবাব এসেছে কি?" "কিছুই না, এখন কি করা যায় ভাই? একবার হালদার সাহেবের কাছে যাব?" "তিনি তো কন্যাদায়ের চিন্তায়ই ব্যস্ত, কোন কথা বলতে গেলেই মনিদিদির সম্বন্ধে অকথা কুকথা বলতে আরম্ভ করবেন।" "বলে বলুক ভাই, তবু একবার জিজ্ঞাসাটা করে আসি" হারাণও কি করিবে খুঁজিয়া পাইতেছিলনা, সে ধীরেনের মত একটা অবলম্বন পাইল এবং নীচের রাস্তা ধরিয়া স্যানিটারিয়ামে চলিয়া গেল।

হালদার সাহেব তখন রায় বাহাদুর খেতাব পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া বসিয়াছিলেন কারণ সেই দিন একজন গৌরাঙ্গ কর্ম্মচারী তাহাকে মোলাকাত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে হারাণ সত্য কথাই বলিয়াছিলেন মনের সঙ্গে সঙ্গে অনুপম অন্তঃর্ধান করিলে হালদার মহাশয় নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে তাহার ভবিষ্যৎ জামাতা চন্দ্রমনির হুকুম মতই দার্জ্জিলিং হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুলিশ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চারিদিক অনুপমের সন্ধানে পুলিশ লাগাইয়া তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ধীরেন ও হারাণ যখন তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিল তখন তিনি চা পান শেষ করিয়া তাহার পদমর্য্যাদার গুরুত্ব অনুযায়ী একটা হৃষ্ট-পুষ্ট কাল বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়াছিলেন।

ধীরেনকে দেখিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং হারানকে দেখিয়া চটিয়া গেলেন কারণ ধীরেন কৃতজ্ঞ হৃদয় তাহার সকল কথার অনুমোদন করিত কিন্তু হারাণ কেবল তর্ক করিত।

তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে মিষ্টার হাল্‌দার ধীরেনকে বসিতে বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, হারান তাহা লক্ষ্য করিল এবং দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরেন না বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করা যায় বলুন দেখি?" হালদার সাহেব চুরুটের ধূম উদ্গীরণ করিয়া বলিলেন "বাবাজী যে ভাবে চলছিলেন তাতে এ ব্যাপারটা যে ঘটবে, তাহা আমি অনেক দিন আগেই বুঝেছিলাম। আমাদের দার্জ্জিলিং সহরের মিসেস মজুমদার অনুপম বাবাজীর অধঃপতনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কলকাতার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে পায়রা দুটীকে এক সঙ্গেই পাওয়া যাবে। বেশী কিছু চিন্তা করবার কারণ নেই কারণ ঠাকুরুণটি শুন্‌ছি সধবা, সুতরাং বাবাজী বেশী গোলমাল করলে শ্রীঘর যেতে হবে।" ডেপুটী সাহেবের আশ্বাস পাইয়া হারাণ এতটা সুস্থ হইল যে, সে স্যানিটারিয়ামের বসিবার ছোট ঘরটী ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ধীরেন অন্যমনস্ক হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। এই সময় একখানা তার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা পড়িয়া প্রথমে হালদার সাহেবের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল বটে কিন্তু তাহার পরেই শুকাইয়া গেল। তার দেখিয়া হারাণ আবার বসিবার ঘরে আসিয়াছিল, মিষ্টার হালদার তারখানা ধীরেনের হাতে দিলেন সে পড়িল,

"Anupom returned home no anxiety refuses marriage—Govinda" "অনুপম বাড়ী ফিরিয়াছে, উদ্বেগের কারণ নাই, বিবাহ করিতে চাহেনা। গোবিন্দ।" তাদের কথা শুনিয়া হারাণ বলিয়া ফেলিল, "সকল পায়রা বোধ হয় এক রকমের নয়।" বলিয়াই সে বাহিরে চলিয়া গেল, হালদার সাহেব তাহার দিকে কট্‌মট করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

মনের আনন্দে জঠর যন্ত্রনা বিস্মৃত হইয়া ধীরেন বলিয়া উঠিল, মাসিমাও বড় চিন্তিত আছেন, খবরটা তাঁকে দিয়ে আসি। এই কথাটা বলিয়া ধীরেন জন্মের মত হালদার সাহেবের শ্রদ্ধা প্রীতি এবং মিষ্টান্নের সম্ভাবনা হারাইল কিন্তু সেকথা তখন সে বুঝিতে পারিল না। ধীরেন উঠিয়া গেল, হালদার সাহেব ক্রোধে ক্ষোভে চুরুট-দানবের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। মানুষের চরিত্রের ক্রম বিবর্ত্তন অনুসারে অনুপমের বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায়ই হইয়াছে। এই কথাটা বার বার তাঁহার মনে উঠিয়া মিসেস্ মজুমদার, মণি মালিনী ও অনুপমের প্রতি তাঁহার ক্রোধের মাত্রাটা বাড়াইয়া দিতে ছিল সুতরাং চুরুট অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভস্মীভূত হইতেছিল।

নির্ব্বাক ও বাকশক্তিযুক্ত অনেকেই দার্জ্জিলিঙ্গের মনির অভাব অনুভব করিয়াছিল। বাক্‌যুক্ত প্রাণীর মধ্যে বেবি এবং নির্ব্বাক পশুর মধ্যে অনুপমের কুকুরটা মণি মালিনীকে

যতটা ভালবাসিত এই অনাথা নিরাশ্রয় রমণীকে তত ভাল আর কেহ বাসিত কিনা সন্দেহ। মণি সঙ্গীহীনা বেবির ক্ষুদ্র প্রাণের গভীরতম কোণগুলি অধিকার করিয়াছিল! সহস্র কাজের মধ্যেও বেবিকে খাওয়াইতে কাপড় পরাইতে অথবা তাহার সঙ্গে খেলা করিতে মণির সময়ের অভাব হইত না। আর অনুপমের কুকুরটা তাহার ভালবাসা পাইয়া প্রভুর রূঢ় ব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে প্রভুর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মিসেস্ মজুমদারের একটা ঘরের কোণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। বেবি কথা কহিতে পারিত, কিন্তু বাক্‌শক্তিহীন কুকুর তাহার মনের বেদনা জানাইতে পারিত না, সেদিন সকাল বেলায় বেবি সম্মুখে একখানা বই খুলিয়া আকাশের দিক চাহিয়া কাঁদিতেছিল আর কুকুরটা কোথা হইতে মণির একটা ছেঁড়া জুতা খুঁজিয়া আনিয়া তাহার উপরে মাথা রাখিয়া বেবির পদতল আশ্রয় করিয়া ছিল।

এই সময় ধীরেন ও হারাণ সেখানে পৌঁছিলে বেবির চোখদুটো জলে ভরিয়াছিল সুতরাং সে তাহাদের দেখিতে পাইল না, কুকুরটা দেখিল নূতন মানুষের পদশব্দ পাইয়া তাহার মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল হারাণ ও ধীরেনের মুখ দেখিয়া সে আশা দূরীভূত হইল। নির্ব্বাক পশু তাহার করুণ নিষ্প্রভ চক্ষু দুইটি ছিন্ন পাদুকার উপর নিবিষ্ট করিয়া আগন্তুকদিগকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গেল। হারাণ তাহা দেখিল, অনুপমের কুকুরের মনের ভাব সে বুঝিল, তাহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল। ধীরেন তাহা বুঝিতে পারিল না, কারণ সে দেখিতেছিল যে বেবি পাঠ্য ভূগোলের মানচিত্র না দেখিয়া আকাশে নিরুদ্দিষ্ট রেখায় অঙ্কিত ভূগোল অধ্যয়ন করিতেছিল।

(১৮)

সকল দেশেই মানব-ব্যাঘ্র একই জাতীয়। এই জাতীয় মানব মনে করে যে তাহারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং তাহাদের মত সুন্দর জগতে আর কিছুই নাই। অনেক সময়ে তাহাদের বেশ বিন্যাসে ও প্রসাধনে পুরুষজনোচিত মার্জ্জিত রুচির অভাব দেখা যায়। কাশীর বাঙ্গালী-টোলার যে ব্যাঘ্রটির লোলুপ দৃষ্টি হতভাগিনী মণিমালিনীর উপর পতিত হইয়াছিল সে এই জাতীয় ব্যাঘ্র। সে দেখিতে নিতান্ত কুরূপ ছিল না কিন্তু সে মনে করিত যে তাহার কন্দর্প কান্তি দেখিয়া কুলনারী মাত্রেই ছুটিয়া আসিয়া তাহার কণ্ঠলগ্না হইবে। এই আশায় সে কাশীতে আসিয়া বাস করিত কারণ সে শুনিয়াছিল যে কাশীতে রূপসী যুবতীর অভাব নাই এবং কাশী-বাসিনী যুবতী কুলত্যাগ করিবার আশায় তাহার ন্যায় রূপবান যুবকের প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

সে প্রভাতে উঠিয়া দুইদণ্ড ধরিয়া প্রসাধন করিত এবং মুখে ও হাতে পায়ে রং মাখিয়া তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণটা গৌর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্ব্বে কাশীর নরনারী যখন যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসে তখন এই ব্যাঘ্র শীকারে বাহির হইত। পথে যাইতে যাইতে তাহার সর্ব্বদা মনে হইত যে গবাক্ষ হইতে নাগরী তাহার মস্তকে পুষ্প

বর্ষণ করিতেছে অথবা তাহার সহিত মিলনের অশায় দূতী পাঠাইয়া অন্তরালে লুকাইয়া আছে। লোকে তাহার মুখে রং অথবা পাউডার দেখিয়া প্রকাশ্যে উপহাস করিত কিন্তু সে সকল উপহাসের কথা সে শুনিয়াও শুনিত না। যাত্রার সময়ে ভদ্র মহিলারা তাহার উৎপাতে অস্থির হইয়া উঠিতেন কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিতে ভরসা করিতেন না। কাশী-বাসিনী দুই সম্প্রদায়, স্থির মতি ও অস্থির মতি। যাহাদিগের চিত্তে চাঞ্চল্য বিদ্যমান ছিল তাহাদিগের হাস্যকণা লাভ করিয়া ব্যা চরিতার্থ হইত, তখন দিগ্বিজয়ী বীরের মত সে উল্লাসে ফুলিয়া উঠিত। কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্যবিহীনা কুলনারী তাহার অপাঙ্গের কটাক্ষ ঘৃণা ও অবহেলা করিলে তাহার মনটা দমিয়া যাইত। ব্যাঘ্র কিন্তু সহজে পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে সে যথাসাধ্য ভদ্রমহিলাদিগকে ত্যক্ত করিতে ছাড়িত না এবং সুবিধা পাইলে অন্ধকারে অথবা লোকের ভিড়ে তাহাদিগের অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

ব্যাঘ্র ভদ্রবংশ-সম্ভূত, তাহার পিতামহ অনেক উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া ভয়ে গ্রামের লোকে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিত না। শুনিতে পাওয়া যায় যে এই ব্যাঘ্রের পিতামহ ডাক্তারী পাশ না করিয়াও হুগলীতে চিকিৎসা করিতেন এবং চিকিৎসা না করিয়াই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ পুত্র ও পৌত্রেরা পুরুষানুক্রমে সদ্ব্যয় করিতেছিল। ব্যাঘ্র বাঙ্গালীটোলায় একটী স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিত এবং বহু কাশীবাসিনীকে আশ্রয় দিত কিন্তু পুরুষ কাশী-বাসীকে কেহ কখনও তাহার আশ্রয়ে বাস করিতে শুনে নাই। তাহার কাশীর বাড়ী একটা প্রকাণ্ড সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল। প্রায়ই সেখানে কথকতা, পাঠ বা পূজা হইত। সন্ধ্যার পরে কথকতা বা পাঠ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতা ও অনিমন্ত্রিতা কাশীবাসিনীতে ভরিয়া যাইত, সেই সময়ে ব্যাঘ্র শীকার খুঁজিয়া বেড়াইত। প্রকৃত ভদ্রমহিলারা ব্যাঘ্রের আশ্রিতা-কাশী-বাসিণী-আহ্বানে একবার কথকতা বা পাঠ শুনিতে আসিয়া পড়িলে দ্বিতীয়বার সে পথে চলিতেন না।

এই ব্যাঘ্রের নাম ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালী-টোলার অধিকাংশ কাশী-বাসিণী ও দুর্ব্বৃত্ত গুণ্ডা তাহার সুপরিচিত ছিল এবং তাহার অত্যাচারে দরিদ্র স্থিরমতি কাশী-বাসিণীরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। যেদিন ত্রিপুরা দিদির নূতন ভাড়াটিয়া কাশীতে আসিয়া পৌঁছিল সেই দিনই ব্যাঘ্র তারাপদ বাবুর বাসার সম্মুখে ওঁত পাতিয়া বসিল। পরদিন প্রভাতে ব্যাঘ্র শীকারে বাহির হইল না। সে যে ঘরটা ভাড়া লইয়াছিল তাহার একটা ছোট জানালা দিয়া তারাপদ বাবুর স্নানের ঘর দেখা যাইত। ফণী ঘরের অপর সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া সেই ছোট জানালায় মুখ দিয়া বসিয়া রহিল।

সকাল বেলায় তারাপদ বাবু আসিলেন এবং হাত মুখ ধুইয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু মণি আসিল না। ফণী কিন্তু সহজে হতাশ্বাস হইবার পাত্র নহে। নয়টা বাজিলে তারাপদ বাবু স্নান করিতে আসিলেন, তখন সে মুখ সরাইয়া লইল। তারাপদ বাবুর পরে মণি

স্নান করিতে আসিল। তারাপদ বাবুর স্নানের ঘরে আলোক আসিত সুতরাং ফণী পিপাসা মিটাইয়া মণির নব যৌবনের সুগঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া চরিতার্থ হইল। স্নান সমাপন করিয়া মণিমালিনী চলিয়া গেল সে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। দ্বিতীয় প্রহর বেলায় সে নিজের বাসায় ফিরিয়া গিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্নানাহার সারিয়া চলিয়া আসিল এবং কাশীর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অপরাহ্ন রুদ্ধকক্ষে বসিয়া কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার অধ্যবসায়ের পুরস্কার মিলিল। ব্যাঘ্র মনের সাধ মিটাইয়া গোপনে বিবসনা কুলনারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিল।

সন্ধ্যার পরে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, মণির রূপ ও কমনীয় সুগঠিত দেহ তখন তাহার চিত্তবৃত্তি এতদূর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল যে সে পাগল হইয়া উঠিল। সে গৃহে ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহার আশ্রিতা কোন কাশী-বাসিনীই তারাপদ বাবুর দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, হতাশ্বাস হইয়া ফণীর আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া উঠিল, যে দুই একটি অভিসারিকা নিত্য তাহার কুঞ্জে আসিত সে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল। সে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না, শেষ রাত্রিতে সে বাঁশের বাকারী দিয়া একটা ধনু ও একটা তীর তৈয়ারী করিল এবং নূতন বাসায় গিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

পত্রখানা এইরূপ ঃ—

প্রাণের অপ্সরা—

যেদিন তোমার মন মাতানে চেহারাখানি দেখেছি সেইদিন থেকেই মরেছি তুমিও আমাকে দেখলেই মরবে তাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। তোমার অপ্সরারূপ কেবল আমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল সেটা যখন তুমি আমার দখলে আসবে তখনই বুঝতে পারবে। প্রাণ, তুমি ত দুনিয়ার জিনিষ নও, তুমি যে স্বর্গের পরী, আমি তোমায় পেলে হাওয়া হ'য়ে আশমানে উড়ে যাব আর কখন মাটীতে নামতে দেব না। পত্রখানি পেলে একবার জানালা দিয়ে মুখখানি বাড়িয়ে দেখ তা'হলেই মরবে। পথের পরের বাড়ীর জানালায় আমি তোমার জন্য মুখ বাড়িয়ে থাকব।

তোমার—জীবন সর্ব্বস্ব।

তৃতীয় দিবসে মণি যখন স্নান ক'রতে আসিল তখন ব্যাঘ্র-নিক্ষিপ্ত-শর পত্র সমেত তাহার বক্ষে গিয়া লাগিল, শরের আঘাতে মণির অনাবৃত বক্ষ কাটিয়া গেল। রক্ত দেখিয়া ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় ব্যাঘ্র অধীর হইয়া পড়িল। সে বিবেক বুদ্ধি হারাইয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিল, কিন্তু থিয়েটারের প্রেতের মত বহুবর্ণে চিত্রিত তাহার মুখ দেখিয়া মণি সভয়ে বসন সংযত করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মণে যবনে বাদ আছে যুগে যুগে

গৌড়ের বাদশা হুসেন সার আমলে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজের উপর মুসলমানের দৌরাত্ম্যের প্রসঙ্গে "চৈতন্য-মঙ্গলের" লেখক জয়ানন্দ বলেছেন যে, "ব্রাহ্মণে যবনে বাদ আছে যুগে যুগে।" কথাটা প্রথম শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম।

তিনি যদি স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর, হিন্দুর সঙ্গে অহিন্দুর, চির-বিরোধের কথা উল্লেখ করতেন তাহলে আমি মোটেই আশ্চর্য্য হতুম না। যে দেশ যুগে-যুগে বিদেশী-কর্ত্তৃক আক্রান্তও অধিকৃত হয়েছে, সে দেশের জনগণের সঙ্গে বিদেশীদের যুগে যুগে দেহ-মনের সংঘর্ষ হয়েছে, এ কথা কেউ বললে, ইতিহাস না জেনেও আমি কথাটাকে ঐতিহাসিক সত্য বলেই সহজে মেনে নিতুম।

কিন্তু বিদেশীর সঙ্গে বিবাদ যে যুগে যুগে এ দেশের একটি বিশেষ সম্প্রদায়েরই হয়েছে, এমন কথা আচমকা শুনলে মনে একটু খট্‌কা লাগে। কাজেই কথাটা খাঁটি বলে মেনে নেবার আগে, সেটিকে ইতিহাসের কাছে যাচিয়ে নেওয়া দরকার।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এ-ক্ষেত্রে জয়ানন্দের এ কথার সত্যাসত্য ইতিহাসের কষ্টি পাথরে কষে নেবার যো নেই, কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই। ইতিহাস যে নেই, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আজকের দিনে এ দেশের ঐতিহাসিক-মহাভারত রচনা করতে বহু-লোকে লেখনী ধারণ করেছেন। ভারতবর্ষের যদি ইতিহাস থাকৃত, তাহলে সে ইতিহাস পড়বার জন্যই আমরা ব্যগ্র হতুম,—লেখ্‌বার জন্য নয়। লেখার চাইতে পড়াটা যে ঢের সহজ, তা যে ছেলের বর্ণ পরিচয় হয়েছে, সেই জানে।

সে যাই হোক্‌, ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নেই, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার প্রয়োজন নেই। পুরাকালের ইতিহাস আছে শুধু রোমের আর গ্রীসের অর্থাৎ রোম নামক একটি সহরের, আর তার চাইতেও ঢের ছোট,—আথেন্‌স্‌ প্রভৃতি পাঁচসাতটি গ্রীক সহরের। আর রোমের ইতিহাসের পরমায়ু হচ্ছে হাজার বৎসর আর গ্রীসের তার সিকি। অপর পক্ষে ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিও যেমন বিপুল তার হিষ্টরিও তেমনি নিরবধি। সুতরাং ভারতবর্ষের শুধু খণ্ড দেশের ও খণ্ড কালেরই ইতিহাস থাকৃতে পারে—আর সে খণ্ড ইতিহাস লেখবার ভার ভগবান বিদেশীদের হাতে দিয়েছেন, এবং তারা তা চিরকালই লিখে আস্‌ছে—কারণ সে সব ইতিহাস না নাটকের তারাই হচ্ছে নায়ক।

(২)

ভারতবর্ষের ইতিহাস না থাক্‌—ভারতবর্ষের সে ইতিহাসের ফল আছে। আর সে ফল শুধু ভৌতিক নয় মানসিকও। ইতিহাস জাতির শুধু অবস্থার পরিচয় দেয় না, তার মনেরও পরিচয় দেয়। আর মনের খবর প্রধানতঃ সাহিত্যের কাছ থেকেই পাওয়া যায়।

আবহমানকাল যবনের প্রতি ব্রাহ্মণের মনোভাব কিরূপ ছিল তার ইঙ্গিত আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট আছে। সংস্কৃতে যবন বলতে—আদিতে গ্রীকদেরই বোঝাত। তারপর বিদেশী মাত্রকেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ একই নামে অভিহিত করেছেন। তা সে বিদেশী আরব দেশের লোকই হোক, আর চীন দেশের লোকই লোক,—আর সে লোক পাহাড় টপ্‌কেই আসুক আর জাহাজ চড়েই আসুক। বিদেশীর জাতিবিচার তাঁরা কখনই করেন নি। তাঁরা এইটুকু জেনেই অসন্তুষ্ট থাকতেন যে, লোকটা বিদেশী অতএব বিধর্ম্মী। বৈদিক ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ জাত পৃথিবীর অপর কোনও দেশে নেই এবং কস্মিনকালেও ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে বিদেশী ও বিধর্ম্মী এ দুটি পর্য্যায় শব্দ—ইংরাজীতে যাকে বলে Synonyms।

এদেশের একটি ধর্ম্ম—অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম অবশ্য ভারতবর্ষের পর্ব্বতের প্রাকার ও সাগরের পরিখা লঙ্ঘন করে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণরা চিরকালই পাষণ্ড ধর্ম্ম বলে অভিহিত করেছেন। এর একটী কারণ বোধ হয় এই যে, এ ধর্ম্মে যবনস্পর্শদোষ ঘটেছিল, অর্থাৎ বিদেশীরাও এ ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল। এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণরাও যে বিদেশীর বৌদ্ধধর্ম্ম আত্মসাৎ করাটা সু-নজরে দেখতেন না,—তার প্রমাণ, "অবদান কল্পলতার" রচয়িতা মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করে'—

"শুষ্কা তুরুষ্কা চীনা প্রনীনা", হয়েছে। এ রকম কথা আমার কানে ঠাট্টার মত শোনায়। এ বিদ্রূপ অন্ততঃ ক্ষেমেন্দ্রের করা উচিত ছিল না,—কেননা,—"অবদান-কল্পলতা" ভারতবর্ষে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল,—তিব্বতেই সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

সে যাই হোক্ এই যবন শব্দটি যে অবজ্ঞাসূচক সে বিষয়ে ত কোনও সন্দেহ নেই। এমন কি একদল বিদেশী—মুসলমানরা—যখন স্বদেশী হল তখনও ব্রাহ্মণরা সেই স্বদেশীদের ঐ একই যবন নামে অভিহিত করেছেন। কারণ তারা স্বদেশী হয়েও বিধর্ম্মী রয়ে গেল, এবং বহু ভারতবাসীকে তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্যও করলে।

এই যবন শব্দের কাছ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণের দিক থেকে দেখতে গেলে—"ব্রাহ্মণে যবনে বাদ আছে যুগে যুগে"—জয়ানন্দের এ কথায় ব্রাহ্মণ-মনোভাব যথার্থ ব্যক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণ-যবনের এই চিরাগত আন্তরিক বিরোধ, সম্ভবত অনেক সময়ে বাহ্যিক বিরোধও ঘটিয়েছে। কারণ মানুষে যাকে বাহ্যিক ঘটনা বলে সে বস্তু মানসিক ব্যাপারের শারীরিক অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(৩)

যবনরাও যে যুগে যুগে ব্রাহ্মণের প্রতি সমান নারাজ ছিলেন এবং আছেন, তার লিখিত-প্রমাণ যবন-সাহিত্যে পাওয়া যায়।—

আলেকজাণ্ডার হচ্ছেন প্রথম যবন-রাজ যিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত পদদলিত করেন। Arian নামক যে যবন পণ্ডিত—আলেকজাণ্ডারের ভারতবিজয় লিপিবদ্ধ

করেছেন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলে গিয়েছেন যে, এদেশে ব্রাহ্মণনামক একটি সম্প্রদায় আছে, যারা হচ্ছে সকল নষ্টের গোড়া!—যে সব ক্ষেত্রে এদেশের ক্ষত্রিয় রাজারা বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করা সুবিবেচনার কার্য্য করেছিলেন, ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় তাঁরাই আবার পরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। সম্ভবত সেকালের ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের কানে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন যে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ।" ফলে—সেই সব ক্ষত্রিয় রাজারা নিধন প্রাপ্ত হয়েছিলেন উপরন্তু মহামতি আলেকজাণ্ডার Aristotle এর শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ বংশ নির্ব্বংশ করবার আদেশ দিয়েছিলেন এবং সে আদেশ যবন সৈন্যরা যথাসম্ভব পালন করেছিল।

Arian এর এ কথা সম্ভবতঃ সত্য। আলেকজাণ্ডার গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করবার সময় তিনি এদেশে যে যবন-কলোনি (Colony) রেখে গিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্ত তার উচ্ছেদ সাধন করেন—চাণক্য নামক জনৈক কুটিল ব্রাহ্মণের কু-মন্ত্রণায়। অন্তত এইরূপ একটা কিম্বদন্তি এদেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। তারপর যে মগধরাজ সত্যসত্যই ভারতবর্ষ নির্যবন করেন সেই পুষ্যমিত্র যে একজন ঘোর ব্রাহ্মণ ছিলেন এ ত ঐতিহাসিক সত্য।

আলেকজাণ্ডারের আগমন ত ভারত ইতিহাসের প্রথম কথা। তার প্রায় আড়াই হাজার-বৎসর পরে—এই খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে Valentine-Chirol নামক জনৈক ফরাসী ইংরাজ-Indian Unrest নামক যে ভয়াবহ গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মোদ্দা-কথা এই যে Indian Unrest বলে-এদেশে কোন জিনিষই নেই, আছে শুধু Brahmin-Unrest। ভারতবর্ষে "স্বদেশ" "স্বরাজ" প্রভৃতি যে সব গোলমেলে কথা উঠেছে সে সবই নাকি ব্রাহ্মণের মাথা থেকে টীকির মত গজিয়েছে। অতএব ব্রাহ্মণ-দমন করলেই ভারতবর্ষে ব্রিটীশরাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আর এই গ্রন্থ—বিলেতি পলিটিসিয়ানদের মধ্যে এতই উঁচুদরের বলে গণ্য যে বিলাতের একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞান-সম্মত দার্শনিক, John Morely—উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে Valentine Chirolকে Sir উপাধিতে ভূষিত ও সম্মানিত করেছেন,—এবং তার অব্যবহিত পরে নিজেও Lord উপাধি লাভ করেছেন।

ব্রাহ্মণের ইংরাজি প্রতিবাক্য যখন priest তখন বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা যে ব্রাহ্মণের... বিরুদ্ধে সকল অপবাদ নির্ব্বিচারে মেনে নেবেন সে ত জানা কথা।

এখন দেখা গেল ইউরোপীয়দের ভারতবাসী সম্বন্ধে প্রথম কথাও যা শেষ কথাও তাই—আর সে হচ্ছে—"ব্রাহ্মণ বড় বালাই।" এ বিষয়ে Aristotel এর শিষ্য ও Mill এর—উভয়েরই একমত।

(৪)

ভারতবর্ষের মুসলমান যুগেরও ঐ হচ্ছে গোড়ার কথা ও আগার কথা।

মুমূর্ষু নবাবী যুগের ব্রাহ্মণ কবি ভারতচন্দ্র জাহাঙ্গীর বাদসার জবানী ব্রাহ্মণের প্রতি মুসলমানদের মনোভাব আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন। জাহাঙ্গিরের সঙ্গে মানসিংহ ও ভবানন্দ

মজুমদারের উক্ত কথোপকথন অবশ্য আদ্যোপান্ত কাল্পনিক। তবে উক্ত কথোপকথনের ভিতর Historical truth না থাকলেও psychological truth আছে। বলা বাহুল্য,—যা সনাতন তার কোনও তারিখ নেই। অতএব জাহাঙ্গির কি বলেছিলেন তা শোনা যাক। তাঁর একটি কথা এই যে—

"দেহ জ্বলি যায় মোর বামন দেখিয়া।"

এ গাত্রজ্বালার কারণও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন।

"আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই,
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই।"

কিন্তু তাঁর এ সাধে বাদ সেধেছিল ব্রাহ্মণরা। কারণ—

"যতেক ব্রাহ্মণ মিছা পুঁথি বানাইয়া,
কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া।"

তার পর জাহাঙ্গিরের মতে ব্রাহ্মণের ধূর্ত্ততার আর এক প্রমাণ এই যে—

"বিশেষে ব্রাহ্মণ জাতি বড় দাগাদারি
আপনারা এক জপে—আরে বলে আর।"

মুসলমান যুগের আদিতে গজনির সুলতান মামুদের সভাসদ আল্‌বেরুনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য গ্রন্থে বলেছেন যে, ব্রাহ্মণরা জনগণের ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না—অথচ সেই লৌকিক ধর্ম্মকেই সযত্নে লালন পালন করে। সেকালের নাকি জনগণের ধর্ম্ম ছিল—মাটি পাথর কাঠ পটের পূজো আর ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম-উপাসনা। সংক্ষেপে তারা—

"আপনারা এক জপে—আরে বলে আর।"

উপরন্তু আলবেরুনি বলেছেন যে ব্রাহ্মণরা এতদূর অহঙ্কারী ছিল যে তারা অপর কোনও দেশের মানুষকে সভ্য বলেই স্বীকার করত না। আল্‌বেরুনির তুল্য সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং তাঁর মত উদারচেতা বিদেশী বোধ হয় ভারতবর্ষে আর কখনও আসেন নি। সুতরাং তার কথা শিরোধার্য্য করতে আমরা বাধ্য।

(৫)

"ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে"—জয়ানন্দের এই কথার স্বপক্ষে কিছু কিঞ্চিৎ প্রমাণ যখন ব্রাহ্মণ ও যবন উভয় সাহিত্যেই পাওয়া যায় তখন কথাটাকে সত্য বলে মেনে নেবার কোন বাধা নেই।

এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—এই চিরাগত বিরোধের কারণ কি? Valentine Chirol প্রমুখ ইংরাজ-রাজনৈতিক লেখকেরা বলেন যে, নিজের প্রভুত্বের উপর হাত পড়ে বলেই ব্রাহ্মণরা বিদেশী প্রভুত্বের বিরোধী। কথাটা সহজ বুদ্ধিতে খুব যুক্তিসঙ্গত শোনায়, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, এ অনুমান একেবারেই অমূলক। ইংরাজী শব্দের ভুল সংস্কৃত অনুবাদ করলে যেমন সে কথার অর্থ আমরা ভুল বুঝি, তেমনি সংস্কৃত শব্দেরও ভুল ইংরাজী অনুবাদ

করলে, সে কথার অর্থও ইংরাজও ভুল বোঝেন। আমাদের পরস্পরের বোঝাপড়া যে একটা গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়েছে সে অনেকটা এই ভুল তরজমার প্রসাদে। ব্রাহ্মণের অনুবাদ priest করলেই গোড়ায় গলদ হয়ে যায়।

সত্য কথা এই যে, ইউরোপীয়েরা যাকে "প্রভুত্ব" বলে সে প্রভুত্ব কস্মিন্‌কালেও ব্রাহ্মণদের করতলগত ছিল না, আজও নেই, সে প্রভুত্ব ছিল ক্ষত্রিয়ের। যদি কেউ বলেন যে রাজ্যের শাসন না হোক্ ধর্ম্মের শাসন ত ব্রাহ্মণদের একচেটে ছিল। এ কথার উত্তর, ধর্ম্মের প্রভুত্ব বলাতে ইউরোপীয়েরা যা বোঝে, সে প্রভুত্ব ব্রাহ্মণরা কখনো পায় নি, কেননা চায় নি! বৈদিক ধর্ম্মে কোনও দালাই-লামা, পোপ কিম্বা খালিফের স্থান নেই। ক্ষাত্রশক্তি একহাতে না থাকলে, ধর্ম্মশক্তি আর একহাতে রাখা যায় না, এমন কথা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে কোথাও নেই।

ব্রাহ্মণের দল ছিল, একালে যাদের বলে intellectual proletariats, আর এ দল যে সকল প্রকার প্রভুত্বের চিরকণ্টক, তা ত সবাই জানে। Chirol যদি বলতেন যে, ভারতবর্ষের নব-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়—অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষিত intellectualsই যত গোল বাধায়, তাহলে তাঁর কথা ষোল আনা না হোক বারো আনা সত্য হত।

(৬)

তবে এই যবন-বিদ্বেষের মূলে কি মনোভাব ছিল? National Consciousness? মোটেই নয়। কেননা পৃথিবীতে এ Consciousnessএর বয়েস আজও একশ বছর হয়নি।...Race-Consciousness? তাও হতে পারে না। Anthropology নামক সদ্যজাত শিশু-বিজ্ঞানের ট্যাঁ ট্যাঁ ধ্বনি তাঁদের কখনো কর্ণগোচর হয় নি। Religious consciousness? তাও নয়। Religion বলতে একালে আমরা যা বুঝি, সেখানে ধর্ম্ম বলতে ব্রাহ্মণরা তা ঠিক বুঝত না। সেকালে "আচার" ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল, একালে তা নয়। তবে কি এ বিদ্বেষের মূলে ছিল Caste Consciousness? এ প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বলতে আমার আপত্তি নেই, যদি Caste-consciousnessএর অর্থ হয় স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি। নিজেদের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান এ সম্প্রদায়ের মজ্জাগত ছিল আর সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা থেকেই বিদেশীদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ঘটেছিল। এ স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি হচ্ছে প্রধানত মানসিক --অতএব এবুদ্ধির যথার্থ ইংরাজী নাম হচ্ছে Culture consciousness, ব্রাহ্মণদেরও যে একটা বিশিষ্ট Culture ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করে না। আল্‌বেরুনি যাকে ব্রাহ্মণদের অহঙ্কার বলেছেন, তাঁর অর্থ ও জাতের নিজস্ব Cultureএর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অটল বিশ্বাস।

এখন দেখা যাক, ব্রাহ্মণ-যবনের চির-বিরোধের ফল কি দাঁড়িয়েছে।

বৌদ্ধযুগে যদি ব্রাহ্মণসম্প্রদায় এদেশে না থাকত, তাহলে সে যুগে পূর্ব্বএশিয়ার মত সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হয়ে যেত, আর মধ্যযুগে যদি ব্রাহ্মণ না থাকত, তাহলে পশ্চিম এশিয়ার মত গোটা হিন্দুস্থান মুসলমান হয়ে যেত। অনেকে মনে করেন যে, এরূপ পরিণাম অতি সুখের হত। ভারতবর্ষ যদি বৌদ্ধ হত, তাহলে চীন জাপানের মত অদ্যাবধি স্বাধীন থাকত, আর

হিন্দুস্থান যদি মুসলমান হত, তাহলে আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে প্রবল পরাক্রান্ত দেশ হত। আর ভারতবর্ষের নামে, পৃথিবীর ছোট ছোট দেশ সব ভয়ে কাঁপত। যা হয়নি, তা হলে কি হত, সে ভাবনা বৃথা।

ব্রাহ্মণের আত্মরক্ষা, প্রচেষ্টার ফল হয়েছে এই যে ব্রাহ্মণরা যুগে যুগে বিদেশীদের বাধা দিয়েও স্বদেশের পলিটিকাল স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেন নি, বরং নিজের সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে দেশের পরাধীনতাই কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের সমাজের জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য আমাদের রাষ্ট্রীয় অধোগতির মুখ্য কারণ না হলেও একটি স্পষ্ট কারণ। ব্রাহ্মণরা বাধা না দিলে ভারতবর্ষের জনগণ নিশ্চয়ই একজাত হয়ে যেত। এমন কি আজকের দিনে যাঁরা জাতি-গঠন করবার উদ্দেশ্যে জাত মারবার জন্য উঠেপড়ে লিখছেন ও বক্তৃতা করছেন, তাঁদের আর হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতা দূর করতে এত ভয় খেতে ও এত বেগ পেতে হত না। তবে ফল কথা এই যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারলেও, ভারতবর্ষের সভ্যতা রক্ষা করেছে।

ভারতবর্ষের সভ্যতা বলে যে একটি জিনিষ আছে ও তার একটা বিশিষ্টতা আছে এ কথা মনে যেই যা ভাবুক মুখে কেউ অস্বীকার করে না। আমরা যখন West এর চাইতে Eastকে বড় বলে প্রমাণ করতে চাই তখন সে East এর মানে হয় ভারতবর্ষ, এবং ভারতবর্ষের সভ্যতার অর্থ হয়—ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-সভ্যতা, ভাষান্তরে—আর্য্য-সভ্যতা।

আমরা যে যুগসঞ্চিত পলিটিকাল অধীনতার চাপে বাস করে আজও চিন্তা করতে পারি, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে পারি, বড় বড় ideal মনে ধারণ করতে পারি, সে শুধু ব্রাহ্মণের প্রসাদে। যুগ যুগান্তর ধরে প্রতিকূল অবস্থার ভিতর লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হয়েও তাঁরা যদি এই মানসিক স্বরাজ্য রক্ষা না করতেন তাহলে Hindu-spirit বলে পৃথিবীতে কোনও জিনিষ থাকত না।

এ Spirit ভবিষ্যতে থাকবে কি চলে যাবে সে কথা বলা কঠিন। আজকের দিনে ব্রাহ্মণে-যবনে বিরোধ ঘটেছে—বাইরে নয়, আমাদের অন্তরে।

ব্রাহ্মণ Culture ও যবন Culture এর টানাটানির ভিতর পড়ে আমাদের মন এখন তার শান্তি হারিয়েছে। আমাদের বহুলোকের মনে আজ Spiritnal Unrest সদাসর্ব্বদা বিরাজ করছে। এর ফল কি হবে? আমরা যদি আমাদের ব্রাহ্মণ-বুদ্ধি রক্ষা করতে পারি—তাহলে এই বিরোধের একটা সমন্বয় করে নিতে পারব। যেমন পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের বিরোধের সমন্বয় ঘটেছে, তান্ত্রিকধর্ম্মে। ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের বিরোধের সমন্বয় ঘটেছে মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম্মে। আর লোকে বলে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মণও খৃষ্টানের বিরোধের সমন্বয় মাত্র।—সে যাই হোক আশা করি আমরা ব্রাহ্মণ-বুদ্ধি—ভাষান্তরে আমাদের মনের স্বরাজ্য ভবিষ্যতেও রক্ষা করতে সমর্থ হব।—বলা বাহুল্য যে ব্রাহ্ম বুদ্ধি ও ব্রাহ্মণের বুদ্ধি এক জিনিষ নয়।

১লা বৈশাখ ১৩৩১।

খেয়াল খাতা

বীরবলের আত্মপরিচয়

আকবর বাদশা বীরবলকে জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি কে বট ?"

বীরবল কহিলেন—

আয় মহারাজ !

ময় প্রথম তো কবীশ্বর হুঁ,
দ্বিতীয়ে মন্ মুন্সী হুঁ (১)
তৃতীয়ে সফা-চাতর হুঁ, (২)
খিলৌনা পাদশাহী হুঁ !
থোড়ি বহুতি বিদ্যা নভ্‌সিদ্ধি ভি জানতা হুঁ, (৩)
চারবেদ বিদ্বান্ ঔর ওষ্‌থি অথাই হুঁ, (৪)
গাওনা বজাওনা রিঝানা জাহু রাজন্‌কো, (৫)
তুরাকো তোর জাহু, রথোঁকা রথবাই হুঁ, (৬)
জাতকা ব্রাহ্মণ হুঁ জান্‌তা জাহান সারা
রাম দেওয়ে হিম্মৎ তো বকৎকা সিপাই হুঁ !

(সরলাদেবীর খাতা হইতে)

(১) মন্-মানো, ধরে নাও
(২) সফা চাতর -সভায় চতুর
(৩) নভ্‌সিদ্ধি—নাড়ী দেখা
(৪) ওষ্‌থি—জ্যোতিষী
(৫) রিঝানা—মনোরঞ্জন করা
(৬) তুরাকো—তুরঙ্গকে। তোর্—চালান।
রথবাই—রথী

রবীন্দ্র বারোমাস

১। ছয় ঋতু ছয় রঙীন রথে
যায় আসে যে বিনা পথে,
নিজেরে সেই অচিন পথের খবর শুধাই।

* * *

২। চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে পলে পলে॥

* * *

৩। নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম, বাহুতে বাহুতে ধরিয়া,
শ্যামল, স্বর্ণ, বিবিধ বর্ণ নব নব বাস পরিয়া॥

* * *

৪। হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দরে॥

* * *

৫। সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থাম্‌তে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা॥

* * *

নববর্ষ

১। হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে, শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনেছি পূজার দান॥

* *

২। নব বৎসরে করিলাম পণ ল'ব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে হে ভারত ল'ব শিক্ষা॥

বৈশাখ

১। হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে॥

* * *

২। হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি পিণাক করাল
কারে দাও ডাক,
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

* * *

৩। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।

* * *

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্র-নাদ।

* * *

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া
ঝড় তাহারে দিল তাড়া;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণ-কিরীট ফেলে দিল অস্ত পারে,
বজ্র-মাণিক দুলিয়ে নিল গলার হারে।

* * *

একপারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া;
অন্যপারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিলে যায় চন্দ্রলোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে,
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া,
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়॥

* * *

বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি'
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে
অঙ্গে তা'র পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ॥

(ইন্দিরাদেবীর সঙ্কলন)

*   *

কালি সব চেয়ে কালো—কিন্তু জগতের সকল মনের আলোর নিদান।

*   *   *   *

একজন ইংরেজ-মহিলা বলেন—কোন মানুষই তার প্রেমাস্পদ কালো হোলে তাকে সাদা বলেন মোটা হোলে তাকে কাটির মতন দেখে না, মাথায় কটা চুল থাকলে তাকে কালোচুল বোলে ভ্রম করে না। সে যা তার জন্যেই প্রেমিক তার প্রেমপাত্রকে ভালোবাসে, সে যা নয় তার জন্যে নয়। সে জানে যে তার কালো বঁধু গৌর নয়—তবে সে ঐ কালোর ভেতর এমন কিছু দেখে যার কাছে জগতেও কাঁচা সোনা বা আর কোন রংই দাঁড়াতে পারে না—সে তার প্রেমাস্পদের সাদাসিধে মুখকে তিলোত্তমার মুখ মনে করে না, তবে সে ঐ সরল মুখখানিতে যা দেখে তাতে তার প্রাণ জুড়িয়ে যায়, সে জানে পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর মুখের বিরুদ্ধে সে সেই মুখখানির জন্যে যুদ্ধ কোরতে পারে। প্রেম খুঁৎকে উড়িয়ে দেয় না—তাকে শ্রী-যুক্ত কোরে দেখে। প্রেম কেবল একমাত্র জায়গায় অন্ধ। সে হোলো সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার প্রেমের ক্ষেত্রে।

*   *   *   *

নিজের মরার খবর নিজে পড়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। গত আশ্বিনে বরোদার মহারাজার সে সৌভাগ্য ঘটেছিল। তাঁর এক কুমারের অকাল মৃত্যু তাঁর মৃত্যু-সম্বাদে পরিণত হয়ে বিলাতের বড় বড় কাগজে লম্বা লম্বা প্রবন্ধের কারণ হয়েছিল।

মার্ক টোয়েনের জীবদ্দশায় একবার তাঁর পরলোকবাসের খবর ছাপা হয়েছিল। মার্ক টোয়েন সব কাগজে লিখে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুসম্বাদ অতিরঞ্জিত।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

আমেদাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলন

এ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ই, ১০ই ও ১১ই তারিখে আমেদাবাদে একটি সঙ্গীত-সম্মেলন হয়েছিল। ভাতখণ্ডে মহোদয়কে এ সম্মেলনের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন যে এরূপ সম্মেলনে তাঁর নিমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যেতে পারেন না, যেহেতু এটি হচ্ছে একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত-সম্মেলন, নিখিল ভারতীয় সম্মেলন নয়। বস্তুতঃ এ সম্মেলনটি বম্বের খ্যাতনমা বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয়ের দ্বারাই আহূত হয়েছিল। ভাতখণ্ডে মহোদয় বল্‌লেন যে এ সম্মেলনে কাজে কাজেই বিষ্ণুদিগম্বরের একাধিপত্য না মেনে নিলে হবে না, তাঁর স্বরলিপি পদ্ধতির অনুমোদন না করলে চল্‌বেনা, মুখ্য বিষয়গুলিতে তাঁর মতে সায় না দিলে আলোচনাদিতে যোগদান করা যাবে না। তাছাড়া এ সম্মেলনে বড় বড় গায়ক বড় একটা কেউই আস্‌বে না। বিভিন্ন প্রদেশস্থ গায়ক বাদক যারা আস্‌বে তারা অধিকাংশ স্থলেই বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয়ের ছাত্র। কাজেই এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ধর্ত্তে গেলে তাঁরই পদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রণালীর নমুনা জাহির করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কথাগুলি শুনে তখন বড় দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে গিয়ে দেখলাম যে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, যদিও খানিকটা সত্য বটে। কারণ ভারতবর্ষের দুই একজন বড় গাইয়ে বাজিয়ে যে আসেন নি এমন নয়।

একটি থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে গান বাজনার আসর হয়েছিল। টিকিটের মূল্য যথেষ্ট করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোক হয়েছিল প্রচুর। আমেদাবাদে দেখা গেল ওস্তাদী গানবাজনার কিছু আদর আছে। গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্থানী গানের যথার্থ সমজদার খুব বেশী না থাকলেও হিন্দুস্থানী গানের আদর আমাদের বাংলা দেশের চেয়ে বেশী। বাংলাদেশে কীর্ত্তন, বাউল ও অধুনাতন কবিত্বময় বাংলা গানের ছড়াছড়ির দরুণই বোধহয় হিন্দুস্থানী গানের আদর ঐ সব দেশের চেয়ে কম। এ কথাটা অবশ্য জোর করে বলা চলে না তবে মনে হয় যে নিম্নতর শ্রেণীর গান—যেমন বাংলা গান—খুব বেশী লোকপ্রিয় হয়ে পড়লে মানুষ সহজে শ্রেষ্ঠতর শ্রেণীর গানের রস গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা কর্ত্তে বড় রাজী হয় না, কেননা দেখাযায় যে সাধারণ মানুষের মন the line of least resistance বা effort এর অনুসরণ করারই সমধিক পক্ষপাতি। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর আর্ট হতে রস গ্রহণ করা সেই পরিমাণে সহজ। কাজে কাজেই মানুষের মন এরূপ আর্ট পেলে তার এর চেয়ে বড় কোনও আর্টের প্রবুদ্ধ রসভোগের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। বাংলা গানের বা অনুরূপ হাল্‌কা গানের সপক্ষে অনেক কথা বলা গেলেও তার বিপক্ষেও নিতান্ত কম কথা বলা যায় না। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় বলে আপাততঃ আমার বক্তব্যের অবতারণা কর্ত্তে চাই।

এ সম্মেলনের আলোচনাদিতে আমি যোগদান কর্ত্তে পারিনি কারণ শুনেছিলাম অধিকাংশ আলোচনাই নাকি গুজরাতী ভাষায় হবে। তাছাড়া আমার নিজের প্রবণতা বেশী করে সঙ্গীতের কলা-কারুর (Æsthetics) দিকে। সঙ্গীতেও কচকচির ও "তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল" রূপ আলোচনা নিয়ে মাথা কাটাকাটি হওয়া যে সম্ভব এ সত্য হয়ত আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। কিন্তু আমার কাছে এ সত্য অগোচর ছিল না বলে আমি ২।৩ ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনার কোড়নে বিহ্বল হয়ে ফিরে এসে, ক্লান্ত মনে আসল সঙ্গীত কলার রসগ্রহণে অপারগ হতে মনকে রাজী করাতে পারিনি। সব-তাতেই সৌষ্ঠবজ্ঞান গুণটি আমাদের অনেক শ্রমের লাঘব করে ও আর্টের ক্ষেত্রে এ জ্ঞান না থাক্‌লে তাকে অনেক সময়েই হাস্যাস্পদ হয়ে পড়তে হয়। কাথিওয়াড়ে এক খুব উচ্চদরের সেতারীর সম্বন্ধে একটি গল্প তাঁর সেতারের রস গ্রহণের বড় কম পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়নি—অন্ততঃ আমার কাছে। একদিন অন্য কোনও গায়কের সঙ্গে ভৈরব রাগে মিড়ে কোমল নি লাগে কিনা এই তর্কে তাঁদের মতভেদ হওয়াতে তিনি তাঁকে তাঁর সেতারের বাড়ি এমন এক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন যে তাতে সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নাকি তখনই হয়ে গিয়েছিল, যদিও এ নিষ্পত্তির "চূড়ান্তত্ব" পরে কতদিন স্থায়ী হয়েছিল সে বিষয়ে দারুণ সংশয় হয়ত অনেকের মনেই উদয় হতে পারে।

তাছাড়া আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে সঙ্গীতের ন্যায় শিল্পের কচকচিতে লোকে অনেক সময়ে একটা উৎসাহের অপব্যয় করে যাবেন যে তার কলাকারু হতে রসোপভোগের জন্য উৎসাহ বড় একটা উদ্বৃত্ত থাকে না। পরমহংসদেব বলতেন যে একজন লোক আম খেতে এসে আম গাছের কয়শো ডাল কহাজার ফল কলক্ষ পাতা—তাতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে শেষটা সে ভুলেই গেল কি উদ্দেশ্যে তার সেখানে শুভাগমন হয়েছিল। সৌষ্ঠব জ্ঞান না থাক্‌লে গৌণ মুখ্যকে অনেক সময়েই অতিক্রম করে ফেলে দেখা যায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আসল যেটা, অর্থাৎ তা'তে রসগ্রহণ,—সঙ্গীতের সম্বন্ধে অফুরন্ত কচকচিতে যে সেটাকে ভুলে যাওয়া অনেক সময়েই একান্ত সহজ হয়ে পড়ে ওটা আমি কোনও কোনও ক্ষেত্রে লক্ষ্য না করেই পারিনি। এখন গান বাজনা সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কিছু লেখা যাক্।

প্র মদিন শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদিগম্বরের শিষ্য, কোল্‌হাপুরের সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, প্রোফেসর বামনরাও পাণ্ডে গাইলেন মন্দ নয়। তবে দু এক মিনিট একটি আড়ানা রাগের বিস্তার কর্ত্তে না কর্ত্তে এত বেশী তান দিতে আরম্ভ করেন যে শেষে আমাদের চিত্ত একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন যদি মিড়, গমক ও অন্যান্য অলঙ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে দেওয়া যায় তবেই তা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আনন্দ দিতে পারে। বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয়ের ছাত্রদের মধ্যে কিন্তু এ সৌষ্ঠবজ্ঞানটির বড় বেশী পরিচয় পাওয়া গেল না। তবে তা সত্ত্বেও পাণ্ডে মহোদয়ের স্বরগ্রাম বেশ শুদ্ধ দেখা গেল—যদিও তিনি হার্মোনিয়মের সঙ্গে যে কেন গাইলেন তা বোঝা গেল না।

উচ্চদরের হিন্দুস্থানী গানের সঙ্গে হার্মোনিয়াম ব্যবহার না করাই ভাল একথা অনেকেই স্বীকার করেন ও ওস্তাদরা প্রায় এক বাক্যে হার্মোনিয়ামের উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁরা হার্মোনিয়াম বাজানোকে প্রায়ই প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন দেখা যায়। এর কারণ, অধিকাংশ ওস্তাদদের মধ্যেই স্ববিশ্বাসে নিষ্ঠা নেই—দুচারজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ছাড়া। উদাহরণতঃ,—এ সম্মেলনের অপরাহ্নের কচকচিতে নাকি স্থির হয়েছিল যে হার্মোনিয়াম পরিত্যাগ করাই বিধেয় কিন্তু কার্য্যতঃ তা পালিত হয় নি।

ইন্দোর থেকে নাজির খাঁ বলে একটি মুসলমান সেতারী এসেছিলেন। তাঁর বেহাগ ও মালকোষ বাজানো ভারি মনোহারী হয়েছিল। তাঁর মধ্যে এমনই একটি দরদ ছিল যার পরশ এক মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী তাঁর সেতার শুনে আমার সেতার-যন্ত্রের উপর শ্রদ্ধা সমধিক বেড়েই গিয়েছিল।

অতঃপর সেদিন মাদুরাবাসী শ্রীপুনস্বামী পিলে "নাদস্বর" বাজালেন। অর্থাৎ, সানাই। কেবল তফাৎ এই সাধারণ সানাই প্রায়ই হৃদয়গ্রাহী, নাদস্বর সানাই উদয়-বিদারী। এত জোর স্বর আমি কখনও শুনিনি। অতবড় থিয়েটার ঘরেও সেদিন আমাদের কর্ণপটহ প্রায় জবাব দেবার উপক্রম করেছিল। তার ওপর তিনি এমনভাবে গণ্ডদেশ ফুলিয়ে তুল্‌লেন ও চক্রাকারে বদনমণ্ডলকে পরিক্রমণ করাতে লাগলেন যে যখন তিনি থাম্‌লেন তখন আমার কবির বাণীর "জ্ঞান গর্ভত্ব" উপলব্ধি কর্লাম যে ঢক্কানিনাদ সুমিষ্টতম হয় তখনই যখন সে বাজে না। নাদস্বর বাজানোর মধ্যে কিন্তু তাঁর দক্ষতা ছিল আশ্চর্য্য রকমের। তবে যাই আশ্চর্য্য তাই শিল্পের মধ্যে গণ্য হতে পারেনা। এ সত্যের যদি কেউ পরিচয় চান তবে পিলে মহোদয়ের নাদস্বর-ভেরী যেন তিনি একটিবার মাত্র শ্রবণ করেন।

তারপর সেদিন কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই ছাত্র একটি জয়জয়ন্তী ও একটি সিন্ধুভার ধ্রুপদ গাইলেন। বিদেশে বিভূয়ে হৃদয়মনক্লান্তকারী তানালাপের আবর্ত্তের মাঝখানে প্রশান্ত ধ্রুপদ অনেকেরই খুব ভাল লেগেছিল। বাংলাদেশের চালে অন্যত্র ধ্রুপদ গাওয়া হয় না। ধ্রুপদের মধ্যে যে একটি গাম্ভীর্য্য আছে সেটি অন্যত্র ধ্রুপদের গমকের অত্যাচারে বড় প্রতীয়মান হয়না। তাছাড়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রদ্বয়ের কণ্ঠস্বর বেশ পরিষ্কার ছিল, যেজন্য ধ্রুপদ গান দুটি আরও জমেছিল।

তারপর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং রুদ্রবীণায় একটি কানাড়া আলাপ করেছিলেন। তিনি এমন দরদ দিয়ে বাজিয়েছিলেন যে প্রথমদিনের গানবাজনায় বোধ হয় তাঁর গুণপনাই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রুদ্রবীণা, রবাব, সুর-আয়না, এস্রাজ প্রভৃতি অনেকগুলি যন্ত্রই সুন্দর বাজাতে পারেন, তবে রুদ্রবীণাতেই তাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। কলিকাতাবাসীর মধ্যে অনেকেই হয়ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাজনা শোনেননি। কিন্তু যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মধ্যে বোধহয় অধিকাংশ লোকেই স্বীকার কর্ব্বেন যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

একজন গুণী ও সত্যকার শিল্পী। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আর একটি মহৎ গুণ ছিল এই যে, সব গায়ক বাদকের মধ্যে কেবল তাঁরই কোথায় থাম্‌তে হয় সে সম্বন্ধে একটা সহজ সৌষ্ঠব, জ্ঞান ছিল। অর্থাৎ অধিকাংশ গায়ক বাদক অত্যন্ত বেশীক্ষণ ধরে একই গান ধৈর্য্যহীনভাবে গেয়ে বা বাজিয়ে তাঁদের গান বাজনার রসভঙ্গ কর্ত্তেই যেন প্রয়াসী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খুব বেশীক্ষণ বাজিয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে অথবা অন্যান্য গায়কদের অতিষ্ঠ করে তোলেননি। প্রত্যেক গায়ক বাদকের যদি এদিকে দৃষ্টি না থাকে তবে এরূপ সম্মেলনে সফলতার আশা বিড়ম্বনা। বক্তৃতা বা গানের আসরে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করা যে উচিত নয় তা সকলেই বোঝেন—কিন্তু সে কেবল আসরের বাইরে। যদি আসরে এসে তাঁরা এ প্রয়োজনিয়তাটি ভুলে না যেতেন তবে সংসারে ট্রাজিডির বাহুল্য অন্ততঃ খানিকটাও ত কম্‌ত। যাঁরা গায়ক বাদকের অনন্তকাল ধরে স্বকীয় গুণপনা জাহিরকরা-রূপ অভ্যাসের খবর না রাখেন তাঁরাই এ ট্রাজিডির গভীরতা ও সত্যতা উপলব্ধি কর্ত্তে বাধ্য। এ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রায় কোনও গায়ক বাদকই তাঁর নির্দ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যেতে অনুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেননি। আমাদের আধ্যাত্মিক দেশে পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং অনিত্য, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এভাবে সচেতন হওয়া অনুচিত বলে কিনা জানিনা। জড়বাদী য়ুরোপে কিন্তু লোকে যখনই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অনুরূপ কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তখনই তারা প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট সময় লঙ্ঘন করা সম্বন্ধে সচেতন থাকে।

প্রথম দিনের আসরে শেষ গায়ক ছিলেন সাঙ্গলী দরবারের রাজগায়ক গুঁড়ুগুবা। এ নাম পড়ে আমরা যে খুব গম্ভীরাননে বিরাজ কর্ত্তে পারিনি সে কথা বোধ হয় বিশেষ করে লেখার প্রয়োজন নেই। এ নামটি পড়বার সময় আমার মনে হয়েছিল যে নাম জিনিষটির শ্রুতিমধুরত্ব বা শ্রুতিকটুত্ব অন্য লোকের পক্ষে যদিবা একটা অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর ক্ষেত্রে তা গুরুতর না হওয়া কঠিন। ধরুণ বঙ্কিমচন্দ্রের নাম যদি হিড়িম্বচন্দ্র হত, রবীন্দ্রনাথের নাম যদি গোবর্দ্ধনচন্দ্র হত, বা নিরুপমা দেবীর নাম যদি জগদম্বা হত তাহলে এঁদের বই পড়ার সময়ে আমাদের যে প্রায়ই এ বেখাপ্পা নামের অসঙ্গতি কর্ণপটহে আঘাত করত এমন কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

ভাগ্যক্রমে গুঁড়গুবা মহোদয় তেমন কিছু বড় রকমের গায়ক ছিলেননা। ইংরাজ অ্যাডিসনের জীবনীতে পড়া গিয়াছিল যে বড় লোকের সামান্য ত্রুটিও সাধারণের কাছে অমার্জ্জনীয় হয়ে ওঠে ও পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু যেহেতু গুঁড়ুগুবা মহোদয়ের গান-শক্তি অভ্রভেদী ছিল না সেহেতু অনেকেই তাঁর নামটির ত্রুটি মার্জ্জনা করেছিলেন।

গুঁড়ুগুবা মহোদয়ের একটি ত্রুটি ছিল কিন্তু এতই শ্রুতিকটু যে সেটি তাঁর নামের শ্রুতি মাধুর্য্যকেও ছাপিয়ে আমাদের রসগ্রহণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বসন্তরাগ আলাপে তারসপ্তকের শীর্ষদেশে আরোহনকরার এমন গলদঘর্ম্মকারী প্রয়াস পাচ্ছিলেন প্রথমটায় আমাদের মনে তাঁর এ স্বরভঙ্গকারী উল্লম্ফনে একটু সহানুভূতির উদয় হলেও তাঁর

পুনঃপুনঃ প্রয়াসে শেষটা আমরা হতাশ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাদের গায়কেরা প্রায়ই দুরারোহ স্বরগ্রামে পৌছনকে মহা বাঞ্ছনীয় মনে করে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে এরূপ হৃৎস্তম্ভন কারী, ভগ্নস্বরবহুল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ধনুষ্টঙ্কার-প্রজ্ঞাপক বিফল প্রয়াসে গানের সৌষ্ঠব বাড়তে পারে না। কিন্তু তাঁর অসম্ভব উচ্চস্বরে আরোহণ করার ব্যর্থপ্রয়াসে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে হাসির হর্‌রা পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি যে তাতে অনুমাত্রও বিচলিত হলেন না এইটেই আমাদের অনেকের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল।

দ্বিতীয়দিন এক হিন্দুস্থানী ব্যাণ্ড ছিল। কিন্তু এ ব্যাণ্ডের মধ্যে গান্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কেন যে হার্মোনিয়ামকে রেখেছিলেন সেইটে ঠিক্ বোঝা গেল না। ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতে হার্মোনিয়ামকে স্থান দেওয়া শুধু যে অসমীচীন তাই নয়, গর্হিত। দুঃখের বিষয় যে বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয় তাঁর খ্যাতনামা গান্ধর্ব্ব মহাবিদ্যালয়েও হার্মোনিয়ামকে বর্জ্জন করেননি।

অতঃপর বোম্বাইবাসী দিগম্বরশিষ্য বাবুরাও গোখলে মহাশয় দুই একটি গান করলেন। এঁর গলাটির Quality ভাল না হলেও অমিষ্ট ছিলনা। তাই এঁর তানালাপ প্রথম প্রথম মন্দ লাগ্‌ছিল না। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি সে তানের বহর এতই বাড়িয়ে ফেল্‌লেন যে হৃদয়মনের ক্লান্ত হয়ে না পড়েই উপায় ছিলনা। বিষ্ণুদিগম্বর মহোদয়ের ছাত্রদের এই ত্রুটির কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। গানে যে ভাল চালের (style) প্রয়োজনীয়তা অন্য কোনও প্রয়োজনীয়তার চেয়েই কমনয় এ সত্যটি উপলব্ধি না কর্লে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই।

তারপর গুজরাত সাহিত্যসভার স্ত্রী-বিভাগদ্বারা গরবা গান নির্ব্বাহিত হয়েছিল। "গরবা" হচ্ছে গুজরাতের বিশিষ্ট সঙ্গীত—ও স্ত্রী-সঙ্গীত। গুজরাতী রমণীরা একত্রে চক্রাকারে পরিক্রমণ করে নৃত্যভঙ্গীতে করতালি দিয়ে গুজরাতী ভাষায় বেশ সহজ সরল সুরে গরবা গান করে থাকেন। এ গানের মধ্যে সত্যকার কলা-কারু আছে, যেহেতু এ সঙ্গীতের মধ্যে একটা সহজ স্ফূর্ত্তি আছে। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র লিখেছি, কাজেই এখানে গরবার গুণকীর্ত্তনে আর অধিক সময় দিতে চাই না। কেবল এখানে এইটুকু বলে রাখি যে লোক—সঙ্গীতের মধ্যে কতখানি সৌন্দর্য্য থাকৃতে পারে তার যিনি পরিচয় পেতে চান তিনি যেন গুজরাতে গিয়ে "গরবা" শোনেন।

এরপরে আমাকে খান দুই গান কর্ত্তে হয়েছিল।

অতঃপর কোন রাজসভা হতে শ্রীগোবিন্দরাও বুরানপুরকর মৃদঙ্গ বাজালেন। একজন হাতে তাল দিয়ে গেলেন ও পুরকর মহাশয় বিচিত্র বোল সহকারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে চল্‌লেন। এমন সুন্দর মৃদঙ্গ বাজানো আমি কখনও শুনিনি। মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীর ধ্বনি সেদিন থিয়েটার হলে বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

নানা ভাবে মুগুর ঘুরিয়ে তারা সঙ্গীতকে এমন কুস্তির আখ্‌ড়ায় পরিণত কর্ল যে হাস্‌ব না কাঁদব ঠিক্ ভেবে পাওয়া গেলনা। এ ড্রিলের মধ্যে মাঝে মাঝে যে ছেলেদের দ্রুত ভঙ্গীতে আমোদ ছিল না তা নয়, কিন্তু তারা এত বেশীক্ষণ সময় নিল যে শেষটা আমরা অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

অতঃপর আমেদাবাদবাসী গোবিন্দরাও পাণ্ডে মহোদয় সেতার বাজালেন। তবে তাঁর দুই একটি মুদ্রাদোষ ছিল বলেই হোক্ বা গ্রামবাসী যোগীর ভিক্ষাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অল্প বলেই হোক্ তাঁর বাজনার সময়ে শ্রোতৃবৃন্দ যেন কৌতুকচঞ্চল হয়ে পড়ল। পরে শুনেছিলাম যে ইনি নাকি বড় ক্রোধন স্বভাব, তাই লোকপ্রিয় নন। কিন্তু সে জন্য সেদিন শ্রোতৃবৃন্দের চাঞ্চল্য ও গোলমাল অন্ততঃ আমার কাছে সুষ্ঠু বলে মনে হয় নি। কারণ পাণ্ডে মহোদয় বাস্তবিকই সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাল বাজিয়ে।

তারপর মহম্মদ ইস্‌মাইল খাঁ জিলফ সুরে একটি তেলেনা গাইলেন। সুরটি বড় মিষ্ট লেগেছিল। পড়ে বরোদায় এ গানটি আর একটি রাজগায়কের মুখে শুনেছিলাম। পারস্যদেশ হতে নাকি এ সুরের আমদানী। কিন্তু যে দেশ থেকেই এ আমদানী হয়ে থাকুক আমরা যে একে নিজস্ব করে নিয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। উত্তর ভারতের অনেক সুরের মধ্যেই পারস্যদেশের দান আছে, অন্যান্য মুসলমানের সৃষ্টি আছে। দক্ষিনী-সঙ্গীত (কর্ণাটকী সঙ্গীত) শুন্‌লে এ দানের কথা বোঝা যায়।

তৃতীয় দিন আলোয়ারের সভাগয়ক সুপ্রসিদ্ধ কালোয়াত সঙ্গীতরত্নাকর আল্লাবন্দে খাঁ ধ্রুপদ গাইলেন। বর্ত্তমান সময়ে নাকি উদয়পুরের সভাগায়ক জাকরুদ্দীন খাঁ ও তস্য ভ্রাতা আল্লাবন্দে খাঁ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী। এ তালের ধ্রুপদ নাকি আর কোথাও পাওয়া যায় না।

এ ধ্রুপদ আলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এতে গমকের প্রাচুর্য্য।

এরূপ হৃৎস্তম্ভনকারী গমক আমি কখনও শুনি নি। এর মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য আছে বটে কিন্তু বড় একঘেয়ে ও সুরের কোনও বালাই আছে বলে মনে হ'লনা। মিষ্টত্ব ও আর্ট হিসেবে বাংলাদেশের ধ্রুপদের বাইরে নাম আছে।

আমারও মনে হ'ল যে খাঁ সাহেবের অভ্রভেদী নাম সত্ত্বেও তাঁর ধ্রুপদে বাংলাদেশের ধ্রুপদের মত আর্ট তত নেই, আছে নৈপুণ্য। তাছাড়া তাঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল না ও মুদ্রাদোষ এতই বেশী ছিল যে তাতে নিরপেক্ষ রসগ্রাহীর রসগ্রহণের সহায়তা মোটেই হয় নি। এ সভার কোনও বাজিয়ের অতি হাস্যকর মুদ্রাদোষ দেখে যখন সে সময়ে সভার মধ্যে হাসির হর্‌রা পড়েছিল তখন আমার পার্শ্বোপবিষ্ট একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত সরল বিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তাঁর উদ্দেশ্য কি লোককে হাসানো! আমাদের সঙ্গীতে বিসদৃশ ও হাস্যকর মুদ্রাদোষ-বাহুল্যের সঙ্গে যার পরিচয় আছে, এ প্রশ্নটির সারল্যে তাঁর চোখ ফোটা

তাতে যে কলাকারুর হানি না হয়েই পারেনা। সরল বালকের এ প্রশ্নে একথা আমার বিশেষ করেই মনে হয়েছিল।

খাঁসাহেবের গান পরে আরও একদিন এক কোটিপতির বাড়ীতে শোনবার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি মুগ্ধ হতে পারিনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ চালের গান লোপ পেতে বসেছে তাতে দুঃখ বোধও কর্ত্তে পারিনি। খুব কম লোকই বোধহয় এ গানের নমুনা শুনে এর বিরলতার দুঃখবোধ করবেন। সঙ্গীত যে মল্লযুদ্ধ নয়, তা যে মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতির অভিব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে। অবশ্য অনভিজ্ঞের কাছে মনোজ্ঞ তান-বিস্তারও হয়ত অনেক সময়ে অ-সুন্দর মনে হতে পারে ; তাই সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশ মাত্রই যে সকলের মনে সাড়া দেবেই দেবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। গানের মধ্যে নিহিত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্ত্তে হলে ভাল গান বাজনা শোনা একটু অভ্যাস কর্ত্তে হয়। ভাল শিল্পীর পুনঃপুনঃ পরিচয়ই তার রসবোধের একমাত্র শিক্ষা। তাই আমি একথা বল্‌তে চাইনা যে উচ্চ সঙ্গীত সকলেরই ভাল লাগতে বাধ্য। তবে একথা বোধ হয় বলা যায় যে মানুষ শিল্পে অলঙ্কারকে এমন বাড়িয়ে ফেলতে পারে যাতে তার গাম্ভীর্য্য ও গরিমা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাবন্দে খাঁর মল্লযুদ্ধ দেখে আমি কথাটি আরও ভাল করে উপলব্ধি করেছিলাম। তাঁর নাদপ্রধান গমকের প্রাচুর্য্য ছিল এতই বেশী যে তা বেসুরো বলে মনে না হয়েই উপায় ছিল না। পরে একজন খুব বড় ওস্তাদের কাছে শুনেছিলাম যে খাঁ সাহেবের সুরের জ্ঞান বাস্তবিকই কম। কিন্তু এক ওস্তাদ সচরাচর অপর ওস্তাদকে প্রশংসা করেন না বলে শেষোক্ত ওস্তাদের এ কটাক্ষে কোন আস্থা স্থাপন না করাই বোধহয় ভাল। তাই আমার মনে হয় যে খাঁ সাহেবের গান আমার কাছে বেসুরো শুনিয়েছিল এ সরল সত্যটি বলাই শ্রেয়ঃ

মোটের উপর আমেদাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে শিক্ষনীয় যথেষ্ট ছিল, যদিও উপভোগ্য সঙ্গীত বড়ই কম ছিল। শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে একটি তথ্য ছিল এই যে আমাদের দেশে গায়কের মধ্যে ওস্তাদ যেমন কম, ওস্তাদের মধ্যে শিল্পী তার চেয়েও কম। আবদুল করিম শেষণ, আচ্ছা বাই, হাফেজ আলি খাঁ প্রমুখ দুচার জন মাত্র সত্যকার স্রষ্টা আজ বিদ্যমান। বাকী সব ওস্তাদদের মধ্যে আছে বেশীর ভাগ মুদ্রাদোষের অতিচার, তানালাপের ব্যভিচার ও সঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যের অপচার। কথাটা হয়ত একটু বেশী কঠোর শোনাতে পারে কিন্তু তাহলেও কথাটি সত্য। সমগ্র ভারত ঘুরে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা আজ মুমূর্ষু—অর্থাৎ সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকার শিল্পের অবস্থা। অশিক্ষিত পেষাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারেনা এসত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই।

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

গান্ধি-অভিজ্ঞান

সত্য, দৃঢ়তা, তেজ, ক্ষমা, বিনয়, সরলতা ; ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ; প্রেম, অলোভতা।

[কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ পত্রের ব্যবহারজীবী, বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ সম্পাদক কথোপকথনক্রমে বলিলেন "নিজের জীবিতকালে মনুষ্যহৃদয়ের উপর এতদূর প্রভুত্ব গান্ধি ছাড়া আর কোন মহাপুরুষের হইয়াছে বলিয়া জানিনা। বিবেকানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ স্বামী প্রভৃতি গান্ধির সমান ওজনের লোকদের কথা ত ছাড়িয়াই দিতেছি, চৈতন্য দেব ও গুরু নানকের স্তরের ভারত-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদেরও ধরিবনা, বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টের মত জগৎ-ধর্ম্ম-প্রচারকদের সঙ্গে তুলনা করিলেও দেখিতে পাই শেষোক্ত মহা-পুরুষেরাও জীবদ্দশায় এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই। তাঁহাদের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে ধীরে ধীরে তাঁহাদের প্রভাব জগতে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও দেখিতেছি গান্ধির অতুল্য প্রভুত্ব লোকের হৃদয়ের উপরে মাত্র, জীবনের উপরে নহে। অগণ্য লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু অল্পাদপি অল্প লোকে তাঁর মতের অনুসরণ করিয়া চলে। তার একটি প্রধান কারণ এই যে তাঁর মতগুলি ধারাবদ্ধভাবে কোথাও পায় না।"

গান্ধির মত, অর্থাৎ গান্ধি যে সত্য প্রচার করিতেছেন তাহা চিরসত্য, একালে গান্ধিমুখী হইয়া তাহা নিঃসৃত হইতেছে মাত্র। নিরালম্ব সত্য যদি কোন শরীরী মানুষের অবলম্বন পায় তবে তাহা অপর মানুষের সহজে গ্রহণ যোগ্য হয়। চরখা-প্রীতিটা তাঁর ব্যক্তিগত সাময়িক বিশেষত্ব মাত্র, তাঁর বাকী অনুভূতি ও উক্তিগুলি যে নিত্য কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের উৎস হইতে প্রসূত, যার জোরে তাঁর জোর,—সেগুলির সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শের জন্য, গান্ধি-শক্তিকুণ্ডে অবগাহনজনিত শক্তিলাভের জন্য 'গান্ধি-অভিজ্ঞান' পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। ভাঃ সং]

আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছি কারণ আমার "স্বদেশী" বোধ আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে যে এই দেশে ইহারই সভ্যতার সংস্কার লইয়া যখন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন এই দেশেরই সেবা করিবার আমি উপযুক্ত পাত্র, এবং আমার সেবার উপর এ দেশেরই সর্ব্বপ্রধান দাবী রহিয়াছে। কিন্তু আমার স্বদেশীতা বর্জ্জনশীল নহে ; অন্য কোন জাতিকে আঘাত করিবার ভাব ইহাতে নাই—উপরন্তু

অন্যান্য জাতিকে যথার্থভাবে উন্নতির পথে সাহায্য করা ইহার অঙ্গ। আমি যতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি—ভারতের স্বাধীনতা অন্যের অবনতির কারণ হইতে পারে না।

* * *

ভারতের স্বাধীনতা যদি অন্যের হানিজনক না হয় তবে কাজে কাজেই তাকে অর্জ্জন করিবার উপায়টি দ্রোহহীন হইতে বাধ্য। ভারত যদি দ্রোহপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে—তবে তার স্বাধীনতা অর্জ্জনের সহিত আমার আর কোন সম্পর্ক থাকিবেনা,—কারণ সে পথে প্রকৃত স্বাধীনতা আসিবে না। ছদ্মবেশী দাসত্বই আসিয়া দেখা দিবে।

* * *

যদি আমরা বলি যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন বিশেষ সময় পর্য্যন্ত আমরা অহিংস পথে চলিব—তবে অন্ততঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সেই বিশিষ্ট সময় পর্য্যন্ত আমাদের চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য তিনেতেই পূর্ণভাবে অহিংস থাকিতে হইবে।

* * *

জ্ঞাতসারেই হউক কিংবা অজ্ঞাতসারেই হউক—আমরা অধিকাংশ লোকেই আমাদের পণ পূর্ণভাবে রক্ষা করি নাই। আমরা আমাদের বিপক্ষ দলের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছি।

* * *

আমাদের স্বদেশবাসীদের মন আমাদের উপর অবিশ্বাসে ভরাট হইয়া গিয়াছে, আমাদের নিরুপদ্রবতার উপরও তাদের কোন আস্থা নাই। বিভিন্নস্থানে হিন্দু-মুসলমানগণ নিরুপদ্রবতার পরিবর্ত্তে উপদ্রবতার পরিচয় দিয়াছে, এমন কি পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ও বিরুদ্ধবাদী উভয় দল পরস্পরের মুখে কাদা ছুড়াছুড়ি করিয়াছেন, উভয়েই মনে করিয়াছেন যে তাঁদের পক্ষে অখণ্ড সত্য বর্ত্তমান এবং একটা অন্ধ বিশ্বাসে তাড়িত হইয়া একদল অপর দলকে বিষম নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভৎর্সনা করিয়াছেন।

* * *

ক্ষতি স্বীকার করিয়া কিংবা বিজ্ঞাপনের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া পত্রিকা চালাইবার পক্ষপাতী আমি নহি। যদি দেশের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে তবে পত্রিকা আপনার ব্যয় আপনি নির্ব্বাহক্ষম হইবে।

* * *

যদি পুরাতন পাঠকদের ব্যক্তিগত ভালবাসা আমার উপর পূর্ব্ববৎ থাকে—তবে ইহা সুনিশ্চিত যে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্র বিনাক্লেশে সত্বর সাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবে।

* * *

নূতন ইয়ং ইণ্ডিয়া কোন নূতন পন্থা ধরিবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস ইহার লেখা বাসি লাগিবে না। সত্য যেদিন বাসি হইবে সেদিন ইয়ং ইণ্ডিয়াও বাসি হইবে।

* * *

কাউন্সিল-বয়কট, এবং ভিতরে থাকিয়া দায়িত্বমূলক সহযোগিতা, এই দুয়ের মধ্যে তৃতীয় কোন পন্থা বর্ত্তমান নাই। যদি কাউন্সিল-বয়কট-নীতি পরিত্যক্ত হয়—তবে নন-কো-অপারেশনের শিক্ষানুযায়ী, কাউন্সিল যন্ত্রটীকে দেশের গঠনমূলককার্য্যের জন্য সরলভাবে ব্যবহার করাই পরবর্ত্তী পন্থা। ধ্বংসাবতার হইয়া দোষ-গুণ বিচার না করিয়া সকল কার্য্যকেই বাধা দেওয়া—নন-কো-অপারেশনের পক্ষে বর্ব্বরতা এবং নীতি-জ্ঞান হীনতার পরিচয়।

কোন ছোট এবং বিশেষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র একটী তালুকের সংঘবদ্ধভাবে সত্যাগ্রহ যখন ফলপ্রদ হইয়াছে তখন দৃঢ়মূল বিপুল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরাট সত্যাগ্রহের আয়োজন করাও নিশ্চয় সম্ভবপর, কেবল মাত্র চাই একদল প্রচণ্ড কর্ম্মী—নিজেদের লক্ষ্য ও পথের উপর যাহাদের দুর্দ্দমনীয় দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবে।

* * * *

আমরা প্রত্যেকে যদি অকপট ভাবে নিজের নিকট নিজে স্বীকার করিয়া বলিতে পারিতাম—"আমি তুচ্ছ" তাহা হইলে কত সুখের বিষয় হইত। তবে আমরা সহকর্ম্মী ও সহসেবক হইতে পারিতাম, যশ এবং আধিপত্যের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না পোষণ করিয়া তখন আমাদের মধ্যে—কে কত বেশী কার্য্য করিতে পারে—তারই একমাত্র প্রতিযোগিতা চলিত। তখন স্বরাজ পাওয়া ও তাহাকে রক্ষা করা একটুও কষ্টকর হইত না। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি তখনই আসিয়া সমুপস্থিত হয়—যখন সবাই নেতা হইতে এবং উপদেশ দিতে চাহে—কার্য্য করিতে কেহই স্বীকৃত হয় না।

* * *

আমি জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নার্থ উপরিলিখিত চিঠি প্রকাশ করি নাই। কারণ এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং কয়েদীগণেকে শাস্তি দেওয়া তাদের স্বেচ্ছাকৃত নহে। সমস্ত দোষ জেল বিভাগের বিধি-প্রণালীর।

আমি ইহাকে পূর্ব্বেই হৃদয়হীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। সরকার যখন এইসব সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া বসেন কিংবা সত্যকে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করেন সেইখানেই অন্যায় আরও বেশী করিয়া প্রকাশ পায়।

* * *

কংগ্রেসের গত দুই বৎসরের ইতিহাস পড়িবার অবসরও যদি আমি পাইতাম—তবু আমি আমার সহকর্ম্মীদের কার্য্যপদ্ধতির সমালোচনা ও তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতাম। ঘটনা ঘটিয়া গেলে বুদ্ধিমান সহজেই হওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া সেইরূপ সহজ নহে।

* * *

কাউন্সিল-বয়কটের পক্ষেই হউন কিংবা বিপক্ষে হউন কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মীদের দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও স্বদেশ প্রেমের উপর আমার পূর্ব্ববৎ যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। সরলভাবেই নিজেদের মধ্যে এই মতানৈক্য হইয়াছিল।

আমরা যে রকম আছি—সেই রকম যতদিন থাকিব এই জাতীয় মতান্তরও ততদিন থাকিবে। আমার মতে বাহ্যিক একটা ঐক্য এবং মিলনের জন্য মানুষের স্ব স্ব স্বাধীন মতামত বিসর্জ্জন না দেওয়া স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

* * *

সমভাবে নিয়মের ব্যতিক্রম না করিয়া চলিলে বিপুল বাধা, কুসংস্কার ও সন্দেহ আপনা হইতেই সরিয়া যায়—আমার বহুক্ষেত্রে উপলব্ধ এই সত্যের উপর জোর দিবার জন্যই আমি এই কথা বলিয়াছি।

* * *

ইংরেজ কর্ম্মচারীদের বৃহৎ কর্ত্তব্যবোধ আছে। তবে সাধারণ কর্ম্মচারীদের সাধুতা তাদের রাষ্ট্রনীতিকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারেনা। ইহা তাহাদের দোষ নহে, বংশানুক্রমে যে পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে—সে মাত্র তাহারই উত্তরাধিকারী—সে পদ্ধতি সবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের শোষণ-নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সেই পদ্ধতির পাশে তাহারা আবদ্ধ। তাই সঙ্কটকালে ইংরেজ কর্ম্মচারীর ব্যক্তিগত সাধুতার পতন হয়।

* * *

আমি পূর্ব্বে জানিতাম না—মিঃ এণ্ড্রুজ আমাকে বলিলেন যে মালাবারের সিরীয়ান খৃষ্টানেরাও অস্পৃশ্যতা বজায় রাখিয়াছে। এই খবর শুনিয়া হিন্দু হইয়া আমি লজ্জায় মাথা হেট না করিয়া পারি নাই। কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে হিন্দুদের অনুকরণ করিয়াই এ দোষ তাহাদের ভিতর গিয়াছে।

* * *

সত্য এবং অহিংসাই আমার লক্ষ্য এবং ইহাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা আমার উদ্দেশ্য, আমার ভুল হইতে পারে স্বীকার করি, কিন্তু আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বন্ধুবান্ধবের মঙ্গল কামনা করিব এবং যতদিন আমার লক্ষ্যকে আমি সর্ব্বোত্তম বলিয়া মনে করিব ততদিন স্বতঃই আমার মনে এই ইচ্ছা উদয় হইবে যে তাঁহারাও আমার মত এই আদর্শতে বিশ্বাস স্থাপনা করুন। আমার আদর্শকে ফলবান করিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ আছে বলিয়াই আমি হিন্দুত্বের বেষ্টনীর মধ্যেই রহিয়াছি।

* * *

হাজার হাজার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির এই বিশ্বাস যে—কোন মানুষ যতই সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হউক না কেন—তার যদি যীশুখ্রীষ্টতে বিশ্বাস না থাকে তবে সে যে কোন খৃষ্ট-বিশ্বাসী অধম পাপীর চেয়েও অনেক হীন। গোঁড়া হিন্দুও কি এরকম ভাব প্রকাশ করেন না? যদি তাঁর মনে এরকম ভাব স্থান না পায়—তবে শুদ্ধি আন্দোলনের জন্য তাঁদের এত চেষ্টা কেন? হিন্দু পিতা তার কন্যার পাত্র নির্ব্বাচন করিবার সময় কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া কেবল সৎ-পাত্রেরই অনুসন্ধান করেন—না তিনি স্বধর্ম্মী কোন সুপাত্রে কন্যাদান করেন? যদি হিন্দু পিতা কেবল স্ব-ধর্ম্মীদের ভিতর হইতে এ নির্ব্বাচন করেন—তবে কি তাদ্বারা এই প্রমাণ হয় না—যে তিনিও মৌলনা সাহেবের মত এই বিশ্বাস পোষণ করেন যে তাঁর নিজের ধর্ম্মমতই জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

* * *

সত্যের মুখে পাথর চাপা দেওয়া হউক—এ আমি চাই না, অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ সত্য প্রকাশ করিতে গিয়া ইতস্ততঃ করে। যথাসাধ্য ভাবে অতিরঞ্জন ও জটিলতা ত্যাগ করিয়া নির্ভীকভাবেই সত্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

* * *

মিঃ ওয়েদারলী এক মস্তবড় প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে অসহযোগ হিংসারই রূপান্তর, একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে একথা কতখানি ভিত্তিহীন। যখন আমরা মদের দোকানে বসিয়া মদ বিক্রয় করিতে স্বীকৃত না হই কিংবা খুনীকে তার দুষ্কর্ম্মের সহায়তা করিতে না চাই তখনই প্রকৃত অসহযোগ আমরা করি। এ আমার বদ্ধমূল ধারণা যে অসহযোগে হিংসাত নাইই বরং ইহাতে প্রেমের স্পর্শ থাকে—যদি ভালবাসা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই অসহযোগ অনুষ্ঠিত হয়। আসল কথা, অসহযোগ মাত্রেই হিংসা নয় এবং অহিংস অসহযোগ ত কখনই হিংসার পথে চলিতে পারে না। তবে সব সময় ইহা ভালবাসা প্রসূত নাও হইতে পারে। রোগীর জন্য কিছুমাত্র ভালবাসা না থাকিলেও চিকিৎসক অতি সুকৌশলে কৃতিত্বের সহিত অহিংসভাবে অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন।

* * *

ইহা স্বত:সিদ্ধ যে যখন ন্যায় ও কর্ত্তব্য বোধে অসহযোগ অনুষ্ঠিত হয়—কতিপয়ের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও, তাহা হিংস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেনা। অন্যায়কারীর সংশোধনকল্পে যদি ইহা অনুষ্ঠিত হয় তবে অসহযোগ প্রেমের কার্য্য বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু ভারতবাসী যে অসহযোগ-পন্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে প্রেমের কোন চিহ্ন নাই—কারণ দুর্ব্বল জাতির আত্মরক্ষার্থেই ইহা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কালের প্রবাহ

সাবধানী সরকারী-মিত্রতা

সিড্‌নি ওয়েব্‌ সাহেব শ্রমিক সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী। বারো বৎসর পূর্ব্বে ওয়েব্‌দম্পতী যখন ভারতপর্য্যটনে আসেন তখন তাঁহারা আমার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের লাগিয়াছিল ভাল। তখনই জানিয়াছিলাম মিসেস্‌ ওয়েব্‌ স্বামীর সর্ব্বতোভাবে সহচরী, তাঁরা দুজনে একই রকম ভাবেন, একই রকম লেখেন—বিলাতের কাগজেও সম্প্রতি এ কথাটা বাহির হইয়াছে। শুধু মনের মাপ নহে, তাঁদের পায়ের মাপও একই। মিসেস্‌ ওয়েব্‌ আমাকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা যখন খুসী যে-যার জুতা পায়ে দিতে পারি। ঠিক এক মাপের পা আমাদের। সেটা আমাদের জীবনযাত্রার মহা সুবিধা।"

শ্রমিক সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যতালিকায় সিড্‌নি ওয়েবের নাম পড়িয়া তাঁহাকে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তৃ-গণের অন্যতম জানিয়া ভারতের প্রতি তাঁর বর্ত্তমান মনের অবস্থা জানিবার ইচ্ছা হইল। সৌভাগ্যের দিনে তাঁদের দল ভারতবাসীর মনুষ্য-আকাঙ্ক্ষার প্রতি উদাসীন হইবেন কিনা, ভাণ্ডারী হইয়া ভারত-সন্তানকে তাদের সহজাত অধিকার যে স্বতন্ত্রতা অন্ন, পার্লামেণ্টের আইনের দ্বারা তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পরিবেশন করিতে কার্পণ্য করিবেন কিনা জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁকে একখানি চিঠি লিখিলাম। সে চিঠির যে উত্তর পাইয়াছি তার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।

প্রিয় মিসেস্‌ চৌধুরী !

আমরা আপনার অভিনন্দন-পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। ভারতের মুক্তির জন্ম আপনার স্বামীর ও আপনার নিজের প্রচেষ্টা আমরা ভুলিব না। আমার ত মনে হয় না যে, শ্রমিকদল ভারতবর্ষ এবং তার স্বরাজ্যের প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন হইবে। কিন্তু কি দেশে, কি পার্লামেণ্টগৃহে উভয় স্থানেই তারা সংখ্যায় অল্প, সুতরাং তাহাদিগকে স্বদেশ ও সাম্রাজ্যঘটিত সমস্ত বিষয়েই ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ যে শেষ পর্য্যন্ত, সে যতখানি স্বরাজ চায়, ততখানিই পাইবে সে-বিষয়ে আমার আদৌ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের নিজেদের স্বরাজ্য স্থাপিত হইতে দুই তিন শতাব্দী লাগিয়াছিল, এবং মাত্র এই ১৯১৮ সালে স্ত্রীলোকদের ভোটের অধিকার দেওয়ার পরে তবে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষকেও সেইরূপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে, যদিও সম্ভবতঃ তার স্বরাজ্য প্রাপ্তির বর্ষগুলি শতকে না পৌছিয়া দশকেই শেষ হইবে।

ভবদীয়

—ওয়েব,

(মিসেস্‌ ওয়েব্‌)

এ চিঠিখানি হইতে দেখা যায় শ্রমিক সরকার দরদী নহেন যে তাহা নয়। কিন্তু অতি-সাবধানী। পলিটিক্সের ময়দানে ঘোড়া বেদম ছোটান তাঁদের অভিমত নহে, ...

টানিয়া, কখনো রাশ ছাড়িয়া বুদ্ধিমানের চালে চলিবেন এটা স্পষ্ট কথা, খানায় পা ফেলিবেন না।

প্রধান সচিব হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ শ্রমিক রাজপুরুষ যে ভারতের প্রতি আন্তরিক মিত্রভাবান্বিত সে বিষয়ে আমি বিশ্বাসহীন নহি। মিত্র হইলেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমার উপকার করিবে এরূপ আশা করা যায় না। মিত্র যে, সে সুযোগ পাইলেই আমার হিতসাধন করিবে এ ভরসা রাখা যায়। তবে সে সুযোগটা এ ক্ষেত্রে গড়ার ভার আমাদেরই হাতে, আমরা যত বেশী স্বয়ং উদ্যমী হইব তাঁদের হাতের জোরও ততই বাড়িবে।

যদি ভারতবর্ষ মিতালির ভরসায় পাত পাড়িয়া বসিয়া থাকে, নিজে উদ্যোগী না হয় তবে খালি পেটেই থাকিবে। আত্মনৈব আত্মানমুদ্ধরেৎ—নিজেই নিজেকে উঠাইবে, তবে মিত্র সরকারও তোমাকে পিছন হইতে ঠেকা দিতে পারিবেন,—নয়ত ঠেকিবে ও ঠকিবে। মহাত্মা গান্ধি নাগপুর কংগ্রেসের অল-ইণ্ডিয়া কমিটীর অধিবেশনে এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেদিন লাজপৎরায়প্রমুখ বড় বড় লিডারগণও দেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশেও প্রবল আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তন্নিমিত্ত কংগ্রেস হইতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অর্থব্যয় মঞ্জুর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। একা মহাত্মা গান্ধি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্রোত ফিরাইয়া দিলেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া পত্রিকাকে করদান বন্ধ হইয়া গেল। পলিটিক্যাল কর্ম্মিগণের কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষই—ইংলণ্ড বা আমেরিকা নহে, ইহাই সকলের মর্ম্মে প্রবেশ করাইলেন। দেশে কিছু করিয়া দেখাইলে বিদেশী শত্রু মিত্র সকলে তোমার সহায় হইবেন—অন্যথা নহে; ভারতবাসীকে নিজের উদ্যমেই স্বরাজ পাইতে হইবে—অন্যের দেওয়ায় নহে—এই কথাটা সরকারস্থানীয় ওয়েব দম্পতীর চিঠিতেও অতি ভদ্রভাবে পাওয়া যাইতেছে।

বেঁচে-মড়া

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আত্মবিভূতির বর্ণনায় বলিয়াছেন তিনি "পৌরুষং নৃষু"। মানুষে যাহা পৌরুষ তাহাই শিব, তাহাই সুন্দর। যেখানে তাহার অভাব সেইখানেই কদর্য্যতা। আজকের সংবাদ-পত্রে পাশাপাশি দুটি চিত্র দেখিয়া হৃদয় বিগলিত ও সংক্ষুব্ধ হয়। মেদিনীপুরের জমিদার সতীশচন্দ্র রায়ের বাড়ী রাত্রি দশটায় ডাকাত পড়িল। ডাকাতেরা দরজা ভাঙ্গিয়া সতীশ বাবুর কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহবাসী সকলে ভয়ে ছাদে পলায়ন করিল। তাঁর স্ত্রী ও দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রও প্রথমে পলায়নপরদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আহত পিতার চীৎকারে পুত্র স্থির থাকিতে পারিল না। কাপুরুষ পরিবারবর্গের নিষেধ না মানিয়া তাদের হাত ছাড়াইয়া সে দৌড়িয়া পিতার পাশে আসিল। ভাবিল না যে একা, শিশু, নিরস্ত্র—পিতার কি সাহায্য করিতে পারে? পিতা যে কাঁদিতেছেন, পিতাকে যে ডাকাতে মারিতেছে,

শুনিবে না, কেউ তাঁর কাছে গিয়া দাঁড়াইবে না ; কেউ তাঁর ব্যথার ব্যথী হইবে না, কেউ তাঁকে রক্ষা করিবে না, সবাই নিজেকে বাঁচাইবে ?

বালকের পিতৃভক্তি তার পৌরুষের রুদ্ধ কবাট খুলিয়া দিল। সে ডাকাতদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বালক দেখিয়া ডাকাতেরা প্রথমটা তাকে শুধু ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিল। বালক গেল না। তখন তার গায়ে তপ্ত লৌহ ছেঁকাইয়া দিল—প্রাণে মারিল না। তাতেও ভক্তিমান পুত্র অসহায় আর্ত্ত পিতাকে ফেলিয়া পলাইল না। এবার তার মাথার উপর এক প্রাণান্তক কোপে ডাকাতেরা তাকে শেষ করিল। তারপর নির্ব্বিবাদে পিতাকে প্রহারের দ্বারা বিগতপ্রাণ করিয়া মাল সম্পত্তি লইয়া দস্যুরা নিষ্ক্রান্ত হইল।

এ বালক মরিয়া অমর হইল। কিন্তু পরিবারের বাকী সব পলাতকেরা—বাঁচিয়া-মড়ারা—জগতে মুখ দেখাইবেন কোন্ লজ্জায় ? আর জমিদারের স্ত্রী ? সে হতভাগিনীকে স্বামীর পাশে আসিয়া ডাকাতদের হাতে মার খাওয়ার অংশ গ্রহণের মনুষ্যত্ব হইতে ভগবান কেন বঞ্চিত করিলেন ?

জঙ্গম ভারত

ভারত চলিতেছে, আর স্থাবর নাই। ভারতের পা যে শূদ্রজাতি—যাহা এতদিন পঙ্গু থাকায় সমস্ত জাতিটা পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল, তাহাও এতদিনে ভাইকোমের রাজপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবার আপাদমস্তক সজীব হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। পা টানিলে মাথাকেও নড়িতে হইবে। ভো ভো জাতির শীর্ষ ভদ্রপল্লীবাসী, প্রমুখ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, ভাল বুঝুন, আপনারাও এখন হইতে স্বতঃই চলুন, নতুবা টানা-হেঁচড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া চলিতেই হইবে।

অনাগম্যতা

শুধু অস্পৃশ্যতা নহে, কেরালার সমস্যা অনাগম্যতা। সেখানকার 'আসারীকে', (সূত্রধর) হিন্দুদের নিকট অন্ততঃ পাঁচ ফিটের ব্যবধানের মধ্যে অগ্রসর হইতে অপারক, আর থিয়াস্ সম্প্রদায়কে সাত ফিট দূরে থাকিতে হয়। চেটমাস্, সুল্যাস্ এবং নয়াদাশ এই তিন শ্রেণী এক ফার্লং কখনো বা তার অধিক সীমানারি মধ্যেও আসিতে পারে না। হাটে ও গ্রামে তাদের পদার্পণ একেবারে নিষিদ্ধ। কখনো কখনো ইহারা মাথায় বোঝা লইয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ "হা হা" শব্দ শুনিয়া দূরে পলাইয়া যায়, কারণ উচ্চহিন্দুগণ যে পথে এই অনাগম্যদের যাতায়াতের সম্ভব সেই পথে যাতায়াতকালে তাদের নৈকট্যে কলুষিত হইবার ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই 'হা হা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন।

হায় দেশ! হায় দেশের শ্রেষ্ঠজাতির পিতৃপরম্পরাগত নিকৃষ্ট বুদ্ধি! হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিন্দুধর্ম্মঘাতী সে দেশদ্রোহী জাতিদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী পূর্ব্বপুরুষ কে না জানি ছিল যে এই প্রথার প্রবর্ত্তনকারী।

পঞ্চমবর্ণ

বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং।" তবে এই পঞ্চমবর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা কোন্ দানবী বুদ্ধিসম্পন্ন মানব ?

জার্ম্মান বিশ্বভারতী

সম্প্রতি জার্ম্মানিতে একটি বিশ্বভারতীর সূচনা হইয়াছে। ডাক্তার রল্ফ্ হফ্ম্যানের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় একটি সুদৃশ্য পর্ব্বতের উপরিভাগে এর্লাঙ্গেন নামক সুন্দর ক্ষুদ্র সহরে এই মহাবিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত স্থানে বহুদিন হইতেই একটি সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাণ্ট, ফিকৃটে, হেগেল, রুকার্ট রণ্ট্গেন প্রভৃতির ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতনামা দার্শনিক, কবি এবং বৈজ্ঞানিক মনীষিগণের স্মৃতি নানারূপে জড়িত রহিয়াছে। এহেন স্থানে অধুনা এই অভিনব বিশ্বভারতীর সৃষ্টি হওয়ায় স্থানটির মাহাত্ম্য যে শতগুণ বর্দ্ধিত হইল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জানি না, ইহা সুদূর প্রাচ্যে প্রথম বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা ভারতসন্তান রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফল কি না ?

এই বিশ্বভারতীর নাম রাখা হইয়াছে "The Akademie Fue, Philosophie" এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানলাভের এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনার যেন একটি কেন্দ্র খুলিয়া যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেন পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিতে পারেন, বক্তৃতার দ্বারা স্বীয় মত প্রচার এবং নানাপ্রকার অনুসন্ধান দ্বারা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারেন। উক্ত স্থানের বাহিরে থাকিয়াও যাহাতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি স্থানীয় মনীষিদের সঙ্গে আলোচনা চালাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে "Die Akademie" নামে জার্ম্মান, ইংরাজী, ফরাসী এবং লাটিন এই চারি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত একটি পত্রিকা প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিশ্বভারতীতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যাপক সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আমেরিকা হইতে ডাক্তার ম্যাকডুগাল, চীন হইতে ডাক্তার চাঙ্গ ও ডাক্তার লিউ, জাপান হইতে অধ্যাপক ডাক্তার ইনোয়ে এবং ভারতের আলিগড় হইতে অধ্যাপক ডাক্তার হাসানকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের একত্রবাসের এবং তাহা হইতে নানারূপ সুবিধার সৃষ্টিকল্পে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। উক্ত বিশ্বভারতী ভারতীয় ছাত্রগণের নানাপ্রকার সুবিধার জন্য বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। এমন কি উক্ত স্থানে থাকিয়া ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে শিল্প, বাণিজ্যাদি সম্পর্কিত শিক্ষালাভেও সমর্থ হন তাহারও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতবাসী যে কেহ ভারত-প্রতিনিধি অধ্যাপক ডাক্তার হাসান মহাশয়কে "Akadamic Auf dem Burgerg, Erlangen, Germany" এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই যে কোন সংবাদ জানিতে পারিবেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য

বাঙ্গালীর ছেলের বেকার সমস্যার নিষ্পত্তিকল্পে প্রায় উনিশ বৎসর পুর্ব্বে আমি 'হিন্দুস্থান ফার্ম্ম' নামে একটি কৃষি ফার্ম্ম খুলিয়া দিয়াছিলাম। গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে জমি লইয়া 'সুহৃদ সমিতি'র পনেরোবিশটি ছেলের হাতে ভার দিয়াছিলাম। সে ফার্ম্ম ছেলেদের পক্ষে লাভজনক হইয়াছিল, কিন্তু রাজনৈতিক উৎপাতে তাহারা উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 'সুহৃদ সমিতি' ছাড়িয়া দিলে জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য সেই জমির মূল্য অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় জমিদার নূতন পত্তনটি দিবার সময় অনেক লাভবান হইয়াছেন শুনিতে পাই।

এখন আর একটি প্রস্তাব আমার সম্মুখে উপনীত হইয়াছে। আমি সর্ব্বসাধারণের বিচার জন্য তাহা উপস্থিত করিতেছি। পশু ও লাঙ্গলের দ্বারা চাষের অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক কলের দ্বারা চাষ করিলে একই সময়ে বহুশতগুণ ফললাভ হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক চাষে খরচ সময় ও পরিশ্রমের কিরূপ লাঘব হইতে পারে সে বিষয়ে যে একটি ষ্টেটমেণ্ট পাইয়াছি তাহা নীচে দিতেছি :—

সাধারণ লাঙ্গল দ্বারা চাষ

একখানা লাঙ্গলে একবৎসরের কার্য্যকালে ২০ বিশ বিঘা জমির অধিক চাষ করিতে পারে না। প্রতি লাঙ্গলে ৩টী গরু ও ১½ জন লোক আবশ্যক হয়। সাধারণ লাঙ্গলে ৩।৪ ইঞ্চির বেশী গভীর চষা যায় না। ২০০০ দুই হাজার বিঘা জমি চাষ করিতে হইলে ১০০ একশত লাঙ্গলে ৩০০ তিনশত গরু এবং ১৫০ জন মজুরের দরকার হয়। প্রত্যেক গরুর মাসিক খোরাকী ১৲ টাকা হারে এক বৎসরের খোরাকী ১২৲ টাকা। তিন শত গরুর এক বৎসরের খোরাকী মোট ৩৬০০৲ টাকা। প্রত্যেকজন মজুরের মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা হারে এক বৎসরের বেতন ১৮০৲ টাকা। ১৫০ জন মজুরের এক বৎসরের বেতন মোট ২৭০০০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত উহাদের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক খরচ আছে। মোট খরচ ৩০৬০০৲ টাকার মধ্যে গোময়ের মূল্য বাবদ ৬০০৲ টাকা বাদ দিলেও অন্ততঃ ৩০০০০৲ টাকা মোট খরচ লাগিবে। ১৫০ জন মজুর লাঙ্গল চাষ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল কাজ করিবে তাহার মজুরী বাবদ মোট ১২০০০৲ টাকা বাদ দিলেও অন্ততঃ ১৮০০০৲ টাকা শুধু জমি চাষ করিতে প্রয়োজন।

মোটর ট্রাক্টর দ্বারা চাষ—

একটী ট্রাক্টর একবৎসরের কার্য্যকালে ২০০০ দুই হাজার বিঘা জমি চাষ করিতে পারে। এই প্রকার চাষে ১৪ ইঞ্চি গভীর চষা হয়। একটা ট্রাক্টরের বার্ষিক খরচ তৈল ২০০০৲ টাকা, একটী ট্রাক্টর চালাইতে দুইজন ড্রাইভারের প্রয়োজন—প্রত্যেক ড্রাইভারের মাসিক বেতন ৩০৲ হারে দুইজনের একবৎসরের বেতন মোট ৭২০৲ টাকা। ট্রাক্টরের মেরামত

প্রভৃতি খরচ মোট ২৮০ টাকা ধরিলেও একখানা ট্রাক্টরের একবৎসরের মোট খরচ ৩০০০৲ টাকা।

সাধারণ লাঙ্গলের চাষে ১৮০০০৲ টাকা প্রয়োজন। সেইস্থলে মোটর ট্রাক্টর দ্বারা চাষে মাত্র ৩০০০৲ টাকা আবশ্যক। শেষোক্ত উপায়ে চাষ করিলে খরচ যেমন মাত্র একষষ্ঠাংশ প্রয়োজন জমিও তেমনি ৪ ইঞ্চির পরিবর্ত্তে ১৪ ইঞ্চি গভীর চষা হইবে। এই প্রণালীতে খরচা ও কার্য্যের যেমন সুবিধা, পরিশ্রমেরও সেইরূপ লাঘব। উভয় প্রকার চাষের তুলনা করায় বৈজ্ঞানিক চাষে কিরূপ সুবিধা তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে।

কোম্পানির নির্দ্ধারিত উৎপন্নের ন্যূনতম হার ও মূল্য

বোরোধান্য	৪০০ একর	২৫/	২৲	২০০০০৲
আশুধান্য	২০০ ,,	২০/	২৲	৮০০০৲
পাট	১০০ ,,	১৫/	৮৲	১২০০০৲
সরিষা	৩০০ ,,	৮/	৫৲	১২০০০৲
ইক্ষু	১২০ ,,	একর প্রতি	৬০০৲	৭২০০০৲
কলা	৮০ ,,	,, ,,	৪০০৲	৩২০০০৲
আলু, তুলা তামাক প্রভৃতি	৯০ ,,	,, ,,	১০০৲	৯০০০৲
				১৬৫০০০৲
কাঠের কার্য্যের উৎপন্ন	..	...		৫০০০৲
				১৭০০০০৲

কোম্পানির নির্দ্ধারিত খরচের হার।

বোরোধানের জমি ৪০০ একর হালের খরচ ৬৲ টাকা একর হারে——	২৪০০৲
অন্যান্য ৮১০ একর হাল দেওয়া বাবদ তৈল খরচ ৩৲ টাকা একর হারে	২৪৩০৲
অতিরিক্ত খরচ বাবদ	২১৭০৲
	৭০০০৲
৪০জন স্থায়ী মজুরের মাসিক ১৫৲ টাকা হারে এক বৎসরের বেতন বাবদ	৭২০০৲
অস্থায়ী মজুর বাবদ	৬০০০৲
অতিরিক্ত খরচ বাবদ	৩৮০০৲

বীজ ও সারের দাম	... ...	৮০০০৲
কাঠের দাম	... ...	৫০০৲
কাঠের কলের তৈলের দাম	... ...	১৫০০৲
		২০০০৲
জলসিঞ্চনের বাবদ	... ...	১০০০৲
ফার্মের ম্যানেজার, ডাক্তার, তত্ত্বাবধায়ক, ড্রাইভার প্রভৃতির বেতন বাবদ		৮০০০৲
মেনেজিং এজেন্টের এলাউয়েন্স ও হেড আফিসের খরচ প্রভৃতি বাবদ	...	৭০০০৲
	মোট	৫০,০০০৲

মোট আয়	... ...	১৭০,০০০৲
মোট ব্যয়	... ...	৫০০০০৲
	নেট আয়	১২০০০০৲

পাঠকগণ নিজেদের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রয়োগ করিয়া এই ষ্টেটমেণ্টগুলির নির্ভুলতা সম্বন্ধে যদি আশ্বস্ত হন তবে "পাইওনিয়ার এগ্রিকাল্চারাল্ ফার্ম লিমিটেড" নামক একটি কোম্পানি যে পূর্ব্বোক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায় তিন হাজার বিঘা অনাবাদি জমি লইয়া বৈজ্ঞানিক চাষে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছেন তাঁহাদের দলভুক্ত হইয়া দেশের ও নিজের ধন বৃদ্ধি করিতে পারেন।

এই জমিটা সমস্তটাই একখণ্ডে থাকাতে মোটর মেশিন কিম্বা অন্য রকমের উন্নত বৈজ্ঞানিক চাষের পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক। এই জমি স্বভাবতঃ এত উর্ব্বর যে প্রথম কয়েক বৎসর এ জমিতে অতিরিক্ত সার প্রয়োজন হইবে না। জমির মধ্য দিয়া একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী বারো মাস প্রবাহিত হয়। এজন্য জলসিঞ্চনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। যদি প্রয়োজন হয় তবে নদীতে বাঁধ দিয়া দিলে অতি সামান্য খরচে জল সিঞ্চিত হইতে পারিবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

মাসিকসাহিত্য-পরিচয়

আমাদের টেবিলের উপর চৈত্রের যতগুলি মাসিক পত্র পড়িয়া আছে তাহাদের মধ্যে দুইখানি সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র—

সুবর্ণবণিক সমাচার ও কংসবণিক পত্রিকা।

কৃষক—কৃষি ও শিল্পবিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক পত্র।

শিক্ষক—শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা বিষয়ক পত্র।

স্বাস্থ্য সমাচার—স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পত্র।

শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমবাসীগণের মুখপত্র।

তত্ত্ববোধিনী—তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্র।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ মাসিক পত্র বার খানি।

উপাসনা, তরুণ, নব্যভারত, প্রভাতী, প্রাচী, প্রবাসী, প্রবর্ত্তক, বঙ্গবাণী, বসুমতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, সৌরভ।

স্বস্ত্যয়ন এই বংশীয় একটী দুই মাসের শিশু।

ইহার মধ্যে অনেকগুলি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের একটা নূতন দম্‌কা হাওয়া বহিয়াছে। সেগুলি পড়িয়া বুঝা যায় প্রাচীন রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এখনো মানসী যুগের তরুণ রবীন্দ্রনাথ সজীবভাবে বাস করিতেছেন। পক্ককেশ তাঁহার ছদ্মবেশ মাত্র এবং তাঁহার চির সুন্দরভাবের উৎস এখনো তেমনি সুবিচিত্র আছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইহার মধ্যে কোন কোন পত্রে সুদূর প্রবাসে বসিয়াও এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের সুদূর উপান্তে উপনীত হইয়াও মাতৃভাষার যে অক্লান্ত সেবার পরিচয় দিতেছেন তাহা বিস্ময়জনক। আচার্য্য প্রফুল্লকুমার রায়ের দেশহিতকারী শক্তির অশ্রান্ত প্রয়োগের চিহ্নও এই সকল পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এবার পত্রিকাগুলির সংক্ষেপ পরিচয়ে কলম বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি। আগামী সংখ্যা হইতে বিশেষ পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা রহিল।

সমালোচনা

মুক্তির পথ—শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বি, এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সব চিন্তা যে সব সমস্যা আমাদের চিত্তে প্রতিনিয়ত উঠিতেছে, ফিরিতেছে, প্রধানতঃ সেইগুলি লইয়াই লেখক আলোচনা করিয়াছেন। আস্তিকতা দেশপ্রীতি, বিশ্বপ্রেম, স্বাধীনতা, স্বরাজ, অহিংসা, সহযোগিতা বর্জ্জন, অহিংস সহযোগিতাবর্জ্জন, চরকা ও খদ্দর, জাতিভেদ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, বর্ণাশ্রামধর্ম্ম, গ্রামের কথা, গণতন্ত্রবাদ, ধন ও শ্রম, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বাইশটী সন্দর্ভ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ত্যাগের দিক দিয়াই লেখক প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন; আমাদের প্রাচ্য আদর্শে ফিরিতে হইবে, বিলাস ত্যাগ করিয়া জড়োন্নতির কথা ভুলিয়া আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে, অধীর হইলেও চলিবে না। এ কথা ঠিক তবে স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে লেখক বলেন, পুরুষ বাহিরের কাজের জন্য সৃষ্ট, স্ত্রীঘরের কর্ত্রী—কর্ম্মক্ষেত্রে স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিতে লেখক নারাজ। কিন্তু কেবল প্রাচ্য-আদর্শে ফিরিয়া নারীগণ রন্ধনশালায় বসিয়া থাকিলে কি এখন আর চলে! ঘরকে তুচ্ছ করিয়া নারীর বাহিরে আসা চলিবে না, মানি; কিন্তু শুধু দাসী বা পাচিকার কাজেই নারীকে আটকাইয়া রাখিলে চলিবে না। জীবন সমস্যার প্রবল স্রোতে বাহিরের বিপুল সংঘর্ষে নারীকে রীতিমত শিক্ষিতা করিয়া তোলা দরকার। তা হক্, তার দাবী সমাজে নারীর অধিকার সাব্যস্ত করার কাল আসিয়াছে, সে সব ঠেকাইয়া রাখিয়া পুরুষই শুধু অধিকার-প্রদত্ত হইয়া চলিবে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ সম্ভব নয়। আদর্শ মাতা, পত্নী গৃহকর্ত্রী, ধর্ম্মপরায়ণা, গৃহকর্ম্ম-কুশলা নারী ত হইবেনই, তাছাড়া শিক্ষাও পুরাদস্তুর তাঁর লাভ করা দরকার কারণ বিশটাকার কেরাণীর ঘরে ছেলেমেয়েদের পড়াইলেও লেখাপড়া শেখানও ত তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা চলিতে পারে ছোটমার অসুখ ডাক্তার না ডাকিয়া তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও তাঁরা করিতে পারেন, তাছাড়া যার বাড়ীতে এরূপ দু'দশটি ছেলেমেয়ে সংসারে স্বচ্ছলতা কিছু তাঁরা আনিতে পারেন,—এগুলা খুব সাধারণ কথা। শিক্ষায় মনের সংকীর্ণতা ঘুচিবে, দলাদলি, ঝগড়াগুলারও বিরাম হইয়া সংসারে শান্তি মিলিবে—এগুলা শিক্ষার দ্বারা সম্ভব। এগুলা কি বড় ছোট লাভ? কাজেই প্রাচ্য আদর্শ মানে এ নয় যে নারী রাঁধা-বাড়া করিবে, প্রাচ্য আদর্শের বেলায় অতীতে দিকে যাইতে হইবে—গার্গী, খনা, লীলাবতী, উভয়ে ভারতীর কথা গ্রহণ করিতে হইবে। সব বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত না হইলেও আমরা তাঁর আলোচনার প্রশংসা করি। বর্ত্তমান সময়ে এ সব বিষয় লইয়া আলোচনা যত হয় ততই মঙ্গল।

কারা-জীবন—শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত প্রণীত। প্রকাশক আর্য্য পালিসিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা, মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য একটাকা। এ বইখানিকে বাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা জীবন্ত পৃষ্ঠা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথম সংস্করণের আমরা প্রশংসা করিয়াছিলাম—সে দিনের কথা। এত শীঘ্র যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল, বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

রূপোপজীবিনী—শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর রায়-চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ছোট গল্পের বই। দিদি, দুঃখ, হতচ্ছাড়া, ভুল, শেষ শিক্ষা

ট্র্যাজেডী, মা ও রূপোপজীবিনী—এই সাতটি ছোট গল্প এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। গল্পগুলির প্লটে খুব বৈচিত্র্য না থাকিলেও লেখকের বর্ণনা স্বচ্ছ সহজ। লেখকের লিখিবার শক্তি আছে।

পলাশ-বন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ বি-এল পি-এইচ্ ডি প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত। মুল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি 'গার্হস্থ্য-চিত্র'—লেখক ইহাকে উপন্যাস বলেন নাই। উপন্যাসের লক্ষণ ইহাতে খুব আছে। বইখানি পড়িতে বসিলেই একটা জিনিষ যা চোখে ঠেকে তা ইহার শান্ত স্নিগ্ধ আবহাওয়া। চরিত্রগুলিতে বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সে-বৈশিষ্ট্য হৃদয়ে এমন ছাপ রাখে, যাহা সহস্র উপন্যাস পাঠেও মিলাইবার নয়। গোল্ডস্মিথের vricar of wokfzcee যে ধরণের উপন্যাস, এখানিও ঠিক সেই ধরণের। ঘটনার সংস্থানের মধ্য ঝাঁজ নাই তীব্রতা নাই,—তাহা একান্তই বাঙলার মাটী, বাঙ্লার আবহাওয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রেমের কথা ইহাতে আছে—প্রেমের-স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস তাহাতে মদির বিহ্বলতা নাই। সুরমার মত মেয়ে বাঙলার উপন্যাস-রাজ্যে দেখা যায় না। গ্রন্থের নায়ক দেবু স্বপ্নশীল—তা হইলেও তার হৃদয়ের বল, সার্থকতা, বাঙালী যুবার আদর্শ হইবার যোগ্য। এ গ্রন্থখানি বহুকাল পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়া যায়—প্রায় দশ পনরো বৎসর পরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; এজন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ দিই। একালের একঘেয়ে বৈচিত্র্য-হীন সমস্যাগত-প্রাণ উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া রেসের পাঠকেরও উপন্যাসে অরুচি ধরিয়া গিয়াছে; তাঁরা এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ পাইবেন, এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

উপগুপ্ত। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় প্রণীত। প্রকাশক, এন্ মুখার্জ্জী, ১ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি বৌদ্ধ যুগের কাহিনী। লেখক ইহাকে উপন্যাস বলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন—তবে কেহ যদি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন ত তাঁর তাহাতে আপত্তি নাই। যাহাই হোক উপন্যাসের আইন-কানুনে বাঁধা পথে না চলিয়াও এবং খুব গুছাইয়া না বলিলেও লেখক যে ভাবে কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। কাহিনীটি ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা বজায় রাখিয়া সেই অতীত যুগের এমন সুস্পষ্ট ছবি মনে আঁকিয়া দেয় যে লেখকের কৃতিত্বের তারিফ না করিয়া থাকা যায় না। তাহার লেখনীর ইঙ্গিতে চরিত্রগুলি বেশ সুস্পষ্ট আকারে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্লটটিও অভিনব বৈচিত্র্যে একটা কৌতুহল জাগাইয়া রাখে। নীরস ইতিহাস যাঁরা পড়িতে চান না, তাঁরা এ বইখানি পড়িলে উপন্যাসের রস-লাভেও বঞ্চিত হইবেন না অথচ বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসের জ্ঞানও কতক লাভ করিবেন।

প্রজ্ঞা-শক্তি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব লিমিটেড, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মুল্য এক টাকা। এখানি অভিনব সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস'—লেখক যখন অসহযোগ আন্দোলনের মুখে আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন, জেলে বসিয়া সেই সময় এখানি রচনা করেন। এ যুগের সামাজিক ও রাজনীতিক বহু সমস্যার কথা উপন্যাসের আবরণে নানা পাত্র-পাত্রীর কার্য্যকলাপের মধ্যে অবতারণা করিয়া সেগুলির একটা সরল সিদ্ধান্তের চেষ্টাও লেখক করিয়াছেন। প্লটটি মন্দ নয়-লেখকের ভাষাও সরল—তবে স্থানে স্থানে নীরস আলোচনার ফলে উপন্যাসের রস কাটিয়া গিয়াছে। সে ত্রুটি সত্ত্বেও উপন্যাসখানির বৈচিত্র্যের দিক দিয়া জমিবার মত হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৮শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ { দ্বিতীয় সংখ্যা

অহঙ্কার

আহা তাই সই ! আমি কিছু নই !
আমি গো শুধুই তুমি !
অষ্টধা তোমার প্রকৃতির আমি
কেবলি খেলার ভূমি !
মোর অহঙ্কার কাড়ি লবে নাথ,
রাখিবে না কিছু লেশ !
যাদুকর ওহে তৃণটিরে তুমি
করিবে অভ্র-চুমী !

মিঠি মিঠি তব কথায় ভুলায়ে
লয়ে যাও কত দূর !
ফিরিতে আর যে পারিনা এ কায়ে
ছাড়ি সীমাহীন পুর !
এত ছোট এত আঁধারেতে ভরা
আর ত লাগেনা ভাল,
আপনার জ্ঞান রহেনাকো তায়
মমতা হয় হে চূর !

কুলায় না মোরে আপন কুলায়,
বাহিরাই বারে বারে,
তোমার নিখিল বিশ্ব দেহেতে
প্রাণ চায় মিলিবারে !
সবে-বুকে-টানা সবারেই-ঘেরা
অতি-মন হতে সাধ,
প্রতিকায়ে কায়ী, মগন সবার
দুখসুখ-পারাবারে !

বিশ্ববিজয়ি হে মনোমোহন
মানাও মানাও হার !
আমিরে হরিয়ে কর তুমিময়,
দাও তব অহঙ্কার !
পূর্ণ-অসীম অদীনতা-জ্ঞান
আমি-জ্ঞান হোক্ নাথ,
পরম তুমি যে, চরম আমি সে,
শিব, সুন্দর, অপার !

শ্রীমতী সরলা দেবী

সাধনা ও আনন্দ

জন সমাজে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোকের ভিতরকার কথা হচ্ছে গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি, আর এক শ্রেণীর লোকের ভিতরকার কথা গাছে উঠিয়া ফল সংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণীর নমুনা—

সংস্কৃত পড়ুয়া বলিতেছেন, বর্ণমালা ব্যাকরণ প্রভৃতি ছাইভস্মগুলা অতিশয় নীরস,—আমাকে তাহা পড়াইও না, যাহাতে আমি আনন্দ পাইতে পারি এই রকমের একটা বই আমাকে পড়াও—কালিদাসের শকুন্তলা পড়াও। বিষয়ী লোক বলিতেছেন, কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা রাত্রিদিন গাধার মত খাটিতে চায়, তাহারা খাটিয়া মরুক, আমার যাহা কিছু পুঁজি আছে তাহারই প্রসাদে আমি রাজার মত আনন্দে দিন যাপন করিয়া আমার মনের সমস্ত আশ মিটাইব। শ্রেয়ঃকামী লোক বলিতেছেন, সাধন একটা নেহাৎ নীরস কষ্টকর ব্যাপার, শুষ্কজ্ঞানী এবং যোগীতপস্বীদেরই তাহা পোষায়, আমার মত গৃহস্থ লোকের পক্ষে তাহা শ্রেয়স্কর নহে, আমি নিখিরকিচে আমার ইষ্টদেবতাকে সরস অন্তঃকরণে প্রীতিপূর্ব্বক ভজন করিয়া পরম আনন্দে কাল যাপন করিব, ও সকল বৃথা পণ্ডশ্রমের কণ্টকাকীর্ণ পথে যাইব না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নমুনা—

সংস্কৃত পড়ুয়া বলিতেছেন, কালিদাসের শকুন্তলা পড়িতে গিয়া দেখিলাম যে আমার মত নূতন ব্রতীর পক্ষে উহার মধ্যে দন্তস্ফুট করা এক প্রকার অসাধ্য সাধন। আমার অল্প স্বল্প সংস্কৃত বোধ যাহা আছে, ব্যাকরণ পড়িয়া তাহাকে বিধিমতে শানাইয়া লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিষয়ী লোক বলিতেছেন, আমার পৈত্রিক ধন আমি যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা বসিয়া বসিয়া খাইয়া শেষ করিলে আমি বিপদে পড়িব, অতএব কৃষি-বাণিজ্যে তাহাকে খাটাইয়া তাহার রীতিমত পুষ্টিসাধন করা অতীব কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃকামী লোক বলিতেছেন, রিপুসকলের উপদ্রবে মন বিক্ষিপ্ত হইলে ঈশ্বর উপাসনায় ভাল করিয়া মন বসে না। অতএব কিছুদিন সাধনের পথ অবলম্বন করিয়া ভজনের পথ পরিষ্কার করা আমার পক্ষে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

বিচার নিষ্পত্তি—

প্রকৃত কথা এই যে, ভজনের পরম আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে বিবেক এবং বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তকে শোধন করা অতীব আবশ্যক। এ যেমন একদিকে দেখিলাম, আর একদিকে

শান্তিবারি সেচন করা আবশ্যক। সাধনের কষ্টস্বীকার প্রকৃত ভক্তের পক্ষে এক প্রকার—ইংরাজিতে যাহাকে বলে, labour of love। প্রকৃত আনন্দলাভ করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, সাধনের কষ্টস্বীকারকে তাঁহারা আপনাদের কণ্ঠের ভূষণ করেন। যে সকল শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিরা সাধন দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা সমস্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক নবতর কল্যাণতর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে থাকেন। তাঁহারা যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য এবং তাঁহারা যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাই প্রকৃত আনন্দ নামের যোগ্য।

যাঁহারা সঙ্গীত রসের রসিক, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কিছু আর টপ্পা টুপ্পীতে সন্তোষ মানিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ উচ্চ অঙ্গের খেয়াল পদাদির রস আস্বাদনের অভিলাষী হন। যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য এবং আনন্দের কাঙাল তাঁহারা সাধনের কষ্টকে বিভীষিকা জ্ঞান না করিয়া অমৃতের দ্বার বলিয়া তাহাকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করেন।

প্রকৃত কথা এই যে সাধন এবং ভজনের একতানতাই অমৃত আনন্দের উৎস। তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইলে এতদিক দিয়া এত রকম কুফল বাহির হইতে থাকে যে পরিশেষে তাহার ধাকা সামলান ভার হইয়া উঠে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব তীর্থ

পুরাণে শুনেছি দক্ষঋষির যজ্ঞভূমির পরে
ত্যজিলেন তনু শিবসুন্দরী অভিমানে অনাদরে,
বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হ'য়ে সে তনু ভারত ভরি'
বিরচিল একপঞ্চাশপীঠ একান্ন ঠাঁয়ে পড়ি'।
মর্ম্মন্তুদ দারুণ বেদনা সঙ্গে যায়নি তাঁর
বলেনি পুরাণ কোথায় রহিল সে দুখ বেদনাভার।
এতদিন পরে পেয়েছি আমরা সে ঠাঁয়ের সন্ধান,
পরম তীর্থ,—অশ্রুগঙ্গা পুলিনে বিরাজমান।
ভূভার হরিতে সে মহাতীর্থে বিশ্ব করিতে ত্রাণ
জনম লভেন দেবকীজঠরে যুগে যুগে ভগবান।
যুগে যুগে তথা সিদ্ধি লভেন ধ্রুব প্রহ্লাদগণ,
জনকতনয়া পুণ্যাশ্রুতে পূত যার প্রাঙ্গন।
আজি এ তীর্থে মহাশুভযোগ, মিলেছে কুম্ভমেলা
দলে দলে দলে যাত্রীরা চলে,যায়নাক ভিড় ঠেলা,
কল কল রব পরমোৎসব জয় জয় ধ্বনি উঠে,
ভক্তেরা জুটে এ ইহজীবন ধরি' অঞ্জলিপুটে।
কত অনশন কত লাঞ্ছনা কত তাপ ক্লেশ হায়,
ব্যথাময়ী মা'র মন্দির পানে তবু দলে দলে ধায়।
শোণিতে পূর্ণ ভোগের পাত্র শিকলে বাজনা বাজে
সহন-হ'বির যজ্ঞ দহন মানস কুণ্ডে রাজে,
হেথা ইহসুখ,পাষান বেদীতে করিলে সকলি দান
দূরে যায় শতজন্মজড়িত হীনতার অপমান,
শতবর্ষের দাস্যের গ্লানি দূরে যায় হেথা স্নানে,
মুক্তির চিরস্বর্গের পথ সুরু হয় এইখানে,
এ মহাতীর্থে করিবে যে জন দুদিনেরোতরে বাস
অন্তর হতে খসে' পরে তার মোহবন্ধন পাশ।

শ্রীকালিদাস রায়।

লাইব্রেরী

(বালি পাবলিক-লাইব্রেরীর গৃহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সভানেত্রীর অভিভাষণ)

কোন কোন শিশু দেখা যায় যারা রিকেট্স্ নামক ব্যাধিগ্রস্ত, তাদের হাতপাগুলি সরু সরু, গলাটি লিক্ লিকে, গায়ে মুখে সর্ব্বত্র মাংসের অপ্রাচুর্য্য। স্বাভাবিক মানবশিশুর পূর্ণতার অভাব তাদের সমস্ত শরীরে পরিদৃশ্যমান। মাতৃগর্ভে, কিম্বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যথোচিত পুষ্টিলাভের অভাবেই তাহাদের এই দশা। উহার একমাত্র প্রতীকার পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা তাহাদের শরীরকে গড়িয়া তোলা। এই ছেলেগুলিকে দেখিলে মায়া করে। কিন্তু এই মায়াটা শুধু তাদের অপূর্ণতাজনিত, তাদের কোন ক্লেশবিশেষের জন্য নয়। কারণ তাহারা কৃশ হইলেও কোন বেদনাক্লিষ্ট নয়। শুধু তারা অন্য ছেলেদের মত খেলাধুলা করিতে অসমর্থ, অল্পতেই শ্রান্তি বোধ করে, তাদের জগতের সম্বন্ধে ঔৎসুক্যটাও অতি ক্ষীণ, সঙ্গীদের মত সব জিনিষকে পরখ করিয়া,দেখিয়া, শুনিয়া, চাখিয়া,শুঁকিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া আয়ত্ত করিবার ইচ্ছাটা তীব্র নহে ; এবং তাদের কোন কিছুতে আনন্দও তেমন সতেজ নহে। এই শিশুরা নিজেদের ন্যূনতা নিজেরা অনুভব করে না, কিন্তু দর্শকের চোখে তা লুকান থাকে না। এমন ছেলে মানুষ করিতে গিয়া ঠাকুর্মা দিদিমারা বড় দায়ে ঠেকেন—তাঁদের সমস্ত প্রাণে চেষ্টা হয় তার ভিতর জীবনের পুরা দমটা ভরিয়া দিতে, তাকে পূর্ণভাবে সজীব করিতে। কেননা তাঁদের ভূয়োদর্শিতায় তাঁরা জানেন জীবনীর অভাবেই জীবন সংশয় হয়, শিশুশরীরের অপূর্ণতাই কোনদিন ক্ষয়রোগে পর্য্যবসিত হইতে পারে। অতএব সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

মানুষ-করা মানেই তাই, অপূর্ণকে পূর্ণকরা, নির্জ্জীবকে সজীব করা। শরীরের রিকেট্সের মত মানসিক রিকেট্সও দেখা যায়। কখন কখন গোটা জাতিটাকেই এই রোগে সমাচ্ছন্ন করে, সে জাতি নিজের ত্রুটি নিজে ধরিতে না পারিলেও দৃষ্টিবান্ অপর সুস্থ ও সংপুষ্ট জাতির কৃপাপাত্র হয়। মানসিক কৃশতা পুরা মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। যে মন নিজের বাহিরের মনোজগৎ হইতে মনের স্থল জল বায়ু ও আকাশ হইতে নিজের পূর্ণতার অনুকূল খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারে, সে চিররুগ্ন চিরকৃশই থাকিয়া যায়।

সে মনে কল্পনা নাই, আগ্রহ নাই, সহৃদয়তা নাই ও রসগ্রাহিতা নাই। সে সব রকম মানসসম্পদে বঞ্চিত তাই নিতান্ত স্বল্পানন্দ। মনীষিগণ বলেন মানুষ হওয়া মানে জগৎকে জ্ঞানে পাওয়া, শক্তিতে পাওয়া ও হৃদয়ে পাওয়া ; সমস্ত জগতের মধ্যেই সমস্ত মানুষের মধ্যেই আমার আত্মার সার্থকতা ইহা অনুভব করাই পুরা মনুষ্যত্ব। তাই পুরা মানুষ হওয়ার জন্য চাই শক্তির বোধন, বুদ্ধির বিকাশ ও ভাবের প্রসার। শক্তির বোধন নানা কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মশক্তির প্রয়োগের দ্বারা হয়। আর সর্ব্ববিষয়বিদ্ধকারিণী ও সর্ব্ববিষয়রূপিণী বুদ্ধি নানা বিষয়ক জ্ঞানের অনুশীলনেই বিশদ ও বিকশিত হয়। এবং বহুকালের বহুদেশের ও বহুমানবের ভাবের বিহারক্ষেত্রে বিচরণেই ভাবের প্রসার লাভ হয়।

বুদ্ধি দিয়া বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানবস্তুকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং হৃদয়ের রস দিয়া হৃদয়ের

বস্তু ভাবসামগ্রী লাভ করিতে হইবে। যার বুদ্ধি ও হৃদয় যতটা জায়গা জুড়িয়া থাকে তার জ্ঞান ও ভাবের প্রাচুর্য্য ততই অধিক হয়। শরীরের বাড়ের একটা সীমা আছে, একটা নির্দ্দিষ্টতা আছে। কিন্তু মনের বাড়ের সীমা নাই। স্থূল জিনিষ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া থাকে কিন্তু সূক্ষ্মের ব্যাপ্তির স্থান অপরিসীম। বায়ু তেজ ও আকাশ তার নিদর্শন। মনের প্রসার মনোমণ্ডলে বিস্তৃতির দ্বারাই হইতে পারে। বিশ্বহৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয়ের যত একীকরণ হইবে, বিশ্বজ্ঞানের সহিত নিজের জ্ঞানের যত সমন্বয় হইবে ততই আমরা মানুষ হইব, ততই আনন্দের মাত্রা আমাদের বাড়িবে। কিন্তু এই সুযোগটি মেলে কেমন করিয়া? এই জ্ঞানমণ্ডলে ও মনোমণ্ডলে বিহারের বিমান কোথায়? সাহিত্য আমাদের সেই বিমান। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সাহিত্যিক যাঁরা দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ও ভাবসাগরের পারে উত্তীর্ণ হন তাঁদের সহিত পরিচয়ে আমাদের চিত্তের কূপমণ্ডুকত্ব দূর হয়, সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া ব্যাপ্তির আনন্দলাভে উপলব্ধি করি—"ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখং।"

আমাদের এক একটি মানবাত্মা যে বিশ্বাত্মরূপী অগ্নির স্ফুলিঙ্গ তার বিকাশ স্বদেহে আত্মসঙ্কোচের দ্বারা হয় না, বহু আত্মার সহিত নিজের মিলনে, একাত্মবোধে বা প্রসারে হয়।

কত মহৎ হৃদয়, কত জ্ঞানী বা ভাবুক কত দেশে কত কালে কত কিছু মহৎ ও সরস ভাবনা ভাবিয়াছেন বা মহৎ ও সরস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—সাহিত্য তাহা দেশে দেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বলোককে বণ্টন করিতেছে। গোটা মানুষের সংস্পর্শ প্রতিদিন সুলভ নয়; কিন্তু হৃদয়বানের হৃদয়, চরিত্রবানের চরিত্র, প্রতিভার হস্তে সাহিত্যের নিপুণ শৃঙ্খলে গ্রন্থশরীরে চিরবাঁধা, সেখানে তাহারা মানুষের চিরসঙ্গী। তাই গ্রন্থের এত মহিমা। গুরুগণের বাণীধারী গ্রন্থসমূহ শিখদের মধ্যে গ্রন্থসাহেব নামে পূজ্য, বাইবল্ যীশুর শরীররূপে পূজ্য, এবং পা ঠেকিলে জড় পুস্তককেও আমরা হিন্দুরা প্রণাম করি—কারণ পুস্তকই প্রাণের রহস্যের আধার। ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী যিনি ভাবের ও জ্ঞানের আদি-অধিষ্ঠাত্রী তিনি পুস্তকহস্তা।

প্রতি লোকালয়ে যেমন লোকের শরীরধারণের জন্য অন্নভাণ্ডার ও বস্ত্র ভাণ্ডারের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ধানের গোলা ও কাপড়ের হাটে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তেমনি প্রতি লোকালয়ে লোকের মানস-পুষ্টিসাধনের একটি ভাণ্ডারও খোলা থাকা চাই, নয় ত সেখানকার লোকদের মানসিক খিন্নতার সম্ভাবনা অত্যধিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানুষ হওয়ার জন্য শরীরের খোরাকের সঙ্গে সঙ্গে মানস-খোরাক চাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা মানবমাত্রের মানুষ হওয়ার উপায় স্বরূপ পঞ্চমহাযজ্ঞ নামে যে পাঁচটি দৈনন্দিন অবশ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন,—স্বাধ্যায়, অর্থাৎ সু-অধ্যায় বা সুন্দর সাহিত্য পাঠ তার অন্যতম ছিল। পাঠ বিনা মনের পুষ্টি হইতে পারে না, পুস্তক বিনা পাঠ হইতে পারে না, সে পুস্তক হস্তলিখিতই হউক বা মুদ্রাঙ্কিত হউক। লাইব্রেরী বা পুস্তকাগার পাঠের সহায়, ইহারা মানস-বস্তুর ভাণ্ডার বা মানুষ গড়ার কারখানা। ইহারা লোকপালনের মহত্তম অংশ বহন করিতেছে। যাঁহারা ইহার উদ্যোগী তাঁহারা যথার্থ

পৃথিবীর লাইব্রেরীর ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে মিলাইয়া দেখিলে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইবেন। আজ মুদ্রিত পুস্তকসংগ্রহকে লাইব্রেরী আখ্যা দেওয়া যাইতেছে একদিন এমন ছিল যখন ছোট ছোট ইষ্টকখণ্ডের সংগ্রহই লাইব্রেরী ছিল। এই পৃথিবীতে এককালে আমাদেরই মত জাগ্রত জীবন্ত একটি জাতি অ্যাসিরিয়া ভূখণ্ডে নিবাস করিত। তাহাদের প্রতাপ, তাহাদের ঐশ্বর্য্য ও তাহাদের সভ্যতা, মহাকালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে—শুধু কতিপয়-সহস্র ইষ্টকফলক তাহাদের আংশিক জীবনকাহিনী আজও নিজের গাত্রে অণুবীক্ষণের সাহায্যে পাঠ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অক্ষরে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই ইষ্টক পুস্তিকাগুলি অ্যাসিরিয়ার অসুর-বনি-পাল নামধেয় গুণগ্রাহী কবিপালক সম্রাটের লাইব্রেরীর অঙ্গ। ইহার দশবিশখানি ইষ্টকে এক একখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ। এইরূপ দশ হাজার গ্রন্থ পাওয়া যায়। সম্রাট অসুর-বনি-পালের লাইব্রেরী তাঁর প্রজাসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই অসুর-বনি-পাল হয়ত বা বেদবর্ণিত সুরগণের ভ্রাতা অসুরগণের বংশোদ্ভূত! কোন্ স্মরণাতীত কালের কোন্ স্মরণাতীত জাতির হাতের স্পর্শ এই ইষ্টক পুস্তকগুলিতে বিদ্যমান্। সে হাতগুলি পঞ্চভূতে কতদিন বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে প্রাণশক্তি সেই হাতদের প্রেরণা দিয়াছিল সে শক্তির ধ্বজা ইহাদের গাত্রে অক্ষরে অক্ষরে প্রোথিত—মহাকালও তাহাকে উৎপাটিত করেন নাই। তারপর ভূর্জ্জপত্রে বা তদনুরূপ আধারের উপর মানুষের আত্মকাহিনী লিপিকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূর্জপত্র লিখিত গ্রন্থসমূহের লাইব্রেরী মন্দিরে মন্দিরে রক্ষিত হইত। পুরাকালে মিশর, ব্যাবিলন, ভারত, চীন প্রভৃতি সকল সভ্যদেশেই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য একটি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেই পণ্ডিতশ্রেণীর লোকেই মন্দিরের পৌরহিত্য করিতেন এবং পুস্তক সংগ্রহ ও সংরক্ষা করিতেন। তাই অতীতের লাইব্রেরী-সমূহ দেব-মন্দিরেই স্থান পাইয়াছিল। এবং প্রত্যেক মন্দিরে লিপিকার সংখ্যাও কম ছিল না। কোন কোন পণ্ডিত স্বগৃহেও পুস্তক সঞ্চয় করিতেন—তাঁহাদের লাইব্রেরীও প্রসিদ্ধি লাভ করিত।

পৃথিবীর ব্রাহ্মণে ও পৃথিবীর ক্ষত্রিয়ে রেষারেষি আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে—কি আধ্যাত্মিকতায় কি বিদ্যানুরাগিতায়। তাই আমরা এক সময় হইতে দেখিতে পাই দরিদ্র বিদ্যামাত্রধনী ব্রাহ্মণের আশ্রয় ছাড়িয়া সরস্বতী সম্রাট ও সৈনিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজার আদেশে মিশরের প্রাচীন সম্রাটগণের সমাধিভবন সরস্বতীর নিবাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। সম্রাট ওসিমান্দিয়াসের সমাধি-গৃহের পুস্তকাগারের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিত ছিল—"আত্মার চিকিৎসালয়।"

আলেকজান্দ্রিয়ার ভুবনবিখ্যাত লাইব্রেরী মিশরের টলেমীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সম্রাট পরম্পরা ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইউয়ের্গেতিস সম্রাটের রাজ্যকালে যে কোন বিদেশী মিশরে আসিতেন—তাঁহার নিকট পুস্তক থাকিলে মূল পুস্তক রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীতে স্থান পাইত—এবং বিদেশীকে তার পুস্তকের

একখানি নকল মাত্র দেওয়া হইত। রাজগণের পুস্তকসংগ্রহ সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতাও চলিত। সুবিধা পাইলেই একজন আর একজনের লাইব্রেরী লুট করিয়া নিজের রাজ্যের গৌরব বাড়াইতেন। মিশরের সম্রাজ্ঞী ক্লিওপাট্রাকে ভুবন-মোহিনী সুন্দরী বলিয়াই আমরা জানি। কিন্তু তাঁর লোকমনোমোহিনী যাদুর মধ্যে সরস্বতী ভক্তিও যে একটি তাহা অনেকেই জানিনা। সীজর যখন আলেক্‌জান্দ্রিয়ার উপকূলে নিজের নৌ-বাহিনীতে আগুণ ধরাইয়া দেন সেই আগুনের একটি লেলিহান শিখা আলকজান্দ্রিয়ার টলেমিগণের দুই ভাগে বিভক্ত লাইব্রেরীর একটি ভাগকে দৈবাৎ জ্বালাইয়া দেয়। মিশরসম্রাজ্ঞী ক্লিওপাট্রার প্রণয়মুগ্ধ সীজর-সেনাপতি অ্যাণ্টোন রাজ্ঞীর হৃদয় হইতে হুতাশনের কবলিত পুস্তাকাগারের শোক বিমোচনের জন্য শত্রুরাজ্য পার্গেমাস হইতে তাহাদের সুবিখ্যাত লাইব্রেরী লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া তাঁর গরীয়সী প্রণয়িণীর দৌর্মনস্য বিদূরিত করেন। ভীমচন্দ্র দ্রৌপদীর মনোরঞ্জনের জন্য নাগপরিবৃত দুর্গম পর্ব্বত হইতে পুষ্প উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুপুরী হইতে পুস্তকাগার জয় করিয়া আনিয়া প্রণয়িণীর পদপ্রান্তে রাখার ইতিহাস আর কোন জাতির ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় না বোধ হয়।

প্রতীচ্য লাইব্রেরীর ইতিহাসে আর একটি নারীর নাম পাওয়া যায়। রোমের সম্রাট অগাষ্টাস্ যে দুইটী প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী স্থাপনা করেন তাহার একটী তাঁহার বিদুষী ভগিনীর নামে প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁরা জগৎ বিখ্যাত জুলিয়স্ সীজরের পৌত্র ও পৌত্রী।

বিদ্বান ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের দানকৃপণ মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে মুক্তি পাইয়া দেবীসরস্বতী ঐশ্বর্য্যবান ক্ষত্রিয়ের মুক্তহস্ততায় প্রজাসাধারণের সুলভ হইলেন। রাজ-পুস্তকালয় সমূহ সর্ব্বলোকের নিমিত্ত উন্মুক্ত করা হইতে লাগিল। এবং আর এক লাভ হইল, লুটপাটে ছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সংগৃহীত পুস্তকের লিপিসংখ্যা বাড়াইয়া পরস্পরের সহিতআদান প্রদান চলিতে লাগিল। এইরূপে প্রাচ্যের বহু পুস্তক প্রতীচ্যের লাইব্রেরীতে পাণ্ডুলিপিরূপে সংগৃহীত থাকিল। ভারতবর্ষ আরব ও গ্রীসের মানসিক কুটুম্বিতা এইরূপে বজায় রহিল। বোগদাদ ও ত্রিপলির খলিফারা এবং স্পেনের মূরেরাও একদিন বিদ্যানুরাগিতায় এবং লাইব্রেরী প্রতিস্থাপন বিষয়ে মানবজাতির অগ্রণী ছিলেন। ইহাঁদেরই নিযুক্ত বহু লিপিকারগণের প্রসাদে আজ ভারতবর্ষের অনেক লুপ্ত সাহিত্য বিদেশ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়।

রাজাদের দেখা দেখি বড় মানুষদের মধ্যেও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা ক্রমে অতীতকালে একটা ফ্যাসান দাঁড়াইতে লাগিল। আজকালও তা লক্ষিত হয়—মানুষের স্বভাব অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ হইয়া একই ভাবে চলিতেছে। চিনিবাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় চিনির স্বাদের ভাগী ইহাঁরা অনেকেই নহেন, শুধু বোঝা বহনের অধিকারী। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত সুবিপুল লাইব্রেরীর অতি অল্প গ্রন্থই ইহাঁরা স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া লাভবান্ হন. অথচ অন্যকেও ব্যবহার করিতে না দিয়া যাঁহারা শুধু সংগ্রহসুখ ভোগ করিতেছেন তাঁরা কৃপাপাত্র। কিন্তু লাইব্রেরীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—বিদ্যালোলুপ হইয়া শুধু সংগ্রহগৌরব-

লোলুপ হইলেও তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের লাইব্রেরীর দ্বার বিদ্বৎগণের জন্য অবারিত রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে সকল লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করিতেন তাঁহারা প্রায়শই বড় বড় কবি, বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ।

প্রাচীন লাইব্রেরীগুলির সহিত লিপিকলার অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। মুদ্রাঙ্কন আবিষ্কারের সহিত সে কলার অবসান হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে বেদব্যাস ও গণেশের সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। বেদব্যাস যিনি তিনি রচয়িতা, আর গণেশ যিনি তিনি লেখক। এখনকার দিনে ভাবুক ও লেখক একই ব্যক্তি, কিন্তু সম্ভবতঃ তখন প্রত্যেক চিন্তাশীলের চিন্তাসামগ্রী সুন্দর বেশে লোকের সাম্‌নে ধরিবার ভার ছিল অন্যের উপর। এখন ভাবুক ও লেখক এক বটে, কিন্তু লেখাকুমারী ও ছাপাসুন্দরীর অধ্যক্ষ এখনও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। যতদিন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই—যতদিন হাতে লিখিয়া লিখিয়া পুস্তকের সংখ্যা বাড়াইতে হইত, ততদিন সরস্বতীকে সাধারণভোগ্যা করা কত দুরূহ ছিল আমরা অনুমান করিতে পারি। সেই দুরূহ সাধনা যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের নমস্য, অতীতের সেই অসংখ্য লিপিকারেরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁহারা তাঁহাদের শ্রমকে সৌন্দর্য্যবোধের সঙ্গে মিলিত করিয়া ভবিষ্যতের মানববংশের মানসিক আহার-সামগ্রী ভাণ্ডার ভরিয়া ভরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের জাগ্রতি সব দেশেই প্রবল হইয়া উঠিল। গুটিকতক উচ্চস্তরের মানবে অধিষ্ঠিত পারমার্থিক রসের পাশাপাশি সার্ব্বজনীন-অনুভূতি-রস আত্মবিকাশের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে থাকিল। সামান্যকে কল্পনা ও কলাশ্রীমণ্ডিত করিয়া জগতের সমক্ষে ধরিবার আকাঙ্ক্ষা জনহৃদয়সমুদ্রে উদ্বেল হইল। তারই ফলে আজ শত সহস্র পুস্তকাগারে লক্ষ লক্ষ সাহিত্য-গ্রন্থ। কিন্তু প্রকৃতিতে দেখা যায় কুঁড়িমাত্রই পূর্ণসুষমাসম্পন্ন পুষ্পরূপে প্রস্ফুটিত হয় না, এবং শত শত পুষ্পের মধ্যে একটি ফলবান্ হয়। যতগুলি প্রাণ আপনাকে ব্যক্ত করিতে চায়, সকলেরই ভাষায় আত্মপ্রকাশ যে সাহিত্যপদবাচ্য তাহা নহে, তুলিধারী মাত্রেই চিত্রকর নহে, গায়কমাত্রেই গুণী নহে। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লেখকের আত্মপ্রকাশের সুলভতায় আধুনিক লাইব্রেরীগুলি যে ধানের বদলে খোসায় কলেবর ভরিতে না পারে এমন নহে সুতরাং আধুনিক লাইব্রেরীয়ানের দায়িত্ব প্রাচীন লাইব্রেরীয়ানের তুলনায় অত্যধিক। নির্ব্বাচনশক্তি গ্রহণ ও বর্জ্জনশক্তির যথোচিত প্রয়োগক্ষমতা না থাকিলে, আধুনিক লাইব্রেরিয়ান মানসিক উন্নতির স্থলে মানসিক অবনতি বিস্তারের সাহায্য করিতে পারেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, ইংলণ্ডের লাইব্রেরীর বিবরণীতেও পাওয়া যায় শতকরা পঞ্চাশ এমন কি পঁচাত্তরটি পাঠক উপন্যাসের পিপাসী। সুতরাং এই উপন্যাসসাহিত্য সম্বন্ধে গুণী সমাজকে ও লাইব্রেরীয়ানকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে—কোন্ উপন্যাস সাহিত্যপদবাচ্য—কোন্ উপন্যাস মনের পক্ষে উপাদেয় কোনটি বা হানিজনক তাহা বিচার করিয়া লাইব্রেরীতে স্থান

দিতে হইবে। য়ুরোপের এক একটি বড় পুস্তকাগারের লাইব্রেরীয়ানের পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ, রসগ্রাহিতাও তদনুরূপ তীক্ষ্ণ, সুন্দর অসুন্দরের বিচারশক্তিও অপূর্ব্ব ধারাল। কলিকাতার থ্যাকারস্পিঙ্ক কোম্পানীত একটি পুস্তকের দোকান মাত্র—কিন্তু তাহার পুস্তকসম্ভার লাইব্রেরীপদ যোগ্য—এবং তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব ফুলের মধুনিবিষ্ট ভোমরার ন্যায় প্রায় প্রত্যেক পুস্তকের মর্ম্মে প্রবিষ্ট ও পুস্তক-জগৎ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। আমাদের দেশের ছোট বড় সকল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানদের নিজেকে এই ভাবে গুণী করিয়া তোলা কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক লাইব্রেরীর পাঠকপাঠিকা-সংখ্যার তালিকার অনুপাতে যে জনপদে সে লাইব্রেরী স্থাপিত সেই জনপদবাসীদের আত্মোন্নতি কামনার বা সভ্যতার মাত্রার পরিমাণ করা যাইতে পারে। য়ুরোপের মধ্যে জার্ম্মাণীর লাইব্রেরীগুলির পাঠকসংখ্যা সর্ব্বোচ্চ, রাশিয়ারও কম নহে। প্রাচ্য দেশের মধ্যে জাপানের পাঠকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আপনাদের এই লাইব্রেরীটির পাঠক পাঠিকাসংখ্যা যতই বাড়িবে ততই আপনাদের এই জনপদটি মানুষ হওয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে জানিবেন।

কিন্তু শুধু মিষ্টি খাইয়া শরীর বাড়েনা সকলেই জানেন, কিছু কটু কষায় লবণাক্ত জিনিষও প্রতিদিন দেহে যাওয়া চাই,নতুবা পাকযন্ত্রের জারকরসের মাত্রা পূর্ণ হয় না,এবং জীবনীশক্তিতেই খাঁকৃতি পড়িয়া যায়। বাঙ্গালীর দৈনিন্দন আহার্য্যতত্ত্বে বঙ্গগৃহিনীরা এ বিষয়ে তাঁদের অশিক্ষিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন—কিঞ্চিৎ কটু সুক্তানি হইতে আরম্ভ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এর বিধি বাঁধাই আছে। অতএব সুধীপাঠকমণ্ডলী লাইব্রেরীয়ানকে সাহায্য করিবেন, নিজেদের হিতকল্পেই আপনাদের লাইব্রেরীটিকে শুধু রসিকগণের রসভাণ্ডার করিবেন না, ইহাতে জ্ঞানীগণের জ্ঞানরত্নের মণিপ্রাসাদ ও ভাবুকগণের চিন্তাসম্পদের শ্রীনিকেতনও গাঁথিয়া তুলিবেন।

আপনাদের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা বিরল বলিয়া আজ পর্য্যন্ত আপনারা ভগ্নোৎসাহ হন নাই দেখিয়া আনন্দবোধ করিতেছি। সরস্বতী লক্ষ্মী দুই ভগিনীর তথাকথিত বিবাদে আমি বিশ্বাস করি না। দুই এক। লক্ষ্মীমন্তরা সরস্বতীর সেবা সম্যক্‌রূপে করিবার অবসর প্রাপ্ত হন, এবং সরস্বতীর সাধকেরা অযাচিত লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন। সাধনার একাগ্রতায় ফল লাভ হয়, অন্যথা নহে। প্রতীচ্যের ছোট বড় কোন লাইব্রেরী এক পুরুষে গড়িয়া উঠে নাই। সংগৃহীত পুস্তকাবলীর জন্য স্থায়ী বাসভবনের ব্যবস্থা বহু আয়াসসাপেক্ষ হইয়াছে। আজ আপনাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, যে দেবী সরস্বতীর সাধনায় আপনারা ধৃতব্রত তিনি উত্তোরোত্তর আপনাদের উন্নতি সাধন করুন।

আজ আমাকে আপনাদের সভানেত্রীর পদে বরিত করিয়া এবং অভিনন্দন পত্রের দ্বারা আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এবং সকল সম্মানের অভিলক্ষিতা সর্ব্ববুদ্ধিস্বরূপা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী বাগীশ্বরীর পাদপদ্মে উহা উৎসর্গ করিয়া আমার বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

য়ুরোপে ও বঙ্গে রূপকনাট্য

এরিষ্টটল্ যখন বলিলেন যে নাটক ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা সভ্যতাবিশেষের আত্মপ্রকাশ, তখন তিনি সত্যকে অসম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও খণ্ডাকারে ব্যক্ত করিলেন মাত্র। অবশ্য তাঁহার এই কথা অধিকাংশ নাটক সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু তিনি বিশেষ বিচার করিয়া দেখেন নাই যে এমন কতকগুলি নাটক হইতে পারে যাহাদের সার্থকতা আত্মপ্রকাশের মধ্যে নয়, আত্মপ্রকাশের ব্যথার মধ্যে। নাট্যকার যখন সত্যের নিবিড় অনুভূতিজনিত আবেগে ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন ও তাঁহার অন্তরের সঙ্গে জগতের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ঘটনাবলীর গূঢ় সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার এই গোপনচারী জীবন নাটকটীকে রঙ্গমঞ্চের রূঢ় আলোকে স্থাপন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন,—যখন অন্তরাত্মার সহিত তাঁহার এই আত্মীয় বস্তু-জগতের চিরন্তন সংযোগ ও গুহ্যমিলন ভাষায়, ভাবে, ঘটনা বৈচিত্র্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টায় আকুল হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখেন তখন বুঝিতে পারেন যে মানুষ তাহার ভাষা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ, অনেক প্রাচীন এবং তাহার এই আদিমকালের বিরাট নাম্নকটী ব্যবহারিক জগতের সাধারণ বৈচিত্র্যের মধ্যেও সুচিন্তিত ভাষার সীমাবদ্ধ স্পষ্টতার মধ্যে আত্মবিকাশে অসমর্থ। তখন তাঁহার সমস্ত অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠে এবং তাহার গাঢ় অনুভূতি বাক্যের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা দেখিয়া প্রকাশের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া আত্মপ্রকাশের অন্ধকার পাষাণকারার মধ্যে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া ফিরে। কিন্তু অনুভূতির ধর্ম্মই প্রকাশ—তাহা ভাষায় হউক, ভাবে হউক, আর রূপেই হউক। কেননা ঘন অনুভূতির রুদ্ধ আবেগ অন্তর-প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। তাই এই প্রকাশ অপ্রকাশের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অন্তরাত্মা মর্ম্মান্তিকরূপে বিধ্বস্ত ও নিষ্পেষিত হইয়া তাহার গোপন বাণীটিকে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করে। এইখানেই কবির সৃষ্টি। আসন্নপ্রসবা জননী যেমন জঠরস্থিত সন্তানটীকে প্রসব করিয়াই তাঁহার সন্তান বহনের আনন্দ ও মাতৃত্বের চরম সার্থকতা উপলব্ধি করেন—তিনি যেমন তাঁহার ভিতরে সন্তানের পরম অনুভূতিজনিত প্রীতি অপেক্ষা বিরাট যন্ত্রণামূলক প্রসবের মধ্য দিয়া প্রাপ্ত সৃজনের সফলতাকেই অধিক সহজ ও আকাঙ্ক্ষিত মনে করেন—কবি ও সেইরূপ তাঁহার আত্মজ সৃষ্টিভ্রূণকে অতলস্পর্শ অন্ধকার হইতে গভীর বেদনার পথ দিয়া জগতের আলোকের মধ্যে বাহির করিয়া কবিজীবনের চরিতার্থতা অনুভব করেন। এই প্রকাশের আবেগ কখনও বা ভাষাকে ছন্দিত করিয়া লিরিক্ (Lyric) কবিতা কিম্বা গানের আকারে, আবার কখনও বা বহুবর্ণের সংযোগ বিয়োগে রংএর সৃষ্টি করিয়া চিত্রকলার আকারে স্ফুরিত হইয়া উঠে। কিন্তু কখন কখন এইরূপ দেখা যায় যে এই লিরিক

উচ্ছ্বাস আপনার মধ্যে পূর্ণতা এবং আত্মনির্ভরের অভাব দেখিয়া সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আশ্রয় করিয়া লিরিক্ নাটকের আকারে বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু এইরূপ গাঢ় অনুভূতি জনিত উচ্ছ্বাস বাহ্য জগতকে এবং সাধারণ ভাষাকে গ্রহণ করে না—অবলম্বন করে মাত্র। সুনিপুণ চিত্রকর যেমন কয়েকটী রেখাসম্পাতে জল প্রপাতের এইরূপ চিত্র আঁকিতে পারেন যে আমাদের মনে হয় যেন জল-কল্লোল শুনিতে পাইতেছি—সেইরূপ এই কবি বা নাট্যকার কয়েকটী সাধারণ ঘটনা ও কতকগুলি সাধারণ কথার সামঞ্জস্যে তাঁহার "অকথিত বাণী, অগীত গানে"র আভাষ দেন মাত্র। রেখা যেমন শব্দের আভাষ আনে এবং শুধু এই আভাষটুকু আনিবার জন্যই যেমন তাহার প্রয়োজন, ঘটনা ও ভাষাও সেইরূপ আত্মার সহিত জগতের ও জগৎ কর্ত্তার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধটীর ইঙ্গিতটুকু দিবার জন্যই কবির গ্রহণীয়। এইজন্যই কাব্যে রূপকের আবির্ভাব। এরিষ্টট্‌ল্ যে নাটক সম্বন্ধে এই সত্য বুঝেন নাই তাহার কারণ গ্রীকনাটকে মিষ্টিসিজম (Mysticism) এর বাহুল্য বিশেষ ছিলনা। গ্রীকদের সভ্যতা, নীতি, গবেষণা, দর্শন ও স্বদেশপ্রেমিকতা—ইত্যাদিই তাহাদের নাট্য সাহিত্যে প্রকাশ হইয়াছিল। Renaissance এর যুগে ইংলণ্ডের প্রচুর নাট্য-সাহিত্যের ভিতর কর্ম্ম ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশই আমরা অধিক দেখিতে পাই, তাহার কারণ এলিজ্যাবেথের যুগ কর্ম্মের যুগ। মধ্য যুগের সুষুপ্তির পর যে কাজের ডাক, আনন্দের ডাক ইংরাজের প্রাণে আসিয়াছিল—যাহাতে নূতন জগতের সন্ধান মিলিল, আরম্যাডা (Armada) বিধ্বস্ত হইল, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরাট পঞ্জরের পর নূতন ধর্ম্মজীবনের সৃষ্টি হইল, তাহারই প্রকাশ আমরা সেক্‌স্‌পিয়ার, মার্লো, কিড, পীল, গ্রীন ইত্যাদি মনীষিগণের নাটকে দেখিতে পাই। কিন্তু এই পরম অনুভূতি, এই অনির্ব্বচনীয়তার প্রকাশ, গোধূলি লগ্নে আত্মার ও জগতের "চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে, সরমে, সম্ভ্রমে"—এই বিরাট অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার গভীর আকাঙ্ক্ষা আমরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যে দেখিতে পাই না। এখন দেখা যাক্ এই প্রকারের নাটক আমরা সাহিত্যে প্রথম কোথায় পাই।

প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা এই অতীন্দ্রিয়তার অভিব্যক্তি একেবারেই দেখিতে পাই না। সংস্কৃত নাটক স্পষ্ট ও সরল। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিকে প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তিত করিয়া লেখকগণ চলিত নাট্যপদ্ধতি অনুসারে গড়িয়া লইতেন ও মানুষের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, হাসি কান্নার বাস্তব সুরের সাহায্যে অবাস্তব পৌরাণিকতাতে স্ফুটতর করিয়া তুলিতেন। এই বাস্তব অবাস্তবের মধ্য পথে মিলন সংস্কৃত নাটকের একটী রমণীয় বিশেষত্ব। ইহার ফলে মানবজীবনের চিরন্তন সত্যগুলি ঔপন্যাসিকত্বের রামধনু-বর্ণচ্ছটায় পরম বরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে অস্পষ্টতার লেশমাত্র নাই। দ্যুলোক ভূলোকের মিলন মোহনায় সংস্কৃত কবিগণ যে নাট্যজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা, পুরুরবা ও উর্ব্বশী, মালবিকা ও অগ্নিমিত্র, মালতী ও মাধব, পূর্ব্বরাগ

অনুরাগ, বিরহ-মিলনের মধ্যে মানুষের পুঞ্জীভূত সুখ দুঃখ লইয়া বিচরণ করিতেছেন— যেখানে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণকে মানবাকারে—কখনও বা কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের রূপে আবার কখনও বা বিরহবিধুর প্রেমিকের রূপে প্রকাশ হইতে দেখা যায়, সেই নাট্যালোকে কোনও রহস্যরূপক অথবা অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিত আমাদের বুদ্ধিকে ও সহজ অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে না। আশ্চর্য্যের কথা যে এই নরনারী-কণ্ঠ-মুখরিত লীলা-চঞ্চল স্নিগ্ধোজ্জ্বল নাট্যকুঞ্জ কাননের কোন প্রদেশেই প্রাচীন উপনিষদের সজল-ঘন ছায়াসম্পাতে নিবিড় রহস্যময় হইয়া উঠে নাই।

পূর্ব্বেই গ্রীক্ নাটকের কথা বলিয়াছি। সোফোক্লিস ও ইউরিপাইডিস্এর মধ্যে রহস্যের কণামাত্র নাই। তবে এস্কিলাস্ এর প্রমিথিয়াস্কে আমরা একেবারে রূপক বর্জ্জিত বলিতে পারি না। কিন্তু এই রূপকের সঙ্গে রহস্যের কোন সম্বন্ধই নাই। যে সনাতন বিদ্রোহ মানুষের প্রকৃতিগত, যে প্রাচীন অসন্তোষ স্বাধীনতার বীজমন্ত্র, যাহা সরল স্পর্দ্ধার আকারে আভিজাত্যের প্রবীণ অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়া, পুরাতন শাসন শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া, ঝড়ের দেবতার মত স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে,—যে রুদ্রশক্তি ক্রমবিকাশের জীবন ও যাহা সত্তা অনুসত্তার চিরন্তন দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবআত্মাকে গতিশীল গূঢ় উৎকর্ষের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, যাহাকে হেগেলের ভাষায় ডায়ালেকটিক্ (Dialectic) শক্তি বলা যাইতে পারে—মানুষের মধ্যে সেই বিরাট শক্তির প্রথম আত্মউপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা রূপকের আকারে এস্কাইলাস্ তাঁহার গ্রীক পুরাণ হইতে গৃহীত প্রমিথিয়াসের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং রূপকাকারে প্রকাশিত এই চিরন্তন সত্যের শরীরীরূপকে আমরা রহস্য বা মিষ্টিসিজম্ নামে অভিহিত করিতে পারি না।

অগষ্টাসের যুগের কিছু পূর্ব্ব হইতে লাটিন সাহিত্যে যে নবজীবনের প্রথম প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাহার ভিতর আমরা হাস্যকৌতুকপূর্ণ মিলনান্ত নাটকের প্রাচুর্য্যই অধিক দেখিতে পাই। টেরেন্স ও প্লটাস্ রোম রঙ্গমঞ্চের রঙ্গদুলাল। নূতন সাম্রাজ্যের আনন্দ গরিমায় রোমের জাতীয় প্রতিভা তখন হাস্য কলরবের মধ্যে বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ইটালীর সামাজিক জীবনের প্রকৃত প্রকাশ। অবশ্য ষ্টোয়িক্ দর্শনের গাম্ভীর্য্য এই সময়ের ইটালীয় সাহিত্যকে গুরু গম্ভীর করে নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। সিসারো ও সেনেকা (Cicero & Seneca) তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্তু ইঁহারা জীবনে ও সাহিত্যে গ্রীক দর্শনের সুচিন্তিত অভিব্যক্তি মাত্র। জাতীয় জীবনের আনন্দপুঞ্জের সহজ ও স্বতঃ প্রকাশ আমরা ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাই না। গ্রীক পুরাণ হইতে গৃহীত কতকগুলি গল্প লইয়া সেনেকা কতকটা নূতন পদ্ধতি অনুসারে ইহাদিগকে ট্র্যাজেডির আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আকটভিয়া নাটকে বর্ণিত নীরোর (Nero) হৃদয়হীনতার চিত্র ও রাণীর নিষ্পেষিত জীবনের করুণগাথা ব্যতীত,—মানুষের প্রাণের কথা, দৈনিক জীবনের সহজ সরল ভাব অথবা সাধারণ ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত মধুগম্ভীর রহস্য অন্যান্য নাটকের মধ্যে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। বিনাশের নিষ্ঠুর হোলীখেলার মধ্যে দ্বিধাহীন রক্তপাতের ভীষণতায়,

প্রেতলোকের দীর্ঘ অস্পষ্ট ছায়ায় অথবা শীর্ণ কঙ্কালমূর্ত্তিগণের আবির্ভাবে, পুঁথিগত দর্শনের অসাধারণ রূঢ় গাম্ভীর্য্যে, সেনেকার নাট্যজগৎ যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জীবের অপ্রাকৃত রণক্ষেত্র হইয়া উঠে। সুতরাং এখানে আমরা রহস্যনাট্যের কোন চিহ্নই পাই না। এ সম্বন্ধে আর একটি চিন্তার বিষয় এই যে ষ্টোয়িক্ দর্শন বুদ্ধির উপাসনা। এই তুষারশীতল মর্ম্মরপ্রতিমার মন্দিরে অনুভূতি ও কল্পনার স্থান নাই, সুতরাং এ রাজ্যে অতীন্দ্রিয় ভাবের সন্ধান বৃথা।

ইংরাজী নাটকের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মধ্যযুগে রূপকের প্রাদুর্ভাব ইংরাজী নাটকে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ পদার্থ কিছুই নাই। যীশু খৃষ্টের ও খৃষ্টান মহাত্মাদের জীবনের কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত অনেকগুলি নাটক নামধেয় পুস্তক পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অনেক "নীতি-নাটক" (মরালিটি প্লে) পাওয়া যায় যাহাতে কবি কতকগুলি পাপ পুণ্যকে বায়বীয় জগৎ হইতে আহরণ করিয়া তাহাদের দেহহীন অস্তিত্বের উপর বাস্তব জগতের কঠিন পরিচ্ছদ পরাইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নাটকের রূপক অত্যন্ত সাধারণ ও কষ্টকল্পিত। এই সকল চরিত্রের রবময় নৈতিক দাম্ভিকতার মধ্যে অত্যন্ত দীন, গ্রাম্য অমার্জ্জিত ও ইতর ভাব লক্ষিত হয়। মনে হয় যেন ধর্ম্মযাজকের নৈতিক বক্তৃতা আধ্যাত্মিক আবরণ নিক্ষেপ করতঃ শরীরী হইয়া মঞ্চের উপর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মধ্যযুগের মঠবাসী ইংরাজ সন্ন্যাসিগণ যে রহস্যলোকে বাস করিতেন, যেখানে প্রদোষের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অলৌকিক জগতের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সকল ধ্যানমগ্ন সাধকসাধিকাগণকে চকিতের জন্য চমকিত করিয়া যাইত, যেখানে কুমারী সন্ন্যাসিনী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নির্জ্জন বাতায়নে দাঁড়াইয়া সুরভি অন্ধকারের লক্ষ ইঙ্গিতের মধ্যে চির সুন্দরের অভিসার প্রতীক্ষা করিতেন,—আশ্চর্য্যের বিষয় যে মধ্যযুগের "নীতিনাটকে" এই অস্ফুট ধর্ম্ম জগতের অস্পষ্ট মেঘালোক রেখা-সম্পাত পর্য্যন্তও করে নাই, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়তার আবির্ভাব দেখা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ১৮৯৩ সালে ফরাসী দেশে এই অতীন্দ্রিয় অথবা সিম্বলিষ্টিক্ নাটকের জন্ম। এই স্কুল রুষদেশীয় উপন্যাসজাত চিন্তার দ্বারা ও বিশেষ করিয়া টলষ্টয়ের প্রতিভা-প্রসূত ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণীত ও পরিপুষ্ট হয়। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নরওয়েবাসী ইবসেন, সুইডেনবাসী বার্ণসান্ ও বেলজিয়ম এর মরিস মেটারলিঙ্ক এই নূতন নাট্য-সাহিত্যযুগে অভিনব চিন্তার ধারা আনয়ন করিলেন। নাট্যজগতের এই নবীন পন্থীদের ভাব ও আদর্শ বিশিষ্টরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে চিন্তার ধারা কিরূপ ছিল। সুনিশ্চিত নিয়মবদ্ধ সাহিত্য-জগতের সাহিত্য-সম্রাট তাঁহার একাডেমির ভিতর দিয়া সমস্ত ইউরোপের উপর যে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে ভাষার বাহ্যিক উৎকর্ষ যথেষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবে সাবধানী প্রতিভার ভীরু উন্মেষে, নিয়ন্ত্রিত কল্পনার অশোভন বিকাশে, বিচার ও সাধারণ বুদ্ধির আস্ফালনে এই সময়ের সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি একটা অসহজ দাম্ভিকতা ও অসুন্দর সাধারণত্বের ভিতর গণ্ডীবদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই সংযত-যুগের প্রকাণ্ড প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া আমরা নূতন সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে দেখিতে পাই। ফ্রান্সে ভল্‌টেয়ার, রুশো এবং ভিক্টর হিউগো, জার্ম্মণীতে কাণ্ট, হেগেল, নীটশে, ফিক্‌টে, গ্যেটে এবং শিলার (Schiller) ইংলণ্ডে শেলি, বায়রন, কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ইউরোপব্যাপী বিরাট আন্দোলনের জীবনস্বরূপ। নূতন পুরাতনের ঘাত – প্রতিঘাতে, স্থিতিস্থাপক বিশ্বাস ও বিদ্রোহী স্বাধীন চিন্তার যুদ্ধে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্ট হইয়াছিল সেই সমুদ্রমন্থন হইতে আমরা এক বিপুল সহজকে উত্থিত হইতে দেখি।

"ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে"

প্রলয়ের অস্থির আবেগ ও সৃজনের আনন্দ আমরা এই সময়ে একত্রে দেখিতে পাই। ইউরোপে ইহাই রোমাণ্টিক যুগের সহজ প্রবণতার উপাসনা। ইহা সাহিত্যের একটা নূতন সৃষ্টির যুগ। এই সময়ের নাট্য-সাহিত্যে আমরা কল্পনা ও দর্শনের অনিন্দসুন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয়ভাবের প্রকাশ আমরা এ সময়ের নাটকে দেখিতে পাই না। অবশ্য, গ্যেটের ফষ্ট, শিলারের মেড্ অব্ অরলিয়ান্স (Maid of orleaons) এবং শেলির প্রমিথিয়াস্ আন্‌বাউণ্ড এর মধ্যে রহস্যের ছায়া যে একেবারে নাই,তাহা বলা কঠিন , কিন্তু ফষ্ট,জোয়ান অব আর্ক ও প্রমিথিয়াস্ ইত্যাদি বর্ণিত বিষয়ে যে পুরাতন রহস্য নিহিত আছে কবিগণ ইহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন অতীন্দ্রিয় রহস্য সৃজনে মনোযোগ দেন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সভ্যতার শতমুখ প্রকাশের ভিতর আমরা লক্ষ্য করি যে অতৃপ্ত মানুষ বাহ্যজগৎ হইতে আপনাকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করিয়া গভীর অন্তর্বীক্ষণের দ্বারা আপনাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। অন্তর্জগতই তখন তাহার নিকট প্রকৃত সত্য এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ কোনও সুদূর অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্ফুট ইঙ্গিত মাত্র।

এই অন্তর্জগতের কার্য্যকলাপের প্রকাশ আমরা সিম্বলিষ্টিক্ নাটকে দুই প্রকার দেখিতে পাই। বুদ্ধি ও দৈনিক ঘটনার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া যে সহজ সত্যের ক্রমোন্মেষ হইতেছে যাহার ফলে সমাজ ও ধর্ম্মজগতের গতানুগতিক নিয়ম সকল প্রকৃতির নাগপাশ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, যাহা আধুনিক ইউরোপীয় মনোবৈজ্ঞানিকদের বিশিষ্ট গবেষণা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির উপর অবস্থিত, দৈনিক জীবনের মধ্যে সেই সত্যের রুদ্র প্রকাশ আমরা যে নাটকে দেখিতে পাই তাহাকে সাহিত্যের ভাষায় বাস্তব অথবা রিয়লিষ্টিক্ নাটক বলা হয়। ইবসেন, বার্ণসন্, বার্ণার্ডশ ইত্যাদি এই শাখার নাট্যকার। কিন্তু বাস্তববাদী বলিলে ইহাদের প্রকৃত বর্ণনা হইল না। সাধারণ ঘটনাবলীর রহস্যময় কাব্য তাঁহাদের সত্যার্থ প্রকাশকে সুন্দর করিয়াছে এবং এই

সৌন্দর্য্যের ভিতর তাঁহারা এক মহৎ আদর্শের দূরাগত চন্দনগন্ধে মধ্যে মধ্যে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা কেবল বাস্তববাদী নহেন—তাঁহারা রহস্যবাদী ও আদর্শের উপাসক—আইডিয়ালিষ্টিক্ এবং সিম্‌বলিষ্টিক্। ইবসেনের এনিমি অব্ দি পিপল্ (Enemy of the people) ও ওয়ারিয়ার্স্ অব্ হেল্‌গিল্যাণ্ড (Oarriors of Helgeland) এই মতের বিশেষ পরিপোষক।

কিন্তু এই শ্রেণীর আর এক প্রকারের নাটক আছে যাহার মধ্যে আত্মার গভীর অনুভূতি, অন্তর্জগতের ভাষাহীন রহস্য, অসীমের গোপন আমন্ত্রণ, ভূমানন্দের লক্ষ কম্পন, পরম বিরহের বেদনাস্পন্দন "নিশ্বাসে, উচ্ছ্বাসে, ভাষে, আভাষে, গুঞ্জনে চমকে পলকে" প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই প্রকার নাটকই প্রকৃত রহস্য-নাটক অথবা সিম্‌বলিষ্টিক্ নাটক। বেলজিয়ামে মেটারলিঙ্ক্, সুইডেনে ষ্ট্রীন্‌বার্গ, রাশিয়াতে এনড্রিভ্ অদৃষ্টবাদী। কঠোর জীবন-দেবতার সহিত কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন প্রদেশে মানবাত্মার যুদ্ধ ও পরাভব ব্ল্যাক্ মস্কার্স্ (Black Moskers এবং লাইফ অব্ ম্যান্ নাটকের জীবন। ষ্ট্রীন্ডবার্গ প্রাচীন প্রবাদ ও প্রাদেশিক জনশ্রুতিগুলির অন্তর্নিহিত প্রহেলিকার সহিত মানবজীবনের গুপ্ত সামঞ্জস্য তাঁহার নাটকে রূপকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও মেটারলিঙ্কের নাটক পূর্ব্বোক্ত লেখকদের নাটক হইতে যথেষ্ট পৃথক। ইহাদের উভয়েরই চিন্তারধারার মধ্যে সম্পূর্ণ মৌলিকত্ব আছে। উভয়েই আত্মার "রূপসাগরের" মধ্যে "অরূপ রতনের" সন্ধান। বস্তুজগতের আবরণের নীচে, দৃশ্যমান ঘটনা-সমষ্টির পশ্চাতে যে অমর সত্য সৌন্দর্য্যের আকারের আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে উভয়েই সেই গোপন-বিহারী চিরসুন্দরকে আত্মদৃষ্টির দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের উভয়ের মধ্যে আবার পার্থক্যও যথেষ্ট। টিউটান প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে আর্য্যঋষিসন্তান রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা দৃষ্ট হয় না, ব্লু বার্ড (Blue Bird)ও জয়জেল্ (joyzelle) নাটকে মেটারলিঙ্ক্ বস্তুজগৎ ও মনোজগতের ফিনোমিনান অথবা পরিদৃশ্যমান ঘটনার অবস্থার মধ্যে সত্তার অথবা ন্যুমিননের (Noumenon) মধুর রূপ দেখিলেন বটে, পিলিয়াস্ এবং মেলিস্যাণ্ডা নাটকে তিনি মরণের মধ্যে প্রেমের নিয়মহীন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহার আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীর আনন্দ ও নিবিড় বেদনা কোথায়? মেটারলিঙ্কের রূপের পূজায় উপাস্য উপাসকের পার্থক্য আছে; তিনি দূর হইতে রূপের মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন! রবীন্দ্রনাথের পূজায় দেবতা ও পূজারী বিরাট প্রেমের ঘন আনন্দের ব্যথার মধ্যে একাকার হইয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিতর আত্মবিস্মৃতি, মহামিলন ও আত্মউপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। "রাজা" নাটকের সুদর্শনার মত অন্ধকারের মধ্যেই কবির সহিত এইরূপ দেবতার অভিসার মিলন। এই বিশ্বরূপের প্রেমে, এই প্রথম দরশমুগ্ধ আত্মার রূপবিহ্বলতায়, এই বিশ্বপ্রাণের আকর্ষণের তন্ময়তায় রবীন্দ্রনাথ আত্মপর ভুলিয়া কঠোর বস্তুজগতের বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া মহা

অভিসারোন্মুখী হইয়া উঠিয়াছেন ও প্রাণের শিরা উপশিরার মধ্যে রক্তের ছন্দিত নৃত্যের মধ্যে বিশ্বসঙ্গীতের তালে তালে যেন অনুভব করিতেছেন,—

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে !
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে !
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি তার মনে তাহা আনি
চির দিবসের ভুলে যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে !
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে !

এই পরম অনুভূতি মেটারলিঙ্ককে নাই ও এই অনুভূতির প্রকাশ আমরা আধুনিক রহস্যনাটকগুলির মধ্যে দেখিতে পাই।

এখন আমরা এই নাটক সম্বন্ধে কিছু বলিব। রবীন্দ্রনাথ পাঁচখানি রহস্য নাটক লিখিয়াছেন—'রাজা' 'ফাল্গুনী' 'গুরু' 'ডাকঘর' ও 'মুক্তধারা'। ইহাদের ভিতর ডাকঘর ব্যতীত আর সকল নাটকের মধ্যেই গানের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। এখানে যেমন ইউরোপীয় রোমান্টিক্ নাটক অথবা সংস্কৃত নাটকের ন্যায় অঙ্ক ও দৃশ্যের বিভাগরীতি নাই, সেইরূপ গ্রীক-নাটকের মত এরিষ্টট্লের ইউনিটি অথবা দেশ, কাল ও ঘটনার ঐক্য ও সামঞ্জস্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। তাহার কারণ, ইহারা আত্মার অনন্ত রহস্যের ইতিহাস ও দেশকাল পাত্রের বহু উর্দ্ধে। এক বিষয়ে এই নাটকগুলির মধ্যে একটি বিশেষ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, ইহারা কবিহৃদয়ের স্বাধীনতার গীতিনাট্য। অনেকগুলি গান ও প্রচুর কবিত্বস্ফুরণ অথবা লিরিক্যাল উচ্ছ্বাস আছে বলিয়াই শুধু ইহাদিগকে আমরা লিরিক্যাল নাটক বলি না। ইহারা কবির রূপোন্মত্ত আত্মার ছন্দিত অভিসার যাত্রা। কবি যখন আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, পুষ্পে, পত্রে, স্তব্ধ আকাশের নীরব ইঙ্গিতে অথবা নব প্রভাতের "গভীর-আলোর রবে",—বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুর মধ্যে রূপের আহ্বান শুনিতে পান, যখন পথপার্শ্বের ব্যাকুল বেণুবনের অব্যক্তগুঞ্জন অথবা দখিন সমীরের অস্পষ্ট চরণ-ধ্বনি তাঁহার প্রাণের ভিতর অগীত-সঙ্গীতের তরঙ্গ তুলিয়া যায়, যখন সুদূর তমালবনের শ্যামল ঘনচ্ছায়া জন্মজন্মান্তের প্রেয়সীর নিবিড় কৃষ্ণচক্ষের সজলস্নিগ্ধ কাতর নিমন্ত্রণের মত আকর্ষণ করে, তখন কবির আত্মা এই কারার মধ্যে মুক্ত বাতায়ন পথে অভিসারিকা রাধার মত রুদ্ধ আবেগে আকুলভাবে চাহিয়া থাকে। তখন এই অবরোধের বেদনা কবির আত্মাকে অস্থির করিয়া তোলে। তখন সমাজ ও সভ্যতার বন্ধন, ব্যবহারিক ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাস, পুরাতন নীতিজ্ঞানের নিয়মনিগড়,

অভ্যাসের গণ্ডী এবং এই রক্ত মাংসের কারাগার, কঠোর নিষেধের মত এই বিরহী আত্মাকে চতুর্দ্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু কখন্ কোন্ অনন্ত মুহূর্ত্তে মিলনাকাঙ্খী বিপুল আবেগে প্রলয় শিশুর মত সমস্ত বিধি নিষেধ চূর্ণ করিয়া মুক্ত-প্রাণ পথের আহ্বানে বাহির হইয়া বলে—

"চলি গো চলি গো, যাই গো চ'লে,
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশী,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি,
জলে স্থলে।"

এই অবস্থাই কবিপ্রাণের মুক্ত অবস্থা, ও এইখানেই কবির রূপের সঙ্গে মিলন। এই রূপ জগদ্ব্যাপী ও অনন্ত মধুর এবং এই নাটকগুলির মধ্যে পাত্র পাত্রীর ভিতর দিয়া কবির স্বাধীন আত্মার এই অনুভূতি, আশঙ্কা, বেদনা, সন্ধান, পথের অভিসার ও মিলন রূপকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য।

গীতিলিপি

গীতি

অরূপ

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরী,
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী।
কূলহারা কোন রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে
আপন মনে স্থির হয়ে রই করিনে চুরি,
ধরা দেওয়ার ধন সে ত নয় অরূপ মাধুরী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিকলপরা

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবরে বিকল ॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে আসা মোদের ক্ষয় করতে সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্বগ্রাস,
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস ॥
সেই ভয় দেখানো ভূতের মোরা করব সর্ব্বনাশ,
এবার আনব মাভৈঃ-বিজয়মন্ত্র বলহীনের বল ॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা
এযে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

নজরুল ইস্‌লাম

লিপি

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[মপা]

সা -া | সা -া II { রমা পা | পা-র্সা | র্সণা -দা I দণা ণা-দা |
আ ০ মা র্ ম ন্ চে য়ে ০ র য়্ ম নে ০

দাপা | পাদা I মা পাদা | দমপা -মপা | দপা -মপা I মজ্ঞা -া -া |
ম ০ নে ০ চে য়ে ০ মা ০ ০ ধু ০ ০ রী ০ ০

ঋা -া | সা -া } I সা সা -া | রা-মা | মা -া I পা দা -া |
আ ০ মা র্ ন য় ন্ আ ০ মা র্ কা ঙা ল্

ণা -া | র্সা-র্রা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞর্ঋা -া | র্সা -া I র্সর্ঋা-ণা -া |
হ ॰ য়ে ॰ ম রে ॰ না ॰ ঘু ॰ রি ॰ ॰

ণদা -া | পা-দা II { মদা দা -া | ণা -া | র্সা -া I র্সর্ঋা র্ঋা-র্সা |
আ ॰ মা র্ চে য়ে ॰ চে ॰ য়ে ॰ বু কে র

র্সা-ণা | র্সা -া I ণা -া র্সা | র্সর্ঋা -া | র্সা -া I দা-র্জ্ঞা র্জ্ঞা |
মা ॰ ঝে ॰ গু ণ জ রি ॰ ল ॰ গু ন জ

র্জ্ঞর্ঋা -া | র্সা -া I ণর্সা ণর্ঋা র্ণসা | ণা-দা | দা পা I সা সা -া |
রি ল ল ॰ এ কৃ তা রা ॰ যে ॰ ম নো

রা-মা | মা -া I মা পা-দা | পা-ণা | পদা -া I পা -া দা | দপা ণা |
র ॰ থে র প থে ॰ প ॰ থে ॰ বা জ ল বাঁ ॰

ণদা -া I পা -া -া | -দা -া | মা -া I মা পা-দা | দপাণা | ণদা-পা I
শী ॰ রী ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ রূ পে র্ কো ॰ লে ॰

মপা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা-রা | জ্ঞা -া I জ্ঞা-দা দপা | মজ্ঞা -া | -া -া |
ঐ ॰ যে দো ॰ লে ॰ দো ॰ ॰ লে ॰ ॰ ॰

জ্ঞমা মা -া | মজ্ঞা -া | ঋাজ্ঞা I সা -া -া | সা -া | সা -া II
অ রূ প মা ॰ ধু ॰ রী ॰ ॰

সা-মা -া | মা -া | মা -া I মদা দা-পা | মজ্ঞা রা | জ্ঞা -া
কু ল্ হা রী ॰ কোন্ র সে দূ স ॰ রো ॰

I জ্ঞরাজ্ঞা -া | -া -া | -মা-পা I পমা-ণা পদা-মপা-মা | জ্ঞা -া | জ্ঞমা মা -া I
বরে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ মূ ল্ হা রা ॰ কূ ল্ তা সে ॰

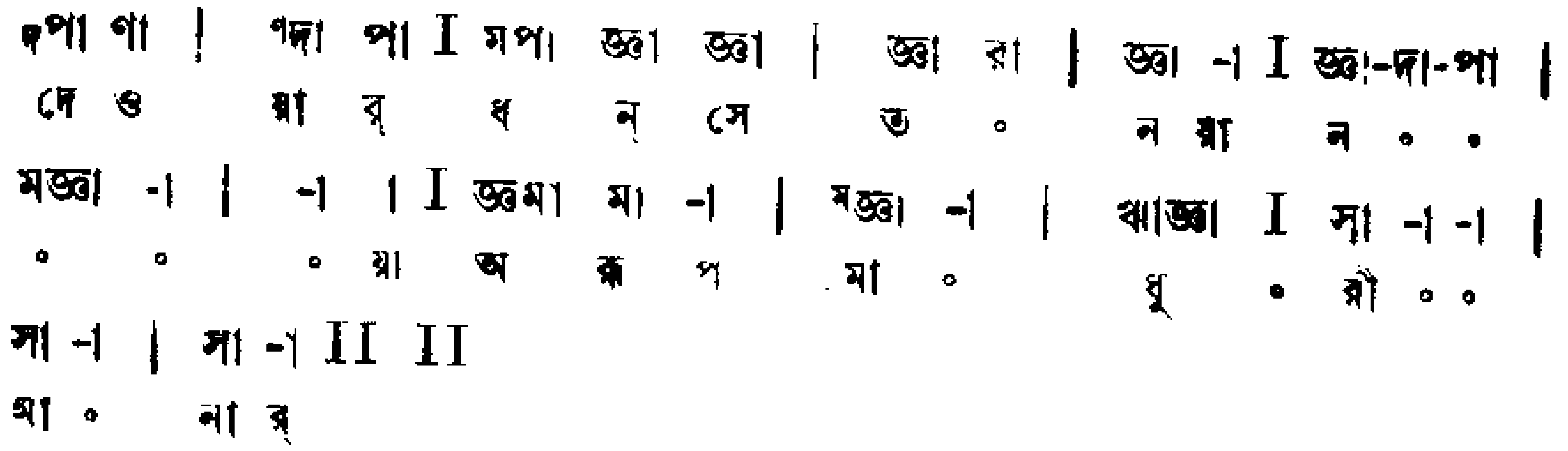
মজ্ঞা -া | ঋা জ্ঞা I জ্ঞঋা সা -া | -া -া | -া -া I দা দা -া |
জ ॰ লে র্ প রে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ হা তে র্

ণা -া | র্সা -া I র্সর্ঋা -া ণর্সা | র্সণা -া | র্সা -া I র্সণা -া র্সা | র্সর্ঋা -া
ধ ॰ রা ॰ ধ র্ তে গে ॰ লে ॰ ঢে উ দি য়ে ॰

র্সা -া I দা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা -া | র্সা র্ঋা I ণর্সা ণর্ঋা র্ণসা | না -া | দা
তা র ঢে উ দি য়ে ॰ তা র্ দি ই যে ঠে ॰ লে

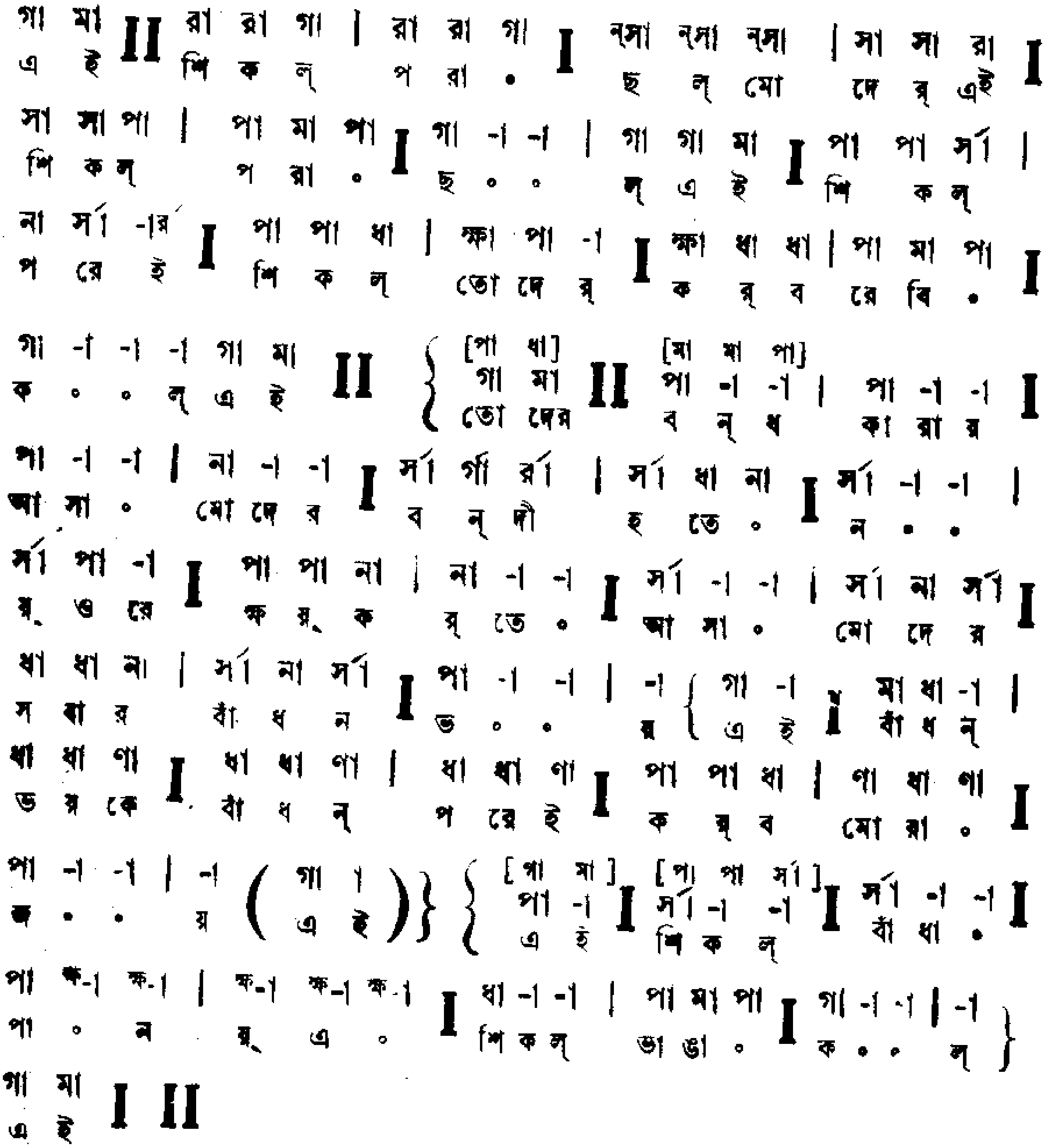
I সা সা -া | রা-মা | মা-পা I পা-র্সা ণা | পদা -া | পা-দা I দমা পা -া
আ প ন্ ম ॰ নে ॰ স্থি র্ হ য়ে ॰ র ই ক রি ॰

| পদা-পণা | পদা -া I পা -া -া | পদা -া | -মা -া I মা পা দা |
লে ॰ ॰ চ ॰ রি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ গ রা ॰



কথা, সুর ও স্বরলিপি :—নজরুল ইস্‌লাম।

(খাম্বাজ—দাদ্‌রা)



বাকী তিনটি অন্তরার প্রথম অন্তরার মতই সুর।

দেবী চৌধুরাণীর মঠে

[নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি হইতে ভারতীতে এ প্রবন্ধ পত্রস্থ করার কারণ বুঝা যাইবে ঃ—"সংপ্রতি শুনিলাম, আপনি আমার 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' সমালোচনা করিয়া বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। পরে বঙ্গবাণী আনাইয়া আপনার "সিংহের বিবরে" পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। আপনি এতদিন পরে আমার অনুরোধ রক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছেন এবং সেজন্য এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার সমালোচনা আমার পক্ষে নিতান্ত সুখকর না হইলেও এরূপ ধরণের মৌলিক গবেষণা অনেক দিন পড়ি নাই। পড়িয়া মনে হইতেছিল আপনি বঙ্গ সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়িয়া দিলেন কেন? পরে গতকল্য সংবাদ পত্রে দেখিলাম আপনি আবার ভারতীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতেছেন, এবং সেজন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। আশা করি আপনার পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে আবার বসন্তের হাওয়া বহিবে এবং ভারতী সমৃদ্ধিশালিনী হইবে।

আপনার সমালোচনা সম্বন্ধে আমার অনেক বক্তব্য আছে, সম্ভবতঃ তাহা আমি একটি প্রবন্ধের আকারে বাহির করিব। বিশেষতঃ নারীজাতির সম্বন্ধে আপনি আমার "মনস্তত্ত্বের" যেরূপ "বিশ্লেষণ" করিয়াছেন তাহাদ্বারা আমার প্রতি সম্যক্ সুবিচার করা হইয়াছে এরূপ বলিতে পারি না।"

পাঠকদের নিকট হইতে তাঁহার আশানুরূপ সুবিচার লাভের জন্য যতীন্দ্রবাবুকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে আমি বাধ্য। দুইপক্ষের যুক্তির অনুসরণ করিয়া পাঠকদিগের মতস্থিরের সুবিধার জন্য আমার প্রবন্ধটি বঙ্গবাণী হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার সহিত সংযুক্তভাবে যতীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি পাঠকেরা পাঠ করিবেন। ভাঃ সং]

সিংহের বিবরে

সম্মানাস্পদ সুহৃদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" নামক পুস্তকের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বইখানির নাম "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" এবং ব্রাকেটে উহার ফলিতার্থ দেওয়া আছে—'বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের গতি নির্ণয় ও সমালোচনা।' কিন্তু বইখানি পড়িলে প্রতীয়মান হয় "সাহিত্যের" স্বাস্থ্যরক্ষা নহে, বরং সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় "সমাজের" স্বাস্থ্যরক্ষাই ইহার লক্ষীভূত বিষয়। গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন আমাদের সমাজটা ছিল হৃষ্টপুষ্ট, আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, সুস্থ, পরম সুন্দর জীব,—সাহিত্যিক-বিশেষেরা তাকে ব্যাধিগ্রস্ত গলৎকুষ্ঠ করিতে বসিয়াছেন। যত কু-য়ের গোড়া ব্রহ্মার সেই অবতারগণের "প্রেমরোগ" নামক

"আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বিধবার প্রেমে পড়ার চিত্র কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। * * * রামায়ণে বালির স্ত্রী তারা বা রাবণ-বনিতা মন্দোদরীর তৎকালে প্রচলিত সেই দেই সমাজের প্রথা অনুসারেই পুনর্ব্বার দেবরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কাহারও প্রেমে পড়েন নাই।"

গ্রন্থের স্বতঃপ্রবৃত্ত ভূমিকা-লেখক গ্রন্থকারের মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া বলিতেছেন—"সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে যৌবনবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ত ঐ সকল ভাবের (অর্থাৎ পূর্ব্বরাগের বা প্রেমরোগের) অস্তিত্ব দেখা যায় না।"

দুইজনেই এইখানে এক মত যে বিধবাবিবাহটাও কখন কখন গায়ে সয়, কিন্তু সেই বিবাহটা "প্রেমে পড়া" পূর্ব্বক হইলেই মারাত্মক, তখনই সমাজের গায়ে ফোস্কা পড়ে, ফোড়া বাহির হয়, সমাজদেহ অস্পৃশ্য হইয়া যায়। উভয়েরই মতে এই প্রেমরোগ পুণ্যশরীর হিন্দুগৃহে কখন ছিল না, জর্ম্মাণ সেনানীর শত্রুরূপে ব্যাধিবীজ ছড়ানর মত নব্য বঙ্গসাহিত্যিকেরা ইহা সমাজদেহে ছড়াইতেছেন। যতীন্দ্রবাবুর মতে এই রোগের প্রতিষেধক "বাল্যবিবাহ"। এইখানে কিন্তু তদীয় ব্রাহ্ম পৃষ্ঠপোষকের তাঁহার সহিত মতের ঐক্য নাই, এস্থলে গোঁড়া হিন্দুসাধক ও গোঁড়া ব্রাহ্ম উত্তরসাধকে মতান্তর ঘটিতেছে। শেষোক্ত বলিতেছেন:—"একটি বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি এক মত হইতে পারি নাই। তিনি বাল্যবিবাহকে ঋষিপ্রবর্ত্তিত ও প্রেমরোগের অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির প্রতিষেধক বলিয়াছেন। বাল্যবিবাহ ঋষিপ্রবর্ত্তিত কি না সে বিষয়ে সকলে এক মত নহেন। দ্বিতীয়তঃ বাল্যবিবাহ যদি প্রেমরোগের প্রতিষেধক হইত, তবে যে সময়ে বাল্যবিবাহ খুবই প্রচলিত ছিল, সে সময়েও বৈষ্ণব কবিগণ পূর্ব্বরাগ, পরকীয়া প্রেম প্রভৃতির পূর্ণসত্তা উপলব্ধি করিলেন কিরূপে?"

যখন দুই বড় বড় ডাক্তারের দুই মত,—Consultationএ বসিয়া হিন্দুপ্যাথ এক কথা বলিতেছেন, আর ব্রাহ্মপ্যাথ তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া সজোরে আর এক মত জাহির করিতেছেন, তখন রোগীর দশা কি হয়?

যতীন্দ্রবাবু চার্জ্জশীটে যে চার্জ্জটা ফ্রেম করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই:—

১। প্রেম একটা রোগ।

২। এ দেশে ইহা পূর্ব্বে ছিল না।

৩। নব্যসাহিত্যিকেরা ইহার বীজ বিলাত হইতে আমদানী করিয়া সাহিত্যে ও সমাজে ছড়াইতেছেন।

৪। তাহাতে হিন্দুসমাজদেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে প্রেম জিনিষটার ধারণা হিন্দু-ভারতবর্ষে ছিল কি না, এবং দ্বিতীয়তঃ প্রেম বলিতে বুঝায় কি। শেষ কথাটার নিষ্পত্তি প্রথমে হইয়া যাক্।

"প্রেম" শব্দের সঙ্গে একটা hero worship বা উৎকর্ষ-পূজার ভাব আছে। যার-তার সঙ্গে যে-সে প্রেমে পড়ে না। ঘরকন্না সকলের সঙ্গে করা যায়, যত্ন স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা দিয়া অনেককেই ঘেরা যায়, কিন্তু 'প্রেমাস্পদ' একটি মাত্র প্রাণী হয়। প্রেম অসামান্যত্ব খোঁজে, যেখানে তাহা আবিষ্কার করে, অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বা অকস্মাৎ তাহাতে লগ্ন হইয়া যায়। প্রেমের আর এক গুণ তন্ময়তা, তদেকপরায়ণতা বা অনন্যমুখিতা। ক্ষণিকপ্রেমে ক্ষণিকভাবে এই তন্ময়তা, এই লগ্নতা, এই নিষ্ঠা থাকে, স্থায়ী প্রেমে স্থায়িভাবে। মোট কথা কোথাও একটুখানি অসাধারণতা বা চমৎকারিতার ইন্ধন ব্যতীত প্রেম জ্বলে না। 'মন্ত্রপড়া' মিলনে শুভলগ্নে শুভদৃষ্টির দ্বারা এই চমৎকারিতার বোধ জাগাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনে অতিপরিচয়ে অসাধারণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও অনেক সময় অনশনশীর্ণ হইয়া ক্রমে হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। কর্ত্তব্যবোধ, ধর্ম্মজ্ঞান, সমাজভীতি বা স্বার্থদৃষ্টি—কখন কখন বা স্নেহ ও দয়া তখন প্রেমের মোহর হস্তগত করিয়া প্রেমের নামে সংসাররাজ্য চালাইতে থাকে। কিন্তু মোহ ভাঙ্গিবার যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও যেখানে প্রেমের মোহ ভাঙ্গে না, কুরূপের বুকের মধ্যেও যেখানে অরূপ সুন্দরকে কোন যোগী বা যোগিনী একনিষ্ঠচিত্তে ধারণ করিয়া থাকে

ও পূজা করে সেই যোগীশ্বর বা যোগেশ্বরী সকল দেশে সকল কালে সকলের সম্মানার্হ। যতীন্দ্রবাবু 'প্রেম'কে যে বিলাতী মাল ভাবিয়া ঘৃণা করিতেছেন, 'শিবপূজায় লাগে না' বলিতেছেন, সেই বিলাতের নিম্নতম স্তরের জীবনেও এইরূপ প্রেমযোগী বা যোগিনীর চিত্র বিরল নহে। ইংরেজ কবি প্রেমবিহ্বলা রাণীর ভাষায় সেই চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন :—

No love where there is any guilt ? O God,

* * * * *

There is many a woman here in Padua,
Some workman's wife, or ruder artisan's,
Whose husband spends the wages of the week
In a coarse revel, or a tavern brawl,
And reeling home late on the Saturday night
Finds his wife sitting by a fireless hearth
Trying to hush the child who cries for hunger,
And then sets to and beats his wife because
The child is hungry, and the fire black.
Yet the wife loves him and will rise next day
With some red bruise across a careworn face,
And sweep the house, and do the common service,
And try and smile, and only be too glad
If he does not beat her a second time
Before her child !—That is how women love."

প্রেমের সঙ্গে আর একটা ভাব প্রায়ই ওতঃপ্রোত থাকে তাহা শরীর-মিলন লালসা। সব রকম হৃদয়-রসই শারীর-বৈদ্যুতী একীকরণের আকাঙ্ক্ষা রাখে। গাভী বৎসকে চাটে, মা ছেলেকে বুকে জাপ্টাইয়া ধরে, শিশুরা গলাধরাধরি করিয়া বেড়ায়, বন্ধু বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তি পায় এবং ভক্ত চরণস্পর্শ সুখ চায়। প্রেম এই সবগুলাই চায় এবং এ সবের অতিরিক্তও কিছু চায়—তাহা আত্মার মিলন কামনা। প্রেম শরীরের আবরণ ভেদ করিয়া আত্মাকে খোঁজে, আত্মার মিলন আবেগে শরীরে ধাবমান হয়। প্রেমিকে কামুকে এইখানে প্রভেদ—প্রেমিক সূক্ষ্ম আত্মা চায়, কামুক স্থূল শরীর চায়। শরীরের আধার ব্যতীতও প্রেমিকের প্রেমানুশীলন পূর্ণমাত্রায় চলিতে পারে, কামুকের অচল। কিন্তু সকল স্থূল কামনার মধ্যেও অজ্ঞাতসারে সূক্ষ্ম আত্মারই কামনা প্রচ্ছন্ন আছে, কেননা আত্মা স্থূলভূতমাত্রে প্রচ্ছন্ন, তাঁহার রসেই সব কিছু [illegible]। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কহিতেছেন :—"পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়ের কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। লোকের কামনায় লোক প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় লোক প্রিয় হয়। দেবের কামনায় দেব প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় দেব প্রিয় হয়। ভূতের কামনায় ভূত প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় ভূত প্রিয় হয়। কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়। অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য ; আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিলে সমস্ত বিদিত হয়।"

স্নেহ, ভক্তি, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি রসগুলি আত্মাকে উপলব্ধির বাহন ; তন্মধ্যে মাধুর্য্যরসে আত্মার প্রকৃষ্টতম বিকাশ, সেইখানে আত্মার গভীরতম অবগাহন ও তাহার সহিত গাঢ়তম মিলনানুভূতি; তাই আত্মশক্তিকে

আপনা হইতে পৃথকরূপে প্রথমানুভাবে ভগবানের যে দ্বৈতভাব তাহাকে 'নিরতিশয় প্রেমাস্পদত্বম্' বলা হইয়াছে। দ্বৈতের প্রাণে যে অদ্বৈতানুভব, যে সাম্যের সানুভূতি তাহাই "প্রেমাস্পদত্ব।"

সুতরাং 'প্রেম' শব্দ ও তাহার বাচ্য মানসিক অবস্থা আমাদের ধার্ম্মিক, সমাজেও ছিল। পৌরাণিক সাহিত্যে শকুন্তলা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সীতা, অহল্যা, অম্বালিকা, নল, অর্জ্জুন, রামচন্দ্র প্রভৃতির চরিতে তাহার কি কিছু অপ্রাচুর্য্য আছে?

শেষ দেখা যাক্ ব্যবহারিক জগতে। রাধাকৃষ্ণের আখ্যায়িকা ও আদর্শ যে সমাজের প্রতি নাড়ীতে রসসঞ্চার করিয়াছে, সে সমাজে প্রেমবীজ নূতন আমদানী এ কথা কি মাননীয়? রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বে "পরকীয় প্রেম"কে সমাজের বুকে সিংহাসন দেওয়া হইয়াছে। ধাপে ধাপে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি ঘটনাটিকে 'sublimate' করা হইয়াছে, তার মলিনতা ও স্থূল ভাগ পরিহার করাইয়া তাকে উচ্চে উত্থান হইয়াছে। যদি কোন মানবীর মনে পরকীয় প্রেম আবেশ করে—সে সধবাই হউক আর বিধবাই হউক—তবে তাহাকে সাফাইয়ের যুক্তি ভাল মতেই শিখান হইয়াছে। স্বয়ং যতীন্দ্রবাবু ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন—

"পার্ব্বতীর এই পরপুরুষের প্রেম কাব্যের হিসাবে খুব মর্ম্মস্পর্শী। ইহা সেই ব্রজগোপীগণের লজ্জাভয় বিসর্জ্জন দিয়া, পতিপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হওয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। একদিন চণ্ডীদাসও রামী রজকিনীর প্রতি এইরূপ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে পিতামাতা প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছিলেন।"

তবে 'প্রেমরোগ' এ দেশের সাহিত্যে বা জীবনে ছিল না কেমন করিয়া প্রতিপন্ন করেন?

বৈষ্ণবকবিগণের ও সাধারণতঃ সেকালের সমাজে প্রচলিত "পিরীতি" এই তিন আখরের স্থলে প্রেমশব্দ ব্যবহার হইলেই কি যত দোষ হইল? সমাজের স্যানিটারি ইন্স্পেক্টরের পদে নিজেকে বাহাল করিলে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে যে, হিন্দু সমাজের স্বাস্থ্যহানি সেই দিনই হইয়াছে যে, দিন বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব সাহিত্য এ সমাজে স্থান পাইয়াছে। যদি হাওয়া সাফ করিতে চান, তবে ইন্স্পেক্টর মহাশয় এই সকল গ্রন্থ স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে স্বহস্তে আগুন ধরাইয়া দিন, নয়ত 'প্রেমরোগের বীজ' এ দেশ হইতে তাড়ান অসম্ভব। তাতে প্রাণ উঠিবে কি?

পাপ যাহা তাহা পাপ, পুণ্য যাহা তাহা পুণ্য, পাপকে পুণ্যরূপে এবং পুণ্যকে পাপরূপে চিত্রিত করিলে লেখকের লেখনী নিঃসন্দেহ দূষিত হয়। কিন্তু সমালোচ্য আধুনিক গ্রন্থাবলীতে কি তাহাই করা হইয়াছে?

যতীন্দ্র বাবু তাঁর সমালোচনার আরম্ভে 'Art' ও 'Interpretation of Life'এর উপর একপ্রস্থ নজরসানি করিয়াছেন। এ বিষয়ে Tolstoyএর মত আপ্ত মানিয়া তাঁহারই প্রমাণে নিজের সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। Tolstoy নিজে একজন আর্টিষ্ট ছিলেন। তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পে তিনি রুসীয় সমাজের সকল প্রকার পাপের চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি চিত্রগুলির দ্বারা সমাজে দুর্নীতির হাওয়া বহান নাই, 'Interpretation'এর দ্বারা দুর্নীতির শিকড় ধরিয়া নাড়া দিয়াছেন, দুর্নীতি উৎপাটনের সহায়তা করিয়াছেন। বাঙ্গলার আর্টিষ্টেরাও অবিকল তাহাই করিতেছেন। যতীন্দ্র বাবুও প্রকারান্তরে সে কথা মানিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"এত বড় পাপের চিত্রে পাঠক পাঠিকার মনে বীভৎস রস ভিন্ন অন্য রসের সঞ্চার হইতেই পারে না।" পাপের চিত্রে পাঠকের মনে বীভৎস-রসেরই যদি সৃষ্টি হইয়া থাকে তবে ত লেখকের আর্ট সফল হইয়াছে। কিম্বা যতীন্দ্র বাবু বলিতে চাহেন তাঁরই মনে বীভৎস রসের উদয় হইয়াছে, সকলের মনে হইবে না?

এইখানে "Interpretation of Life"এর কথা আসে। আর্টের বাহনের উপর "Interpretation"এর বিধিভেদ হয়। নাট্য-সাহিত্যে অল্প কথায় রস ঘনীভূত করিয়া "interpret" করিতে হয়। উপন্যাসে বিস্তৃত কথার অবসরে রসকে ছাড়াইয়া ছড়াইয়া দেখান যায়। নাটকের আর্টিষ্টের মর্ম্মকথা সাধারণ পাঠক অনেক সময়

ধরিতে পারে না, কোন তত্ত্বদর্শী সুগ্ন সমালোচকের হাতে তার চাবিটি হঠাৎ আসিয়া পড়িলে তিনি কবির মর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া কবিহৃদয়ে প্রবেশের পথ সকলের পক্ষে সুগম করিয়া দেন। যেমন ডাউডেন সেক্ষপীয়রের চরিত্রগুলিকে ও আর্টকে "Interpret" করিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যে কবি স্বয়ংই এ কাজ করিতে পারেন। যে তুলির দ্বারা কবি তাহা করিবেন, তাহার নাম হইতেছে "মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণী।" যতীন্দ্র বাবু এইটার উপর বিশেষভাবে চটা। কিন্তু ডাক্তার হইলে এই বিশ্লেষণ ব্যাপারটাতে চটিলে ত চলিবে না। আজ কাল শারীরিক ব্যাধি চিকিৎসার আর একটী নূতনতম বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কার হইয়াছে তার নাম "Psycho Analysis",—কলিকাতা য়ুনিভার্সিটিতেও সম্প্রতি ইহার একটি "chair" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্লেষণ ত করিতেই হইবে, নয় ত রোগের মূলে পৌঁছিবে কেমন করিয়া, চিকিৎসককে নাড়িভুঁড়ি ঘাঁটাঘাঁটি করিতেই হইবে, সে বিষয়ে জুগুপ্সা থাকিলে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার উচ্চ অভিলাষ ত্যাগ দিয়া পাততাড়ি গুটাইয়া তাঁর ঘরে বসিয়া থাকাই শ্রেয়। সুতরাং নিম্নলিখিত কথাগুলি তাঁহার মুখে শোভা পায় না—"এই কাব্যে মানসিক ভাব বিশ্লেষণের চূড়ান্ত ছড়াছড়ি, ইহার আখ্যায়িকা গ্রন্থকার নিজের কথায় ব্যক্ত না করিয়া পাত্রপাত্রীর আত্মকথার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ক্রমাগত নিখিল, বিমলা ও সন্দীপের Sick sentimentalism পাঠকের মনে বিরক্তি উৎপাদন করে। সময় সময় তাহাদের পুতিগন্ধময় ভাবের বিশ্লেষণ দ্বারা পাঠকপাঠিকার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তখন মনে হয় যে এই তিন ব্যক্তি তাহাদের পেটের নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া ক্রমাগত চটকাইতেছে, এবং তাহার দুর্গন্ধে চতুর্দ্দিকের আব-হাওয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

কথা হইতেছে:—"To analyse is to understand and to understand is to excuse"। বিশ্লেষণের দ্বারা কার্য্য কারণের মূলতত্ত্বে পৌঁছিলে তখন আর ক্রোধ বা জুগুপ্সা থাকে না, ক্ষমা ও দয়া তার স্থান অধিকার করে। যতীন্দ্র বাবু সমাজের দয়া ও সহানুভূতির পাত্রাপাত্রিতা ভেদ সর্ব্বদা ঠিক রাখিতে চাহেন, সমাজকে অপাত্রে দয়া বা ক্ষমার বাজে খরচ করিতে দিতে চাহেন না, পাছে তাতে সমাজ-সংস্কার করিতে হয়। সুতরাং 'মনস্তত্ত্বের' উপর খড়্গহস্ত। তিনি নিজেকে অনেক সময় বিনয় পূর্ব্বক "স্থূলবুদ্ধি" বলিয়াছেন, কিন্তু এ মিথ্যা বিনয়ে ফল নাই। প্রকৃতপক্ষে স্থূলবুদ্ধি হইলে বা স্থূলবুদ্ধির আবরণে নিজেকে আবৃত করিয়া সমাজস্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণে নামিলে তাঁর পর্য্যবেক্ষণ রিপোর্টের কোন মূল্য হইবে না।

সত্য কথা এই,—'সধবার প্রেম' ও 'বিধবার প্রেম' অর্থাৎ দুয়েরই 'পরকীয় প্রেম', এ দেশে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। পুরাকালে পুরাতন বিধায় চলিত, নূতনকালে নব্য বিধায় চলিতেছে—এই 'প্রেম' বস্তু হিন্দুর ঘরে ঘরে সিন্দুকে প্যাঁটারায় লুকান। উপন্যাসে কাব্যে শুধু "চাতরে হাঁড়ি ভাঙ্গা" হইতেছে। কবিরা তাঁহাদের পাপকলুষিত হৃদয় হইতে পাপচিত্র উদ্ভাবন করিয়া সমাজকে কলুষিত করিতে বসেন নাই, কিন্তু যে সকল পাপ সমাজের বর্ত্তমান বিকৃত অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী তাহার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া সমাজ-সংস্কারের ইঙ্গিত করিতেছেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল, কলিকাতা বিশ্বাপীঠের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা দেখিতেছিলাম। বাঙ্গালা পাঠ্যে দেখিলাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলীও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যখন ভারতী সম্পাদন করিতাম তখন তাঁহার একটি ছোট গল্প যেন বড় লেখকের আগমনী বার্ত্তা লইয়া আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল—এমনি একটা স্মৃতি মনের ভিতর খেলিতে থাকিল। ইদানীং তাঁর নাম শুনিয়াছি, কিন্তু কোন উপন্যাসই আমি পড়ি নাই। তাই সেক্রেটারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শরৎ বাবু আধুনিক লেখক। তাঁর লেখা কোন্ গুণে এতদূর classicsএ গণ্যযোগ্য মনে করেন যে, অন্য অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনা ঠেলিয়া তাঁর উপন্যাসকে বঙ্গসাহিত্যে একখানি ভিত্তি প্রস্তরের মত স্থান দিয়াছেন?"

সেক্রেটারী মহাশয় উত্তর দিলেন, "শরৎবাবুর বই যে গল্পের বই বলিয়া পাঠ্য তাহা নহে। শরৎ বাবুর গল্প

সমাজে একটা নাড়া দিয়াছে। তাঁর সমাজকে একটা নতুন কথা বলিবার আছে, সে কথাটার সঙ্গে সব বাঙ্গালীর ছেলেরই পরিচয় হওয়া চাই।" সেই কথাটা— আজ যতীন্দ্রবাবুর সমালোচনা পড়িয়া বুঝিলাম—রবীন্দ্রনাথ যেন হিন্দু সমাজের বাইরে থাকিয়া বলিয়াছিলেন, শরৎবাবু আজ ভিতরের লোক হইয়া বলিতেছেন, তাই যতীন্দ্রবাবুর মতে "শরৎবাবুর আর্ট বেশী dangerous, কেন না বেশী popular।"

"হিন্দুসমাজ" শব্দটা যতীন্দ্রবাবুর পুস্তকে প্রায়ই আছে। "মনুষ্যসমাজের" নহে, "হিন্দুসমাজের" দোহাইটা বারম্বার তাঁহার লেখনী হইতে—অর্থাৎ মন হইতে নির্গত হয়। এই হিন্দুসমাজটা কি? ইহা তোমার আমার কারও একার পৈতৃক সম্পত্তি নহে। হিন্দু কে? আমিও হিন্দু, তুমিও হিন্দু, আমি হয়ত শৈব তুমি শাক্ত, আমি নিরাকারের উপাসক তুমি সাকারের; আমি গোঁসাই তুমি অঘোরী, তুমি তান্ত্রিক মতে অসবর্ণ বিবাহী, আমি বৈষ্ণব মতে। প্রত্যেকেরই শিরায় হিন্দুর শোণিত, প্রত্যেকেরই জীবনযাত্রায় হিন্দুর সংস্কার, কতকগুলি মূলতত্ত্ব তুমিও মান, আমিও মানি—শাখাপ্রশাখাতেই যত কিছু ভেদ।

সমাজ কাকে বলে? কতকগুলি লোকের একত্রে দলবদ্ধ হইয়া থাকার নাম সমাজ, সেই দলের সব লোকের মধ্যে প্রায় এক রকম আচার ব্যবহার পাওয়া যায়। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলের বা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক নিয়ম দাঁড়াইয়া যায়। নিম্ন বর্ণের হিন্দুসমাজে বিধবা বিবাহ সমাজসম্মত। উচ্চ বর্ণের হিন্দুসমাজে সম্প্রদায় বিশেষে বিধবা বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ প্রচলিত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে ইচ্ছামত স্ত্রীপুরুষ ত্যাগ বা গ্রহণ বৈষ্ণবসমাজসঙ্গত; শৈবগণের ভৈরব ভৈরবী করা বা ছাড়া শৈবসমাজ অনুকূল। বর্ত্তমান ইংরাজীশিক্ষিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজে গৌড়-বিলানুযায়ী অসবর্ণ বিবাহ সমাজসঙ্গত, বিদ্যাসাগরের মতানুযায়ী বিধবাবিবাহ সমাজানুমোদিত। তাই দেখা যাইতেছে একই সমাজের সাম্যের ভিতরও ভেদ প্রচুর। বৃহৎ হিন্দুসমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ সমাজে ও কায়স্থ সমাজেই কত আচার ব্যবহারের সূক্ষ্ম ভেদ। আবার ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, কায়স্থে কায়স্থে—দক্ষিণের ব্রাহ্মণে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে, বাঙ্গালী কায়স্থে পশ্চিমের কায়স্থে, গুজরাতের বৈশ্যে বাঙ্গালী বৈশ্যে—এমন কি ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারেও কত আচার ব্যবহারের চুলচেরা তফাৎ এবং সেই প্রত্যেক তফাৎটি 'নিয়ম'এর লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ। শুধু স্ত্রী আচারেই দেখ না—কোন পরিবারে বুধবারে নূতন কাপড় পরা নিষেধ, কোন পরিবারে সেই দিনই কাপড় পরা বিশেষ বিধি। কাহারও ছেলের বিয়েতে এয়োস্ত্রীদের জল সইতে' নাই, চরকায় সুতা কাটিতে হয়, কারো ঘরে সেদিন চরকা ঢুকিলে বিপদ, জল সইতেই হইবে—আপনাপন পারিবারিক সমাজের এই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম নিয়মগুলি যে না মানিবে সে নিন্দাভাজন হইবে। হিন্দুসমাজে এইরূপ অপরাম্পরা ভেদ। মোট কথা আর সব গরমিল বাদ দিয়া আহার ও কন্যাব্যবহার এই দুয়েতে এখন হিন্দুসমাজ দাঁড়াইয়াছে। আহারটাও প্রায় উঠিবার গতিক হইয়া এখন কন্যাব্যবহার মাত্রে সমাজের অস্তিত্ব দাঁড়াইবার উপক্রম হইয়াছে। যে দলের মধ্যে ছেলেমেয়ের বিবাহ সহজে দেওয়া চলে সেই দলটুকু প্রত্যেক লোকের সমাজ, কিন্তু এইরূপ ছোটছোট বহু দলের কতকগুলি একই প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা উদারতার যে সমষ্টি তারই নাম এখনও "হিন্দুসমাজ।" আদত হিন্দুসমাজ-হ্রদ এখন শীর্ণ, কৃশ। হ্রদ হইতে খাল কাটিয়া কাটিয়া অনেক জল এখন বাহির হইয়া গিয়াছে। খালের জল বিশ্বজগতে স্রোতের জলের সঙ্গে সংযুক্ত। যখন নূতন ভাবের বান ডাকে, স্রোতস্বতীর সংস্পর্শে খালের জলগুলিও তরঙ্গায়িত হয়—সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন স্থির হ্রদের জলেও সংক্ষোভ পৌঁছায়। যাঁরা পুরাতন হ্রদতটবাসী তাঁরা সেটা ভারি আপত্তিকর মনে করেন; নব্য ম্যুনিসিপালিটি হইতে পুকুর ছেঁচিয়া জল সাফ করিবার হুকুমজারি হইলে তাঁরা হাজার নামের দস্তখৎ দিয়া আর্জি পেশ করেন হুকুম রদ করার জন্য, মলিনতাতেই যে প্রাচীন পুকুরের মাহাত্ম্য, সেটি বাদ দিয়া স্বচ্ছ জল সেবনে হিন্দুর হিন্দুত্ব যাইবে এই প্রতিপন্ন করিতে চান। কিন্তু বানের হাত হইতে বাঁচেন কেমন করিয়া? তার ডাক কোথা হইতে আসে, কোন্ মহাকালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া সুপ্তকালকে নিত্যপরিবর্তনশীল করিয়া চলে, তাহা ভাবিয়া দেখেন না।

সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা মলিন পুকুরের জল সেবনে হয় না। কোথায় কিরূপে পুকুরকে মলিন করা হইতেছে, পানীয় জলকে দূষিত করা হইতেছে ইহা দেখাইয়া দিলে সমাজের স্বাস্থ্যহানি করা হয় না, সমাজের সেবা করা হয়। যাঁরা সংস্কার করিতে চান, তাঁরা লোকহিতৈষণার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই করেন, তাঁরা দশের শত্রু নহেন—মিত্র। দুই দল লোক আজকাল আমাদের মধ্যে আছেন এক দলের নাম উন্নতিশীল, আর একদলের নাম রক্ষণশীল। যতীন্দ্রবাবু এই শেষোক্তদলের মুখপাত্র। উন্নতিশীলেরা বক্তারূপে রিফর্ম্ম প্লাটফার্ম্ম হইতে যে কটা সংস্কারের পক্ষে তারস্বরে বক্তৃতা করিতেছেন, লেখকরূপে আর্টের সহযোগে যে বিষয়ে চিত্রকলা ফুটাইয়া তুলিতেছেন, কর্ম্মীরূপে কার্য্যের দ্বারা যাহা বাস্তবে পরিণত করিতেছেন—যতীন্দ্রবাবু ঠিক সেইগুলির বিরুদ্ধেই প্রাচীন সমাজের পক্ষ হইতে পতাকাবাহী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। উন্নতিশীলেরা বলেন,—

১। বাল্যবিবাহ বন্ধ কর।

২। বিধবাবিবাহ হইতে দাও।

৩। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার কর।

৪। স্ত্রীজাতিকে পরদায় রাখিও না।

৫। স্ত্রীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাও।

যতীন্দ্রবাবু ঠিক এই কটি কথার পাল্টা জবাব দিয়াছেন—

১। বাল্যবিবাহ অতি উত্তম সেকোবিষ, সমাজকে প্রত্যহ একটু খাওয়াইলে, শৈশব হইতেই ইন্দ্রিয়ভোগাস্বাদ দিলে, দুর্নীতির সাপের কামড়ে সমাজ রসাতলে যাইবে না।

২। বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে কস্মিন্‌কালে থাকিলেও একালে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অধিকারী অনধিকারীভেদে প্রত্যেক বিধবাকেই ব্রহ্মচর্য্যের চাক্‌না পরাইয়া রাখিতে হইবে। মনে করিও না what is sauce for the gander is sauce for the goose—পুরুষ স্ত্রীর পক্ষে সমাজের আইন এক হইতে পারে না। বিপত্নীকের ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধান হিন্দুসমাজে নাই, সুতরাং হিন্দুবিপত্নীক যতবার খুসী দার গ্রহণ করুক—আশৈশব মৃত্যু পর্য্যন্ত, তাতে সমাজের স্বাস্থ্যহানি হয় না—কিন্তু হিন্দুবিধবা পুনর্ব্বার বৈধভাবে পতিগ্রহণ করিয়াছে কি সমাজদেহ গলিত হইয়াছে—অবৈধভাবে পরগৃহে গৃহিণীত্বে ক্ষতি নাই ; তাতে সমাজদেহ দুষ্ট হয় না।

৩। স্ত্রীশিক্ষাটা বড় ভয়ানক বস্তু। ইহাতে মেয়েদের মাথা পরিষ্কার হইয়া যায়, বিচারশক্তি জন্মে, স্বাধীনতাস্পৃহা হয়, পুরুষের প্রাধান্য মানে না। সুতরাং পুরুষ সাবধান! স্ত্রীশিক্ষাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজে আমল দিও।

৪। স্ত্রী কন্যাকে পরদায় রাখো, বাইরে মিশিতে দিও না, নতুবা হারাইয়া বসিবে। বাইরের হাওয়া লাগিলে তাদের উপর আর এমন নির্ব্বিবাদ সহজ প্রভুত্ব চলিবে না! চারিত্র্যে, যত্নে, সেবায়, নিজেকে উৎকর্ষের আদর্শ পূর্ণমাত্রায় জাগাইয়া রাখিতে হইবে, নিজেকে মানুষ হইতে হইবে। রামচন্দ্র হইব না, সীতা পাইব এরূপ সস্তা সওদা আর তখন চলিবে না। সুতরাং হিন্দুসমাজের স্বাস্থ্যহানি হইবে।

যতীন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের ক্ষুদ্র অবয়বের মধ্যে অনেকগুলি গুরুতর সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমি সবগুলির পর্য্যালোচনা করিতে পারিলাম না। কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার ঐক্যমত্য আছে। কিন্তু তাঁর যে মূল বক্তব্যটি এ প্রবন্ধে আলোচিত হইল তাহার সহিত আমার মতের অনৈক্য তাঁর অনুমেয় হওয়ার কথা। তথাপি যে তিনি আমার মত জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদারহৃদয়তার পরিচয় পাইতেছি, এবং বিপক্ষ মতে নিজেকে "open to conviction" রাখার চিত্তবৃত্তিতে তাঁহাকে ধন্যবাদযোগ্য মনে করিতেছি!

কিন্তু যাঁদের লইয়া তাঁর সমাজ, যাঁরা আমাদের মত এবং মানবসমাজের অন্তর্গত নহেন, যাঁরা কেবল

যতীন্দ্র বাবুর তথাকথিত "হিন্দু সমাজ" এরই অন্তর্গত—এমন শত শত মনস্বিনী ভগ্নীরা আজ স্বাভিমত স্ফুটস্বরে ব্যক্ত করিতেছেন। তাঁদের মিলিত কণ্ঠের মহা ঐক্যতানে যতীন্দ্র বাবু ঐশ্বরী বাণী শুনিতে পান না কি? বঙ্গভূমিতে আজকাল এক অভিনব দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বঙ্গনারীরা অবলীলাক্রমে সমাজকেশরীর সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া জীবন-মরণ খেলা খেলিতেছেন, নারীরা একেবারে কেশরীর ঝুঁটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। সমাজের বিধিব্যবস্থা সংস্কারকানুন যেখানেই দেবত্বের ভানে পুরুষের পশুত্বের প্রশ্রয় দিয়া নারীর মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে সেখানেই তাঁরা খর্পর হাতে আগুয়ান হইতেছেন। বঙ্গে এই মর্ত্ত্য মাহিষমর্দ্দিনীর লীলায় সমাজ-অসুরের পরিণাম যে দেবমানবের বাঞ্ছিত ও হিতকারী হইবে সে বিষয়ে কোন শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

একদা এক সিংহ অনশনে শীর্ণ হইয়া হিমাচলের সানুদেশস্থ স্বীয় বিবর হইতে আহারান্বেষণে বহির্গত হইল। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের নিকটে গঙ্গাশীকরশীতল স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরু-সুশোভিত একটি আশ্রম দেখিতে পাইল। সেই আশ্রমের দ্বারদেশে একটি কাষ্ঠফলকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা ছিল—"দেবী চৌধুরাণীকা মঠ।" এই সিংহটি রঘুবংশে বর্ণিত মহারাজ দীলিপ সম্ভাষণকারী পশুরাজের বংশধর, সুতরাং সে দেবভাষা ও মানবীয় ভাষা বুঝিতে পারিত, এমন কি সেই সকল ভাষায় কথা কহিতে পারিত।

আশ্রমের মধ্যে মানুষের গন্ধ পাইয়া সিংহ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া গভীর গর্জ্জন করিল। সেই গর্জ্জন শুনিয়া পাঁচ ছয়টি ললনা সবেগে বাহিরে আসিলেন,—তাঁহাদের মধ্যে একজনের হস্তে একখানা পুস্তক, আর সকলের হস্তে খাতা ও পেন্সিল। তাঁহারা সাহসভরে কেশরীর সম্মুখীন হইয়া সকলে একসঙ্গে তাহার ঝুঁটি ধরিয়া ফেলিলেন, এবং টানিতে টানিতে তাহাকে আশ্রমের মধ্যে লইয়া গেলেন। সিংহ তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিল—"হে ললনাকুল! তোমরা দেবী কি মানবী তাহা জানি না; আমি ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছি, আগে আমাকে কিঞ্চিৎ আহার্য্য দান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

সিংহের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পুস্তকহস্তা রমণী বলিলেন—"বেশত—তুমি দেখিতেছি মানুষের মতন কথা কহিতে পার! তুমি কি খাবে বল। আমার এই আশ্রমে প্রাণি-হিংসা নিষেধ।"

সিংহ বলিল—"তোমার কথার ভাবে বুঝিতেছি, তুমিই এই আশ্রমের মালিক দেবী চৌধুরাণী। আমি সিংহ হইলেও ভগবতীর বাহন, আমার পূজার নৈবেদ্য চালকলা খাওয়ার অভ্যাস আছে।"

সিংহের বাক্যে তুষ্ট হইয়া সেই আশ্রমাধিকারিণী দেবী চৌধুরাণী ঈষৎ হাস্য করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা তাহার সৎকার করিলেন এবং ফলমূল আনিয়া ভক্ষণ করিতে দিলেন।

সিংহ খাইতে খাইতে বলিল—"ভগবতীর আদেশে আমি প্রাণি-হিংসা ত্যাগ করিয়াছি, সেই জন্য আমার এই দুর্দ্দশা। এখন মায়ের পূজাও আর বেশী হয় না, আমাকেও অনশনে দিন কাটাইতে হয়। অনেকদিন পরে তোমার কৃপায় তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলাম। সেজন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু আমি হঠাৎ আসিয়া তোমাদের কাজের ব্যাঘাত করিলাম, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমরা এখানে কি করিতেছিলে?"

দেবী চৌধুরাণী বলিলেন—"আমি এই আশ্রমে সংপ্রতি একটি প্রেমের পাঠশালা খুলিয়াছি। আমি এই কয়টি মহিলাকে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিই।"

সিংহ বলিল—"প্রেম কাহাকে বলে ?"

দেবী বলিবেন—"আমি সেই কথাই এখন ইহাঁদিগকে বুঝাইতেছিলাম। আমি যাহা বলিয়া যাই, ইহাঁরা খাতায় পেনসিল দিয়া তাহা লিখিয়া নেন। তুমিও এখানে বসিয়া তাহা শুনিতে পার।"

এই বলিয়া দেবী চৌধুরাণী বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রেম বলিতে কি বুঝায় ? প্রেম শব্দের সঙ্গে একটা hero-worship বা উৎকর্ষপূজার ভাব আছে। যার তার সঙ্গে যে সে প্রেমে পড়ে না। ঘরকন্না সকলের সঙ্গে করা যায়, যত্ন স্নেহ মমতা দিয়া অনেককেই ঘেরা যায়, কিন্তু প্রেমাস্পদ একটিমাত্র প্রাণী হয়।"

সিংহ বলিল—একটু সবুর কর। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে দাও। তুমি যে উৎকর্ষ পূজার কথা বলিলে, তাহা আমি বেশ বুঝিলাম। সেরূপ প্রেম দুইবার মাত্র দেখিয়াছি—একবার মাত্র এই হিমালয়ে যখন উমা শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, আর একবার যমুনা-তীরে যখন ব্রজগোপীগণ শ্রীনন্দনন্দনের জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ উৎকর্ষপূজা দেবলীলায়ই সম্ভব নরলোকে বড় দেখা যায় না। তুমি আর যে একটি কথা বলিলে, যার তার সঙ্গে যে সে প্রেমে পড়ে না, ইহাত খুব সত্য। জন্ম-জন্মান্তরের আকর্ষণবলে একজন আর একজনের সঙ্গে প্রেম-রজ্জু দ্বারা বাঁধা পড়ে। এজন্য লৌকিক কথায় বলে বিবাহ দৈবাধীন ঘটনা।

দেবী বলিলেন—কিন্তু বিবাহ হইলেই প্রেম জন্মে না! "বিবাহ হইলে স্নেহমমতা জন্মিতে পারে, একসঙ্গে থাকিয়া ঘরকন্নাও চলিতে পারে; কিন্তু কোথায়ও একটুখানি অসাধারণতা বা চমৎকারিতার ইন্ধন ব্যতীত প্রেম জ্বলে না।"

সি।—তাহা হইলে এত লোকে যে মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কি প্রেম জন্মে না ?

দে।—সেই মন্ত্রপড়া বিবাহেও "শুভলগ্নে শুভদৃষ্টির দ্বারা এই চমৎকারিতার বোধ জাগাইয়া দেওয়া হয়।"

সি।—সাধারণতঃ বরক'নে আগে কাহাকেও কেহ দেখে নাই, কে কেমন তাহাও জানে না; শুভলগ্নে কাপড়ের বেষ্টনীর মধ্যে উভয়ে চক্ষু মেলিয়া একজন আর একজনকে চাহিয়া দেখিল, অমনি বর ক'নেকে মনে মনে বলিল—'তুমি চমৎকার!'—কনেও বরকে দেখিয়া মনে মনে বলিল—'তুমি চমৎকার!'—তখন হইতেই তাহারা প্রেমে পড়িল। এই ত কথা ?

দে।—হাঁ, ঠিক কথা।

সি।—তাহা হইলে এই মন্ত্রপড়া বিবাহের খুব অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতেছি। তবে

আবার একথা বলিলে কেন বিবাহ হইলেই প্রেম জন্মে না, একসঙ্গে ঘরকন্না করিলে বা স্নেহ মমতা দিয়া ঘিরিলেই প্রেম জন্মে না ?

দে।—শুভদৃষ্টি বা মন্ত্রপড়ার সময়ে যে প্রেম জন্মে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রেম চিরকাল স্থায়ী হয় না। "বিবাহিত জীবনে, অতিপরিচয়ে, অসাধারণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমও অনেক সময়ে অনশনশীর্ণ হইয়া ক্রমে হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। কর্ত্তব্য বোধ, ধর্ম্মজ্ঞান, সমাজভক্তি, বা স্বার্থ দৃষ্টি—কখন কখন বা স্নেহ ও দয়া তখন প্রেমের মোহর হস্তগত করিয়া প্রেমের নামে সংসার রাজ্য চালাইতে থাকে।"

সি।—তাহা হইলে এই যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরনারী মন্ত্রপড়া বিবাহের পরে এক সঙ্গে থাকিয়া ঘরকন্না করিতেছে,—একজনের জন্য আর একজন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে, অথচ তাহাদের মধ্যে কোন অসাধারণ গুণ দেখা যায় না। ইহারা সকলেই কি তবে জাল মোহরের ছাপ দিয়া সংসার চালায় ?

দে।—তা' বৈকি। "মোহ ভাঙ্গিবার যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও যেখানে প্রেমের মোহ ভাঙ্গে না, কুরূপের বুকের মধ্যেও যেখানে অরূপ সুন্দরকে কোন যোগী বা যোগিনী একনিষ্ঠ চিত্তে ধারণ করিয়া থাকে ও পূজা করে, সেই যোগীশ্বর বা যোগেশ্বরী সকল দেশে সকল কালে সকলের সম্মানার্হ।"

সি।—তাহা হইলে সকল দেশে সকল কালে এইরূপ যোগেশ্বর বা যোগেশ্বরীর সংখ্যাইত খুব বেশী। কিন্তু তাহাদের প্রেমের মোহ যে ভাঙ্গিয়াছে তাহার প্রমাণ কি ?

দে।—প্রমাণ তাহাদের বাহ্যিক কুরূপতা এবং অসাধারণতা বা চমৎকরিতার অভাব।

সি।—হয়ত বাহিরের লোকের নিকট তাহারা নিতান্ত কুরূপ ও নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় যে দুই জোড়া চোখ পরস্পরকে চমৎকার বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহাদের নিজের কাছে তাহারা সেইরূপ চমৎকারই রহিয়া গিয়াছে।

দে।—তাহা অসম্ভব। তাহাদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইবে, তাহাদের ভাবের ঘরে চুরি হইয়া গিয়াছে। "রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বে পরকীয় প্রেমকে যখন সমাজের বুকে সিংহাসন দেওয়া হইয়াছে", তখন পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর মধ্যে অসাধারণত্ব দেখিলেই বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষের মন পরকীয় প্রেমের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে।

সি।—তবে এ কথা বল কেন,—"প্রেমের আর এক গুণ তন্ময়তা, তদেবপরায়ণতা বা অনন্যমুখিতা" ?

দে।—প্রেমের মধ্যে নিশ্চয়ই এসব গুণ আছে। তবে "ক্ষণিক প্রেমে ক্ষণিকভাবে এই তন্ময়তা, এই লগ্নতা এই নিষ্ঠা থাকে, স্থায়ি প্রেমে স্থায়িভাবে থাকে।"

সি।—প্রেম যদি একজনের প্রতি তন্ময় ও অনন্যমুখী হয়, তবে আর একজনের প্রতি ধাবিত হইবে কেন ?

সি।—আচ্ছা, পরকীয় প্রেমের জন্য বিবাহিত নর-নারী কেন লালায়িত হয় তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু দু'দিন পরে, অতিপরিচয়ে সেই পরস্ত্রী বা পরপুরুষের অসাধারণত্ব বা চমৎকারিতাও ত আর থাকে না। তখন সেই পরকীয় প্রেমাগ্নিও ইন্ধনের অভাবে নিভিয়া যাইবে?

দে।—তা' যায় বই কি?

সি।—তখন কি সেই প্রেমিক বা প্রেমিকা আবার নূতন একটি অসাধারণ পুরুষ বা স্ত্রী খুঁজিবে? সংসারে ত এইরূপ অসাধারণতা বা চমৎকারিতার শেষ নাই।

একজনের চেয়ে আর একজন বড়, তার চেয়ে আর একজন বড়, তার চেয়ে আবার আর একজন বড়—এইরূপে তার বড় তার বড় করিতে করিতে এই অপার সংসারের কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

দে।—ঠিক কথা, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত আছে। "প্রেম শরীরের আবরণ ভেদ করিয়া আত্মাকে খোঁজে, আত্মার মিলন আবেগে শরীরে ধাবমান হয়।" পরপুরুষ বা পরস্ত্রী সেই আত্মার সহিত আত্মার মিলনের উপলক্ষ্য মাত্র। সকল স্থূল কামনার মধ্যেও অজ্ঞাতসারে সূক্ষ্ম আত্মারই কামনা প্রচ্ছন্ন আছে, কেন না আত্মা স্থূলসূক্ষ্ম-ভূত মাত্রে প্রচ্ছন্ন, তাঁহার রসেই সব কিছু রস যুক্ত।"

সি।—অতি চমৎকার কথা! কিন্তু পরস্ত্রী বা পরপুরুষের মধ্যে এইরূপ আত্মার মিলন খুঁজিতে গেলে, সমাজ থাকিবে কিরূপে?

দে।—কেন—"রাধাকৃষ্ণের আখ্যায়িকা ও আদর্শ যে সমাজের প্রতি-নাড়ীতে রস সঞ্চার করিয়াছে", সে সমাজ এতদিন টিঁকিল কিরূপে? "ধাপে ধাপে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি ঘটনাটিকে sublimate করা হইয়াছে, তার মলিনতা ও স্থূলভাগ পরিহার করাইয়া তাকে উচ্চে উঠান হইয়াছে। যদি কোন মানবীর মনে পরকীয় প্রেম আবেশ করে—সে সধবাই হউক আর বিধবাই হউক—তবে তাহাকে সাফাইয়ের যুক্তি ভালমতেই শিখান হইয়াছে।"

সি।—তুমি একটা মস্ত ভুল করিলে। রাধাকৃষ্ণের আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করিয়া অনেক নেড়ানেড়ির সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, এ কথা ঠিক। আবার সেই সকল লোক তাহাদের পরকীয় প্রেমের সাফাইস্বরূপ রাধাকৃষ্ণকে সাক্ষী মানে, এ কথাও স্বীকার করি। কিন্তু এই নেড়ানেড়ির দল হিন্দু সমাজ নহে, তাহারা সমাজের নর্দ্দমা। সাধারণ বৈষ্ণবসমাজ রাধাকৃষ্ণকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের পরকীয় প্রেমকে মানব সমাজের আদর্শ জ্ঞান করিয়া তাহার অনুকরণ করে না; কারণ তাহাদের বিশ্বাসমতে ঐশ্বরিক লীলা মানবমানবীর পক্ষে দুরধিগম্য (unapproachable)। যাঁহাদের চক্ষে এই ঐশ্বরিক লীলার স্থূল ও মলিনভাব ধরা পড়ে, তাহারা হয়ত অন্যকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদ্বারা শোধন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা দ্বারা মানব-মানবীর পরকীয়

প্রেমের সমর্থন করা হয় না। এখন কথা হইতেছে মানব মানবী যদি সেই রাধাকৃষ্ণের পরকীয় প্রেমকেই বিকৃতভাবে বুঝিয়া, এবং তাহাকে আদর্শ করিয়া, পরনারী বা পরপুরুষের ক্রমাগত একটির পর আর একটির প্রতি আসক্ত হইতে থাকে, তবে সমাজ চলিবে কিরূপে?

দে।—এতদিন যেভাবে চলিয়াছে, সেইভাবেই চলিবে। এই পরকীয় প্রেমরোগ হিন্দুসমাজে নূতন আমদানি হয় নাই। "হিন্দুসমাজের স্বাস্থ্যহানি সেই দিনই ঘটিয়াছে, যে দিন বৈষ্ণবপদাবলী ও বৈষ্ণব-সাহিত্য এ সমাজে স্থান পাইয়াছে।" অতএব, হে সমাজ কেশরি! যদি তুমি হাওয়া সাফ্ করিতে চাও, তবে ঐ সকল গ্রন্থ স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দাও। তা'তে প্রাণ উঠিবে কি?

সি। বৈষ্ণব-পদাবলী ও বৈষ্ণব-সাহিত্য অনধিকারীর হাতে পড়িয়া সমাজের স্বাস্থ্য হানি করিতেছে এ কথা আমিও মানি। কিন্তু তাই বলিয়া সেই গ্রন্থস্তূপে আগুন ধরাইয়া দিতে যথার্থই প্রাণ উঠিবে না। কারণ সমাজে এরূপ লোকও আছেন যাঁহারা শ্রীরাধিকার প্রেমকে ঠিক বিমলা বিনোদিনীর প্রেমের ভাবে দেখেন না। যাঁহাকে অনেক লোক অবতার বলিয়া মান্য করে, সেই নদীয়ার নিমাই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। এখনও লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিকট কৃষ্ণরাধিকার প্রেম প্রাকৃতজনের পরকীয় প্রেমের ন্যায় স্থূলমলিন নহে। তবে এরূপ লোকেরও অভাব নাই, যাহারা রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিয়া ব্যাভিচারে লিপ্ত হইয়া সমাজের স্বাস্থ্য হানি করিতেছে। নর্দ্দমার দুর্গন্ধে স্বাস্থ্যহানি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার প্রতিকার হইতেছে মধ্যে মধ্যে নর্দ্দমা সাফ করা, নর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি করা নহে।

যাহা হউক, তুমি যে বলিয়াছ, "প্রেমাস্পদ একটিমাত্র প্রাণী হয়" তুমি তাহা যে অর্থেই বলিয়া থাক, আমি তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিয়াছি। সেই প্রেমাস্পদ এক ভগবান্ ভিন্ন মানুষ হইতে পারে না। মানুষ জন্মে জন্মে সেই "নিরতিশয় প্রেমাস্পদ"কেই খুঁজিয়া বেড়ায়। প্রেমিক কি প্রেমিকা মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজিতে যাইয়া তাঁহাকেই খোঁজে। দ্বৈতানুভবে তাহার আরম্ভ, প্রেমাস্পদের সহিত মিলন দ্বারা অদ্বৈতানুভূতিতে তাহার পরিসমাপ্তি। শিবশক্তি বা রাধাকৃষ্ণ সেই দ্বৈত হইতে অদ্বৈতসিদ্ধির উচ্চতম আদর্শ। তুমিও একথা আরো সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছ:— "স্নেহ, ভক্তি, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি রসগুলি আত্মাকে উপলব্ধির বাহন; তন্মধ্যে মাধুর্য্যরসে আত্মার প্রকৃষ্টতম বিকাশ, সেইখানে আত্মার গভীরতম অবগাহন ও তাহার সহিত

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে গোদাবরীতীরে শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত যখন মহাপ্রভুর সাধ্য সাধন তত্ত্ব-সম্বন্ধে—কথোপকথন হইয়াছিল, তখন রামানন্দ প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ধাপে ধাপে রাধিকার মাধুর্য্যরসে উঠিলে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার পরে কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানন্দ অদ্বৈতভাব ব্যাখা করিতে গেলে গৌরাঙ্গ তাহাকে চুপ করিতে বলিলেন। গ্রন্থকারের এই অদ্বৈততত্ত্বের কথা ভাল লাগে নাই, পাছে মায়াবাদ আসিয়া সব

গাঢ়তম মিলনানুভূতি, তাই আত্মশক্তিকে আপনা হইতে পৃথকরূপে প্রথমানুভব ভগবানের যে দ্বৈতভাব তাহাকে "নিরতিশয় প্রেমাস্পদত্বম্" বলা হইয়াছে। দ্বৈতের প্রাণে যে অদ্বৈতানুভব, যে সাম্যের সানুভূতি তাহাই "প্রেমাস্পদত্বম্"। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মাধুর্য্যরসের মধ্যে এই অদ্বৈতানুভব করিয়াছিলেন। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার নিজের মধ্যে একাধারে যুগপৎ এই রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্যরস বিকাশ করিয়া অদ্বৈতানুভূতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু মানুষের মধ্যে মানুষের সেই অসাধারণ প্রেমাস্পদত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা বৃথা। সেই জন্যই কিছু দিনের পর অতিপরিচয়ে সেই অসাধারণত্ব হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। তাই হিন্দুনরনারী যে প্রেমে উৎকর্ষপূজা (heroworship) চায় তাহা ভগবানের জন্য তুলিয়া রাখিয়া বিবাহিত জীবনে পরস্পরের প্রতি শুধু যত্ন স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা অবলম্বনে ঘরকন্নায় নিযুক্ত হয়। পরে উভয়ের হৃদয়ের মিলিত প্রেম লইয়া সেই নিরতিশয় প্রেমাস্পদের চরণতলে উপনীত হয়। ইহাই হিন্দুর দাম্পত্য প্রেম। আর যাহারা মানুষের মধ্যে প্রেমাস্পদত্ব আবিষ্কার করিয়া উৎকর্ষপূজা করিতে বাঞ্ছা করে, তাহাদের প্রেম কিছুদিন বাদে আশাভঙ্গে অনশনক্লিষ্ট হইয়া পরকীয় প্রেমরূপ মায়া মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। ইহাই প্রেমের বিলাতী আদর্শ। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য সমাজও ইহাকে হাড়ে হাড়ে চিনিয়া এখন ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলিয়াছে।

সিংহের এই বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিয়া শ্রীমতী দেবী চৌধুরাণী বলিলেন—"থাম থাম ! তুমি হিমালয়গুহাবাসী অসভ্য পশু, তুমি সুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজের খবর কি জান ? প্রেমতত্ত্বেই বা তোমার অধিকার কি ? অতএব হে পশুরাজ ! তুমি আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া যে পথে আসিয়াছিলে সেই পথে গমন কর। যদি ক্ষুধায় কাতর হও, তবে আর একদিন আসিও।"

সিংহ "তথাস্তু" বলিয়া শ্রীমতীকে ধন্যবাদ দিয়া স্বীয় বিবরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

রাতের ছবি

(চিত্র)

রাত বারোটা বেজে গেল ; কিন্তু চোখে আমার ঘুম নেই। রোগের যাতনায় ঘুম-হারা চোখে বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করছি। উঃ—কি নিবিড় বেদনা আমার বুকে পুঞ্জীকৃত হয়ে আছে। ভাল করে একটুও নিঃশ্বাস নিতে পাচ্ছি না। অথচ দম বন্ধ হয়েও যাচ্ছে না। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে, খানিকটা বাতাস নেবার জন্যে এ কি যন্ত্রণাময় যুদ্ধে রত হতে হয়েছে আমায়। এ যে আর সহ্যও হচ্ছে না, অথচ নিজের গলাটিপে সব শেষ করে দেবার সাহসও আমার আসছে না।... ... ...

---

*"Sorrows of Satan by Marie Corelli এবং East Lynneby Mrs Henry Wood, দ্রষ্টব্য

আঃ—অনেকক্ষণ পরে একটু সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি।... ...

বাইরে রাস্তার আলোগুলো স্থিরভাবে জেগে দাঁড়িয়ে আছে, কঠিন কর্ত্তব্যের মতো। গ্রীষ্মের রাত কিনা, তাই রাস্তা এখনও নিস্তব্ধ হয়নি, মাঝে মাঝে এক একটা মোটার একনিঃশ্বাসে ছুটেছে। ছ্যাকড়া গাড়ীর জুড়ী ক্লান্তপদে কদমে কদমে চলেছে; তাদের খুরের আঘাতোত্থিত খট্ খট্ শব্দ গানের তালের মতো শোনা যাচ্ছে।... ...

"বল হরি, হরি বোল"—

আমার গাটা শিউরে উঠল। কে শমনের পরোয়ানা পেয়ে চলে গেল; আর আমি মৃত্যুকে এমন করে সাধ্ছি, তবুও আমার তপ্ত বুকে তার শীতল পরশ পেলাম্ না। কিন্তু মৃত্যু আমাকে যে এমন ভাবে উপেক্ষা করে যাবে এ ত আমি ভাবিনি। নয় পৃথিবীরই আবর্জ্জনা-স্বরূপ হয়েছি, তার কোনো উপকার করবার শক্তি নেই, সে জন্যে কি তোমারও অবহেলার পাত্র হয়েছি। অথচ দেখি—যাদের শক্তি আছে, দশের ও দেশের কাজ কর্ব্বার উৎসাহ আছে, তাদেরই ত তুমি নিয়ে চলে যাও। এর মানে কি? এত বড় অবিচার! ভেবেছিলাম ও জিনিষটা শুধু মর্ত্ত্যে যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তারাই করে, এখন দেখছি তা নয় এ বাস্তবের ওপারে, কল্পনায় যদি কেউ অসীম ক্ষমতাশালী থাকেন ত তিনিও বড় কম্ অবিচারক নন। প্রমাণ, পৃথিবীর আবর্জ্জনা আমি, আমাকে না সরিয়ে, তিনি কোন বিচারে নিয়ে গেলেন আমার পাশের বাড়ীর বাপ মায়ের শিবরাত্রের সলতে এক ছেলেকে। বছর ছাব্বিশ বয়স, শক্তিমান বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল এক তরুণ যুবক, সংসারের একটা গৌরব, তার অভাবে অমন একটা জমাট সংসার গেনো-লাগা বাড়ীর মতো বসে গেল। অথচ আমি গেলে কারই বা ক্ষতি হত। যাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল, তাদের ত অনেক আগেই টেনে নিয়েছ। আমার ছোট ভাই, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র,—সব মনে করতে গেলে ব্যথায় বুক টম্ টন্ করে উঠে। পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।... ... ...

উঃ—আবার বুকে কি ব্যথার যাতনা। এত কষ্টেও প্রাণ কেমন করে আছে, ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। উঃ এ যে অসহ্য ব্যথা, যেন দেহের সকল শিরা উপশিরা টান দিচ্ছে।—নির্ম্মম, নির্ম্মম! বিধাতা!... ... ...

কার চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে না? ও গলির মোড়ের লাল বাড়ীটার কর্ত্তার বিধবা পুত্রবধূ। যে পাগল হয়ে গিয়েছে, সেই কাঁদছে। পতিপুত্র হারা ঐ বধূটী বিধাতার নির্ম্মম অত্যাচারের আর এক নিদর্শন। এই রাতে নীরব আঁধারের বুক চিরে চিরে এই শোকের কান্না গুমরে উঠছে। কার কাণেই বা পৌছবে?... ...

* * * * *

প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টায় গির্জ্জার ঘড়িটা বেজে যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি। টং টং টং করে তিনটে বাজল। বাতাসে ঘড়ির আওয়াজটা কেঁপে কেঁপে অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিক সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্বাদশীর চাঁদটা এতক্ষণ পর্য্যন্ত

জেগে থেকে ঘুমের নেশায় পাণ্ডুর হয়ে ঢলে পড়েছে। খালি পূর্ব্বের মতো জেগে আছি আমি। না ; শুধু আমি নয় ঐ রাস্তার ওপারে আমায় ঘরের সামে ঐ বড় বাড়ীটার বৌটাও বোধহয় জেগে আছে। তার ঘরে আলো জ্বলছে দেখতে পাচ্ছি। আহা কি কষ্ট ঐ বৌটীর।

দু'বছর আগে অই মেয়েটী ঐ বাড়ীতে বধূরূপে এসে প্রবেশ করেছে। বিয়ের সময় কত ধূমধামই না হয়েছিল। একপক্ষ ধরে কত উৎসবই না চলেছিল। নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ, বায়স্কোপ কিছুই বাদ যায় নি। বড়লোকের একছেলে—কিছু বাদ যাবেই বা কেন? টাকা ত আর নিজেদের রোজগার করতে হয় না। গরীবের মুখে-রক্ত-তুলে রোজগার করা টাকা খাজনারূপে এদের হাতে এসে পড়ে। কাজেই যেমন বিনা আয়াসে টাকা আসে তেমন অনায়াসে জলের মতো ব্যয় হয়ে যায়।... ... ...

প্রথম প্রথম বৌটীর কতনা সুখে দিন কেটেছে। কতদিন দেখেছি ছেলেটা কলেজ থেকে পালিয়ে চুপি চুপি বাড়ী চলে এসেছে। দিনে দুপুরে, সকালে সন্ধ্যায় প্রেমের কতনা লুকোচুরি চলেছে। আর এখন? বোধ হয় দিনান্তে একবার শুধু দেখাই পায়, তাও আবার হয়ত স্বরূপে নয় বিরূপে।... ... ...

একটা মোটার শব্দ করে বাড়ীর সামে দিয়ে চলে গেল। ঐ ত সেই বৌটী জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। মোটারটা চলে গেল। বৌটীর বুকে কতখানি তীব্র নিরাশার তীর হেনে—কে জানে?

বৌটী নিরাশাহত ম্লানমুখে বুকে একটা বিপুল ব্যথার ভার নিয়ে জানালার গরাদ ধরে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেন ব্যথার একখানি শরীরিণী মূক-প্রতিমা।

বৌটীর ব্যথার কথা মনে করে আমার যন্ত্রণা যেন কমে গিয়েছিল। মনের ঐ বেদনা কত তীব্র জ্বালাময়। দেহের যাতনা মনের সংযমে হয় ত ভোলা যায়। কিন্তু আমার মনের বল কই? যাতনা আমার যে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাতর ভাবে অনেক প্রার্থনা করেছি, কিন্তু তাতে যন্ত্রণার কিছু ত উপশম হয়নি। আর প্রার্থনা করতে ইচ্ছাও হয় না। আর বিশ্বাসই বা হবে কোথা হতে। একে দুর্ব্বল মন, তার উপর চারপাশে এই সব বীভৎস নৃশংসতা —এ যন্ত্রণার কি শেষ নেই। কত রাত যে এমন ভাবে কাটিয়েছি আর কত রাত যে এমন ভাবে কাটাতে হবে কে জানে। রাতের এই কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে যে সব নাটকের অভিনয় দেখছি তাতে মুমূর্ষু প্রাণে মরণের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রভাবে জেগে উঠে। এই অন্ধকারের বুক চিরে কোনোদিন একটা হাসির কোন উচ্ছ্বাস কাণে আসেনি। কাণে এসে যা বেজেছে, তা এই নিশার ক্রন্দন, তার হৃদয়ের বুকভাঙ্গা বেদনার দীর্ঘশ্বাস।

* * * * *

বিশ্রী একটা শব্দ করে একটা মোটার ঐ বাড়ীটার সামনে থেমে গেল। বৌটা একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে জানালা হতে সরে গেল। এতক্ষণে মাতাল স্বামী ঘরে ফিরে এল। এই

মাতাল বেশ্যাসক্ত লম্পটের জন্য তার বৌটা এত রাত পর্য্যন্ত জেগে কষ্ট ভোগ করছে ; কিন্তু স্বামী তার এ কষ্টের কথা বোঝে কি ? যেখানে বুঝি, কষ্ট করলে তার সুফল আছে সেখানে কষ্ট স্বীকার করা যায় কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হলেও, বৌটী তার এমন স্বামীর জন্যে এতটা রাত জেগে বসে থাকে, তার সেবা করে, তার দাসীত্ব করে। কোন স্বার্থে ? নিঃস্বার্থে !... ... ...

এ দেখে প্রাণে একটা আনন্দ না নিরানন্দ জেগে ওঠে বলতে পারি না, কিন্তু এ মনের উপর বেশ একটা দৃঢ় ছাপ দিয়ে যায়। পৃথিবীময় দেখি শুধু স্বার্থের বীৎভস ঘাত প্রতিঘাত দান প্রতিদান। কিন্তু এর মধ্যে এমন ধারা একটা নিঃস্বার্থ ব্যাপার একটা খাপ ছাড়া কাণ্ড না হয়ে আরও সুন্দর করে দেয় পৃথিবীকে। তাকে বরণীয় করে তোলে এরাই এদের এমনি ধারা মহিমা দিয়ে।

... ...

বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বৌটী তার মাতাল স্বামীর হাত ধরে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে। আস্তে আস্তে তার গায়ের জামাটা খুলে নিলে। মাতালটাত অজ্ঞানের মতো পড়ে আছে ; আর বৌটী তার পাশে বসে পাখার বাতাস করছে। ক্রমশঃ তার হাতের গতি থেমে আসছে। এতক্ষণে ঘুমের নেশায় বেচারী ঢুলে পড়েছে। আবার তারি মাঝে মাঝে চমকে উঠে হাতের পাখা চালাচ্ছে।...

... ...

কি একটা নিশাচর পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে চলল।

... ...

আস্তে আস্তে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। যন্ত্রণা আমার যেন কম বোধ হচ্ছে।

আহা এত রাত অবধি জেগে বৌটী ঘুমের নেশায় অবসন্ন হয়ে সুখদা সুপ্তির শান্তিময় কোলে ঢলে পড়েছে। আর আমি, চির সুপ্তির শান্তির প্রতীক্ষায় বসে আছি, রাতের পর রাত জেগে, তার আশা পথ চেয়ে।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

বাণী-বিতান

পিতা স্বর্গঃ

নীল আকাশের কোনখানে ঐ নীল আকাশের কোন কোণে—
পরীরা সব করচে খেলা পারিজাতের ফুল বনে ?
মিথ্যে অলীক কল্পনা—
কামধেনু আর কল্প-লতার ছলনাতে ভুলবোনা !
তুমিই আমার স্বর্গ পিতা তুমিই আমার দেবতা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

তাল পাতার ঐ পুঁথির ভিতর ধর্ম্ম আছে বল্লে কে ?
বেদ কোরাণ আর বাইবেলে কি কেউ দেখেছিস্ এক লেখে ?
পুরোহিতের মন্ত্রণায়
সোনা ফেলে আঁচলে তুই বাঁধলি গেরো হায় রে হায় !
তুমিই আমার ধর্ম্ম পিতা তুমিই আমার দেবতা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

হোম আরতি ঘিয়ের বাতি তপ তপস্যার আড়ম্বর
জোপবোনা নাম, ন্যাস প্রাণায়াম কোরবোনাক অতঃপর,
কাজ কি মিছে জঞ্জালে ?
কি হবে তোর চক্ষু বুজে আসন পেতে বাঘ ছালে !
তুমিই আমার তপ তপস্যা তুমিই আমার দেবতা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

জানিনিকো শৈশবে আর মানিনিকো যৌবনে,
পাপ করেচি হাজার হাজার আদেশ-নিষেধ-লঙ্ঘনে ;
অপরাধ আর দোষ ত্রুটী—
ক্ষমা করো ভিক্ষে মাগি জোড় করে মোর হাত দুটী !
ঠেকিয়ে মাথা তোমার পায়ে আর মাগি এই ভিক্ষা গো—
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

তোমার অতল স্নেহ-শীতল পরশখানি মোর প্রাণে—
বুলিয়ে দে যায় শান্তি সুখের কি অমৃত কে জানে !
মনে মনে হয় ধোঁকা—
আজো আমি তেমনি তোমার ছোট্ট কচি সেই খোকা,
আড়াল করে আগলে আছ যা-কিছু ঝড় ঝঞ্ঝা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধুলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

প্রেমের সুরা পান করেছি—উগ্র তাতে তীব্র ঝাঁঝ !
তোমার স্নেহের গঙ্গাবারি কণ্ঠ আমার চাইচে আজ,—
কালো আঁখি, লাল ঠোঁটে—
বেল ফুল আর চাঁদের আলোয় কই সে রকম মন ওঠে—?
তড়িৎ হানে শিরায় শিরায়—চাইনা ও আর চাইনা গো—
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

গান্ধী মহারাজ

শীর্ণতনু, খর্ব্বদেহ জীর্ণ ম্রিয়মান,
বিশ্ব মানব জোড়া তবু বিরাট যাহার প্রাণ,
ধৈর্য্যে হিম-শৈল সম অটল দিবারাত
শৌর্য্যে যে জন সব্যসাচী, ক্ষমায় ভোলানাথ,
স্থূল-সত্তা হারায়ে যে চিৎসত্তাসার—
ভোগের অরি, ব্রহ্মচারী, ত্যাগের অবতার,
মোক্ষতরে দুঃখে বরে, বক্ষে ধরে বাজ,
সে যে মোদের বন্ধু পরম গান্ধী মহারাজ।

প্রথম যে জন মিলাইল হিন্দু মুসল্‌মান,
বেদ-কোরাণের মিলনসোয়াদ করলে প্রথম দান।
আশ্রমে যাঁর রামরহিমে প্রথম পরিচয়,
হাফেজ-কালিদাসের হলো মাল্য বিনিময়।

অশোক সাথে পাগ্‌ড়ী বদল করলে আরংজেব
মহম্মদে হর্ষে বুকে ধরল মহাদেব।
নমে যাঁরে পাগোদা, স্তূপ, দরগা, দেউল, তাজ
সে যে দীনের বন্ধুপরম গান্ধী মহারাজ।

মুণ্ডিত শির পথের ফকির, কৌপীন ও কম্বল
যাত্রাপথে করেছে যে একান্ত সম্বল,
ভারতীয় খ্রীষ্ট যে জন বিংশ শতাব্দীর,
মর্ত্ত্যজীবন বহে যে জন দিলীপ দধীচির,
ত্রিশ কোটি হৃৎপদ্মাসনে ধেয়ান সমাসীন
জীবন্মুক্ত, বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মানন্দে লীন।
অন্তরে যাঁর বৈজয়ন্ত বাহিরে দীন সাজ,
সে যে দেশের বন্দ্যপরম গান্ধী মহারাজ।

আয়ুধ যাঁহার চরকা কেবল, কর্ম্মী কবীর যেই
সহিষ্ণুতা ভিন্ন যাহার অস্ত্র কবচ নেই।
স্বাধীন জীবন বোধনে যে দৈব পুরোহিত,
তিরিশ কোটির অন্ন তরে সাধ্‌লে বিশ্বজিৎ,
লজ্জাভরা সজ্জা, ত্বরা করতে পরিহার—
খাদি নিয়ে 'সাধিসাধি' ঘুরে যে দ্বার দ্বার,
ঢাকছে যে জন তিরিশ কোটির কটিতটের লাজ,
সে যে ক্ষমাসিন্ধু অগাধ গান্ধী মহারাজ।

হিমাদ্রি যায় আশিস্‌ করে, বিন্ধ্য নোয়ায় শির,
নিদেশ পালে 'সাতীল-আরব'—গঙ্গারেবার তীর,
বন্দীশালার বৃক্ষ গয়ায় সিদ্ধ যে গৌতম,
একদেহে যে নিত্যানন্দ, নিমাই, নরোত্তম।
সকল কর্ম্ম সমর্পিত পরমব্রহ্মে যাঁর
যাঁর যশোগান দেশে দেশে গাইছে পারাবার,
জম্বুদ্বীপের জাগরণের কম্বু বাজায় আজ,
সন্ধ্যাবেলার কাণ্ডারী সে গান্ধী মহারাজ।

শ্রীকালিদাস রায়।

ভাঙাচোরা

বুকের মাঝে সুখের বাসা
ভাঙ্‌ল প্রলয় ঝড়ের মুখে,
সেই ফাঁকে এই দুনিয়া খানা
ঢুক্‌ল এসে আমার বুকে।
লাগ্‌ল ভাঙা বুকের ঘাটে
যত ভাঙা তরীর ভিড়,
এল ভেসে বুকের পাশে
শত ভাঙা পাখীর নীড়।
ভাঙ্গা চোরায় উঠ্‌ল ভরে
আমার বুকের গভীর তল,
নিভিয়ে দিল বুকের আগুন
মুছিয়ে দিল চোখের জল।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

ভুল ভাঙা

(রবীন্দ্রনাথের ভুলভাঙা পড়িয়া)

সত্য হে কবি, এ যে ভুল ভাঙা
আর এক ভুল ধরিতে !
এ যে তটিনীর এক কুল ভাঙা
আর এক কুল গড়িতে !
প্রেম বহে যায় বাঁধাত রহেনা,
তাই ফেলে যায় বোঝাত বহেনা—
কেন চাহ তারে একটী স্বপনে
ভরিতে !
সুখ বেদনার এ যে ফুল রাঙা
কালই নিশাশেষে ঝরিতে ;

মানব মনের এই দখিনারে
রেখনাক সখা বাঁধিয়া,
অনেক সুরভি নিতে হবে তারে
অনেক কুসুম সাধিয়া !
এরে চুমি বহু জীবন ফুটিবে
সার্থক হয়ে অনেকে টুটিবে,
এ যদি বন্দী রহে গো অপরে
বাঁধিয়া—
ব্যর্থ করিয়া ব্যর্থতা ভারে
মরিবে কাঁদায়ে কাঁদিয়া ।
জীবন নিত্য-ক্ষণিক-স্বপন
অনন্ত কাল রয় তো,
এক কোণে এক কালেতে বপন
করিবার ধন নয় তো !
এক মধুনিশা একটী জীবন
অনন্ত মাঝে দুইই একক্ষণ ;
কোটী বঁধু সেও একজন প্রেম-
ময় তো !
যাহা ফেলে যায় বয়ে চলে চায়
তারেই জীবন কয়তো !
ভুবনে ভুবনে জীবনে জীবনে
বাজিছে প্রেমের বাঁশী যে
চলিবার টানে তাই প্রাণে-প্রাণে
বাঁধিছে মোহের ফাঁসি যে !
তাই যৌবন লীলা অনন্ত
নিখিল বিশ্বে চির বসন্ত,
তাই নিশিদিন অনাহত বীণ
বাজিছে !
কভু প্রেমঘোর কভু আঁখিলোর
নয়নে নয়নে সাজিছে !
ক্ষণিকেরই তরে নাও যারে চাও—

আপনার মালা তার গলে দাও
তার মালা নাও দুলায়ে !
ফুল যাবে ঝরে রবে শুধু ডোর
চুম্বনস্মৃতি-ভরা-আঁখিলোর
পরিমল-ব্যথা রবে কিছু ওর
কুলায়ে !
ক্ষণকেও আছে চির-আনন্দ
অসীম জীবন ভুলায়ে !

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ।

সন্ধ্যার পল্লী

সন্ধ্যা ছেয়ে আসে ওই প্রান্তর সীমায় —
ভানু গেছে দিগন্তের দেশে,
সেথায় ফুটিয়া উঠি গাঢ় শোণিমায়
মেঘগুলি আসে ভেসে ভেসে !
ব্যাকুল বিহঙ্গদল বিহ্বলের মত
ছুটে চলে ওই দেশ পানে ;
ছায়াচ্ছন্ন সুদূরের পল্লীরাজি যত
ভরি উঠে লক্ষসুরে গানে !
তটিনীর এ পারেতে বসে আছি একা—
লাল জল কালো হয়ে আসে !
কাননের ছবি যায় স্বপ্ন সম দেখা
অন্তহীন আঁধারের পাশে !
উদাস এ মন যায় ছুটে লুটে পড়ে
ওপারের উৎসবের বুকে :
বিপুল রহস্যময় পল্লী ঘরে ঘরে
ডুবে যায় অনুপম সুখে !
অজানা কাহারা সেথা ভরি আছে গেহ,
রচিয়াছে কত মায়াজাল,
মধুময় করি আছে ঘন প্রেম স্নেহ
সেথাকার সর্ব্ব দেশকাল !

পুঞ্জীভূত করিয়াছে কত চিন্তা ভাব
অভিনব কত যে জীবন,
ছন্দতালে নৃত্য করি আনন্দ স্বভাব
ভিড় করে কতশত মন !

অন্ধকারে মৃদুশিখা প্রদীপের প্রায়
জলে সেথা তরুণীর রূপ :
অজ্ঞাত সে গহনের গোপন ছায়ায়
লুক্কায়িত কত রস-কূপ !
কে জানে কাহারা সেথা চাহে বা কাহারে,
কে সেথা বসিয়া রহে একা !
সারা বিশ্ব তন্ন তন্ন খুঁজিয়া আকারে
নাহি পায় কার যেন দেখা !
কার আঁখি জাগে সেথা দৃষ্টি অনিমেষ
সারা জন্ম তারায় তারায়,
দীর্ঘশ্বাস ছুটি পিছে কারে নিরুদ্দেশ
পাই পাই করিয়া হারায় !
কাহার জীবন শুধু রচে প্রহেলিকা,
ধরা নাহি দেয় কারে সেথা,
অন্তরালে গাঁথি কত মন্দার-মালিকা
বাহিরে ঘনায় শুধু ব্যথা !—
ওই পল্লী—ওযে শুধু রহস্যের ভূমি,
ওযে শুধু আমারে কাঁদায় ;
এপারে বসিয়া একা কার আত্মা চুমি'
মন মোর ওরি পানে ধায় !
বসে থাকি প্রতিদিন এমনি সন্ধ্যায়
তবু নাহি হই নদী পার ;
প্রাণে রচা স্বপ্ন-ছবি পাছে ভেঙে যায়
বুক চাপি উঠে হাহাকার !

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক ।

মুগ্ধা

একে কুহক নিয়ে যৌবনের ক্ষণে
গেল ফাগুন হাওয়া দিয়ে মনের বনে।
কিশ—লয়ের পুটে
কচি রভস লুটে,
একে স্বপন ছোঁয়ায় নীল নয়ন-কোণে!

ফুল— ঝুরির সুরে ঘুম সোহাগ পিয়ে
চুম— বিথার দিয়ে ধুম লাগায় কি এ!
এযে সবুজ মোহ
চায় প্রাণের লোহ,
এল ফাগুন নিয়ে গেল আগুন দিয়ে!

ছি-ছি ফাগুন এ যে!—ঝরে আঁখির দেয়া!
বয়ে কে ওই আসে মরণ-পারের খেয়া?
একি মনের ভুল
হ'ল অশোক ফুল?
ভাল— বাসার বুকে ফোটে কাঁটার কেয়া!

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী।

—

সাঁঝে

আজি সাঁঝে মৌন চাঁদ ঢালিছে কিরণ,
সুদূরে কাঁশর ঘণ্টা তুলিছে রণন,
গৃহপাশে ঝিঁঝিঁ ডাকে অক্লান্ত হরষে,
গুপ্ততম কোন্ বার্ত্তা আমারে পরশে!—
শুয়ে আছি গৃহকোণে ভাবি অনুখন—
এই যে প্রশান্ত বিশ্ব মোহন শোভন—
কোথা মোর এর সাথে কোথা আছে যোগ
যাহারি আনন্দ আজ করি উপভোগ
জননীর স্নেহের মতন?

আছে আছে আছে—
এ বোধ হৃদয়ে মোর আজিকে বিরাজে—
আছে ঠাঁই, আছে ঘর, আছে মোর স্থান
আলোক-বিধৌত বিশ্বে, এই অফুরান-
প্রশান্ত-আনন্দ-ভরা নিখিলের বুকে,
তারি শান্তি তারি তৃপ্তি তারি হর্ষে সুখে—
পদ্ম সম সরসীর সলিল-কল্লোলে ;
দুলি আমি নাচি আমি তাহারি হিল্লোলে,
তাহাতে লুটাই তারি রস পিয়ে বাঁচি,
এমনি নিখিল-চিত্তে আছি আমি আছি।

আজি রাতে দীপ্তিময়ী মোহন মৌনতা
পরাণে চুমিয়া মোরে কহে যেন কথা ;
আমি যেন নিখিলের আনন্দ-বিকাশ,
তাই তার প্রীতি মোরে পরাইছে পাশ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত।

শেষ ভালো

(ইংরাজী হইতে)

সব ভাল যার শেষ ভালো গো
শেষ ভালো,
সেই রমণী সুন্দরী যার
চোখ কালো!
পুকুর পাড়ে মিশিয়ে যাওয়া
চুড়ীর বীণ!
আঁখির কোণে উজলা হাসি
রাত্রি দিন।
মরাল গ্রীবার হংস গতির
পা তোলা,
দখিন হাওয়া উড়িয়ে বসন
দেয় দোলা!

শিথিল খোঁপায় আধেক ঢাকা
ঘোমটাটী—
আঁচলখানি জড়িয়ে কোমর
রয় আঁটি!
নির্জ্জন সেই গ্রাম্যপথে
যাই একা
কলসী কাঁখে পল্লীঘাটে
দেয় দেখা!

* * * *

বছর ভরে আশার রঙ্গীণ
জাল বুনি
কাটিয়েছিলাম অশ্রু সজল
দিন গুণি।
আজকে আমার স্বপ্ন আশা
সব সফল,
বুকের মাঝে মুখটী তব
নিদ্ কমল!
দূর করে সব বিফলতার
মিশ কালো,
ভাবছি আজি সব ভাল
যার শেষ ভালো!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

লেখকতার পরিণাম

(১)

ঘণ্টা বাজ্‌তেই খাতাপত্র সব গার্ডের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি পরীক্ষাগৃহের রুদ্ধ বাতাসের পরিবর্ত্তে বাহিরের নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য ছুটে বেরিয়ে এলুম। এতক্ষণ যেন জোর করে' নিঃশ্বাস ফেল্‌বারও ক্ষমতা ছিল না। কাগজের গৌরবর্ণচ্ছটা নীলাম্বরীর সাজে বেশী সুন্দর দেখায় কিনা ঘণ্টা তিনেক ধরে পরীক্ষা করবার পর চোখ দুটা চারিপাশের দৃশ্য জগতের দিকে একবার নূতন করে চেয়ে নিলে। ছ'বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম—এর মধ্যে কত বিবর্জ্জন

পরিবর্ত্তনের স্রোত বিশ্বের উপর দিয়ে বয়ে গেছে—কোন দিকেই লক্ষ্য কর্‌বার অবসর ছিল না। এতদিনে নিশ্চিন্ত!

বন্ধুবর ক্ষিতীশের বিবাহ এই সপ্তাহের শেষে। নিতান্ত বাধ্য হয়েই এ কটা দিনও কলিকাতাতে কাটিয়ে যেতে হবে।

অনেকদিনের পর লেখাপড়ার ঝঞ্ঝাট ছাড়া আর কিছুর আরাধনা করে রাত্রি কাটাবার সুযোগ এসেছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, বেশ সুখেই কাট্‌বে। কিন্তু কাজ না থাক্‌লে প্রত্যেক মুহূর্ত্তটাও যে এত দীর্ঘ হয়ে ওঠে তা কে জান্‌ত বল! কালি কলম নিয়ে বস্‌লুম। একটা কিছু না করে সময় কাটাই কেমন করে? কোন্ ভাষাতে লিখ্‌ব? এতদিন পরে মাতৃভাষারই পুনরায় আলোচনা করা যাক্। গদ্য না পদ্য? গদ্য লিখ্‌তে বস্‌লে লেখা ক্রমশঃ এমন বেড়ে যায় পনের কুড়িপাতার কম শেষ হয় না। পদ্যই ভাল। না পারি,—একটা চতুর্দ্দশপদী কিম্বা অমিত্রাক্ষর—অন্ততঃ চেষ্টা দেখিই না কেন। বিষয়? 'ফুল'—'নক্ষত্র'—'বাণীর আবাহন'—'প্রেম'—না, কোনটাই মনঃপূত হয় না। 'মাতৃস্নেহ'? সে যে ক্ষমতার অতীত! মার কাছে চিরকাল আব্‌দার ও উপদ্রব করে এসেছি—কিন্তু তাঁর স্নেহ অমরাপুরীর কোন মন্দাকিনীর ধারা বয়ে নিয়ে এসে আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ ধুয়ে মুছে দিত তার কথা কবে ভেবেছি? মায়ের সেই অফুরন্ত ভালবাসাকে রূপ দিয়ে কালির আঁচড়ের মধ্যে মূর্ত্তিমান করে তুল্‌ব সেই সাধনা আমার নেই ত! তবে 'পল্লীর স্মৃতি'? এই বেশ! কিন্তু?—হাঁ—কিন্তু একটা আছে বটে। পল্লীর মধ্যেত একমাত্র জন্মস্থান 'সোণারডাঙা' ছাড়া কারুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তবে, সেই একটা গাঁয়ের যতটুকু আমি জানি তার স্মৃতিতে মন ভরে আছে। সেই 'কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে'—'সেই পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলা গেহ'—'সেই শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী'—সেই সরল ও অনাবিল প্রাণের লীলাখেলা আমাদের মনে প্রাণে কি আনন্দেরই না ঢেউ তুল্‌ত! আর, হাঁ—সেই কথাটা যে এতদিন ভুলেছিলুম! জীবনের এত বড় একটা ঘটনা এর মধ্যেই বিস্মৃত হওয়া উচিত হয় নি।··· সন্ধ্যা হয় হয়। কৃষ্ণপক্ষের দশমী না একাদশী—হাঁ একাদশীই বটে, মার সেদিন উপবাস মনে আছে। দীঘির ধারে সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছিলুম। বড় বড় গাছের ঘন পত্ররাজির অন্তরালে লোহিত পিণ্ডটা লুকিয়ে পড়ছিল। ঠিক সেই সময়টা হঠাৎ কোথা হতে মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লে। তখন সে খোলা মাঠে দাঁড়ায় কার সাধ্য? অদূরে একটা কুঁড়ে দেখ্‌তে পেয়ে তারির দিকে ছুট্‌লুম। রুদ্রের সে কি ভৈরব মূর্ত্তি! চোখের সামনে দশ বিশটা গাছ উব্‌ড়ে পড়্‌ল। কুঁড়েটার মধ্যে আশ্রয়ের জন্য ঢুকে দেখ্‌লুম—ভেতরেও একটা ঝড়ের লীলা চল্‌ছে। বছর এগার বারর একটী মেয়ে 'বিসূচিকা'র আক্রমণে যাতনায় আকুলি বিকুলি খাচ্ছে! কেবল হুঙ্কার আর দাস্ত কর্‌ছিল। সে কি অস্থির কাতরতা!......কিন্তু খানিক পরেই সে নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অত যাতনা সত্ত্বেও সে যে কেমন করে ঘুমুত পেরেছিল—তাই আশ্চর্য্যি! হয়ত বা ঝড় জলের সঙ্গে যে ঝাপটাটা এসেছিল, তারির শীতল

স্পর্শে সে খানিক স্থির হয়েছিল;—আর তার বুকের আগুনটাও খানিকক্ষণের জন্য নিবে গিয়েছিল।

'বিন্দি' বলে মাঠ হতে রাঘব দত্ত ফিরে এসে আমাকে দেখ্তে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছিল। মেয়ের অসুখ দেখে সে ত কেঁদে ফেল্‌লে। অপুত্রক যম তার সব কটী ছেলে মেয়েকেই এক এক করে কেড়ে নিয়ে গেছে! অন্ধের যষ্টির মত ঐ একটী মাত্র সম্বল! আজ তাকেও বুঝি আর ধরে রাখ্তে পারে না।

অমার তখন চার বছরের অধীত বিদ্যার জোরটা দেশের লোকের সামনে জাহির কর্‌বার স্পৃহা বেশ একটু মনে জেগেছিল। দুটা ওষুধের নাম লিখে, গম্ভীর চালে রাঘবকে আশ্বাস দিয়ে তখনি ডাক্তার হাজ্‌রার 'ডিস্‌পেন্‌সারিতে' পাঠিয়ে দিলুম। হাজরা সন্ধ্যার আগে 'কলে' বেরিয়েছিলেন; ও দুর্য্যোগে আর ফির্‌তে পারেন নি। তাঁর ছেলেকে অনুরোধ করে বহু খোঁজাখুঁজির পর দশবৎসরের পুরাণো আল্‌মারি ঘেঁটে রাঘব যখন ওষুধ সংগ্রহ করে আন্‌লে, তখন সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। সেই সময় বিন্দি একটা বড় রকমের টাল সামলালে। আমার তখন মনে ভয় আর উদ্বেগ এত বেশী হয়েছিল যে কি বল্‌ব! চিকিৎসার দায়িত্ব জিনিষটা যে কি, সেই একটী দিনেই উপলব্ধি করেছিলুম। সেই নির্জ্জন কুঁড়েয় একাকী রোগীকে কোলের কাছটীতে নিয়ে বসে—ওঃ কি রাত্রিই গেছে সেদিন! কিন্তু ভগবান্—মুখ রক্ষা করেছিলেন। রাত দু' তিন্‌টের সময় থেকে অসুখটা বেশ একটু নরম পড়েছিল। সকাল হলে উদ্বেগের আর কোন কারণ ছিল না।...

মা'র কাছে সমস্ত বল্‌তে তাঁর দুচোখ বেয়ে জল ঝরেছিল ও অন্তরের নির্ম্মল আশীর্ব্বাদে আমাকে অভিষেক করছিল।······

একি—এগারটা বেজে গেল! নাঃ—কবিতা লেখা আমার কর্ম্ম নয়। মাকে একখানা চিঠি লিখে দি—'বুধবার যাব'...এক পাতার মধ্যেই 'ইতি'! তা হলে যে কালি কলম নিয়ে বসাই মিথ্যা হল। আর একখানা লেখা যাক্। কাকে আর লিখ্‌ব? ঐ বিন্দিটাকেই একখানা লিখি না কেন?—লিখ্‌লুম,—

"...আমার জীবনের এই পঁচিশটা বছর লেখাপড়ার বাঁধাধরা গণ্ডীর ভিতর কাটিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। মুক্তির আনন্দে আজ আমার প্রাণ যে কি রকম দুলে উঠ্‌ছে, তা তোমায় কি বল্‌ব। ছোট বোনটী আমার! এবার ফিরে গিয়ে আমার এই কর্ম্মক্লান্ত জীবনটাকে তোমাদের সরল শান্ত মধুর বুকের মাঝে বিলিয়ে দেব!···

আজ হয়ত তুমি একটী ছোট্ট ঘরে, একটী ছোট্ট সংসারের রাণী সেজে বসেছে। তোমার ওই নির্জ্জন মনের কোণটীতে এই ঘরছাড়া দাদাটীর কথা কোন দিন জেগেছে কি? সে একটি দিনের পরিচয়—মনে আছে কি? একটী নিমিষের দেখা, তবু তারির মধ্যে তুমি আমার অন্তরের মাঝখানে এমন একটু স্থান অধিকার করেছ যে, তোমাকে আমি জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না...

মা ছাড়া আর কারুর ভালবাসা আমি পাই নি। কিন্তু যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি, কেমন যেন আকুল অভাবের ব্যথা আমার মনে জেগেছে! লেখাপড়া আর কাজের মাঝে আমার কাঙ্গাল মনের তৃষ্ণা বেড়েই চলেছে! তাই এবার দেশে গিয়ে তোমাদের মত মা বোনদের ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে জীবন ধন্য করব।…

(২)

সেদিন ছিল আষাঢ়ের পয়লা ; কিন্তু বহুদিন যাবৎ বৃষ্টি হয় নি বলে মাঠ প্রান্তর সব শুকিয়ে কাট ফাটছিল। দু' একটা ছোট খানার মত দেখ্‌লুম, হয়ত কোন এক সুদূর অতীতের যুগে সেগুলা চাষীদের পিপাসায় শান্তি দান করত। আজ কিন্তু এক বিঘতও জল নেই। অথচ পাঁকে বোঁজা সেই জলগণ্ডূষটুকুর অংশ পাবার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটা গরু আর মোষ কাড়াকড়ি লাগিয়েছে।

পথের ধারে একটা বটগাছের অপেক্ষাকৃত শীতল ছায়ায় খানিক জিরিয়ে নেব ভাব্‌লুম। উত্তর পূর্ব্ব কোণে গজদশেক পরিমিত একটা জমাট কাল মেঘের আবির্ভাবে কালিদাসের "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসের" কথা মনে পড়্‌ল। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতই সুদূরের প্রিয়ার বার্ত্তা বহে এনেছে মনে করে আগ্রহান্বিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লুম। একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম—তার ওষ্ঠাধরে স্বপ্নরাণীর ঈষৎ চঞ্চল হাসি আর অশ্রুর যুগলখেলার ছায়াপাত দেখ্‌বার জন্য।

সেই নীরব স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হ'ল—"এই যে, অমিয় এখানে!"

চেয়ে দেখ্‌লুম, অন্ততঃ সতেরজন মহারথী লাফাতে লাফাতে কাছে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। চক্কোত্তি খুড়োকে দেখে পথের মাঝেই প্রণাম কার্য্যটা সেরে নেবার উদ্দেশ্যে নত হতেই—তিনি পা সরিয়ে নিলেন।

"আধ ঘণ্টা ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি—বেটা আমার গাছের তলায় বসে হাওয়া খাচ্ছেন। কিছুতেই গ্রামে ঢুকতে দেব না। দেশের কুলাঙ্গার।—সহুরে হয়ে ভূত হয়েছেন বাবু আমাদের।"

"সত্যি দাদা—দেবু মুখুজ্যের ছেলে—এতটা হবে আশা করিনি! কালে কালে আরও কত কি দেখ্‌ব।"

"কালকের ছেলে, আস্পর্দ্ধাটা ভাব দেখিনি। লেখে কিনা 'ভালবাসা'—'নিমিষের দেখা'—'আকুলতৃষ্ণা'। আবার এ সঙ্গে ভণিতাও আছে 'ইতি তোমার দাদা'! বলি দাদার দাদাগিরিটা চল্‌ছে কতদিন থেকে?"

"সেবার এসে কি ঢলানটাই ঢলিয়েছিল। আমি তখনি বলেছিলুম ওসব অসুখ টসুখ মিছে। বাপু, ছাই দিয়ে কি আগুন ঢাকা থাকে?"…

হাতে আমারি দেওয়া বিন্দির নামের চিঠি। কিন্তু তাতে এমন কি লিখেছি যে, এঁরা

এ রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন ? ছোট বোন ভেবে ভালবাসা—তার ভেতর এ রকম বিশ্রী কল্পনা গড়বার মত এমন কি জিনিস আছে ? ছিঃ—ছিঃ—নির্ম্মল স্নেহ ভালবাসার নামে একি কলঙ্ক ! মনের পবিত্র উচ্ছ্বাস পৃথিবীর মাটীতে পড়ে একি গরল সৃষ্টি কর্‌ল ভগবান !

চিঠিখানার প্রত্যেক আঁচড়টা আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চোখ দুটা বিঁধে অক্ষরগুলা যেন তীরের মত ফুট্‌তে লাগল। তারা আমায় বিদ্রূপ করে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল—'কি কৈফেয়ৎ দেবে তুমি !'...কিন্তু জবাব দেবার আমার ত কিছু ছিল না। সামান্য বিষয় রঙচঙের গুণে যে একটা উঁচুদরের রোমান্স পর্য্যন্ত সৃষ্টি করে—তার নিদর্শন পেয়ে আমি স্তব্ধ হয়েছিলুম। তার পর পঞ্চায়েতের বিচার ফল ও শাস্তির কথা যখন দিগন্ত কাঁপিয়ে শতমুখে বিঘোষিত হয়েছিল, তখন কেঁদে ফেলেছিলুম।

আহা ! রাঘবের কথা শুনে কষ্ট হয়। বেচারী আজ ক' মাস ধরে শুধু তার মেয়েটীর উপর নির্ভর করে মরণাপন্ন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। দারিদ্র্য ও রোগের পীড়ন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তার উপর অপরিণামদর্শী আমার এই এক "খেয়ালের খেলা"য় তার জীবনের শেষের কটাদিনকে আরও দুর্ব্বহ করে দিলুম। আমার জন্যে অভাগী বিন্দিরও সারাজীবনটাই ব্যর্থ যাবে। তার জীবনের সাধ আশ কিছুই পূর্ণ হবে না ! সমাজে তার স্থান নেই ! রাঘব মরে' গেলে তাকে আর কেহ আশ্রয় দেবে না। বুড়া চোখ বুজ্‌লেই সকল দিক অন্ধকার ! সহায় নেই—সম্পদ নেই—! স্রোতের টানে সে ভেসে উধাও হয়ে যাবে—আর নিষ্ঠুর বিচারক সমাজ তার দিকে চেয়ে হাস্‌বে আর ব্যঙ্গ কর্‌বে। কিন্তু সরলা বালিকা সে—তার কি দোষ ? সে ত কোন অপরাধ করে নি ! যদিই বা আমার মহাপাতক হয়ে থাকে, শাস্তি শুধু আমারই হল না কেন ? তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিন্দিকে, হৃদয়ের পবিত্রতার গর্ব্ব জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করবার সমাজের কি অধিকার আছে ?

কিন্তু কে শুন্‌বে আমার এ নিষ্ফল তর্ক ?—আমি যে নিজে অপরাধী !......

বুকভরা হাহাকার নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে 'ইচ্ছামতী'র তীরে একটা ছোট্ট ঝোপের আড়ালে ক্লান্ত তনু ভূমিশয্যায় বিছিয়ে দিলুম।

পৃথিবীর শেষ আলোরেখাটুকু এক গাঢ় তন্দ্রাচ্ছন্ন আঁধারের মাঝখানে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌ছে। আমার নিজের অস্তিত্বটুকুকে যদি এম্‌নি করে গভীর অন্ধকারে লীন করে দিতে পার্‌তুম্‌ ! নদীর অশ্রান্ত হিয়া কোন মর্ম্ম কাঁদানো আকুল করা গানের সুরে তাল দিয়ে গেয়ে চলেছে ! ওকে চুপ কর্‌তে বল—! আমি যে নিজেরই দীর্ঘশ্বাসে নিজে চম্‌কে উঠ্‌ছি ! সামান্য একটা বিদ্যুতের ক্ষীণ আলোয় শিউরে উঠ্‌ছি !—যদি কেউ দেখে ফেলে ! সকলকার বিদ্রূপ কটাক্ষ থেকে নিজেকে গোপন কর্‌তে হবে ! আমার এই লজ্জার ম্লানিমাটুকু ঢেকে ফেল্‌তে হবে !.........

কিন্তু আমার এ শাস্তি ত তুচ্ছ। বিন্দিকে যে এর অনেক বেশী কঠিন শাস্তি মাথায় পেতে নিতে হবে! সে কি পারবে? সে যে নিতান্তই বালিকা। আগুনের তাপে নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু পুড়ে' ক্ষার হতে না দিয়ে, গলিত সোণার মত নিষ্কলঙ্ক করে' তোলবার ক্ষমতা তার আছে কি?......

কে এক উদাসী শ্মশানঘাটে বসে গাইছিল,—

"বিপদে মোরে রক্ষা কর
 এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়!
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
 নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে আমি করিতে পারি জয়!"......

সত্যিই ত! এই মিথ্যা অপরাধের মিথ্যা বিচারের দণ্ড পেয়ে মাথা নত করে' চলাত আমায় সাজে না! এই দুঃখ আর অপমান বিধাতার দান বলে আমায় মাথা পেতে নিতে হবে! কাতর হয়ে পরাজয় মান্‌লে চল্‌বে না! আমায় জয়ী হতে হবে! আমা' হতে যে জীবন ব্যর্থ যাচ্ছে—তাকে আমিই সার্থক করে তুল্‌ব। এখনো চেষ্টা কর্‌লে কি রাঘবকে বাঁচাতে পার্‌ব না? আর বিন্দি—! সে কায়স্থের মেয়ে—! হলই বা! আমারও ত ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব সমাজের বিচারে চূর্ণ হয়ে গেছে! লোকলজ্জা আদি তুচ্ছ করে তাকে আমি সাদরে কাছে ডেকে নেব! কেন? আপত্তি কিসের? কে আপত্তি কর্‌বে? বিন্দি? সে যদি, তার অবমাননা করেছে যে, তাকে ক্ষমা না কর্‌তে পারে...? কিন্তু সেও কি আমার ব্যথিত অন্তরের দিক চেয়ে বিচার কর্‌বে না? আমার ক্ষুব্ধ প্রাণের ব্যথা না বুঝে মুখ ফিরিয়ে নেবে?—না—সে ত পাষাণী নয়! তার সেই করুণামাখা মুখখানি যে এখনো চোখের সামনে দেখ্‌ছি! সেদিন সকালে চলে আস্‌বার সময় তার সেই সকরুণ চাহনিটুকু—ভুলতে পারব না আমি। সেই স্বচ্ছ চোখ দুটার ভিতর দিয়ে আমি যে তার সত্যিকার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখেছি! সে ত নিষ্ঠুর নয়!......

উদাসী তখন গাইছিল,—

"দুঃখের দিনে নিখিল ধরা
 যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

সংসারের এই বন্ধুর পথে প্রাণ আমার যখন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে, তখন আমার মাকে যে আমি ভুলে আছি! মা—! মা—! কতদিন তোমায় দেখিনি! তোমার কাছে ফিরে আস্‌বার জন্য যে আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছিলুম! কিন্তু বাড়ীর দোরের কাছে এসে তোমায় কেন ভুলে গিয়েছিলুম? আমার সুখ দুঃখ, মান-অপমান সমস্তের বোঝা তোমার চরণতলে

নামিয়ে দিই নি কেন? আমার লাঞ্ছিত অবসন্ন দেহ ত তোমার সর্ব্বসন্তাপহরা স্পর্শ বিনা শান্তি পাবে না! ভগবান! আমাকে আজ এইটুকু শক্তি দাও, আমি আমার মায়ের পায়ের তলায় নিজেকে বহে' নিয়ে গিয়ে লুটিয়ে দি'!!

(৩)

আস্তে আস্তে মার ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালুম—ওকে! বিন্দি! আমার মায়ের কোলটীতে মাথা লুকিয়ে কাঁদছে! কিন্তু—কেন? নালিশ করতে এসেছে আমার নামে?—

মা বলছিলেন "ভয় কি মা—? রাঘব চলে গেল—। কিন্তু আমি ত রয়েছি! সংসার না তোকে চায়, আমার বুকের আড়ালে তোকে লুকিয়ে রেখে দেব!…চল মা! আমি নিজে গিয়ে তোমার বাবার সৎকারের সব আয়োজন করে দেব।…আমি শুধু ভাবছি—সে এখনো এল না কেন? আমার ছেলে হয়ে সে কি এত দুর্ব্বল যে, ভয়ে পেছিয়ে যাবে? সে না পারলেও, আমি কিছুতেই অস্বীকার করব না। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমি তোমাকে সংসারের সব বাধা লাঞ্ছনার হাত থেকে লুকিয়ে রেখে দেব।"

এই আমার মা! এই মাকেই আমি ভুলে ছিলুম!

ছুটে গিয়ে পা' দুটী জড়িয়ে বললুম—"ক্ষমা কর' মা—তোমার এ অবোধ সন্তানে! আমার এ দুর্ব্বল বুকটীতে এমনি শক্তি ভরে' দাও মা—যাতে আমি সব সইতে পারি।"

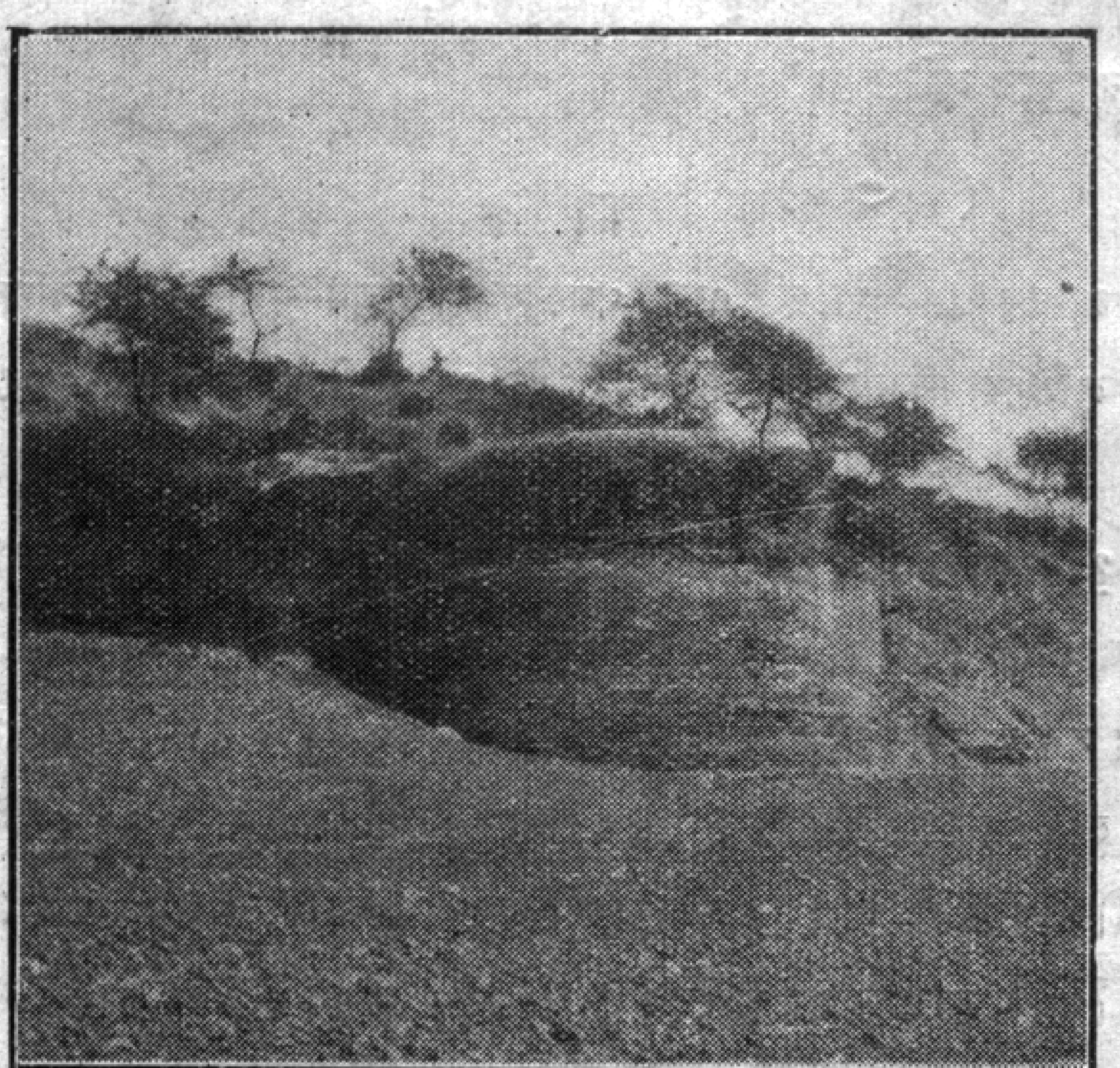
শ্রীপূর্ণিমা দেবী।

কৌশাম্বী

এলাহাবাদের অন্তঃপাতী কড়ারী পরগণায় যমুনার উত্তর তীরে কোসম ইনাম ও কোসম খিরাজ নামে পরস্পর সংলগ্ন দুটী পল্লীগ্রাম বর্ত্তমান আছে। ঐ দুটী গ্রামে কতকগুলি প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দেখিয়া এবং কৌশাম্বীর সহিত কোসম নামের সাদৃশ থাকায় এইস্থানেই প্রাচীন প্রসিদ্ধ কৌশাম্বী নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া (General Cunning-ham) জেনারেল কনিংহেম নির্দ্দেশ করেন। (Mr. Vincent Smith) মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু জেনারেল কনিংহেমের মতের পরিপোষক এমন অনেক নিদর্শন দেখা যায় যাহাতে তাহার নির্দ্ধারণ সন্দেহ করার কোন কারণ দেখা যায় না।

বর্ত্তমান কোসমের নিকট কড়া ও পাভোসা নামক দুটী স্থান আছে। উক্ত কড়া হইতে রাজা যশপালের শাসনকালের (১০৯৩ সংবতের) একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে পাভোসা কৌশাম্বী মণ্ডলীর অন্তর্গত এবং কড়ার রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

দিগম্বর জৈনদের নিকট অতি প্রাচীন কাল অবধি এই স্থানই কৌশাম্বী বলিয়া পরিচিত। এখানে তাহাদের একটী মন্দির স্থাপিত আছে। ঐ মন্দিরে এখনও নিত্য নৈমিত্তিক সেবা পূজা হইয়া থাকে।



কৌশাম্বীর ভগ্ন দুর্গের এক অংশ।

এলাহাবাদ দুর্গে যে অশোক-স্তম্ভ আছে, ইহা পূর্ব্বে কৌশাম্বীতেই ছিল। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ইহা এখান হইতে স্থানান্তরিত করিয়া উক্ত দুর্গে প্রোথিত করান। ঐ স্তম্ভে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে।

যে (আ) ন পয়তি কোশম্বির মহম (।) ত···
যঃ সংঘস্ (ই) ত্ (অ) চিয়ে সংঘং
ভাখতি ভিখু ব ভিখুনীয়া (দ) উসানি—
নং ধাপয়িতু আন (য়) স······

ইহা ব্যতীত এই স্থানই যে সেই প্রাচীন কৌশাম্বী তাহার আরও নিদর্শন আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে বলিয়া সেগুলি উল্লেখ করিলাম না।

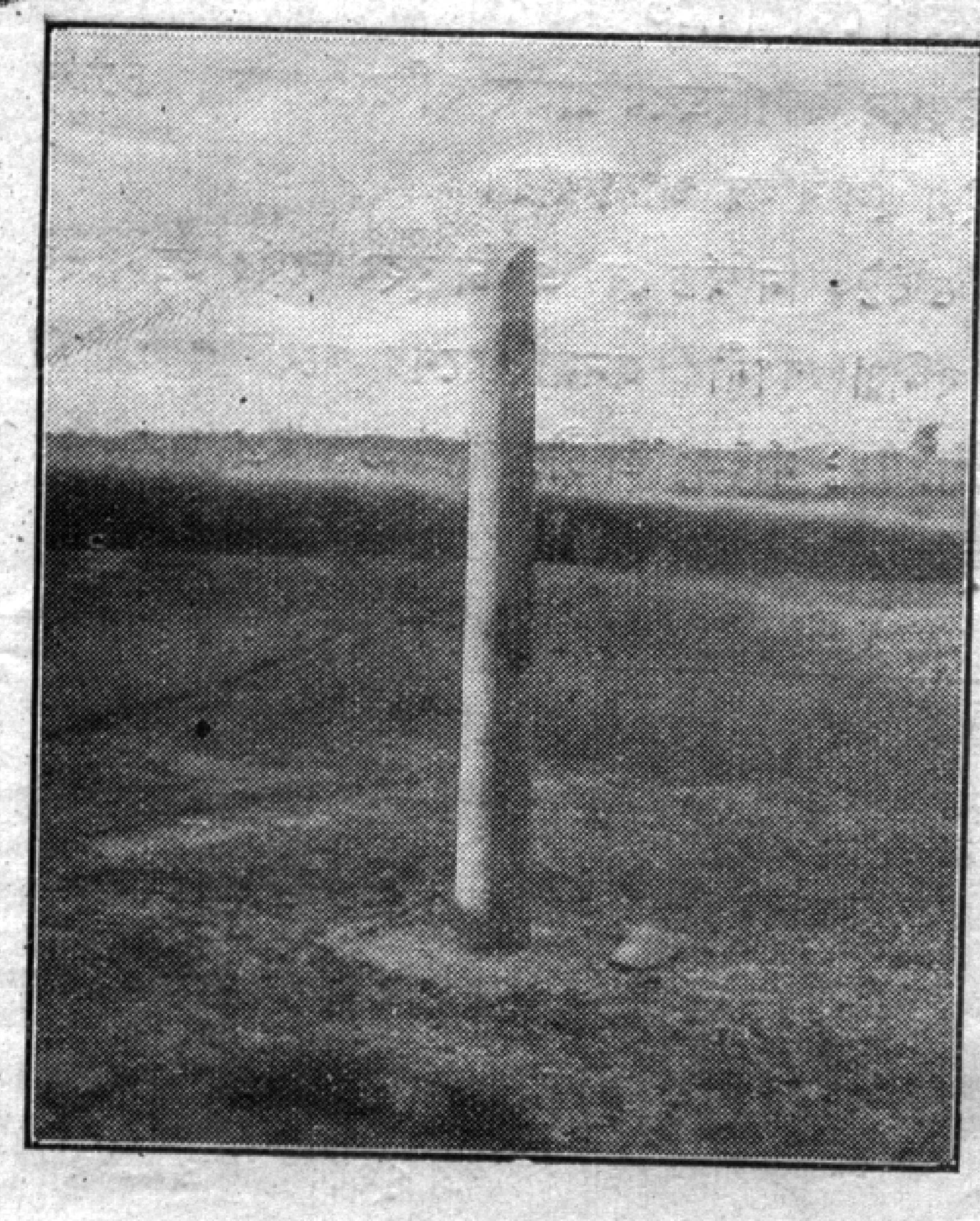
এই প্রবন্ধ লিখিত কৌশাম্বী ব্যতিরেকে আরও কয়েকটী কৌশাম্বী নগরের উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মগধের অন্তর্গত শোন নদীর তীরবর্ত্তী কৌশাম্বী।



কোসম ইমামের ভগ্ন ইমামবাড়া।

এই নগরীর কথা রামায়ণে বালকাণ্ড তৃতীয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। সেই নগর আমাদের বর্ণনীয় কৌশাম্বী নহে; কারণ রামায়ণ অনুসারে ব্রহ্মানন্দন কুশপুত্র কুশাম্বই সেই কৌশাম্বীর প্রতিষ্ঠাতা।

কথা সরিৎ সাগরে এক কৌশাম্বীর নাম দেখা যায়।



কৌশাম্বীর দুর্গ মধ্যস্থ প্রস্তর স্তম্ভ।

"সা চ পুরী গৌড়দেশান্তর্গত বৎস ভূমিগতা।
অস্তি বৎস ভূমি ইতি খ্যাতো দেশ
ইত্যুপক্রমে;
কৌশাম্বী নাম তত্রাস্তি মধ্যভাগে মহাপুরী।"
কথা সরিৎসাগর।

এই কৌশাম্বীর বিষয় হিতোপদেশেও উল্লেখ আছে।

"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী"
হিতোপদেশ।

ভারতবর্ষের উত্তরে কৌশাম্বীনামক একটী নগর ছিল বলিয়া হেমচন্দ্রের অভিধানে উল্লেখ আছে।

"ভারতবর্ষস্যোত্তরে দেশ বিশেষঃ"
* * * কৌশাম্বী।"
হেমচন্দ্র।

মহাভারত যুগ—চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবার পরবর্ত্তী একাদশ পুরুষ কুশাম্ব এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় জনপদটী স্থাপন করেন। উক্ত জনপদ কৌশাম্বী নগরী বা কৌশাম্বী পুরী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি কৌশাম্বী মণ্ডলী নামে তৎকালে খ্যাত ছিল। এই অঞ্চলের অরণ্যেই পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।



দুটী গুহাযুক্ত পাভোস পর্ব্বতের এক অংশ।

আরায়েস্-ইমহফিল্ নামক যাবনিক গ্রন্থেও এই কথা উল্লেখ আছে বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গেজেটিয়ারে দেখা যায়।

বিষ্ণু-পুরাণে দেখা যায় যে, গঙ্গাতে হস্তিনাপুর ধ্বংস হইয়া গেলে অর্জ্জুনের পরবর্ত্তী অষ্টম পুরুষ চক্রের নেতৃত্বে পাণ্ডবের বংশধরেরা কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। চক্র হইতে দ্বাবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত তাহারা এইস্থানে একাদিক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চক্রের রাজত্বকালে এই প্রদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

ইদানীং যমুনার তীরে কোসমে মৃত্তিকা ও ইষ্টক নির্ম্মিত যে একটী বৃহৎ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। এই দুর্গের পরিধি প্রায় ৪½ মাইল, প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৩০।৩৫ ফিট হইবে এবং ৫৬২ একর ভূমি দুর্গের অন্তর্ভুক্ত।



মুসলমানদের দ্বারা মুখ নষ্ট করা বুদ্ধ মূর্ত্তিটী ও আর কয়েকখানি প্রস্তর মূর্ত্তি।

বৌদ্ধযুগ—ললিত বিস্তার গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেব যে দিবস ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিবসেই উদয়ন বৎসও জন্মগ্রহণ করেন, এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর বুদ্ধদেব কয়েক বৎসর কৌশাম্বীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৫ম খৃষ্ট শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (Fa Hian) ভারতবর্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া যে ভ্রমণ বৃত্তান্তটী লিখেন, তাহা হইতে জানা যায় যে গোচিরবন নামক এক পবিত্র বৃহৎ উদ্যান কৌশাম্বীতে ছিল, একদা বুদ্ধদেব তথায় বাস করিয়াছিলেন এবং তৎকালেও নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধশ্রমণেরা সেই স্থানে বাস করিত। উদ্যানটি সিংহল দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে গোশিখ নামে উল্লিখিত আছে।

৬৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের ভারতে রাজত্ব কালে চীন পরিব্রাজক হিউএন্ ত্ সেঙ্গ (Hiuen Tsang) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ আছে যে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই কৌশাম্বীর অধিপতি রাজা উদয়ন রক্তচন্দনকাষ্ঠের একটী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার প্রাসাদের মধ্যস্থলে প্রস্তরমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধ-মূর্ত্তি লইয়া রাজা উদয়ন ও উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোতের মধ্যে যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল হিউএন্ ত্ সেঙ্গএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তারও উল্লেখ আছে। সেই সময়ে কৌশাম্বীতে দশটী মাত্র জীর্ণ বৌদ্ধ বিহার এবং পঞ্চদশটী শ্রীসম্পন্ন হিন্দু মন্দির বিদ্যমান ছিল। আজ কৌশাম্বীর সেই সকল পূর্ব্বগৌরবের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কালের কুটিলচক্রে সমস্তই ধ্বংস হইয়াগিয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল হইতেই কৌশাম্বীর অবনতি আরম্ভ হয় বলিয়া জানা যায়। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি ঐ অঞ্চলের আর কোন পরিষ্কার ইতিহাস পাওয়া যায় না।



মুসলমানদের দ্বারা মস্‌জিদরূপে পরিণত কুসমইমামের একটী প্রাচীন হিন্দু গৃহ।

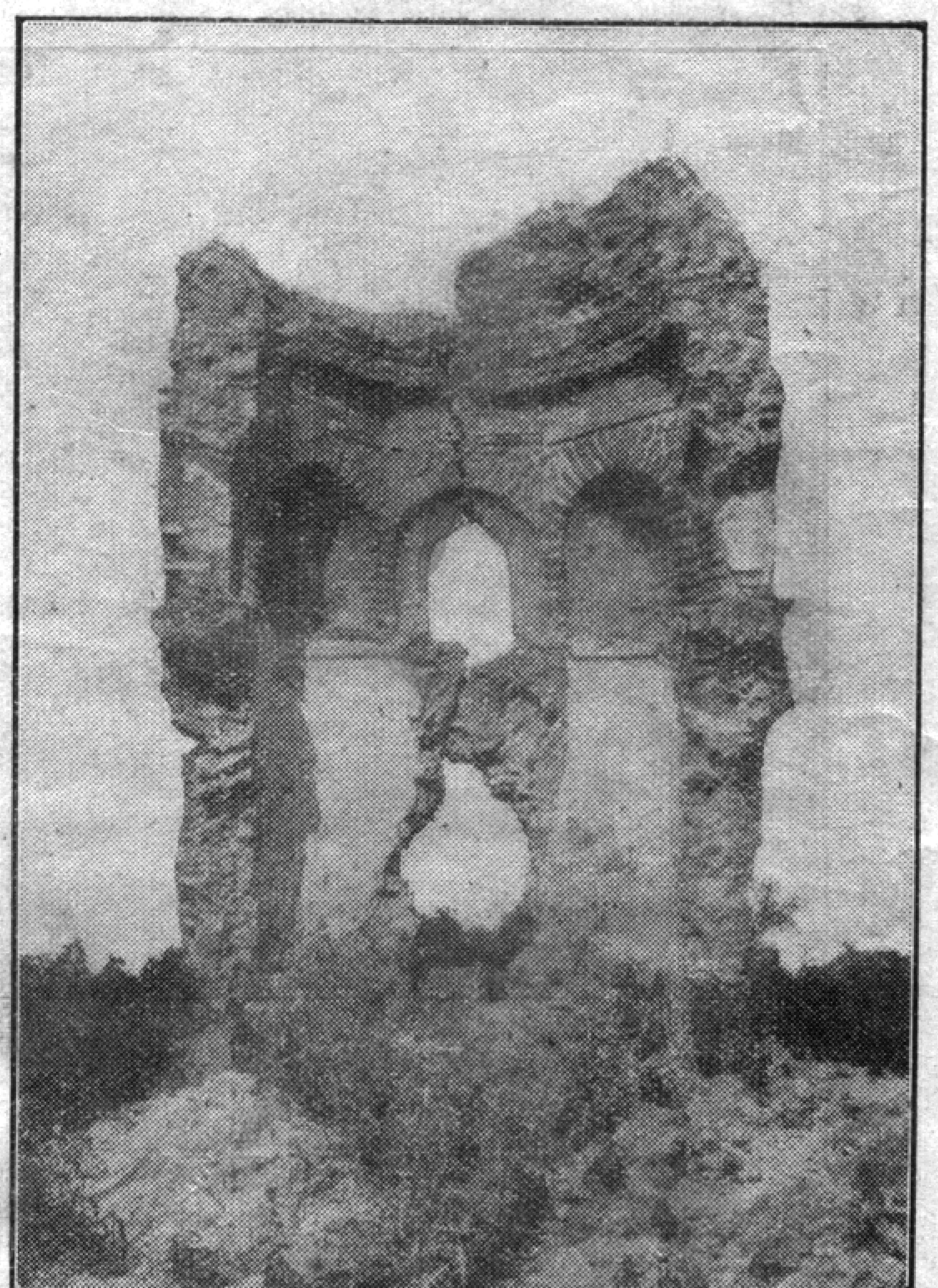
জেনারেল কনিংহেম এইস্থান হইতে অনেকগুলি বৌদ্ধযুগের প্রচলিত মুদ্রা, অলঙ্কার, তৈজসপত্র, প্রস্তরমূর্ত্তি ইত্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী ভগ্নমস্তক প্রস্তরস্তম্ভ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐ স্তম্ভটী এখনও কৌশাম্বী দুর্গ মধ্যে প্রোথিত আছে। ইহা এলাহাবাদ দুর্গে রক্ষিত প্রস্তরস্তম্ভের অনুরূপ। লোকে উহাকে অশোকনির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করে। গুপ্তবংশীয়দের রাজত্ব কাল অবধি যে সকল তীর্থ যাত্রী ও পরিব্রাজক এ স্থানে আসিয়াছেন তাঁহারা আপনাদের নাম ইহার গাত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ স্তম্ভে "কৌশাম্বী পুরী" এই কথাটা স্পষ্ট লিখিত থাকায় এই স্থানই যে সেই প্রাচীন কৌশাম্বী-পুরী ইহা বিশ্বাস করিতে আর কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না। এই স্তম্ভটীকে স্থানীয় রামের ছড়ী কহে।

এখনও কৌশাম্বীর সেই ভগ্ন দুর্গমধ্যে প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ, কতকগুলি

প্রস্তর মূর্ত্তি ও ইষ্টক স্তূপরাশি পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্নস্বরূপ বিকীর্ণ রহিয়াছে। প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী বুদ্ধমূর্ত্তির মুখ মুসলমানেরা নষ্ট করিয়াছে বলিয়া স্থানীয় পল্লীবাসীদের নিকট জানা গেল।

কোশমইনাম গ্রামস্থিত হিন্দু-সময়ের নির্ম্মিত দুটী প্রাচীন ইষ্টকগৃহের একটীকে মুসলমানেরা মস্‌জিদরূপে ও অপরটীকে ইমাম্‌বাড়ীরূপে পরিণত করিয়াছে। এই দুটী গৃহেরই বর্ত্তমান অবস্থা অতি জীর্ণ। ইমামবাড়াটীর ছাদ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ দুটী ব্যতীত এখানে অতিজীর্ণ প্রাচীন একটী কবর আছে।

কৌশাম্বীর দুর্গ হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে প্রস্তরময় একটা পর্ব্বত আছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউন্ ত্ সেঙ্গ বলেন যে এই পর্ব্বতের গুহায় প্রকাণ্ডকায় একটী নাগ বাস করিত। এই পর্ব্বতে দুটী গুহা আছে। দুটীই কৃত্রিম। একটী কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে; অপরটী মধ্য দেশে। এই মধ্যস্থ গুহার দুই পার্শ্বে দুটী প্রস্তরস্তম্ভ এবং ভিতরে কয়েকটী প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। উর্দ্ধের গুহাটীকেই স্থানীয় লোকে নাগ গুহা বলে। মহাসাংগিকবিনয়ে লেখা আছে যে নাগ গুহাটী স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু পর্ব্বতগায়ে গুপ্তবংশীয় রাজাদের সমসাময়িক অক্ষরে কতকগুলি ভাস্করের নাম খোদিত থাকায় উক্ত দুটী গুহা তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে খোদিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাও হইতে পারে যে উপরের গুহাটী বুদ্ধদেবের সময়ে এবং মধ্যেরটী গুপ্ত-রাজাদের সময়ে খোদিত হইয়াছিল।



কৌশাম্বী দুর্গমধ্যের একটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ।

হিউএন্ ত্ সেঙ্গএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আরও জানা যায় যে, পাভোসা পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে দেব কুণ্ড নামে যে সরোবর বিদ্যমান্ আছে, তাহার তীরে একটী উচ্চ স্তূপ ছিল। ইহার নিকট বুদ্ধদেব উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যানে মগ্ন হইতেন। এই স্তূপ মধ্যেই তাঁহারা

কেশ ও নখ উক্ত চীন পরিব্রাজকের সময় রক্ষিত ছিল। এখন আর ঐ স্তূপের কোন চিহ্ন নাই।

মুসলমানদের রাজত্বকালে করারীনিবাসী সৈয়দ হিসাম নামক জনৈক মুসলমান, সুলতান আলাউদ্দীনের আদেশে কৌশাম্বী অধিকার করে। অদ্যাবধি ইহা সৈয়দ বংশীয়দের অধিকারেই আছে।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

সত্যাগ্রহ-সেনাপত্য

মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ তিতিক্ষা। পূর্ব্বাচার্য্যগণের শেষ আদেশ ইহাই—"তিতিক্ষস্ব," অথবা "Resist not evil!" পাপ ও পুণ্য, ভাল ও মন্দ দুইই সমানভাবে সহন করিবে, কারো সহিত দ্রোহ করিবে না। পুণ্যবান্ ও পুণ্যের প্রতি এবং ন্যায়বান্ ও ন্যায়ের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ ত করিবেই না, পাপী বা তৎকৃত পাপের বিরুদ্ধে, অন্যায়কারী বা তদাচরিত অন্যায়ের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইবে না। যেমন শীতাতপ, সুখ দুঃখ, তেমনি পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ সব সহনশীল হইবে। ইহাই পরম সহিষ্ণুতার লক্ষণ ও সাধুতার চরম লক্ষ্য। ইহাই তিতিক্ষা, বা সাত্ত্বিকতা-সিঁড়ির শেষ ধাপ।

কিন্তু সে শেষ ধাপে চড়িবার অধিকারী সকলে নহ। কেন? আমাদের প্রকৃতি এখনও অত উচ্চে আমাদের চড়িতে দেয় না। মনে কর তোমার বুদ্ধি এ জিনিষটা অনুমোদন করিল, করিয়া ভাবিল—"বেশ ত আমি তিতিক্ষাশীল হব, মন্দেরও বিরুদ্ধাচারী হব না"—এই বলিয়া একটি গাছতলায় বসিয়া রহিলে। সেই সময় দেখিতে পাইলে একজন ইংরেজ গোরা একটি সুন্দরী গ্রাম্যবধূকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তার স্বামী রহিমুল্লা চাষা তাকে রক্ষা করিবার জন্য পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতে গোরা বন্দুক তুলিয়া গুলির ঘায়ে তাকে ধরাশায়ী করিল, এবং আবার বধুটিকে টানিয়া অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিল। তখন তোমার প্রকৃতি তোমাকে তিতিক্ষাশীল হইতে দিবে কি? কার্য্যে ও বাক্যে যদি বা সহিষ্ণু থাক মনে মনে থাকিবে কি? না সেই গোরাটার পাশবিকতায় তোমার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিবে? এবং শুধু মেয়েটিকে উদ্ধার করা নয়, তার প্রতি অত্যাচারইচ্ছুককে শিক্ষা দেওয়ার তীব্র প্রেরণাও ভিতর হইতে অনুভব করিবে? এই যে অনুভবের তাড়না ইহাই স্বভাব, ইহাই প্রকৃতি। এই অনুভবকে রোধ করিব, তিতিক্ষাশীল হইব বলিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলে, ধীরে ধীরে মনোসাগরে উত্থিত তরঙ্গগুলিকে শান্ত করিতে পারিলে কালে তোমার অধিকারিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু দেখিবে প্রথমতঃ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা—যদি না গোরাভীতিতে আক্রান্ত হও—তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে, এবং তাতেও যদি বা সক্ষম হও তবে মনের ক্ষুব্ধ উর্ম্মিগুলিকে বশে আনা তোমার সাধ্যাতীত হইবে, তুমি

তাদের দাবাইতে পারিবে না, বরং উল্টাই কিছু করিয়া বসিবে। এই অবস্থাকে কল্পনায় রাখিয়াই গীতাতে বলা হইয়াছে...

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিং করিষ্যতি ॥"

স্বভাব যাহার যাহা তাহারি মতন
জ্ঞানবান হইলেও হয় আচরণ।

তাই যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সর্ব্বোত্তম জ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাঁর মনে জ্ঞানের বীজ উপ্ত করিলেন, কিন্তু তার ফল ফলিতে বিলম্ব হইবে, তাহা কালে পরিণতি লাভ করিবে ইহা জানিয়া তাঁর তৎকালীন প্রকৃতি-অনুযায়ী কর্ম্ম তাঁকে নিষ্কামভাবে করিতে প্ররোচনা দিলেন। রাজসিকতাকে তামসিকতার আলিঙ্গন হইতে ছাড়াইয়া তাকে সাত্ত্বিকতার সহিত মিলনের প্রথম ধাপে চড়াইলেন।

আমরা শিবগীতায় রামচন্দ্র সম্বন্ধেও তাঁহার গুরু অগস্ত্যের এইরূপই আচরণ দেখিতে পাই। দশানন সীতাকে হরণ করিলে দাশরথী দয়িতাবিরহে ব্যাকুল হইয়া যখন আহার নিদ্রা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অহর্নিশ অনুজ লক্ষণের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন মহর্ষি অগস্ত্য সম্বাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক সংসারের অসারতা বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। অগস্ত্য কহিলেন "হে রাজেন্দ্র! এইরূপ বিষণ্ণভাবে অবস্থিতি করিতেছ কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, কে কাহার কান্তা? এই দেহ পঞ্চভূতময়, ইহা কোন্ মূঢ়মতি অবগত না আছে?"

"যিনি নির্লেপ, সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি সেই আত্মার জন্ম বা বিনাশ কিছুই নাই এবং তিনি কিছুতেই দুঃখভোগী হয়েন না এই সূর্য্যদেব সকলের চক্ষুরূপে অবস্থিতি করিয়াও যেরূপ চাক্ষুষ দোষের দ্বারা বিলিপ্ত হয়েন না, জীবন বিনষ্ট হইলে এই মলপিণ্ডময় জড়াত্মক দেহ কাষ্ঠাদি সংযোগে দগ্ধীভূত অথবা শৃগালাদি জীবকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াও সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না, অতএব তাদৃশ জড়দেহবিরহে ব্যথা কি?"

রামচন্দ্র বলিলেন—"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি যে ব্যথা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি তাহা নাই, তাই আপনি বলিলেন, অতএব আপনার বাক্যে কেমন করিয়া বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে?"

অগস্ত্য অনেক উপদেশ দিয়া অবশেষে কহিলেন—"শাম্ভবী মায়া অতীব দুর্জ্জেয়, সেই মায়াদ্বারা এই জগৎ সম্মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ রুচিকর হয় না, সেইরূপ গুরুর বাক্য পরিণামে অমৃতস্বরূপ হইলেও কামক্রোধাদি পীড়িত মানব উহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না।"

শ্রীরাম বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়, আমার ভার্য্যা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন, এখন যদি তাহাকে বিনষ্ট করিতে না পারি তবে এই জীবনে ফল কি? অতএব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা

আমার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ কাম-ক্রোধাদি সকলেই আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে এবং অহঙ্কার আমার জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজ কান্তা অপহরণদ্বারা অবমানিত হইয়াও তত্ত্ববোধে ইচ্ছুক হয় সে লোকমধ্যে পুরুষাধম বলিয়া পরিগণিত। অতএব সমুদ্র-বন্ধন করিয়া রাবণের বধবিষয়ে যে উপায় আছে তাহা আপনি বলুন। হে মুনিপুঙ্গব আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য গুরু নাই।"

গুরু দুঃখমুগ্ধ নিস্তেজ মরণাভিলাষী ক্ষত্রিয়ের পৌরুষ জাগ্রত করাইয়া কহিলেন—"যদি এই তোমার দৃঢ়নিশ্চয় হয়, উঠ, দীক্ষা গ্রহণ কর; এই দীক্ষাপ্রভাবে তুমি বিশুদ্ধ দেহবান্ হইয়া যুদ্ধে শত্রুজয়ী হইবে এবং পৃথিবীমণ্ডল ভোগ করতঃ জ্ঞানবিকাশের সহিত শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে।"

আবার স্তরে স্তরে, তামসিকতা হইতে রাজসিকতা, এবং রাজসিকতা হইতে সাত্ত্বিকতায় উঠাইবার প্রচেষ্টা দেখিলাম। তোমার আমার পক্ষেও ইহাই বিধেয়। তুমি আমি আপাততঃ যে ধাপের লোক সেই ধাপের উপযুক্ত কাজই আমাদের করিতে হইবে। সাত্ত্বিকতার কল্পনালোক ছাড়িয়া রাজসিকতার বাস্তব ধামে নামিতে হইবে, শুধু সাবধান থাকিতে হইবে যেন তামসিকতার রসাতলে না তলাইয়া যাই।

রাজসিক প্রকৃতির লোক নিজেকে তমোগুণ হইতে বাঁচাইয়া সত্ত্বমুখী হইয়া কাজ করিবেন। দেহধারী কেহ পূর্ণ সাত্ত্বিক হইতে পারেন না, তবে যাঁহার রাজসিকতা যত সাত্ত্বিকতা-মাখান তিনি তত সাত্ত্বিকপদবাচ্য। বুদ্ধ ও ক্রাইষ্ট এই চরম শ্রেণীর সাত্ত্বিক। তবে উহাঁদের মধ্যেও তারতম্য আছে। বুদ্ধ শুধু পুণ্যকে রূপদান করিয়া পুণ্যের পদ্ধতি বাঁধিয়া দিয়া পাপকে লজ্জিত করিয়াছিলেন, পাপের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্যতায়ুধ হন নাই। কিন্তু ক্রাইষ্ট পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যদিও পাপীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। সত্যাগ্রহীর আদর্শে পাইতেছি তাণ্ডব শিবস্বরূপ ক্রাইষ্ট, শান্ত শিবরূপী বুদ্ধ নয়। ক্রাইষ্ট হইতে টলষ্টয়, টলষ্টয় হইতে মহাত্মা গান্ধিতে এই পাপের প্রতি দ্রোহ কিন্তু পাপীর প্রতি প্রেমের যুগলধারা নামিয়া আসিয়াছে। যেখানে কর্ম্মস্পৃহা আছে, সংস্কারস্পৃহা জাগিতেছে সেইখানে রজোগুণের প্রেরণা পুরাদমে কাজ করিতেছে অনুমান করিতে হইবে। সেই রজোগুণকে সংযমের দ্বারা শুদ্ধ রাখা, রাজসিকতাকে সাত্ত্বিকতায় উন্নীত করা সত্যাগ্রহের সাধনা।

বাইবলে মুসার অনুশাসনে বা যীশুর উপদেশে যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে সে সকলের সার হিন্দুশাস্ত্রের পঞ্চ যমের মধ্যে নিহিত আছে। যীশু বলিয়াছিলেন—"Do not kill do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud." আমাদের শাস্ত্রকারেরা ও সাধু সন্তেরাও সাধনের উপদেশ দিতেছেন পাঁচটি বিষয়ে

"সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ।" এগুলি সব রাজযোগের উপকরণ,

পারমার্থিক পাথেয়, ঈশ্বরের সহিত মিলনের সেতু, তা বলিয়া দৈনন্দিন জীবনে পরিত্যাজ্য নহে। এগুলি সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকের পক্ষে আচরণীয় ও পরমধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। হিন্দু জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সমস্ত জীবনটাই মনুষ্যত্বের সাধনা-ক্ষেত্র। মানুষ হইতে হইলে পঠদ্দশাতেই ব্রহ্মচর্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আর চারটি সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াও নানা নিয়মের নিগড়ে নিজেকে বাঁধিয়া পাঁচটি সংযম পালন করিতে করিতে চলিতে হইবে। আর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের ত কথাই নাই, তা সংযমই সংযম। সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থ পরস্পরের আঘাত হইতে নিরুপদ্রব রাখার জন্যও এই পাঁচটি সংযম ফলদায়ী। সকলেই যদি সত্য বলে ও সত্য আচরণ করে, কেহ কাহাকে প্রতারিত না করে, তবে সকলেরই অনেক বালাই কাটে। যদি সবাই সবারের প্রতি কায়মনোবাক্যে অহিংস হয়, বাঁচা যায়। পরস্পরের সম্পত্তি চুরি না করিলে হাঙ্গাম মিটে। ব্রহ্মচর্য্য মানিয়া চলিতে পারিলে অনেক আপদ চুকে, এবং নিজের আবশ্যকের অতিরিক্ত ভোগের জন্য পরিগ্রহ না করিতে ধৃতব্রত হইলে লোভ পালাইবার পথ পায় না। সকলেই করুক আর না করুক, আমি যেটা ভাল বুঝিয়াছি আমি অন্ততঃ সেইটা করিব এই ভাবে দুচার দশজন করিলেও মঙ্গল। সকলেই সম্পূর্ণভাবে করুক আর নাই করুক, সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে এই সংযম কয়টা দৈনন্দিন জীবনে চর্চ্চা করিতেছি বলিয়াই সমাজ ও সংসার টিঁকিয়া আছে, নতুবা, উচ্ছন্ন যাইত, পরস্পরের পাশবিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হইত।

কিন্তু একটা ধারণা আমাদের ভিতরে ভিতরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে ব্যক্তিগত জীবনে যা উপাদেয়, সমাজজীবনে যা মঙ্গলজনক,—পলিটিক্সের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ একদল মানুষের সহিত আর একদলের যোগাযোগে বোঝাপড়ায় তা অকেজো। টলষ্টয়ের শিষ্য মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে প্রথমে ইহার বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিলেন। মহামতি তিলকের সহিত মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক অনুভূতিতে এইখানে একটা স্পষ্ট পার্থক্য পাওয়া গেল। এ বিষয়ে তিলক মহারাজের জীবিতকালে উভয়ের মধ্যে কলম চালাচালিও হইয়াছিল পুরাণ ইয়ং ইণ্ডিয়ার পৃষ্ঠায় তাহা লিপিবদ্ধ। মহাত্মা এ যুগের ধর্ম্মসংস্কারক নহেন, সমাজসংস্কারক নহেন, রাজনীতিসংস্কারক অর্থাৎ দলবদ্ধ জীবনের সংস্কারক। তাঁর নিজের আশ্রমের বাহিরে তাঁর স্পষ্টতঃ লক্ষ্য রাজনৈতিক শুদ্ধি, উপলক্ষ্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক শুদ্ধি।

প্রিয়বস্তু প্রাপ্তির জন্য অপ্রিয় বস্তু যদি সাধকরূপে প্রতীয়মান হয় তবে তাহাও প্রিয় হইয়া উঠে। তিলকের দল প্রথম সমাজসংস্কারের বিরোধী গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু অনেকাংশে গোঁড়ামি না ছাড়িলে ও সমাজকে সংস্কৃত না করিলে রাজনৈতিক অধিকারপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিবে ইহা উপলব্ধি করিয়া শেষাশেষি বিশেষতঃ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিলক আর সমাজসংস্কারের বিরুদ্ধ রহিলেন না। তেমনি অধিকাংশ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কর্ম্মী সশস্ত্র গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষীণবল প্রয়োগের দ্বারা কোন ফললাভ হইবে না, তদপেক্ষা অহিংস আন্দোলন বেশী ফলদায়ী হইতে পারে ইহা অনুভব করিয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অহিংসাকে অস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছেন—সাধুতার লোভে নয়।

যদি করিলেনই তবে সে অস্ত্রের প্রয়োগবিধিটিও ভাল করিয়া আয়ত্ত করা চাই। সুতরাং এ বিষয়ে অস্ত্রাচার্য্যের নিকট রীতিমত তালিম গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। তলোয়ার খানা বা লাঠিসড়কি গৎকাটা হাতে লইয়া যেমন তেমন করিয়া ঘুরাইলেত চলিবে না, কতকগুলা এলোপাতারি মারের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। গুরুর পায়ে পাগড়ি রাখিয়া, সেলামী দিয়া রীতিমত শিক্ষানবীশী করিতে হইবে। মিজ্রাপটা আঙ্গুলে পরিলেই সেতারের গৎখানা ছর্‌ছর্‌ করিয়া হাত দিয়া বাহির হয় না, বেয়ালার ছড়িখানা তাঁতে ঘষিলেই সুর নাচিয়া কাঁদিয়া উঠে না, রীতিমত শিক্ষা চাই, অভ্যাস চাই, অনুশীলন চাই।

সত্যাগ্রহের সেনাপত্য অতি কঠিন জিনিষ। সে বিষয়ে আচার্য্য কি বলিতেছেন তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিয়া, নোট করিয়া, আত্মস্থ করা চাই, আচরণে পরিণত করা চাই। অহিংস-অস্ত্রাচার্য্য গান্ধি বলেন ধর্ণার সঙ্গে সত্যাগ্রহের অনেক গরমিল। সত্যাগ্রহ ধর্ণা নয়, কেননা ধর্ণার মধ্যে একটা জোর জুলুমের ভাব আছে, সত্যাগ্রহে তা নাই। সত্যাগ্রহ ধর্ণার মত অন্যের উপর চাপ দিয়া কাজ আদায়ের ফন্দি নয়, নিজেকে কষ্ট দিয়া অপরাধীর মন-গলানরদ্বারা ইষ্টলাভের চেষ্টা সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহে পরার্থের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করিতে হয়। অন্যের মনের কলুষ তিরস্করণের দ্বারা আমার প্রাপ্য সুলভ করিতে হয়, উহা তিরস্কৃত হউক আর না হউক আমার লক্ষ্য অন্ততঃ তাহাই থাকিবে। সত্যাগ্রহরূপ মুদ্রার এক পিঠ সত্য, এক পিঠ অহিংসা। যে বিষয়ে সত্যাগ্রহ করা যাইবে সে বিষয়টি সত্য অর্থাৎ ন্যায়সম্মত হওয়া চাই এবং তাহা প্রাপ্তির পদ্ধতিটি অহিংস হওয়া চাই। অহিংসার মধ্যে শিষ্টাচার আছে। সত্যাগ্রহী আইন ভঙ্গ করিতে পারেন, এমন কি Civil Disobedience তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র, কিন্তু তাহা Civil হওয়া চাই, শিষ্ট হওয়া চাই। যেমন অন্যায় আদেশস্থলে আমি পিতারও অবাধ্য হইতে পারি, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁর প্রতি অশিষ্ট হইতে পারি না।

মহাভারতে শিষ্টাচারের বর্ণনায় আমরা পাই—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম, তাহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং সত্যের উপর নির্ভর করিয়াই শিষ্টদিগের সমুদায় প্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শিষ্টাচারের অনুষ্ঠানে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।"

"গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারিটী বিষয় শিষ্টাচারে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।"

"শিষ্টদিগের অনুশাসন এই যে, যে কর্ম্ম ন্যায়যুক্ত তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা অন্যায় তাহাই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা অক্রোধী, অসূয়াশূন্য, নিরহঙ্কারী, মাৎসর্য্যবিহীন, সরল ও শমগুণসম্পন্ন, তাঁহারাই শিষ্টাচারী হন। যাঁহারা বেদত্রয়বিহিত, শুচিশীলসম্পন্ন, মনস্বী, গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ও দান্ত তাঁহারাই শিষ্টাচারী হন।"

যাঁহারা ন্যায়পরায়ণ, সদ্‌গুণযুক্ত, সর্ব্বলোকহিতৈষী, সাধুস্বভাব, স্বর্গজয়কারী, সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, সৎপথে সন্নিবিষ্ট, দাতা, আত্মম্ভরিতাশূন্য, দীনগণের প্রতি অনুগ্রহকারী, সকলের পূজ্য, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াশালী তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট পুরুষ।”

সুতরাং সত্যাগ্রহের মধ্যে এতগুলি গুণ অন্তর্নিহিত আছে,—সত্য, অহিংসা, অক্রোধ অনসূয়া, নিরহঙ্কার, শম, দম, শীলতা ও সারল্য। অন্ততঃ যতক্ষণ কোন বিষয়ে সত্যাগ্রহ আচরণ করিবে ততক্ষণ সাঙ্গোপাঙ্গ এই সমস্ত গুণগুলিকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজের রক্ষাকবচ স্বরূপ রাখিতে হইবে, নতুবা সত্যাগ্রহে ত্রুটি হইবে। যিনি এতটা পারিবেন তাঁরই সত্যাগ্রহের সেনাপত্য যথাযথ হইবে। আর মহাভারতের ভাষায়—“সেই বিপুল সত্ত্বসম্পন্ন মানবগণের অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমস্তই তাঁহাদিগের সমুচিত সৎকার বিধান করিবে। সুতরাং তাঁহাদের হিংসাদি দোষ সমুদায় সত্বরই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।”

দেখা গেল, পলিটিক্সের প্রেমে মাতিয়া সত্যাগ্রহ-অস্ত্রধারী হইলে ইহার ফলে হইবে ভিতরকার মানুষখানার আমূল পরিবর্ত্তন। যে কোন বিধি বা প্যাথিই হউক না, অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি বা হাইড্রোপ্যাথি বা বৈদ্যপ্যাথি তাহার যথাযথ ফল পাইতে হইলে তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে হইলে চাই তাকে অবাধ গতি দেওয়া, তার ব্যবস্থা গুলির সম্যক্‌ ও সম্পূর্ণ অনুসরণ করা। সত্যাগ্রহের দ্বারা পোলিটিক্যাল ফললাভের পরীক্ষাও তখনই সম্পূর্ণ হইবে যখন ইহার সমস্ত বিধানগুলি ঠিক ঠিক মানিয়া চলা যাইবে। ইহা একটি মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানময় অস্ত্র। ইহার উপকরণ গুলির শুদ্ধতার বা মাত্রার চুলচেরা তফাতে ইতর বিশেষ ঘটিয়া যায়। ইহার ওজন দাঁড়ি পাল্লায় নয়; নিক্তিতে। ইহার সূক্ষ্ম পথগুলির অনুসরণ না করিয়া যদি কেহ বলিয়া বসেন—দলবদ্ধ সাধুতার দ্বারা দলবদ্ধ অসাধুতাকে জয় করা যায় না, এ বৃথা কল্পনা, বৃথা চেষ্টা,—তবে সুবিচার হইবে না। আর যদি কেহ সতর্কভাবে ইহার সূক্ষ্ম বিধিগুলি মানিয়া চলেন তবে দেখিবেন তাঁর রাজসিকতা ধীরে ধীরে সাত্ত্বিকতায় মিলাইয়া আসিতেছে। যে অল্প স্বল্প পরীক্ষা করিয়া দেখিবে তারও লোকসান নাই, কারণ

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

আরম্ভ বিফল নয়, নাহি ইথে বিঘ্ন প্রত্যবায়
এ ধর্ম্মের স্বল্পেতেও মহাভয় হতে ত্রাণ পায় ॥

এ রসায়ণ যতটুকু গায়ে লাগিবে মাটির মানুষকে ততটুকু সোনা করিয়া দিবে। দূরদৃষ্টি সত্যাগ্রহী শস্ত্র-আচার্য্যের অভিপ্রায়ও বুঝি তাহাই।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

ভাষা শিখিবার সহজ উপায়

৪

এমন লোক প্রায় দেখা যায় না, যাহার কলা-বোধ একেবারেই নাই।

Dordogneর গুহাগহ্বরের ভিতর আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হই; নরাকৃতি বড় বড় বানরের কাছাকাছি বুনো লোকেরাও হার তৈয়ারী করে, ফুল তৈয়ারী করে, অস্ত্রাদি অলঙ্কারে বিভূষিত করে, স্থূল-ধরণের তালের ছন্দে নৃত্য করে। আমাদের সভ্যতার দেশে,—আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত কম সভ্য—একেবারে বিকলেন্দ্রিয় না হইলে—যে সব শিল্পকলা তাহাদিগকে ঘিরিয়া আছে, সেই সব শিল্পকলার একটা ছাপ তাহাদের মনের উপর পড়ে।

একটা বড় ইমারৎ দেখিয়া একজন চাষার, যাদুঘরে গিয়া একজন সৈনিকের, রঙ্গালয়ে গিয়া একজন মুটেমজুরের মুখ হইতে যে সব কথা বাহির হয়, তাহা শুনিয়া কোন মার্জ্জিত রুচির লোক একটু হাসিতে পারেন। কিন্তু ঐ চাষা, ঐ সৈনিক, ঐ মুটেমজুর তাহাদের সাধ্যমত কলাবিদ্যার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকে। বুদ্ধির দ্বারা যে কলা শেখা যায়, কলার সভায় সেই কলার অগ্র-আসন। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-চেতনা (Sensibilities) ঐ কলার খোঁজ না করিলেও, ঐ ইন্দ্রিয়-চেতনার উপর বুদ্ধি স্বকীয় প্রভাব প্রকটিত করে।

ঠিক্ এই সার্ব্বজনীন প্রভাবের দরুণই,—আমার চারিদিকে, মাঝারি ধরণের রস-বোধ শক্তির উপর কলাবিদ্যা কিরূপ ক্রিয়া প্রকটিত করে, তাহা সহজেই পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। এই কথা বলিতে পারা যায় যে কোন ব্যক্তি—বিকলেন্দ্রিয় ছাড়া—যে কলা সম্বন্ধে শিক্ষা পায় নাই সে একেবারে রসবোধহীন না হইলেও, তাহার রসবোধ খুবই কম কিংবা তাহার চিত্ত উল্টাভাবে রসমুগ্ধ হয়। কখন কখন, বিশেষত সঙ্গীত ক্ষেত্রে, রেখাঙ্কন ক্ষেত্রে, মূর্ত্তিগঠন-ক্ষেত্রে, একটা রসবোধ জাগিয়া ওঠে, তাহার পর আপনা-আপনি পরিণতি লাভ করে; এটা ব্যতিক্রম স্থল, প্রতিভাতেই এইরূপ দেখা যায়। শিশুর মধ্যেও এই কলা-রুচি কখন কখন দেখা যায়। এবং কাহারও সাহায্য না পাইয়াও, বিনা-চেষ্টায় বালক ও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই প্রকার নিশ্চেষ্ট (Passive) শিক্ষা অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা আধুনিক নগরেই সম্ভব।

সাধারণ নিয়মটা এই—মাঝারি ধরণের যে রসবোধশক্তি, সেই রসবোধশক্তিকে তাহার নিজের হাতে ছাড়িয়া দিলে, সে তেমন উন্নতিলাভ করিবে না। বরং কঠোর জীবন-ধারার অবসাদজনক দেহক্ষয়কারী ক্রিয়ার প্রভাবে এই রসবোধশক্তি কমিয়া যাইবারই কথা। আমি অন্য এক স্থানে বলিয়াছি, যে শিশুমাত্রই আর্টিষ্ট।

এই কলারসবোধশক্তি, যাহা প্রকৃতি সকলের অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—প্রথমে উহার পুষ্টিসাধন করা আবশ্যক, তাহার পর উহাকে অভ্যাসের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক।

কলা-ঘটিত শিক্ষার ইহাই উদ্দেশ্য। শিক্ষার দ্বারা রসগ্রাহী হইতে পারা যায়। ঠিক্‌মতো রসগ্রাহী হইতে পারা যায়।

*

* *

কলার শিক্ষানবীশি, জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষানবীশির মতোই ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার—শৃঙ্খলার ব্যাপার, সময়ের ব্যাপার হইলেও উহা একটা ভিন্ন অধিকারের জিনিস। শিক্ষায় একান্ত প্রয়োজনীয় এই সকল নিয়মের অভাব আর একটা জিনিসে পূরণ হইয়া থাকে—সেটা হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক শক্তি। মানুষে মানুষে বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রভেদ, তাহা অপেক্ষা কলা-বোধশক্তির তারতম্য ঢের বেশী। কলাবিদ্যায় অমুক শিক্ষানবীশ, এক এক সময় দেখা যায়, কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া হঠাৎ তাহার শিক্ষককে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। চিত্র কর্ম্মশালায় গিয়া দেখিতে পাইবে ছোট ছোট ছেলেরা ছবি আঁকিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রীড়াচ্ছলে অতি সহজে তাহার আদর্শ চিত্র ঠিক্‌মতো আঁকিয়াছে—উহার একটা প্রীতিজনক রূপ দিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কেহ-কেহ, চোখকে খুব খাটাইয়া, জিহ্বা বাহির করিয়াও—পেনসিল ক্রমাগত কাটিয়াও একটা বেঢপ আকারের ধ্যাবড়া রকমের ছবি আঁকিয়াছে দেখা যায়। অমুক ব্যক্তির স্মৃতি-পটে, একটা কোন সুর শুনিলেই, চিরকালের মতো মুদ্রিত হইয়া যায়। আবার অন্য এক ব্যক্তি, শতবার শুনিলেও কোন একটা গানের টুক্‌রা মনে রাখিতে পারে না। এস্থলে ঈশ্বরদত্ত শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে ; মনে করিও না, ছাত্রের কোন প্রকার প্রয়াস প্রযত্ন, শিক্ষকের কোনো প্রতিভা উহার সমতুল্য কিছু সংসাধন করিতে পারে।

পক্ষান্তরে যে ছাত্রের বাস্তবিকই একটা ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে, তাহার পক্ষে প্রয়াস-প্রযত্ন একটা সুখের জিনিস। বালক-রেখাচিত্রকর বালক-সঙ্গীত-গুণী,—তাহাদের সাধের কলার উৎকর্ষসাধনে আমোদ পায়।

এইরূপে, এই সকল উচ্চাধিকারীদিগের যে একটু প্রয়াস প্রযত্ন করিতে হয়,—তাহাদের এই প্রয়াস প্রযত্নই একটা আনন্দ ; উহারা যে নিয়মগুলা আধা-আধি রকমে বুঝিয়াছে, সেই নিয়মগুলা আপনা হইতেই তাহাদের রসবোধের সহিত খাপ খাইয়া যায় ; ইহাতে সময় গণনার মধ্যেই আসে না। উহারা যেরূপ দ্রুতভাবে অগ্রসর হয় তাহা অতীব বিস্ময়কর ; তা ছাড়া উহারা সময়ের ভার আদৌ অনুভব করে না···অনুচ্চাধিকারীদের সহিত ইহাদের প্রতিযোগিতা অসমান। কলা জিনিষটা ন্যায়ের অধিকারভুক্ত নহে—পরন্তু উহা ভগবৎ প্রসাদের অধিকার ভুক্ত ;—ঈশ্বরেচ্ছার অধিকার ভুক্ত।

অতএব উচ্চাধিকারীদিগকে, কলা কিরূপে শিখিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিবার

কোন আবশ্যকতা নাই। আমাদের সমাজ যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ তাহাতে আমি বড়-একটা বিশ্বাস করিনা যে, বড় বড় ব্যবসায় গুলায় স্থান একেবারে কনায়-কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। যাহা অপরিজ্ঞাত এরূপ কোন ওস্তাদ-হাতের কাজ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না… Mozort, Burns, Correge একাকীই আপন-আপন রাস্তা দেখিয়া লইয়াছে! কলাবিদ্যা শিখিবার কোন শিক্ষা-গ্রন্থ তাহাদের জন্য লিখিত হয় নাই।"

কিন্তু Mozort না হইয়াও Burns কিংবা Correge না হইয়াও, কলাবিদ্যার রসাস্বাদন করা যাইতে পারে। একটা খুব ছোটখাটো কবিতা কিংবা খুব ছোটখাটো একটা গান রচনার অভিমান না রাখিলেও, নিজের নাম স্বাক্ষরিত কোনও ছবি দেওয়ালে টাঙ্গাইব না বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইলেও, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ও কবিতার অনুরাগী হওয়া যাইতে পারে। শিক্ষানবিশ! তোমার মনোগত অভিপ্রায়টা কি? তুমি একজন সাধারণ ভক্তের ভাবে না, একজন উচ্চপদস্থ পুরোহিতের ভাবে কলা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহ?…

বেশীর ভাগ লোক সরল হৃদয় হইলে এইরূপভাবে উত্তর দিবে :—

—"আমি এখনি প্রধান-পুরোহিত হইতে ইচ্ছা করি।"

এইসব লোককে দীক্ষা-মন্ত্র শিখাইবার চেষ্টা করিব না।

উহারা একাকীই মন্দিরে প্রবেশ করুক, এবং যদি পারে, উহাদের ঈপ্সিত ঐ উচ্চপদ লাভ করুক………যাহারা উহাদের অপেক্ষা কম উচ্চাভিলাষী, তাহাদিগকেই নিয়মশাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিব। তাহারা বলে :—

—"আমরা বেশী কিছু চাহি না, আমরা শুধু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজায় যোগ দিব……"

এইরূপ যদি হয়—দেখা যাইবে, এই বিনীত ভক্তদলের মধ্যে পৌরহিত্যের বাসনা একদিন জাগিয়া উঠে কি না!

যাহার মাঝামাঝি রকমের ভাবগ্রাহিতা-শক্তি আছে, তাহার সেই ভাবগ্রাহিতা-শক্তিকে পুষ্ট করিয়া তোলা, নানা প্রকার আর্টিষ্টিক আমোদ-প্রমোদে, আনন্দে, আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাহাকে দীক্ষিত করা—ভগবৎ প্রসাদের অধিকারভুক্ত এই কলা বিভাগে, ইহা ছাড়া আর কিছুই শিক্ষা দিবার নাই।

শিক্ষানবিশকে আমরা এই কথা বলিব :—

"বাছা লোক" খুব কমই মেলে। "আমি একজন ওস্তাদ হইব, এই কথা ভাবিয়া যে ব্যক্তি কলা শিক্ষা আরম্ভ করে, তাহার জন্য নিষ্ঠুর নৈরাশ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। আবার যে ব্যক্তি মনে করে "আমি হয়ত ওস্তাদ হইতে পারিব না, কিন্তু আমি কতকগুলি আদর-যোগ্য রচনা করিতে পারিব"—পরে সেও হয়তো দেখিবে, সে ভুল বুঝিয়াছিল। সে যখন কোনো আদর-যোগ্য রচনা করিতে সমর্থ হইবে, তখন আবার তাহার মনে হইবে, লোকে তাহার রচনাকে খুব ওস্তাদি রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে না। প্রবীণ বিজ্ঞ লোক এইরূপ

ভাবিতে আদেশ করেন :—"নব-উৎপাদক আর্টিষ্টদিগের সহিত টক্কর দিতে আমি প্রতি-যোগিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহি না। আমি শুধু আর্ট জিনিসটা বুঝিবার জন্য, অন্যদের রচনা জ্ঞান-সহকারে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবার জন্যই আর্ট শিখিতেছি—আমি নিজে নূতন কিছু উৎপাদন করিব এবং আমার রচনার দ্বারা লোকদিগের নিকট হইতে বাহবা পাইব,—এ উদ্দেশ্যে আমি আর্ট শিখিতেছিনা।"

*

* *

এইরূপ বিজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখিলে, কলা-শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালীটা কি ?

শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে, কিংবা যাহার বোধশক্তি বা ভাব-গ্রাহিতাশক্তি পরিপুষ্ট হয় নাই এরূপ কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমে এই উদীয়মান অথবা আচ্ছন্ন বোধশক্তির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। যতই অশিক্ষিত হোক্ না কেন, মনুষ্যমাত্রই অমুক কিংবা অমুক কলার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ন্যূনাধিকভাবে বোধশীল এইরূপ মনে করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে :—একটা বিশেষ-বোধশক্তি প্রকটিত হইয়াছে দেখিতে পাইলে, প্রথমে তাহাকে পরিপুষ্ট কর : একজন গায়কের হস্তে জোর করিয়া তুলি দিও না। যে শিশু, আপনা হইতে মোমের মানুষ গড়িয়া খেলা করে, তাহাকে পিয়ানো অভ্যাস করাইতে যাইও না। সকল কলাবিদ্যাই পরস্পরের ভাই। যদি কম-জমকালো ও বেশী ঠিক্‌ঠাক্ কোনও কলার মূলসূত্র তোমার ভাল লাগে, তাহা হইলে দেখিবে, আভ্যন্তরিক বোধশীলতার প্রভাবে, সকল কলার পরস্পরের মধ্যেই একটা কথা-চালাচালি হইয়া গিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনিবার উদ্দেশেই আর্ট একটা তীব্র আকারে, একটা জমাট্ আকারে গঠিত হইয়া থাকে। চিত্রকর, সঙ্গীতবেত্তা, তক্ষণ-শিল্পী ইহারা আপনাদের মধ্যে যখন বাক্যালাপ করে তখন যদি তাহাদের কথা শোনো, তাহা হইলে, আর্টিষ্টদিগের মধ্যে এই অন্তর্যোগাযোগ বেশ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

কোনো বিশেষ-বিষয়ের সম্বন্ধে এই বোধশীলতা যখন গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিবে ; অর্থাৎ যখন তৎসংক্রান্ত কৌতূহল, তৎসংক্রান্ত আনন্দ, তৎসংক্রান্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস পুষ্ট হইয়া উঠিবে, তখনই এই বোধশীলতার-Sensibility-এলাকা বাড়াইবার সময় আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। তুমি দেখিতে পাইবে, প্রথম পরীক্ষার পূর্ব্বেই, ঐ বোধশীলতা ঐ সমস্তের সহিত আরও অধিক উপযোগী করিয়া লইবে। দেখিবে ইতিমধ্যেই উহা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আরও নমনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাছাড়া আরও সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

শিশুদিগের ও বয়স্ক ব্যক্তিদিগের কলা-শিক্ষায় যে অনেক বাধা পড়ে, তাহার কারণ—বুদ্ধির দিক দিয়া আরম্ভ করা হয় বলিয়া। অবশ্য, সকল কলাবিদ্যারই একটা ব্যাকরণ আছে, সেই ব্যাকরণ জানা দরকার। সার্গম ও স্বরমিলের একটা ধারণা না থাকিলে, সঙ্গীত কখনই ভাল করিয়া বুঝা যায় না। ছন্দের নিয়ম জানা না থাকিলে কবিতাও ঠিক্ বুঝা যায় না। কিন্তু

"চিত্রবিদ্যা এমন একটা কলা যাহা"···এই বলিয়া চিত্রবিদ্যার শিক্ষা আরম্ভ করা একটা বিষম ভুল (জ্যামিতি-সম্বন্ধীয় এই ভুল অপেক্ষাকৃত আরও গুরুতর)। ভাল শিক্ষা সেই দিনই আরম্ভ হয় যে দিন শিশুর চক্ষু একটা ছবির উপর মনোযোগের সহিত সন্নিবিষ্ট হয়, সেই ছবি দেখিয়া তাহার সুখ হয়, সেই ছবির ব্যাখ্যা সে আপনিই করিতে পারে। তাহার পর, তাহাকে একটা ছবির সহিত আর একটা ছবির তুলনা করিতে দিতে হয়। তাহাকে দিয়া বলাইতে হয়,—কোন্ ছবিটা সে পছন্দ করে, এবং কেন পছন্দ করে ; তাহার পর তাহার কথায় প্রতিবাদ করিয়া, তাহার নিজের মত সমর্থন করিতে তাহাকে বাধ্য করিতে হয়···কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি যদি নিজেই নিজেকে কলা-শিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র হন, তাহা হইলে, ওস্তাদের রচনাগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া, তৎসংক্রান্ত মতামত শ্রবণ করিয়া, পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া নিজের পছন্দ-অপছন্দের মূল সূত্রটী স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া, এই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। যে দিন শিক্ষানবীশ তর্কবিতর্ক করিবে, নিজের পছন্দটাকে সমর্থন করিতে গিয়া রাগিয়া উঠিবে তখনই জানিবে তাহার প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, বোধশীলতার শিক্ষানবীশি,—ইহা যতটা সম্ভব শিক্ষককর্তৃক যথা-পথে-পরিচালিত একটা আত্মসাধনা। প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিলে, শিক্ষকবর্জ্জিত এই আত্মসাধনা, অন্যত্র অপেক্ষা এইক্ষেত্রে আরও বিপদাবহ। আত্মশিক্ষক অলীক আর্টিষ্টকে কে না দেখিয়াছে ? এই প্রকার পাগলামির জন্য কে না আক্ষেপ করিয়াছে—কে না ভীত হইয়াছে ? কলাবিদ্যা সম্বন্ধে প্রতিভাহীন আত্মশিক্ষক প্রায়ই একটা হীন বোধশক্তি লইয়া, অদ্ভুতের কোঠায় গিয়া, অতি বাড়াবাড়ির কোটায় গিয়া, বীভৎসময় কোটায় গিয়া উপনীত হয়।

ভাল শিক্ষক পাওয়া বড়ই কঠিন! সৌভাগ্যবান কোনো Rubensর শিষ্য কোনো Beethovenএর শিষ্য, কোনো Flambertএর শিষ্য প্রতিভার অভাব সত্বেও, কোন নিরভিমান সরলহৃদয় অধ্যাপক যিনি নিজের কলাবিদ্যাটির প্রতি অনুরাগী তিনি ছাত্রদিগের আরও বেশী উপকার করিতে পারেন। কেহ যদি কোনো শিক্ষকের সাহায্য লইতে না চাহেন, তাহা হইলে ভাল ভাল কতকগুলি পুস্তককে পথপ্রদর্শকরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিজেরই চেষ্টা করিতে হইবে। এ বেশ জানিবে যে, পাচিকা যেরূপ "জেলি" তৈয়ারী করে, সেইরূপভাবে একটা ক্ষুদ্র "হস্তপুঁথির" উপর চোখ রাখিয়া চিত্রকর্ম্ম শেখা চলে না। আমার মনে হয়, এরূপস্থলে, চিত্রকলার বোধটাকেই পরিপুষ্ট করা দরকার, চিত্রকলার ভাল মন্দ ঠিক বিচার করিবার শক্তি অর্জ্জন করা দরকার। এমন কি চিত্রকরের প্রকরণ প্রণালী ও ইতিহাস অবগত হওয়া দরকার। গোড়ায় দৃঢ় সংকল্পের সহিত ওস্তাদের প্রণীত ভাল ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ কর—সেই সব ওস্তাদের গ্রন্থ যাঁহারা তাঁহাদের কলাবিদ্যাকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। চিত্রকর্ম্মের কথা যদি ধর, তবে Fromentin প্রণীত "সেকালের ওস্তাদ" নামক গ্রন্থখানি পাঠ কর ; ইহা পাঠ করিলে তোমার কৌতুহল, তোমার বোধশক্তি উদ্দীপিত হইবে ; সুন্দর চিত্র দেখিবার জন্য, তুলনা করিবার জন্য, বিচার করিবার জন্য, তোমার ইচ্ছা হইবে

পত্রাবলি পাঠ কর। তাহাতে যে সকল ওস্তাদি-রচনার উল্লেখ আছে তাহা টুকিয়া রাখ; উহা দেখিবার জন্য চিত্রশালায় যাও, আধুনিক বড় বড় আল্‌বমে উহাদের "কাপিগুলার" সন্ধান কর…তোমার চোখের সাম্‌নে যখন কোনো ওস্তাদি-রচনা থাকিবে, তখন সেই ওস্তাদের জলন্ত বোধশক্তির সহিত তোমার বোধশক্তির জড়তার তুলনা করিয়া দেখ। এই প্রকার আত্মশিক্ষাপদ্ধতিই ফলদায়ক—কিন্তু বুদ্ধির দিক্ দিয়া আর্টের শিক্ষানবীশি;—যে পুস্তক এই বলিয়া আরম্ভ করে:—চিত্র-বিদ্যা একটা কলা-বিশেষ যাহা "…" ইহা—না, না শতবার না!

*

* *

অভ্যাস রহিত করিলে কলা-শিক্ষার পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে একটা প্রবল উপায় হইতে আপনাকে বঞ্চিত করা হয়। প্রথমতঃ একটি শিশুর সাধারণ মানসিক গঠনের জন্য, ব্যাকরণ ও অঙ্কের গোড়ার সরল তত্ত্বগুলি যেমন প্রয়োজনীয়,সঙ্গীত ও চিত্র-কলার গোড়ায় সরল তত্ত্বগুলিও তেমনি প্রয়োজনীয়। মূর্ত্তিগঠনের গোড়ার তত্ত্বগুলা, তত প্রয়োজনীয় না হইলেও, তবু উহা মূল্যবান। তা ছাড়া "La Joconde"এর একটা যাচ্ছে তাই রকমের কাপি করিলে, ঐ কাপি করার দরুণ, সে সাধারণ চিত্রজ্ঞানে এবং বিশেষরূপে Vinciকৃত চিত্রের জ্ঞানে নিশ্চয় অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হইবে। স্থূল রকমের হইলেও সে যে একটা কাপি করিয়াছে, ইহা দেখাইলেই হইল—আর কিছু চাহি না। অতএব যেমন কোনও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সাধনায় ব্যাবহারিক প্রয়োগ দরকার,সেইরূপ—আমি নিজে একজন আর্টিষ্ট এই অভিমানটি বাদ দিলে—প্রকৃত আর্টিষ্টিক শিক্ষাসাধনায় হাতে-কলমে অভ্যাস একান্তই আবশ্যক। ফরাসী ভাষায় ছন্দ জ্ঞান তোমার কখনই হইবে না—ফরাসী কবিদের কবিত্বরস কখনই তুমি ভাল করিয়া আস্বাদন করিতে পারিবে না, যদি তুমি নিজে পদ্য রচনায় কখন আঁচড়-প্যাঁচড় কাটিয়া না থাক। কেবল এইটের প্রতি লক্ষ্য যেন থাকে যে এইরূপ আঁচড় প্যাঁচ কাটিয়া পরে উহা আগুনে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

* *

*

কলাবিদ্যার অনুশীলনে মানুষের সুখ বৃদ্ধি হয়; এই কলাবিদ্যাকে একটা খুব উচ্চ জিনিস বলিয়া বিশ্বমানবের গ্রহণ করা আবশ্যক; কেননা, সকল যুগেই যশের মঞ্চে একটা বিশেষাধিকারীর আসন রাখা হইয়াছে আর্টিষ্টদের জন্য, অর্থাৎ সেই সব লোকের জন্য যাহারা মোটের উপর, এমন কিছুই করে না যাহা কেজো, কিংবা প্রয়োজনীয়। অতএব প্রিয় পাঠক, মানব জীবনের আনন্দের জন্য কলার অনুশীলন কতকটা দরকার তাহা তোমার নিকট সপ্রমাণ করিয়া তোমাকে আর ক্লান্ত করিব না। আমার বোধ হয়, এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটা তোমরা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন তোমাদের ঠোঁটের উপর আসিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি:… উহার উত্তর ঠিক করিয়া বলিবার পূর্ব্বে, আমাদের চারিদিকটা একবার নজর করিয়া দেখা

যাক। যাহাদের অবসর আছে, তাহাদের মধ্যে এমন-সব লোক দেখিতে পাই যাহারা পর্য্যায়ক্রমে ভাল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, সমৃদ্ধ যাদুঘরে গমন করিয়া, ভাল সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মবিনোদন করে: আমি সে-সব লোকের কথা বলিতেছি না যাহারা, ঐ সমস্ত শুধু ফ্যাশানের জন্য করে,কিংবা লোক দেখানোভাবে করে;আমি অকপট খাঁটি কলানুরাগীদের কথা বলিতেছি। প্যারিসের মতো সহরে আর্টিষ্ট অনেক আছে; কিন্তু ইহারা সকলেই অবসর-সুলভ লোক; অর্থাৎ হয় তাহারা ধনী, নয় তাহারা কলা-সুখ সম্ভোগের উদ্দেশে একটু সময় করিয়া লইবার জন্য খুব অল্পের মধ্যেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর আর্টিষ্ট আছে। অতএব, সকল কলাই এক সঙ্গে উপভোগ করা যাইতে পারে; কেবল উহার আগে অবসররূপ একটা "যদি" থাকা চাই; কিন্তু দেখা যায়, জীবনের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অংশে অধিকাংশ লোকের অবসর খুব কম। তাহাদিগকে আমি এই কথা বলি:—

মানব-সূক্ষ্মানুভূতির বিকশিত পুষ্প যাহা কলা নামে অভিহিত—সেইরূপ কোন একটি পুষ্প সম্বন্ধে তোমার যাহাতে নিছক্ অজ্ঞতা না থাকে সে বিষয়ে যত্নশীল হইবে; কিন্তু তুমি যদি ফুলের একটা সমস্ত তোড়া সংগ্রহ করিতে না পার, যে ফুলটার প্রতি তোমার অনুরাগ বেশী অন্ততঃ সেই ফুলটাই তুমি চয়ন কর—যাহাতে করিয়া তোমার জীবনের অন্তরতম প্রদেশটা বিভূষিত হইতে পারে। কি আক্ষেপের বিষয়! ইহা নিশ্চয়, সরকার-দফ্তরের কেরাণী, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কর্ম্মচারী, কারখানার হেড্-মিস্ত্রী,—আর্টের বিশেষাধিকারীদিগকে আমাদের বিরাট সভ্যতা এই যে পরমানন্দ বিতরণ করেন, অবসর অভাবে উহারা তাহা হইতে বঞ্চিত। কিন্তু এতটা বাধাবিঘ্নময় জীবন প্রায় দেখা যায় না যে, সে জীবনে অনুরাগ স্থান পাইতে পারে না, কিংবা কোন আর্টের অনুশীলন স্থান পাইতে পারে না। এক একটা দেশের সমস্ত লোক চিত্রকলার অনুরাগী কিংবা সঙ্গীতের অনুরাগী; যেমন মনে কর ইটালি ও জার্ম্মানি। ফরাসীরা সাহিত্যে উন্মত্ত। ভৌতিক ব্যাপার লইয়া যাহাদের জীবনে যুঝাযুঝি চলিতেছে আমাদের সেই সাধারণ ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে যাহারা নিজ নিজ রুচি অনুসারে, একটা আর্ট সম্বন্ধে কৌতুহলী হইয়া থাকে কিংবা কার্য্যতঃ উহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, আমরা যেন তাহাদের সেই কৌতুহলকে তারিফ করি, তাহাদের সেই অনুশীলনে উৎসাহ দিই; এবং আমরা নিজে,—যাহারা অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান, যাহারা আর্টের জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, অনুশীলন করিবার জন্য, রসাস্বাদন করিবার জন্য একটু অবসর সঞ্চিত করিয়া রাখি,কোন একটা বিশেষ কলার উদ্দেশে বেশী সময় দিতে পারি, বেশী অনুরাগ দিতে পারি—আমাদের এটা জানা উচিত, যদি কোনও একটা কলাকেও আমরা অবজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমরা শিষ্ট সজ্জনের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুক্রম

১৯

সেইদিন বিকাল বেলায় বীরবল তারাপদ বাবুর স্নানের ঘরে তিনটা পর্দ্দা টাঙাইয়া দিয়া গেল, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ব্যাঘ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই তাহার সহিত ত্রিপুরা দিদির নূতন ভাড়াটিয়ার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিয়াই ফণী চটিয়া গেল, কারণ সুদৃশ্য সুবেশ যুবা পুরুষ দেখিলেই সে তাহাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া লইত। নবাগত ব্যক্তি যখন তারাপদ বাবুর দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ারে করাঘাত করিল, তখন ফণীর রাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে শত্রু নিধনের পরামর্শ করিতে দশাশ্বমেধ ঘাটে চলিয়া গেল।

আগন্তুক দুয়ারে করাঘাত করিতে বীরবল বাহিরে আসিল, সে তাহাকে একখানি পত্র দিল, বীরবল তাহা লইয়া ভিতরে গেল, যাইবার সময়ে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই বীরবল ফিরিয়া আসিয়া নবাগতকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল এবং তাহা দেখিয়া দেবনাথ পুরার লোক বিস্মিত হইল। আগন্তুক বীরবলের সহিত দ্বিতলে উঠিয়া তারাপদ বাবুর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল। সে ঘরটা পুস্তকের রাজ্য, ছাদ ব্যতীত সেই প্রকাণ্ড ঘরের সমস্ত স্থানই ইংরাজী, বাঙ্গালা ও ফারশী কেতাবে আচ্ছন্ন, মধ্যে সামান্য একটু বসিবার স্থান ছিল, তাহাতেই তারাপদ বাবু বসিয়াছিলেন।

পায়ের শব্দ পাইয়া নাকের চশমা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোবিন্দের ছেলে, এখানে কখন এসেছ ?" আগন্তুক গৃহস্বামীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, পরশু এসেছি।" তখন তারাপদ বাবু তাহার দিকে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরশু এসেছ, এখানে ওঠনি কেন ?" আগন্তুক বলিল, "আজ্ঞে, বাসা খুঁজে পাইনি বলে, এই দুইদিন ধরে চেষ্টা করে তবে আপনার ঠিকানা পেয়েছি। আমি আপনার বাড়ীর কাছেই বাসা নিয়েছি।" "ঠিক কথা, গোবিন্দকে আমার ঠিকানাটা জানান হয়নি। দেখ বাবাজী, আমি কাশী এসে পর্য্যন্ত ঠিক করে রেখেছি যে আমি মরে গিয়েছি, বন্ধু বান্ধবের যে আমাকে দরকার হতে পারে সে কথাটা আমার মনেই হয় না, তুমি কাশীতে বেড়াতে এসেছ ত ?" অনুপম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে বেড়াতেও বটে, তার সঙ্গে একটু কাজ ও আছে," "তা' যে কাজই থাক তুমি আমার বাসায় উঠে এস।" "আজকে বিকেলেই তবে আস্‌ব," "আর বিকেলে প্রয়োজন কি, এই বেলাতেই এসো।"

অনুপমকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া তারাপদ বাবু একটী ছোট ঘণ্টা বাজাইলেন, বীরবল বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল সে ছুটিয়া আসিলে, তারাপদ বাবু তাহাকে বলিলেন, "ওরে মণিকে ডেকে দিয়ে যা" মণির নাম শুনিয়া অনুপম শিহরিয়া উঠিল, বীরবল চলিয়া গেলে

তারাপদ বাবু বলিলেন, "দেখ বাবাজী, আমার এখানে লোকজন বড় একটা আসে না, কিন্তু আমাদের পাড়ার ত্রিপুরাদিদি কাশীর অনেক সন্ধান রাখেন। আমি তাকে ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি।" অনুপম মাথা নত করিয়া বলিল, "আমি এসে ত্রিপুরাদিদির বাড়ীতেই উঠেছি।" তাহার উত্তর শুনিয়া তারাপদ বাবু বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? ত্রিপুরাদিদি নানা কারণে আমার বাধা, কাশীতে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে অমন ভদ্রস্ত্রীলোক দেখা যায় না। তুমি কি কাজে এসেছ বাবাজী?" অনুপমের আর উত্তর দেওয়া হইল না। কারণ সেই সময়ে মণি আসিয়া উপস্থিত হইল, অনুপমকে দেখিয়া মণির মুখে বিস্ময়ের কণামাত্র ও দেখা গেল না কিন্তু অনুপম তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, তারাপদ বাবু তখন বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলেন, তিনি দুইজনের কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "মণি—এটি গোবিন্দের ছেলে, আমাদের বাসায় দিনকতক থাকবে, তুই ওর জন্যে ওপরের একটা ঘর ঠিক করে দে।" তখন মণি জিজ্ঞাসা করিল, "নেড়াদা! তুমি কবে কাশীতে এলে? বাড়ীতে বলে এসেছ ত?" লজ্জায় অনুপমের মাথা হেট হইয়া গেল, সে বলিল, "আমি কাশীতে বেড়াতে এসেছি, আর একটু কাজও আছে। বাড়ীতে বলে আসব না কেন মণি? বাবার চিঠি নিয়েই ত তারাপদ বাবুর কাছে এসেছি" তখন তারাপদ বাবু মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণি! তুই গোবিন্দের ছেলেকে চিনিস্?" মণিমালিনী বলিল "খুব চিনি মামাবাবু, উনি দার্জ্জিলিঙ্গে চাকরী করেন, আমি ওঁকে দাদা বলে ডাকি।" তখন তারাপদ বাবু—অনুপমের মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন আর বলিলেন, "তুমি দাঁড়ালে কেন হে, ছোট বোন দেখ্‌লে কি দাঁড়াতে হয়?" অনুপম অপ্রস্তুত হইয়া বসিয়া পড়িল।

আবার পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়া তারাপদ বাবু বলিলেন, "মণি! তোর সঙ্গে যখন গোবিন্দের ছেলের আলাপ আছে, তখন তুই ওকে ওপরে নিয়ে যা," বলিতে বলিতে তারাপদ বাবু তাহাদের অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মণি বলিল, "মামা পড়তে আরম্ভ করেছেন। তুমি উঠে এস নেড়াদা।" অনুপম উঠিল এবং মণিমালিনীর সহিত ত্রিতলে চলিয়া গেল। অনুপমকে বসাইয়া মণি বীরবলকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিল এবং নিজে তাহার খাবার গুছাইয়া আনিল, খাবার দেখিয়া অনুপম বলিল, "আমি এখন কিছুই খেতে পারব না মণি।" মণিমালিনী হাসিয়া বলিল, "নেড়াদা' তুমি কখন কি কর, আর কোন সময়ে কি খাও তা'কি আমি জানি না? তোমাকে খেতেই হবে।" মণির আদেশে অনুপম খাবারের থালাটা হাতে করিল বটে কিন্তু খাইতে পারিল না, তখন মণি আবার বলিল, "যদি না খাও তা'হলে আমি খাইয়ে দেব কিন্তু।" অনুপম খাইতে আরম্ভ করিল, মণি দূরে একখানা আসন টানিয়া লইয়া বসিল, চা আনিয়া দিয়া বীরবল জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব,—সামনে?" অনুপম আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও মণি, এ কি বলে?" তাহার ভাব দেখিয়া মণি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ পরে মণিমালিনী বলিল, "ও সিংহলার হিন্দী বল্‌ছে নেড়াদা, বীরবল মামাবাবুর সঙ্গে সিমলা

থেকে এসেছে, ও জিজ্ঞেস কচ্ছে—তোমার জিনিসপত্র কোথায়?" তাহা শুনিয়া অনুপম বলিল, "মণি তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও যে আমি অন্য বাসায় উঠেছি, জিনিসপত্র পরে নিয়ে আসব।" বীরবল চলিয়া গেলে মণি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কতদিন এসেছ নেড়াদা?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বিশেষ লজ্জিত হইয়া অনুপম বলিল, "আজ তিনদিন হ'ল।" "কেন এলে?" অনুপম তখন মুখে খাবার তুলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার মুখের গ্রাস অর্দ্ধ পথেই রহিয়া গেল। তাহার ভাব দেখিয়া মণিমালিনী লজ্জিত হইল, সে বলিল, "তুমি এখন খাও নেড়াদা' সে পরের কথা পরে হবে'খন।" তখন গ্রাসটা অনুপমের মুখে উঠিল।

এক চুমুকে গরম চায়ের বাটীটা শেষ করিয়া অনুপম উঠিয়া দাঁড়াইল। মণি বুঝিল যে সে লজ্জিত হইয়াছে বলিয়া পলাইতে চাহে, সুতরাং সে বাধা দিল না, অনুপম বলিল, "আমি তবে জিনিসপত্তর গুলো নিয়ে আসি মণি?" মণি বলিল, "যাও, বাসা-বাড়ীতে থাকলে মামাবাবু আমারই ওপর রাগ করবেন। তুমি বীরবলকে সঙ্গে নিয়ে যাও নেড়াদা' সে কুলি মজুর ডেকে দেবে, তুমি কেবল তাকে জিনিসপত্তর দেখিয়ে দিয়ে এস।" অনুপম মণির নিকট হইতে পলাইয়া বাঁচিল।

২০

জিনিসপত্র লইয়া অনুপম যখন ফিরিয়া আসিল তখন দেবনাথপুরার পথে ব্যাঘ্র আবার তাহাকে দেখিল। দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। অনুপম কিন্তু তাহার দিকে না চাহিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। সে যখন তিনতলায় উঠিল, তখন মণি আলো জ্বালিতেছিল, তাহার চেহারার পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনুপম অবাক হইয়া গেল, অনুপম যখন জিনিসপত্তর আনিতে যায়, তখন মণি ভদ্রগৃহস্থের বধূর মত একখানা বিলাতী সাড়ী ও জামা পরিয়াছিল, তাহার ভিজা চুলগুলা পিঠের উপর এলাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন সে একটা লাল পেড়ে গেরুয়া শাড়ী ও তাহার উপরে একটা গেরুয়া রঙের ফতুয়া পরিয়াছিল, তাহার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছিল, নব প্রজ্বলিত দীপের আলোকে অনুপম দেখিল যে, মণি তাহার আজানুলম্বিত কেশপাশ একেবারে ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহার সীমন্তে নূতন সিন্দুর বিন্দু অগ্নির মত জ্বলিতেছে।

এই নূতন বেশে মণিকে কিন্তু আরও সুন্দর দেখাইতেছিল, অনুপম তাহা না দেখিয়া রাগিয়া গেল। সে ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মণি, একি করলে? আমি এসেছি বলে চুল কেটে ফেল্লে?" মণি তখন একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পলিতা কাটিতেছিল সে মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল, "চিরটাদিনই তোমার একভাবে গেল নেড়াদা? যা মুখে আসে তাই বল, কার সামনে কি বল তার ঠিক্ নেই। তুমি যাও ঘরে যাও, আমি একটু বাদে আসছি।" অনুপম রাগে অন্ধ হইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং জামা জুতা না খুলিয়াই ধপ্ করিয়া একখানা খাটের উপর বসিয়া পড়িল। আধ ঘণ্টা পরে মণি আসিয়া

দেখিল যে অন্ধকার ঘরে অনুপম তখনও সেইভাবে বসিয়া আছে, সে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি আশ্চর্য্যি, নেড়াদা' জুতো খোল নি, জামা ছাড় নি, এই ঘুটঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে একাকী বসে আছ? আলো নেই, তা' একবার লোক ডাকৃতে নেই? আমি তো এই বারান্দাতে বসে আলো কচ্ছিলুম।" অনুপম মণির মুখের দিক চাহিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "মণি! আমি না বুঝে এসেছি, তুমি আমায় মাপ কর। কাল সকালে উঠেই দেশে ফিরে যাব। তুমি যেমন ভাবে ছিলে তেমনি ভাবেই থাক।" মণি একটু হাসিয়া বলিল, "নেড়াদা' আমি ইষ্ট দেবতার দিব্বি করে বল্‌ছি যে তুমি এসেছ বলে আমি চুল কেটে ফেলিনি', তুমি জামা জুতো খোল তারপর সমস্ত কথা বলছি।"

অনুপম তাড়াতাড়ি উঠিয়া জুতা দুইটা ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিল এবং জামাটা জোর করিয়া টানিয়া ঘরের এক কোণে ছুড়িয়া দিল, তাহার রাগ দেখিয়া মণি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমার রাগটা এখনও যায়নি দেখ্‌ছি নেড়াদা,' মাথার চুল তোমার জন্যে কাটিনি—তার কারণ অন্য রকম।" ফণির চিঠিখানা তখনও মণির আঁচলে বাঁধা ছিল, সে তাহা অনুপমের হাতে দিল। পত্র পড়িয়া অনুপম লাফাইয়া উঠিল এবং তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'একে মণি?" মণি ধীর শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, "এই পাড়ারই লোক, তুমি ক্ষেপে উঠ না নেড়াদা' তাহলে কিছুই কর্ত্তে পারবে না। একাজ ধীর শান্ত লোকের কাজ। আমার মত অনাথা স্ত্রীলোক দেখলে কম বয়সের সকল লোকেরই প্রেম জন্মায়। সে প্রেমটা আমি চাই কিনা সে কথা কেউ খোঁজ করে না। সবাই মনে করে যে আমরা তাদের নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় এক পা বাড়িয়ে দাড়িয়ে আছি, আর তাদের ডাকের অপেক্ষা কচ্ছি।"

কথাগুলা শেলের মত অনুপমের বুকে গিয়া বিঁধিল, সে মনে করিল যে সে নিজে মণির সন্ধানে কাশী পর্য্যন্ত আসিয়াছে বলিয়াই মণি তাহাকে এতগুলা কথা শুনাইল। চিঠিখানা তাহাকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যেই মণি বাহির করিয়াছে। এই কথা মনে হইতেই অনুপম আবার ধপ্ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া মণি জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি হল? ও নেড়াদা তোমার কি দশা লাগ্‌বে নাকি?"

অনুপম প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "না কিছু না। মণি, লোকটাকে আমায় দেখিয়ে দেবে?" মণি বলিল, "পরে দেবো, এখন তুমি কি খাবে বল? আমি নিজের হাতে তোমার খাবার তৈরী কত্তে যাব।" হাতে মাথা রাখিয়া চিন্তা করিতে করিতে অনুপম বলিল, "যা তোমার মন চায় তাই করগে?" "ও রকম উত্তর দিলে চল্‌বে না নেড়াদা, মামাবাবু বলে দিয়েছেন যে তোমার হুকুম নিয়ে তবে খাবার তৈরী কত্তে হবে। তুমি ভাত খাবে কি পোলাউ খাবে, লুচি খাবে কি রুটী খাবে?" তখন অনুপম বাধ্য হইয়া বলিল, "তবে লুচিই খাব।"

মণি কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে বলিল। "ও রকম অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলে চল্‌বে না। তুমি গালে হাত দিয়ে কি ভাবতে বস্‌লে নেড়াদা?" অনুপম আবার প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল," "না কিছুই ভাবিনি। মণি আমি সত্য সত্যই লুচি খাব। তুমি নীচে যাও।" মণি বলিল, "যাব। কেবল তোমাকে একটা কথা বলে যাব। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথাই আছে, সে সব কথা শুন্‌লে তুমি হয়ত চটে যাবে কিন্তু তাহলেও আমাকে বল্‌তে হবে।

নেড়াদা। এখন তুমি মামাবাবুর কাছে যাও। দেখ, এটা দার্জ্জিলিঙ্গ নয়। জুতোপায়ে দিয়ে ঘরে ঢোকা মামাবাবু পছন্দ করেন না। আমি এখন খাবার কত্তে যাই, খাবার হলে তোমাদের ডাক্‌তে আস্‌ব। দার্জ্জিলিঙ্গে আমার স্বামী যে কেলেঙ্কারী করেছেন সে কথা আমি মামাবাবুর কাছে ভাঙ্গিনি—তুমিও সে কথা কিছু বলে ফেল না।"

মণি এই বলিয়া চলিয়া গেল, অনুপম আবার হাতে মাথা রাখিয়া ভাবিতে বসিল। তাহার মনে হইল যে তাহার মনের কথা মণি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে, অথচ সে যে কেমন করিয়া নিজের মনের কথা মণির নিকট ব্যক্ত করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। এইরূপে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল, অনুপম তারাপদ বাবুর কাছে যাইতে ভুলিয়া গেল, তখন মণি আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল, "নেড়াদা এখনও গালে হাত দিয়ে ভাবছ, খাবার দিয়ে এসেছি, নীচে এস।"

অনুপম অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মণিমালিনীর সহিত দ্বিতলে নামিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজ্ঞান-বিহার

১

সন্তান-বাৎসল্য

সংসারে বুদ্ধির খেলা যেখানে যত বেশী দেখা যায়, স্নেহের স্বাদ সেখানেই তত বেশী পাওয়া যায়। আবার প্রাণী-জগতের যে স্তরে বুদ্ধির বিকাশ কম, সে স্তরে স্নেহের পরিচয়ও কম মিলে থাকে। এইজন্যই জগতের শ্রেষ্ঠ-জীব বুদ্ধিমান মানুষের সমাজে স্নেহের মাধুর্য্য এত উজ্জ্বলভাবে চোখে পড়ে; আর তার পরে ক্রমনিম্ন জৈবস্তরে স্নেহের ছবি ক্রমে অস্পষ্ট হতে হতে শেষে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

মনুষ্য-সমাজে সন্তান স্নেহের প্রকাশ আমরা নিয়তই দেখ্‌তে পাই। সুতরাং তার কথা নতুন করে বলবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গ, মৎস্য

ও পাখী প্রভৃতির ভিতরেও যে নিয়ত এই স্নিগ্ধ মধুর স্নেহের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার লক্ষ পরিচয় বিস্ময়াবহ।

সকল স্তরের প্রাণীর মধ্যেই স্নেহ বা বাৎসল্য সন্তানপালনে এবং সন্তানের জীবনরক্ষার চেষ্টাতেই প্রকাশ পায়। নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে সন্তানপালনের দুই বিভিন্ন ধারা আছে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে এক শ্রেণীর জননী আছে—যারা নিজেদের সতর্ক এবং সযত্ন পাহারায় সন্তান পালন করে। আর এক শ্রেণীর জনকজননী প্রসবের পরমুহূর্ত্ত থেকে—মমতা পরিশূন্য হয়ে অপরিণত সন্তানদের প্রকৃতির হাতে সঁপে দেয়। এই হতভাগ্যদের মাঝ থেকে যে কটি ষষ্ঠীমায়ের কৃপায় বেঁচে থাকে, তারাই তাদের বংশের পরিচয় দেয়।

শোনা যায় সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে "কড্" মাছ এই প্রকৃতির। এদের—অধিকাংশ সন্তান হয় উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, না হয় শত্রুর কবলে পড়ে মারা যায়। একটা "কড্" মাছ একবারে প্রায় ৬৬,৫২,০০০ ডিম প্রসব করে। কিন্তু এদের অধিকাংশই অন্য যত সামুদ্রিক প্রণীদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এদের জনকজননীর মধ্যে স্নেহের আভাস বড় পাওয়া যায় না।

তবে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের কথায় সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে Stickleback, Sea-Horse, এবং Pipe-fishদের এ বিষয়ে একটু বিশেষ উন্নত বলেই মনে হয়। তবে এদের মধ্যেও আবার একটু মজা আছে। এদের মা থেকে বাপেরাই বেশী স্নেহবান। দু-একজন মা আবার এমন যে ফাঁক পেলে নিজের ডিম নিজেই খেয়ে ফেলেন। কিন্তু স্নেহবান পিতার সতর্কতায় সেটা বড় ঘটে ওঠে না।

Stickleback জাতীয় মাছ প্রসবের সময় হলেই তাদের স্ত্রীদের—জঙ্গলপূর্ণ কোন জলা জয়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়। স্ত্রীরা ডিম প্রসব করলেই স্নেহবান পিতা জননীদিগের এবং বাহিঃশত্রুদের হাত থেকে ডিমগুলিকে অতি সতর্কভাবে রক্ষা করতে নিযুক্ত থাকে। তারপরে Sea-Horse এবং Pipe-fishদের রীতি আরো চমৎকার। এদের জননীরা ডিম প্রসব করলেই জনকেরা সন্তানপালনের জন্য নিজেদের পেটের তলায় এক একটি মস্ত থলির সৃষ্টি করে। এবং যে পর্য্যন্ত না ডিমগুলি ফুটে ছানাগুলি একটু বড় না হয় সে পর্য্যন্ত জনকেরা অতি সাবধানে সন্তানদের রক্ষায় নিযুক্ত থাকে।

উভয়চরদের ভেতরে ভেকজাতির একটা শ্রেণীকে এদের চাইতে স্নেহ সম্বন্ধে আর একটু উঁচু বলে মনে হয়। তাদের বেঙ-রাণীরা ডিম প্রসব করলেই পালনের ভার পরে স্নেহ পরায়ণ নির্জ্জনতাপ্রিয় গম্ভীরমূর্ত্তি বেঙ-রাজাদের উপর। তারা অমনি তাড়াতাড়ি কোন একটা গুপ্ত ভিজে জায়গা খুঁজে ডিমগুলিকে নিয়ে সেখানে চলে যায়। এবং যতদিন না তারা একটু বড় হয় তত দিন ধৈর্য্য ধরে বেশ সাবধানে সেখানে তাদের পালন করে।

মাকড়সাদের মধ্যে সাধারণতঃ দুই দল দেখা যায়। একটা দল আছে, যারা প্রসবের আগেই তাদের খাঁটি স্বদেশী রেশমে সব রকমের আবহাওয়াতে টেকসই একখানা জাল

তৈরি করে। এতে তাদের এক ঢিলে দুই পাখী শিকার হয়। খাদ্য-প্রাণীও ধরা পড়ে, আবার সন্তানপালনও হয়। প্রসবের পরেই এরা ডিমগুলি এই জালের সঙ্গে রেখে দেয়। এবং ডিম ফুটে বড় হওয়া পর্য্যন্ত এদের তত্ত্বাবধানে এই জালেই বাস করে। আর এক দল আছে, তারা প্রসবের পরে ডিমগুলিকে নিজের তৈরি এক রেশমী থলিতে পুরে পেটের তলায় রেখে ওগুলিকে ফুটবার এবং বড় হবার অবসর দেয়।

কীট পতঙ্গাদির ভিতরে মৌমাছি, বোলতা এবং গুবড়ে পোকার প্রভৃতির মধ্যে সন্তান প্রসবের এবং ভবিষ্যৎ সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য একটা স্নেহপূর্ণ আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। প্রসবের সময় উপস্থিত হলেই—গুবরে পোকাদের স্বামী স্ত্রী—এক সঙ্গে অতি আগ্রহের সহিত উপযুক্ত বাসস্থান ঠিক করে, এবং ভবিষ্যতে যখন তাদের বাইরে আসা সম্ভব হবেনা, তখন সপরিবারে বসে বসে খেতে পারে এমন উপযুক্ত সব গোবরের তাল সংগ্রহ করে রাখে। কিন্তু মজা এই যে, কি শারীরিক ক্ষমতায়, কি কোন নূতন উদ্ভাবনের ব্যাপারে, কিম্বা বাসানির্ম্মাণের দক্ষতায়, সকল বিষয়েই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

মৌমাছি ও বোল্‌তা কি পরিশ্রম এবং কৌশলের সঙ্গে বাসানির্ম্মাণ, ও সন্তানরক্ষা করে—মৌমাছিরা কি শ্রমে মধু-সংগ্রহ এবং বোল্‌তা কি কৌশলে নিজেদের এবং সন্তানদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে—তা বোধ হয় অল্প বিস্তর সকলেই লক্ষ্য করিছেন। বোল্‌তারা খাদ্যের জন্য কতক কীট পতঙ্গ মারিয়া সংগ্রহ করে; আবার কতক (একটু বেশী দিন টাটকা রাখিবার জন্য বোধ হয়) শুধু হুলের ঘায়ে চলচ্ছক্তিহীন করে দেয়। এ বিষয়ে বোল্‌তা-স্ত্রীর চতুরতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তার হুলবিদ্ধ হওয়ামাত্র শিকার অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অথচ মরে না। এই ভাবে জীবন্মৃত করে সে উহাকে বাসার এক গর্ত্তে রেখে উহারই উপরে ডিম প্রসব করে। উহাতে দুই সুবিধা হয়। এক ভবিষ্যৎ সন্তানের খাবার সুবিধা হয়—আর কোন চোরের অপহরণের সুবিধা থাকে না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এত আগ্রহসত্ত্বেও স্নেহ পরায়ণ বোল্‌তা প্রিয় সন্তানের মুখ দেখতে পায় না। তার অনেক আগে তাদের জীবনের ছোটখাট ইতিহাস সমাপ্ত হয়ে যায়।

২

অন্ধের নয়ন

মানুষ জগতের যাবতীয় সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—আবহমান কাল হইতে আমরা ইহাই শুনিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন ভারতের নাকি এমন একদিন ছিল, যখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ নরসমাজে দেবতা সদৃশ ছিলেন। তাঁহাদের এমন শক্তিও নাকি ছিল, যাহার বলে তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ধ্বংশ বা সৃজন করিতেও সমর্থ হইতেন। কিন্তু সে সমস্তই অক্ষম, অলস আমরা, পরের কথায় বিশ্বাসী আমরা নিতান্তই অলীক গল্প বলিয়া

এতদিন অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় এবং পাশ্চাত্য মণিষী-গণের বৈজ্ঞানিক সাধনার ফলে আজ আবার সেই সমস্ত অবিশ্বাসের বিষয়সমূহ ধীরে ধীরে সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। এতদিন আমরা জানিতাম যে এই দুই বড় বড় চক্ষু দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই সত্য। অন্য কোন প্রকারে পার্থিব পদার্থের দর্শনলাভ অসম্ভব। কিন্তু অধুনা জনৈক ফরাসী ডাক্তার সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে—আমাদের এই বড় বড় চক্ষু দুটির সাহায্য ছাড়াও সমস্ত পদার্থ দেখিতে পারি।

ইতিমধ্যে প্যারিসে একটি কক্ষে বহু অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গে পূর্ণ এক মস্ত বড় সভাগৃহে ইহারই সত্যাসত্যের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় অন্যান্য মণিষী-গণের মধ্যে প্রবীণ লেখক Anatole Franceও উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বাগ্রে মুক্ত দিবালোকে সাধারণের সর্ব্ব প্রকার সন্দেহের কারণ বিদূরিত করিয়া এই পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ কয়েকজন অভিজ্ঞ ডাক্তার একটি অন্ধকে গৃহের এক কোণে তাহার বক্ষ বাহুদ্বয় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া দেন। তার পরে একজন ডাক্তার তাহার চক্ষুদ্বয় plaster এর সাহায্যে উত্তমরূপে ঢাকিয়া দেন। তদুপরে চারিটি পৃথক পৃথক পটিদ্বারা উক্ত চক্ষুদ্বয়কে এরূপ দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দেন যে তাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদেরও দেখিতে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার পরে আরও দ্বাদশটি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ অন্ধকে একখানা সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক পড়িতে দিলে সে উহা পাঠ করে। তৎপরে সে তাহার সম্মুখে একে একে উপস্থিত করান সকল পদার্থেরই নাম এবং পরিচয় বলিয়া দেয়। এইরূপে সে পাঁচ খণ্ড হীরক দেখিতে পায়, এবং একটি ফুলের তোড়ায় কি কি বর্ণের ফুল আছে তাহাও বলিতে সমর্থ হয়। ইহা দেখিয়া সভাস্থ দর্শকমণ্ডলী নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন। জানিনা অদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আরও কি শুনিতে পাইব।

এই তথ্যের আবিষ্কারক বলিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষের দেহবলের ভিতরে এমন একটা শক্তি আছে যাহার অনুশীলন করিলে প্রত্যেক মানুষই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকেও দর্শনলাভ করিতে পারে। তিনি বলেন যে মানুষের সমগ্রদেহ-বর্ম্মে—অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু আছে। ইহার ব্যবহার না করিয়াই মানুষ ইহাদের সাহায্যে দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দুইটি চক্ষের অধীন হইয়াছে, এবং চেষ্টা করিলে ঐ দুই চক্ষের সাহায্য ছাড়াও চর্ম্মচক্ষের সাহায্যে মানুষ এক সময়ে তাহার চারিদিকের সকলই দেখিতে পায়। জানিনা এই জন্যই ব্রহ্মা "চতুর্ম্মুখ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বড়ই কষ্ট সাধ্য। তথাপি ইহা যে জগতের অন্ধদিগের নিকট এক অভাবনীয় আশার বাণী একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কেননা উপরিউক্তভাবে নগ্ন দেহে, এবং মুদিত নেত্রে চেয়ারে বসিয়া অনবরত একাগ্রভাবে দর্শনের চেষ্টা করিতে করিতে সকলেই নাকি ঐ রূপ দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইতে পারে।

শ্রীঅমূল্য রায় চৌধুরী।

শিকলির দাম

মরু-রৌদ্রে দেশটা ঝিম্ ঝিম্ করত—সেতারের অবিশ্রান্ত ঝঙ্কারের মত, আর মরু জ্যোৎস্নায় দেশটা পরীর-রাজ্য হয়ে উঠত—অবাস্তব স্বপ্নভরা।

দুরন্ত জাতটা দাপাদাপি করে বেড়াত প্রাণের প্রাবল্যে মাঠে, তেপান্তরে, বনে, বাদাড়ে—অসভ্য, স্বাধীন, চির-তরুণ।

একদিন খেয়াল হ'ল—না আর সকলের মত আদব কায়দা শিখতে হবে, সভ্য ভব্য হতে হবে। সকলে বল্লে "বাঃ ভারী মজা হবে, চুপচাপ কাজ করব মুখভার করে, দৌড়োতে ইচ্ছে হলেও দৌড়ব না—চেঁচাতে ইচ্ছে হলেও চেঁচাব না, কিন্তু শিখ্‌ব কোথায় ?"

সমৃদ্ধ প্রবীণ প্রতিবেশী এসে বল্লে—"তার আর ভাবনা কি! তোমরা ত আর আমার পর নও, আমি যেমনটি বলি, তেমনি শুনে চল, তোমাদের মানুষ করে দিচ্ছি।"

সমস্বরে সকলে বল্লে—"খুব শুনব, আলবৎ শুনব।"

দেখতে দেখতে দেশের এফোঁড়-ওফোঁড় বড় বড় রাস্তা বনে গেল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারৎ উঠ্‌ল, বড় বড় কারখানা দেশময় হাঁস ফাঁস করে কাজে লেগে গেল। দেশটাকে চেনাই যায় না।

প্রতিবেশীর পুষ্যিরা তরওয়াল খুলে—রাস্তা ঘাটে পাহারা দেয়, প্রতিবেশীর চৌদোলা চলে—রাতে দিনে রাস্তা ঘাট আলো করে'। দু-একজনকে মখমলের মস্‌নদে বসিয়ে সমারোহ করে সমস্ত দেশটাকে কারখানায় কলে জুড়ে দিয়ে প্রতিবেশী বল্লে—"দেখ দিকি, তোমাদের জন্যে নিঃস্বার্থ ভাবে কি করলুম! পরের জন্যে কে এমন করে নিজের সময় নষ্ট করে বলত ?"

তারা কুণ্ঠিত হয়ে শুধু বলে "আপনি অতি মহৎ!" প্রতিবেশী কৃপার হাসি হেসে বলে, "আরে সে কি ওরকম পাড়া-পড়সি হ'লে একটু আধটু করতে হয়। এখন তোমাদের মানুষ করে নিজের পায়ে ছেড়ে দিতে পারি তবেই বুঝি কিছু করলুম।"

তারা এত করুণায় আরো লজ্জিত হয়ে পড়ে।

এমনি করে দিন যায়—অনেক দিন যায়। জাতটা কেমন চিন্তিত হয়ে উঠল। এটা কি রকম! তাদের দেশ—শুনছে, বড় হয়ে উঠছে, তবে তাদের অবস্থা এমন হয় কেন! কারখানায় কলে গাধার মত খেটে তাদের সভ্য হবার কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছে না। ধোঁয়ায় ধূসর বাস, আধপেটা খেয়ে ক্ষীণ দেহ, প্রাণে স্ফূর্ত্তি নেই—শরীরে বল নেই—এক রকম সভ্য হওয়া!

একদিন প্রতিবেশীকে সটান জিজ্ঞাসা করেই ফেল্লে "আচ্ছা—এতদিন ত বেগার খাটলুম, কই—সভ্য হলুম কোথায় ?"

প্রতিবেশী ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লে—"বেশ যা হোক, চেয়ে দেখ দিকি দেশটার পানে, কি ছিল আর কি হয়েছে। রাস্তা, ইমারৎ, কারখানায় দেশটা ছেয়ে গেল, সভ্য হলুম কোথায়!" কেউ কেউ বল্লে—"তা ইত"—কিন্তু মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল।

আরো দিন যায়। একদিন তারা হাত জোড় করে গিয়ে বল্লে—"আপনি আমাদের ঢের করেছেন, আর আপনাকে কষ্ট দেব না। এইবার আমরা সভ্য হয়েছি, নিজেদের ভার নিজেরা নেব।" কাষ্ঠ হাসি হেসে প্রতিবেশী বল্লে—"আরে রামঃ। এই অপরিণত অবস্থায় তোমাদের নিজের পায়ে ছেড়ে দিয়ে আমি কি একটা পাপের ভাগী হব? এখনো কি তেমোদের ক্ষমতা হয়েছে না বুদ্ধি হয়েছে!—ছেলে মানুষ সব যত! আর দিনকতক সবুরই করুনা বাপু, তোমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করাব বল্লেইত এত করছি। আমার নিজের কিছু স্বার্থ আছে বলতে পার—?"

তারা বল্লে, "আজ্ঞে, আমরা কি রকম পারি একবার দেখুনই না।" তারা এই বলে আরো অনেক শিশু-জাতের উদাহরণ দেখালে। প্রতিবেশী এবার ধমক দিয়ে বল্লে—"নানা ওসব হবে না, ছেলে-মানুষী কি সব কাজে চলে।" কারখানায় খেটে তারা হায়রাণ হয়ে গেছল, বল্লে—"তবে কাজ নেই আমাদের সভ্যতায়, আমরা চল্লুম, যেমন ছিলুম তেমনিই থাকব।" প্রতিবেশী বল্লে—"আচ্ছা বেশ!"

তারা কিন্তু বেরিয়ে দেখলে—সেপাইদের তরওয়াল গুলো বেয়াড়া-ভাবে উঁচু হয়ে আছে। জিজ্ঞাসা কল্লে—"একি রকম?" প্রতিবেশী বল্লে—"কালকাল কিনা, লোকের ভালো করতে গেলে মন্দ হয়। তোমরা পাগল হয়েছ বলেত আর আমি পাগল হতে পারি না। কিসে তোমাদের ভালো হয়—তাই আমায় দেখতে হ'বে।"

এবার তারা চটে গিয়ে বল্লে—"এরকম হিতৈষী হবার কথাত আপনার সঙ্গে ছিল না! আমরা আপনার উপকার-করা না চাইলেও আপনি উপকার করবেন? দূর!—আমরা আর কিছু করব না।" কিন্তু সঙ্গীনীগুলো অনুমতি না নিয়েই খোঁচাতে সুরু করলে; খোঁচা গুলোও হিতৈষী খোঁচার মত নিঃস্বার্থ লাগলে লাগল না। তারা কাঁদলে, প্রতিবাদ করলে, ধর্ম্মের দোহাই দিলে, কিন্তু কিছুতে কিছু [illegible]

প্রতিবেশী বল্লে, "সত্যের মর্যাদা, ন্যায়ের মর্য্যাদা, শৃঙ্খলার মর্য্যাদা ত আমায় রাখতে হবে। আমার নিজের একটা কর্ত্তব্য বোধও ত আছে ছেলে অবাধ্য হয়ে অন্যায় করলে তার সত্যকার হিতৈষী তাকে শাসনই করে থাকে। যা করছি, জেনো—তোমাদের ভালোর জন্যেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্য হলে, আমাদের আর বলতে হবে না, আমরা নিজে থেকেই সরে যাব। নিজের সময় নষ্ট করে কতদিন তোমাদের দায় ঘাড়ে করে বেড়াব বাপু?"

এরা এত বড় বক্তৃতার মর্ম্ম গ্রহণ না করে শুধু বল্লে—"আমাদের সভ্য হয়ে দরকার নেই।"

কিন্তু তাদের দরকার না থাকলেই ত চুকে গেল না! সেপাইগুলোর তরোয়াল বেপরোয়া ঘুরতে সুরু করলে। তারাও মরিয়া হয়ে বল্লে—"বেশ আমরাও টলব না, মারবওনা, হারবও না। যতদিন একজনও বেঁচে থাকবে—ততদিন আমরা নড়বনা।" অটল হয়ে দাঁড়িয়ে তারা অম্লান মুখে মার খেতে লাগল। অন্ন নেই—জল নেই—ঘরদোর ভেঙে গেল, গাঁ উজাড় হয়ে গেল, দেশ শ্মশান হয়ে গেল—তবু তারা অটল—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এমন সময় প্রতিবেশীর মাসতুত ভায়েরা দাঙ্গা বাধিয়ে বসল। প্রতিবেশীর নিজেরি সামাল-সামাল! কারখানা, কল, ইমারৎ ছেড়ে হতাবশিষ্ট জাত্ বেরিয়ে গেল—মরুর তেপান্তরে।

আজো তারা ধুধু—মরুর মাঝে মাতামাতি দাপাদাপি করে বেড়ায়—অসভ্য অশান্ত। আর প্রতিবেশী তাদের দেখিয়ে ঘৃণার স্বরে বলে—"নেহাৎ লক্ষ্মী ছাড়া! ঢের ভালো করতে গেছলুম—কিন্তু ঘি কি সয় সবার পেটে!"

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

সুর-বাহার

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

গান

যখন ভাঙল মিলন মেলা
ভেবেছিলেম ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা।
দিনে দিনে পথের ধুলায়
মালা হতে ফুল ঝরে যায়,
জানিনে ত কখন এল বিস্মরণের বেলা।
দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল,
ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে না যে
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা।

শান্তিনিকেতন— বৈশাখ ১৩৩১,

গানের সাজি এনেছি আজি

গানের সাজি এনেছি আজি
ঢাকাটি তার লওগো খুলে

যে থাকে মনে স্বপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে।
কি যে সে তাহা আমি কি জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী
সুরের ফুলে গন্ধখানি
ছন্দে বাঁধি' দিয়াছে,
সে ফুল বুঝি হয়েছে পুঁজি,
দেখ ত যেয়ে কি আছে!
দেখ ত, সখি, দিয়েছে ওকি
সুখের কাঁদা দুখের হাসি,
দুরাশা-ভরা চাহনি?
দিয়েছে কিনা ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান-গাহনি?
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা
সোহাগ কভু কভুবা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
পরাণমন-দাহনি,—
দেখ ত ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি?
ডেকেছে কবে মধুর রবে
মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
তোমার কর-পরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কখন্ চোখে ঢালিলে সুধা
ক্ষণিক তব হরশে,—
বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে
সে সব দান ফিরিয়ে দিতে
আমার দিন-শেষের গীতে,
সফল তা'রে কর' সে।
গানের সাজি খোল গো আজি
করুণ কর-পরশে।
রসে বিলীন সে সব দিন
ভরেছে আজি বরণ ডালা

সুরের ডোরে গাঁথনি করে'
রচিয়া মম বিরহ মালা
রাখিয়া যাব চরণে।
একথা তব মনে না র'বে,
স্বপনে এ'রা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে মরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ করে'
সকল শেষ বরণে॥

বঙ্গবাণী— বৈশাখ ১৩৩১

শেষ অর্ঘ্য

যে তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষ বেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্ত মুখে ; নিখিলের আনন্দ মেলায়
স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল, দিল আনি'
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দে চরণে আসি' কম্পিত পরশে
চম্পক অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

কল্লোল— বৈশাখ ১৩৩১

লীলা-সঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যমনি চাহিরে
মনে হল যেন চিনি—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী?
কাজে ফেলে মোরে চলে' গেলে কোন্ দূরে।
মনে পড়ে' গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?

ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী !
বিস্মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি !
এলোচুলে বহে' এনেছ কি মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুল গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল !
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল !
মনে আছে কি সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনও আমের নব মুকুলের বেশে,—
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।
নদী-কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি, করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন-কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জ্জন ক্ষণে কখন অস্ত-মনায়
ছুয়ে গেছে থেকে থেকে।
কখন হাসিতে কখন বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে

সাথী খুঁজে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা—প্রাঙ্গণে ?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে,
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে ?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে !
আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমা গুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি ?
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে' যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কল-গুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি ?
দেখ না কি, হায়, বেলা চলে' যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি'
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।
এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকোচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তা'রে ?

দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?
যদি রাত হয়—না করিব ভয়,
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে'
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস রঙ্গিণী।
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৩১

গতি ও স্থিতি

যিনি দেহ শ্বাস প্রশ্বাস আকর্ষণ বিকর্ষণ করচেন—"তিনি জীব।" যিনি একটী ক্ষুদ্র দেহকে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত করে বার্দ্ধক্যে পরিণত করচেন—তিনি "জীব।" যিনি আপন অখণ্ডস্বরূপ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সুখী হতে চান না—তিনি "জীব"। যিনি পরমাত্মার সহিত মিলন ব্যতীত কিছুতেই আনন্দলাভ করেন না—তিনি "জীব।"

যিনি পার্থিব ভোগ্য বস্তু পেয়ে আনন্দ করেন, না পেয়ে দুঃখ করেন, নিরানন্দ হন—তিনি "জীব" নন, "মন"। যিনি রাগ করেন, হিংসা করেন, গর্ব্ব করেন, ঘৃণা করেন, লোভ করেন, কামোন্মত্ত হন—তিনি "জীব" নন—"মন"। যিনি শুচি-অশুচি ভাবাপন্ন হন, তিনি "জীব" নন—"মন"। এই মন জীব সান্নিধ্যে থেকে শক্তিলাভ ক'রে শান্ত অশান্তি সৃষ্টি করচে। আর যিনি "জীব," তিনি তাঁর আপন অখণ্ড স্বরূপ, সেই অব্যক্তকে পাবার জন্য সদাই কাতর; হে গুরো! হে ভবপারাবারের কর্ণধার! তোমার কৃপা ব্যতীত তাঁকে জানতে পারা যায় না।

সৎগুরু কে? যিনি—সৎকে, দেখিয়ে দেন, চিনিয়ে দেন, পরিচয় করিয়ে দেন। সৎ গুরু আনন্দ ব্রহ্ম। হে গুরো! আমি জীব—আমি তোমায় ভূমিবিলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। তুমি আনন্দ স্বরূপ—জীবকে আনন্দধামে নিয়ে যেতে—একমাত্র তুমিই সারথী। তোমার রাতুল চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত! জ্ঞান-ঘনমূর্ত্তি তুমি!—চিৎঘন মূর্ত্তি তুমি!—আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি তুমি!—আমি তোমায় মানসে পূজা করি। সুখ দুঃখ দ্বন্দভাব তোমাতে

নাই—তুমি গগন-সদৃশ, সীমাশূন্য! তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্! তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালেই সমভাবে আছ। তুমি স্থির অচঞ্চল, অবিকৃত, তুমি পুরাণ শাশ্বত, শ্রুতি "তত্ত্বমসি" তোমাকেই বলেন। তুমি ভাবাতীত, গুণাতীত, তুমি আপন মহিমায় অনন্ত বিভক্ত হয়ে, সর্ব্ব জীবের জীবন রূপে বিরাজ করচ, তোমা হতে আনন্দ কণা ত্রিভুবনে অহর্নিশি ক্ষরিত হচ্চে। হে গুরো! হে আনন্দ ব্রহ্ম তোমায় নমস্কার! গীতোক্ত রাজ যোগই সম্পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ। ইহাই জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তার সকলগুলিই এই গীতা কেন্দ্রের শাখা স্বরূপ। আপনারা যদি একটু বিচার বুদ্ধিপরায়ণ হয়ে শ্রীগীতা পাঠ করেন, তাহলে দেখবেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় এই পূর্ণেরই অংশ বিশেষ। এই পূর্ণকে সম্পূর্ণরূপে না দেখা পর্য্যন্ত পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদে ব্যস্ত। কিন্তু যিনি পূর্ণ—তিনি পরম শান্ত। আজ শ্রীগীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্মটী আপনাদের সম্মুখে বিজ্ঞাপন করতে উদ্যত।

একবার এই বিশাল অনন্ত জগতের দিকে চেয়ে দেখুন—কি দেখবেন? যা কিছু সৃষ্ট বস্তু, তার কোন না কোন ধর্ম্ম আছে। অনন্ত জড়রাশিরও ধর্ম্ম আছে, আবার অনন্ত চেতনেরও ধর্ম্ম আছে। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম পরমাত্মা—তাঁর কোন ধর্ম্ম নাই, তিনি নিঃসঙ্গ, তিনি সৃষ্ট বস্তু নয়। মায়ার শক্তিপ্রভাবে—জড়চেতনের সংমিশ্রণে অনাত্মার ধর্ম্মটী পরমাত্মায় অধ্যাস হয় মাত্র, ক্রমান্বয়ে এই অধ্যাস হয় বলে লোকে পরমাত্মাকে প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত জড়িত দেখে। পরমাত্মার প্রকৃতস্বরূপ যিনি না জানেন, তিনিই নিঃসঙ্গ পরমাত্মাকে ধর্ম্মী বলেন। যেমন একটী আর্শির সম্মুখে একটি জবাফুল থাকলে, জবা ফুলটী আর্শিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং আর্শি নির্লিপ্ত থাকলে ও যেমন জবা ফুলের সহিত জড়িত বলে মনে হয়—পরমাত্মায় অনাত্মার ধর্ম্মটী অধ্যাস হওয়ায় পরমাত্মাকে প্রকৃতির ধর্ম্মের সহিত জড়িত বলে অনুমিত হয় মাত্র।

বেদ, উপনিষদ, আদি সমস্ত গ্রন্থে দেখতে পাই যে, প্রাণের কম্পন হতেই এই বিশাল বিশ্ব রচিত হয়েচে—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম।" ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে কম্পনা ব্যতীত কোন বস্তুই সৃষ্টি হতে পারে না। যদি দীপ্তিশালী অগাধ, অসীম কিছু থাকে, তা হতে কম্পনের মত কিছু উঠবেই উঠবে। উদাহরণ স্বরূপ ধর—একখণ্ড বড় হীরক, তা হতে যে ঝলক উত্থিত হয়, দেখলেই মনে হয়, যেন একটা কম্পনবিশিষ্ট ঝলক উত্থিত হচ্চে। সেইরূপ সেই অসীম, অচঞ্চল পরম শান্ত নীলমণি হতে যে কোটী সূর্য্যসমপ্রভ ঝলক কম্পন উঠার মত এক প্রকার বোধ হয়, তা হতেই এই বিশাল বিশ্ব রচিত হয়েচে—তিনিই সেই ব্রহ্মশক্তি বা প্রাণ।

জগতের জীবের দিকে চেয়ে দেখুন, তারা মায়িক কম্পনের ফলস্বরূপ, আহার, নিদ্রা, ভয় ও কাম, এই চার বিষয় লয়েই উন্মত্ত। ভগবান গীতায় দেখাচ্চেন যে, এমন কার্য্য প্রণালী আছে, যার দ্বারা আহার নিদ্রা ভয় ও কাম এই সাধারণ কর্ম্মকে জীব [illegible]

বশে আনতে পারে। মানুষের মূল শক্তিস্থান একটী, অর্থাৎ মূলাধারে প্রাণ শক্তি; এই প্রাণশক্তিই জীব দেহে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন রূপে প্রকাশিত হচ্চে। এই ত্রিশক্তিকে চালনা করে মূলাধারস্থিত প্রাণ শক্তির সহিত মিলিত করে, সেই পরম কারুণিক অচঞ্চল, পরম শান্ত স্থির স্বরূপ পরব্রহ্মে সংরক্ষিত করাই শ্রীগীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, কারণ জগতের প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু এমন কি এ জগৎটাই সর্ব্বদা পরিণামশীল—চঞ্চল। মনও স্বভাবতঃ চঞ্চল। চঞ্চল, চঞ্চলের সহিত যুক্ত হলে কখনও স্থির হতে পারে না বরং চঞ্চলতার বৃদ্ধিই হয়ে থাকে। ব্রহ্মই একমাত্র স্থির, অতএব গুরু কৃপায় "ব্রহ্মকে" দেখে জেনে তাতে চঞ্চল মনকে সংযোগ করলে স্থিরতা লাভ করা যায়। ইহা ব্যতীত মনকে স্থির করবার আর কোন উপায় নাই।

আত্মজ্ঞান-হীনতার নামই "মৃত্যু"! এই মৃত্যুই—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রূপে মনের ঠিক উপরেই অহঙ্কারের (তমের) মধ্যে বাস করে; যে কার্য্যপ্রণালী দ্বারা এই মৃত্যুকে জয় করা যায়, তার নাম রাজযোগ। মৃত্যুঞ্জয় হওয়াই গীতোক্ত ধর্ম্ম।

(১) শ্রীগুরুকৃপায় জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দেখে জানার নাম—"জ্ঞান।"

(২) জানার পর, মন যখন সর্ব্বশক্তির আধার, সেই বিরাটকে দেখে, তখন মনের মধ্যে এক প্রকার ভয় মিশ্রিত ভাবের উদয় হয়—তার নাম "ভক্তি।"

(৩) যে উপায়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করা হয়, তার নাম "যোগ।"

(৪) এই যোগের পর ভক্তি পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন মন গলে যায়, তার নাম প্রেম। মহাত্মা রজনীকান্ত সেনের একটী গান ঠাকুর প্রায়ই গেয়ে থাকেন:—

প্রেমে জল হয়ে যাও গলে—
কঠিনে মেশে না সে, মেশে রে সে তরল হলে॥
অবিরাম হয়ে নত, চলে যাও নদীর মত
কল কলে অবিরত জয় জগদীশ বলে,—
যেওনা কোন স্থলে শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চলে॥
সে জলে নাইবে যারা, থাকবেনা মৃত্যু জরা
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুইলে,—
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে তাদের টেনে নে যাও একেবারে,
ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও সেই পরিণাম সিন্ধু জলে॥

(৫) এই রাজযোগ সাধনায় প্রথমে হয় জীবাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎ; সেই সাক্ষাতের পর সেই অনন্ত শক্তিমানকে দেখে মনের মধ্যে ভয় মিশ্রিত সম্ভ্রম ভাবের উদয় হয়, তার নাম ভক্তি; মন ক্রমান্বয়ে ভক্তি করতে থাকলে সেই অনন্ত অখণ্ড পরমাত্মা হতে এক আনন্দাকর্ষণরূপ আকর্ষণ তখন হয় "যোগ"। এই যোগের পর মন যখন মাতোয়ারা হয়ে উঠে—তখন মন গলে যায়, তার নাম প্রেম, সেই প্রেমিক সাধক তখন দেখে, ভগবান কি করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করচেন? অর্থাৎ সৃষ্টি কোথা হতে কোথায় আছে ও প্রলয়ান্তে কোথায়

যাবে ? এবং এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ভিতরে বাহিরে এক করে অবস্থিত, অথচ যিনি নির্লিপ্ত, তাঁর নাম—বিজ্ঞান।

এই অখণ্ডই রাজ যোগের সাধ্য বস্তু—ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, ইনিই সর্ব্বপ্রকার উপাধি শূন্য, অনন্ত, অচঞ্চল, অগাধ, পরম শান্ত। ইনিই সকল বস্তুর সকল জীবের ভিতর বাইরে এক করে মহাসমুদ্রের মত অবস্থিত। তাই যোগী অষ্টাবক্র বলেচেন—

"এবং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা॥"

যিনি অব্যক্ত, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। আর যিনি সকল সময়ে আপনাতে আপনি থেকেও সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করচেন তিনি সগুণ ব্রহ্ম, বহুভাগে বিভক্ত হয়ে প্রাণ বা জীবাত্মা নামে প্রতিভাত হন।

এখন আমরা দেখলাম, যিনি জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, চঞ্চলতাহীন পরম শান্ত—তিনি ব্রহ্ম। আর যিনি কম্পনশীলা—তিনি শক্তি।

যিনি ব্রহ্ম, তিনি স্থিতি, জ্ঞান
যিনি শক্তি, তিনি, গতি, অজ্ঞান

শ্রীগীতার সাধন এই গতি হতে পরম স্থিতিতে যেতে হবে। কিন্তু তোমরা হয়ত বলতে পার স্থিতিতে গতি কিরূপে সম্ভব ? জ্ঞানে অজ্ঞান আসা কিরূপে সম্ভব ? যিনি এই সকলের হেতু, যিনি অখণ্ড শক্তিমান, তাঁতে সকলি সম্ভব। তাই বেদ শক্তিকে ইন্দ্রজাল, কুহক, বা মায়া বলেন।

যিনি ব্রহ্ম, তিনি আপন মহিমায় শক্তির কুহককে নিবৃত করে সর্ব্বদাই অবিকৃত অবস্থায় অবস্থিত—

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম সত্যং পরম ধীমহি"

এই গীতোক্ত সাধ্য বস্তুকে পাবার যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী তারই নাম রাজ যোগ।

নির্ম্মলানন্দ স্বামী।

বাব্‌লা

২৫

হ্যারিসন রোডের মোড়ে বাবলা আর লালবিহারীর দল এমনি আসর জমাইয়া তুলিল যে, তাদের হাতে কাগজ পড়িয়া থাকে না, চটপট্ সব বিক্রয় হইয়া যায়। তাদের উৎসাহ দেখিয়া অনেক কাগজওয়ালা তাদের কমিশনও একটু উঁচুহারে দেয়। ইহাতে অপর ফেরিওয়ালাদের হইল রাগ। তারা গায়ের জোরে খরিদারদের মাঝে পড়িয়া গোল বাধাইতে

সুরু করিল। সেদিন ট্রাম হইতে নামিয়া একটি বাবু বাবলার কাছ হইতে যেই কাগজ কিনিবে, একটা ছোকরা অমনি কোথা হইতে আসিয়া বাবুটির হাতের পয়সা লইয়া তার হাতে একখানা কাগজ গুঁজিয়া দিল।

বাব্‌লা বলিল,—আমার কাছে উনি কাগজ চাইলেন, তুমি দিলে কেন কাগজ ?

ছোকরা বলিল,—তোমার তো দোকান নেই, আর দোকানও বাবু চোকেন নি !

বাবলা বলিল,—তা না হোক্, তবু আমার কাছ থেকেই তো উনি কাগজ চাইলেন—

ছোকরা বলিল,—বেশ করেছি দিয়েছি, তুমি করবে কি, শুনি ?

বাবলা বলিল,—কি আর করবো ? আমিও তোমার খদ্দের ছিনিয়ে নেব।

একটু পরে হইলও তাই। বাবলা এক কোণে ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একটা চলন্ত ট্রাম হইতে একটি বাবু হাঁকিলেন,—ওরে কাগজ নিয়ে আয় তো

কথাটা সেই ছোকরাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল ; কিন্তু কথাটা তাঁর মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র বাবলা ছুটিয়া গিয়া ঝপ্ করিয়া ট্রামের পাদানিতে চড়িয়া বাবুটির হাতে কাগজ দিয়া পয়সা লইয়া ট্রাম হইতে লাফাইয়া পড়িল। ছোকরা হারিয়া রাগিয়া উঠিল। বাবলা ট্রাম হইতে আসিবামাত্র সে আসিয়া বাবলাকে বলিল,—কেন তুই আমার খদ্দের নিলি ?

বাবলা হাসিয়া বলিল,—শোধ নিলুম। মনে নেই ?

—আবার চালাকি হচ্ছে ! বলিয়া ছোকরা বাবলার মুখে একটা ঘুসি মারিল। বাবলা টাল সামলাইতে না পারিয়া পথের উপর পড়িয়া গেল। তার কাগজগুলা হাত হইতে ছিটকাইয়া পড়িল—কয়খানা হাওয়ার মুখে বহু দূরে উড়িয়া গেল, কতকগুলা ধুলা-কাদা মাখিয়া নোংরা হইয়া গেল !

গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া কাগজগুলা আয়ত্ত করিয়া বাবলা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, ছোকরাটি তখন বহুদূরে সরিয়া গিয়া হাঁকিতেছিল—টেস্‌মান্—ডেলিনিউজ—অমর্ত্তবাজার—

বাবলা তার কাছে অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল,—মারলি যে আমাকে ?

ছোকরাটা ঝগড়া পাকাইবার জন্য উদ্যত ছিল। এ কথায় কোন জবাব না দিয়া সে আবার বাবলার মুখে মারিল এক ঘুষি। বাব্‌লা মার খাইয়া হঠিল না—সোজা আগাইয়া আসিল, এবং ঘুষি পাকাইয়া শোধ লইতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে ছোকরা ইতিমধ্যে দলে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; তার দলের আরো পাঁচ-সাতজন ততক্ষণে রুখিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাবলা বলিল,—এতগুলো ছেলে একজনের সঙ্গে লড়তে এলে—লজ্জা করে না ?

তারা হাসিয়া বলিল,—লজ্জা কিসের ! কাম্ অন্ ফাইট।

তখন একটা ভারী তর্কাতর্কি বাধিয়া গেল। তাদের চীৎকারে লালবিহারীর হুঁস হইল। সে দূর হইতে চাহিয়া দেখে, বাবলাকে ঘিরিয়া কতকগুলা ডাগর ছোকরা খুব জটলা পাকাইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে। সে তখন বাবলার দিকে আগাইয়া আসিল।

লালবিহারীকে আসিতে দেখিয়া বিপক্ষদল আরো রুখিয়া গলার স্বর আরো চড়া করিল। তর্কাতর্কি শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হইল। মারামারি যখন খুব জমিয়াছে, তখন প্রমোদ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সে ট্রামে চড়িয়া কোথায় যাইতেছিল—পথে ছেলেদের মারামারি দেখিয়া নামিয়া পড়িল।

বাবলা তখন খুব মার খাইয়াছে; তার কাগজগুলা ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে; প্রমোদ আসিয়া দলের মাঝখানে পড়িয়া তাহাদের হঠাইয়া দিল ও বাবলাকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া একটা কলের কাছে লইয়া গেল—এবং জলে রুমাল ভিজাইয়া তার কাটা ঘায়ের রক্ত-ধূলা মুছিয়া সামনের এক দোকানের রোয়াকে তাকে বসাইয়া দিল। লালবিহারী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল—বিপক্ষদল তখন সেখান হইতে সরিয়া গিয়া দূরে ফেরি হাঁকিতেছিল। প্রমোদ বলিল,—কাগজগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে তোমার। তাইতো—তা কত লোকসান হলো?

বাবলা কোন কথা না বলিয়া দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া প্রমোদের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রমোদ বলিল,—কত কাগজ ছিল?

বাবলা বলিল,—বেশী নয়—এক টাকা পাঁচ সিকের হবে…

লালবিহারী বলিল,—বিক্রীর পয়সা আছে তো, না পথে পড়ে গেছে?

বাবলা বলিল,—পড়ে যায় নি, আছে—এই বলিয়া সে ট্যাঁক দেখাইল; ট্যাঁকের গেঁজেয় পয়সা ছিল—সেগুলা পড়িয়া যায় নাই।

প্রমোদ বাবলার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল,—তোমার ও কাগজগুলো আমিই কিনলুম—তার দাম নাও।

বাবলা বলিল,—না, তা আমি নেব না। আপনি তো কাগজ কেনেন নি।

প্রমোদ বলিল,—ঐগুলো ছেঁড়া ধুলো-মাখা যা আছে আমায় দাও—আমি নেব। আমি ঐ ছেঁড়া কাগজই কিনবো!

বাবলা বিস্ময়ে প্রমোদের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রমোদ বলিল,—এবার হলো তো? দাও, কাগজ দাও, দিয়ে টাকা নাও।

বাবলা বলিল,—এ কাগজ বিক্রী হবেনা আর—!

প্রমোদ বলিল—আমি ঐ কাগজই নেব। দাও আমায়।

বাবলা প্রমোদের সঙ্গে কত তর্ক করিবে! অগত্যা ছেঁড়া কাগজগুলাই তার হাতে তুলিয়া দিল। টাকাও তাহাকে লইতে হইল—প্রমোদ যে-রকম নাছোড়বন্দা, কি আর করিবে সে! উপায় ছিল না!

প্রমোদ তখন তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বাড়ী কোথায়?

বাবলা বলিল,—বাদুড়বাগানে।

প্রমোদ বলিল,—তুমি এখানে রোজ কাগজ বিক্রী কর?

বাবলা বলিল,—হ্যাঁ।

প্রমোদ বলিল,—বেশ, আমি রোজ তোমার কাছে কাগজ কিনবো—যত রকম কাগজ থাকবে, সব রকমই একখানা করে—কেমন?

হাসিয়া বাবলা বলিল,—আচ্ছা।

তারপর সামনেই একটা ট্রাম চলিয়াছে দেখিয়া প্রমোদ টক্ করিয়া তাহাতে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বাবলা তার পানে চাহিয়া রহিল। প্রমোদ তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিলে তার পকেট হইতে প্রকাণ্ড ব্যাগটা পথে পড়িয়া গেল…প্রমোদের সেদিকে হুঁসও ছিল না। বাবলা চকিতে তাহা দেখিয়া ব্যাগটা কুড়াইয়া লইল—ও খানিকক্ষণ নিরুপায়ভাবে চলন্ত ট্রামের পিছনে ছুটিল। ট্রাম বহুদূরে চলিয়া গেলে সে বিস্মিতভাবে দাঁড়াইল; পরে যখন প্রমোদকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিল না, তখন সে গিয়া একটি গলির একধারে বসিয়া পড়িয়া ব্যাগ খুলিল। ব্যাগে দশ টাকার নোট ছিল পাঁচখানা; তা ছাড়া টাকা পয়সা আধুলি সিকি অনেকগুলা! তাইতো, উপায়? কি করিয়া এ ব্যাগ ফিরানো যায়! বাবলা ভাবিতে লাগিল।

চট্ করিয়া তার মনে পড়িয়া গেল, কাল তো তিনি কাগজ কিনিতে আসিবেন, সেই সময় ফিরাইয়া দিলে চলিবে! সে ব্যাগটা লইয়া গোলদীঘির মধ্যে ঢুকিল। হাতে কাগজ ছিল না—কাজ, নাই! সে ভাবিল, বাড়ী ফিরিবে…কিন্তু

ফিরিবার পূর্ব্বে সে আবার ব্যাগটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ব্যাগের মধ্যে একটা কার্ড ছিল, তাহাতে একটা নামও লেখা রহিয়াছে, ঠিকানাও এই আছে যে! আমহার্ষ্ট স্ট্রীট! বাঃ, এ তো তার বাড়ীর কাছেই!

বাবলা তখন উঠিয়া সেই ঠিকানার খোঁজে চলিল। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে প্রমোদের বাড়ী গিয়া খোঁজ লইয়া সে জানিল, প্রমোদ বাড়ীতে নাই। সে ভাবিল, চাকরদের কাছে ব্যাগটা দিয়া আসিবে কি?…পরক্ষণেই মনে হইল, না, যদি তারা না দেয়! যদি তারা টাকা পয়সা কিছু সরাইয়া লয়! তার চেয়ে নিজে হাতে করিয়াই এ ব্যাগ প্রমোদকে দিবে সে! একটা বিজয়ের আনন্দ-গর্ব্বেও তার প্রাণটাকে নাড়া দিল। প্রমোদ কত খুসী হইবে! যিনি তাকে ঐ গোঁয়ার গোন্দিদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ছেঁড়া কাগজগুলা লইয়া টাকা দিয়াছেন, তাঁর এ করুণার বিনিময়ে…সে যে এ মস্ত আনন্দ দিয়ে তাঁকে! বাবলা প্রমোদের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া রহিল। মনের মধ্যে নানা চিন্তা কল্পনার রঙে রঙীন হইয়া তার বিচিত্র পরশে বাবলাকে মাতাইয়া তুলিল!

প্রমোদ বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পথে গ্যাস জ্বলিতেছে—রাস্তার ওধারের একটা বাড়ী হইতে পিয়ানোর ঝঙ্কার উঠিয়াছে—সে সুরের হাওয়ায় বাবলার ছোট্ট মনটুকু কেমন এক স্বপ্নে ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ তার হুঁশ হইল যখন প্রমোদের স্বর তার কাণে গেল। প্রমোদ ট্যাক্সি হইতে নামিয়া

বাবলাকে সেখানে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি এখানে এলে কি করে?

বাবলা আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া ব্যাগটা বাহির করিয়া প্রমোদের হাতে দিল। বলিল, আপনি ট্রামে ওঠবার সময় আপনার পকেট থেকে পড়ে গেছল!

প্রমোদ বলিল,—তুমি রেখেছিলে? বাঃ! প্রমোদ ব্যাগ লইল।

বাবলা বলিল,—এতে আপনার নাম লেখা আছে কিনা দেখবো বলে আমি ব্যাগ খুলে দেখেছিলুম! পয়সা-কড়ি ঠিকই আছে—

প্রমোদ এই দরিদ্র বালকের সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ ও আনন্দিত হইল। সে আদর করিয়া বাবলার হাত ধরিয়া বলিল,—এসো আমার সঙ্গে, আমার মার কাছে নিয়ে যাই। মা খুব খুসী হবেন তোমায় দেখে।

বাবলা আনন্দ-পূর্ণ চিত্তে প্রমোদের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। প্রমোদ তাকে উপরকার ঘরে বসাইয়া মাকে ডাকিল। মা আসিলে প্রমোদ বাবলার পরিচয় দিয়া বলিল,—ভারী ভালো ছেলে মা এটি। গরিবের ঘরে পয়সার লালচ করে, তবু এমন নির্লোভ! ইচ্ছা করলেই ব্যাগটা নিতে পারতো তো!

প্রমোদের মা বলিলেন,—বেঁচে থাকুক! গরিবের ঘরে জন্মেছে বলেই তো আর বদ হয় না মানুষ—! ভদ্রঘরের ছেলে, অভাবে পড়ে কাগজ বেচে! সাধুতা তো ভদ্র ঘরেরই একচেটে নয়।

প্রমোদের মা তখন তার মা-বাপের পরিচয় লইলেন। তার কোথায় বাড়ী, কে আছে। বাবলা পরিচয় দিল। মার অসুখের কথা বলিবার সময় তার দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর অশ্রুর পরশে মৃদু হইয়া আসিল।

প্রমোদ বলিল,—তুমি লেখাপড়া করতে চাও যদি তো কর না কেন! আমি তোমায় খরচ দেব। এমন বুদ্ধি, এমন ভালো মন তোমার" লেখাপড়া কর! কেমন?

বাবলা জানলার গায়ে ঝোলানো বিচিত্র পর্দাটা লক্ষ্য করিতেছিল, নানা রঙের কাঁচের থালা বাতাসের দোলা পাইয়া ঠিন্‌ঠিন্‌ রাগিণী তুলিয়াছে! প্রমোদের কথায় ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না।

প্রমোদ বলিল, কেন পড়লে কত শিখবে—

বাবলা হাসিয়া বলিল,—আমার পথে পথে কাগজ বিক্রী করতে ভালো লাগে আমার লালু মামাও বেচে, তাই দেখেই তো আমার ইচ্ছা হলো! তাছাড়া আমার মার যা অসুখ, পড়তে গেলেই মন খারাপ হয়ে যায়। এ কাগজ বেচে যে পয়সা পাই তাতে মার জন্যে এটা সেটা কিনে নিয়ে যাই, নাহলে পয়সায় আমার দরকার মিটতো! ঠাকুমা পয়সা দেয়।

এই ছেলেটিকে দেখিয়া প্রমোদের তাকে ভারী ভালো লাগিয়াছিল কথা কহিবার মধ্যে এমনি একটা সতেজ ভঙ্গী আছে যে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় ছেলেটির বুদ্ধি অসাধারণ,

মমতাও তার প্রাণে জ্বলজ্বল করিতেছে—অথচ কেমন একটা এলোমেলো ভাব! কোন জিনিষে বেশীক্ষণ যে মনোযোগ দেয় না—এটা ওটা এক নিমেষে দেখিয়া লয়। চটপটেও ছেলেটি তেমনি!

প্রমোদের মা খাবার আনিয়া বলিলেন,—খাও বাবা···

প্রমোদ বলিল,—চা খাবে, আমার সঙ্গে?

বাবলা বলিল,—খাব।

বাবলা চা পান করিল, পান করিয়া বলিল,—বেশ লাগলো তো! এ কখনো আমি খাইনি আগে!

প্রমোদ বলিল,—খাবার খাবার খাও। বাবলা খাবারও খাইল—তারপর রাত্রি দীর্ঘ হইতেছে দেখিয়া প্রমোদ তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—তোমার মার জন্যে কিছু কিনে নিয়ে যেয়ো—

বাবলা বলিল,—ধেৎ, টাকা কিসের? দরকার নেই তো।

প্রমোদবলিল,—আমি তোমার বড় ভাই, আমি দিচ্ছি, নিতে হয়—না বল্‌তে নেই। নাও। তারপর আমি তোমার সঙ্গে তোমার মাকে একদিন দেখতে যাব। এসে আমায় নিয়ে যেয়ো। বুঝলে? এ টাকা নাও, তোমার মার জন্য দিচ্ছি—

এই স্নেহের দান বাবলা ফিরাইতে পারিল না। সে টাকা লইল এবং লইয়া এমনি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রমোদের পানে চাহিল যে সে দৃষ্টি গিয়া প্রমোদের মর্ম্মে বিঁধিল। প্রমোদ তাকে বলিল—আবার তুমি এসো। যখনই সময় পাবে, এসো। তোমার বাড়ী তো কাছেই—বাড়ী যাবার সময় এসো এখানে। কেমন, আসবে ত?

বাবলা বলিল,—আচ্ছা।

২৬

হেদায়েৎ আসিয়া তার পরাজয়ের কাহিনী খুলিয়া বলিল, তার এক উকিলের কাছে। এই উকিলটির সহিত তার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী। উকিলটি আজ পাঁচ-ছয় বৎসর আদালতে বাহির হইতে সুরু করিয়াছে। প্রথম-প্রথম মামলা-মকর্দ্দমা সে বড় একটা পাইত না। কারণ বার-লাইব্রেরীতে তার ঘেঁষ কেহ সহিতে পারিত না। সে ছিল পরশ্রীকাতর; তার উপর সে অপরের মক্কেলের পিছনে নিজে লাগিয়া অর্থাৎ তার গৃহে গিয়া বিনা পয়সায় তার মকর্দ্দমা করিয়া দিবে এমনি সর্ত্তে মক্কেল ছিনাইয়া লইত। এ কথা বার লাইব্রেরীতে প্রকাশ হইলে তাকে লাইব্রেরী হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য তুমুল আন্দোলন ওঠে; সে তখন বেগতিক দেখিয়া করজোড়ে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কাজেই লাইব্রেরী সদস্য-তালিকা হইতে নাম কাটা হইতে সে যাত্রা রেহাই পাইল।

ইহার পর হইতে সে তার কাজের ধারা দস্তুরমত গোপনে বাইতে সুরু করিল। কলিকাতার বড় বড় বদমায়েস, চোর কোকেনওয়ালার বাসায় গিয়া তাদের গায়ে পিঠে

হাত বুলাইয়া তাদেরও বশ করিতে লাগিল। তারাও বর্ত্তাইয়া গেল। এমনি একটা গৃহপালিত উকিল পাইলে কে আর তাকে ছাড়িয়া দেয়! কাজেই এ উকিলটিকে তারা কায়েমীভাবে আশ্রয় দান করিল। উকিলটির নাম বৃন্দাবন সামন্ত।

এই উকিল বৃন্দাবন সামন্তর পরামর্শেই হেদায়েৎ হাকিম বীরেন্দ্রবাবুর কাছে ফলের ডালি লইয়া গিয়াছিল এবং তাঁকে ঘুষ দিবার প্রস্তাবও উত্থাপন করিয়াছিল। বৃন্দাবনের বিশ্বাস, টাকায় বশ করা যায় না, এমন লোক দুনিয়ায় নাই। টাকা দিলে সকলকে দিয়াই সব কাজ করানো যায়, সে কাজ যত কঠিনই হোক! নিজের চরিত্রের মাপকাঠি দিয়া সে দুনিয়ার তৌল করিত। নিজে যেমন পয়সা পাইলে কোন কাজ করিতে হঠিত না, তেমনি সে ভাবিত টাকার বশ সকলেই! এ জীবটিকে কোর্টের অপর উকিলের সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; কয়েকজন হাকিমও তাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই বৃন্দাবন ছিল হেদায়তের প্রধান মুরুব্বি। হেদাতের পরাজয়ের কাহিনী শুনিয়া বৃন্দাবন বলিল,—বটে তোমায় হঠিয়ে দেছে! আচ্ছা, জব্দ কর আগে ওর হবু জামাই ব্যারিষ্টারকে ছাড়িয়ে!

কথাটা গিয়া উকিলদের বৈঠকে সে খুব সাবধানেই পাড়িল। বড় উকিলরা চটিয়া বলিলেন,—এ মকর্দ্দমা ও ঘরেই রাখতে হবে। অন্য ঘরে গেলে মুস্কিল! জানো ত, অন্য ঘরে পুলিশ-চালানী কেশ, সাজা না হয়ে যাবে না!

বৃন্দাবন কহিল,—কিন্তু এ ঘটনার পরে কেশটা—

সিনিয়র উকিল ধমক্ দিয়া বলিলেন,—এঁর কাছে সুবিচার পাবে যেমন, তেমন আর কোথাও নয়। সাক্ষীর জবানবন্দী ওজন করে ঠিকঠাক বিচার করা—এ আর কোথাও হবে না। এ ঘর থেকেও মামলা অন্য ঘরে নেওয়া যায় না! বিশেষ শক্ত কেশ! সাক্ষীদের হাত করতে পারলেই আশা—! তার উপর প্রমোদকে ছাড়া হতে পারে না।—ও পরামর্শ ওকে দিলে কে—হাকিমের বাড়ী যাওয়া ডালি নিয়ে? ছিঃ!

ধমক খাইয়া বৃন্দাবনের মুখ এতটুকু হইয়া গেল—কিন্তু কথাগুলা তিক্ত হইলেও বৃন্দাবন সেগুলা হজম করিল, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া!

তারপর মামলার দিন সিনিয়ার উকিল হেদায়েতের নির্বুদ্ধিতার জন্য বীরেন্দ্রবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, এ মামলা তাঁর ঘরেই থাকিলে ভালো হয়। মামলাটি জটিল ...বীরেন্দ্রবাবুর কাছেই সুবিচার হইবে।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—কিন্তু ও ঘটনার পরও আপনাদের বিশ্বাস হয়, আমার কাছে মামলা রাখতে?

সিনিয়র উকিল বলিলেন,—আপনার উপর আমাদের বিশ্বাস চিরদিনই অটুট! পার্টির কোন ক্ষতি হবে না—এ ঘরে মামলা চললে।

পত্র ঘাঁটিয়া মামলা চালাইতে লাগিলেন, আর বৃন্দাবনউকিল সাক্ষী ভাঙ্গাইয়া আরো নানা নোংরা কাজ করিয়া গোপনে তদ্বির করিতে লাগিল। কিন্তু এই বিপুল চেষ্টা-সত্ত্বেও মামলা হারের পথেই গড়াইয়া চলিল।

সাক্ষীদের জেরা প্রভৃতি হইয়া গেলে আসামী পল্টু বলিল, সে নির্দ্দোষ; শুধুই নির্দ্দোষ নয়—ফরিয়াদী যে সময় মারপিট হইয়াছে বলিয়াছে, সে সময় পল্টু উকিল বৃন্দাবনবাবুর কাছে বসিয়া একটা দলিল লেখাইতেছিল।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—বেশ, তাহলে বৃন্দাবন বাবু এসে সাক্ষী দিন।

পল্টুর পক্ষের উকিলরা বলিলেন,—সেই সাক্ষীই দেব আমরা। তখন বৃন্দাবন বক্সে উঠিয়া হলফ লইয়া সেই সাক্ষ্যই দিল, কিন্তু পুলিশের পক্ষের জেরায় এমন বিশ্রী গোল পাকাইয়া ফেলিল যে তা শুনিয়া লজ্জায় অপর উকিলদের মাথা হেঁট হইয়া গেল!

বীরেন্দ্রবাবু রায় দিবার সময় বৃন্দাবনবাবুর জবানবন্দী স্পষ্টভাবে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া সেটা একেবারে নির্ভর করিবার উপযুক্ত নয় বলিলেন। এবং পল্টুর দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময় তার উকিলেরা বলিলেন,—এটা ওর প্রথম অপরাধ, এবং আসামীর বয়স কম,—ইহা ভাবিয়া মুচলেকায় আসামীকে যদি ছাড়িয়া দেন, তবেই ছেলেটার ভবিষ্যৎ মাটী হইয়া যাইবার ভয় থাকে না, তার ভালো হইবারো কিছু আশা থাকে!

বীরেন্দ্রবাবু ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তিনি বিশেষ ভাবিয়া এ অনুরোধ রক্ষা করিতে অক্ষম! কারণ এইটাই পল্টুর প্রথম অপরাধ নয়—তাছাড়া যে-সংসর্গে সে আছে, তাহাতে শুধরাইবার সুযোগও কম। তবে জেলে থাকা—বদ্‌মায়েসদের সঙ্গেও দীর্ঘকাল পল্টুকে তিনি থাকিতে দিতে চান্ না—সেইজন্য পল্টুর মোটা টাকা জরিমানা ও পনেরো দিনের কারাদণ্ড, ইহাই হইল তাঁর আদেশ!

এ আদেশে হেদায়েৎ আর-একবার স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার লোকজনকে কত মামলায় এর চেয়ে কত কম পয়সা ব্যয় করিয়া সে সাজার হাত হইতে বাঁচাইয়াছে, আর এ তার ছেলে, পল্টু! তার জন্ম এত পয়সা ব্যয় করিয়াও তাকে বাঁচাইতে পারিল না! সে রাগিয়া গেল বৃন্দাবন উকিলের উপর! তারি পরামর্শে জলের মত সে অজস্র পয়সা ব্যয় করিয়াছে, উকিল কৌঁসুলী—বৃন্দাবন যার নাম করিয়াছে, তাকেই মোটা টাকা ফি দিয়া ছেলের পক্ষে এন্‌গেজ্‌ করিয়াছে! তার এক বন্ধু বলিল, ঐ উকিলের সল্লায় হাকিমের বাড়ী ডালি নিয়ে গেছলি তাতেই হাকিম পল্টুকে দোষী সাব্যস্ত করেছে গোড়া থেকে।

বৃন্দাবন আসিয়া হেদায়েৎকে বলিল,—নকল নিয়ে হাইকোর্ট করে দাও!

হেদায়েৎ চেঁচাইয়া উঠিল—যান বাবু আপনার সলায় হাকিমের বাড়ী গিয়েই এই হলো! হাকিম ভাবলে, পল্টু দোষী নিশ্চয়, নাহলে পয়সা দিতে আসবে কেন!

বৃন্দাবন দেখিল, হেদায়েৎ তার উপর চটিয়াছে! সে বলিল,—পাগল! হাকিম বদমায়েসী করে সাজা দেছে। তারও রাগ হইয়াছিল, বীরেন্দ্রবাবুর উপর। রায়ে অমন করিয়া তার

সাক্ষ্যটাকে উড়াইয়া দিয়াছেন অর্থাৎ তাকে ঘোরালো কথায় মিথ্যাবাদীই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মিথ্যা কথা সে বলিয়াছে, সন্দেহ নাই, তবু তার একটা পোজিশান্ আছে ত! তবু তার সাক্ষ্যটাকে অগ্রাহ্য করা! সে বলিল,—আরে, ও সব বাজে কথা। তুমি খরচ দাও—নকল বার করে ওদিকে হাইকোর্ট করে দাও আর এদিকেও আমি বীরেন হাকিমকে একটু শিক্ষা দেবার ফন্দী বার করছি!

হেদায়েৎ বলিল,—হাইকোর্ট করলে ফল হবে?

বৃন্দাবন বলিল,—আলবৎ! তবে এ সব কৌঁসুলি দিয়ে নয়! ভালো কৌঁসুলি আমি ঠিক করে দেব। আমার সাক্ষী হাইকোর্ট গ্রাহ্য করবেই।

অসীম নিরাশার মধ্যে আশার আভাষ পাইয়া হেদায়েৎ বলিল,—তবে নকল নাও, বাবু হাইকোর্টই কর!

সেদিন কোর্ট হইতে প্রমোদ বাড়ী ফিরিয়া দেখে, বাবলা রোয়াকে বসিয়া আছে—তার মুখ শুষ্ক—হাতে খবরের কাগজের বাণ্ডিল।

প্রমোদ বলিল,—কি হে বাবলু, খপর কি! বসে যে?

বাবলার চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিল। সে বলিল,—ভালো লাগছে না কাজ করতে, তাই এখানে চলে এসেছি।

প্রমোদ বলিল,—কেন? কাজ করতে ভাল লাগছে না কেন?

বাবলা ম্লান দৃষ্টিতে প্রমোদের পানে চাহিয়া বলিল,—আমার মার অসুখ বেড়েছে।

প্রমোদ বলিল—ডাক্তারের কাছে গেছলে?

বাবলা বলিল,—তিনি দেখে গেছেন, ওষুধ দেছেন—কিন্তু অসুখ কমেনি…বাড়ীতে দেখতে পারলুম না, মার কষ্ট।

প্রমোদ বলিল,—তুমি ও ঘরে এসো আমার সঙ্গে। খাবে কিছু?

বাবলা বলিল,—খেতে ইচ্ছে করছে না।

মমতায় প্রমোদের মন গলিয়া গেল। আহা, বেচারী মার অসুখের যাতনা দেখিয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রমোদ বাবলাকে লইয়া উপরে গেল। মুখ হাত ধুইয়া বসিলে—চা আসিল, লুচি আসিল। প্রমোদ বলিল,—আর এক পেয়ালা চা, আর এক রেকাবী লুচি তরকারী আনো।

প্রমোদের মা আসিলেন, আসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কে এসেছে, বল্ দেখি পমু…

প্রমোদ বলিল,—কে মা?

মা বলিলেন,—বিভা এসেছে, অনেকক্ষণ। যাবে যাবে করছিল, বীরেন বাবুর বাড়ী ফেরার সময় হয়েছে কি না!

প্রমোদ বলিল,—বিভা এসেছে!

মা বলিলেন,— এইবারে কথাটা পাকা করে ফেলি, বাবা, কেমন ?

প্রমোদ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—পাগল হয়েছ মা তুমি !

মা বলিলেন,—কেন, পাগল কিসে ?

প্রমোদ বলিল,—আমি ওর যোগ্য নই মা। ও কোন্ রাজার ঘরে পড়লেই তবে মানায়। আমি একটা সামান্য লোক...

মা গম্ভীর মুখে প্রমোদের পানে চাহিয়া রহিলেন—প্রমোদও নীরব ; আর বাবলা দুই জনের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া—এমন সময় বিভা সে কক্ষে প্রবেশ করিল। সকলেই এক দৃষ্টে তার পানে ফিরিয়া চাহিল। বাবলা দেখিল, এ যেন রূপকথার রাজকন্যা তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে অপলক নেত্রে বিভার পানে চাহিয়া রহিল।

বিভা ডাকিল,—মা...

মা বলিলেন,—কেন মা ?

বিভা বলিল,—আমি তাহলে আসি। একটা গাড়ী আনিয়ে দিতে বলুন না।

মা বলিলেন,—বলি, তুমি বসো...মা চলিয়া গেলেন।

বিভা লজ্জা-রক্তিম মুখে চুপ করিয়া একটা চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রমোদ বলিল,—বসো বিভা,—দাঁড়িয়ে রইলে যে !

বিভা বলিল,—বসছি এই যে ···

বিভা বসিল। প্রমোদ বলিল,—এই সেই বাবলু—যে ছেলেটীর কথা তোমায় বলেছিলুম ! ভারী ভালো ছেলে ! তারপর বাবলার পানে চাহিয়া বলিল—এ কে চেনো, বাবলা ?

বাবলা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ !

প্রমোদ বলিল,—ইনি

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া একমুখ হাসিয়া বাবলা বলিল,—আপনার বৌ !

প্রমোদ চমকিয়া উঠিল, বিভা লজ্জায় মাথা নত করিল। ঘর একেবারে স্তব্ধ !

তার পর জোর করিয়া প্রমোদ কথা কহিল। এ অপ্রতিভ ভাব, এ প্রসঙ্গটাকে উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, প্রমোদ বলিল—দূর পাগল—ও কথা বলতে আছে···তোমার মাকে আমি একদিন দেখতে যাব বাবলু—তাঁর এমন অসুখ···তুমি এসে আমায় নিয়ে যাবে···

কথাটা বলিয়া প্রমোদ বিভার পানে চাহিল। বিভার কর্ণমূল তখনো লজ্জায় রাঙা হইয়া আছে ! ঠিক এমনি আভাষ মাও তাকে আজ দিয়াছেন যে ! লজ্জায় বিভার সারা অঙ্গ ছম ছম করিতেছিল। সে লজ্জা কাটে নাই বলিয়া, প্রমোদ বাড়ী ফিরিতে, সে চট্‌ করিয়া প্রমোদের সামনে আসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। তার উপর বাবলার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ! সে লজ্জায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

খেয়াল খাতা

রবীন্দ্র বারমাস্যা

সম্বৎসর

১। এমনি ধীরে একটী করে কাটিছে দিনরাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল লইয়া যুথী জাতি॥
সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝরঝর,
কাননে ফুটে নবমালতী, কদম্ব-কেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা-মালিকা,
সকল বন আকুল করে শুভ্র-শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে দীর্ঘ দুখ-নিশা,
শিশির-ঝরা কুন্দ-ফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুণ মাস আবার এল বহিয়া ফুল ডালা।
জানালা পাশে একেলা বসে ভাবিছে রাজবালা —
কে পরালে মালা।

জ্যৈষ্ঠ

১। দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি যে জানে॥

* * * *

২। দুপুরে খরতাপ, বকুল শাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে॥

* * * *

৩। গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটা ছোঁটা কুর্ত্তি।
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে ভারি উগ্র মূর্ত্তি॥

* * * *

৪। পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহা পিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে॥

দিগন্ত বিস্তৃত যেন ধুলিশয্যা পরে
জরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে ॥

*　　*　　*　　*

৫। তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি !

*　　*　　*　　*

৬। সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম—
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।

*　　*　　*　　*

৭। বসি আঙিনার কোণে　　গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি ;
বাঁধাকূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি ॥

(ইন্দিরা দেবীর সঙ্কলন)

*　　*　　*　　*

বিলিতি ক্লাব্

লণ্ডনে অসংখ্য Dining Club আছে, এ-সমস্ত ক্লাবের কোনো নির্দ্দিষ্ট ঘরবাড়ী নেই, সপ্তাহে কিম্বা মাসে একদিন একটা খেলো রেষ্টোর াঁতে গিয়ে সবাই খাবার কিনলে ও বেশ জুৎ করে' বসে' আড্ডা দিয়ে চল্‌ল। এ সময়টুকুতে খাওয়াও হোল—ফূর্ত্তিও হোল, নানান্ বিষয় তর্ক হোল, আলোচনা হোল, অথচ ঘর ভাড়া কিম্বা অন্যান্ত চেয়ার-টেবিল ইত্যাদির জন্ম কিছু ভাড়াও লাগ্‌লনা।

এ-রকম ঢের ক্লাব্ আছে, এক-একটা এক-এক ধরণের। একটা ক্লাব্ ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল—বিশিষ্ট বিদেশী ভদ্রলোকদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করা। লর্ড কার্জ্জন এ-রকম একটা ক্লাবের সভ্য ছিলেন।...

একটা Dining Club আছে, তার নাম হচ্ছে, Nobodys Friends। এই ক্লাব্‌টি প্রায় একশ' বছর ধরে টিকে আছে, সভ্যরা বছরে একদিন করে' নিয়মিত ভাবে মিলিত হন, সেদিন প্রকাণ্ড মজ্‌লিস বসে ও চমৎকার জলসা চলে। William Stevens বলে' একজন মোজার ব্যবসাদার এই ক্লাবটি স্থাপনা করেন, Lord Balfour এই ক্লাবের একজনবিশেষ সভ্য।

Optimists বলে' লণ্ডনে একটা নতুন ক্লাব্ খোলা হয়েচে। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্চে—যত সব মুখভার, মনমরী-ভাব, মীইয়ে—জুড়িয়ে—কালিয়ে—থাকার ভাবকে ঝেঁটিয়ে তাড়ানো; এর সভ্যরা ভারী জীবন্ত প্রাণবান ও [illegible]

বরদাস্ত করতে পারে না। অন্যান্য ক্লাবে অশ্লীল কথা বললে জরিমানা দিতে হয়, কিন্তু এই Optimists ক্লাবে কেউ যদি একটু অসন্তোষের ভ্রুকুটি করেন, কেউ যদি আধ ঘণ্টার মধ্যে না হাসেন—তবে জরিমানা দিতে হবে।...

একজন সঙ্গীতজ্ঞ ভদ্র লোক You be quiet বলে একটা ক্লাব্ খুলেচেন। চাঁদা খুব অল্প, বছরে মোটে পাঁচ শিলিং। সভ্যরা এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আখা করলেই প্রত্যেকবার হুইস্কি চুরুট্ ও সোডা পাবেন। সভ্য হবার একটা-দায়িত্ব আছে। দায়িত্বটা হচ্চে এই, প্রত্যেক সভ্যের এই সভাপতিটির অসংখ্য বিষয়ের স্বার্থপর মতামত্ নিঃশব্দে নির্ব্বিবাদে শুনে মেনেও যেতে হবে, তাঁর মত্ কোনো মতেই নিজের মত্ দিয়ে খণ্ডন করতে পারবেন না।...

অনেক বছর আগে Philomaritan বলে' একটা ক্লাব্ হয়েছিল—কতিপয় বিবাহিত ভদ্রলোকদের চেষ্টায়। তাঁরা এই ক্লাবে চাঁদা দিতেন এই সর্ত্তে যে, তাঁরা চোখ বুজলে তাঁদের বিধবারা বেশ একটা মোটা টাকা পাবেন। তাঁরা সবাই মরেছেন, এবং তাঁদের জমানো টাকাও তাঁদের উত্তরাধিকারিণীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েচে।...

Ancient Order of Shepherds বলে' একটা ক্লাব আছে। তার নিয়ম ভারী অদ্ভুত! ক্লাবে আস্বার আগে কোনো সভ্য যদি দাঁড়ী কামিয়ে না আসেন—তবে তাঁকে এক পেনি জরিমানা দিতে হবে।

চার্লস্ ডিকেন্স এর অনুরাগী সাহিত্য-সেবীরা Boz Club স্থাপনা করেচেন। চাক্রী থেকে তাড়িয়ে-দেওয়া জাহাজের কর্ম্মচারীরা করেচে Castaways।

স্কাউট্রা করেচে Last Legion ক্লাব। Polyglot ক্লাব এর সভ্যরা অনেক ভাষা বল্‌তে পারেন—Frothblowers club এর সভ্যরা সবাই হরদম্ bear টান্‌তে মজবুত, আর Faithing League এর সভ্যরা গরীব মেয়ে-দর্জ্জিদের একটা বাড়ী তৈরী করবার জন্য উঠে পড়ে' লেগে গেচে।

এ সম্পর্কে আমাদের বাংলা দেশের কথা মনে পড়া খুব স্বাভাবিক। আমরা এত ঘরকুণো ও আপ্‌নাতে আপ্‌নি চুপ করে থাকা এত ভালোবাসি যে, কোনো একটা সঙ্ঘ গড়ে তুলে তাতে সবাই মিলিত হয়ে ভাব ও বন্ধুত্বের বিনিময়ে নানা উপায়ে স্বাস্থ্যকর মানসিক চর্চ্চা ও আলোচনা করে আনন্দ লাভ করবার আমাদের ইচ্ছা নেই। আমাদের সাহিত্যিকেরাও সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন, তাঁদের মধ্যে সব-সময় নিয়মিত ভাবে গোষ্ঠী আলাপন হয় না, তাতে সাহিত্যের দিক থেকে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। ওরকমভাবে মিলিত হওয়া থেকে মনের স্ফূর্ত্তি বেড়ে যায় অপরিসীম, আর খোরাক্ ও মেলে চূড়ান্ত। আমাদের দেশে বিলেতের মতো একটা Optimist ক্লাব খোলা উচিত,যত সব ন্যাকামী ঢং,মুখভার—উচ্চ হাসির ঢেউয়ে ডুবিয়ে দিতে, যত সব বার্দ্ধক্য অক্ষমতা ও অথর্ব্বতাকে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে মাতিয়ে তোল্‌বার জন্য।

অচিন্।

রঙ্গ প্রদর্শনী পদাবলী

১

বঙ্গের রঙ্গের কথা কত আর ক'ব।
নিত্য হয় অভিনয় দৃশ্য নব নব।

২

এলেন বিলাত-ফের্তা গায়ে কোর্ত্তাকুর্ত্তি।
অর্দ্ধ গোরা, অর্দ্ধ কালা, বর্ণচোরা মূর্ত্তি॥

৩

কুর্দ্দয়ে দর্দ্দুর, যেন শার্দুলের নাতি।
দর্পে হালে কেঁচো, যেন সর্পের স্বজাতি॥

৪

পায়রা তোলে পাখম, শিখীর দেখি শিখি।
ঠোকর দিয়ে বলে কাক, "কেকা ডাকো-দিখি?

৫

নাসিকা বর্দ্ধন করি, মূষিকা-সুন্দরী,
কী সরেস করিণী সেজেছে, আহা মরি!

৬

জালা-মিছ্‌রি ফেলি থুয়ে খুদে-পিঁপড়েগুলি,
ঝোলা-গুড়ের সঙ্গে করে মরণ-কোলাকুলি॥

৭

এই সব দৃশ্য দেখি, বনি গিয়া জড়্।
কালের চতুর্থ-পাদে করিলাম গড়॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* * * * * *

মেয়েদের ব্যায়াম করা দরকার কিনা, আর কতটা বা দরকার—বিলাতে এই নিয়ে আজকাল খুব আলোচনা চলচে। অধিকাংশের মতে স্থির হয়েচে যে, ব্যায়াম নিশ্চয়ই দরকার; তবে তার সম্বন্ধে বিচার চাই। সব মেয়েরাই কিছু এক রকম ধাতে গড়া নয়—সকলেরই কিছু এক বিষয়েই প্রবৃত্তি বা ঝোঁক নেই; অথচ মেয়েদের স্কুল কলেজে যেখানে হকি ফুটবল বা আর কোন খেলার ব্যবস্থা আছে সেখানে সকলকেই ওই সব খেলায় যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। ভিন্ন স্থানের ভিন্ন রকম মাটিকে পিটে ইঞ্জিন যেমন সবটাই এক রকম করে, তেমন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এই রাস্তা পেটা ইঞ্জিনের শিক্ষা চলবে না। আর চলবেনা—খুব শ্রমসাধ্য যে সব খেলা ধুলা। অধিকাংশ লোক বলেন হকি ফুটবল বা টেনিস খেলায় প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার চেয়ে, ক্রিকেট খেলাই মেয়েদের পক্ষে ভাল। এতে শারীরিক—

শ্রমের কষ্ট কম, স্নায়ুর ওপর বেশী চাপ এতে পড়ে না, অথচ পেশীসমূহ এতে উন্নত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। তা ছাড়া ক্রিকেট খেলায় দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, মস্তিষ্কের দ্রুত কাজ-করবার নিপুণতা, ঠিক্ বিবেচনা শক্তি, আর ক্ষিপ্রকারিতা লাভ হয়।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

শ্রেয় ও প্রেয়

("মহামানব"—মোহিতলাল মজুমদার)

এস গো মহান্ অতীত সাক্ষ্য হে তথাগত
হের এ ধরণী মরণ-শাসনে মূর্চ্ছাহত
কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া মানব-রাজ
গাহ জয়, গাহ মানবের জয়, গাহ গো আজ!

(সবুজপাতার গান—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো শ্যায় গো কাণে মন্ত্রণা।
শুন্‌ছ কথা? বল্‌ছে "জগৎ মোক্ষ লাভের যন্ত্রণা
নয় সে শুধুই তত্ত্ব কথা, নয় সে মাত্র মত্ততা
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজ পত্র তা।"

(তমাললতা বসুর সঙ্কলন)

আশীষের বিষ

স্নান সারিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম।···পথের ধারে এক বৃদ্ধা ভিখারিণী কঙ্কালের মত শীর্ণ তাহার হাতখানি প্রসারিত করিয়া বলিল,—জয় হোক্ মা!

একবার পিছন-পানে চাহিলাম। দেখিলাম, শুভ্র বস্ত্র-পরিহিতা, সদ্যস্নাতা, নিরাভরণা তরুণী তার সিক্ত কুন্তল-রাশি পিঠের উপর ছড়াইয়া মাথার কাপড়টা প্রায় কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া তার দিকে আসিতেছে।...সদ্য-জাগ্রত প্রভাতের তরুণ অরুণের বিচ্ছুরিত সোনালি রশ্মি তার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে!...

বৃদ্ধা ভিখারিণীর কাতর উক্তিতে তরুণী থম্‌কিয়া থামিয়া আঁচল হইতে একটা পয়সা বার করিয়া বলিলেন,—এই নাও বাছা!

সাগ্রহে সে তার হাতখানি পাতিয়া পয়সাটি লইল; কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—জয় হোক্ মা, জয় হোক্! ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর।···

চকিতে তরুণীর সুন্দর মুখখানি ভরিয়া একটা ক্ষণিক পরিবর্ত্তনের কালো ছায়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। তার সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া একটা তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস বাহির হইল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে তার চলার পথে চলিতে আরম্ভ করিল। পিছন ফিরিয়া ভিখারিণীর নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, তার দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায়······আর সে তরুণীটি বিধবা, পুত্রহীনা!······

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

পূর্ব্ব-স্মৃতি

শ্রীমতী ভারতী সম্পাদিকা করকমলেষু

(নূতন ভারতী পড়িয়া)

আমি যে "ভারতীর" আন্তরিক শুভ-কামনা করি,—সে কথা কি আর মুখ ফুটে বলা প্রয়োজন ?

প্রতি কাগজের পিছনেই মানুষ আছে। আর ভারতী যাঁদের কাগজ, আকৈশোর তাঁদের মনের সংসর্গেই আমার সাহিত্যিক-মন গড়ে উঠেছে। তাই ভারতীর প্রতি আমার একটা পারিবারিক অনুরাগ আছে। যখন শুনলুম যে ভারতীর অন্তিম দশা উপস্থিত—তখন যেমন দুঃখিত হয়েছিলুম, আবার তেমনি সুখী হলুম—যখন শুনলুম যে তুমি তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে কৃতসংকল্প হয়েছ !

তার পর ভারতীর নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমি যে একজন মসীজীবি হয়ে উঠেছি, সে একমাত্র ভারতীর প্রসাদে।

আমি যখন M A পড়ি, তখন পাঁচজন সতীর্থের অনুরোধে আমি একটি সাহিত্যসভায়—জয়দেবের পদাবলীর উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। সেই আমার প্রথম লেখা। তার পূর্ব্বে আমি কখনো দু-ছত্র বাঙলা লিখিনি। এমন কি একটি মধুর-রসাত্মক শ্লোকও নয়।

সেই লেখাটি ছাপার অক্ষরে ওঠে—ভারতীর কৃপায়। তোমার মা তখন ও পত্রিকা সম্পাদন করতেন। তিনি যদিও লেখাটি না ছাপতেন,—তাহলে বোধহয় আমার জীবনের ধারা অন্য পথে বয়ে যেত,—কাগজের উপর বাঙলা কালীর আঁচড় কাটা আমার জীবনের প্রধান কাজ হয়ে উঠত না।

২

ভারতীতে ওপ্রবন্ধ যে প্রকাশিত হয়েছিল, এ কথা যখনই ভাবি, তখনই অবাক্ হই।—

প্রথমতঃ—লেখাটি হচ্ছে সাহিত্যসমাজে অজ্ঞাত কুলশীল একটি যুবকের হাতের প্রথম লেখা।—

দ্বিতীয়তঃ—সেটি অতি দুঃসাহসিক লেখা। যেখানে গীতগোবিন্দের কোমল কান্ত পদাবলী মহাকবিতা বলে গণ্য ছিল, যাঁর একটি পদ শুনলে সেকালে বহু সাহিত্যিক দশা প্রাপ্ত হতেন—সেই গীত গোবিন্দের উপর হাত তোলাটা যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার,—সে বিষয়ে উক্ত সাহিত্যসভার প্রায় সকল সভাই একমত ছিলেন। আমার বেয়াড়া মতামত

শুনে তাঁরা যুগপৎ রোষে ও ক্ষোভে, এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁদের হিষ্টিরিয়া হবার উপক্রম হয়েছিল ; অথচ এঁরাই ছিলেন সেকালের শিক্ষিত যুবকদের শীর্ষস্থানীয়।

তৃতীয়তঃ—লেখাটিতে সুরুচির কোনও খাতির রাখা হয় নি। গীতগোবিন্দ বাঙলায় অবিকল অনুবাদ করলে যে তা অশ্লীল হয়, সে জ্ঞান আমার পূর্ণ মাত্রায় ছিল, তথাপি আমি উক্ত প্রবন্ধে গীতগোবিন্দের অনেক শ্লোকের সংস্কৃত আবরণ খুলে ফেলতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই নি।—সমাজ ভয়ে বাক্‌রোধ হওয়াটা যৌবনের রোগ নয়।

এত দোষ থাকা সত্ত্বেও ভারতী যে ও লেখাটিকে অঙ্গীকার করেছিলেন,—তার ফলে আমি স্পষ্ট ভাষী লেখক হতে সাহসী হয়েছি।

এরপর লেখা আমি একেবারে ছেড়ে দিই। তুমিই আবার আমার হাতে জোর করে কলম তুলে দেও। ইতিমধ্যে আমার বয়েস অন্ততঃ দশ বছর বেড়ে গিয়েছিল, ফলে সংসার সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এ জ্ঞান আমার জন্মেছিল যে, লেখকের পক্ষে সত্য কথা বলাও যেমন কঠিন, পাঠকের পক্ষে সত্য কথা শোনাও তেমনি কঠিন। অবশ্য আমি সেই সত্যের কথা বলছি,—যে সত্য লেখকের অন্তরে আছে। বলা বাহুল্য ঐ সত্য নিয়েই সাহিত্যের কারবার। "দুয়ে দুয়ে চার হয়",—এই অকাট্য সত্য দর্শন বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত—সাহিত্যের নয়।

এতদিনে আমার আর একটি জ্ঞান লাভ হয়েছিল যে, হাসি মুখে অনেক কথা বলা যায়, যা গম্ভীর ভাবে বললে লোকের সহ্য হয় না। আর তাছাড়া আমার এই ধারণাও জন্মে যে, অনেক ক্ষেত্রে তর্ক করা বৃথা, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার মজুরি পোষায় না। এই কারণে আমি এবার সাহিত্যের আসরে নামলুম, বীরবল সেজে। কেন যে বীরবল সাজলুম, তার একটা লম্বা ইতিহাস আছে, সে কথা আর একদিন বলব। আশা করি সে আত্মকথা বলবার সুযোগ তুমি আমাকে দেবে। একটা বয়েসে আশার চাইতে স্মৃতি যে মানুষের মনকে বেশী অধিকার করে, এ সত্য অবশ্য তোমার অবিদিত নেই, আর সাহিত্যে আশার মত স্মৃতিরও স্থান আছে।

এখন আমার বক্তব্য এই যে,—প্রথম চৌধুরী ও বীরবল,—এ দুজনকে তোমরাই সাহিত্যের আসরে নামিয়েছ—আর সেই দুই ব্যক্তি আজও যথাশক্তি বাঙলার পাঠক সমাজকে কখনো রসিকতা করে হাসাচ্ছে, কখনো বিদ্রূপ করে রাগাচ্ছে, আবার কখনো কখনো তর্ক করে বিরক্ত করছে।—বিরক্ত করছে কথাটা আমি মোটেই বিনয় করে বলছি নে। সাহিত্যে মিছে কথা বলা আমার ধাতে নেই—আর বিনয় যে অধিকাংশ লোকের অধরে তাম্বুল রসের মত একটি ঝুঁটো ভূষণ তাকে না জানে। আমার মন চলতি মতের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে না—এইত হয়েছে মুস্কিল! তবে বাঙালী সমাজ মুখে না হোক, মনে মনে আমার মতামতকে যে অবজ্ঞা করেনা,—তার কারণ সে মত বাজারে নয়। আমার প্রথমলেখার ভিতরে যে গুণ অথবা দোষ ছিল, আমার আজকের লেখার ভিতরেও সেই গুণ অথবা দোষ

আছে আর সে বস্তুর নাম হচ্ছে individuality—ভারতী যদি প্রথম থেকেই আমাকে প্রশ্রয় না দিত, তাহলে খুব সম্ভবতঃ আমি এতদিনে ইংরাজী ভাষায় একজন ধনুর্দ্ধর পলিটিকাল লেখক হয়ে উঠতুম। ছেলেবেলা থেকে মাষ্টার মহাশয়দের মুখে শুনে আসছি যে আমি মুখস্থ করতে ওস্তাদ। আর যে মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী—তার পক্ষে ইংরাজী ভাষায় পলিটিক্স লেখা ত ছেলে খেলা।

৩

যা চ'লেছে, আর খুব জোরের সঙ্গে চ'লছে, তার ধাক্কায় আমার মন অনেক সময় পীড়িত হলেও যে সব-সময় বিচলিত হয় না, তার একটি প্রমাণ দিচ্ছি। ভারতী আবার ছবি-ছুট হয়েছে দেখে আমি যথার্থই খুসী হয়েছি। আর বাঙলার চলতি-সাহিত্যে ছবি যে বুক ফুলিয়ে চ'লছে তার প্রমাণ,—ছবি না থাকলে শুনতে পাই কাগজ চলে না। যে কারণেই হোক্ ছবি যে এখন একটা সংক্রামক রোগের মত, বাঙলার কাগজপত্রের দেহ আক্রমণ করেছে,—মাসিকপত্রের দেহ থেকে সাপ্তাহিক পত্রের দেহে, সাপ্তাহিক পত্রের দেহ থেকে দৈনিক পত্রের দেহে তা সংক্রান্ত হয়েছে, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য।

সাহিত্যের মত ছবি ও গানও যে আর্ট—তা আমি জানি, এবং দেশে আর্টের প্রচার ও লোক-সমাজকে আর্টিষ্টিক শিক্ষা দেওয়াও যে একটা সৎকার্য্য—তাও আমি সম্পূর্ণ স্বীকার করি। তবে সাহিত্যের কোলে ছবি বসিয়ে দেওয়াটা, শিশু চিত্রকলার লালন পালনের সদুপায় কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস ও উপায়ে ছবিকে শুধু সাহিত্যের আহ্লাদে ছেলে করে তোলা হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সিগারেটের প্যাকেটের ভিতর বিচিত্র ভঙ্গীর স্ত্রীমূর্ত্তি ঢুকিয়ে দেওয়া আর্টের কোন সাহায্য করা হয় না। কেননা ওসব ছবির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ঐ ছবির লোভ দেখিয়ে তামাকের বদলে ঘাস খাওয়ানো, এক কথায় ও চিত্র-সংযোগের উদ্দেশ্য আর্টিষ্টিক নয়—commercial। এর থেকে অনুমান ক'রছি—সাহিত্যেও চিত্রসংযোগের উদ্দেশ্য আর্টিষ্টিক নয়—commercial।

এর থেকে মনে ভেব না যে, আমি cmmercialism এর বিরুদ্ধে কোনও কথা বলতে চাই। এ জ্ঞান আমার আছে—যে পৃথিবীতে যে জিনিষই যত বড়, যত আধ্যাত্মিক, যত পেট্রিয়টিকই হোক্ না কেন, তার একটা স্পষ্ট economic basis আছে। যার চূড়া যতই অভ্রভেদী,যতই গগন চুম্বী হোক না কেন, সব মন্দিরের ভিত্তি মাটিতে গাঁথা আছে। তবে আমি এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয় মনে করি যে—আমাদের সাহিত্যের কোনও মূল্য নেই—তা শুধু ছবির সঙ্গে ফাউ কাগজের মত বাজারে বিকিয়ে যায়। পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ commercial ও সব চাইতে নিকৃষ্ট আর্টিষ্টিক দুটি দেশ হচ্ছে ইংলণ্ড ও আমেরিকা এবং এই দুই দেশের কাছ থেকেই আমরা এই ছবি চালানের বিদ্যা শিখেছি।

৪

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে ভারতী শতায়ুঃ হয়—এ হচ্ছে আমার আন্তরিক কামনা। কিন্তু কি করে যে কাগজের আয়ু বৃদ্ধি করতে হয়, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এ বিষয়ে যদি আমার কোনরূপ জ্ঞান থাকত, তাহলে "সবুজ পত্র" আর অকালে শুকিয়ে ঝরে পড়ত না। লিখতে যে আমার আলস্য নেই, তার প্রমাণ—গত দু-বৎসর আমি পাঁচখানি মাসিক, একখানি পাক্ষিক ও চারখানি সাপ্তাহিক পত্রের খোরাক জুগিয়েছি, আর আমার লেখা যে বাঙলার সাহিত্য সমাজে অগ্রাহ্য নয় তার প্রমাণ—এতগুলি কাগজ তা প্রসন্ন মনে অঙ্গীকার করেছে। এর থেকে বুঝতে পারছ যে—আমি নিজের কাগজ চালাতে না পারলেও অপরের কাগজ চালাবার কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি।

আমার লেখায় ভারতীর যদি কিছু সাহায্য হয়, তাহলে সে সাহায্য—চাইলেই পাবে। তবে আমার লেখা আমার লেখাই থেকে যাবে,—কোনও ব্যক্তি বিশেষের বা দলের তা প্রতিধ্বনি হবে না। "হবে না"—এই জন্যে বলছি, যে অদ্যাবধি তা যখন হয় নি, তখন ভবিষ্যতে সে লেখার যে চরিত্র বদলে যাবে, সে আশা কম। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। বাঙলার কোনও মাসিক পত্রই কোন দলের মুখপত্র নয়। বাঙলায় কোনও দলমত প্রচার করতে হলে—ইংরেজী ভাষায় দৈনিক পত্র প্রকাশ করতে হয়।

যাই হোক, বাঙলার সব পত্রেই নানা লেখকের নানা রকম মতামত প্রকাশ হয়। বাঙালীর মন কখনো কোনও ব্যারাকে গড়া হয় নি, তাই বাঙালীর মনের বৈচিত্র্য আছে,—আর বাঙলা সাহিত্যে সেই বৈচিত্র্যের প্রকাশ হওয়াটা স্বাভাবিক।—

বাঙালীর মন যে বহুকাল একমত আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেনা তার প্রমাণ—গত বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙালী জাত ক্রমান্বয়ে তার মত উল্টে ফেল্‌ছে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ কবি Heine ফরাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, ও জাতটা থেকে থেকেই এমনি উল্‌টো ডিগবাজি খায় যে, অপর অপর জাতের মনে ভয় হয় যে—এইবার জাতটে ঘাড়মোড় ভেঙ্গে পড়বে ও মরবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রতিবারই দেখা যায় যে, জাতটে—comes down on it feet। আমার বিশ্বাস যে আমাদের জাতটাও কতকটা ঐ চরিত্রের। বাঙালী কোনও এক পথ ধরে সোজা চলতে পারবে না—সে ডিগবাজি খেতে খেতেই অগ্রসর হবে।

বাঙালী জাতির মতের স্থিরতা না থাকলেও—মনের স্থিরতা আছে। অর্থাৎ আমাদের জাতের সকল মতামতের ভিতর থেকে একটা বিশেষ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি বল সে মনটি কি? তাহলে আমি তার definition দিতে পারব না, কারণ সে বস্তু—definite নয়। পৃথিবীতে definite হয় শুধু জড় পদার্থ। মন, প্রাণ ইত্যাদি পদার্থের ধর্ম্মই হচ্ছে—সকল definition অতিক্রম করা। জানি কথাটা খুব স্পষ্ট হল না। কিন্তু এ সত্য কি প্রত্যক্ষ নয় যে, মানুষের মনের শক্তি যে পরিমাণে সচল সেই অনুপাতে তার মত দৃঢ় হয়। বৃদ্ধের মতামত যে তার মাংসপেশীর মত regid এ কথা কে না জানে।

এখন আমার মতে ভারতীকে সঞ্জীবিত করবার প্রধান উপায় হল—ওপত্রকে বাঙালী মনের বিশিষ্টতার মুখপত্র করা। বাঙালী বক্তৃতা, মনের স্রোত যদি ভারতীর বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে যায়—তাহলে বাঙলা সাহিত্যের ও সেই সঙ্গে ভারতীরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

আমি তোমার কাগজের বিষয় দুকথা বলতে গিয়ে নিজের বিষয় অনেক কথা বলে ফেল্লুম। এ বাচালতা মাপ করো। সাহিত্যের বাণীর ভিতর দিয়ে, মানুষের "অহং" বেরিয়ে পড়বেই পড়বে। অপর পক্ষে যে লেখার ভিতর অহং নেই সে-লেখা আর যাই হোক, সাহিত্য নয়।—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কালের প্রবাহ

প্রশ্ন-পঞ্চদশী

"ছুঁৎমার্গ" পরিহারের জন্য ৺কাশীধামে হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে ৺কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহাশয় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ঐ সভার আহ্বানকারীদের চেষ্টা বিফল করায় ৺কাশীর ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী এবং ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একটী বৃহৎ সভা হইয়াছিল। এই সভাতে ৺কাশীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলাভ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর প্রভৃতি মহাশয়গণ সভার উদ্দেশ্যাদি ব্যক্ত করিবার পরে, উক্ত সভার পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহাশয়কে সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং স্বর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার পক্ষ হইতে এক তোড়া টাকা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মিশ্রজীর সমীপে সমর্পণ করিলে তিনি স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া সভায় সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহাশয় উঠিয়া তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে উক্ত মিশ্রজীকে জ্ঞাপন করেন যে তাঁহার এই নির্ভীকতা ও সৎসাহসের এবং ধর্ম্মানুরাগের জন্য যদ্যপি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হইতে অপসৃত হইতে হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ বিদ্যালয় হইতে যে ১৫০৲ দেড়শত টাকা মাসিক বেতন এক্ষণে পাইতেছেন, রাজা বাহাদুর আজীবনকাল তাঁহাকে ঐ পরিমাণ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত রহিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মলাভ শাস্ত্রী মহাশয় রাজা বাহাদুরের এই উক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, রাজা জমীদারগণের নিকট হইতে এরূপ পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের হৃদয়ের বল দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং তাঁহারাই সাহসের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা পালন করিতে পারিবেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জয়দেব মিশ্রজীকে ধন্যবাদ প্রদান এবং জয়ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।"

সংবাদপত্রে উপরোক্ত সংবাদটি পাঠ করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহাশয়কে নিম্নলিখিত পঞ্চদশটী প্রশ্ন করিয়া একটি পত্র লিখিবার প্রয়োজন অনুভব

করি। পত্রখানি সংস্কৃত ভাষায়। উহার বাঙ্গলা প্রতিলিপি মিশ্রজীর পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর মহাশয়কে প্রেরিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের বিচারশক্তির অনুশীলনকল্পে বাঙ্গলা চিঠিখানি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

ওঁ

৩নং সানি পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
৩১শে বৈশাখ, ১৩৩১।

নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, ব্রাহ্মণ-জায়া ও ব্রাহ্মণ-মাতা এবং সামান্যতঃ অধীত-ব্রহ্মবিদ্যা। আমার এবং চারিবর্ণযুত হিন্দুজাতির অজ্ঞান বিদূরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসু হইয়া আপনার নিকট নিম্নলিখিত পঞ্চদশটি প্রশ্ন উপস্থিত করিতেছি। উত্তরদানে কৃতার্থ করিবেন :—

১। বেদ এবং বেদোক্ত বাণী সত্য বা মিথ্যা ?

২। বেদের দশম মণ্ডলস্থ পুরুষ-সূক্তে যে উক্ত হইয়াছে আমরা চারিবর্ণের মনুষ্যজাতি পরম পুরুষের শরীর হইতে উদ্ভূত হইয়াছি তাহা ঠিক কিনা ?

৩। বেদোক্ত চারিবর্ণের স্রষ্টা ছাড়া অপর কোন স্রষ্টা আছেন কি যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্পৃশ্য বা পঞ্চম বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা ?

৪। বেদবর্ণিত স্রষ্টাপুরুষ বেদমন্ত্রে কোথাও চারিবর্ণের পরস্পরের সহিত অস্পৃশ্যতা বা হেয়তার আদেশ করিয়াছেন কি ?

৫। লৌকিক বুদ্ধিই কি ইহার সমর্থন করে ?

৬। মস্তিষ্ক কি হস্তপদ বা বক্ষকে কাটিয়া ফেলিয়া জীবিত সুস্থ বা অবিকৃত থাকিতে পারে ?

৭। আপনারা ব্রাহ্মণেরা ন্যাসকালে এবং অন্য প্রয়োজনেও আত্মশরীরে আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গগুলি স্পর্শ করেন নাকি ?

৮। আপনার মস্তিষ্ক আপনার জন্য চিন্তা করে, আপনার হাত আপনাকে রক্ষা করে, আপনার হৃদয় আপনার জীবনী-রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালন করে এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মযুগল আপনার সর্ব্ববিষয়ের হিতকল্পে চলে। আপনার শরীর হইতে ইহার কোন একটিকেও ত্যজ্য করিতে বা ক্ষীণবল করিয়া রাখিতে আপনার প্রাণপুরুষ চায় কি ? যে মানুষ তাহা করে সে কি বুদ্ধিমান্ আখ্যাযোগ্য ?

৯। যেমন ব্যক্তিগত জীবদেহে তেমনি হিন্দুজাতিদেহেও কোন একটি অঙ্গের পক্ষাঘাতে বাকী অঙ্গেরও স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। জাতির পদস্বরূপ বহু শূদ্রবর্ণকে অস্পৃশ্যতা দ্বারা অবাধ গতি রহিত করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কলির ব্রাহ্মণও নিস্তেজ ও জড়বৎ হইয়া গিয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষগম্য কিনা ?

১০। শুধু জাতিতে নহে, গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবে যিনি ব্রাহ্মণ, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তাঁহার পক্ষে শূদ্র অস্পৃশ্য নহে, কারণ যিনি সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মদৃষ্টি—

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।

আর যাঁহার ব্রহ্মণ্য জাতিগত মাত্র—যথা আজকালকার লক্ষ লক্ষ তৎপদবাচ্যের, যার স্বভাব গুণ কর্ম্ম ও বিশ্বের তাবৎ লোক-সাধারণের স্বভাব গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই তাঁর পক্ষে শূদ্র কিরূপে হেয় হইতে পারে?

১১। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব-অভিমান, বৈশ্য শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ের স্ব স্ব ব্যষ্টি অভিমানের সহিত একীভূত হইয়া এক সাধারণ শরীরের সমষ্টি অভিমানের সঙ্গেই পুষ্টিলাভ করিতে পারে, কিম্বা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বা শরীরের কোনও অঙ্গ বিশেষকে দাবাইয়া?

১২। শূদ্ররূপী পদাঙ্গের চলায় ব্রাহ্মণেরা তাদের পশ্চাতে অনিচ্ছায় পরিচালিত হইবেন—ইহা বুদ্ধিসঙ্গত হইবে, না অগ্রবর্ত্তী নেতা হইয়া স্বয়ং তাদের চালান বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ হইবে?

১৩। ব্রাহ্মণের রক্ষা কিসে? আন্যেতর বর্ণগণের সহিত সদ্ভাবে ও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারে—না -তাদের আত্ম-সম্মানবোধে নৃশংসরূপে আঘাত পরম্পরায় তাদের বিদ্রোহিতায়?—মাথাটা উঁচু রাখিয়া চলায়, না মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে চালিত হওয়ায় তাঁদের আত্মরক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইবে?

১৪। জাতির মূলাধারস্বরূপ শূদ্রের ভিতর জাতির কুণ্ডলিনীশক্তি নিহিত রহিয়াছে। আজ সেখানে শক্তি জাগ্রত হইয়া জাতির মস্তকস্থিত ব্রাহ্মণরূপী শিবের সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা সে মিলন স্বীকার করিবেন কিনা? কিম্বা তাকে রোধ করিয়া মস্তিষ্কের বিকার বা জীবন সংশয় করিবেন?

১৫। হিন্দুজাতির শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণবর্ণ কোনকালে যে কোন কারণে হউক কোন কোন শূদ্রকে অস্পৃশ্য করিয়াছিলেন। এখন সেই অস্পৃশ্যতা দৃঢ়সংস্কারে পরিণত হইয়া তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির দ্বারা প্রকৃতিজয়ী হইয়া উক্ত সংস্কারের সংস্কার করা আমাদের কর্ত্তব্য কিনা?— ইতি

বিনীতা—
শ্রী সরলা দেবী।

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ

প্রত্যেক মঠের মোহান্ত এক একটি খলিফা। কামালতুর্কী যেমন কর্ত্তব্যবিমুখ খলিফাকে দেশান্তরিত করিয়া স্বধর্ম্মীগণের ধর্ম্মচৈতন্য জাগ্রত করিয়াছে, হিন্দুদের অধিকাংশ মোহান্ত সম্বন্ধেই হিন্দুদের তদ্রূপ কর্ত্তব্য। তারকেশ্বরের ব্যাপারে মৃতপ্রায় হিন্দুদের মধ্যে জীবনীর লহরী আবার ছুটিয়াছে। কিন্তু এখনও অধিকাংশ হিন্দুরই আস্তিক্য প্রায় নাস্তিক্য সমতুল্য,

তাঁহাদের দেবতার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পুঁথিগত—উহা জীবন্ত নহে। স্বামী বিশ্বানন্দ যে সেই শ্রদ্ধাকে উদ্দীপিত করিতে পারিতেছেন ইহাই তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের মহাফল। হিন্দুধর্ম্মীর সংহতি-শক্তি প্রজ্জ্বলিত ও প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে হিন্দুজাতি এ যুগেও মৃত্যুঞ্জয়ী হইবে।

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ এখন যে রূপ ধারণ করিয়াছে, মোহান্তর বিরুদ্ধাচরণ ছাড়িয়া এখন যে কোর্টের নিযুক্ত রিসিভারের মুকাবিলা আরম্ভ করিয়াছে, সে বিষয়ে ধীরভাবে বিচার করার দরকার।

সত্যাগ্রহআচার্য্য বলিয়াছেন ফলাফলের দ্বারা লুব্ধ হইয়া নহে, ঔচিত্য অনৌচিত্যের নিক্তিতে ওজন করিয়া বিষয়বিশেষের প্রতি সত্যাগ্রহের প্রয়োগ বা অপ্রয়োগের বিধান দেওয়া কর্ত্তব্য। এই নীতি অনাদর করিয়া রিসিভারের বিরুদ্ধে প্রথম হইতেই সত্যাগ্রহ করা সমীচিন কিনা বিবেচ্য।

মঠের দেবত্র সম্পত্তি সাধারণের, মঠাধিপতি মোহান্ত তার ট্রাষ্টি মাত্র। ট্রাষ্টি যদি আমানতে খেয়ানৎ করেন তবে সাধারণের মধ্যে যে কেহ কোর্টে দরখাস্ত করিলে, কোর্ট রিসিভার নিযুক্ত করিতে বাধ্য। এই আইন অনুসারেই এস্থলে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কতিপয় সভ্যের দরখাস্তে কর্ণপাত করিয়া কোর্ট রিসিভার পাঠাইয়াছেন। এ রিসিভার নিরপেক্ষভাবে সাধারণের সম্পত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করেন কিনা, সাধারণের পূজার অধিকার অখণ্ড রাখেন কিনা, না দেখিয়া না শুনিয়া রিসিভারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সুরু করায় এ সত্যাগ্রহ অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এইরূপ কেহ কেহ শঙ্কা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, যাহারা সত্যাগ্রহ করিতেছেন তাঁরাও সাধারণের এক অংশ, যাঁরা রিসিভারের জন্য দরখাস্ত করিয়া আইনসঙ্গতভাবে রিসিভার আনাইয়াছেন তাঁরাও সাধারণের একদল সুতরাং রিসিভারবিমুখতায় সত্যাগ্রহ এখন দ্বিতীয় দলের ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে প্রথম দলের সত্যাগ্রহ করা দাঁড়াইতেছে। সাধারণের সম্পত্তিরক্ষার জন্য রক্ষক হইয়া যে ভক্ষক হয় তাকে পদচ্যুত করার অধিকার ও তৎকৃত অন্যায়ের প্রতিবিধানের অধিকার সাধারণের হাতে থাকিবে—কোর্টের হাতে নয়—যতদিন না এই কানুন প্রচলিত হয় ততদিন কোর্টের রিসিভার যদি অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেন তখন রিসিভারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে। কিন্তু তাঁকে পরীক্ষার জন্য কিছু সময় দেওয়া চাই।

এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাতে মোহান্তের প্রতি পক্ষপাতই প্রকটিত হইয়াছে—সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিত্তভোগী রিসিভারও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবেন ইহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এবং রিসিভার মহাশয় পদার্পণ করিয়াই যেরূপ বিধি প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অন্যায়ের প্রশ্রয়কারী উহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কিছুদিনের জন্য সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখিয়া, তাঁকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ অমূলক।

তবে নেতাহীন শ্রমিকদের দলে দলে সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার আমরা একেবারেই পক্ষপাতী নহি। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে যে মত ব্যক্ত করিয়াছি তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কামধেনুর পুচ্ছ"

১৯১৯ সালে যখন রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়, মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন—"সত্যাগ্রহ তোমাদের কামধেনু, ইহার দ্বারা তোমাদের সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

ঠিক কথা। কিন্তু ১৯১৯ এর প্রত্যক্ষ ঘটনার পর আরও বিশেষ করিয়া আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কামধেনুর পুচ্ছ নড়িলে অধ্যাত্মবলের স্থলে পাশববলের উপপত্তি হয়। বশিষ্ঠের কামধেনুর পুচ্ছ হইতেই নানাস্ত্রধারী সৈন্য উথিত হইয়া রাজ-সৈন্যগণকে অস্ত্রবৃষ্টির দ্বারা আহত ও ত্রাসান্বিত করিয়াছিল। কেবল মহাসত্ত্ব বশিষ্ঠের নেতৃত্বে তাহারা উঁহাদের প্রাণহনন হইতে নিরস্ত ছিল।

সত্যাগ্রহ একটী অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক অস্ত্র। ইহার বিজ্ঞান ও প্রয়োগাভিজ্ঞ বিচক্ষণ নেতার অধীনে না থাকিলে, কোন বিজ্ঞ দলপতির দলভুক্ত ও তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী না হইয়া সত্যাগ্রহে যোগ দিলে সাধারণ লোকের পক্ষে মর্য্যাদা অতিক্রমের অত্যন্ত সম্ভাবনা।

সিঁদুরে মেঘ

কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ঘরপোড়া গরুর সাবধান হওয়া উচিত। লিলুয়া, হাওড়া, বালি, বেলুড় এমন কি ঝরিয়ার শ্রমিকদের মধ্যেও এই ধার্ম্মিক উত্তেজনা যখন সংক্রামক হইবে, তখন উদ্বেল জনস্রোতকে ট্রেন বন্ধ করিয়াও রুখিতে পারিবেন না, জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেন্টের শাসন টিঁকিতে পারিবে না। সুতরাং এই সত্যাগ্রহে মোহান্তের পক্ষপাতিতার দ্বারা অনধিকার চর্চ্চা না করা গবর্ণমেন্টের বিজ্ঞতার পরিচয় হইবে।

সত্যাগ্রহ না দুরাগ্রহ

কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ধার্ম্মিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে সত্যাগ্রহ ব্যাপ্ত হইতেছে ইহাতে সত্যাগ্রহের অবনতির বিপদাশঙ্কা আছে।

সঙ্ঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের অবনতির শঙ্কা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু তাহা কি রাজনৈতিক কি ধার্ম্মিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই সমান নহে ? শিখগুরু তেগ বাহাদুর ধর্ম্মের জন্য সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন—পাঞ্জাবে আরও অনেক মহাপ্রাণ অনেক সময় ধর্ম্মের নিমিত্ত নিরস্ত্র সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু একক ; একলা প্রাণের মহানুভূতি তাঁদের সত্যাগ্রহকে ক্ষেত্র নির্ব্বিশেষে সমুন্নত রাখিয়াছে। পুরাকালে যখনই সঙ্ঘবদ্ধভাবে আততায়ীর সম্মুখীন হওয়া গিয়াছে তখনই সঙ্ঘের হাতে অস্ত্র দেখা গিয়াছে। নিরস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহ সঙ্ঘধর্ম্ম কিনা

পরীক্ষা সাপেক্ষ। আজ শুধু ধার্ম্মিক বা সামাজিক কেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সঙ্ঘবদ্ধ সত্যাগ্রহের নায়কত্ব যতদিন মহাত্মা গান্ধি বা তৎকল্প শাস্ত্রবিশারদের হাতে থাকিবে ততদিন বিপদ নাই, কিন্তু মহাত্মা ক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলেই, নেতৃত্বটা একটু কাঁচা লোকের হাতে পড়িলেই হিতে বিপরীত হইতে পারে। সেইজন্য স্বরাজীরা যেমন মহাত্মাজীর সহিত কনফারেন্স করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইলেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ চিকীর্ষু নেতাগণেরও উচিত মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিয়া, তর্কাতর্কি করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে এ বিষয়ে মহাত্মাজীর উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে তাঁদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কতদূর সম্মতি বা বাধা দেয়। নয়ত মুখে মহাত্মাজীর চেলা বনা, এবং কাযে তাঁর অনুশাসনের অন্যথা আচরণ করা অসঙ্গত ও অসত্য দাঁড়াইতেছে। মহাত্মাজি ভাইকোম সত্যাগ্রহে মুসলমান ক্রীশ্চান বা অপর কোন অহিন্দু সম্প্রদায়ের যোগদান সত্যাগ্রহবিধির বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অর্থসাহায্যগ্রহণ ও অবৈধ বলিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও তারকেশ্বরে মুসলমান ভাইরা হিন্দুদের সত্যাগ্রহের সঙ্গী হইতেছেন এবং তত্রস্থ নেতারা তাঁহাদের সাহায্য স্বীকার করিতেছেন। আমরা যেমন মুসলমান না হইয়াও ইসলামধর্ম্মীর খিলাফতে সহানুভূতি দেখাইয়াছি, খিলাফতের পতাকার নীচে লড়িয়াছি, খিলাফৎ সমিতির সদস্য হইয়াছি ও অর্থ সাহায্য করিয়াছি, তেমনি মুসলমানেরা হিন্দুভ্রাতাদের ধার্ম্মিক বা সামাজিক যুদ্ধে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য তাঁহাদের সত্যাগ্রহে সামিল কেনই বা না হইবেন—এ বিষয়ে মহাত্মাজীর সহিত একটা বোঝাপাড়া করিয়া লওয়া উচিত। নতুবা চেলারা করিলেন সত্যাগ্রহ, এবং গুরু তার নাম দিলেন দুরাগ্রহ, এ বিসদৃশ ব্যাপার ভাল নয়।

মহাত্মাজী তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে নাবালকের যোগদানেরও বিরোধী। তারকেশ্বরের ধর্ম্ম যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আগ্রহে নিয়মবিরুদ্ধতাবশতঃ কংগ্রেসকমিটির সাহায্য না পাওয়ায় মহাত্মাজীর সম্মতির জন্য তার করিয়াও আমার পুত্র নিরাশ হইয়াছে। কিন্তু নাবালক প্রহ্লাদ সত্যাগ্রহী খেলোয়াড়ের রঙের টেক্কা। মহাত্মাজী সত্যাগ্রহসম্বন্ধে কুটবিচারের খেলায় অনেক সময় এই তাসখানি ফেলিয়া বাজী জিতিয়াছেন। অথচ তারকেশ্বরে নাবালকের যোগদানে তার সম্মতি নাই, এই বিরোধী ভাবের নিষ্পত্তি করিয়া মহাবীর দল নাবালকদের গ্রহণ করা বা না করা যেন সাব্যস্ত করেন!

মহাত্মাজী ও স্বরাজী

মহাত্মা

কৌন্সিলে যাওয়া না যাওয়া সম্বন্ধে মহাত্মাজী ও স্বরাজীনেতা দাশ-নেহেরুজী পরস্পরের সহিত মন্ত্রণা ও যুক্তি সংঘর্ষণের পর উভয় পক্ষের যে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মহাত্মাজীর সম্বন্ধে তিনটি বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে ঃ—

১। ভক্তবাৎসল্য; তাঁর ভক্তেরা দিল্লী ও কোকনাদার কংগ্রেসে স্বরাজীদের কৌন্সিলে যাওয়া সম্বন্ধে যে ছাড়পত্র দিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিপর্য্যস্ত না করিয়া ভক্তদের মানরক্ষা করিয়াছেন।

২। ন্যায়ানুরাগ; উক্ত দুই কংগ্রেস যখন গলতি করিয়া বসিয়াছেন তখন সেই গলদের ভিতর যা ন্যায্য তা মাননীয়—তদনুসারে স্বরাজীদের কৌন্সিলের ভিতর নিজেদের রাজনৈতিক বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিবার স্বাধীনতা আছে স্বীকার করিয়াছেন।

৩। তাঁর অটল ব্যক্তিত্ব; তাঁর মনের দাঁড়িপাল্লাটা যেদিকে ঝোঁকা সেদিক হইতে তাঁকে অন্যদিকে ঝোঁকান অপর পক্ষের যুক্তির সাধ্যাতীত। স্বরাজীরা ইহাই লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়া থাকিবেন "তাঁর মতের সহিত আমাদের যুক্তির মিল হইল না।" উভয়পক্ষেই কথাটা ঠিক। বার্ক বলিয়াছেন, যুক্তি বুদ্ধি বা ঝোঁকেরই পরিচারিকা।

দাশ-নেহেরু

মহাত্মাজী বলিতেছেন "আমি যদি কৌন্সিলে যাইতাম তবে আমি সেখানে কতকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাবের জন্য শ্রম করিতাম।"

দাশ-নেহেরু যাহা বলিতেছেন তার মর্ম্ম এইঃ—কোন কোন স্থলে ভাঙ্গন না হইলে পুনর্গঠন হয় না। যেখানে ১৩১ কোটি টাকার মধ্যে কেবলমাত্র ১৬ কোটি টাকার ব্যয় সম্বন্ধে আমাদের ভোটের অধিকার আছে, প্রজার রক্তশোষী ১১৫ কোটী টাকা গবর্ণমেণ্ট বিনা ভোটে যদ্রূপ ইচ্ছা খরচ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, অথচ আমাদের দ্বারাই এ বিধিটা মঞ্জুর করাইয়া লইতে চান, সেখানে বজেট নামঞ্জুর করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বাধা দেওয়াই আমাদের স্বরাজ প্রাপ্তির জন্য গঠনমূলক কাজ।" প্রজাশক্তির উদ্বোধন যে দলের দ্বারা যেমন করিয়াই হউক, তাড়ণ, ধারণ, ভাঙ্গন, গঠন, সবেতেই আমাদের সহমতি আছে।

নারী-নির্য্যাতন

বঙ্গে নারী-নির্য্যাতন আজকালই যে আরম্ভ হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে ছিল না, ইহা নহে। পূর্ব্বেও যথেষ্ট ছিল, তবে জাতির চৈতন্য এতদিন সুপ্ত ছিল, তাই লক্ষ্য করে নাই—আজ প্রতি শিরায় শিরায় তার জাগ্রতি ফিরিয়া আসিতেছে তাই সে চঞ্চল হইয়াছে। হিন্দু-নারী-নির্য্যাতন প্রতিকারের চারটি উপায় আছে।

১। নারী-রক্ষিনী সমিতি স্থাপন, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-দুর্নীতি-নিবারণী সভা বা প্রতিষ্ঠানের আয়োজন ও আয়তন বৃদ্ধি করা।

২। নারী-নির্য্যাতক দুষ্ট পুরুষকে সমাজে বিশেষভাবে দণ্ডিত করা। তাবৎ-অনুতাপ তাহার সহিত সমাজের অসহযোগিতা-নীতির প্রবর্ত্তন করা।

৩। নিরপরাধিনী নির্য্যাতিতা অকলুষহৃদয়া নারীকে সমাজে গ্রহণ করা। দুষ্ট নারীকে শিষ্টা করিবার চেষ্টামূলক প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করা।

৪। নারীদিগকে ভীরুতানিবারক ও আত্মরক্ষা সহায়ক অস্ত্রবিদ্যায় অল্পবিস্তর দীক্ষিত করা—।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

আম্‌-দরবার

[পাঠক সাধারণকে ভারতীতে বা অন্যত্র প্রকাশিত বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এই পর্ব্বটি খোলা হইল। বলা বাহুল্য উক্ত স্বাধীনতাটি শিষ্টতা সুসঙ্গতি ও যুক্তিযুক্ততার অধীন থাকবে। ভাঃ সং]

চরকার বাণী

বৈশাখের ভারতীতে "গান্ধি-অভিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে—"চরকা প্রীতিটা তাঁর (মহাত্মা গান্ধির) ব্যক্তিগত সাময়িক বিশেষত্ব মাত্র। ইহা পড়িয়া সাধারণ পাঠকের মনে চরকা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। সেজন্য দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

মন ও হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ দ্বারাই সৃষ্ট জগতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে মানুষের জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—কি আহারবিহারে বা অশনবসনে, কি কর্ম্মক্ষেত্রে বা চিন্তা ও ভাবরাজ্যে, মানুষের সমস্ত জীবনটাই যেন কেমন একটা বৃথা আরম্বরপূর্ণ উৎকট অস্বাভাবিকতায় পরিণত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ভোগলালসাকে আমরা মূর্ত্ত করিয়াছি আমাদের ভোগসর্ব্বস্ব নাগরিক জীবনে। ফলে, আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হইয়াছে অর্থ। আজ আমাদের সমস্ত শক্তিই এই অর্থসংগ্রহেই নিয়োজিত—চাই অর্থ, আর ভোগ!

ব্যষ্টিজীবনের সেই অদম্য ও ভয়াবহ অর্থলালসা ও ভোগলিপ্সা, ভৌগলিক সীমাকে অবলম্বন করিয়া, সমষ্টিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে। এবং এই সংহত সমষ্টি এক একটা জাতির রূপ ধরিয়া অর্থ পিপাসায় ক্ষিপ্তের প্রায় ছুটিতেছে—কে কোথায় দুর্ব্বল ও অসহায় আছে, উন্মত্ত রাক্ষসের মত তাদের ধনরক্ত শোষণ করিবে।

সত্যান্বেষী মনীষী বৈজ্ঞানিকের সারাজীবনের সাধনার ফলকে সহায় করিয়া, মানুষের নীচ স্বার্থ ও অপরিমেয় ভোগপিপাসা আজ যতকিছু কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করিতেছে। তাই আজ সর্ব্বত্র, মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগলালসার তৃপ্তির জন্য কলকারখানার মধ্যে নিষ্পেষিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর আত্মবলির মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে। এবং সেই কলকারখানায় প্রস্তুত অতিরিক্ত দ্রব্যসম্ভারের প্রচারের জন্য, ব্যবসা ও বাণিজ্যের এবং সভ্যতার আলোক প্রদানের নামে, দেশবিদেশে শৃগাল কুকুরের ন্যায় অর্থের কাড়াকাড়ি চলিতেছে।

মানুষের এই বিভ্রান্ত ও উন্মত্ত বাহ্যপ্রকৃতিকে আত্মস্থ করিবার জন্য, আজ এক মহাপুরুষের করুণ স্পর্শ চরকাকে জাগরিত করিয়াছে। মানবরূপী দৈত্য দানবের বিকট চীৎকার কোলাহলপূর্ণ যান্ত্রিক সভ্যতার মহা-শ্মশানে এক সিদ্ধমানবের মধুর আহ্বানে আজ সেই চরকার বাণী সমুত্থিত।

চরকা ভারতে শুধু অর্থনীতির সমাধান করিতে চাহে না। চরকা ভারতীয় বিশিষ্ট সভ্যতার এক অপূর্ব্ব দান। মানুষের স্বার্থ ও পশুবৃত্তিকে সুসংযত করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট মানবজীবনের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বহিঃপ্রবাহকে সরল ও স্বাভাবিক গতিতে ফিরাইয়া আনিতে চরকা একটি আদর্শ। মানবজীবন বিধ্বংসকারী ভোগমূলক যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বৃহত্তর মানবতার স্বাভাবিক বিদ্রোহের চরকা হইতেছে একটা মূর্ত্ত বিগ্রহ। সহজ সরল মানবীয় জীবনযাত্রার পথে চলিবার জন্য চরকা একটা বিশিষ্ট অবলম্বন। মানবের দেবত্বে পরিণতির সহায়ে অদ্যত্র চরকা একটা সত্য জীবন্ত আদর্শ। মহাত্মাজীর চরকাপ্রীতির ইহাই মূল কারণ।

শ্রীসুধীশচন্দ্র পাল।

উত্তর

লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত, এবং অনেকস্থলে অনেক প্লাটফরম হইতে সে মত ব্যক্তও করিয়াছি। গান্ধি-অভিজ্ঞানে এ চরকাপ্রীতিকে মহাত্মাজীর সাময়িক ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উহা সময় বিশেষে ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক উদ্ভুত একটি symbol বা প্রতিভূ। ভিন্ন কালে ভিন্ন পুরুষ বা গান্ধি স্বয়ং ঐ একই বিষয়ের জন্য আর কোন symbol বা প্রতিভূর কল্পনা ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। একালে গান্ধি নামক কোন পুরুষের প্রতিভা সে বিষয়ের প্রতিভূস্বরূপ চরকাকে বরণ করিয়াছে।

"ভারতী" সম্পাদিকা।

মাসিক সাহিত্য পরিচয়

চুম্বক

অর্চ্চনা—বৈশাখ ১৩৩১

১। কর্ম্মকার জাতি সম্বন্ধে বেদের প্রমাণ—লেখক শ্রীপ্রিয়লাল গোস্বামী এম এ, বিএল। এই প্রবন্ধে লেখক প্রমাণাদিসহ দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন যে কর্ম্মকার জাতির শুধু অস্তিত্বই যে বৈদিক যুগে ছিল তাহা নয় - এমন কি আর্য্য সমাজে তাদের স্থান নিতান্ত নিম্নে ছিল না। শ্রুতিই হিন্দুর প্রামাণ্য গ্রন্থ কাজেই তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে, ৯মণ্ডলে ও ৫ম মণ্ডলে এই কর্ম্মকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এই সব শ্লোক হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে এই সম্প্রদায় তখন যথেষ্ট নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিল। লেখক অনুমান করেন যে সুধন্বার পুত্র প্রভু প্রভৃতি ও কর্ম্মকার গণ বৈদিক যুগের আদিতে অভিন্ন ছিল। সুধন্বার পুত্রগণ যে শিল্পজ্ঞান সম্পন্ন ছিল তাহার প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়; দেবতাদের অস্ত্র নির্ম্মেতা বিশ্বকর্ম্মা এই উভয়েই শিল্পশিক্ষা দিয়াছিলেন। শিল্পবিজ্ঞানসম্ভূত বিষয় গুলি যে আর্য্যঋষিদের প্রতিভাশালী মস্তিষ্কপ্রসূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই এই কর্ম্মকার-শিল্পীগণকে ঋষির সম্মান অনেক স্থানেই দেওয়া হইয়াছে,—যথা যজুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—সূত্রধর - রথকার কুম্ভকার ও কর্ম্মকারগণকে নমস্কার, অথর্ব্ববেদের ৩য় কাণ্ড, ৫ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, রাজা কহিতেছেন—এই পর্ণমণির কৃপায় আমি যেন * * * মনীষাসম্পন্ন কর্ম্মকারগণকে শাসনাধীনে রাখিতে পারি. রাজাও তাহাদিগকে ভয় করিতেন তার স্পষ্ট উল্লেখ এখানে আছে। হিন্দুশাস্ত্ররূপ মহা সমুদ্র মন্থন করিয়া সমুদয় প্রমাণ সংগ্রহ করা যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে পণ্ডিত ব্যক্তি চেষ্টা করিলে—এই কর্ম্মকার জাতির ঐতিহাসিক পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে জানা সম্ভবপর হয়।

—

২। বিশ্ববিদ্যালয় বাহিনীর কথা—লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্র এম, এ

ইউরোপ যখন যুদ্ধদানবের রক্তহোলী-খেলায় বিষম মাতিয়া উঠিল তখন সকলেরই দৃষ্টি পড়িল স্ব-স্ব গৃহের পানে, সকলে তাই হাঁকিল "সামাল সামাল"। ইউরোপবাসী যে যেখানে ছিল—গৃহের পানে ছুটিল—নিজের শেষ রক্তফোটা দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য। সেই সুযোগে ১৯১৭ সালে কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয় বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। নইলে এই মরণভীতুর কলমপেশা-হাতে কোনদিন আগ্নেয়াস্ত্র দেখা যাইত কিনা আর সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করার সুবিধা হইত কিনা—তাহা বিধাতাই জানেন। এসার কমিটী তাহাদের রিপোর্টে এই বিশ্ববিদ্যালয় সৈন্য-বাহিনীর উৎসাহ ও মহদ্‌শ্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে যখন ইণ্ডিয়ান "টেরি টেরিয়াল এ্যাক্ট" পাশ হয় তখন পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় বাহিনী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। সুযোগ পাইলে বাঙ্গালী ছেলেও যে বেদুইনের মত দুর্দ্দান্ত জার্ম্মানদের মত সমর-কৌশলী হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ইতি মধ্যেই অনেক বাঙ্গালী দিয়াছেন। এখানকার ছাত্রদের উৎসাহ দিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে,। "সিল্ড-প্লটুন" প্রভৃতি দ্বারা প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা হইয়াছে, এই সব কার্য্যের

জন্য অনেক মহানুভব উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ধন্যবাদর্হ । আজ বাঙ্গালী ছেলেকে একাধারে সৈনিকের সঙ্গীন ধারাইতে হইবে—অন্যদিকে সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দেবার ফুল চন্দন করিতে হইবে। জগতের জীবন যুদ্ধে এই দুইই আজ তার চাই।

—

উদ্বোধন—বৈশাখ ১৩৩১

ধর্ম্মের স্বরূপ—লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়। ঋষি টলষ্টয় লিখিত what is religion নামক নিবন্ধ অনুসরণে লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ। জীবনের সমস্যার সমাধান কল্লেই এ সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিত। বিজ্ঞান এত উন্নত হইয়াছে—দর্শন ইতিহাস চীকিৎসা-বিদ্যা সকল বিষয়ে মানুষ তাহার অদ্ভুৎ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে কিন্তু এজীবনের সমস্যা তেমনি রহিয়া গিয়াছে। বরং বিজ্ঞান জীবনকে আরও জটিলতর করিয়াছে। বিজ্ঞান মানুষকে বলে—"এ পৃথিবী সংগ্রামক্ষেত্র, এখানে দুর্ব্বলের বাঁচিবার দাবী নাই—সবলের জন্যই এ পৃথিবী"—তাদের এ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিলে মানুষের আর অন্যের জন্য ভাবিতে হয়না—নিজে টিকিয়া থাক অন্যে বাঁচুক আর মরুক দেখার দরকার করে না, এইজন্যই কতিপয়ের স্বার্থের জন্য হাজার হাজার মানুষ নিজের প্রাণ বলি দেয়—মানুষের জীবনটাকে নিয়া বিজ্ঞান আজ গেণ্ডুয়া খেলা সুরু করিয়াছে, এ পৃথিবীতে আসিবার অধিকার যিনি দিয়াছেন বাঁচিবার অধিকারও তিনি দিয়াছেন—এ সত্য অস্বীকার করিলে চলিবে না। একে স্বীকার করিলে ধর্ম্মের স্বরূপ জানিতে পারিবে ; পৃথিবীতে সুখের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে, সমস্ত পদার্থের উৎপত্তিস্থলের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ তাহার নাম ধর্ম্ম! মূলতঃ কোন ধর্ম্মের সহিত অপর ধর্ম্মের বিরোধ বা অমিল নাই। সবাই ঈশ্বরকে স্বীকার করে তাকে জানিতে হইলে নীতি-পরায়ণ হইতে হইবে, নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করিতে হইবে, প্রেমকে নিকৃষ্ট ঘৃণ্য বস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবেনা, কুসংস্কার বাদ দিয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে হইবে। অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা শান্তি আসেনা—প্রেমের সাহায্যে মানুষের অন্তরকে ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। কোন বিজ্ঞানই এত অনাচার অবিচার বৈষম্যের সমাধান করিতে পারিবে না—তাহা বাড়াইয়াই তুলিবে, "The Soul of man is the light of God" মানুষের আত্মাই ভগবানের দীপ, মানুষকে দুর্ব্বল অযোগ্য ভাবিয়া পিষিয়া মারিবার অধিকার কারও নাই—ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলেই সব সমস্যা পরিস্কার হইয়া যাইবে—শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

—

কল্লোল—বৈশাখ ১৩৩১

৩। আলোচনা—বাঙ্গালীর দেহের স্বাস্থ্য যেমন নষ্ট হইয়াছে মনের স্বাস্থ্যও তেমনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দৈহিক স্বাস্থ্য যে নাই, তাহা নিজ নিজ শরীরের পাঁজর বাহিরকরা ক্ষীণ বুকখানার দিকে চাহিলেই জানা যাইবে। আর মনের স্বাস্থ্য যে নাই তার প্রমাণ, সে আজ আনন্দ উপভোগ করার মত উৎসাহ ও সামর্থ্যহীন। প্রধান কারণ—তার বদহজম হইয়াছে। বিদেশী-উপন্যাস প্রভৃতি তার হজমশক্তির উপর এত বেশী অত্যাচার করিয়াছে যে সে আজ কাল্পনিক সুখের আশায় এমন ভরপুর যে নিজের দৈনন্দিন জীবনে সে আস্থাহীন। এমন কি তার নিকট স্বামী স্ত্রীর প্রেম রোমান্স-শূন্য মামুলি ধরণের একঘেয়ে বলিয়া ধারণা। আজকালকার গল্পগুলিতে দুঃখের কাঁদুনি, হতাশার বেদন, নিরাশার ভীতিতেই ভরপুর, আর মধ্যম শ্রেণী নিয়া যে উপন্যাস রচনা করা হয় তাহাতে পাঠকদের অকারণে শুধু কল্পনার মাঠে ঘোড় দৌড় করাইয়াই মারে। কারণ আজকাল মধ্যবিত্ত

বলিয়া কোন ক্লাশ নাই—আছে ধনী ও শ্রমিক আর মাঝখানে অনন্ত ব্যবধান। মুষ্টিমেয় ধনী নিজেদের ভিতর রেষা-রেষির ফলে অশান্তি বিপ্লব-জুয়াচুরি জাল প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিদেশী সমস্যাগুলিতে দেশটা ছাইয়া ফেলে—আর প্রলোভনের রঙ্গীন চিত্র সরল দরিদ্রের সম্মুখে ধরিয়া তার সর্ব্বনাশের রাস্তাটী বেশ পরিস্কার করিয়া দেয়। বিদেশী উপন্যাসের নায়কগণ—আমাদের মতই জীব, এ জ্ঞান থাকা মন্দ নয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা প্রয়োজন—আমরা যে আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, সেখানে ঐ বিদেশী ধরণের ন্যাকামী মোটেই খাপ খায় না—খাওয়াইতে গেলে অশান্তি মনস্তাপ প্রভৃতিই বাড়িয়া উঠে। সংযত মনে নিজের সহজ অবস্থার পরিচয় জানিতে চেষ্টা পাইলে—আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হইবে—আর গল্পলেখকের সেই আত্মবিশ্বাস রচনার মুখে আগুণের কণার মত সকলের বুকে ছড়াইয়া পড়িবে—ভয়ভীতু জাতির নিরাশা ও অবসাদগ্রস্থ ক্লান্ত মনে—দুয়ার ভাঙ্গা কল্লোলে যৌবন উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিবে।

—

গন্ধবণিক—বৈশাখ ১৩৩১

১। চণ্ডীকাব্যের ইংরেজী অনুবাদ লেখক ডাক্তার আশুতোষ দাঁ, লেখকের মূল বক্তব্য এই।—কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য বাংলার খুব আদরের সামগ্রী, সাহিত্যপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই এই কাব্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন, E. B. Cowell সাহেব মুকুন্দরামকে "চসারের" মত উচ্চস্থান দিয়াছেন, এই Cowell এক সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি এক বাঙ্গালী ভদ্র লোকের মুখে চণ্ডীকাব্যের নাম শুনিয়া উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। দুর্ব্বোধ্য স্থানে তাহার বাঙ্গালী বন্ধুবরই তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। অবশেষে কাউয়েল সাহেব চণ্ডীকাব্যের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। গল্পটীর সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কতক অংশ গদ্যে লিখিয়া বাকী অংশ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তিনি মূলের সহিত মিলাইয়া অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদটী বেশ সুন্দর হইয়াছে, একজন বিদেশীর পক্ষে "চণ্ডীকাব্যের" মৌলিকতা অক্ষুন্ন রাখিয়া অনুবাদ করা কম গৌরবের কথা নহে, তবে দুএক স্থানে যে ভ্রম দৃষ্ট হয় তার জন্য অনুবাদককে দায়ী করা যায় না, দায়ী সেই বাঙ্গালী বন্ধুগণ যাহারা তাহাকে অর্থবোধে সাহায্য করিয়াছিলেন। যথা—ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। "রাঁড় অর্থ বিধবা; বধূ—পুত্রবধূ। অনুবাদক অনুবাদ করিয়াছেন—His Six poor childless wives bemoan their fate. বধূ অর্থ করা হইয়াছে স্ত্রী এবং রাঁড় অর্থ করা হইয়াছে বন্ধ্যা, এপ্রকার ত্রুটী যদিও খুব অল্প হইয়াছে—তবু না হইলেই ছিল ভাল।

—

নব্যভারত—বৈশাখ ১৩৩১

শিখ—লেখক শ্রীযুক্ত নির্ভয় সিংহ। পঞ্জাবে শিখজাতি সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে, এই নিরুপদ্রতা তাহাদের ধাতে সম্পূর্ণ নুতন কিনা এই প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠিতে পারে;—শিখজাতি—যুদ্ধ জিনিষটী যাহাদের একরকম ব্যবসা হইয়া গিয়াছে, ইউরোপের গত যুদ্ধে যাঁহারা এই দূরদেশ হইতে ছুটিয়া গিয়া পরের রক্ত পাত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের হাজার বুকের তপ্ত-রক্তধারায় ভূমি সিক্ত করিয়াছে—এই অহিংস পন্থা কি তাদের পক্ষে সম্ভবপর? ইহা যে তাহাদেরই পক্ষে সম্ভবপর, ইহা লেখক শিখজাতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরুনানক। ভারতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ এতদিন সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাদ দিয়াই ধর্ম্ম জগতের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নানক সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাদ দিলেন না, ইহাদের অবনতিকর প্রথাগুলি ছাটাইয়া তাঁর ধর্ম্ম দেশের কাছে প্রচার করিলেন—

"ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান—উচ্চনীচ, হিন্দুমুসলমান ধনীদরিদ্র সবারই সেখানে এক আসন।" জাতিভেদকে অস্বীকার করিয়া সর্ব্বধর্ম্মকে নিয়া এক নূতন জাতি তিনি গঠন করিলেন। তিনি সন্ন্যাস মানিতেন না। নানকের পর একে একে নয়জন গুরু আসিয়া এই শিখজাতিকে সকল দিক দিয়া পূর্ণ ও সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা দিলেন, নানকের পরে গুরু হইলেন অঙ্গদ—তিনি প্রচার করিলেন গুরুভক্তি। তৃতীয় গুরু অমরদাস আসিয়া শুনাইলেন—সংযম ও সাম্য ; নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান আসন। ৪র্থ গুরু রামদাস প্রচার করিলেন —মাভৈঃ মন্ত্র। ভীরুই কেবল ভয় করে—ঈশ্বর ব্যতীত ভয় করিবার পাত্র কিছুই আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই ; সত্যকে জান—ভয় খসিয়া পড়িবে। এই রামদাসই লঙ্গরের সৃষ্টি করিয়া অমৃতসরে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে শিখধর্ম্মের কেন্দ্র রচনা করেন। সকলেরই উপার্জ্জনের অংশ দ্বারা এখানে সাহায্য করিবে, সকলেরই এখানে সমান অধিকার রহিবে। পরবর্ত্তী গুরু—অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে ব্যবসা করা নিন্দনীয় নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। পরিশ্রমী দীনের আসন তিনি উচ্চে দিয়া গিয়াছেন। এই অর্জ্জুনই "আদি গ্রন্থ" লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ত্যাগ ও সেবা উভয়ের প্রচার করিয়াছেন—নিজের জীবনে তাহা পালন করিয়াছেন। গুরু অর্জ্জুনের পর গুরু হন হরগোবিন্দ। তিনিই প্রথম শৌর্য্যের বাণী প্রচার করেন,—অত্যাচারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি শিখদিগকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তাহার সময়ই শিখদের অপূর্ব্ব জয়ধ্বনি 'সৎশ্রী অকাল' প্রথম সূচিত হয়। হরগোবিন্দের পর গুরু হর রায় আসিয়া বলিলেন—কমনীয়তার অভাবে শৌর্য্য নিষ্ঠুর অত্যাচারী হয়, অতএব কমনীয় গুণ বর্জ্জন করিলে চলিবে না। পরবর্ত্তী গুরু হরকিষণ—তিনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন দ্বারা গুরু গ্রহণ করিবার প্রথার সৃষ্টি করিয়া গণবাদের ভিত্তি দৃঢ় করেন। ইহার পরে গুরুর আসনে আসিলেন তেগবাহাদুর—তিনি শির দিলেন তবু আরঙ্গজেব তাঁর শির নিতে পারিলেন না। শেষ গুরু-গুরুগোবিন্দ সিংহ। এই সিংহের হাতেই এই সিংহবহুলজাতি প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। তিনি শিখদের নামের শেষে সিংহ উপাধি যোগ করেন। তিনি গণতন্ত্রবাদকে শিখধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম করেন, তাই প্রচার করিলেন—গুরুও সাধারণ শিষ্যের ন্যায় মানুষ, তাই তাহার সময় দীক্ষা দেওয়া হইত—কৃপানস্পৃষ্ট জলে—গুরুর পাদস্পৃষ্ট জলে অভিষেক করার প্রথা তিনি বন্ধ করেন। এই বীরই "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" এমন ভাবে জাতি গঠন করেন। শিখ শুধু ধর্ম্মকেই লইয়া থাকিবে না; তাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কোষে কৃপাণ দুলিল—চক্ষে সিংহের বিভীষিকা দৃষ্টি আসিল—বুকে মরণ নেশা নাচিয়া উঠিল, এ তারই সময়। বীর্য্যবানের চিহ্নস্বরূপ সেই হইতে শিখগণ কেশকঙথ (বেণীর মধ্যে ক্ষুদ্র চিরুণী) কড়া, (হস্তের লৌহবলয়) কৃপান, কছ (জাঙ্গিয়া) এই পঞ্চ "ক" গ্রহণ করে। মুসলমানদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য শিখগণ দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইল—তাদের অসির আঘাতে মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল কাঁপিয়া উঠিল, সেই শিখজাতির চরম উন্নতির সময়। পরে রনজিৎ সিংহ প্রভৃতির সাম্রাজ্যবাদ, মুসলমান অত্যাচারকে রোধ করিতে গিয়া "ইসলাম ধর্ম্মকে" আঘাত করা—এই সব কারণেই শিখধর্ম্মের অবনতি। গুরুদ্বারের মোহান্তগণের স্বেচ্ছাচারীতা কুসংস্কার দলাদলি এই সব মিলিয়া তাদের দুর্দ্দশার একশেষ করিল। আজ আবার শিখ জাগিয়াছে, তার প্রথম কাজ সব গুরুদ্বারগুলিকে পূর্ব্বের মত সাধারণ সম্পত্তি করা, সাধারণের সঙ্ঘই ইহার কর্ত্তা, মোহান্ত কিংবা গভর্ণমেণ্ট নয় ; সেই সঙ্ঘকেই গড়িয়া তোলা তার প্রচেষ্টা—যে সঙ্ঘের কাছে গুরুগোবিন্দ পর্য্যন্ত নিজকৃত কর্ম্মের জন্য হাটুগাড়িয়া শাস্তি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সিংহ জাগিয়াছে তার সম্মানের কেশর ফুলিয়া উঠিবেই, তার শক্তির লাঙ্গুল তাড়নায় অন্যায়ের ধুলি উড়িয়া যাইবে—দৃপ্তগ্রীবার উন্নত ভঙ্গিমা আর রক্তনয়ন দৃষ্টি দেখিয়া অত্যাচারী ভয়ে শুষ্কবুক হইয়া উঠিবে, সে দিন দূরে নয়—এ যে তারই সূচনা।

প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৩১

১। অবরোধপ্রথা।—শ্রীঅমৃতলাল শীল প্রবাসীতে অবরোধপ্রথা শীর্ষক প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহার রচনার চুম্বক নিম্নে দেওয়া হইল।

অবরোধপ্রথা ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী নহে, মুসলমানদের অত্যাচারে এ প্রথার সৃষ্টি হয় নাই কারণ ইহা পূর্ব্বেই এদেশে ছিল, তবে তাদের অত্যাচারে এ প্রথাটা কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়াছে সত্য। রামায়ণ হইতে এই অবরোধ প্রথার নজীর উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; যথা—১ম, মন্দোদরীর রাবণের মৃত্যুতে প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া এই বলিয়া বিলাপ করা, যে, সে রাবণের মহিষী হইয়াও এত লোকের সম্মুখে আসিয়াছে তবু রাবণ কেন কুপিত হইতেছে না। ২য়—"রাবণের মৃত্যুর পর সীতাকে" বিভীষণ রামের নিকট আনিবার সময় "সেস্থান হইতে সকল পুরুষকে সরাইয়া দিয়াছিল।"৩য়—বনবাসে যাইবার পূর্ব্বে সীতাকে সাধারণ অযোধ্যাবাসীরা দেখে নাই। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে, পূর্ব্বে উত্তরভারতে শ্রাবণ মাসে তরুণীদের মধ্যে কাজরী নামে এক উৎসব প্রচলিত ছিল ; আজকালও কিছু আছে, ইহার প্রথা হইতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে অবরোধপ্রথা তখনও প্রবল ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই কাজরী উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা জাকজমকের সহিত হইত, এই কাজরী উৎসবের সময়ে রাজপুতদের রমণী হরণ করা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক, যদিও তাদের এই চেষ্টার ফলে প্রায়ই কাজরী উৎসবটা রক্ত-বাদল ধারায় রঙ্গীন হইয়া যাইত। অবরোধপ্রথা খৃষ্টজন্মের ৬শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সময়ে ছিল জৈন সাহিত্যের নানা গল্পেই তাহার প্রমাণ আছে। দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের প্রবেশ সর্ব্বপ্রথম ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে। দক্ষিণাত্যে সমস্ত ভূভাগে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এমন হিন্দুরাজ্য ছিল অহিন্দুর আধিপত্যের নিশান যেখানে কোনদিন উড়ে নাই, যেমন ত্রিবাঙ্কুর। এখানে কোনদিন অহিন্দু প্রভাবের ছায়াপাত হয় নাই কাজেই হিন্দুদের বৈদিক প্রথা সমূহ অবিকৃত থাকাই কতকটা উচিৎ ; কিন্তু এদেশের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নম্বুদ্রীদের সামাজিক নিয়ম সমূহ আলোচনা করিলে জানা যায় যে ইহাদের ভিতর অবরোধপ্রথা বহুকাল ধরিয়া বর্ত্তমান। এই প্রথার কঠোরত্ব এখানে বড়ই উচ্চ ধাপে গিয়া উঠিয়াছে। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণীকে যে কোন কারণে পথে চলিতে হইলে পায়ের তলা হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকিয়া নিতে হয়, এইরূপ বস্তাবন্দী হওয়ার ফলে বেচারারা শেষটা অচল হইয়া পড়ে স্বাধীনভাবে হাটিতে পারেনা—কোন সম্ভ্রান্ত নায়র রমণী হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া নেয়।

মুসলমানগণ অবরোধপ্রথাটা ভারতে আসার সময় লইয়া আসে নাই তার পূর্ব্ব প্রমাণ সমূহ আলোচনা করিলেই বোঝা যায়, কারণ ইস্লামের জন্ম হইবার আগেও ভারতে এই প্রথাটী ছিল। আর মুসলমানদের মধ্যে অবরোধ প্রথম ছিল না। ভারতের বাহিরে থাকিবার সময় মুসলমান রমণীগণ "অনাবৃত দেহ সাধারণ পুরুষের চোখে না পড়ে" এই উদ্দেশে বোরকা পরিত, আরব ইরাণ মিশর তুর্কি কাবুল ইত্যাদি দেশের কুলকামিনীরা বোরকা পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে যাইতে পারিত—প্রয়োজন মত সকলের সহিত কথা বলিত, মসজিদে পুরুষ ও মেয়েমানুষ একত্র উপাসনা করিত। ভারতে আসিয়া তাহারা যখন দেখিল যে, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলারা অবরোধের অন্তরালে বাস করেন তাদের পথে ঘাটে হাটা নিন্দনীয়, তখন মুসলমানগণও নিজ নিজ কুলকামিনীগণের সম্মানরক্ষার্থ অবরোধের পর্দ্দা টানিয়া দিয়া তাদের সাধারণের দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া রাখিলেন। শেষে মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুদের এ অবরোধের পর্দ্দাটা দিন দিন খুব বেশী পুরু ও ভারী হইয়া চলিল আর মুসলমানদের মধ্যেও এ প্রথাটী আপন অধিকার খুব বেশী করিয়া বিস্তার করিয়া ফেলিল—এত ইতিহাসের সেদিনের কথা।

২। ঐতিহাসিক নাটক—লেখক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে ঐতিহাসিক নাটক আদৃত হইয়া আসিতেছে"। "মুদ্রারাক্ষস" ও "মালবিকাগ্নিমিত্রম" অতি উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক নাটক,—এই দুইখানির মূল উপাখ্যান সত্য এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক নাট্যকারগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের আসন খুব উচ্চে, ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে গিয়া তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়া আজকাল যে সব ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয় তাহাতে ইতিহাসের কোন আধিপত্য নাই শুধু কল্পনার তুলিকা-পাতই হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল "প্রতাপ সিংহ নাটকে" "আকবর কন্যার গোপনে প্রতাপ সিংহের শিবিরে যাওয়া" "অবগুণ্ঠন শূন্য করিয়া শক্ত সিংহের শিবিরে মেহেরুন্নিসার গমন" ইত্যাদী ঘটনাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়া ইতিহাস যথেচ্ছভাবে লঙ্ঘন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের তিনখানি নাটক (১) আলেকজাণ্ডার (২) ইরাণের রাণী (৩) ললিতাদিত্য এই শ্রেণীর ইতিহাসের ছাপ মোটেই নাই, ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে মনে হয় যে এই তিনখানি, নাটক বিশেষতঃ আলেকজাণ্ডার নাটকখানি "শিশুরঞ্জন গল্প মালার দিদিমার কাহিনী" সিরিজের পুস্তক হইয়াছে, বাঙ্গালীর লেখা যখন আজকাল বিদেশে পঠিত হইবার আশা তখন ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতৃগণ যেন ইতিহাসের খাতার উপর চোখ বুলাইয়া নেন লিখিত ইতিহাসের আজকাল আর অভাব নাই। নতুবা বিদেশীর নিকট এই ধরণের ইতিহাস চর্চ্চার পরিচয় দিয়া সমগ্র জাতির মুখে কালী লেপিয়া দিবার সাহায্য আর করিবেন না।

বঙ্গবাণী—বৈশাখ ১৩৩১

১। নবপ্রসূত আফগানিস্থান।—লেখক শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী।

এক এক দেশে সময়ে সময়ে এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করে যে, তারা যেন নিজের একার চেষ্টায়ই দেশের উপরকার হাজার দিনের জমান অন্ধকারের আবরণটা টান মারিয়া সরাইয়া দেয়। আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর সেই শ্রেণীর অসাধারণ মানুষ। মুস্তাফা কামালের মতই নিজের শক্তির উপর দৃঢ় আস্থা রাখিয়া তিনি দেশের বিপুল পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। দেশ স্বাধীন হলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না দেশবাসী সে স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে উপভোগ করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এজন্য সর্ব্বপ্রথম চাই শিক্ষা। পরিবর্ত্তনের আক্রমণক্রে দেশের প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়—তার কার্য্যে বাধা দিয়া নিজেদের বাণী শুনাইতে আসিয়াছিল অনেক—কিন্তু আমীর সাহেব ভয় পাইয়া পিছাইয়া যান নাই। তিনি নিজের দশ বৎসর-বয়স্ক পুত্রকে শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইয়াছেন—এবং অন্যান্য অনেক বালককে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য সরকারের ব্যয়ে ফ্রান্সে ও জার্ম্মাণীতে প্রেরণ করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে প্রাইমেরী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন।

বিদেশ হইতে জার্ম্মাণ ও ফরাসী অধ্যাপক আনিয়া কাবুল সহরে পার্শিয়ান স্কুল কলেজের পাশাপাশি ফরাসী জার্ম্মাণ স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাবুলে মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমীর সাহেব কিপলিং এর Westand East will never meet বাক্য মানিয়া লন নাই—তাই পাশ্চাত্যের মস্তিষ্ক ও প্রাচ্যের হৃদয়—এই দুই মিলাইয়া এক নূতন সভ্যজাতি গঠন-প্রয়াসী হইয়াছেন। শিক্ষার মূলে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরবিশ্বাস—এই কথা আমাদের মত তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। কৃষির উন্নতির জন্য—শীতের জমান বরফ যখন গ্রীষ্মকালে গলিত হয় তাকে আটক করিয়া ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জল দিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সরঞ্জাম আনা হইয়াছে; বিদেশী বিশেষজ্ঞ রাখিয়া শিক্ষা প্রচলন করা হইতেছে। আফগানিস্থানের রাস্তাসমূহ মেরামত ও উপরভাগে পাহাড়ের

উপর নূতন অসংখ্য রাস্তা গড়িবার জন্য—ইতালী ও জার্ম্মেণী হইতে ইঞ্জিনীয়ার আনা হইয়াছে। কাবুল সহর রাজধানীর উপযুক্ত নয় বলিয়া ইহার ৩ মাইল দূরে দর-উল-অমন নামক এক নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের কার্য্য দুই বৎসর হয় আরম্ভ হইয়াছে। সহরের বিভিন্নস্থানের দাওয়াইখানা গুলিকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী করিবার জন্য বিদেশী অভিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়াছে, এবং অনেক নূতন দাওয়াইখানা খোলা হইয়াছে। এখানে বহু পরিমাণে তুঁতের গাছ জন্মায়—তাই রেশম ফ্যাক্টরী খোলা হইয়াছে; এখানেও বিদেশী তত্ত্বাবধারক আছে। এখানে শীত বেশী, কাজেই চা খুব ব্যবহৃত হয়। এসব চা চীন ও ভারত হইতে সেখানে যায়, কাজেই নিজ দেশে চা চাষ করিবার জন্য—আসাম হইতে বিশেষজ্ঞ লোক আনিয়া জেলালাবাদে কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল বিভাগের কাজই আমীর সাহেব স্বয়ং পরিদর্শন করেন, তাই তাকে প্রত্যহ ১৩।১৪ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। উদ্যোগী শক্তিমান পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করে—কর্ম্মহীন মড়ার গলায় বিজয় লক্ষ্মী কোনদিন জয়মাল্য দেয়না—এ কথাটাই আজ আমাদিগকে জানিতে হইবে।

২। বলাকা ও বের্গস—লেখক শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র।

এই প্রবন্ধে লেখক দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, ফরাসী দার্শনিক বের্গসের ন্যায় আমাদের রবীন্দ্রনাথও গতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার বলাকা এই গতির বাণীকেই প্রচার করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। দার্শনিক চূড়ামণি শঙ্করাচার্য্য সত্যের লক্ষণ বলিয়াছেন যে—তাহা তিনকালেই সমভাবে অবস্থিত। কালের রথচক্র ঘূর্ণনে যাহার উপর পরিবর্ত্তনের পুঞ্জ পুঞ্জ ধুলিচ্ছটা রঞ্জিত হয়, তাহা সত্য নয়—কারণ সত্যের পরিবর্ত্তন নাই।

অতীতকে ঠেলিয়া দিয়াই বর্ত্তমান বিজয়ীর সিংহাসন দখল করে; তাই অতীতে বর্ত্তমানে বিরোধ চিরন্তন। এযুগে সত্যের সন্ধান মিলিয়াছে—গতিতে, স্থিতির অচলায়তনের সুদৃঢ় দুর্গে তার বসতি নহে। বের্গস বলেন যে, অতীতের দার্শনিক সম্প্রদায় স্থিতিকে আঁকড়াইয়া ছিল, তাই সত্যকে পায় নাই—কারণ সত্য যে গতির সঙ্গে চঞ্চল চরণে সরিয়া পড়িয়াছে। বের্গসই বিশেষ করিয়া এই তথ্য প্রচার করেন তাই এ দর্শনকে গতিবাদ বলা হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বলাকাতে ছত্রে ছত্রে গতির অপরূপ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন—তার শক্তিমান তুলির মুখে এ সত্যের সৌন্দর্য্য বিরাটভাবেই ধরা দিয়াছে। তিনি গতিকে "নবীন" "কাঁচা" বলিয়া নাম করণ করিয়াছেন—স্থিতিশীল "প্রবীণরা" "অন্ধকারের বন্ধ করা খাঁচায়" দম বন্ধ হইয়া মরুক, তিনি নবীনকে ডাক দিয়াছেন—"শিকলদেবীর ঐ পূজাবেদী" পায়ের তলার ভাঙ্গিয়া দিয়া তুই আয়—কারণ নিয়মের বাঁধা পথের যাত্রী ত তুই নস্।

আবার কখন "সর্ব্বনেশে" এই নামের পরিচয় লিপি তার ললাটে লটকাইয়া দিয়াছেন—কারণ এই "সর্ব্বনেশের" গমন পথে "বেদনার বান ডাকে"—"রক্ত মেখে ঝিলিক মারে; আর এই পাগল গহনপারের বজ্রধ্বনির তালে তালে অট্টহাসি হাসে। এই "সর্ব্বনেশের" সাথী হইতে হইবে—"পিছুর টানে" পিছন পথে পড়িয়া এরা থাকে না—গতিবেগের আনন্দে উন্মত্ত এ যাত্রীদল "রৌদ্রে ছায়ে" ছোটে—রক্ত পায়ের আঘাত দিয়া বাধন খোলে, ঈশান জাগবে তার বিষান বাজবে—"হাওয়ায় বিজয় নিশান" উড়বে—"আর মৃত্যুসাগর মন্থন করিয়া অমৃতরস লুটিয়া এই "সর্ব্বনেশের" দল নিবে।

বাঁশীর সুর নয়—এযে সঙ্খের মুখের ফুৎকার। ৪র্থ কবিতায় গতিকে অভয় শঙ্খ বলা হইয়াছে। শঙ্খ আরাম দেয়না—এ "সকল অঙ্গ ছেয়ে রণসজ্জা" পরায়। এই গতিরবাণী কবি আমাদের নিকট আনিয়াছেন

"গহন রাত্রিকালের" ঝড়ের হাওয়ায় মত্ত সাগর পাড়ি দিয়া—এ গতি "কালো রাতের কালি ঢালা, "দিগঙ্গন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়ায় না—যদিও তখন "আকাশ যেন মুচ্ছি পড়ে সাগর সাথে মেশে" আর "উতল ঢেউ এর দল" অক্রোষে ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে মাথা কুটিয়া মরে।

বস্তুর নিস্তব্ধ নিরালবাসর ঘরের বঁধু ত এ সত্য নয়। অন্তর বেদনার বীণার তারে এই সত্যের চল চঞ্চল আঘাত বাজিয়া উঠে—তাই "ভারত ঈশ্বর সাজাহান" ভাবিয়াছিল তার "অন্তরবেদনা চিরন্তন হয়ে থাক্"—"শুধু থাক একবিন্দু জল কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল"; কারণ "হীরা মুক্তামাণিক্যের ঘটা—শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল" ওযে "ইন্দ্রধনুচ্ছটা"। এই বেদনা তাজমহলের চাইতে সত্য—তাই এই "সমাধি মন্দির এক ঠাঁই রহে চিরস্থির" কিন্তু "জীবনের রথ" বারম্বার কীর্ত্তিরে পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কারণ। তার নিমন্ত্রণ "যে লোকে লোকে" জীবন বস্তুতে প্রকাশ পায়না, বের্গসের ন্যায় কবিও বলিতেছেন—এযে অনন্ত প্রবহমান বিরাট নদী সে যে—"ভৈরবী বৈরাগিনী" "চলে নিরবধি" আর "বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে" প্রবাহ প্রতিহত হইলেই বস্তুর স্তূপ তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।

বের্গসের সঙ্গে কবির এই পর্য্যন্ত মিলিয়াছে ভাল, কিন্তু বের্গস গতিকে কেবল গতিই বলিয়াছেন—ক্রমাগত সমুখ পানে আগাইয়া চলাই তার সত্য,—তৃপ্তি পূর্ণতা এর ধার বের্গস ধারে না। কিন্তু আমাদের কবি গতির ভিতর আনন্দের হাতছানি দেখিতে পাইয়াছেন—নইলে যে এই নিরস অফুরন্ত চলার পিছনে ধাইয়া আমরা হাঁপাইয়া মরিতাম,—কবি আশার বাণী শুনাইয়াছেন—প্রাপ্তির আশা আছে সে আর কিছুই নহে প্রাণের তৃপ্তি—বিপুল আনন্দ। বের্গস আর রবীন্দ্রনাথের এইখানে পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য। কবি বলিয়াছেন গতি কেবল গতিতেই আবদ্ধ নহে—অপ্রকাশের রুদ্ধগুহা হইতে প্রকাশের আলোকে আসা—নিরাকার হইতে আকারে মূর্ত্তিমান হওয়াও তার ধর্ম্ম। "অতীতের গৃহ ছাড়া" অশ্রুতবাণা একদিন না একদিন বাণীর "লোকালয় তীরে" আসিয়া পৌঁছিবেই—"আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই—" "তারতরে" "অরচিত দূর যজ্ঞভূমে" ঠাঁই রচনা হবেই—কবি এই আশারবাণী গাহিয়াছেন কারণ বেদনা চিন্তা এসব আকার পাবেই আকারের তৃষ্ণায় যে এরা পাগল।

কবি ও বের্গস উভয়েই মানুষের দুটী চেষ্টাকে স্বীকার করিয়াছেন—"একটী হইতেছে চলা আরটী হইতেছে চলা হইতে মুক্তির অন্বেষণ।" কবি কিন্তু এই উভয় চেষ্টাই মুলে সত্যের জন্য সন্ধান-কামনা দেখিতে পান।

বের্গস গতিকে লক্ষ্যহীন দুস্তর মরু পাড়ি দিবার জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন—কাজেই গতি তার নিকট নীরস বলিয়া মনে হইয়াছে। সত্যের ভালমন্দ-ছাড়িয়ে যাওয়া কঠিন রূপই তার চোখে পড়িয়াছে। কবি জীবনের সহিত অসীমের মিলন দেখিয়াছেন—তাই গভীর আনন্দের কলকোলাহল শত গানে তার নিকট বাজিয়া উঠে। বের্গস জীবনের উদ্দেশ্য হারাইয়াছেন—কবি হারান নাই; যেহেতু তিনি—গতিতে আমাদের মুক্তি নয়—মুক্তির দেশে যাইতে হইলে গতি মাত্র একটী প্রচেষ্টা—একথা বলিয়াছেন। তাই তিনি সন্দেহের সুরে গাহিয়াছেন—

মৃত্যুর অন্তরে পশি, অমৃত না পাই যদি খুজে
সত্য যদি নাহি মিলে দুঃখ সাথে যুঝে,
* *
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে?
* *
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবেনা কেনা?

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন ?
নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যু ঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্য সীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

৩। লণ্ডন টাইম্‌সে "দাশু রায়"—লেখক শ্রীদীননাথ সান্যাল।

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ কবিবর মধুসূদন হইতে আরম্ভ, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ এবং দাশরথি রায়কেই প্রাচীন সাহিত্যের শেষ সীমানা বলিয়া ধরা যায়। প্রাচীন সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল পৌরাণিক আখ্যাকে অবলম্বন করিয়া তার কাব্য রচনা। সে যুগের শেষ কবি দাশুরায়ের রচনা লোকশিক্ষার দিক দিয়া বাদ দিলেও তার রসপ্রাচুর্য্যের জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পুরাতন পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে দাশুরায় খুব বিশেষভাবেই সমাদৃত হইয়াছিল। সেকালের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক দার্শনিক কবিকুলতিলক প্রভৃতি দেশের সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তিই তাঁর কাব্যকে সমাদর করিত,—"পূর্ণব্রহ্মভাব মিশ্রিত নায়ক নায়িকার অদ্ভুত প্রেমবর্ণনাই" তাহার অসাধারণত্ব। তবে কোন কোন যুবকদল তাহার রচনার পক্ষপাতী ছিল না, তাই কোন প্রাচীন কবি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"হে চম্পক! মলিনাশয় পতঙ্গ অলি তোমায় আদর করে না। তাহাতে কি তোমার দুঃখ হয়? নলিন-নয়নাসমূহের কেশ কলাপ কুশলে থাকুক, তোমার আদরের অভাব কি?"

আজ তাহাই হইয়াছে—পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির কাছেও দাশুরায় সেই পূর্ব্ব সমাদর পাইয়াছে। ২৩শে ডিসেম্বরের Sunday Timesএ দাশুরায় সম্বন্ধে বিলাত প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া তার প্রতিভা পাশ্চাত্য পাঠকগণের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি এই প্রবন্ধে পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের ন্যায়ই বলিয়াছেন— His blending of religicn and philosophy is unrivalled. Dash Roy * * * has sung the stern mysteries of life in the fragrant atmosphere of love. জীবনের কঠোর রহস্যের কাহিনী প্রেমের মাধুরী মাখাইয়া অদ্ভুত ভাবে দাশুরায় দেখাইয়াছে। তাহার রচনা গুণীর নিকট আদরণীয় হইবে তাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবিদ্যা—বৈশাখ ১৩৩১

১। বীরোচিত কর্ম্ম—শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস মহাশয়ের "I promise" পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের অনুবাদ অনুবাদক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী। অনুবাদ সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই—ক্রমশঃ রহিয়াছে; মানুষের প্রিয়পাত্র হইবার একটী উপায় বীর হওয়া, বীরোচিত কর্ম্মই—মানুষকে মানুষের নিকট প্রিয়, সমাজের উপকারী, দেশের হিতৈষী করে। ৬০০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের আর্থার নরপতি "Knight" উপাধির সৃষ্টি করেন, Knightগণের কর্ত্তব্য ছিল—অত্যাচার দমন করা। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, কাহারও উপর কোন রকম অত্যাচার নিবারণ করাই ছিল তাদের কাজ। বীর যেমন অপরের উপকার করে সেইরূপ অপরের অপকার করা হইতেও বিরত থাকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেই বীরোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। পথে ঘাটে, রেলে ষ্টীমারে চলিতে গিয়া অপরের সাহায্য ত করিতেই হইবে; উপরন্তু এও

দেখিতে হইবে যে নিজের চলা দ্বারা অপরের অসুবিধা না হয়। মানুষ সহিয়া যায় বলিয়াই যে অসুবিধা করিতে হইবে এটা উচিৎ নয়। ট্রেনে মালপত্র দিয়া অধিকারের বেশী স্থান দখল করিয়াও অপরের স্থান অভাব না জন্মান, ধূমপান করিয়া অপরের বিরক্তি উৎপাদন না করা ইত্যাদি ছোটোখাটো কাজেতে আমাদের বীরমনের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। মানুষের সহিষ্ণুতার উপর অত্যাচার করা কর্ত্তব্য নহে—নিজের জীবনযাত্রায় পারিপার্শ্বিকের অশান্তি উৎপাদন না করিয়া সাহায্য করাই বীরের কর্ম্ম। কাজেই মানুষকে ভাল বাসিতে হইবে নহিলে এ সব সম্ভবপর হয় না। সমাজকে নিরলস কর্ম্মঠ, উদ্যমী করিয়া গড়িয়া তোলা ও মহৎ কার্য্যের জন্য জীবনপাত করাই বীরোচিত কর্ম্ম।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ ১৩৩১

১। প্রাচীন ভারতের গৃহস্থ—লেখক শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ভারতের মানবজীবনের লক্ষ্য ছিল অমরত্ব লাভ করা বা ভগবৎ প্রাপ্তি। এই জন্যই তারা জীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে—যথা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি। এই চারিটীই গৃহস্থ আশ্রম হইতে উৎপন্ন, এবং গৃহস্থই অপর তিনটীকে পোষণ করে বলিয়া বেদস্মৃতির বিধান মতে মনুও গৃহস্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াছেন। ব্রহ্মচারী গার্হস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষায় শক্তিমান হইবে; গৃহস্থের স্ত্রীই তার গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রধান সাথী, এমন কি পুরাণে গৃহিণীকেই গৃহ বলা হইয়াছে, সারথির ন্যায় স্ত্রীও স্বামীর পাশে থাকিয়া তার সংসারক্ষেত্রে জীবন যাত্রাকে লক্ষ্যাভিমুখে নিয়ন্ত্রিত করিবে, স্ত্রী শুধু স্ত্রীই নহে —সে উপভোগের সামগ্রী নহে। সে গৃহিনীসচিব সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা —,স্ত্রীকে যথাযথ সমাদর ও যত্ন করা গৃহস্থের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য কারণ মনু বলেন সন্তান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সেবা উৎকৃষ্ট সুখ, নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের স্বর্গ—সমস্তই স্ত্রীর অধীন; সুতরাং স্ত্রীকে অনাদর করিলে সবই নিষ্ফল হইবে, স্ত্রীকে পৃথক রাখিয়া স্বামীর কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই। এখন স্ত্রীর কর্ত্তব্য আলোচনা করা যাউক। স্বামী, পরিজনবর্গ, দাসদাসী, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির সেবা ও গৃহস্থালী কর্ম্ম সমাপন করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য। দ্রৌপদী সত্যভামাকে বলিয়াছিল—"আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জনা, রন্ধন, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। গৃহস্থের নিত্যকৃত্য—বেদাধ্যয়ন বা ধর্ম্মালোচনা দ্বারা ঋষিগণের পূজা হোম দ্বারা দেবতার সন্তোষ কুলধর্ম্ম পালন, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের সেবা ও সকল জীবের সেবা, সন্তানকে সুশিক্ষিত করিয়া কুলধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। দাস দাসীর প্রতিও গৃহস্থের কর্ত্তব্য কম নহে। মনুর বিধি অনুসারে "ব্রাহ্মণ আত্মীয় ও ভৃত্যগণকে আহার করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে গৃহস্থ স্ত্রী পুরুষ তাহাই আহার করিবেন।" অতিথি সৎকার গৃহস্থের আর এক প্রধান ধর্ম্ম, ভারতে দানবীর কর্ণের উপাখ্যান ঘরে ঘরে প্রচলিত কাজেই এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বশেষে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মপথে জীবন অতিবাহিত করিবে কারণ ভগবান প্রাপ্তিই তার একমাত্র লক্ষ্য। সধর্ম্মনিরত গৃহস্থই সমাজের দেশের ভূষণ—তাদের উপরই সকল প্রকার উন্নতি নির্ভর করে।

মাতৃমন্দির—বৈশাখ ১৩৩১

১। "মাতৃজাতির প্রতি"—লেখিকা শ্রীমতী সুতপা দেবী।

মাতৃজাতিকেই বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা লিখিত। বিধাতার মানবসৃষ্টি নর ও নারীকে নিয়াই গঠিত—একের অভাবে শুধু অপরের অস্তিত্বে এই সৃষ্টির পূর্ণতা অসম্ভব। কাজেই সমাজের উন্নতির নজর দিকেদিলে নারীকে বাদ দিয়া নরের সাহায্য নিলেই চলিবে না—উভয়ের সাহায্য চাই। কারণ

একপক্ষবিহঙ্গমের উড়িবার আশা বৃথা—চলা অসম্ভব। আর নারী যে সমাজের কতখানি, তা সকলের জানা উচিৎ। যেমন এক চোক বুজিয়া অন্য চোক মেলিয়া ঘুমান অসম্ভব, তেমনি নারীকে বাদ দিয়া একপক্ষ সমাজের চলা অসম্ভব। গণ্ডী যত ক্ষুদ্র করিয়া টানা হইবে মনের বিস্তৃতিও সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইবে। বদ্ধঘরের কোণে—অবরোধের অন্তরালে—শত বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে নারীকে তার সহজ চলা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তার বিকাশ চাই—তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি মাতৃত্বে ও নারীত্বে—এবং তাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে হইতে হইবে এমন নহে, সে পুরুষের কাজ নিজের কাঁধে তুলিয়া নিবে তাও নহে। সে নর নয়—সে নারী, কাজেই তার কার্য্যও স্বতন্ত্র। সে জননী এই তার সব চেয়ে বড় পরিচয়। সন্তান-পালন তার সব চেয়ে বড় দায়িত্ব। তাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া বিশ্বে ছাড়িয়া দেওয়া তার সবচেয়ে বড় দান এ পৃথিবীতে। এজন্য গৃহকর্ম্ম নিপুণতা—নীতিপরায়ণতা—শুশ্রূষা—স্বাস্থ্যরক্ষা—পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য এসব তার প্রথম চাই। দ্বিতীয়তঃ শিল্পচর্চ্চা—লেখাপড়া—সঙ্গীত আলোচনা—তার প্রয়োজন। এসব বাদ দিলেও চলিবেনা কারণ এসব যে তাকে তার নারীত্বের পথে অনেকখানি পাথেয় যোগাইবে। নারী—তাকে জানিতে হইবে তার শক্তি অফুরন্ত—সে শক্তির সন্ধান নিতে হইবে—কারণ বিশ্বের ক্ষয়ক্ষীণ ক্লান্ত ভাণ্ডার সঙ্গোপনে ভরাট করিয়া—তাকে শক্তিমান করাই নারীর কাজ।

২। নারী-শক্তির অপচয়—লেখক শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

লেখক এ দেশের নারী-শক্তির কতখানি অপচয় হইতেছে—তা'র দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ অপচয়কে অপব্যয়ের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিলে দেশও সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি বাঁচিয়া যাইবে।

দেশে জাগরণের পালা আসিয়াছে—কাজেই আজকার দিনে শক্তির অপচয় জাতির পক্ষে মহা হানিকর। তিনি আমাদের দেশের বৈষ্ণবীদের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, আর ছেলেপিলে মানুষ করিবার আপদও ইহাদের নাই। কাজেই মালা ও তিলকের উপর মায়া যদি একটু কমাইয়া ইহারা দেশের উপর ভাল নজর দেয়—তবে দেশের বহু উপকার হয়। ইহারা ঘরে ঘরে শিক্ষা, সেবা, শুশ্রূষা বহিয়া নিতে পারে—দেশের দরিদ্র-নারায়ণের জন্য যদি ইহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে প্রাণপণ পরিশ্রম করে, তবে স্বয়ং নারায়ণ আর তাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবেন না—এ কথাটা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেশের কাজে নামাইবার সময় আজ আসিয়াছে। শক্তিই শুধু উন্নতির চাকাটা ঠেলিয়া নেয়না—তাকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করিবার কলা-কৌশল জানা চাই—নইলে দেশের ও জাতির মঙ্গল সম্ভবপর নহে,।

শান্তিনিকেতন—বৈশাখ ১৩৩১

সংস্কৃত সাহিত্যে মহিলা কবিগণ—লেখক শ্রীমনমোহন ঘোষ।

নারীকে চিরকাল ছোট বলিয়া নাচে দাবাইয়া রাখিবার পক্ষপাতি যে সব পুরুষ, তাদের যুক্তি-তর্কের মুখ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ রচিত। সাহিত্যে নারীর প্রতিভা কতখানি প্রকাশ পাইয়াছে তারই একটা তালিকা সংস্কৃত সাহিত্য ঘাটিয়া এখানে ধরা হইয়াছে। ঋগ্বেদের কতিপয় শ্লোক ঋষি পত্নীদের রচিত তাহা লেখক দেখাইয়াছেন। বৈদিকযুগের পর—লৌকিক সাহিত্যের আসরে নামিয়া আসিলে প্রায় ৪৫জন মহিলা কবির নাম

পাওয়া যায়, ইহাদের লেখা কচিৎ ছিন্ন-মালায় ভ্রষ্ট মণির মত কাল সময়ের পথ প্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে—এই মণির ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য সত্যই মনোহর। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে শর্ম্মিষ্ঠা নামক মহিলা কবির উল্লেখ আছে, ইনি ছলিক প্রয়োগের রচয়িত্রী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে গ্লোরিকা, কুন্তীদেবী, মুক্তা-পীড়া, মাঙ্গমালা মৌরিকা, প্রভুদেবী, প্রকাশদত্তা প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, "সংঘত্রী"-নামক কোন মহিলা কবির নাম পাওয়া যায় ইনি বোধ হয় বুদ্ধের উপাসিকা ছিলেন, ইহার মাত্র দুটী কবিতা পাওয়া যায়। বিকটনিতম্বা নামে মহিলা কবির উল্লেখ কবি রাজশেখরের গ্রন্থে দেখা যায়। ইহার ৪।৫টী কবিতা পাওয়া যায়। ইহার পর যাহার নাম পাওয়া যায় তার নাম বিজ্জাবিহা বা বিহিকা বা বিহকা। ইনি ভবভূতির ন্যায়ই সাহঙ্কারে একশ্লোকে সরস্বতীর সহিত নিজকে সমতুল্যা বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহার লিপি কুশলতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইহার কতিপয় শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। ইন্দুলেখা নামক আর একজন কবির একটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। ভাবদেবী বা ভবিকাদেবী দুইটী সুন্দর কবিতায় অভিমানিনী সাধ্বী নারীর মনের কথা বেশ নিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব মহিলা কবিদের মাত্র নামই পাওয়া গিয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদের বংশ পরিচয় জানিবার ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই বোধ হয় যাইবেও না। সৌভাগ্য ক্রমে কয়টী মহিলা কবির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস নিজেই সাক্ষী আছে। যথা—মধুরবাণী, মোহনাঙ্গিনী, অভয়ার, মানি, আনন্দময়ী, বৈজয়ন্তী, মালিনী ও প্রিয়ম্বদা; ইহাদের ইতিহাস "ভারতীয় বিদুষী" নামক পুস্তকে রহিয়াছে। একজন মাত্র মহিলাকবির লিখিত পূর্ব্বাঙ্গ কাব্য পাওয়া গিয়াছে, এই কবির নাম গঙ্গাদেবী—ইনি কাঞ্চী-রাজমহিষী, ইহার রচিত "মধুরা বিজয়" নামক মহাকাব্য প্রথম হইতে ৮ম সর্গ ও ৯ম সর্গের খানিকটা শুদ্ধ পাওয়া গিয়াছে; ইহা যে শুধু কাব্যকলার দিক দিয়াই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে তাহাই নয়—ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে নিয়া লিখিত বলিয়া ইতিহাসের কার্য্যও ইহা দ্বারা বহুল পরিমাণে সাধিত হইয়াছে।

ইনি স্বরচিত মহাকাব্যের ভূমিকায় আদি কবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া চোদ্দজন কবির নাম উল্লেখ করিয়া প্রশংসাচ্ছলে সমালোচনা করিয়াছেন। ইনি এক শ্লোকে ভারবির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—সেরূপ স্বয়ং মল্লিনাথও বুঝি বলিতে পারেন নাই—যথা :—

"বিমর্দ্দ ব্যক্ত সৌরভ্যা ভারতী ভারবেঃ কবেঃ ।

ধত্তে বকুল মালেব বিদগ্ধানাং চমৎক্রিয়াম ॥"

"বকুল ফুল যত বিমর্দ্দিত হইবে তার সৌরভ ততই ছড়াইয়া পড়ে—তেমনি ভারবির রচনা যতই আলোচিত হয় ততই পণ্ডিতগণের বিস্ময় প্রশংসা আকর্ষণ করে।" এই মহিলা কবির রচনা শক্তির প্রশংসা পণ্ডিত মাত্রেই করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা বিশেষরূপেই প্রমাণিত হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যে মহিলা কবিগণের একটা স্বতন্ত্র আসন ছিল যাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

সৌরভ—বৈশাখ ১৩৩১

রাষ্ট্রের ভিত্তি—লেখক শ্রীযুক্ত মাখনলাল লাহিড়ী।

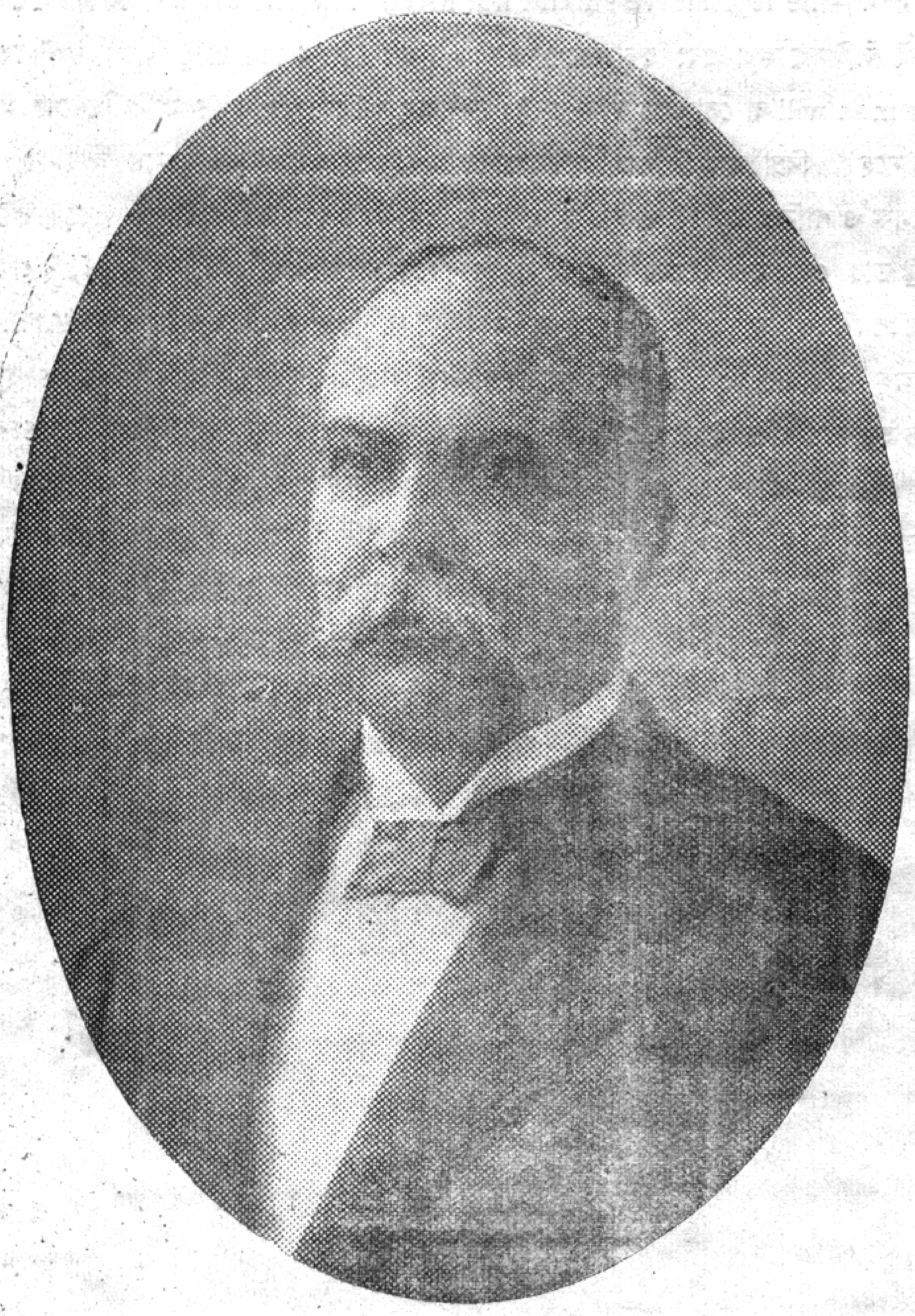
এই নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধে রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি কি তাহাই দেখান হইয়াছে। প্রথমে মনে হয় যে সৈন্যবল ও জোরজুলুমই রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং ইহার সাহায্যেই রাষ্ট্র বাহির এবং ভিতর উভয়ের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে, প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, রাষ্ট্রের ভিত্তি লোক মতের উপর। Upon the consent of the people। লোকে ইহাকে স্বীকার করে তাই সে টিকিয়া আছে, কেন স্বীকার করে? তাহা খোঁজ করিলে বলা যায়—যে দেশের

জনসাধারণ—তাহাদের স্থিতি ও ক্রমবিকাশের জন্য কোন একটা শক্তির প্রয়োজন যখন অনুভব করে তখনই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, (Common Good) সাধারণের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্যই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত কয়েকজনের জন্য রাষ্ট্র নয় কিংবা রাষ্ট্রের জন্য জনসাধারণ নহে, জনসাধারণের জন্যই রাষ্ট্র। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই এই সংঘর্ষ বিপদ আপদের সৃষ্টি হয়; জনসাধারণ যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখনই রাষ্ট্রের পতন হয়। স্বেচ্ছাচারী শক্তি কতদিন শক্তির সাহায্যে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে বটে কিন্তু এই বিপুল জনসংঘ যেদিন শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায় তখন স্বেচ্ছাচারের সকল চিহ্ন দুনিয়ার বুক হইতে লুপ্ত হয়, রাষ্ট্রের প্রধান অধিকার আইন প্রণয়ন ও তাহা কার্য্যকরী করা। আইন প্রণয়ন মানে—the legislatave should not invent law but write it যে নিয়ম লোকের ভিতরে আছে তাহাকেই লিপিবদ্ধ করা এবং সুচারুরূপে কার্যাকরী করা, এইখানেও রাষ্ট্রের লক্ষ্য থাকিবে Common good। Common will বা লোকমত জানা রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। লোকমত ব্যক্তিবিশেষের মত নহে কিংবা কতিপয়ের মত নহে। বিচারক্ষম শিক্ষিত অধিকাংশের মতই লোকমত, অধীনদেশে স্বাধীনতা প্রবর্ত্তন করা উচিৎ তাহা শাসক ও শাসিত উভয়েই স্বীকার করে, কিন্তু লোকমত গঠন করা অধীনদেশে বড়ই কষ্টকর। কারণ যথেচ্ছাচার রাষ্ট্র তার লোকমত গঠনের সমস্ত অলিগলি বিশেষভাবে রোধ করিয়া দাঁড়ায়, এই জনশক্তি যতদিন যথেচ্ছাচারী গভমেণ্টকে আমল হইতে টানিয়া নামাইয়া না দিতে পারে ততদিন তাহা Anarchism আর সফলকাম হইলেই তাহা Revolution, লোকমতের উপর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—লোকমত চঞ্চল হইলে তাহারও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, শত শক্তি ইহাকে রোধ করিতে পারে না—পারে নাই, আমেরিকা ইংলণ্ডকে মাথার উপর হইতে সড়াইয়া দিয়াছে—কারণ তার জনসাধারণ নিজেরাই মাথা তুলিতে চাহিয়াছিল—ইংরেজের মাথাই তাদের মাথা এ কথা তাহারা স্বীকার করে নাই। অবাধ প্রভুতন্ত্র একদিন ইংলণ্ডের জনসাধারণের ধাক্কায় magna charn প্রসব করিয়াছিল, হাঙ্গেরী ইটালীর লোকমত দাবাইয়া রাখিতে পারেনাই—ইংরেজ চুরদিগকে পারেনাই—ইতিহাসত এইসব ঘটনারই নির্ব্বাক সাখী, লোকমতের উপর যারা প্রতিষ্ঠ্য লোকমতের জন্যই একদিন তার পতন হয়। একমাত্র কারণ কোন রাষ্ট্র চিরস্থায়ী নহে—লোকমত ইহার জন্মদাতা আবার ইহারই ধ্বংশকর্ত্তা।

—

৺স্যার আশুতোষ চৌধুরী

প্রায় চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে একটি রত্নগর্ভা-বঙ্গমাতা যে রত্ন প্রসব করিয়াছিলেন উক্ত মাতার দেহান্তের দুই মাস পরে গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রভাতে বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেই রত্নটিও কালগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পত্নী প্রতিভা দেবীর মৃত্যুর পর হইতেই স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তবু—তাঁহার এই মৃত্যু সংবাদ আকস্মিক বজ্রপাতের মতই বাংলার বুকে আসিয়া বাজিয়াছে।



৺স্যার আশুতোষ চৌধুরী।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাবনা জিলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের মত একাধারে শিক্ষিত গুণী-কর্ম্মী ও মনস্বী ব্যক্তি সত্যই

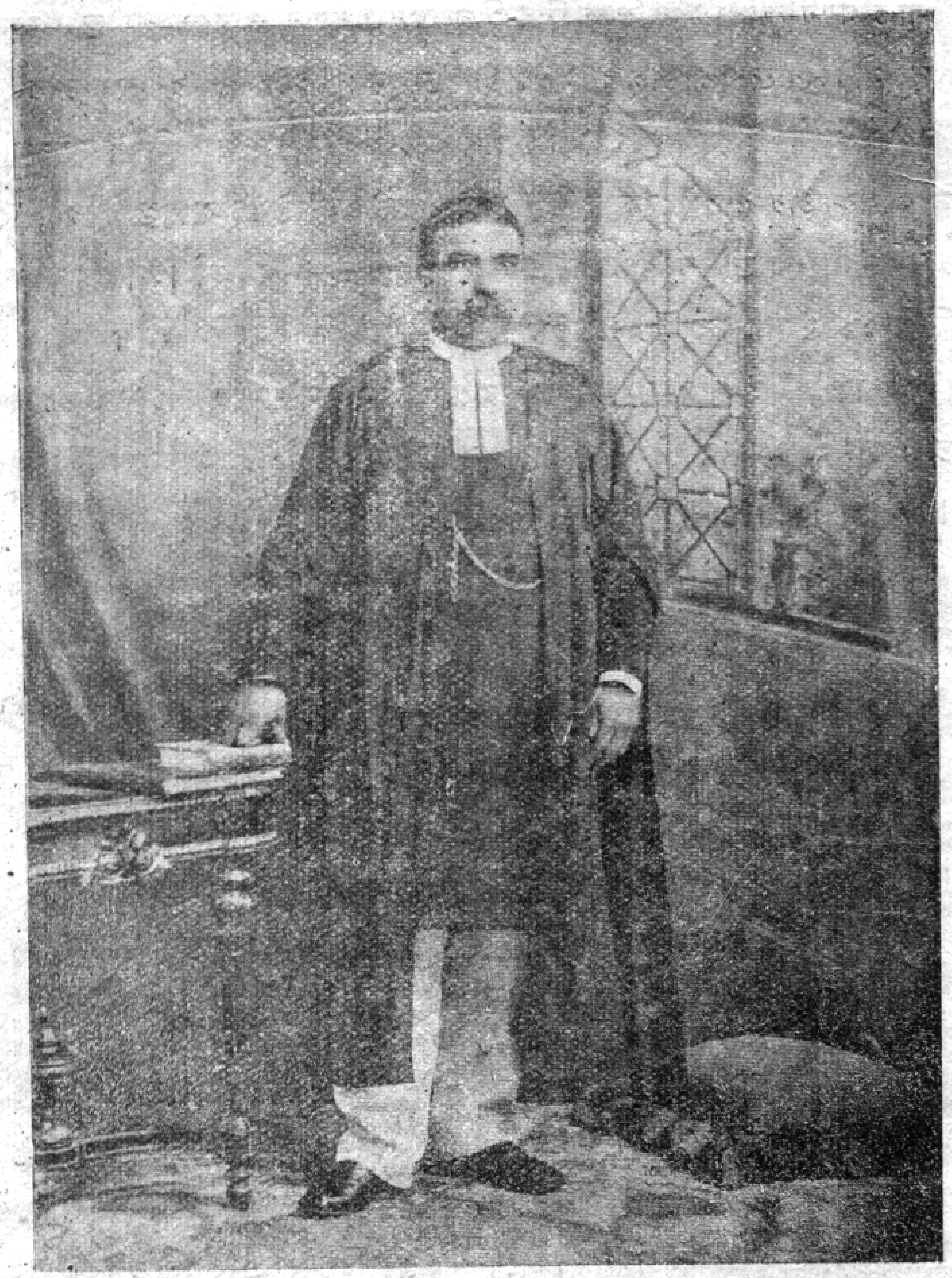
দুর্লভ। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া ১৮৮৩ সনে তিনি বিলাত গমন করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিলাত যাত্রার সময় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবন কথায় এই নবীন যুবকের লোকাকর্ষণীশক্তির পরিচয় সুললিত ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁর পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর সহিত পরিণয় হয়। পঁচিশ বছর ব্যারিষ্টারী করার পর তিনি ১৯১২ সালে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। অতি দক্ষতা ও সুনামের সহিত তিনি এই পদে সমাসীন থাকিয়া ১৯২২ সন পর্য্যন্ত বিচারপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। গত এক বৎসর যাবৎ তিনি পুনরায় আবার ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই সময়েই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় অক্লান্তভাবে দেশের—সমাজের সেবা করিয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার আসন উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯০৪ সালে বর্দ্ধমানের বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনিই দেশের নিকট সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি (Political mendicacy) শব্দটী প্রচার করেন। তিনি ১৯১২ সনে দিনাজপুর সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই Bengal Landholder Associationএর প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতাNational Collegeএর প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম, তিনি Syndicate এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেম্বর ছিলেন। তার লাইব্রেরীটি গুণীগণের উপভোগ্য বস্তু। সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্পকলায় তদীয় অনুরাগ খুব প্রবল ছিল। পত্নী প্রতিভাদেবীর সাহায্যে একটী সঙ্গীত-সংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সঙ্গীতের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

এইত গেল তাঁহার কর্ম্মজীবনের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তিনি তাঁহার জীবনকালে দেশের সমাজের সকল প্রকার মঙ্গলজনক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য দ্বারা জনসাধারণকে পরিচালিত করিয়াছেন সত্য—কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আর একটী অভিনব দিক্ ছিল, সেইটী তাঁহার চরিত্রকে দেবদুর্লভ করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ অমায়িক উদার প্রীতিপূর্ণ হৃদয় কম বাঙ্গালীরই দেখা যায়, তাঁহার সমস্ত গুণাবলী বাদ দিলেও এই গুণ আত্মীয় বন্ধুবর্গের মনে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

বার অ্যাশোসিয়শনে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার ভার পড়িয়াছিল উহার প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় অ্যাটর্ণি মহাশয়ের উপর। ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা এবং আশুতোষের বাল্য সখা ও সহপাঠী। মোহিনীবাবুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে এ ঘোষণা অসম্ভাবিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উপর ভার ন্যস্ত করিয়া মোহিনী বাবু বলিলেন—"একটি কথা বলিতে ভুলিও না, আশু চৌধুরী জীবনে কাহারও কখনও অনিষ্ট করে নাই—নিজের ছাড়া।" আমরা উহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিনামেঘে বজ্রপাত



৺স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আমরা দুর্ব্বল মানুষেরা ভুলিয়া যাই যত বড় লোকই হউন না, দেশের পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হউন, কেহই অমর অজর নহেন। তাই বুঝি মহাকাল এক একবার আমাদের নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়া চৈতন্য দেন, যাকে ভিন্ন চলিবে না ভাবা যায়, তাকে অকস্মাৎ বিনা বলা-কওয়ায়, বিনারোগে সরাইয়া স্তম্ভিত করিয়া দেন, যাতে পরক্ষণেই আত্মসম্বৃত হইয়া দেশের লোক ব্যক্তিগত ইতিকর্ত্তব্যতা ও সংহতকার্য্য সম্বন্ধে দক্ষতর হইতে পারে।

জ্যৈষ্ঠের "ভারতী" প্রেস হইতে বাহিরোন্মুখ, এমন সময় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাটনায় নিদারুণ আকস্মিক মৃত্যুসম্বাদ আসিয়া পৌঁছিল। অধিক বলিবার সময় নাই—

যস্য ছায়া অমৃতং
যস্য ছায়া মৃত্যুঃ
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

কলিকাতা—২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেস হইতে শ্রী কমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৮-শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩১ { তৃতীয় সংখ্যা

ছায়ানট

রিন্ রিন্ ঝিন্ বাজে সুর হৃদয় মাঝারে ;
বাজে সুর বাজেরে !
দেরে দারা দ্রিম্, তানা নারে রিম্, হৃদয় মাঝারে
সুর-বীণা বাজেরে ।
সুখেই দুখ, দুখেই সুখ,
—শুনায় আঙ্গুল কাচিন্,
উতল মন শীতল করে
অরূপ আলাপিন্ ।
হৃদয় মাঝারে
সুর-বীণা বাজেরে ।

ঝিকিমিকি ধিক্ জ্বলে সুর হৃদয়-শিখরে
জ্বলে সুর জ্বলে রে !
ঝক্ মক্ ধক্ তিমির-নাশক—হৃদয় শিখরে
সুর-ভানু জ্বলেরে !

আলোয় রঙীণ, উজ্জল নবীন,
কঠিন হয় সরস !
জড়ের বুকে হিল্লোল তুলে
প্রাণভরা পরশ !
হৃদয় শিখরে
সুর-ভানু জ্বলেরে !

ঝিরি ঝিরি ঝির্ ঝরে সুর হৃদয়-নিঝরে,
ঝরে সুর ঝরেরে !
ছর্ ছর্ ঝন্, কুল্ কুল্ ছন্ হৃদয়-নিঝরে
সুর-ধারা ঝরেরে !
জুড়ায়ে প্রাণ সিঁচায়ে করে
প্রেমের অমৃতে সিনান !
অতি নির্ম্মল চিরসুন্দর
নব জীবন দান !
হৃদয়-নিঝরে
সুর-ধারা ঝরেরে !

শ্রীমতী সরলা দেবী।

হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরকার কথা

আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে কতকগুলি কথা আছে এরূপ যে, তাহার আপাদমস্তক নিগূঢ় অর্থে পরিপূর্ণ। ওঁকার তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং তাহার নীচেই সৎচিদানন্দ শব্দটি। এ সকল শব্দ আমাদের দেশে এক প্রকার আটপহুরিয়া ব্যবহার্য্য সামগ্রী হইয়া গিয়াছে অথচ তাহার প্রকৃত অর্থ অতি অল্পলোকেই হৃদয়ঙ্গম করেন। সৎচিদানন্দ শব্দটির প্রথম অঙ্গটি হচ্ছে সৎ, সৎ বলিতে কি যে বুঝায় তাহা কেহই একটি কথায় বলিতে পারেন না, নানা কথায় সাজাইয়া তাহার অর্থ করেন এরূপ জোলো রকমের যে, প্রকৃত অর্থটী

সহজ ও সুবোধ্য সে তাহা বলিবামাত্রই আপামর সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সে অর্থটি আর কিছু না বাস্তবিক সত্তা। বাস্তবিক সত্তা যে কি পদার্থ তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মহা মহা পণ্ডিতেরা হাবুডুবু খান্। সে সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্ক উঠাইলে শত বৎসরেও তাহা শেষ হয় কিনা সন্দেহ, অতএব এখানে তাহার বাষ্পও উল্লেখ করিতে আমার মন চাহিতেছে না। আমি কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাই যদি কেহ মনে করেন যে আমি সেদিনকার জীব বই নই, দুদিন পরেই চলিয়া যাইব এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জগতই আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে তখন আমার নিকট আমিও যেমন নাই জগতও তেমনি নাই, ইহার মধ্যে আমারই বা অস্তিত্ব কিসে বাস্তবিক এবং জগতেরই বা অস্তিত্ব কিসে বাস্তবিক তাহা তো দেখিতে পাইতেছি না। এরূপ অবস্থায় আমার মতো ক্ষুদ্র জীবদিগের মুখে একথা কিরূপে শোভা পাইতে পারে যে আমার বাস্তবিক সত্তা আছে অথবা জগতের বাস্তবিক সত্তা আছে। যদি কেহ এরূপ ভাবেন তবে তাঁহাকে আমি বলিতে চাই এই—তুমি এই যে সব কথা বলিলে, কিসের জোরে বলিলে? অবশ্য জ্ঞানের জোরে। পশুপক্ষীদের জ্ঞান নাই তাহারা জগতের অস্থায়ীত্ব দেখে না, কোন কিছুরই দোষ অনুসন্ধান করে না, দিব্য সুখে আছে। অতএব আমার নিকট দুঃখ না জানাইয়া তোমার জ্ঞানের নিকটে গিয়া বিনীত ভাবে বল কেন তুমি আমাদিগকে এরূপ নৈরাশ্যে ডুবাইয়া দিতেছ? তুমি না আসিলেই ভাল হইত, তাহা হইলে পশুপক্ষীদের ন্যায় দিব্য নির্ভাবনাচিত্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারিতাম। অতএব আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। সূর্য্যকে তেমনি তুমি বলিতে পার যে তুমি উদয় হইলেই আমরা যত প্রকার কাঁটাবন, কুৎসিত কদর্য্য আবর্জ্জনা রাশি যেখানে সেখানে দেখিতে পাই, অতএব তুমি যদি উদয় না হও তবে আর ও সকল আমাদিগকে দেখিতে হয় না আমরা দিব্য মনের সুখে কালযাপন করিতে পারি। মনে কর তোমার প্রার্থনা অনুসারে সূর্য্য এক সপ্তাহের মত জগৎকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তখন তিনদিন যাইতে না যাইতেই তুমি কাঁদুনি গীত গাহিতে থাকিবে এইরূপ; "আমি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি নাই, সূর্য্য যেমন কাঁটাবন দেখাইত তেমনি পুষ্পও দেখাইত, যেমন কুপথ দেখাইত, তেমনি সুপথও দেখাইত যেমন কুৎসিত সামগ্রী দেখাইত তেমনি সুন্দর সামগ্রীও দেখাইত আর আমি সেই সুযোগে কাঁটাবন ছাড়িয়া পুষ্পবনে যাইতাম, কুপথ ছাড়িয়া সুপথে যাইতাম ইত্যাদি। এখন কেবল বিশাল অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছি, কোথাও কোন আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই।"

যে কোন বস্তুই হোক্ না কেন—সূর্য্যই হোক্ আর চন্দ্রই হোক্—জ্ঞানই হোক্ আর ভাবই হোক্ তার সৎব্যবহার করিলেই সুফল ফলে অপব্যবহার করিলেই কুফল ফলে। আমাদিগকে পথ দেখাইয়া কুলোকদিগের আড্ডায় উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া কার্য্যে আমরা যদি সূর্য্যালোককে খাটাই তাহা হইলে তাহাতে আমরা একরূপ ফল পাইব এবং যদি সাধু সজ্জন দিগের সন্নিধানে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া কার্য্যে খাটাই তাহাতে আর একরূপ ফল

পাইব। জ্ঞানকেও তেমনি যদি আমরা ভাল কার্য্যে খাটাই তবে ভাল ফল পাইব কুকার্য্যে খাটাই তবে কুফল পাইব। অতএব বর্ত্তমান স্থলে জ্ঞানকে কিরূপ কার্য্যে খাটান সর্ব্বাপেক্ষা সুফলপ্রদ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্।

আমরা যদি কেবল জ্ঞানের দোষানুসন্ধান কার্য্যে জ্ঞানকে খাটাই; আমাদের মর্ম্মগত অভিপ্রায় যদি এই হয় যে জ্ঞানকে তাহার দোষের জন্য তিরস্কারপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিলে যাহা আমাদের ইচ্ছা হয় তাহাই করিবার যো পাইব, আমাদিগকে ধমক ধামক দিবার মত অথবা আমাদের শ্রবণকটু কোন কথা বলপূর্ব্বক আমাদিগকে শোনাইয়া দিবার মত উপরওয়ালা কেহই থাকিবে না। এরূপ করিলে লাভের মধ্যে খালি, যে ডালে আমরা বসিয়া আছি সেই ডালের মূলোচ্ছেদ করিয়া আপনারাই আপনাদের অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করিব। সুতরাং জ্ঞানের এরূপ অপব্যবহার করা কোন অংশেই কোন জ্ঞানবান জীবের পক্ষে শুভদায়ক নহে। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা জ্ঞানকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা বলি শোন :—

জ্ঞানকে প্রণিপাত দ্বারা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা, সেবা দ্বারা জানিয়া লও, তত্ত্বদর্শীগণ তোমাদিগকে তাহার উপদেশ দিবেন।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক)

তাহা হইলে আর তুমি এ প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইবে না, আর তাহার ফল হইবে এই যে তুমি সমস্ত জীবকে আপনাতে দেখিবে ও সেই সঙ্গে আমাতে দেখিবে।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক)

তুমি যদি অধম পাপীও হও তাহা হইলেও তুমি জ্ঞান তরীকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ হইতে তরিয়া যাইবে।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৬ শ্লোক)

রাশি রাশি ইন্ধন কাষ্ঠকে যেমন অগ্নি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক)

জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি কালে আপনাতে সেই জ্ঞান লাভ করেন।

(গীতা চতুর্থ অধ্যায় ৩৮ শ্লোক)

এই গীতোক্ত জ্ঞান যে কিরূপ জ্ঞান এবং তাহার অনুশীলন করিলে তাহা হইতে যে কিরূপ ফল আমরা পাইতে পারি তাহা বারান্তরে বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ পাঠ

(Alphonse Daudet)

সেদিন সকালে স্কুলে যাবার জন্য খুব দেরী করে' বাড়ী থেকে ছাড়লেম। সেদিন ধমক্ খাবার ভয় ছিল; কেননা মাষ্টার-মশায় হামেল্-সাহেব আগেই বলে রেখেছিলেন,—প্রত্যয়াস্ত পদ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করবেন। আমি তার প্রথম বর্ণও জানতেম না। একবার আমি ভাবলেম, পালিয়ে যাই, পালিয়ে গিয়ে দিনটা বাহিরে-বাহিরেই কাটিয়ে দিই। আজ দিনটা বেশ গরম ও উজ্জ্বল। বনভূমির ধারে ধারে পাখীরা কেমন গান করছে। আর করাৎ-যাঁতা-ঘরের পিছনে খোলা ময়দানে প্রুশীয় সৈনিকদের অঙ্গচালনার শিক্ষা চল্‌ছে। প্রত্যয়াস্ত পদের চাইতে এ-সব বেশী লোভনীয় হলেও আমার আত্মদমনের বল ছিল—আমি তাড়াতাড়ি স্কুলে চলে গেলেম।

নগর-দালানের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেম, তখন দেখলেম, সেখানে সরকারী বিজ্ঞাপন-তক্তির সম্মুখে একটা ভীড় জমেছে। আমাদের দুই বৎসরের যত খারাপ খবর ঐখান থেকেই এসেছিল। যুদ্ধের পরাজয় সংবাদ, বলপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ, সেনা-নায়কের হুকুম-ইত্যাদি। আমি না থেমে মনে মনে ভাবলেম :—

"না জানি এখন কি ব্যাপার চল্‌চে ?"

আমি যখন ঐখান দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেম,—তখন কামার "বাখতের" ও তার শিক্ষানবীশ, বিজ্ঞাপনের হুকুমগুলো পড়ছিল। "বাখ্‌তের" আমাকে ডেকে বল্লে,—"অত ছুটে চোলো না ছোগ্‌রা; স্কুলে ঠিক সময়ে পৌছবে—যথেষ্ট সময় আছে।"

আমি মনে করলেম, আমাকে নিয়ে বুঝি মজা করছে। আমি থামলেম না, আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে মাষ্টার মশায়ের ছোট বাগানটিতে এসে পৌছলেম।

সচরাচর যখন স্কুল বসে, তখন খুব হুড়োহুড়ি হয়, সে শব্দ রাস্তা থেকেও শোনা যায়; ডেস্কো বন্ধ করা হচ্চে, ডেস্কো খোলা হচ্চে, পোড়োরা সমস্বরে পাঠ আবৃত্তি করচে—খুব উচ্চস্বরে আবৃত্তি করচে—তা বোঝবার জন্য হাত দিয়ে কাণ ঢাক্‌তে হচ্চে; আর মাষ্টার মশায় তাঁর মস্ত "রুলটা" দিয়ে টেবিলে ঘা মারচেন। কিন্তু এখন সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ। আমি মনে করেছিলেম, গোলমালের সুযোগে আমি আস্তে আস্তে আমার ডেস্কে গিয়ে বসব—কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। জানালার ভিতর দিয়ে দেখ্‌লেম, আমার সহপাঠীরা তাদের জায়গায় বসে গেছে—আর মাষ্টার মশায় বগলের ভিতর ভীষণ লোহার রুল-গাছটা রেখে, ঘরের ভিতর লম্বালম্বি পায়চালি করছেন। দরজাটা আমায় খুলতে হল, আর খুলে সকলের সম্মুখ দিয়েই যেতে হ'ল। বেশ বুঝ্‌তেই পারচ,—আমার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল, আর আমার কি ভয়ই হচ্ছিল।

কিন্তু যা মনে করেছিলেম সে রকম কিছুই হ'ল না। মাষ্টার মশায় আমাকে দেখতে পেয়ে বেশ সদয় ভাবে বল্লেন,—"যা, তোর জায়গায় গিয়ে শীগ্‌গির বসে নে। তোর অনুপস্থিতেই আমার কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছিলাম।"

আমি বেঞ্চি টপ্‌কে, আমার ডেস্কে গিয়ে বসলেম। আমি আগে লক্ষ্য করি নি, কিন্তু আমার ভয়টা ভেঙ্গে গেলেই লক্ষ্য করলেম,—মাষ্টার মশায় আজ একটা সুন্দর সবুজ কোর্ত্তা পরেছেন, কোঁচকানো কামিজ পরেছেন, কালো রেশমের ছোট একটি টুপি পরেছেন—সমস্তরেই চিকনের কাজ। এরকম সাজ-সজ্জা "ইনস্পেকশান" ও "প্রাইজের" দিন ছাড়া আর কখনও তাঁকে করতে দেখিনি। তাছাড়া, আজ সমস্ত স্কুলটা আমার চোখে কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌ছিল - কেমন যেন গম্ভীর বলে মনে হচ্ছিল। সব চেয়ে আমার মনে হল পিছনের যে সব বেড়া পূর্ব্বে খালি থাক্‌ত, আজ দেখলেম তার উপর গ্রামের লোকেরা চুপচাপ করে বসে আছে। পূর্ব্বেকার পঞ্চায়তের সর্দ্দার বুড়ো "হাউজার" তিন-কোণা টুপি মাথায়; আগেকার "পোষ্টমাষ্টার";—তাছাড়া আরও অন্যান্য লোক রয়েছে। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ।

হাউজার একটা প্রথম-পাঠ্য পুস্তক সঙ্গে এনেছিল—সেই পুস্তকটা তার হাঁটুর উপর খুলে রেখেছিল—আর সেই পুস্তকের পাতার উপর তার চস্‌মাটা ছিল।

এই সব দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম—এমন সময় মাষ্টার মশায় তাঁর চৌকিটার উপর উঠে দাঁড়ালেন। এবং খুব গম্ভীর ও শান্ত স্বরে বল্লেন,—"বৎসগণ! এই শেষ-পাঠ আমি তোদের দেব। বার্লিন থেকে হুকুম এসেছে, "আল্‌সাস" ও "লোরেনের" স্কুলে শুধু জর্ম্মান শেখানো হবে। কাল একজন নূতন শিক্ষক এখানে আস্‌বে। আজ তোদের এই শেষ ফরাসী পাঠ। আজ তোরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়।"

এই কথাগুলো আমার যেন বজ্রাঘাতের মত মনে হল! হতভাগারা নগর-দালানে বুঝি এই বিজ্ঞাপনটা লট্‌কে দিয়েছে!

আমার শেষ ফরাসী-পাঠ! আমি যে অক্ষর লিখ্‌তেও শিখি নি! আর আমি শিখ্‌তে পাব না! আমার শেখা তবে এইখানেই শেষ হল! আমার এখন ভারী দুঃখ হচ্চে, কেন আমি আগে পড়ায় মন দিই নি; পাখীর ডিম চুরী করে, নদীতে জমাট্‌ বরফের উপর পিছলিয়ে-পিছলিয়ে চলেই এতদিন বৃথা সময় নষ্ট করেছি! কিছু আগে, যে কেতাব আমার কাছে একটা উৎপাত বলে মনে হত, বয়ে নিয়ে যেতে ভার বোধ হত—এখন সেই ব্যাকরণ, সেই সাধুদের ইতিহাস আমার পুরাণো বন্ধু বলে মনে হতে লাগ্‌ল। আমি আর তাদের ছাড়তে পারছিলাম না। আর মাষ্টার মশায় চলে যাচ্চেন, তাঁকে আর দেখ্‌তে পাব না—এই কথা মনে করে তাঁর রুল-গাছার কথা একেবারেই ভুলে গেলেম—আর ভুলে গেলেম তিনি কি ভয়ানক বাতিকগ্রস্ত লোক ছিলেন।

বেচারা! তিনি এই শেষ-পাঠ দেবার খাতিরেই রবিবারের মত সুন্দর সাজসজ্জা করে এসেছেন। এখন বুঝতে পারচি, বৃদ্ধ লোকেরা কেন এই ঘরের পিছনে বসে আছে। তাদের

দুঃখ হচ্ছিল, কেন তারা আগে স্কুলে পড়তে আসে নি। মাষ্টার মশায় চাল্লিশ বৎসর ধরে নিজের কর্ত্তব্য যে ঠিক্ মত করে এসেছেন, এর জন্ম তাঁকে ধন্তবাদ দিতে এবং যে দেশ এখন আর তাদের নয়, সেই দেশের জন্ম সম্মান দেখাতেই তারা এইখানে জড়ো হয়েছে।

আমি যখন এইসব কথা ভাবছিলেম, আমার নাম ডাক হল। এইবার আমার আবৃত্তি করবার পালা। আমি প্রত্যয়ান্ত পদের নিয়মটা যদি স্পষ্ট করে, উচ্চস্বরে, একটুও ভুল না করে' বল্‌তে পারতেম তাহলে বড় খুসী হতেম। কিন্তু প্রথম থেকেই আমার মাথা ঘুলিয়ে গেল, একটা বর্ণও বল্‌তে পারলেম না—ডেস্কটা ধরে রইলেম—আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল—উপর দিকে তাকাতেও সাহস হচ্ছিল না। তখন মাষ্টার মশায় আমাকে বল্লেন ;—বৎস! আমি তোকে ধমকাবো না। এমনইত তোর যথেষ্ট কষ্ট হচ্চে। ব্যাপারখানা এখন দাঁড়িয়েছে এই :—প্রতিদিনই আমরা মনে মনে ভাবতেম—"আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। আজ-না-কাল পাঠ অভ্যাস করব। এখন ছাখ, আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি। আল্‌সাসের বিপদ যত ঐখানেই। সবাই কালকের জন্ম লেখাপড়া স্থগিত রাখ্‌তে চায়। ঐ সব লোক যারা ঐখানে বসে আছে তারা এখন তোকে এই কথা বেশ বল্‌তে পারে ;—"একি রকম? তুই ফরাসী বলে পরিচয় দিস্, অথচ তোর নিজের ভাষায় পড়তেও পারিস্ নে—লিখ্‌তেও পারিস্ নে?" তবে, তুই-ই যে শুধু দোষী তা নয়। আমাদেরও অনেকটা দোষ আছে।

তোর শিক্ষার জন্ম তোর অভিভাবকদের তেমন চাড় ছিল না। তাঁরা বরং পছন্দ করতেন, তুই কোন ক্ষেত-বাড়ীতে কিংবা কোন কারখানায় কাজ করিস্—যাতে ঘরে কিছু পয়সা আনতে পারে। আর আমি? আমারও দোষ ছিল। পাঠ-অভ্যাসের বদলে অনেক সময় আমার ফুলগাছে জল দেবার জন্ম তোদের কি আমি পাঠাই নি? আর আমি যখন মাছ ধরতে যেতেম তখন কি তোদের আমি ছুটি দিতেম না?

তার পর মাষ্টার মশায়, ক্রমশঃ ফরাসী ভাষার কথা পাড়লেন। তিনি বল্লেন, অমন সুন্দর ভাষা পৃথিবীতে আর একটিও নাই—সব চেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। এই ভাষাকে আমাদের বজায় রাখ্‌তেই হবে—ভুল্‌লে চলবে না। কারণ যখন কোন দেশের লোক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তখন যতদিন তারা নিজের ভাষাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে, ততদিন যেন তাদের হাতে কারাগারের চাবিটা থেকে যায়। তারপর তিনি ব্যাকরণ খুলে একটা পাঠ পড়ে শোনালেন। কি আশ্চর্য্য! আমি বেশ বুঝ্‌তে পারলেম। তিনি যা বল্লেন তা এমন সোজা মনে হল! এটাও আমার মনে হয়, আমি পূর্ব্বে কখনই পাঠে এতটা মনোযোগ দিই নি—আর মাষ্টার মহাশয়ও এমন ধৈর্য্যের সঙ্গে সমস্ত আমাদের বুঝিয়েছিলেন, মনে হল বেচারী, চলে যাবার আগে, তাঁর সমস্ত বিদ্যে আমাদের মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দেবার জন্ম উৎসুক হয়েছেন।

ব্যাকরণের পর হাতের লেখা আরম্ভ হল। সেদিন মাষ্টার মশায় আমাদের জন্য সুন্দর গোল-গোল ছাঁদের অক্ষরে লেখা আদর্শ-লিপি তৈরী করে এনেছিলেন। France, Alsace, France, Alsace। স্কুল ঘরের সর্ব্বত্র এই লেখাগুলো ডেস্কের মাথার উপর একটা কাঠি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল—ওগুলো ছোট ছোট নিশেনের মত দেখতে হয়েছিল। তুমি যদি দেখ্‌তে, সবাই কেমন কাজে লেগে গিয়েছিল,—আর সব কেমন চুপচাপ! শব্দের মধ্যে কাগজের উপর শুধু কলমের খচ খচ শব্দ। একবার কতকগুলো আর্স্‌লা ঘরের ভিতর উড়ে এসেছিল; কেউ তাদের দৃকপাতও করলে না। এমন কি খুব ছোট ছেলেরা যারা একটা নস্‌কায় দাগা বুলোচ্ছিল, তারাও মনে করছিল যেন ফরাসী শিখছে। ছাদের উপর পায়রারা নীচু স্বরে "একুমবম্‌-বকুবকম্‌" করছিল; আমি মনে মনে ভাবলেম,—"এই পায়রাদেরও কি ওরা জর্ম্মান ভাষায় ওদের বুলি বলাতে বাধ্য করবে?"

যখন আমি লেখায় ক্লান্ত হয়ে একএকবার উপরদিকে চোখ তুলছিলেম, তখনই দেখতে পাচ্ছিলেম মাষ্টারমশায় নিশ্চলভাবে চৌকির উপর বসে আছেন; একবার এটার দিকে, একবার ওটার দিকে তাকাচ্চেন—তাঁর ছোট্ট স্কুল-ঘরটি কেমন দেখাচ্চে শুধু তাই দেখবার জন্য। ভেবে দেখ! চাল্লিশ বৎসর ধরে তিনি একই জায়গায় বসেছেন—জানলার বাহিরে তাঁর বাগানটি—আর সম্মুখে তাঁর পোড়োরা। কেবল, ডেস্কো ও বেঞ্চগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে; বাগানের আখরোট গাছগুলো আরও লম্বা হয়েছে; আর "হপ-লতা" যা তিনি নিজের হাতে পুঁতেছিলেন, জানলায় জড়িয়ে জড়িয়ে ছাদ পর্য্যন্ত উঠেছে। এই সমস্ত ছেড়ে যেতে হবে মনে করে' বেচারীর বুক ফেটে যাচ্ছিল। উপরতলার এক ঘরে তাঁর ভগিনী জিনিসপত্র বাকসোবন্দি করছিলেন, তার শব্দ তাঁর কাণে আস্‌ছিল! কেননা, তারপর দিনই তাঁদের দেশ ছেড়ে যেতে হবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠ নেবার সাহস তাঁর ছিল। হাতের লেখা হয়ে গেলে ইতিহাসের পাঠ আরম্ভ হল, তারপর কচি ছেলেরা "বি—এ বে, "বি-ও বো" বি আই—বি" এই রকম সুর করে আবৃত্তি করতে লাগল। ঐ ওখানে—ঘরের পিছন দিকে বুড়ো "হাউজার" চস্‌মা নাকে দিয়ে, প্রথম-পাঠ্য পুস্তকটা হাতে নিয়ে, তাদের সঙ্গে অক্ষর বানান করছিল। দেখ্‌তে পেতে, সেও শেখবার চেষ্টা করছিল; আবেগ-ভরে তার স্বরটা কাঁপছিল,—আমাদের এমন মজা মনে হচ্ছিল,—আমরা হাস্‌ব কি কাঁদবো ভেবে পাচ্ছিলেম না। আমায় এখনো বেশ মনে আছে—সেই শেষ পাঠটা!

হঠাৎ গির্জার ঘড়িতে ১২টা বাজলো। তার পরেই উপাসনা। ঠিক এই সময়ে অঙ্গচালনার শিক্ষাক্ষেত্র হতে প্রুসীয় সৈনিকেরা ফিরে এসে আমাদের জান্‌লার নীচে তুরী নিনাদ করলে। পাণ্ডুবর্ণ-মুখ মাষ্টার মশায় তাঁর চৌকীর উপর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে এত লম্বা বলে আমার আর কখনো মনে হয় নি। তিনি বল্লেন:—

"বন্ধুগণ! আমি—আমি" কিন্তু কি-যেন একটা গলায় আট্‌কে গেল—আর বল্‌তে পারলেন না।

তার পর কালো-তক্তির দিকে ফিরে, যত বড় অক্ষরে পারেন এই কথাগুলি লিখ্‌লেন :—

"চিরজীবি হোক্ ফ্রান্স!"

তার পর থেমে, দেয়ালের গায়ে মাথা ঠেস দিয়ে, একটি কথাও না বলে, শুধু হস্ত ভঙ্গির দ্বারা আমাদের জানালেন ; —"স্কুল শেষ হয়ে গেল—তোমরা যেতে পার।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবীন জার্ম্মাণীর জীবন-স্পন্দন

(১)

বিগত নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেনাপতি লুডেনডোর্ক এবং ন্যাশন্যালিষ্ট জননায়ক হিট্‌লার মিউনিক শহরে বিদ্রোহী হন। পাঁচ মাস ধরিয়া আদালতে তাঁহাদের বিচার হইতেছিল। সম্প্রতি রায় বাহির হইয়াছে। (১ এপ্রিল ১৯২৪)। লুডেনডোর্ক বেকসুর খালাস। হিট্‌লারকে ছয় মাসের জন্য নজরবন্দিভাবে থাকিতে হইবে। গবর্মেণ্টের মর্জ্জি হইলে ইঁহাকে পাঁচ বৎসরের ম্যাদ ভুগিতেও হইতে পারে।

দুনিয়ার সকলেই এই রায় শুনিয়া হতভম্ব। আইনের চোখে এই দুই জনের অপরাধ অতি গুরুতর শ্রেণীরই ছিল। জার্ম্মাণ দণ্ড বিধি অনুসারে রাজদ্রোহ এবং আইন ভাঙার অপরাধে মৃত্যুই আসল সাজা। কম সে কম আজীবন কারাবাস অপরাধীদের ভুগিতে হয়।

ইঁহারা যে "দোষী" সে কথা ইঁহারা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান জার্ম্মাণ গবমেণ্টকে উঠাইয়া দিয়া একটা নতুন দেশ গড়িয়া তোলা ইঁহাদের মতলব ছিল, এবং তাহার জন্য বার্লিন পর্য্যন্ত ধাওয়া করা ইঁহাদের কার্য্য তালিকায় স্থান পাইয়াছিল এ সব কথা খোলাখুলি বলিতে ইঁহারা ছাড়েন নাই। ইহাকে দোষ বিবেচনা না করিয়া ইঁহারা ধর্ম্মই বিবেচনা করিতেছিলেন।

(২)

ব্যাভেরিয়ার বড় শহরে দাঙ্গা ঘটিয়াছিল। ব্যাভেরিয়ার আইন ভাঙা হইয়াছে সর্ব্বপ্রথম। কাজেই মিউনিকে বিচার হইতেছিল। কিন্তু গবমের্ণ্টের পক্ষের সরকারী উকীল আসামী-দিগকে আসামীর মতন ব্যবহার করেন নাই।

বার্লিনের "ফোসিশেৎ সাইটুঙ" বলিতেছেন ;—"রাজদ্রোহের মামলায় আসামীদিগের সঙ্গে আদালতের এমন মধুর ও বন্ধুত্বময় ব্যবহার জগতের আর কোথাও দেখা যায় নাই। এই কাগজ ন্যাশন্যালিষ্ট মতের বিরোধী। সাম্যবাদী গণতন্ত্রী হিসাবে "ফোসিশে" পত্রটা জার্ম্মাণিতে নামজাদা।

সোশ্যালিষ্ট মতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাগজের নাম "ফোরহ্বেয়ার্টস্।" এই দৈনিকের সম্পাদক লিখিয়াছেন ;—"মিউনিক জার্ম্মাণির ন্যাশন্যালিষ্টদের কর্ম্ম কেন্দ্র! এই আওতায় ন্যাশন্যালিষ্ট আসামীদিগকে কি বিচারকেরা আসামী জ্ঞান করিতে পারে? আদালতের কাণ্ডকারখানায় ভবিষ্যতে রাজদ্রোহ, আইন-ভাঙা, পুলিশের সঙ্গে স্বদেশ সেবকদের লড়াই সবই আইন-সঙ্গত এবং ন্যায্য বিবেচিত হইতে থাকিবে।"

(৩)

বিচারটা চলিয়াছে আগাগোড়া যেন রাষ্ট্রনৈতিক সভার বাক্‌বিতণ্ডার আকারে। আসামীদের তরফ হইতে গলাবাজির সুযোগ দেওয়াই যেন আদালতের মতলব ছিল।

কিন্তু সরকারী উকীল মহাশয় আইনের কেতাব খুলিয়া আসামীদের অপরাধ সাব্যস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবেচনায় লুডেনডোর্কের দুই বৎসর এবং হিটলারের আট বৎসর জেল হওয়া উচিত। এই মত তিনি খুলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেনও।

বার্লিনের "লোকাল আনৎসাইগার" ন্যাশন্যালিষ্টপন্থীদের দৈনিক। সরকারী উকীলের রায় শুনিবামাত্র এই কাগজের সংবাদদাতা বার্লিনে তার পাঠাইয়া জানাইল :—জার্ম্মাণির পক্ষে আজ এক অতি দুর্দ্দিন। এমন লজ্জা ও নিন্দা জার্ম্মাণ জাতিকে আর কখনো সহিতে হয় নাই! সেনাপতি লুডেন ডোর্কের মতন জার্ম্মাণ বীরকে একজন জার্ম্মাণ উকীল জার্ম্মাণ ভাষায় জার্ম্মাণ আদালতে অপরাধীরূপে সাজা দিবার প্রস্তাব করিয়াছে!"

(৪)

অথচ উকীল মহাশয় হিটলারকে সাজা দিতে যাইয়াও তাঁহার চরম প্রশংসা করিয়া ছাড়িয়াছেন। হিটলারের চরিত্রবত্তা এবং স্বার্থত্যাগ সম্বন্ধে ইনি শতমুখে গুণ গাহিয়াছেন।

সার লুডেন ডোর্ক সম্বন্ধেত কথাই নাই। সরকারী উকীল বলিয়াছেন, "লুডেনডোর্ক দেশের আইন অমান্য করিয়াছেন। কিন্তু কেন তিনি এই আইন ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? তাহার কারণ এই যে তিনি একজন মানুষের মতন মানুষ এবং সিপাহী। সেনাপতি বাহাদুর সমরক্ষেত্রে যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন সেই যশ আজকার এই আইন-ভাঙা সত্ত্বেও অটুট রহিল।"

লুডেন ডোর্ককে স্বর্গে তুলিতেও উকীল মহাশয় ছাড়েন নাই। ইনি বলিয়াছেন :— "সেনাপতি বাহাদুর জানিতেন যে হয়ত তাঁহার আরব্ধ বিদ্রোহ সফলতা লাভ করিবে না। তিনি স্পষ্টই জানিতেন যে দাঙ্গা ঘটানো বেআইনি এবং চরম অপরাধ। তবুও তিনি হিটলার প্রবর্ত্তিত বিদ্রোহের আন্দোলনে নিজকে সর্ব্বপ্রধান দায়িত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কেন? তাহার কারণ, লুডেন ডোর্ক একজন মানুষের মতন মানুষ এবং সিপাহীর মতন সিপাহী। তাঁহার সাধছিল যে স্বদেশের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনিই যেন শত্রুপক্ষের প্রথম গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। লুডেন ডোর্কের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ এবং স্বদেশভক্তিই তাঁহাকে বিদ্রোহ-রূপ বে-আইনি কাজে প্রবৃদ্ধ করিয়াছে।"

(৫)

উকীলের এইরূপ নরম গরম বক্তৃতার পর লুডেন ডোর্ক আসামীদের তরফ হইতে এক বক্তৃতা দিতে উঠেন। আদালতকে ইনি অনুরোধ করেন যে সকল আসামীকেই খালাসের হুকুম দেওয়া হউক।

লুডেন ডোর্কের বক্তৃতাটা গোটা জার্ম্মাণ দেশের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইনি বলিয়াছেন;—"১৯০৪ সাল হইতে আমি নিজকে স্বদেশের সেবায় বাহাল রাখিয়াছি। সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির প্রত্যেক যুবাকে সমর বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আমি সেকালের সরকারকে হাজার বার অনুরোধ করিয়াছিলাম। কেহই আমার কথায় কান দেয় নাই। তাহার পর যখন মহা যুদ্ধ সুরু হয় তখন আমি আমার স্বদেশবাসীকে অধিকতর স্বার্থত্যাগ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলাম। আমার সকল অনুরোধ উপরোধ অরণ্যে রোদন মাত্র সার হইয়াছিল। তাহার ফল ১৯১৮ সালের পরাজয়।"

কিন্তু লুডেন ডোর্ক এখনও আশা ছাড়েন নাই। তাঁহার মতে স্বদেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তোলা এখনো সম্ভব। সেনাপতি মহাশয় বলিয়াছেন:—"যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি বটে। কিন্তু দেশের যেখানে যেখানে আমি জন-সাধারণের জাতীয় আন্দোলনের সংস্পর্শে আসিয়াছি সেইখানেই আমি যথার্থ স্বদেশভক্ত স্বার্থত্যাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবাপুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এই সকল সার্ব্বজনিক জাতীয় প্রচেষ্টাই জার্ম্মাণ সমাজকে পরাজয়ের বিষাদ ও নৈরাশ্য হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই জাতীয় প্রচেষ্টাগুলা যদি সফলতা লাভ করিবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে জার্ম্মাণি আবার একটা ভার্সাইয়ের অপমান সহিতে বাধ্য হইবে। সেই ভার্সাই ১৯১৮ সালের ভার্সাই হইতে আর বেশী অপমান জনক।"

লুডেন ডোর্কের শেষ কথা এই;—"আমার কথা শুন। আমার কণ্ঠে বাহির হইতেছে স্বাধীনতার জন্য নির্য্যাতি জার্ম্মাণাত্মার করুণ ক্রন্দন। স্বদেশ সেবক আসামীদিগকে বেকসুর খালাস করিয়া দেওয়াই বিচারালয়ের কর্ত্তব্য।"

(৬)

এই গেল লুডেন ডোর্কের বাণী। হিট্‌লারের সহযোগী আর একজন আসামী আদালতকে বলিয়াছেন;—"তোমরা বলিতেছ আমরা আইন ভাঙিয়াছি। নির্লজ্জ বেহায়া! এইগুলো আবার আইন? কে এইসব আইন করিয়াছে? কোন্ শাসন পদ্ধতি অনুসারে এই সকল আইন কায়েম হইয়াছে? ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের আমরা তোয়াক্কা রাখি না। সে ত স্বদেশদ্রোহী নিমকহারাম ছোটলোক ইহুদিদের সৃষ্টি। শত্রুপক্ষের টাকা খাইয়া এই সব লোক জার্ম্মাণ জাতির পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। পল্টন হইতে পলাইয়া আসিয়া যে সকল জার্ম্মাণ আমাদের সেনাশক্তির ইজ্জৎ নষ্ট করিয়া ছাড়িয়াছে সেই সকল সোশ্যালিষ্ট শত্রুপদলেহনকারী পাপিষ্ঠ নরপিশাচদের তৈয়ারি আইন স্বীকার করিয়া আমরা

চলিব ? তাহা হইতে পারে না। ১৯১৮ সালের আইনকানুন সবই বেআইনি। সেইগুলার উচ্ছেদসাধন করাই জার্ম্মান স্বদেশসেবকদের একমাত্র স্বধর্ম্ম।"

জার্ম্মান ন্যাশন্যালিষ্টরা সর্ব্বদা এই কথাই বলিয়া থাকে। ইহাদের বিবেচনায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকা জুয়াচুরি করিয়া লড়াইটা জিতিয়াছে। জার্ম্মাণিতে কতকগুলা সোশ্যালিষ্ট ইহুদি ও খৃষ্টান নর-নারী শত্রুপক্ষের ধাপ্পায় পড়িয়া তাড়াতাড়ি লড়াই খতম করিয়া দেয়। তথাকথিত বিশ্বশান্তির প্রপাগাণ্ডা চালাইয়া শত্রুরা জার্ম্মাণ সোশ্যালিষ্ট দিগকে সমরপন্থী ন্যাশন্যালিষ্টদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। এই কারণে সোশ্যালিষ্ট দিগকে জার্ম্মাণ সমাজের অধিকাংশ লোকই বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে।

(৭)

আদালতে হিট্‌লারের বক্তৃতায় এই কথাই স্পষ্টরূপে প্রচারিত হইয়াছে। হিটলার বলিতেছেন;—"আমরা আইন ভাঙিয়াছি, শাসন-দ্রোহ, রাজ-দ্রোহ আমাদের অপরাধ। বেশ কথা। কিন্তু রাজদ্রোহী নয় কে ? জগতের সকল বড় বড় কাজেই রাজদ্রোহ গোড়ার কথা। রাষ্ট্রবর বিস্‌মার্ক ছিলেন রাজদ্রোহী। আর আজকালকার তুর্কবীর কামালপাশা এবং ফাসিষ্ট দলপতি ইতালীয়ান মুসোলিনিও রাজদ্রোহী। আমরা রাজদ্রোহটাকে সফল করিয়া তুলিতে পারি নাই। ইহাই আমাদের একমাত্র অপরাধ। কুছ পরো আ নাই।"

রাজদ্রোহ বা শাসন-দ্রোহ অর্থাৎ আইনভাঙা কাণ্ড দুষনীয় নয় এই মত প্রচার করিবার পর হিটলার বলিতেছেন —কিন্তু দেশদ্রোহ ঘোরতর পাপ। সেই দেশদ্রোহ অপরাধের জন্ম কাহারা দোষী ? বর্ত্তমান জার্ম্মাণি শাসনপদ্ধতি যেসকল লোক স্থাপন করিয়াছে তাহারা সকলেই। যাহারা "আর্মিষ্টিশ" মাগিয়া লড়াই থামাইয়াছিল তাহারা দেশদ্রোহী। যাহারা ভ্যার্সাইয়ের সন্ধি সহি করিয়াছিল তাহারা দেশদ্রোহী। যাহারা বিগত পাঁচবৎসর ধরিয়া আঁতাঁতের প্রত্যেক কথায় সায় দিয়া জার্ম্মাণ জাতিকে শত্রুদের হাতে বিকাইয়া দিতেছে তাহারা দেশদ্রোহী। অর্থাৎ জার্ম্মাণরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবার্ট, রাষ্ট্রনায়ক শাইডেমান এবং অন্যান্য সোশ্যালিষ্ট পন্থী জর্ম্মাণ হোমড়া চোমড়া সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বদেশদ্রোহীতার অপরাধে জেলে পাঠানো উচিত।

সুর চড়াইয়া হিটলার আদালতকে শুনাইলেন ;—কার্ল মার্ক্‌স্ প্রবর্ত্তিত শ্রেণীবিবাদ নীতি এবং সোশ্যালিষ্ট মতের রাষ্ট্রনীতি ধ্বংস করা আমার জীবনের লক্ষ্য। পাঁচবৎসর ধরিয়া ব্যাহ্বেরিয়ায় এবং জার্ম্মাণির প্রদেশে প্রদেশে আমি এই লক্ষ্য অনুসারে কাজ করিয়া আসিতেছি। ব্যাহ্বেরিয়াকে খাঁটি জার্ম্মাণ আদর্শের কেল্লায় পরিণত করিয়া ব্যাহ্বেরিয়ার সাহায্যে সমগ্র জার্ম্মাণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ছাড়িব ইহাই আমার পণ। জগতে জার্ম্মাণি আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। দেখিতে পাইতেছ না আমার সেনা জার্ম্মাণির পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িয়া যাইতেছে ? নবেম্বর মাসে আমাদের বিদ্রোহ সফলতা করেনাই ভাবিতেছ ? ভুল বুঝিয়াছ। সমগ্র জার্ম্মাণ জাতি আজ তাতিয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রের

সাধন কিম্বা শরীর পতন এই মন্ত্র পাঁচবৎসর পর জার্ম্মাণ যুবকমহলে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদিগকে জেলে দিতে চাও দাও। তোমার রায় শীঘ্রই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ভগবানের আশিষ আমাদিগকে মুক্তি দিয়া ছাড়িবে

(৮)

নবীন জার্ম্ম্যাণির জীবনস্পন্দন বিগত বৎসরও দেখা গিয়াছে। মন্ত্রী কুনোর আমলে সত্যাগ্রহের লড়াই সুরু হওয়া অবধি জার্ম্মাণিরা আবার যেখানে সেখানে শক্তিযোগের পরিচয় দিতেছে। ইতিমধ্যে আবার ক্রাউণপ্রিন্স জার্ম্মাণ যুবরাজ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে রিপাব্লিক বা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন জার্ম্মাণিতে মাথা তুলিতেছে। শ্রীযুক্ত হেল্‌ফেরিথ সোশ্যালিষ্ট এবং ডেমোক্র্যাট ইত্যাদি সাম্যধর্ম্মী দিগকে কাবু করিবার জন্য ন্যাশন্যালিষ্টদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। হেল্‌ফেরিথ খুব পাকা লোক। টাকার বাজার, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিষয়ে ইনি ওস্তাদ। লড়াইয়ের যুগে ইনি ছিলেন জার্ম্মাণির মন্ত্রী। ইংরেজরা হেলফেরিথকে চরম দুসমন বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

পুনর্বিবাহ

বিবাহ যদি সত্যই ঐ নামের যোগ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ দ্বারা আমাদের আপনার প্রতিই অবিশ্বাসী হইতে হয়; এবং জীবনটা মিথ্যাপূর্ণ ও জটিল হইয়া উঠে। কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি দৃঢ় নয়,—আপনাকে আপনি লইয়া থাকিতে ও চালাইতে পারে না,—তাহারা যদি পূর্ব্ব পতি-পত্নীর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও আবার বিবাহ করে, তবে তাহাদের মনে রাখা উচিত যে আপনার পূর্ব্বজীবনের দাবীও তাহার সহিত ছাড়িতে হইবে। সন্তানাদি বাহিরে প্রকাশিত নিতান্ত অচ্ছেদ্য যোগ না ছাড়িতে পারিলেও যতদূর সম্ভব সত্যই যথাসাধ্য নূতন জীবন আরম্ভ করিতে হইবে। যাহাদের হৃদয় দৃঢ়তার অভাব সত্ত্বেও প্রেমপ্রবণ, তাহাদের কিন্তু ইহাতে অনেক দুঃখও পাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। কিন্তু সে দুঃখ সম্পূর্ণই একা গোপনে বহন করিতে হইবে। নূতন সঙ্গীকে তাহার বোঝার লেশমাত্র জানিতে দেওয়ার অধিকারও কাহারও থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেককে আবার বিবাহ করিয়াও পূর্ব্ব স্ত্রীর ফটো ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিয়া এবং তাঁহার পত্রাদি লইয়া ভালবাসা ও ভাবোচ্ছাসের ফোয়ারা ফুটাইতে দেখা যায়। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে তাঁহার গুণপনার উল্লেখ করিতে ও তুলনা পর্য্যন্ত দিতে যাহারা পারে, তাহাদের পাষণ্ডতার কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে এই সব নীচতা দেখিতে দেখিতে এ বিষয়ে আমাদের যে রুচি বিকার ঘটিয়াছে,

তাহার বিষয় ভাবিতেও অবসন্ন বোধহয়। ঐরূপে পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি প্রেমোচ্ছাস প্রকাশের চেষ্টা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, ইহা দ্বারা একসঙ্গে তাঁহাদের উভয়কেই অপমানিত করা হয়। নূতন স্ত্রীর সাক্ষাতে পূর্ব্বস্ত্রীর "পূজা" তাঁহাকে কেবল বিদ্রূপ করা মাত্র, আর দ্বিতীয়াও এমনই মনের মধ্যে যথেষ্টই বঞ্চিত ও সঙ্কুচিত থাকেন,—তাহার উপর আবার এরকম নির্লজ্জ ব্যবহার কেবল মনের ঘোর ইতরতার পরিচয়।

যাঁহাদেরই মনের মধ্যে একটু পদার্থ আছে, তাঁহাদের সকলেই এরূপ স্থলে একটু আত্মস্থ হইবার অবকাশ পাইলেই আপনার প্রতি একটা ঘৃণা ও অনুতাপের ভাব,—হারান ধনের জন্য বেদনা এবং তাহার জন্য কাঁদিবার অধিকারও যে হারাইতে হইয়াছে——ইহাতে একটা তীব্র যন্ত্রণার দংশন সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত ইহা তাঁহাদের আপনারই দুর্ব্বলতা ও কর্ম্মফল। তুমি যাহাকে হারাইয়াছ তাহার অভাবের ক্ষতি তোমাকে সহিতেই হইবে। যে তোমার জীবনে দেহে, মনে এক হইয়াছিল,—তাহার স্থানে আর একজনকে আনিলেই কি তাহাকে আর ফিরিয়া পাইবে, তোমার সেই জীবন আর ফিরিয়া আসিবে? জীবনের ধারা যদি অক্ষুন্ন রাখিতে চাও,—তাহাকে যদি সত্যই জীবনে কতকটা পাইতে ও রাখিতে চাও,—তাহা হইলে আর কাহাকেও আপনাদের নিভৃত গোপনীয়তার মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহা অপবিত্র করিও না।—একাকী তাহার অভাবের দুঃখ বহন কর। তাহাতে তোমার নিজ জীবনও স্বচ্ছন্দ, সরল, সবল হইয়া উঠিবে। কিন্তু আপনাকে চালাইবার শক্তি যদি তোমার না থাকে ও সাংসারিক সুখই তোমার প্রধান হয় তবে মিথ্যাজীবনের ভার বহিতেই হইবে।

আপনার শ্রেষ্ঠজীবনের দিকে দূর হইতে চাহিয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জনের জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। উহাকে জীবনের শ্রেষ্ঠধন বলিয়া আঁকড়াইয়া রাখিতেও যে তোমার প্রলোভন হইবে না এমন নয়,—আর "নূতন" জীবনের মিথ্যার মধ্যে (তুমি জান যে তাহা মিথ্যা) তাহাও যদি ক্রমে হারাইতে থাক, তাহা হইলে দীর্ঘ নিঃশ্বাসও তোমার কম পড়িবেনা। যতই তাহা হারাইবে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাও ততই যে দূরে যাইতেছে,—ইহাও তোমার অন্তরের কোণে বিঁধিয়া থাকিবে। এমন কি তোমার নূতন সঙ্গীর মধ্যেও প্রকৃত ভালবাসা দেখিতে পাইলে তুমি যে তাহার কত অনুপযুক্ত এই লজ্জায় মনে মরিয়া যাইবে। ইহাতে যে তোমার সত্য অধিকার নাই,—এই ভাবও তুমি সহজে দূর করিতে পারিবে না। মনের মধ্যে হাহাকারও যে উঠিবে না এমন নয়,—"হায় হায় ইহা যদি তাহার কাছ হইতে আসিত।"—

জীবনের কোন সুখেই যে আর পরিপূর্ণতা ও গৌরব নাই,—ইহাও মনে লাগিয়া থাকিবে।—আর ইহার কিছুই যদি তোমার না হয়, তাহা হইলে অবশ্য পশুর মত মাংস খণ্ড পাইলেই তোমার আর কোন সুখেরই বাধা হইবে না। তবে দয়া করিয়া ইহ পর-লোকবাসী দুই দুইটী আত্মার অপমান অন্ততঃ করিও না।

এই সূত্রে একটী কথা মনে পড়িল। অনেক সময় সন্তানদের লালন পালনই নূতন স্ত্রী আমদানীর একটী বিশেষ গুরুতর কারণ বলিয়া উপস্থাপিত করা হয়। ইহা এত অসার যে, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেও ঘৃণা হয়। তবে নরনারীর সম্বন্ধের যে অবস্থা, তাহাতে এমন খেলো, বাজে ও প্রত্যক্ষ অসত্য ও অন্যায় জিনিষ নাই, যাহার বিষয়েও তর্ক না করিতে হয়। কাজেই ইহাতে প্রথমেই এই বলিতে হয় যে বিজ্ঞতার আবরণ ছাড়িয়া একবার আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেই যখন ইহার সত্যকারণ যথেষ্টই পরিস্কার দেখা যাইতে পারে, তখন আর কিছু না বলাই ভাল। আর একটী কুমারীকে (আমাদের দেশে তাহারা ত আবার একেবারেই বালিকামাত্র) তাহার প্রথম ও নূতন বিবাহের পরই আসিয়া অন্যের ছেলে মানুষ করিতে লাগিয়া যাইতে বলিতে সাহসই বা হয় কি করিয়া? তাহার পর যে ছেলে মানুষের জন্য নবীনার এত প্রয়োজন, তিনি আসিলে ত তাহা আরও বাড়িয়াই উঠিবে। তিনি পুরান ছেলেদের "মানুষ" করিবেন, না, নূতন নূতন সন্তান আনিয়া তাহা আরও জটিল কঠিন করিয়া তুলিতে থাকিবেন? এদিকে আবার এক আধটী সন্তান থাকিলেই তাহাদের অযত্ন হইবে বলিয়া যাহারা বিধবাদের বিবাহে ভয় দেখান তাহাও এই সূত্রে মনে আসে। বিপত্নীকদের সন্তানদের যদি তাঁহাদের নবপত্নীরা পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্য ঐরূপ স্থলে পতিবাও ঐ সন্তানদের ভরণ পোষণ ও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে না পারিবার কোন কারণ নাই।

কেহ কেহ আবার প্রকৃত কারণটীও জানাইতে ত্রুটি করেন না! একজন ধনী তাঁহার তৃতীয় বিবাহের কারণ দিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মত বাগান ভ্রমণ পছন্দ করেন না। ইহাতে অবশ্য তাঁহার আপনাকে খুবই সাধু বলিয়া মনে হইয়াছিল;—এবং ঐ দুইটী ভিন্ন অন্য কিছুর সম্ভাবনাও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু বিবাহ যখন ব্যভিচারের সঙ্গে সমান আসন পায় তখন তাহারও মূল্যই বা কি দাঁড়ায়? আর সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ও হৃদয় বিদারক ব্যাপার এই যে আমাদের দেশে একটী পবিত্র কুমারী জীবনকেই ইহাতে বলি দেওয়া হয়। তাহার পর আবার তৃতীয় পক্ষটির জীবনসায়াহ্নে "বাগানে যাওয়া" নিবারণের জন্য অবশেষে তাহাকে চিরজীবন মানুষের বাহির করিয়া কেবল জীবনমাত্র ভিক্ষা দিয়া রাখা হয়। সমাজের এ অবস্থায় ঐ তৃতীয় পক্ষ জাতীয় সমস্ত জীবকেই বলিতে হয় আপনার প্রতি, আপনার পরলোকগত পত্নীর প্রতি কোন দায়িত্ব, কর্ত্তব্যের জ্ঞান বা প্রেম যদি তাঁহাদের নাই থাকে, তবে আর যাহা খুসী করিতে পারেন, কিন্তু কুমারীজীবনগুলাকে এমন করিয়া অশুচি কলঙ্কিত করিয়া অবশেষে এমন করিয়া দলন ও দগ্ধ অন্ততঃ করিতে পারিবেন না। জীবনের মধ্যাহ্ন অথবা অপরাহ্নের "দ্বিতীয়পক্ষ" সম্বন্ধেও ইহা প্রায় সমানই খাটে। কুমারী জীবনের মর্য্যাদা তাহাতে সমানই নষ্ট হয় এবং শেষে সেই একই অবস্থায় ফেলার সম্ভাবনা হইতেও বড় কম থাকে না। কারণ ভগবান আমাদের দেশেও নরনারীর আয়ুর পরিমাণ সমান করিয়াছেন।

বাস্তবিক যাহারা এইরকম "বিবাহ" করিবেন তাঁহারা যদি অন্ততঃ আপনাদের সহিত বয়সে মিলিতে পারে এমন বিধবাদের বিবাহ করেন তাহা হইলেও হয়। বিধবা হইলেই নিঃসন্তানা বালিকা বা যুবতীর সহিত পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ অবশ্য সমান হইতে পারে না। ইহাতেও ন্যায় বিচার চাই।

আর নরনারী উভয়েরই পতি বা পত্নীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ একই হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় বিপত্নীকেরা পুনর্বিবাহ না করিলে এবং বিধবারা বরং করিলেই প্রশংসা করিতে হয়। কারণ এত প্রশ্রয় ও সুযোগ থাকিতেও যে সকল বিপত্নীকেরা (অবশ্য প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ নয়) আবার বিবাহ না করেন তাঁহাদের পত্নীপ্রেম ও চরিত্রবল যথার্থই আছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু যে সকল বিধবা (ইহাতেও প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধার কথা অবশ্য বলা হইতেছে না) আপনাদের জাতীয় দুর্দ্দশা ও বন্ধনের মুক্তির জন্য এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিবাহ করিতে সাহস করিতে পারেন, তাঁহাদের সৎসাহস প্রশংসনীয় ও উৎসাহ পাইবার যোগ্য। বৈধব্য যন্ত্রণার নিপুণ নিয়মাবলীর নাগপাশও যাঁহারা অস্বীকার করিয়া চলিতে পারেন উহা তাঁহাদেরও প্রাপ্য।

বঙ্গনারী।

বাঙ্গালার লোক-সঙ্গীত

গানের সাথে মানুষের সম্পর্ক চিরকালকার। অরফিয়সের বাঁশী হইতে কৃষ্ণের বাঁশীর অনেক কথাই আমাদের সেই সম্পর্কের পরিচায়ক। আর প্রকৃতির নগ্ন বুকে যাঁহারা লালিত পালিত, গান তাঁহাদের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছসিত ভাব আবেগ।

আমাদের এই 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' বাঙ্গলা দেশের নিরক্ষর কৃষক, কি হিন্দু কি মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে—অনেক স্থানেই নানা প্রকার গানের প্রচলন ছিল বা আছে।

বাঙ্গালার লোক সঙ্গীত বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অন্য দেশের লোক সঙ্গীত হইতে বাঙ্গালার লোক সঙ্গীতের অন্তরনিহিত সুর উচ্চ। অন্য দেশে লোক সঙ্গীত উদ্ধার ও সংগ্রহ করিবার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান আছে, আমাদের দেশে ঈদৃশ কোন কিছু নাই। আমাদের এই লোক সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইলে প্রাচীন সামাজিক রীতি নীতি ও ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাইবে। এই গুলি সংগ্রহে বদ্ধপরিকর না হইলে অচিরেই লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়া যাইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভীষণ ক্ষতি হইবে। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্য ভালবাসেন তাঁহাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে

তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়টীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমি দুই চারিটী গান পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। এই গানগুলি পাবনা জিলার সুজানগর থানার অন্তর্গত মুরারীপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

'জাগ'—পাবনা জিলার অনেক স্থানেই পৌষ মাসের প্রথম হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত রাত্রিকালে রাখাল বালকগণ—হিন্দু ও মুসলমান 'জাগ' গায়। তাঁহারা নিম্নলিখিত এবং ঐ ধরণের অন্যান্য গান গ্রামবাসীগণের বাড়ীতে গায় ও ভিক্ষা লয়। এই ভাবে ভিক্ষা করিয়া পৌষ সংক্রান্তির দিনে 'বনভোজ' করে। এই সমস্ত গান সাধারণতঃ কৃষ্ণ বিষয়ক। এই সমস্ত গান কোন সময় কাহার বা কাহাদের দ্বারা রচিত তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে মুসলমান প্রভাবের ও প্রতিপত্তির সময় বা পরে রচিত।

কৃষ্ণের গান *

ধুয়া

এ মা দয়া নাইরে তোর,
মা হয়ে বেটারে সদা বলো ননী চোর।

গান

কৃষ্ণ যায়, মা, বিষ্ণুপুরেরে, যশোদা যায় ঘাটে,
খালি গৃহ পেয়ে গোপাল সকল ননী লোটে।
'ননী খা'লো কেরে গোপাল, ননী খা'লো কে" ?
'আমি, মা খাই নাই ননী বলাই খেয়েছে,
'বলাই যদি খাইত ননী থুতো আদা আদা
তুমি গোপাল খাইছো ননী ভাণ্ড করেছো সাদা'

(ধুয়া পরিবর্ত্তন করিয়া গীত হইবে)

এমা দয়া নাইরে তোর,
এত সাধের নীলমণি বান্দা রইলো তোর।

ছড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে,
এক লম্ফে উঠ্‌লেন গোপাল কদম্বেরই গাছে।
পাতায় পাতায় ফেরে গোপাল ডালে না দ্যায় পাও,
গাছের নীচে নন্দরাণী ডরে কাঁপে গাও।
"নাম, নাম, ওরে গোপাল পাড়্যা দেই তোর ফুল,
কদম্বেরই ডাল ভাঙ্গিয়ে মজাবি গোকুল।"

* এই গানে কৃষ্ণ ও যশোদার কথোপকথন আছে।

"নাম, নামি, ওরে মারে একটী সত্য করো,
নন্দঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো।"
"তাকি আর হয়রে গোপাল তাকি আর হয়
নন্দঘোষ যে তোমার পিতা সর্ব্বলোকে কয়।"
'নালা ভোলা' দিয়া গোপালরে গাছ হতে নামাল,
গাভী 'ছাঁদা' রসি দিয়ে দুই হস্ত বাঁধিল।"

(ধূয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া গীত হইবে)

এমা দয়া নাইরে তোর,
এত সাধের নীলমণি খালাস পা'লো তোর।

"কিবা বন্ধন বাঁধ্‌লি মা রে বন্ধন গেল কসে,
বন্ধনের তাপে মোর লোহু চল্‌লো ভেসে।
কিবা বন্ধন বাঁধলি মা রে বন্ধন জ্বালায় মরি,
কাঁচা ডোরের বন্ধন মা রে সহিতে না পারি।
কিবা বন্ধন বাঁধ লি মা রে বন্ধন পিষ্টি মোড়া,
বন্ধনের তাপ মা রে ছুটলো হাড়ের জোড়া।
তাতে যদি শোধ না যায় আর এক সত্য করি,
নন্দঘোষের ধেনু রেখে দিব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
হাতের বালা বন্ধক থুয়ে দিব ননীর কড়ি।
তাতে যদি শোধ না হয় আর এক সত্য করি,
বাড়ী ছেড়ে যাবো আমি মামার বাড়ী,
মামাদের গরু রেখে দিব ননীর কড়ি।"
ঐ কথাটি শুনে মার একটু দয়া হল
হাতের বন্ধন খুলে দিয়ে গোপাল কোলে নিল।

(২)

ধূয়া

ঐ চল্‌লো কৃষ্ণ রাখালগণের সনে,
বগে ঘিরিল ধেনু চড়াইতে। (যে গোষ্ঠ মাঝে)

একেতে বগের জাতরে আড়ে আড়ে চায়,
কানাইকে দেখিয়া বগরে নাচিয়া বেড়ায়।

নাচিয়া নাচিয়া বগরে কানাইর কাছে আসিল,
কানাইর কাছে এসে বগরে কানাইকে ঘিরিল।
এক শিশু-'নেড়ানুড়ি' আর এক শিশু ধায়
কানাইর মরণের খবর গোকুলে জানায়।
একেত নন্দরাণী 'হাউল্যা' মাথার কেশ,
ঘর হতে বাড়িয়ে এল যেমন পাগলিনীর বেশ।
আগে ছিদাম পাছে সুবল মাঝে নন্দরাণী,
'কোন্ মাঠে গিলেছে বগরে আমার নীলমণি।'
আরে আগে ছিদাম পাছে সুবল মধ্যি নন্দরাণী,
'এই মাঠে গিলেছে বগরে তোমার নীলমণি।'
একঠোঁট পদতলে আর একখানি ঠোঁট হাতে,
দুইখানি ঠোঁট টান্যা কানাই বাহির করে।
'উয়্যাই' দেখে ছিদাম সুবল হাসিতে লাগিল
'উয়্যাই' নন্দরাণী কানাই কোলে নিল।

'বগ'— বক ; নোড়ানুড়ি— দৌড়াদৌড়ি, হাউল্যা—আলুলায়িত উয়্যাই—উহাল।

(৩)

ধুয়া

ওগো বিন্দ্যা ললনা,
সুখের নিশি গত হ'ল কৃষ্ণ এল না।

কৃষ্ণ গেছেন বিষ্ণুপুরেরে না গিছে বলিয়া,
সারারাতি গেলেন কৃষ্ণ 'পাঁচালি' খেলিয়া।
ভাত হ'ল কড়কড়ে, বেগুন হ'ল বাসি
কোথায় রলেন কৃষ্ণ আমার তিনদিনকার উপোসী
গোপ কাঁদে, গোপিনী কাঁদে, কাঁদে তরুলতা,
সকল তান ধরিয়ে কান্দে, "কৃষ্ণ রলেন কোথা।"
শয়নেতে ছিলেন কৃষ্ণ সোণার পালঙ্কে,
কোকিলের রব শুনিয়া জাগিলেন বিহানে।
এসো কৃষ্ণ বসো কোলে কওরে সমাচার,
আজেকেরো ধেনু রাখা বলদ (?) রাখাল!
আজকেরো যে ধেনু রাখা বড়ই পাইছি দুঃখ
সোণার পায়ে বিন্দে রইছে কুসুমের অঙ্কুর।

আসুক আগে নন্দ ঘোষরে বেচাইব ধেনু,
নগরে মাঙ্গিয়া খাইব না রাখিব ধেনু।
নগরে মাঙ্গিয়া খাইব লজ্জা পাব না,
তবু লোকে বল্‌বে আমায় রামকানুর মা।

'ননী'র স্থলে সর্ব্বদাই 'রণী' ব্যবহৃত আর 'বন্ধন' স্থলে বান্‌নোন।

মহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

জীবনের আঁধার কোণ

কালিন্দী দেবী

(সত্য ঘটনা মূলক)

বয়সে কিশোরী, নামে কালিন্দী। সুন্দরী নয় শ্রীমতী। অপরাধ জাতি গোপন করিয়া রামধন চক্রবর্ত্তীকে নিজের রাঁধা ভাত খাওয়ান। রামধনের উক্তি যে, তাহাতে তাহার মনের কষ্ট ও সামাজিক অবমাননা হইয়াছে। রামধনের পক্ষে আদালতে সুপরিচিত বিচক্ষণ উকিল। কালিন্দীর সঙ্গে আসিয়াছেন একটী প্রবীনা। তাহার দুই হাতে বালা, কানে মাকড়ী, গলায় হার, পরনে সাড়ী জামা। প্রবীনা বেশ সপ্রতিভ চালাক চটপটে। কালিন্দীর ভাব কাঁদো কাঁদো, মাথা হেঁট, নিজের পায়ে দিকে স্থির দৃষ্টি। আসামীর পক্ষে কোন উকিল না থাকায় হাকিমের অনুরোধে একজন নবীন উকিল নন্দবাবু তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। কয়েকবার দিন ফিরিল। উভয় পক্ষের সাক্ষী পরীক্ষায় দেখা গেল যে, আসামীর উকিল বয়সের পক্ষে সুদক্ষ। যাহা হউক সাক্ষীদের উক্তি প্রত্যুক্তির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। যাহা শেষ ফল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল তাহাই যথেষ্ট।

কালিন্দীর বাপের বাড়ী আমতার কাছে একটি ছোট গ্রামে। জাতিতে ব্রাহ্মণ, অল্প বয়সে মাতৃহীনা। বাপের বিদেশে চাকরী, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ গাঢ় নয়! কালিন্দী দূর আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রতিপালিত। বাপ সুবিধার সুপ্রভাত মাত্রেই নিজের গ্রামে সমান ঘরে মেয়ের বিবাহ দেন। বর বিধবার একমাত্র সন্তান। কলিকাতায় সওদাগিরি আফিসে সামান্য কেরাণী। স্বামীর সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই কালিন্দীর বৈধব্য ঘটে। সেই অবধি শাশুড়ী-বউয়ের সংসার। জমী জমা, বাড়ী বাগান, পুকুর, যাহা ছিল তাহাতে সংসার নিশ্চিন্তায় চলিত। কালিন্দীর কপাল পোড়া। চৌদ্দ বৎসর বয়সে পড়িতে না পড়িতেই শাশুড়ী মারা যান। কিছু পূর্ব্বেই বাপ পেনসন লইয়া গ্রামেই বাস করিয়া আছেন। সংসার-রক্ষার জন্য আধা বয়সী একজন আত্মীয় বিধবাকে সংসারের ভার দিয়াছেন। একজন নানা

লোকে নানা প্রকার কানাকানি করে আর সামাজিক ব্যবহারেও একটু মোচড় লাগিয়াছে—তবে তেমন কিছু বেশী নয়। যাহা হউক শাশুড়ীর শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া কালিন্দী বাপের বাড়ী গেলেন। ভবতারিণী দেবী যিনি বাড়ীর গিন্নি হইয়া বাপের সংসার চালাইতেছিলেন কালিন্দীর প্রতি তাঁহার মুখে খুব স্নেহ মমতা ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু মনের ভাব অন্তর্য্যামীই জানিলেন। শাশুড়ীর সপিণ্ড করণের পর ভবতারিণী একদিন বলিলেন, "কালিন্দী তুই একবার গঙ্গা স্নান করে আয়। শুদ্ধ হয়ে নারায়ণের ভোগ রাঁধতে পারবি। এক বছরত হয়ে গেল। কালাশৌচ গিয়েছে।" কালিন্দী সম্মত কিন্তু এখন সঙ্গী খুঁজিবার দরকার। কয়েকদিন পরে অন্য গ্রামের দুইটী স্ত্রীলোক ও রামধন চক্রবর্ত্তীর ভাই মধুসূদন গঙ্গাস্নানের জন্য যাইতেছে বলিয়া তাহাদের সঙ্গে কালিন্দীকে যাইবার জন্য ভবতারিণী জেদ করিলেন।

অপরিচিত বলিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইতে কালিন্দীর ইচ্ছা নাই। কলিকাতায় গাঁজার গলিতে কালিন্দীর সম্পর্কে জ্যেঠা বাস করিতেন। কালিন্দী বাপের সঙ্গে আসিয়া সেই জ্যেঠার বাড়ীতে কয়েকবার থাকিয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা ছিল যে এবারও বাপের সঙ্গে সেইখানে থাকিয়া গঙ্গা স্নান করে। কিন্তু বাপ কাশীরোগে জখম ছিলেন বলিয়া সে ইচ্ছা কাজে আসিল না। ভবতারিণীর গঞ্জনায় ও বাপের তাড়নায় অগত্যা কালিন্দীকে উহাদিগকে সঙ্গী করিয়া গঙ্গা স্নানের জন্য যাত্রা করিতে হইল। যেদিন শ্রীরামপুরে আসিয়া গঙ্গা স্নান সমাপ্ত হইল সঙ্গীরা বলিল যে সেদিন সেখানে থাকিয়া পরদিন বাড়ী ফিরিতে হইবে। পরবর্ত্তী ঘটনা বুঝাইবার জন্য এখানে আর একটা কথার প্রয়োজন। বিধবা হইয়া কালিন্দী গহনা পরা ছাড়িয়া ছিল। কিন্তু বাপের বাড়ী আসিয়া বাপের কথায় দুই হাতে সাদা বালা পরিতে হয়। সে বালা আমতার বাজারে দীনু সেকরাকে দিয়া বাপ গড়াইয়াছিলেন।

কালিন্দী সন্ধ্যার সময় আহার না করিয়াই বাসায় ঘুমাইয়া পড়ে। সেই ঘরে তাহার সঙ্গীরাও ছিল। ঘুম ভাঙ্গিলে কালিন্দী দেখিল সঙ্গীরা নাই আর হাতের বালাও নাই। রাত্রিও তখন বেশী হয় নাই। বাসার লোকেরাও জাগিয়াছিল। সঙ্গীদের সন্ধান করিয়া কালিন্দী খবর পাইল যে, তাহারা রেলে চলিয়া গিয়াছে। কালিন্দী নিরাশ্রয় হইয়া কাঁদিতেছে। দেখিয়া বাসার গিন্নির দয়া হইল। পরের গাড়ীতে লোকের দ্বারা টিকিট দিয়া তাহাকে চড়াইয়া দিলেন। কালিন্দী হাবড়ায় আসিয়া দেখিল, পুল খোলা। কাজেই গাঁজার গলিতে জ্যেঠার বাড়ী যাইবার জন্য ষ্টেশনের সম্মুখে বাধ্য হইয়া বসিয়া রহিল। পরে কতকটা পূর্ব্ব-স্মৃতিতে, কতকটা জিজ্ঞাসা করিয়া জ্যেঠার বাড়ী পৌছিল। বসিয়া থাকিবার সময় ও রাস্তায় অনেক ঠাট্টা তামাসা ও অপমানের কথা শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু মন অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় তাহাতে কালিন্দীর বিক্ষেপ জন্মায় নাই।

জ্যেঠার বাড়ী পৌছিবার সময় মাত্র সূর্য্য উঠিতেছে, রৌদ্র দেখা দেয় নাই। জ্যাঠাইমা হাতপা ধুইয়া গৃহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময় কালিন্দীকে দেখিয়া ঝাঁটা

লইয়া মারিতে আসিলেন। বলিলেন, "পোড়ার মুখী হতভাগী ; মুখ দেখাতে লজ্জা হয় না। কুলে কালি দিলি। বাপ জ্যেঠার মুখ পোড়ালি। আবার লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে গৃহস্থ বাড়ী এসেছিস্। দূরহ, এখনি বাড়ীর বাইরে যা। তোর মুখ দেখলে পাপ হয়। বেরো বলছি। না যাস ত ঝাটা মেরে তাড়িয়ে দেব।"

কালিন্দী কাঁদিতে কাঁদিতে পায়ে ধরিতে গেল।

"ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে বলছি। ঐ কাপড়খানা পরে সারারাত্তির কত বদখেয়ালী করেছিস। আর তাই পরে ছুঁতে এসেছিস্। তুই বেরো বলছি।"

কালিন্দী অবাক, অচেতনের মতন দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ঝরঝর করিয়া দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। ফুঁকাইয়া কালিন্দী বলিল মা দুর্গা, এত মিথ্যা এল কোথা থেকে ?

"দেখ, অত ন্যাকা সাজতে হবে না। তোমার সঙ্গী সেই হরির মা কাল এসে রাত্তিরেই সব বিদ্দে ফাঁস করে গেছে। এখন যা। আর মিছি মিছি রাগ বাড়াস নি। শেষে একটা ভাল মন্দ হয়ে যবে। হতভাগী, ডানখাগী।"

"জেঠাই মা আমাকে তাড়িয়ে দাও দাও, এইটুকু কর যে দেশে যেতে পারি।"

"সে গুড়ে বালি। যাওনা, সেখানে মুখে নুড়ো জেলে দেবে। হরির মা এতক্ষন সাত গাঁ গাবিয়েছে। তোর বাপকেও দেশত্যাগী হতে হবে।"

"হা, ভগবান এ পৃথিবীতে আমার দাঁড়াবার জায়গা নাই"—এই বলিতে বলিতে কালিন্দী বাহির হইয়া গেল।

"কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে গিয়া থামের আড়ালে চুপচাপ এই সংকল্প করিয়া বসিল যে, একটু ভির থামিলেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিবে। কতক্ষণ পরে সেখানে ভগী গোয়ালিনী স্নান করিতে উপস্থিত। ভগবতীর ঘর কালিন্দীর বাপের বাড়ীর খিড়কী পুকুরের ওপারে। সে কালিন্দীর বাপের প্রজা। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় ভগবতী এখন হোটেল ঠাকরুণ। ইহাদিগকে অনেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ধরিয়া লয়। হোটেলের কর্ত্তা সত্যই ব্রাহ্মণ, রামলোচন রায়। ভগবতীর সুলভ ক্ষীর দধির জোরে আর বাকচাতুর্য্যে হোটেলের পসার বেশ। রায় মহাশয় বাজার করেন আর হিসাবপত্র রাখেন। অধিকন্তু তাঁহার আর একটা ব্যবসায়, ছোট আদালতে মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বির করা। যাহাতে দু'পয়সা তাহাতেই রায় মহাশয়ের মনোযোগ। হোটেল ভগবতীরই জিম্মা। ভগবতীর একার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য। ভগবতী ভিজাকাপড় ছাড়িবার সময় কালিন্দীকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "তুই এখানে!"

কালিন্দী কাঁদিতেছে। ভগবতী আর কোন কথা কহিল না। পাণ্ডার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া কালিন্দীকে স্নান করাইল। পরে সামান্য কএকটা জিনিষ কিনিয়া দুইজনে ভগবতীর হোটেলে আসিল। আহারান্তে কালিন্দীর সমস্ত কথা শুনিয়া

ভগবতী তাহাকে তখনকার মত সেইখানেই থাকিতে বলিল। পরে দেশের অবস্থা সন্ধান করিয়া যেরূপ হয় হইবে। কালিন্দী নিরূপায় তাহাতেই স্বীকার হইল। কালিন্দীর বাপের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ভগবতী তাহা গোপনে রাখিল।

এদিকে রামধন চক্রবর্ত্তীর ভাই মধুসূদন আমতার বাজারে কালিন্দীর বালা জোড়া বিক্রয় করিতে গিয়া দীনু সেকরার দোকানে বালা দেখায়। রামধন ও তাহার ভাইয়ের পূর্ব্ব চরিত্রের জন্য দুইজনই দেশের লোকের প্রীতিভাজন ছিল না। দুইজনের কাজই ছিল গ্রামের মধ্যে বিবাদ, মোকর্দ্দমা বাধাইয়া নিজের রোজগার বৃদ্ধির চেষ্টা। সম্প্রতি থানার দারোগার নামে উপরওয়ালার কাছে এক বেনামী চিঠি যায়। পুলিসের সন্দেহ যে, রামধনের ভাই মধুসূদনই চিঠি লিখিয়াছে। কাজেই মধুসূদনকে বামাল গেরেপ্তার করিয়া পুলিসে চালান দেয়। সে মোকর্দ্দমার প্রধান সাক্ষী কালিন্দী। তাহার সাক্ষ্যকে নির্বিষ করিবার জন্য রামধন কর্ত্তৃক মিথ্যা নালিশ। ভগবতী কালিন্দীর সঙ্গে আশুন্ত আদালতে আসিয়াছে। তাহার সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল যে মধুসূধন ভগবতীকে গোয়ালিনী জানিয়াও তাহার হাতে অনেকবার ভাত খাইয়াছে। কালিন্দী ব্রাহ্মণী। সে কখনও রামধনকে ভাত দেয় নাই। রামধনও তাহাকে ব্রাহ্মণী বলিয়া বহুপূর্ব্বাবধি জানিত। কালিন্দী খালাস হইল এবং রামধন মিথ্যা নালিশ করা অপরাধ হইতে বাঁচিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। অপরদিকে কালিন্দী ও দীনু সেকরার সাক্ষ্যে ও রায় মহাশয়ের তদ্বিরে হরির মা ও মধুসূদনের ছয় ছয় মাস করিয়া কারাবাস ঘটিল।

নিরপরাধী দুষ্ট পীড়িতা কালিন্দীর দশা হইল কি? যে সমাজে জন্ম সেখানে তাহার আর চিহ্ন মাত্র রহিল না। তাহাকে এক ধনী যুবকের সঙ্করূপ নরকে পাঠাইবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সংবাদ পাইয়া সেই উকীল নন্দ বাবু তাহাকে বেহালার খ্রীষ্ট আশ্রমে সমর্পণ করিলেন। শিক্ষা শেষ হইলে যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন করিবেন। নতুবা সদুপায়ে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের উপায় অপ্রতিবন্ধ।

হাকিম শুনিয়া বলিলেন, "আমাদের হিন্দুকুলে উৎপীড়িত নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নাই।"

নন্দবাবু বলিলেন, "কৈ আর আছে? আমি নিরুপায় হইয়াই কালিন্দীকে বেহালায় পাঠাইয়াছি।"

"কিন্তু আগে এরকম ছিল না। ফুলেমেনের মুখুর্য্যে কুলীনদের আদিমাতা বিবাহের পূর্ব্বে হানিফ থানাদার কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও মহাপণ্ডিত অর্জ্জুন মিশ্রের সহধর্ম্মিনী।"

"সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই।"

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাণী-বিতান

সুরের অভিশাপ

বহুকালের সঙ্গীতালয় উঠিয়ে দিয়ে গ্রাম্য জনেক ধনী
খুললে সেথা মস্ত আড়ত লক্ষ্মী দেবীর সম্ভ কৃপা গণি।
চাউল ধানের বস্তা এনে কাণায় কাণায় ভরলে গৃহখানা
রাক্ষা খেড়োর খসড়া খতেন সিঁদুর লেপা কাঁটার কি কারখানা
পাইকার এবং পয়সা পেয়ে পুলক ভরে দিবস নিশি যাপে
ভাবলে না সে পড়তে হবে অতি দারুণ সুরের অভিশাপে।

২

কর্ত্তা চটে কথায় কথায় মগজে কে ঝিঁঝিঁট বাজায় জোরে
রাত্রে বাজে ঐক্যবাদন, দগড় জগঝম্প বাজে ভোরে।
যখন তুমার করতে ব'সে মুন্সী এবং খাতার বোঝা লয়ে
বাউল এসে নাচ্‌তে থাকে ভয়ঙ্কর সে দিনের কথা কয়ে।
যখন বসে চিন্তা করে সামনে এসে হাস্‌তে থাকে পরী
যোড়ায় যোড়ায় ঘাঘরা ঘুরায়, রসান চৌকী আলাপ করে চৌরী

৩

ফর্দ্দে খাতায় ঠিক থাকে না সরকরদা যে চলছে দিবস রাতি,
চৌতাল এবং সুর ফাঁকেতে ফাঁক রাখে না করছে মাতামাতি।
ধ্রুপদ খেয়াল দাড়ায় এসে নেংটী পরে হস্তে লয়ে লাঠী
সাহানা তার হাস্য থামায়, জয় জয়ন্তী লাগায় কান্নাকাটি
পুরবীকে সঙ্গে লয়ে ইমন আসে হাঘরেদের মত
গৌরী সোহাগ গুমরে কাঁদে দারুণ ব্যথায় মুখটী অবনত।

৪

একটী দিবস শান্তি নাহি দেবদেবীকে করলে কত স্তুতি,
সুরেরা সব বল্লে হেসে আমরা তোমার করবো নাক ক্ষতি,
ভাঙলে এখন সঙ্গীতালয় আড়তের কি ঠাঁই পেলে না ভবে
কড়ি কোমল ভাঙলে তুমি মিঠা কড়া সইতে এখন হবে।
সুর যে অমর মরবে নাত অমিল করে দেবে সকল কাজে
তুমি সুরের নীড় ভেঙেছ প্রাণের বাঁশী বেসুরা তাই বাজে।

৫

এই ঘরেতে যত্ন করে যেথায় তুমি করলে বাঁধাই তিসি,
উৎসব রাত কাটলো কত কণ্ঠে এবং বাদ্যে মেশামিশি,
ওই যে উজল খণ্ড শশী হাস্‌ছে ধূসর তমাল গাছের ফাঁকে
কই ভোলেনি সুখের স্মৃতি,—সামনে খাড়া,—সুধাও তুমি তাকে ?
এমন গীতের পুণ্যপীঠে আড়ত এসে খুললে তুমি খুড়া
গড়মিল হবে খাতায় মাথায় অভিশাপ যে লাগলো তোমায় পুরা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ছায়া-প্রেম

শেলিমের প্রিয়া অতুল রূপসী নূরজাহান
জীবনের শেষ দিনে চেয়েছিলে লভিতে স্থান
শাহ দরার বুকে,
পুরে নাই তব অন্তিম আশা, শেষ আরজি
নয়নের জল, তুচ্ছ করিল রাজ মরজি
হাস্য কৌতুকে।
সেই কৌতুক প্রেম স্রষ্টার মরমে পশি
দারুণ বিরহ জ্বালায় অমনি উঠিল শ্বসি,
সে ব্যথা হাহাকার
সমাধি সুপ্ত শেলিমের বুকে মারিল ঝাঁকি,
সেথা মৃত্যুর পঞ্জরে উঠে বেদন কাঁপি
দুঃখে বার বার।
একদা যাহার কটাক্ষ ভয়ে টলিত ধরা
আঁখি-ইঙ্গিতে শেলিমের ঠোঁটে-শিরাণ সুরা
ধূলায় যেত পড়ি।
বাহুতে যাহার ঝলসিত অসি, হাতীর পিঠে,
ছিল যে সুধার আধার, দৃষ্টি আগুন-ছিটে,
শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ;
আজ সে পথের এক পাশে যেন ছিন্ন ফুল,
জীবনের এই বিরাট যজ্ঞে স্বপ্ন ভুল,
ব্যর্থ আঁখি জল ;

অতীত তোমার গর্ব্ব মহিমা, অমিত বল,
তোমারি সমুখে মায়া মরীচিকা; দুখ কেবল,
দহিছে হৃদি-তল।

* * * *

খুরম দিলনা শেলিমের পাশে, তোমারে স্থান,
তবুও খোদার বিরহে ধ্বনিল, তোমার গান
অমনি আসে নামি
শাহ-সমাধির সুনিবিড় ছায়া প্রিয়ার বুকে
আর নাহি চলে, অসীম আবেগে, নিবিড় সুখে
সেথায় রহে থামি;
হে রাজমহিষী রূপের প্রদীপ বণিক বালা
শোনেনি খুরম তব নিবেদন, খোদা-তালা
নিঠুর সে কি হয়,
তাঁহারি সৃজন প্রেমের স্বরগ মর্ত্তলোকে
সাঁচ্চা প্রেমের প্রদীপ দাহন মর্ম্ম-শোকে
কভুও মেকী নয়।
কায়াহীন ছায়া হয়ে আজি একি মিলন-সুখে
সমাধি হইতে জাগিয়া সম্রাট আপন বুকে
তোমারে নিল বরি,
রাজার যে রাজা ইঙ্গিতে তার রবির কর
সায়াহ্নে আনে সমাধির ছায়া তোমার পর,
হে চির সুন্দরি।*

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

---

* জনশ্রুতি যে মৃত্যুকালে নুরজাহান সম্রাট খুরমের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে তাঁহাকে যেন মৃত সম্রাট শেলিমের সমাধি (শাহদরা) মন্দিরে পতির পার্শ্বে কবর দেওয়া হয়, খুরম বিমাতার এ প্রার্থনা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার দেহকে মৃত শেলিম-সামাধির কিছু দূরে অন্যত্র কবর দেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় (বেগমের কবরের স্থান যাঁহারা নির্ণয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধির জন্যই হোক অথবা যে কারণেই হোক) নিত্য সায়াহ্নে শেলিম-সমাধির ছায়া আসিয়া নুরজাহানের কবরকে আবৃত করিয়া ফেলে।

তৃণ

তুচ্ছ নহি, ক্ষুদ্র নহি, শ্যাম দূর্ব্বা রহি বিশ্ব জোড়া,
উপেক্ষার পাত্র নহি মোরা ;
ঘুচাইতে আপদ বালাই ।
দেবতা সানন্দে শিরে দিয়ে থাকে ঠাঁই ।
আমরা অমর বলি' নর নারী হর্ষিত অন্তরে,
স্নেহাস্পদে আশীর্ব্বাদ করে,
ধান্য সহ লয়ে দূর্ব্বাদল !
প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, সাঁঝে,
লাগি মোরা সকলের কাজে !
ব্রত পূজা পর্ব্বদিনে রমণীরা একান্ত আগ্রহে,
আমাদের লহে !
মোরা ঘোর গণতন্ত্রবাদী ;
এক সাথে সর্ব্ব কার্য্য সাধি !
মোদের সমাজে মোরা পরস্পরে রহি নির্ব্বিবাদী !
কে যে উচ্চ, কে যে তুচ্ছ, ইহা লয়ে নাহি রচি ভেদ ;
সুনীরবে গাহি সদা সাম্য-সামবেদ !
মোদের জীবনে যবে জরা আসে এক সাথে আসে ;
মৃতবৎ মৃত্যু পরকাশে !
বর্ষাজলে জাগি যবে এক সাথে জেগে উঠি সবে,
পরম গৌরবে !
চিরদিন উপেক্ষিত, তবু মোরা হব না বিলীন !
কে শুধিবে আমাদের ঋণ ?

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

উন্মেষ

ধীরে ধীরে ওই জননীর জাতি অবনীর মাঝে উঠিছে জাগি'—
অযুত যুগের সুপ্তি টুটিছে জীয়ন-কাঠির পরশ লাগি' !
শুভ্র বিমল মুক্তা ফুটিছে স্বাতীর সলিল বিন্দু পেয়ে,
ভোরাই কিরণ ছুঁয়েছে নয়ন, ধীরে ধীরে নারী দেখিছে চেয়ে !

আজি নিখিলের আঁধার গুহায় পশেছে পাখীর প্রভাতী গান !
অরুণালোকের সুষমা লভিয়া, উঠিছে রাঙিয়া রমণী-প্রাণ !

* * *

শিল্প-শালায় যে চারু-শিল্পী অতুল-তুলিকা হস্তে ধরি'
প্রাণের যতনে সুষমা নিঙাড়ি' রমণীর দেহ তুলিল গড়ি',
সে কি ভেবেছিল এ দেবী-প্রতিমা বিশ্বের মাঝে দাসীর মত,
রবে গৃহকোণে বঞ্চিতা হয়ে, সাধি লাঞ্ছিত দাসীর ব্রত ?
এ কভু নহে গো বাসনা তাঁহার, সুন্দর ধরা সৃষ্টি যাঁর,
ললাটে যাঁহার ভাস্কর জ্বলে, গলায় দোলায় তারকা হার !

* * *

যে শুভ-ব্রতের জন্য জগতে কল্যাণী নারী আসিল নেমে,
সফল করিয়া তুলুক সে কাজ, তাদের দয়ায়, তাদের প্রেমে।
মঙ্গলময় অরুণ আলোকে জাগুক্ নারীরা মেলিয়া চোখ,
কল্যাণাশীষে মর্ত্ত্যের মাঝে নামিয়া আসুক স্বর্গ-লোক !

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

আব্‌ছায়া

ঘর্ ছাড়া মন্ চায় আজি কোন্ পথ্ দেখা সেই সঙ্গীরে
সাঁজ পরা টিপ্ নীলিমার দীপ্ শ্বাস লাগে কোন তন্বীরে !
দক্ষিণ দ্বার্ সাগরের পার্ জেগে ওঠে ওই ফাল্গুনী—
দূর বাঁশরীর্ লয়ে আঁখিনীর স্বপ্ন কুহেলি জাল্ বুনি।
বুক চুয়া কার আঁখি জল্-ভার্ ঝরে সদা মন্-মন্দিরে !
আব্‌ছায়া দূর্ স্বপনের পুর্ কোন্ সুর জাগে মঞ্জিরে !

বন্দে আলী মিয়া।

মণির পকেট

ছোট্ট খোকা মণিবাবু,
দেখো যদি পকেট তারি,
ঠাট্টা তোমার থাকবে ঠোঁটে,
বল্‌বে—বা ! বা ! বলিহারি !

মণিবাবুর সমান রুচি—
কাচের ভাঙা, পাথর কুচি,
কুড়ানো ফুল, সোনার কুটি,
আরো সব কি হাল্‌কা-ভারি ;
ছোট্ট মণির পকেট ত' নয়
ছোট্ট দোকান মণিহারি !
ছোট্ট খোকা মণিবাবু,
দেখ্‌লে অবাক্ পকেট তারি,
বালক বিশ্বকর্ম্মা যেন
গড়্‌বে নতুন জগৎ-বাড়ী !
খেলার জগৎ,—জগৎ মহৎ,—
থাক্‌বে না ভেদ ক্ষুদ্র-বৃহৎ,
থাক্‌বে নাক পুঁথি এবং
পণ্ডিত মশায় বেতের বাড়ি ;
মণির পকেট মণির পকেট,
সুবিচিত্র মনোহারী !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী।

কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব

জনবন্ধু গান্ধি রণশিঙ্গা বাজাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধিকে যদি আমরা শুধু যীশু খ্রীষ্টের অবতার মনে করি ভুল হইবে। তাঁহাতে একাধারে মুসা ও যীশুর যুগপৎ আবেশ পরিদৃষ্ট হয়। জগতের ইতিহাসে মুসার মত প্রচণ্ড স্বজাতি-প্রীতিবান ও তীব্র ঈশ্বরানুভূতি-সম্পন্ন মনুষ্য দুর্লভ। তিনি প্রফেট ও পেট্রিয়ট দুইই। যেমন একদিকে ঈশ্বরকে নিয়তসাহচর্য্য ও তাঁর বাণীনিবিষ্টতা তাঁহাতে পাওয়া যায়, তেমনি অপর দিকে ইহুদি জাতির দাসত্বমোচন করিয়া তাহাদের মিশর প্রবাস হইতে পুণ্য ইহুদিভূমিতে ফিরাইয়া আনাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ্য ছিল। তিনি ৬০ লক্ষ ইহুদিকে দুষ্পার দুর্গম ভয়াবহ আপদ-সঙ্কুল নদী কান্তার মরু পর্ব্বত সাগর ও অরণ্য পার করাইয়া মধু ও দুগ্ধস্রাবী দেশে পৌঁছাইবার প্রলোভনে পথে বাহির করিয়াছিলেন। তাঁর সর্ত্ত দুইটি ছিল—তারা ধর্ম্ম পথে থাকিবে, অর্থাৎ মুসার অনুশাসিত নৈতিক জীবন যাপন করিবে এবং ইহুদীপূজ্য দেবতার ভক্ত থাকিবে, অন্য কোন বিজাতীয় দেবদেবীর পূজা করিবে না। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই ষাট লক্ষ লোক যাত্রা করে।

ইতিমধ্যে কতবার কতপাপে কত অধর্ম্ম আচরণে স্খলিত-পাদ-বশতঃ পথে দলে দলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়,—আবার মূসার নির্ব্বন্ধে ক্ষমাবান দেবতার কৃপায় পুনর্জ্জীবিত হইয়া দুগ্ধ ও মধুস্রাবী স্বদেশের নিকটবর্ত্তী হয়।

মহাত্মা গান্ধীও তাঁর দেশবাসীকে স্বরাজের প্রলোভনে পথে বাহির করিতেছেন। তিনিও বলিতেছেন তাদের দাসত্ব মোচন করিয়া দিবেন—দুই সর্ত্তে,—তারা ধর্ম্মপথে চলুক এবং তারা পূজ্য দেবতাকে মানিয়া চলুক—হিংসাদেবী ও মিথ্যা দেবতার পূজা ছাড়ুক, সত্য, অহিংসাও অসহযোগকে বরণ করুক। মূসাচালিত অনেক ইহুদির মত ভারতবাসী বলিতেছে—"বাপ্‌রে এত কষ্ট করার চেয়ে দাসত্ব ভাল।"

যীশু ব্যক্তিগতভাবে প্রেমময় ছিলেন বলিয়া যে তাঁর ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ত্তব্য বিষয়ে জ্বালাহীন অগ্নি ছিলেন তাহা নহে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"I am come to send fire on the earth; and what will I, if it be already kindled? Suppose ye that I have come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather division; for from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three." বুদ্ধ ও চৈতন্যের স্নিগ্ধ শীতলতার দেশে সত্ত্বপ্রধান রাজসিক প্রেরণার এরূপ জ্বালাময়িতার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। একমাত্র গুরু গোবিন্দ সিং যীশু ও মূসা প্রকৃতির জ্বলন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধি বৈষ্ণবকুলজাত, পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের অহিংসাপরতা তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত হইয়াছে। অহিংসা তাঁহার স্বভাবগত, তিনি রক্তপাত দেখিতে পারেন না। অথচ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পরাধীনতাজাত অপমান, পরম্পরা ঘরে বাইরে তাঁর প্রতি রক্তবিন্দুকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে, তিনি তীব্র বেদনাবান্ লোক। তাই দুয়ের সামঞ্জস্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রাইষ্টের নিরস্ত্র অহিংস যুদ্ধ তাঁর আত্মসম্বিতের অঙ্গীভূত হইল। যে কোন সাধনা ক্ষেত্রেই তাঁকে দেখা যায় তাঁর ভিতর গতির একটা তীব্র বেগ পাওয়া যায়। সেই গতি যেখানেই বাধা প্রাপ্ত হয় সে বাধাকে অতিক্রম করিয়া চলার একটা অনিবার প্রচেষ্টা থাকে। বাধা যদি নিজের ভিতর হইতে আসে নিজের প্রতিও তিনি যেমন প্রশ্রয়হীন, অপরের প্রতিও তদ্রূপ—সে অপর স্ত্রী পুত্র পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয় বন্ধু মিত্র যে কেহই হোক্ না। সুতরাং তিনি অহিংস হইলেও অবাধ নহেন। অস্ত্রধারণ না করিলেও তিনি যোদ্ধা। যাহারা কল্পনা করিয়াছিল মিত্রে মিত্রে আপোষে মিটমাট হইয়া গেল, মহাত্মাজী সুবোধ বালকটির মত স্বরাজীদের কৌন্সিলে যাওয়ার ছাড়পত্র দিলেন, সূর্য্যদেব এক পাক ঘুরিয়া পাটে ফিরিতে না ফিরিতে তাদের ভ্রান্তির অপনোদন হইল।

কোন মতামতে আস্থা বা অনাস্থা সম্বন্ধেও মহাত্মাজীর মধ্যে একটা প্রবলতা-গুণ পাওয়া যায়। তিনি যেটা যতক্ষণ বিশ্বাস করেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরুদ্ধ-সাক্ষ্যও তাঁর বিশ্বাসকে

সেটা খুব জোরের সঙ্গেই অবিশ্বাস করেন—সেখানেও প্রত্যক্ষের সাক্ষ্য বহুদিন যাবৎ আমল পায় না। তাঁর পক্ষে আলো-আলো এবং আঁধার আঁধার; আলোর ভিতর কালো এবং আঁধারে আলো থাকিতে পারে, এ ভাব তিনি মনে পোষন করেন না, তাঁর কল্পনা সেদিকে খেলে না। তাঁর ভিতর দ্বিধাবিচলিততা মোটেই নাই তাঁর মতামত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা নড়বড়ে একেবারেই নয়; তাহা একান্ত দৃঢ়, শক্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত মহাত্মাজীর আপাততঃ বিশ্বাস ও মত এই যে অধুনা কৌন্সিলের ভিতরে গিয়া দেশবাসীর হিতসাধন চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তাঁর মতে যতদিন না ইংরেজ মেম্বরদের চিত্তের আমূল পরিবর্ত্তন হয় ততদিন কৌন্সিল প্রবেশ নিরর্থক। তাঁর মতে জনমত মিলাইয়া জনসাধারণকে কৌন্সিলে যাওয়া হইতে নিরস্ত করিলে প্রকৃত জনবন্ধুতা হইবে এই তাঁর বিশ্বাস। তাই তিনি নিজেও এই কোট ধরিয়া বসিয়া আছেন এবং সকলকেই তাই ধরিতে বলেন—সকল সম্প্রদায় শাসিতের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য যদি পরিতাপ দেখাও তবে তোমাদের শাসন-সভাগৃহে পাদস্পর্শ করিব—যতদিন তা না করিবে তোমাদের চৌকাট মাড়াইব না।"—নিরামিশাষী বৈষ্ণবী জিদ।

স্বরাজীরা বলেন—"অনুতাপ দেখাও, আর না দেখাও, ঘাড় ধরিয়া অনুতাপ করাইব। তোমাদের চৌকাট ডিঙ্গাইয়া তোমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিব।—তোমাদের শিল তোমাদের নোড়া দিয়া আমিষাশী শাক্তের জিদ্!

দুইদলের মধ্যে এইরূপ প্রকৃতিগত ভেদ। বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব ভারতে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। আজ পলিটিক্সে তারই প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে।

প্রথম ঘোষণাপত্রে ব্যক্ত হইল কৌন্সিলে যাওয়া লইয়া মহাত্মাজী গণ্ডগোল করিবেন না। তাঁর জেল-অবস্থিতি-কালে নো-চেঞ্জাররা স্বরাজীদের কৌন্সিলে যাওয়া রুখিবার চেষ্টায় যে সময় ও শক্তির অপব্যয় করিয়াছিলেন সে দুটা হাতে রাখিয়া গঠনমূল ককাজে লাগাইয়া সৎব্যয় করিবেন এই আশ্বাস দিলেন। দাশ নেহেরুর সহিত চিরাম্বিত আলাপের পর জগৎকে জানাইলেন—আমি যদিও কৌন্সিলে যাওয়ার পুর্ব্ববৎই বিপক্ষে এবং যদি বা যাইতাম ত আমার কার্য্যবিধিও অন্যরূপ হইত, তথাপি যাঁরা কৌন্সিলে যাবার পক্ষে তাঁদের আমি বাধা দিবনা, তাঁরা যাউন এবং স্ব-স্ব মত অনুযায়ী কার্য্য করুন, ইহাতে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার আছে সে অধিকারে আমি হস্তক্ষেপ করিব না। আমি কৌন্সিলের বাহিরে থাকিয়া গঠনমূলক কার্য্য করিয়া যাইব, খদ্দর চালাইব, জাতীয় বিদ্যালয়গুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করিব, অস্পৃশ্যতা দূর করিব—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কৌন্সিলে যাওয়া সম্বন্ধে এবং কৌন্সিলের ভিতরে কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বাধা দিবেন না জানাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রে কর্ত্তার প্রতি প্রেম অটুট রাখিয়া কার্য্যের প্রতি বিরোধের ডমরু বাজাইলেন। কৌন্সিলের বাহিরে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব রুখিবেন। জানাইলেন। "একখাপে দুইটি তলোয়ার থাকিতে পারে না—এক কর্মক্ষেত্রে দুই বিভিন্ন

প্রকৃতির কর্ত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং হয় তোমরা স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের কর্ত্তাত্বি ছাড়, নয় আমি ছাড়িব।"

নয়ত আমি ছাড়িব—এই কথাটী উচ্চারণ করাই মহাত্মাজীর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা। তিনি জনতাধীশ, জনতা উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার কথা শুনে ও তাঁর ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করে। জনতা তাঁকে ছাড়িতে চায় না—সুতরাং তাঁকে কংগ্রেসে বজায় রাখার জন্য স্বদেশীদের বর্জ্জন করিবে।

মহাত্মাজীর ইচ্ছা মানে হুকুম। তাই তিনি যেমনি হুকুম শুনাইলেন, "যারা কৌন্সিলে যাইবে যাক্, কিন্তু তারা কংগ্রেসের কর্ত্তাত্বি ছাড়ুক",—অমনি তুমুল গোল বাধিল। স্বরাজী-সেনানায়ক মুঞ্জে মহারাষ্ট্র হইতে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"এত বড় কথা! আমাদের হাত হইতে কংগ্রেসের কর্ত্তাত্বি ছিনিয়া লইবার চেষ্টা।" মহাত্মাজি কর্ত্তাত্বি দিতে চান কাদের? যাদের না আছে গবর্ণমেণ্টের টাইট্‌লের ঝলক, না আছে গবর্ণমেণ্টের আদালতে ধনসঞ্চয় করিয়া ধনকুবেরের গরিমা, না আছে গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজে মাষ্টারি করিয়া প্রাধান্যের ছাপ, না আছে বিদেশী সূক্ষ্মবস্ত্রেমণ্ডিত দেহশ্রী—এককথায় যারা নিতান্ত তথা-কথিত সাধারণ লোক, বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টিবশে বা তাদের প্রজাপীড়ক নীতির সংযোগিতাবশতঃ যারা কোনরূপ অসাধারণত্ব লাভ করে নাই। সেই ধড়্‌চূড়াহীন সাধারণের মধ্যে যারা ত্যাগ, কর্ম্মঠতা ও জনসেবানিষ্ঠার দ্বারা নিজস্ব খাঁটি অসাধারণত্ব প্রকট করিয়া জনগণমনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব—তারাই জনপ্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা হউক, গবর্ণমেণ্টের সহযোগে অসাধারণত্ব প্রাপ্ত কৃষ্ণবিষ্ণুরা নহে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গের দ্বারা আত্মশক্তি বিবর্দ্ধিত প্রতি কৃষ্ণের জীবটি জনসেবার জন্য জননায়ক হওয়ার সুযোগ পাউক এই মহাত্মাজীর অভিপ্রায়। পলিটিক্সে অহিংস সত্য ও অসহযোগ তাঁর পূজ্য এই দেবতাত্রয়ের যারা পূজক না হইবে তাদের মহাত্মা পারৎপক্ষে কংগ্রেসে কর্ত্তাত্বি করিতে দিবেন না।

স্বরাজীরা মহাত্মার অসহযোগবিধান আংশিক ভাবে মানেন, সম্পূর্ণভাবে নয়; রাজনৈতিক সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধেও বোধ হয় তাই। অথচ কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ছাড়িতে তাঁহারা নারাজ। সুতরাং আগামী কংগ্রেসে দুই দলের শক্তিপরীক্ষা হইবে এই অনুমান করা গেল।

পরক্ষণেই কিন্তু আবার মহাত্মাজীর তৃতীয় ঘোষণাপত্র বাহির হইল। "কর্ত্তা তারাই হইবে যারা মাসে মাসে স্বহস্তে দশ তোলা সুতা চরকায় কাটিয়া কংগ্রেস কমিটিতে পাঠাইবে।"

চরকা ও খদ্দর প্রচারের জবরদস্ত উপায় বটে, কিন্তু অতি-জিদ্। এতবড় জিদ্ ভক্তেরা প্রাণপণ চেষ্টায়ও টিঁকাইতে পারে কিনা, সুতরাং কংগ্রেসের কর্তৃত্বে মহাত্মাজীকে বজায় রাখিতে পারে কিনা সমস্যার বিষয়। যদি না পারে তাতেও মহাত্মাজীর দুঃখ নাই—তিনি যেমন কৌন্সিলের বাহিরে তেমনি কংগ্রেসেরও বাহিরে থাকিয়া স্বমতানুযায়ী কাজ করিবেন, কংগ্রেস তাঁহাকে বর্জ্জন করিলে তিনি অক্ষুণ্ণচিত্তে কংগ্রেসের সহিত অসহযোগ করিবেন।

অসহযোগ নীতিতে তিনি অতুল্য দক্ষ ও প্রতিভাবান্—সারাটা জীবন তাঁর ঘরে বাহিরে অসহযোগ করিয়াই কাটিয়াছে। তাঁর জিদ্ কখনও ছাড়েন নাই। কংগ্রেসের মারফৎ দেশনেতৃত্ব থাকুক আর না থাকুক। এখনও না থাকার কথা নয় কারণ এখনও অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সভ্য তাঁর ভক্ত এবং খোলা কংগ্রেসের জনগণ ত তাঁর আছেই।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দের দলের লোক যখন প্রথম প্রথম গান্ধিবিদ্বেষে অধীরতা দেখাইয়াছিল, অরবিন্দ তাদের উপদেশ দিয়াছিলেন—"Time Spirit is with Gandhi, Don't hit him, you wont Succeed" "কাল-আত্মা গান্ধির শরীরে ভর করিয়াছেন। তাঁকে মারিতে চেষ্টা করিওনা, এখন মার পৌঁছিবে না।"

জনহৃদয়ে গান্ধির নেতৃত্ব ততদিনই থাকিবে যতদিন তাঁর নিস্পৃহতা থাকিবে, তার একদিন কমও নহে, একদিন বেশীও নহে।

যার পার্থিব কোন কিছু আঁকড়াইয়া থাকিবার লোভ নাই তাকে কে মারিতে পারে? শরীরধর্ম্মীর একমুহূর্ত্তের জন্য অভ্যস্ত বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ অনুভব হইলেও পরমুহূর্ত্তেই সে আত্মস্থ হয়, তখন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তিমারুতঃ
অচ্ছেদ্যোয়মদাহ্যোয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

অনুক্রম

২১

সকাল বেলায় অনুপম যখন তারাপদ বাবুর বাসা হইতে বাহির হইল, তখন ফণি তাহার জন্য দেবনাথপুরার বাসার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। সে অনুপমকে দেখিয়া বলিল, "মশাই কি এখন বেড়াতে যাচ্ছেন?"

অনুপম একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ফণি কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে, সে বলিয়া উঠিল, "আপনি আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না অনুপম বাবু?"

অনুপম তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আপনার সঙ্গে কি আমার পূর্ব্বে কখনও আলাপ হয়েছিল? ফণি পূর্ব্বে কখনও অনুপমকে দেখে নাই কিন্তু সে বাড়ীওয়ালী ত্রিপুরাদিদির নিকট হইতে তাহার

নাম ধাম জানিয়া লইয়াছিল, এখন সে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "হয়েছিল বৈ কি মশাই, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন।"

অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আলাপ হয়েছিল বলুন দেখি? আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না।"

ফণির মুখে আসিল "দার্জ্জিলিঙ্গে" কিন্তু তাহার মুখ ফস্‌কাইয়া গেল, "কেন, হুগলীতে?"

তখন অনুপম হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কারণ সে জীবনে কখনও হুগলীতে পদার্পণ করে নাই। সে বলিয়া উঠিল, "আপনি ভুল করেছেন মশাই, আমি কখনও হুগলী যাই নাই।"

ফণি একটু অপ্রতিভ হইল কিন্তু সে তখনও অনুপমের সঙ্গ ছাড়িল না।

কিছু দূর যাইতে যাইতে অনুপম যখন দেখিল যে,ফণি তখনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, তখন সে মনে মনে বিরক্ত হইল। তাহার সঙ্গে খানিক দুর গিয়া ফণি বলিল, "দেখুন মশাই, আপনি ঠিক আমার একটী বন্ধুর মত দেখ্‌তে।"

অনুপম অবজ্ঞা ভরে বলিল, "তা' হবে।"

ফণি তখনও সঙ্গ ছাড়িল না, অনুপম তখন জোরে জোরে চলিতে আরম্ভ করিল তখন সেও জোরে হাঁটিতে লাগিল, খানিকটা পরে ফণি বলিল, "দেখুন আমি একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।"

তখন অনুপম বুঝিল যে ফণির কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে, সে একেবারে দাঁড়াইয়া গেল, আর ফণি তাহার গায়ে ধাক্কা লাগিয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল, ফণি সামলাইলে অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি হয়েছে বলুন।"

ফণি বলিল, "আজ্ঞে এমন কিছু নয়। তবে আমি অনেক দিন কাশীতে আছি তারাপদ বাবুর সঙ্গে আলাপ কর্‌বার সুবিধা পাইনি। দেখুন আমার একটু লেখা টেকা অভ্যেস আছে, আমি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদের সম্বন্ধে একখানা বই লিখ্‌ছি। আমি যখন লক্ষ্ণৌতে ছিলুম তখন তারাপদ বাবুর নাম শুনেছিলুম, সেখানকার লোকে বলে যে নবাবদের সম্বন্ধে তারাপদ বাবু যত খবর রাখেন, এত খবর আর কেউ রাখেনা। আপনি যদি দয়া করে তারাপদ বাবুর সঙ্গে আমার একটু আলাপ করে দেন তা'হ'লে বড়ই উপকার হয়।"

অনুপম ফণিকে চিনিত না সুতরাং সে অনায়াসেই ধরা পড়িল, সে বলিল, "দেখুন আমি তারাপদ বাবুর কাছে নতুন এসেছি। তিনি আমার বাবার বন্ধু বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার বেশীদিন আলাপ হয়নি।"

শীকার ফাঁদে পা দিয়াছে দেখিয়া ফণি অনুপমকে ধরিয়া বসিল, সে বলিল, "দেখুন, আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার দরখাস্তটা তারাপদ বাবুর কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। তাঁর চাকর বামুন বড়ই বেয়াড়া, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে চায় না। আপনি যদি দয়া করে কেবল আমার কথাটা তাঁর কাছে বলেন, তা'হলেই আমার কাজ হয়ে যাবে।"

অনুপম ভাবিয়া দেখিল যে প্রস্তাবটা অন্যায় নহে। তারাপদ বাবু লেখা পড়া ভালবাসেন এবং যাহারা লেখা পড়া করে তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখেন। সুতরাং হয়ত তিনি ফণির সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইবেন। অনুপম নিজে যখন তাঁহার বাসায় উঠিয়া আসিয়াছিল তখন তিনি অনুপমকে লেখাপড়ার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া জিনিষটাকে অনুপম বাঘের মত ডরাইত, পড়িলে মাথা ধরে বলিয়া সে বাঙ্গলা নভেল পর্য্যন্ত পড়িত না। তারাপদ বাবু যখন বুঝিলেন যে লেখা পড়ার কথা তোলায় অনুপম বড়ই বিপন্ন হইয়াছে তখন তিনি অন্য কথা পাড়িয়া তাহার ভয়দুর করিয়াছিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অনুপম ফণিকে বলিল যে, সে তাহার দরখাস্তের কথা তারাপদ বাবুকে জানাইবে।

তখন হইতে ফণি অনুপমকে গিলিয়া বসিল। সে তখন অনুপমের চির পরিচিত বন্ধুর মত তাহাকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিল। কথা কহিতে কহিতে দুইজনে বাঙ্গালীটোলা ছাড়িয়া দশাশ্বমেধ বাজারের নিকট আসিয়াছিল। ফণি তাহাকে মান মন্দির, কচুরী গলি, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা, জ্ঞান বাপী প্রভৃতি দেখাইয়া একেবারে পুরাতন চকের বাজারে লইয়া গেল এবং টাকায় চারি খিলি পান কিনিয়া নানা উপায়ে অতিথি সেবা করিল, অনুপম একেবারে গলিয়া গেল। ফণি সদালাপী, সে বহুরূপীর মত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিতে জানিত, এখন সে শিক্ষিত সাহিত্য-সেবী সাজিয়া অনুপমকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে সে অনুপমের পেটের কথা টানিয়া বাহির করিল। অনুপম কাশীতে পূর্ব্বে আসিয়াছে কিনা, সে দার্জ্জিলিঙ্গে কি কাজ করে এবং এখন সে কি উদ্দেশ্যে কাশী আসিয়াছে সমস্ত কথাই অনুপম ব্যক্ত করিয়া ফেলিল, কেবল মণির নামটী বলিল না। অনুপম ফণির কাছে মণির নাম গোপন করিয়া বিশেষ কিছুই করিতে পারিল না। কারণ সে আন্দাজে সমস্ত কথাই বুঝিয়া ফেলিল। দশাশ্বমেধের বড় রাস্তা দিয়া দুইজনে আস্তে আস্তে দেবনাথ পুরার দিকে ফিরিল। অনুপম দেখিল যে কাশীর অনেকের সহিত ফণির আলাপ। ইতর, ভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই তাহার পরিচিত, সরল হৃদয় অনুপম ভাবিল যে, এতদিনে অদৃষ্টের গুণে বন্ধু জুটিয়াছে ভাল।

দেবনাথ পুরার ছোট সরু গলিটির ভিতর তাহারা যখন ঢুকিল, তখন মণি উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, ফণির কাঁধে হাত দিয়া অনুপমকে গলির ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অঙ্গ হিম হইয়া গেল। ফণি তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না। মণি তাহা বুঝিতে পারিল কিন্তু তাহার পা চলিল না, লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহ লাল হইয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মনে হইল যে তাহার পা দুখানা অসাড় হইয়া গিয়াছে।

ফণি তাহার রক্তবর্ণ সলজ্জ দেহের শোভা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া গেল, তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে, দাঁড়ালে কেন?"

তখন ফণির চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "একটা কথা মনে পড়ে গেল, তা' থাক পরেই হবে। চল আগে তারাপদ বাবুর সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"

মণি তখনও দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখিয়া অনুপম কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হয় নাই, কারণ দার্জ্জিলিঙ্গে থাকিতে মণি সকলের সম্মুখেই বাহির হইত। ফণি যখন অনুপমের সাহায্যে তারাপদ বাবুর দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল, মণি তখনও পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

২২

মণি দার্জ্জিলিঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার একমাস পরে এক রবিবারে হারাণ হঠাৎ মাতাজী তপস্বিনীর প্রিয় শিষ্য নিতাই সুন্দরের দেখা পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে তখন বাজারে চলিয়া গেল, হঠাৎ নিতাইকে দেখিয়া তাহার মাতাজীর কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পারিবারিক বিপদের কথা মনে পড়িয়া গেল, সে বাজারের কথা ভুলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া রইল। নিতাই প্রথমে তাহাকে দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু সে লজ্জা কাটাইয়া হারাণের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে হারাণ বাবু, কোথায় যাচ্ছেন।"

হারাণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিয়া ফেলিল "না কোথাও যাই নাই, এই বাড়ী ফিরে যাব মনে কচ্ছিলুম।"

নিতাই তখন বলিল, "দেখুন আমি আপনার কাছে যাচ্ছিলুম, আমার আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

তাহার সঙ্গে নিতায়ের কথা আছে শুনিয়া দারুণ ভয়ে হারাণের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "কেন? কে? আবার কি মাতাজী এসেছেন না কি?"

নিতাইসুন্দর তাহার সুন্দর মুখ অবজ্ঞায় ফিরাইয়া বলিল, "পাগল হয়েছেন মশাই, সে বেটীর সঙ্গে আর আমি থাকি? বেটী নাপ্‌তের মেয়ে, চেহারার জোরে মাতাজী সেজে বেড়ায়। কি বল্‌বো বাপু, অল্প বয়সে গাঁজা খেতে শিখে উচ্ছন্ন গিয়েছিলুম, তার পর বেটীর পাল্লায় পড়ে এমন পরীর মত সুন্দর পরিবার ছেড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। দেখুন হারাণ বাবু, আমি বেটীকে শ্রীরামপুরে ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। একেবারে বদ্‌লে গিয়েছি বুঝলেন। আমার স্ত্রী আমার জন্য এ জায়গায় মুখ দেখাতে না পেরে চ'লে গিয়েছে, তাও আমি শুনেছি। কথাটা আমার মনে বড়ই লেগেছে। দেখুন হারাণ বাবু, কোন রকমে যদি ঠিকানাটা বলে দিতে পারেন, তাহ'লে আমি আমার পরিবারের কাছে গিয়ে বাস করি।"

হারাণ এই লম্বা বক্তৃতাটা নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া গেল। যাহারা তাহাকে ভাল রকম জানিত তাহারা বুঝিত যে বিপদে পড়িলে শ্রীমান হারাণচন্দ্র কেন বোবা হইয়া যায়। বিপদে পড়িলে হারাণ প্রথমতঃ চটিত। এবং চটিলে সে তোতলা হইয়া যাইত, সুতরাং তাহার রাগে লোকে না রাগিয়া কেবল হাসিত। দ্বিতীয়তঃ হারাণ সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীদের অন্তরের

সহিত ঘৃণা করিত, ক্ষীরদা নাপিতানী ওরফে শ্রীশ্রীমাতাজী তপস্বিনীকে সে কোনদিনই শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই এবং মাতাজীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে সে অশ্রদ্ধা ভীষণ ঘৃণায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয়তঃ হারাণের দৃঢ় ভরসা ছিল যে মণি মালিনী মনে মনে অনুপমকে ভালবাসে কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে সে প্রকাশ্যে তাহার বন্ধু অনুপমের অতুলনীয় প্রেমের প্রতিদান দিতে পারে নাই। নিতাই সুন্দর মণির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করাতে হারাণের সন্দেহ হইয়াছিল, কারণ সে মনে করিয়াছিল যে মণির সহিত মিলনের আশাতেই অনুপম দার্জ্জিলিঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া হারাণচন্দ্র একদম বোবা হইয়া গেল। অনেকক্ষণ তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নিতাই সুন্দর যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হারাণ বাবু চুপ ক'রে রইলে যে?"

তখন হারাণ অতি ধীরে অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট বালকটীর মত জবাব দিল "আজ্ঞে কি বলবো তাই ভাব্‌ছি।"

নিতাই তখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, "দেখুন হারাণবাবু, ভদ্র ঘরের ছেলে অল্প বয়সে বখে গিয়ে যতদূর শাস্তি পাবার পেয়েছি, এখন আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এখন যদি পরিবারটীকে খুঁজে পাই তাহ'লে আবার নূতন ক'রে সংসার পাতি।"

হারাণ চুপ করিয়া শুনিয়া গেল, কিন্তু উত্তর দিল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে মণির মত সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া এই ব্রাহ্মণ কুলের পশু এতদিন একটা বেশ্যাকে পাইয়া উন্মত্ত ছিল, কিন্তু এখন বেশ্যাটী বুড়া হইয়াছে বলিয়া সে পরিবার আবার দখল করিতে চাহে। একবার যে নিজের অধিকার হইতে ছাড়িয়া গিয়াছে তখন আইন বা সমাজ যাই বলুক মণির উপরে তাহার আর কোন অধিকার নাই।

অনুপম মাণকে কুড়াইয়া পাইয়াছে সুতরাং সেইই মণিকে নির্ব্বিবাদে ভোগ করুক। আমরা পুরুষ, নারীর মনস্তত্ব আমরা এইরূপেই বিচার করিয়া থাকি। হারাণকে তখনও চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নিতাই সুন্দর সত্য সত্যই বড় কাতর হইয়া পড়িল, তাহার গলা ধরিয়া আসিল, তাহার চোখ দুইটী জলে ভরিয়া গেল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে হারাণের হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি বলছি হারাণ বাবু, আমার মনে কোনই কপটতা নেই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যি, মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্রের দিব্যি ক্ষিরী নাপতিনীর ত্রিসীমানায় আর যদি আমি কখনও পা দি', তাহ'লে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নই, আমি নিতাইসুন্দর দেবশর্ম্মা বলে পরিচয় না দিয়ে নিতাই গয়লা বলে পরিচয় দেব।"

হারাণ তাহার কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" এখন তুমি শ্রীমতী ক্ষীরোদা সুন্দরীর যৌবনের অবসান দেখিয়া ধর্ম্ম-পত্নীর সন্ধানে বাহির হইয়াছ। হারাণ কোনই উত্তর দিল না এবং মনে মনে স্থির করিল যে নিতাইসুন্দর গোপ কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিলে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই।

হারাণের কাছে কোন উত্তর না পাইয়া নিতাইসুন্দর যখন তাহার পায়ে ধরিবার উপক্রম

করিতেছে তখন পৃষ্ঠে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়া হারাণ ফিরিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণদ্বয় সজোরে মর্দ্দন করিয়া ধীরেশ বলিল, "রাস্কেল, বাজারে বেরিয়েছিস কখন? তোর চাকর তোকে বাজারে খুঁজে না পেয়ে বাড়ী ফিরে গেছে, বৌমা সেখান থেকে আমাদের মেসে খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলেন—ধীরেশের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হারাণের বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সে কোনমতে নিতাইসুন্দরের হাত ছাড়াইয়া পলাইবার সময়ে বলিল, "বড় বেলা হয়ে গেছে চেলা মশাই হাট এতক্ষণে উঠে গেল।"

দেখিতে দেখিতে হারাণ বাজারের ভিড়ে মিশিয়া গেল দেখিয়া নিতাই অগত্যা ধীরেশের শরণ লইল, নিতাই সুন্দরের অনুতাপ ও কাতরতা দেখিয়া ধীরেশের মন গলিয়া গেল, সে বলিল, "আচ্ছা মশাই আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি সন্ধান করে দেখছি, মণি দিদি যাবার সময়ে আমাকে কিছুই বলে যায় নি, তবে মাসি মা হয়ত খবর রাখেন।"

ভয় পাইয়া নিতাই সুন্দর বলিয়া উঠিল, "মশাই এবার যদি তার খবর পাই তাহ'লে নিজে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে সংসারী হব।"

দার্জ্জিলিঙ্গের যত লোককেই মণি দাদা বলিয়া ডাকিত তাহাদের মধ্যে কেবল ধীরেশই তাহাকে প্রকৃতরূপে চিনিয়া ছিল, সুতরাং এতদিনে মণির একটা কিনারা হইল ভাবিয়া ধীরেশ সত্য সত্যই বড় আনন্দিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিটভ্যপত্তন

(দেউরিয়া ও ভিটা)

কৌশাম্বী হইতে পূর্ব্বদিকে নৌকা যোগে যমুনা বাহিয়া এলাহাবাদ সহরের এপার মাইল দূরে গমন করিলে যমুনার দক্ষিণ তীরে দেউরিয়া ও ভিটা নামক দুটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়। সেইখানেই জৈনদের বীর চরিত্র গ্রন্থে লিখিত, রাজা উদয়নের রাজধানী বিটভ্যপত্তন নামক নগর অবস্থিত ছিল বলিয়া জেনারল কনিংহেম নির্দ্দেশ করেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে রাজা উদয়ন জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক একটী মহাবীর মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং ঐ মূর্ত্তি অধিকারের জন্য উজ্জয়িনীর রাজা চণ্ড প্রদ্যোত ও রাজা উদয়নের মধ্যে তুমূল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সম্ভবতঃ কৌশাম্বীর রক্ত চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি লইয়া উক্ত দুই রাজার মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় এই উপাখ্যান তাহার সহিত জড়িত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক ইহা খুব সম্ভব যে বিটভ্যপত্তন নগরটী কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন কর্ত্তৃক স্থাপিত

হইয়াছিল। কারণ এই স্থান কৌশাম্বী হইতে অধিক দূরে নহে। নৌকাতে সহজেই যাতায়াত করা যায় এবং সর্ব্ব সাধারণে সেরূপই করিয়া থাকে।

দেউরিয়ার সন্নিকটে যমুনার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। কোন সময়ে এই দ্বীপ যমুনার সৈকত ভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়া নদী গর্ভের অবস্থা দৃষ্টে লোকে অনুমান করে। উক্ত দ্বীপস্থ ৬০ ফিট উচ্চ একটী শিলাস্তূপের উপর পূর্ব্বে সুষণ দেব বা সুষান দেব নামক দেবতা বিশেষের মন্দির ছিল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের সে সময়ের শাসন কর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক উক্ত দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইয়া সেইস্থানে চারিদিক মুক্ত ১২ ফিট ব্যাসের গোলাকার গুম্বজাকৃতি বর্ত্তমান গৃহটি নির্ম্মিত হয়। এই বিষয় উক্ত গৃহের প্রাচীরে পারস্য অক্ষরে খোদিত আছে। আমি ইহারপ্রতিলিপি আনিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় কোথায় পড়িয়া আছে এখন অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। নতুবা এ প্রবন্ধে ইহার প্রতিলিপি প্রদান করিতাম।



সিঙ্গরীদেবী—দেউরীয়া।

মুসলমান রাজত্ব পতন হইলে স্থানীয় হিন্দু নিবাসীগণ ঐ গৃহ মধ্যে একখানি প্রস্তরখণ্ড শিবলিঙ্গ রূপে স্থাপন করে। উক্ত শিলাস্তূপগাত্রে পঞ্চ পাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে, দৃষ্ট হইল। কবে কাহার দ্বারা এ মূর্ত্তিগুলি খোদিত হইয়াছে, সুষানদেবই বা কি এবং ইহার মন্দিরই বা কে স্থাপিত করিয়াছিল, এ সমস্ত বিষয় স্থানীয় লোকের নিকট অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও জানিতে পারিলাম না।

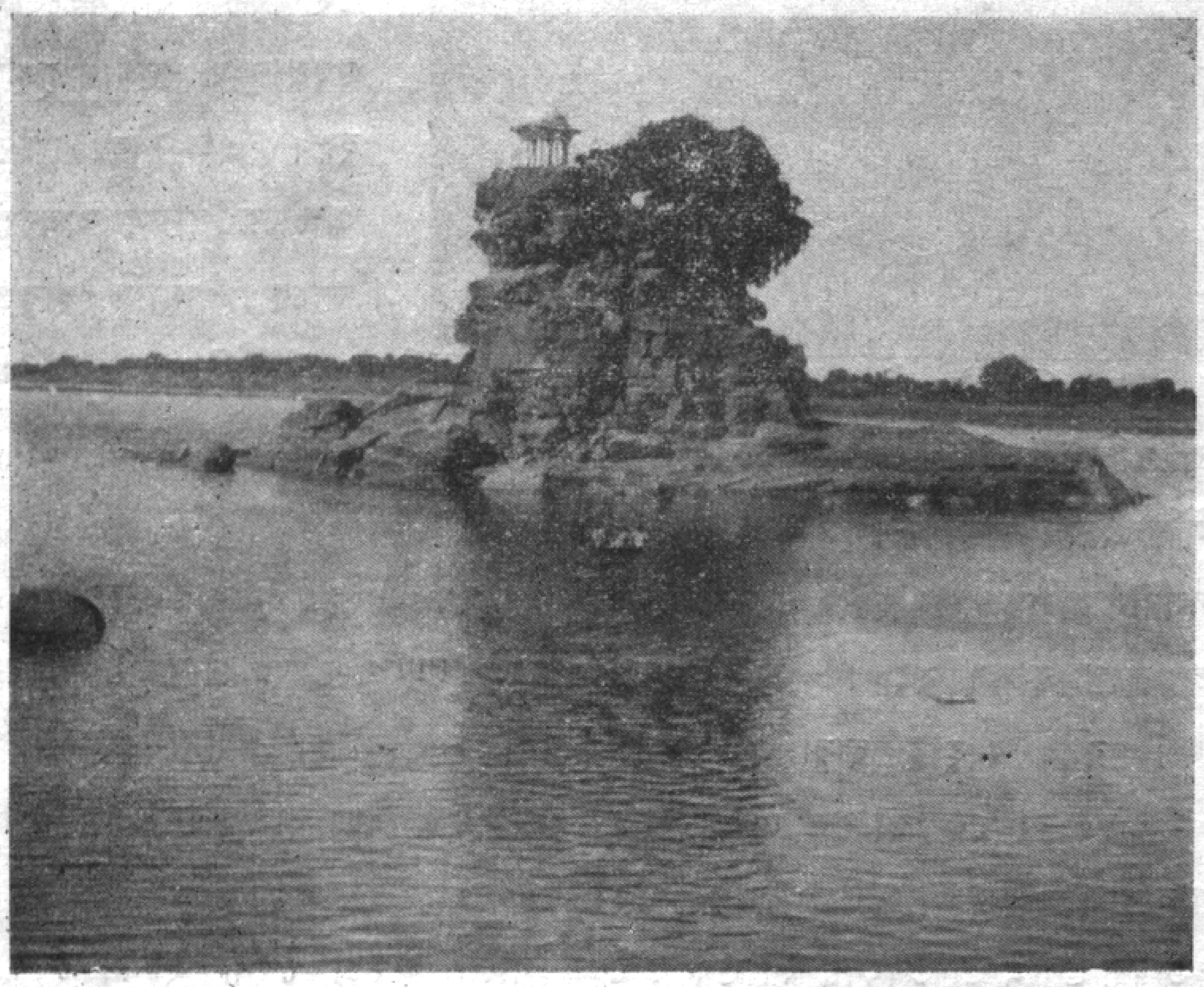
দেউরিয়া গ্রামে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে একটী মেলা হয়। সেই সময় বহু হিন্দু নরনারী সমবেত হইয়া ঐ প্রস্তর খণ্ডের পূজা করে বলিয়া শুনিলাম। সুষান দেবের কোন মন্দির বা মূর্ত্তি না থাকিলেও ঐ প্রস্তর স্তূপকেই সর্ব্ব সাধারণে সুষান দেব বলে।

স্থানে স্থানে গ্রাম মধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপ ও ভূমির নিম্ন দেশ হইতে মৌর্য্য, কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের শাসন সময়ের মৃন্ময় পাত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত হইয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রায়ই গ্রামমধ্যে বৃক্ষের নিম্নদেশে প্রস্তরও দগ্ধ মৃত্তিকার (Terra Cotta) ভগ্ন মূর্ত্তি এবং প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহাদির নানাবিধ ভগ্ন খণ্ড

স্তূপীকৃত হইয়া আছে। পল্লীবাসীরা এগুলির পূজা করে। একটী নিম্ব বৃক্ষের নীচে কতক গুলি ভগ্ন মূর্ত্তির মধ্যস্থ একখানি সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তিকে জনৈক গ্রাম বাসী মহাদেব বলিয়া পূজা করে। ঐ মূর্ত্তিটী আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। অর্থের প্রলোভনও যে না দেখাইয়াছি এমন নহে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি কোনমতেই মূর্ত্তিটা হস্তান্তর করিতে স্বীকার করিল না।

যমুনার তীরবর্ত্তী ধান্যক্ষেত্রে শিঙ্গারী দেবী নামে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী নাগ মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে ইহার পাঁচটী মস্তক ছিল বলিয়া জানা যায়, শুনিলাম গ্রাম্য বালকেরা মস্তকগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এই নাগমূর্ত্তির সম্মুখে একটী মস্তক, দক্ষিণ বাহু ও পদহীন প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি পল্লীবাসীরা রাখিয়া দিয়াছে।

দেউরিয়ার অল্প দুরেই ভিটাগ্রাম অবস্থিত। গ্রাম দুইটী এক প্রাচীন জাঙ্গালের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। জাঙ্গালটী অসমান ও উচ্চনীচ হইলেও ইহার উপরে মোটরে যাতায়াত করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না।



সুযানদেব—দেউরীয়া।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী স্যর জন মার্সেল (Sir John Marshal) ভিটা গ্রাম খনন পূর্ব্বক ভূগর্ভে যে দুর্গটী দেখিয়াছেন, তাহাতে কতকগুলি প্রাচীন নিদর্শন দেখিয়া স্থির করেন যে, মৌর্য্যবংশীয় হইতে গুপ্ত বংশায় পর্য্যন্ত রাজাগণ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মার্সেল সাহেবের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এ স্থানে লোকের বাস ছিল।

কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ এ অঞ্চল পুর্ব্বোক্ত শাসন কর্ত্তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে

অসভ্য আদিম নিবাসীগণ ইহা অধিকার করে। ইহাও অসম্ভব নহে যে ঐ সকল আদিম নিবাসীদের সহিত সেই প্রদেশের আর্য্যবংশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের কোন এক সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহারা সেখান হইতে বিতাড়িত হন।

উক্ত দুর্গের প্রায় এগার ফিট প্রশস্ত ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাকার মৃত্তিকার বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত। প্রাকার গাত্রে অনেকগুলি লৌহ বাণফলক এবং দুর্গের অভ্যন্তরে সাধারণ প্রস্তর, মৃত্তিকা ও মর্ম্মর নির্ম্মিত "ক্ষেপণী" (Catapult) বর্ত্তুল পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তুলগুলি সপ্তম কিংবা অষ্টম খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দী হইতে গুপ্তবংশীয়দের শেষ সময় পর্য্যন্ত সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

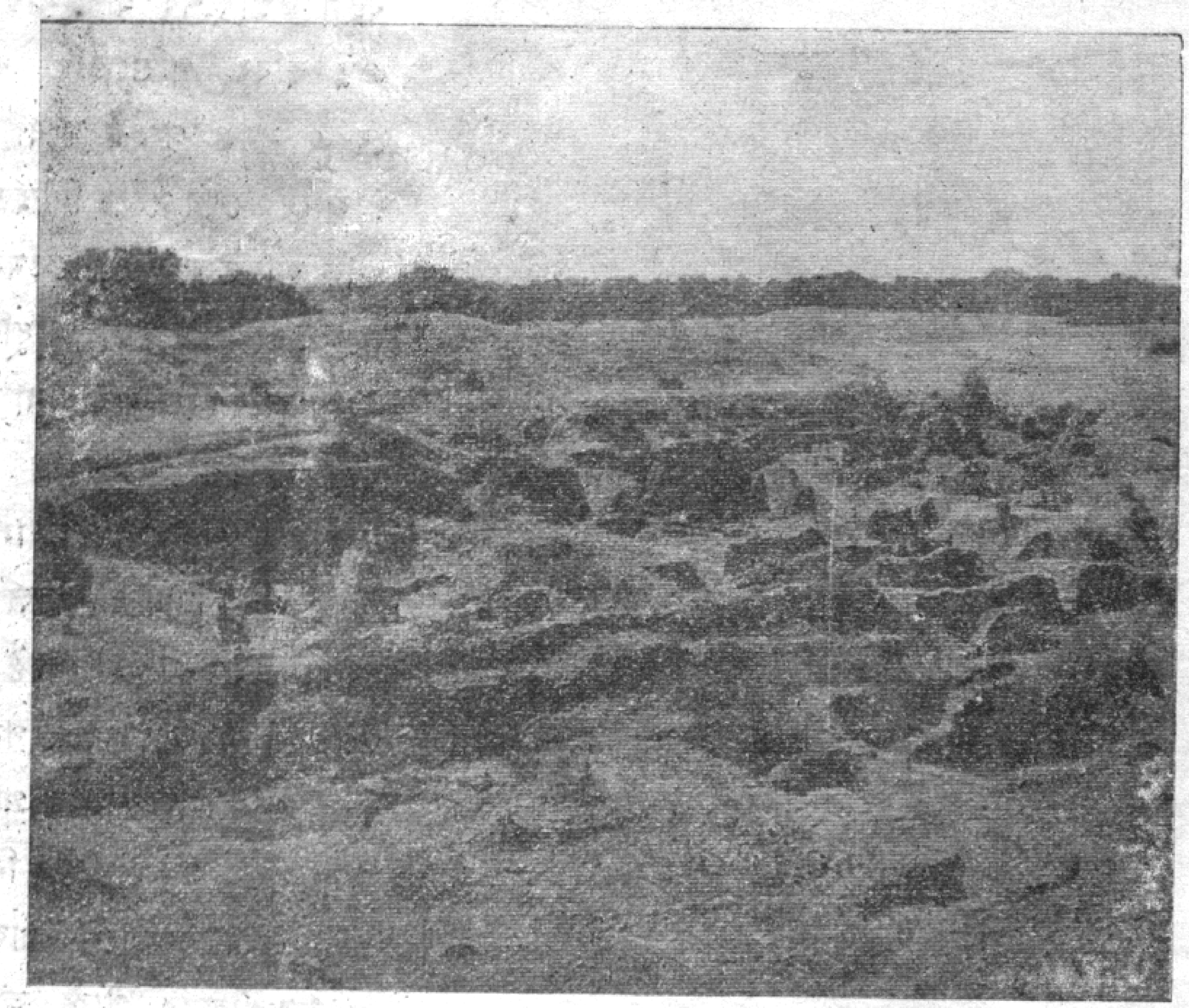


মহিষ মর্দ্দিনী—
(চাঁদ কি দেবী)—বিকার।

দুর্গের অভ্যন্তর রাজ পথ, সংকীর্ণ গলি, সুবিন্যস্ত গৃহাদির বহুল ভগ্নাবশেষ দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে এ সমস্ত গৃহের মধ্যে গুপ্ত রাজাদের শেষ সময়ে নির্ম্মিত গৃহ গুলি আয়তনে ক্ষুদ্র, তেমন দৃঢ় নহে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। ইহার অধোদেশে কুষাণ বা প্রথম গুপ্ত সময়ের অধিকাংশ গৃহই তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নিবাসীদের ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। সর্ব্ব নিম্নে মৌর্য্য সময়ের গৃহাদি দৃষ্ট হয়। ভগ্ন দ্রব্যাদির প্রত্যেক স্তূপরাশির স্তরে সেই সেই কালের প্রচলিত মুদ্রা, প্রস্তর ও দগ্ধ মৃত্তিক নির্ম্মিত মূর্ত্তি এবং তৎকালের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মৌর্য্যবংশীয়দের পূর্ব্বে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের ব্যবহার অতি বিরল ছিল। কিন্তু কদাচিৎ কোন কোন স্থানে সেই সময়ের নির্ম্মিত দগ্ধ ইষ্টকের প্রাচীরাদি যে দৃষ্ট না হয় তাহাও নহে। দুর্গ মধ্যে ভগ্ন গৃহাদির বৃহদাকার ইষ্টক রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের কুটীর প্রস্তুত করে। স্থানীয় লোকমুখে শুনিলাম যে এ দুর্গের অভ্যন্তর হইতে যমুনা পর্য্যন্ত ভূগর্ভে একটী বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী আছে এবং দুর্গের নিম্নস্থ একটী গহ্বরকে ঐ প্রণালীর মুখ বলিয়া তাহারা নির্দ্দেশ করে। এখন নাকি পয়ঃপ্রণালীটী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

যে সকল প্রাচীন দ্রব্যাদি এখান হইতে উদ্‌ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। লোকের নাম ও বাসস্থান জ্ঞাপক বর্ত্তলৌহ, (Bronze) গজদন্ত ও প্রস্তর নির্ম্মিত নামমুদ্রা (Seal) এবং মুদ্রিত মৃত্তিকা ফলক, উত্তর প্রদেশস্থ কুষাণ সম্রাটগণের, দক্ষিণস্থ অন্ধ দেশের এবং অবন্তী, কৌশাম্বী ও অযোধ্যার নৃপতিগণের প্রচলিত মুদ্রা; তৎকালের বেশ ভূষায় ভুষিত, সুরঞ্জিত নানাবিধ মৃত্তিকার মূর্ত্তি; তাম্র ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত নানা আকারের প্রকারের তৈজসপাত্র; স্বর্ণকারদের কারুকার্য্যের নানাবিধ যন্ত্র; মৃতপ্রস্তর (Steatite) ও মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রসাধন পেটীকা; স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণি মুক্তা খচিত নানাবিধ অলঙ্কার; এবং এগুলির সঙ্গে প্রস্তরযুগের আদিম নিবাসীদের প্রস্তর নির্ম্মিত কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র ইত্যাদি; এইগুলি এখন রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এই প্রকারের বহুবিধ দ্রব্য দৃষ্টে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, একদা এই প্রদেশ

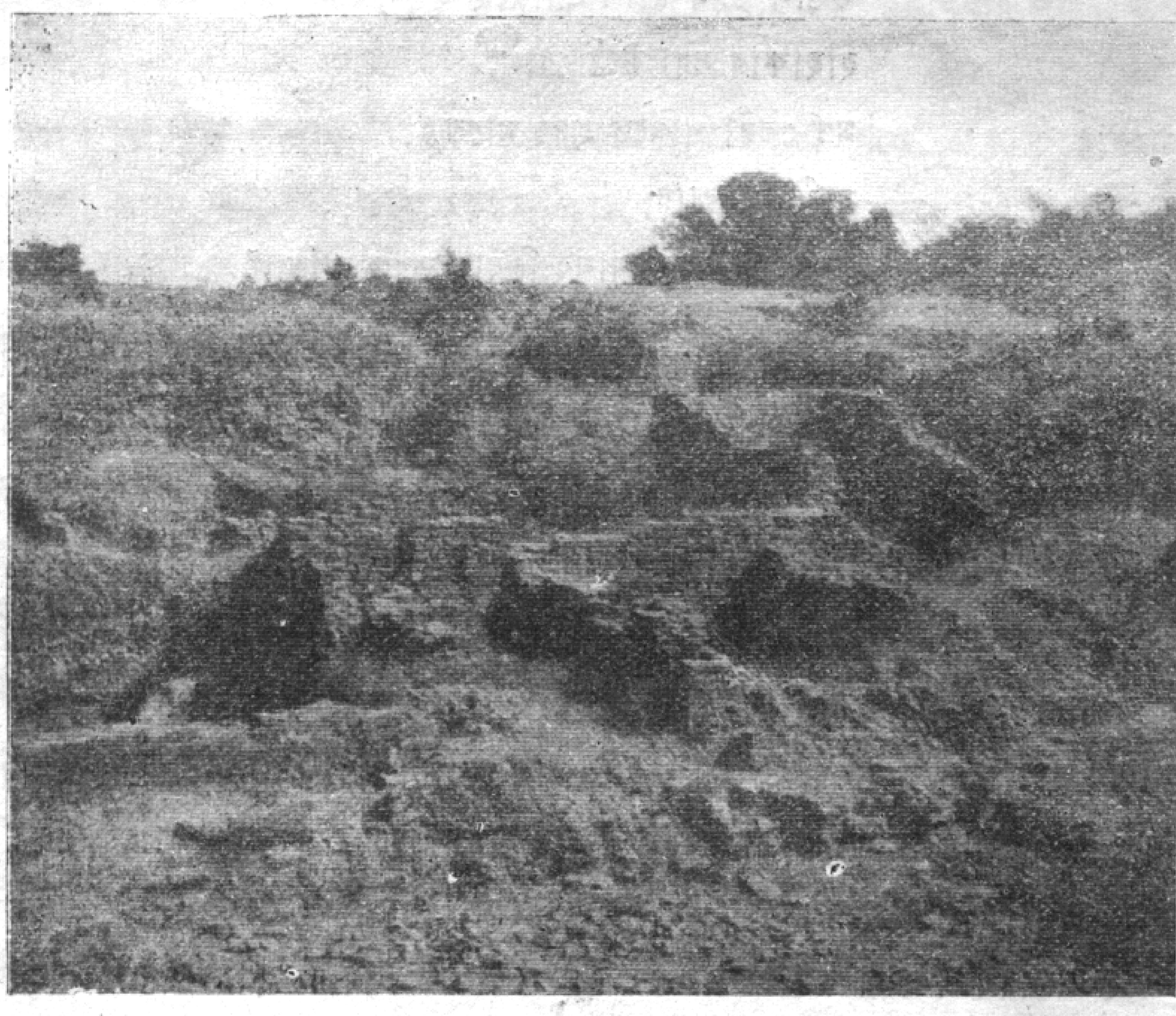


ভূগর্ভস্থ দুর্গ—ভিটা।

বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, জনাকীর্ণ এবং সুশিক্ষিত সভ্য আর্য্য জাতি ও অশিক্ষিত অসভ্য আদিম নিবাসী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের বাসভূমি ছিল।

দেউরিয়া হইতে অল্প দূরেই যমুনার তীরে থিকার নামক ক্ষুদ্র একটী প্রস্তরময় পর্ব্বতোপরি শিলানির্ম্মিত একখানি মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি আছে। স্থানীয় লোকে ইহাকে "চাঁদকি দেবী" কহে। মূর্ত্তিটী দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহা অতি প্রাচীনকালে নির্ম্মিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের পর

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে তন্ত্রানুযায়ী শক্তি উপাসনা সর্ব্বত্র যখন বহুলপ্রচলিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই সময়ে ঐ শক্তিমূর্ত্তি কোন শক্তিসাধক কর্ত্তৃক এই বিজন শৈলশিখরে স্থাপিত হইয়াছিল। কে বলিতে পারে যে এখানে পূর্ব্বকালে নরবলি হয় নাই! এতদ্ব্যতীত আর কোন শক্তি এ অঞ্চলে দেখিনাই; বিষ্ণু মূর্ত্তি একখানিও দেখিলাম না। এ মূর্ত্তির সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের মধ্যে কেহই কিছু বলিতে পারে না। কালচক্রে এ বিষয় তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।



ভূগর্ভস্থ দুর্গের এক অংশ—ভিটা।

এখান হইতে কিছুদূরে প্রাচীন মূর্ত্তি, মন্দির ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ পূর্ণ কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বৌদ্ধযুগে সেইসকল স্থানে জনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ সমস্ত স্থানে যাইয়া ফাটোগ্রাফ তুলার নিতান্ত বাসনা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ। সেই সময় আমি ম্যালেরিয়াজ্বরে আক্রান্ত হওয়াতে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

———

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

লক্ষহীন ভ্রমি ধরা মাঝে,
উত্তাল তরঙ্গ রাশি গ্রাসিছে জগৎ,
হাহাকার সদা উঠে রোল,
মর্ম্ম-ভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে,
নাহিক নিস্তার,
কে আছ মানব নিবার তরঙ্গ রাশি।"

স্বামী বিবেকানন্দ যখন উত্তর ভারতবর্ষ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পদব্রজে দীনহীনের ন্যায় পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে সমগ্র ভারত বাসীদের দুঃখ কষ্ট দর্শন করিয়াছিলেন। আতুর দরিদ্র, নিরাশ্রয় ঔষধ পথ্য ও আহার ব্যতীত নিতান্ত কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি আমেরিকা যাইয়া এ বিষয় বিস্মৃত হন নাই। বহু পত্রে ও বক্তৃতায় তিনি এ সকল বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভারতে আসিয়া তিনি দেখিলেন, সেই পূর্ব্বাবস্থা ও পূর্ব্বভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল মাত্র অধিকতর কষ্টকর বলিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার মন দুঃখী, দরিদ্র এবং ক্লিষ্টের নিমিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল থাকিত। আনন্দের ভিতর শোক, হর্ষের ভিতর বিষাদ সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে পরিলক্ষিত হইত, কি উপায়ে এই দুঃখ রাশির প্রতিকার করা যাইবে এই চিন্তায় তিনি মগ্ন হইয়া থাকিতেন। শোকে তাঁহার হৃদয় উথলিত হইত এবং চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত।

বহুকাল হইতে মহা পুরুষেরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং স্ব স্ব কালোপযোগী প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। যদিও সকল মহাপুরুষের ভাবরাশির মর্ম্ম একই হইয়া থাকে তথাপি কার্য্যদক্ষতা সময়োপযোগী এবং কার্য্য প্রণালী পৃথক হয়। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" এই ভাব লইয়া ভিক্ষুকগণ সর্ব্বত্রই বিচরণ করিবেন। সরল ভাষায়, "জীবে দয়া এইমাত্র জানি।" প্রত্যেক জীবকে দয়া করিবে। "পানাতি পাতাভের মণি শিক্ষাপদম্ সমাদিয়ামি। প্রাণীবধ হইতে বিরত হইলাম! আমি এই প্রতিজ্ঞা এই শিক্ষাগ্রহণ করিলাম। ইহাই বুদ্ধদেবের সঞ্চশীলায় প্রথম মন্ত্র, এবং আর চারিটি শীলাও তদ্রূপ।

এই শান্তি ভাব অবলম্বন করিয়া, এই অহিংসাভাব গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিতর এই মহতী প্রথম সোপান। সমস্ত বৌদ্ধ

ধর্ম্মের ভাবরাশি প্রক্রিয়া উন্নতি স্থিতি ও ধ্বংস এই মন্ত্রটীর উপর নির্ভর করিতেছে। "অনসিং স্বভাব" এইটীই হল বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল মন্ত্র।

ঈশা কোন একজন লোককে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়া ভাল বাসিবে এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার জানিবে। তাঁহার সময় এবং তাঁহার সমাজেতে ইহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক খৃষ্টীয় মতালম্বীরা এই ভাবটী গ্রহণ করুক আর নাই করুক, ইহাই যে ভগবানের উক্তি এবং এই ভাবটী জগতে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন এবং নানা উপাখ্যান দ্বারা জন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ভগবান শ্রীচৈতন্য তাঁহার সময়োপযোগী ভাবরাশি একটী শব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। "জীবে দয়া নামে রুচি।" জীবকে দয়া করিবে, এবং ভগবানের নামে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিবে। যদিও এই সকল ভাব অতি উচ্চ ও বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল কিন্তু কাল ক্রমে তন্নিহিত শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। মন্ত্রটী কেবল শব্দ মাত্র হইয়াছিল, "প্রাণহীন শবে পরিণত।"

স্বামী মহাশক্তিমান পুরুষ; একদিকে তাঁহার যেমন সিংহ গর্জ্জন ওজস্বী ভাব দুর্দ্দমনীয় বিক্রম, কোন বাধা বিপদ কিছুই মানিতেন না, প্রত্যেক অন্তরায়ের মূলোৎপাটন করিয়া নূতন পন্থা স্থাপন করিতেন। অপর দিকে তাঁহার হৃদয় কোমল। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে দোহন কালে দুগ্ধতে যে বুদ্বুদ উঠে, তাহাও অতি কঠিন তাহাতেও অঙ্গুলি কাটিয়া যাইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব। কিন্তু রাধিকার যে প্রেমোচ্ছ্বাস তাহা দুগ্ধ বুদ্বুদ অপেক্ষাও কোমল হইয়া পড়িত। আর সে ব্যক্তি নয়, আর সে ভাব নয়। শোকার্ত্তের সহিত শোকার্ত্ত হইতেন, ক্লিষ্টের সহিত ক্লিষ্ট হইতেন।

দার্জ্জিলিং অবস্থান কালে একদিন তিনি প্রাতে বায়ুসেবনার্থে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। শরীর সুস্থ। প্রাতে কিঞ্চিৎ জলযোগও করিয়াছেন, এবং হর্ষিত মনে দুই তিনটী লোক সঙ্গে লইয়া গিরি সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ধীর পদ সঞ্চারে বিচরণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক ভুটিয়া স্ত্রীলোককে পৃষ্ঠদেশে গুরুভার বহন করিয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন। তাহার পায়ে হোঁচট লাগাতে পৃষ্ঠস্থিত ভার পড়িয়া গেল এবং তাঁহার পাঁজরায় আঘাত লাগিল। স্বামীজী দূরে ছিলেন, অনিমেষ নেত্রে তাহা লক্ষ্য করিলেন, আর পদ বিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। মুখের ভাব স্থির হইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে তিনি কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বড্ড ব্যথা লেগেছে। আর যেতে পাচ্ছি না। বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, স্বামীজী, কোথায় ব্যথা লেগেছে?" তিনি তাঁহার পার্শ্বদেশ দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে, দেখিস্ নি ঐ স্ত্রীলোকটীর লেগেছে।" বালকেরা অল্প বয়স্ক কিছুই বুঝিতে পারিল না, ভাবিল এ আবার কি ঢং,—"এক গাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে আর এক গাঁয়ে মাথা ব্যথা।" স্বামীজীর মুখের ভাব এত পরিবর্ত্তিত হইল যে কেহই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবাসে গমন করিল। বহুকাল পরে যখন সেই বালকেরা বয়স্ক হইল এবং প্রবীণতা লাভ করিল তখন তাহারা এই ব্যাপারটীর ভাব বুঝিতে পারিল।

মহাপুরুষের একটা প্রধান লক্ষণ পণ্ডিতরা বলিয়া থাকেন যে, "A great man is one who can transfigure himself into various forms" মহাপুরুষেরাই কেবল আগন্তুক ব্যক্তির চিন্তানুযায়ী নিজের দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারেন। ইংরাজীতে যাহাকে "Sympathy" বা সহানুভূতি বলে ইহা তাহা নহে, ইহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনীয় ভাব। আগন্তুক ব্যক্তি, শোকার্ত্ত, ক্লিষ্ট, পণ্ডিত জ্ঞানী বা অপর কোন ভাবাপন্ন হইলে মহাপুরুষেরা আপনার ভিতর হইতে তদ্‌রূপিণী শক্তি বিকাশ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির অনুরূপ হ'ন। এবং অনতি বিলম্বে আগন্তুক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেন্ যে ইহার পশ্চাতেও বহু উচ্চ স্থান আছে এবং এই পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। ভাব রাশির সাধারণ লোক কেবল মাত্র বর্ণ বিন্যাস জানে। কিন্তু মহাপুরুষেরা সেই ভাবের যে প্রত্যক্ষরূপ আছে, অবয়ব আছে, অধিষ্ঠান বা ভঙ্গি আছে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। তাঁহার দেহের ভিতর সেই ভাবটী প্রতিবিম্বিত হয়। পূর্ব্বতন ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া নূতন ব্যক্তি উদ্ভূত হয় এবং ভাবটি প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শকের সম্মুখে প্রতীয়মান হয়। মহাপুরুষ যেন গম্ভীর ভাবে বলেন, "দেহ মন এবং ভাব সবই এক। পরস্পর সকলই ব্রহ্ম যাইবার সোপান পরম্পরা হৈব।" এই নিমিত্ত স্বামীজী বলিতেন "দেখিলে পরের মুখ, দেখি আপনার মুখ।"

অপর একটী উক্তি আছে; "A great man is the outcome of revolution, fulfils the revolution and is the father of fixture ages।" মহা বিপ্লব হইতেই মহাপুরুষের অভ্যুত্থান। বিপ্লবকেই তিনি পূর্ণ মাত্রায় লইয়া যান্ এবং ভবিষ্য যুগের পথ প্রদর্শক হইয়া থাকেন। পূর্ব্ব যুগের ভাব আচার পদ্ধতি যতদূর রাখা আবশ্যক মহা পুরুষরা তাহাই রাখেন এবং যতটা বর্ত্তমান যুগে অপ্রয়োজনীয় বা অন্তরায় রূপে লক্ষিত হয়, কেবল মাত্র সেই অংশটুকুই পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। এবং পরিত্যক্ত অংশ নিজের ভাবরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ইহা হইতেই পরবর্ত্তী কাল, স্রোতস্বতীর ন্যায় মৃদুগতি হইতে হিল্লোল কল্লোলে পরিণত হয়, পরিশেষে মহা শব্দায়মান মহা সমুদ্র রূপ ধারণ করে। এইটী হইল পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহা পুরুষের অপর একটী লক্ষণ। শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামি-বিবেকানন্দজীর ভিতর এই দুইটী লক্ষণ একীভূত ও "সহজরূপে" প্রতীয়মান্ হয়! কোন্ ভাবটীর কখন প্রাধান্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। কখনও বা প্রথম লক্ষণটী ঘনীভূত হইতেছে। কখনও বা ভাব যখন ভাব মুখী ও ওজস্বীভাব ধারণ করে তখন দ্বিতীয় ভাবটী প্রকাশ পায়।

স্বামীজী এই যুগের পথ প্রদর্শক রূপ এই নূতন মতটী সৃষ্টি করিলেন "নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা।" "দরিদ্র নারায়ণ" বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর," স্বামীজী যে কয়েকটী নূতন ভাব জগৎকে দিয়াছেন তাহার মধ্যে এইটীই অন্যতর। হয়ত এইটী

নূতন। জীবে দয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। দয়া শব্দ উচ্চ নীচ ভাব আনয়ন করে এবং আশ্রিত ও করুণা প্রার্থী এরূপ ভাব প্রকাশ পায়। স্বামীজী নূতন ভাব প্রকাশ করিলেন দীন হীনকে শিব জ্ঞানে পূজা করা। ইহাতেই জগতের মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "হাতী নারায়ণ মাহুত নারায়ণ চোর নারায়ণ।" স্বামীজী সেই ভাবটী স্পষ্ট করিয়া, সাধারণের উপযোগী করিলেন। দরিদ্র নারায়ণের পূজা ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

সমাজ সংস্করণ, শিক্ষা সংস্করণ বাণিজ্য ব্যবসা সংস্করণ জাতির ভিতর পরস্পর সখ্য ভাব স্থাপন করা। এইরূপ বহুপ্রকার সংস্কারীর ভাব লইয়া নানা ব্যক্তি চিন্তা করিতেছেন; কার্য্য ও সমস্ত ভাব গুলিই সত্য এবং খণ্ড খণ্ড রূপ প্রত্যেকটী ফল দায়ক। স্বামীজী কিন্তু একটী শব্দ দ্বারা সব ভাব গুলিই কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। যত প্রকার সংস্করণ আছে সেবা ভাব বা শিব জ্ঞাতে জীব সেবা সকলই ইহার ভিতর আসিয়া যায়, ছুঁত মার্গ তিরোহিত হয়, সংকীর্ণতা বিদূরিত হয়। প্রাণ উদার হইলে, সকলের ভিতর সেই এক ব্রহ্ম দেখিলে, সকলের ভিতর এক শিব দেখিলে কেইবা না প্রাণ খুলিয়া পূজা করিবে।

এই সেবা ভাব হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়া যায়। শিবের সেবা নারায়ণের সেবা যে অহোরাত্র করিতেছে, সকল জীবের ভিতর যে এক শিব এক নারায়ণ দেখিতেছে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার করতল-আমলকবৎ, চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সাধনের উচ্চাঙ্গ সকল প্রতিফলিত হয়।

পূর্ব্বকালে ইষ্ট আর পূর্ত্ত দুইটী শব্দের প্রচলন ছিল। ইষ্ট অর্থে ঈশ্বর লাভার্থ প্রয়াস, বেদ পাঠ হোম যজ্ঞাদি আর পূর্ত্ত অর্থে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ পান্থশালা স্থাপন ইত্যাদি। আধুনিক ভাষায় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। স্বামীজী এই ভাবটী পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ভাব সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন ইষ্টই পূর্ত্ত এবং পূর্ত্তই ইষ্ট। ধর্ম্মই কর্ম্ম এবং কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্মেতেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ এবং কর্ম্মেতেই মুক্তি। তিনি বহুবার বলিয়াছেন "ভারতে ধর্ম্ম আছে, ভারতে ভক্তি আছে কিন্তু প্রাণহীন। ইহাতে প্রাণ সঞ্চার করা আবশ্যক। কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধর্ম্মকে দেখান চাই। প্রত্যেক কর্ম্মই ধর্ম্ম। প্রত্যেক সেবাই নারায়ণ সেবা এই বীজ মন্ত্র তিনি প্রনয়ণ করিলেন। এস্থানে, একটী উপাখ্যান বলিলে অসংগত হইবেনা। জনৈক মহা পুরুষ এক সময় প্রাঙ্গণে বসে আছেন এমন সময়ে একটী পোষা টিয়া পাখী উড়িয়া আসিয়া সেই মহা পুরুষের মস্তকে এবং স্কন্ধে বিচরণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার সে উড়িয়া বৃক্ষে বসিল। আবার মহাপুরুষের স্কন্ধে আসিয়া বসিল। এইরূপে সেই পক্ষী নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই মহাত্মা তাহার ঐ ক্রিয়া দেখিয়া চক্ষু স্থির নিমীলিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন—যেন কি ভাবিতেছেন। অনেক পরিমাণে বাহ্য জ্ঞান হ্রাস হইয়াছে। মুখ আনন্দে পরিপূর্ণ, যেন কোন নূতন বস্তু দেখিতেছেন ও উপলব্ধি করিতেছেন। সহসা তিনি জনৈকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই টিয়া পাখীকে খাওয়ান, গরুর জাব কাটা, গোল ঘর পরিষ্কার করা, কুটনো

কোটা, বাসন মাজা, ঠাকুর ঘরের মেঝে পোঁছা, ঠাকুর পূজা করা আর জপ ধ্যান করা সবই দেখছি ভাই এক। সব এক—এক্!—এক!—এক! কোনটা বড় কোনটা ছোট নয়। তাই আমি অবাক হয়ে এই বৃষ্টির মাঝে জ্বর গায়ে বসে আছি। আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। কি দেখ্‌ছি আমি বুঝ্‌তে পারছি না।" ইহাকেই বলে কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান একই। ইহাকেই বলে কর্ম্ম থেকে ব্রহ্ম দর্শন।

এই তেজস্বী মহাভাবের কাছে আপর সকল ভাব হিমপ্রভ হইয়া যায়; প্রাণের ভিতর ব্রহ্ম শক্তি জাগরিত হয়। হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটিত হইয়া প্রাণ যেন সকল জীবের প্রতি তরঙ্গায়মান হইয়া প্রবাহিত হয়। এই নিমিত্ত স্বামীজী বারংবার বলিতেন, "প্রেম, প্রেম এই মাত্র জানি", যে প্রাণ থেকে ভাল বাসিতে জানে, নিঃস্বার্থ হইয়া অপরকে সেবা ও অপরকে ভাল বাসিতে জানে ব্রহ্মজ্ঞান ত তার অচিরাৎ হইবে।

লীলা দেখিলে লীলা অনুভব করিলে নিত্য স্বতঃসিদ্ধ তাহার উপলব্ধি হয়। নিত্যের জন্য আর কোন প্রয়াস করিতে হয় না। এই সেবা ভাব সকল মানুষকে এক করিতে পারে। বর্ণাশ্রমের ক্ষুদ্র পরিধির বহু উচ্চে, রাজনৈতিকের বহু উচ্চে সমাজ সংস্কার আপনা আপনি হইয়া যায়। এইজন্য স্বামীজী পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "সেবা ধর্ম্মই এ যুগের প্রধান সহায়।" দেশের জড়তা নাশ করিতে গেলে, সজীবতা আনিতে গেলে দেব ভাব জাগ্রত করিতে হইলে সেবা ধর্ম্মই প্রধান সহায়ক। "উত্তাল তরঙ্গ রাশি গ্রাসিছে জগৎ, হাহাকার সদা উঠে রোল, মর্ম্মভেদী পশিছে হৃদয় মাঝে নাহিক নিস্তার, কে আছ মানব নিবার তরঙ্গ রাশি।" ইনি ভারতের যুবকদিগকে আহ্বান করিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন বলিতেছেন, "কে আছ মানব নিবার তরঙ্গ রাশি।"

ভাব প্রবণ হওয়া বহুভাষী হওয়া এবং নিরর্থক তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করাই এতদ্ জাতির প্রধান লক্ষণ। কার্য্যকারিতা সংঘটন শক্তি অতি অল্পই আছে, কিন্তু সেবা কার্য্য করিতে যাইলে কার্য্য তৎপরতা ও সংঘটন শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। এই সংঘটন শক্তিই জাতি গঠন করিয়া থাকে। এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেম উদ্ভূত করিয়া দেয়। দেব ভাব উদ্ভূত না হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব আসে না এবং জাতির জাতিত্ব হয় না। দেব ভাব অপরকে দেখাইতে গেলে শক্তি প্রকাশ মুখিন্ করিতে হয়, ক্রিয়া তাহার প্রধান অবলম্বনীয় এবং সেবা ভিন্ন ক্রিয়া হওয়া সুকঠিন। এইজন্য স্বামীজী কেবলই বলিতেন, জীব সেবা এই যুগের প্রধান সহায়। নিরাশ্রয় দিগকে আশ্রয় দিবে, শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনা দিবে এবং সুষুপ্ত দেব ভাব তাহাদিগের ভিতর জাগ্রত করিয়া দিবে। ইহাই হচ্ছে দেশের কল্যাণ কর পন্থা।" ভগবান্ ঈশাও বলিয়াছিলেন, "যিনি সকলের সেবক (minister) তিনিই তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন।" স্বামীজী নানাস্থানে এই বাণী পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। "আমি ব্রহ্মতে লীন,— ব্রহ্ম আমাতে লীন হও। কর্ম্মই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারাই ব্রহ্ম পাওয়া যায়।"

স্বামীজী ৺ কাশীধামে আসিবার তিনবৎসর পূর্ব্বে চারু বাবু প্রমুখ আমরা একটী সমিতি গঠন করিয়াছিলাম। ঠাকুর ও স্বামীজীর গ্রন্থাদি পাঠ তদ্বিষয় আলোচনা ও কর্ম্ম যোগের বিশেষ মন রাখিয়া কিরূপে কার্য্য চালাইতে পারা যায় এ বিষয়ে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতাম। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং কাশী সেবাশ্রমের ইতিহাস কাশী সেবাশ্রমের কার্য্য বিবরণীতে পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছে। কেবল মাত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া কিছু বলিতে চাই। আমরা কয়েকটী যুবক মিলিত হইয়া পরিধ্যান, ভজন সৎচেষ্টা সৎপ্রসঙ্গ এবং সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। ক্রমে কাশীর ভদ্রোমহোদয়গণ আমাদের পৃষ্ঠ-পোষক হইলেন। কাজটী অল্পে অল্পে বাড়িতে লাগিল। আমরা ইহার নাম দিয়াছিলাম, দরিদ্র প্রতিকার সমিতি।

দুই বৎসর কাল স্বামীজীর ভাব লইয়া আমরা কার্য্যারম্ভ এবং তৃতীয় বৎসরে স্বামীজীর ভাব বিশেষতঃ কর্ম্মযোগের ভাব কি করিয়া কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা দরিদ্র নারায়ণ সেবা সমিতি আরম্ভ করিলাম, এবং অল্পে অল্পে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। সমিতির কার্য্যারম্ভের একবৎসর পরে স্বামীজী ৺কাশীধামে আগমন করেন। এবং আমাদিগকে তাঁহার পদাম্বুজ বলিয়া গ্রহণ করেন। আমার দীক্ষার পর চারু বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহারও দীক্ষা তদ্রূপ হইয়াছিল। যদিও আমি গৃহাভ্যন্তরে ছিলাম না। কিন্তু চারু বাবু আভাসে আমায় যা বলিয়াছিলেন তাহাই কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। স্বামীজী মহাধ্যানমগ্ন। তিনি বিদেহ অবস্থা হইয়া গিয়াছেন। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিন অবস্থা। তিনি তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। সেই অবস্থায় মন তুলিলে সমস্ত জগৎ ভাবরাশি ইত্যাদি সব একত্বে পরিণত হয়। দূরত্ব ও কাল বলে কোন বস্তুই থাকে না। কেবলমাত্র বর্ত্তমান—সর্ব্বব্যাপ্ত বর্ত্তমান—ইহাই থাকে। ইহাকেই বলে চিদাকাশ। স্বামীজী চিদাকাশে মন তুলিলে পর চারু বাবুর পূর্ব্ব ঘটনা সকল তাঁর সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এবং চারু বাবুকে সে সমস্ত বিষয়ের আবশ্যকীয় অংশগুলি বলিলেন।

স্বামীজী এই সময়ে চারু বাবুর মধ্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন, এবং জীবসেবার জন্য বিশেষ উপদেশ দেন,তিনি ভূয়োঃ ভূয়োঃ বলেন,—"গরীবের একটী পয়সা নিজের গায়ের রক্ত বলে জানবে, আর তোরা কি দরিদ্র প্রতিকার সমিতি কর্‌বি। False Colour এ march করিস্ না। এর নাম ঠাকুরের নামে Ramkrishna Home of Service রাখ। Mission এর হাতে এটিকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দে।"—আমরা সেই সময়ে তদনুযায়ী করিয়াছিলাম।

এইরূপে সেবাশ্রম পরিগঠিত হয়। এবং স্বামীজী কৃপা করিয়া চারু বাবু ও আমাদের কয়েকটীর ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে বিশাল রূপ ধারণ করিয়াছে। এবং আরও কত বড় হবে তার কোন ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় সেবাশ্রম ও তাহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমি নিভৃতে একস্থানে স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করি। আমি পূর্ব্বে স্বামীজীর দেহ রূপ দেখিয়াছি। সেই চেহারা সেই মূর্ত্তি, সেই অবয়ব আমার

স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু এ নব অবয়ব ত দেখি নি। গৃহ, উদ্যান, চিকিৎসালয়, রোগীগণ, প্রশস্ত ঘাট ও ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীগণ ত্বরিতপদে রোগীদিগের নিকট ঔষধ পথ্য লইয়া গতায়াত করিতেছেন, সবটাই ত স্বামীজীর আর এক রূপ। কোন্‌টা যে স্বামীজীর আসল রূপ তাহা বুঝিতে পারি না। অস্থি, মাংসের ভিতর যে স্বামীজী ছিলেন তাহার পরিধি অল্প ছিল। কিন্তু অস্থি মাংস বিহীন স্বামীজী বিশাল, মহান্‌। তাহার আমি কিছু সীমা করিতে পারি না। তাই নির্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া বিরলে বসিয়া থাকি। "অবাঙ্‌ মানস গোচরম্‌ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।" স্বামীজীর দেহ হইতে চিন্তারাশি ভাবরাশি এখন এই গৃহাদি, রোগী, ঔষধ পথ্য এবং সেবা সেবা রূপে পরিণত হইয়াছে। "সূক্ষ্ম, স্থূল প্রসবিনী, স্থূল পুনঃ সূক্ষ্মেতে মিশায়।" ব্রহ্মই কর্ম্ম এবং কর্ম্মই ব্রহ্ম।

জনৈক সেবক।

বিজ্ঞান-বিহার

পিপীলিকার প্রাসাদ

বুদ্ধিতে এবং শিল্প নৈপুণ্যে মানুষ যাবতীয় প্রাণীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মনুষ্যেতর ক্ষুদ্র বৃহৎ জীব-জন্তুদিগকেও যে ভগবান ঐ সব গুণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেন নাই তাহা পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্রতর প্রাণীদের শিল্প কৌশল হইতেই প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক ডোন্‌ (Doone) এর প্রাকৃতিক ইতিহাসে পিপীলিকার নির্ম্মিত এক অত্যাশ্চর্য্য আবাস গৃহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল সুদৃশ্য এবং সুউচ্চ আবাসকে পিপীলিকাদের প্রাসাদ বলা যাইতে পারে। ঐ সকল গম্বুজযুক্ত প্রাসাদের উচ্চতা চার হইতে সতর ইঞ্চি, এবং চারদিকের বেড় প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি। কিন্তু এই সব প্রাসাদ এত হাল্‌কা যে সামান্য স্পর্শের আঘাতেও ভাঙ্গিয়া পড়ে। উহা ভাঙ্গিলে গৃহস্থ পিপীলিকারা কোন নিভৃত স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণের আশায় বাহির হয়।

পাখীর জীবৎ-শক্তি

সাধারণতঃ আমরা মনে করিয়া থাকি যে ক্ষুদ্রাবয়ব-বিশিষ্ট প্রাণীদের প্রাণটি বড়ই ঠুনকো। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ঠিক নহে। সংপ্রতি পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় যে বিশেষ প্রাণঘাতক গ্যাস ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং অন্যান্য যে সব বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে মানুষের সঙ্কট মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তাহা চড়ুই গৃহপালিত পায়রারা অক্লেশে সহ্য করিতে সমর্থ হয়। যে পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাসে একজন সৈনিকের মৃত্যু হইতে পারে, সেই পরিমাণ গ্যাসে চড়ুই বা পায়রাদের বিশেষ কোনই ক্ষতি হয় না।

প্রবাল

সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে প্রবালকীট অতি অদ্ভুত প্রাণী। প্রবালকীট বলিতে কখনও ঐ জাতির একটী মাত্র জীবকে বুঝায় না। ঐ জাতির বহু সংখ্যক জীব পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ভাবে জীবন ধারণ করে। প্রবালকীটের এই যুক্ত-অবয়ব এত বিস্তৃত হয় যে, সহসা দেখিলে বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত সামুদ্রিক কোন বৃক্ষ বিশেষ বলিয়া ভ্রম হয়। এই যুক্ত-শরীর-বাসী প্রত্যেক প্রবালকীটের দেহে খাদ্য সংগ্রহের এবং গ্রহণের উপযুক্ত এক একটী মুখ এবং উদর ভিন্ন আর বিশেষ কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাদের শরীর বড় কোমল; এবং ঐ সকল কোমল শরীর চুণের ন্যায় এক প্রকার পদার্থের অস্থিময় আবরণে আবৃত থাকে। ইহাদের মুখে বিদ্ধ করিবার উপযুক্ত এক প্রকার যন্ত্র আছে, এবং আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য ভিতরে আকর্ষণের ও অনাবশ্যক-খাদ্য পরিত্যাগের শক্তিও ইহাদের মুখে বর্ত্তমান। ইহারা অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। ডাক্তার টি, ভন্ (Dr. T. W. Vaughan) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহারা মাংসাশী জীব নিরামিষ ইহারা মোটেই পছন্দ করে না। ইহাদের ক্ষুধার সময় যদি ইহাদের নিকট কিঞ্চিৎ মাংসের রস অথবা দু-এক টুকরা মৎস্য বা মাংস ধরা যায় অমনি একটী পর একটী প্রবালের কোমল মুখ গুলি ব্যাদায়িত হইতে থাকে। শেষে যখন সমস্ত মুখগুলিই যুগপৎ একটা অখণ্ড আগ্রহে ব্যাদায়িত হইয়া পড়ে তখন উহাদিগকে একটী সুন্দর ফুলের তোড়া বলিয়া ভ্রম হয়। ভোজনান্তে ক্ষুধার পরিসমাপ্তি হইলে সেই মুখই আবার কিছু নিরামিষ দান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যাখান করিয়া মুখগুলি পুনরায় গাত্রাবরণের অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

এ কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি যে প্রাচীন সূর্য্যকান্তমণি ভারতের যোগী ঋষিরা বহু শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন; এবং একালেও তিব্বতের লামাগণ যে সুস্থ এবং কর্ম্মক্ষম দেহ ধারণ করিয়া প্রায় তিন শত বৎসর জীবিত থাকেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই দীর্ঘকাল স্থায়ী জীবনীশক্তির মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মহারাষ্ট্র দেশীয় প্রতিভাশালী তরুণ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পি, এন, রাও, ছত্রজী Radium বা সূর্য্যকান্তমণির গুণের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ কাল তিব্বতে লামাদের সংস্পর্শে বাস করিয়া তাঁহাদের দীর্ঘকাল স্থায়ী জীবনী শক্তির একমাত্র কারণ স্বরূপে ইহাই জানিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, রাসায়নিক উপায়ে সূর্য্যকান্তমণি হইতে নিষ্কাশিত এক প্রকার রস মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট করাইবার ফলেই মানুষ এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হয়।

এই সূর্য্যকান্তমণি, যাহার অন্য নাম মহীশূর-মণি, সর্ব্ব প্রথমে ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়। ইহা পূর্ব্বে কেবল ভারতবর্ষে মহীশূর রাজ্যে এবং হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে পাওয়া যাইত। অবশ্য বর্ত্তমানে ইহা পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই পাওয়া

যায়। এই মণি যে শুধু মানুষকে দীর্ঘজীবী করে তাহা নহে ; ইহা ক্যান্সার ও বাতব্যাধির ন্যায় কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিরও অব্যর্থ মহৌষধ।

Radium যে এত গুণসম্পন্ন তাহা বর্ত্তমান যুগে মাত্র অল্প দিন পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে। এবং তাহা প্রথম প্রচারিত হয় পোলাণ্ড দেশীয়া জনৈকা স্ত্রী-বৈজ্ঞানিক এবং ফরাসী ও আমেরিকা দেশীয় দুইজন অধ্যাপকের দ্বারা।

ছত্রজী বলেন যে বিদেশে Radium মাত্র রোগ উপশমের উপকরণ বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু ইহার সাহায্যে যে দীর্ঘজীবনও লাভ করা সম্ভব তাহা অনেকেই জানেন না। এই মহামূল্য পদার্থ মহীশূর রাজ্যে বিশেষতঃ তুঙ্গভদ্রা নদীর তলদেশে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাচীন প্রথানুসারে ভারতে Radium হইতে যে ভাবে জীবনীশক্তিদাতা তরল রস নিষ্কাসিত হইত, তাহা তিব্বতীয় লামাদিগের নিকট হইতে ছত্রজী অতি নৈপুণ্যের সহিত শিখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মতে এই চেষ্টা ফলবতী হইলে, জগতের এক মহৎ উপকার সাধিত হইবে। এবং তাহা হইলে এই মহৌষধের মাত্র তিনটি বিন্দুর প্রয়োগে একজন মানুষকে তিনশত বৎসর সবল এবং কর্ম্মঠভাবে জীবিত রাখিবে।

চার বৎসর পূর্ব্বে ছত্রজী "অগস্ত্য-কর্ম্মকাণ্ডম্" নামের একখানা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে এই অনুসন্ধানের কার্য্যে ব্যাপৃত হন। আজ মহীশূরের রাজসরকার এবং ভারতের অন্যান্য ধনী সম্প্রদায় যদি উপযুক্ত অর্থসাহায্য করিয়া ছত্রজীর এই মহদনুষ্ঠানকে সফল করিয়া তুলেন, তবে শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। (পত্রাদি আদান প্রদানের ঠিকানা—

(Proprietor, Himalaya Exploration co. Mysore,)

শ্রীঅমূল্য রায় চৌধুরী।

অর্ঘ্য

(সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণে)

অভাগিনী বঙ্গ-মাতা পুত্র-রত্নহারা,
কেঁদে সারা
বলে,—"কই সন্তান আমার,—প্রাণপ্রিয় আশুতোষ কই ?
কোল ছেড়ে গেছ তুমি আমি শান্ত রই
কার মুখ দেখে আজ ?
বিশ্বের আসরে মোর চিরন্তন লাজ
ঘুচাবে কে আর ?

নাশিবে কি কেহ তাহা হাতে ল'য়ে মশালের আলো ?
সকলি ফুরালো,
আমার সকল আশা সবসুখ সব অভিলাষ !
কে দিবে আশ্বাস ?
বিশ্বাস না হয় মনে মুখোজ্জল পুত্র মোর নাই !"
প্রতিধ্বনি কেঁদে বলে,—
"গিয়েছে সে চলে,—
নাই, নাই, আশুতোষ নাই !"

বঙ্গের সুমেরুশৃঙ্গ, তুমি ছিলে ভারতের গৌরব-শিখর !
চুম্বিত অম্বর
তোমার তেজের শিখা, তোমার প্রাণের হোমানল,
প্রতিভার দীপ্তি সমুজ্জল !
বিশ্ব-জ্ঞান-যজ্ঞভূমে ছিলে তুমি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ
আমরণ !
ওগো হোতা,
গেলে তুমি কোথা
পূর্ণাহুতি নাহি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত যাগে ?
যুক্তকরে আগে
তব যজ্ঞ অবশেষ নিমন্ত্রিত রবাহুত দল,
করে নিতে পথের সম্বল
তোমার আশীষ বাণী,—তবমুখে প্রচারিত গির !
দুর্গতির
সীমা নাহি আমাদের—না ফুরাতে তব কর্ম্মভার
গেলে চলি পুণ্যলোকে, বঙ্গভূমি করি' অন্ধকার !

আজীবন করি প্রাণপাত,
জগতের মাঝে ঘৃণ্য নগণ্য এজাত,
তুলেছিলে গড়ি' তা'রে বিশ্বের বরেণ্য অগ্রদূত !
নির্দ্দোষ নিখুঁৎ
আদর্শ ধরিয়া ছিলে তাহাদের নয়ন সম্মুখে !

বাঙালী মানুষ হয়ে থাকে যা'তে অটল অনড়,
আপনাতে আপনি নির্ভর,
সারাটি জীবন ধরি' এই ছিল তোমারি সাধনা!
দেশ-মাতৃকার পদে এই তব শ্রেষ্ঠ আরাধনা!
তব স্নিগ্ধ জ্ঞানাঞ্জন
অজ্ঞান-তিমির-অন্ধ খুলে দিলে জাতির নয়ন!
চক্ষু মেলি' চাহি
স্তম্ভিত বাঙালী দেখে, জ্ঞানাম্বুধি—তা'র অন্ত নাহি,
তবু হ'তে হ'বে পার
জাতির উন্নতি-তরে বিদ্যা-পারাবার!

বুলায়ে স্বপনতুলি,—হৃদয়ের রঙে রঙাইয়া
নানা আভরণে সাজাইয়া,
বিশ্ববাণী পূজা লাগি' রচেছিলে স্থবর্ণমন্দির,
ওহে কর্ম্মবীর!
বন্যার প্লাবন
যখন আসিয়াছিল,—ভেবেছিলে ধরিবে ভাঙন,
ত্রেতাযুগে শ্রীকৃষ্ণের সম ধরেছিলে গোবর্দ্ধন প্রায়!
শতবন্যা ঝটিকার ঘায়
তোমার দেউল-দেহে লাগেনিকো একটু আঘাত!
লক্ষ বজ্রপাত
সুদৃঢ়-মন্দির-ভিতে এতটুকু আনে নি কম্পন,
এমনি সে অদ্ভুত সৃজন!
তোমার পথের পরে সর্প বিষধর
ফণা তুলি ভয়ঙ্কর
আসিত ধাইয়া পিছে সর্ব্বদাই করিতে দংশন!
তুমি আপনার তেজে করেছিলে শত শত কালিয়-দমন!

অনাদৃতা বঙ্গবাণী
তাঁরে দানি'
সম্মানের সিংহাসন মন্দিরে তোমার
মাতৃভূমি অহঙ্কার

বাড়াইলে স্বদেশ প্রেমিক !
হে চির নির্ভীক !
দেশের পোষাক,—তা'রে সাদরে দিলে যে বহুমান
বিজাতি সকাশে !
স্বাধীনের পাশে,
জাতির পাঁতির মাঝে
বিদ্যায় ও কাজে
পরাধীন এ জাতের করেছিলে তুমি আগুয়ান !
স্বাধীনতা উপাসক,
দেশব্রত মন্ত্রের সাধক,
তরুণ কর্ম্মীর দল গড়ি' নিজ মনোমত করি'
মনুষ্যত্ব বীজ তা'র চিত্তভূমি মাঝে দিলে গো সঞ্চরি' !

কুসুম কোমল হিয়া বজ্র সুকঠিন;
হে চির নবীন,
আবরিয়া রেখেছিলে সাহস অঞ্চলে,
জানিতে না ভয় কা'রে বলে !
মোরা ভেবেছিনু মনে,
আমাদের সনে
র'বে তুমি চিরদিন আপন গৌরবে !
বক্ষ হ'তে ছিনাইয়া ল'বে
মৃত্যুদুত এসে
অবশেষে,—
স্বপ্নে ও মনের কোণে ভাবি নাই এ দারুণ কথা !
তাই তব মৃত্যুর বারতা
শেলসম বাজে বুকে,—
পারি না যে করিতে বিশ্বাস !
গেলে হাসিমুখে,—
প্রাণহীন দেহ এল ফিরে,—এ দুর্দ্দিনে কে দিবে আশ্বাস ?

নাই,—তুমি নাই ?
তাই
মানিয়া লইতে হবে ?—সে কি কভু হয় গো সম্ভব ?
যাহা কিছু সৃষ্টি তব রয়েছে তো সব ?

তুমি শুধু গিয়েছ চলিয়া,
ধীরে ধীরে কারে কোনো কথা না বলিয়া,
মরণের নিমন্ত্রণে
জীবন-উৎসব ছাড়ি ধরা-প্রান্তে আনন্দ-নন্দনে ?
তব হিয়াখানি
কি সুখের আশা-ডোরে ল'য়ে গেল টানি,
পৃথিবীর পর-পারে—
এ সংসারে
টিকিল না মন তব,—কীর্ত্তি তব রাখিল না ধরি,—
পুত্র কন্যা পত্নী দেশ সবারে বিস্মরি,
কর্ম্মবীর, চলে গেলে তুমি
কাঁদাইয়া আপন সংসার,—কাঁদাইয়া সারা বঙ্গভূমি ?

সর্ব্বজয়ী ক্ষমতা মৃত্যুর,—নাহি মানে কভু তাহা কবি !
ভস্ম হয় বিনশ্বর দেহ'—জাতিমাঝে রাখি যায় নিজ প্রতিচ্ছবি
মাহান্ মানব !
ব্যাপক সে অনুভব
অগ্নিশিখা সম তেজে চারিদিকে পড়ে গো ছড়ায়ে,
প্রতি পরমাণু সাথে রহে তা'র পরশ জড়ায়ে !
আমাদের আশুতোষ, তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
জানি হে নিশ্চয় !
অশরীরী আত্মা তব অহরহ নবীন প্রেরণা
আনিবে জাতির মাঝে বিশ্বকাজে নিত্য তারে করিবে চালনা
সত্য শিব সুন্দরের পথে !
তরুণের দিগ্বিজয়ী রথে
তোমার পতাকা চিহ্ন চিরকাল রহিবে অঙ্কিত !
প্রপীড়িত কলঙ্কিত
জগৎসভায় ঘৃণ্য এ জাতির ভালে
মুছিবে না বিজয়-তিলক,—যাহা তুমি আপনি পরালে !

ওগো বৈশ্বানর,
লুপ্ত নহে তব তেজ,—তরুণের প্রাণের ভিতর
জ্বলুক তোমার আত্মা অহর্নিশ এই নব-জাগরণ দিনে,—

তোমার পরশ দিয়ে কর সঞ্জীবিত !
সারা বিশ্ব হইয়া বিস্মিত
তব নিজ হাতে গড়া এজাতির পানে চেয়ে রোক !
ভুলে দুঃখ শোক,
আমরা বলিতে শিখি,—"আছ তুমি আমাদের মাঝে,
উৎসাহের রূপে সব কাজে !
স্পার্শমণি, স্পর্শে তব ছিল যত মেকি
সোনা হোল দেখি !
আছ তুমি, থাকো তুমি অন্তরের তলে,—
জ্ঞান দাও, প্রাণ দাও, শক্তি দাও,—অজ্ঞান দুর্ব্বলে !—
তুমিও বল গো দেব,—"ওরে, নাই ভয় !
মৃত্যুতে অমর আমি, চিরদিন তোদেরি ভিতর রহিব নিশ্চয় !"

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল।

নারী

ব'লবেনা ?

না !

ব'লবেনা ?

না !

ব'ল্‌বেনা ?

কি হবে শুনে বলত ?

না, তুমি বল ; আমি শুনব !

শুধু শুধু মন খারাপ !···

তা' হ'ক্ ;—তুমি ব'ল্‌বে কিনা বল ?

তবে শোন !···

বাহিরে তখন সমস্ত আকাশ ভরিয়া একটা নিবিড় কাল মেঘ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; বহুক্ষণ হইতে ঝড়ের মাতামাতি সুরু হইয়াছিল ; এবার খানিকক্ষণ হইতে অজস্র জলধারাও তাহার বুক ফাটিয়া বিপুল গর্জ্জনে নামিয়া আসিতেছে—পৃথিবীর উত্তপ্ত বক্ষকে স্নিগ্ধ শীতল

করিবার জন্য ঝম্—ঝম্—ঝম্। মাঝে মাঝে আকাশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরিয়া যে বিদ্যুতের অগ্নিশিখা সমস্ত বিশ্বকে ত্রস্ত কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল তাহারই দীপ্ত ঝলক জীর্ণ পুরাতন বাতায়নের ফাঁক দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া তরুণ তরুণীর ক্ষুদ্র বক্ষ দুটিকে ত্রস্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল।

নিজের বুকের ঠিক পার্শ্বেই শায়িতা তার পত্নীর পানে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়াই একবার চাহিয়া লইয়া নিখিল আরম্ভ করিল তাহারই বিগত জীবনের এক অশ্রুসিক্ত অধ্যায়ের করুণ কাহিনী।

—সতের বৎসরের তরুণের মাথায় যখন একদিন অকস্মাৎ অত্যন্ত আশাতীত ভাবেই সংসারের অসহ্য গুরুভার ভাঙ্গিয়া পড়িল, নিখিল তখন তাহার জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চিরপ্রিয় তা'র সেই ক্ষুদ্র পল্লীর স্নেহমাখা শ্যামল কোলটুকু ছাড়িয়া কলিকাতায় রওনা হইল—মাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ৺ সিদ্ধেশ্বরীর পূজার সেই শুষ্ক মলিন কয়েকটা ফুল ও বিল্বপত্রকে তাহার পথের একমাত্র সঙ্গী করিয়া।···

কয়েকদিন অবিরত ঘুরিয়া ঘুরিয়াও যখন একটা সামান্য ২০।২৫ টাকা বেতনের চাকরীও তাহার ভাগ্যে জুটিলনা—তখন নিখিল অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল। নিজের সামান্য সঞ্চিত অর্থও তাহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর দু'দিন পরেই হয়ত' তাহাকে হোটেল হইতে তাড়াইয়া দিবে।···নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু সহসা আর্দ্র হইয়া উঠিল। সেদিনের রাত্রিতে নিখিলের তরুণ মনের উপর যে গুরু ভারটা সজোরে চাপিয়া বসিয়াছিল, পিতার অত্যন্ত আকস্মিক মৃত্যুতেও বোধ করি ততটা বেদনার চাপ তাহার বক্ষে বাজে নাই।···

শ্রান্ত অবসন্ন দেহটাকে টানিয়া লইয়া নিখিল সেদিনের সেই রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে এক নির্জ্জন সরু গলির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখিল—দেওয়ালের গায় একটা কিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া রহিয়াছে। নিকটে আসিয়া সে পড়িল, 'একটি প্রাইভেট টিউটার চাই; ঠিকানা' —।

সেই মুহূর্ত্তেই নিখিল নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় আসিয়া পৌঁছিল। দরজার বাহিরে আসিয়া ডাকিতেই একটি ছোট্ট ছেলে বাহির হইয়া আসিল, এবং তাহার আবশ্যকতার বিষয় জানিয়া আবার ভিতরে চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই নিখিল শুনিতে পাইল বাহিরের ঘর হইতে কে একজন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন এবং ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বসিবার জন্য সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল।···

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সমস্ত ঠিক হইয়া গেল এবং ঈশ্বরের এক কণা আশীর্ব্বাদের জোরে আজ সে সেই অজ্ঞাত অপরিচিত গৃহেরই এককোণে একটু আশ্রয় পাইল। * * *

কয়েকদিনের মধ্যেই নিখিল এইক্ষুদ্র পরিবারটুকুর সহিত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়া পড়িল যে সে সংসারের সমস্ত দুঃখ দৈন্যের ইতিহাসই তাহার নিকট স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া

পড়িল। খোকার নিকট হইতে সে জানিল—এবাটিতে তাহার মাতা ও তাহার ঠাকুমা ভিন্ন আর কোনও ব্যক্তিই থাকেন না। পার্শ্বের বাটিটিও তাহাদেরই গৃহের একটা অংশ এবং অর্থের অভাবেই বোধ করি সেটাকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে; খোকার মাতা যে বিধবা এ কথাটাও সে ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল এবং তাঁহার বেশভূষা হইতেও সে একদিন তাহা প্রত্যক্ষও করিয়াছিল।…

সকালবেলা খোকাকে পড়ানর পর নিখিল বাহির হইয়া যাইত চাকুরীর সন্ধানে এবং ফিরিতে প্রায়ই একটু বেশী বেলা হইত। সেদিন বেলাটা একটু অত্যন্ত বেশী রকমই হইয়া উঠিয়াছিল। তীব্র আগুণের মত দীপ্ত রৌদ্রের মধ্য দিয়া নিখিল যখন তাহার রক্ত-রাঙা মুখ লইয়া বাসায় ফিরিল—তখন দরজার নিকট হইতেই সে বুঝিল তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া কে একজন তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিখিল ভাবিল হয়ত খোকাই তাহার ঘরে বসিয়া কি সমস্ত নাড়াচাড়া করিতেছিল এবং তাহার ভয়ে সে এখন সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া নিখিল দেখিল—এককোণে তাহার ভাত ঢাকা রহিয়াছে।…

স্নানান্তে নিখিল আহারে বসিতেই খোকা আসিয়া কহিল,—আর যদি কিছু দরকার থাকে চেয়ে নেবেন।

খানিকটা ভাত ভাঙিয়া মাখিতে মাখিতে নিখিল কহিল, না আর কিছু বিশেষ চাইনা। তোমাদের সব খাওয়া হ'য়েছে ত?

খোকা কহিল,—হাঁ, হ'য়েছে। কেবল মা এখনও খান্‌নি।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের পাশ হইতে একটা শাসকের শুষ্ক কণ্ঠের ন্যায় অস্পষ্ট স্বর আসিয়া কাণে বাজিল,—এই, চুপ কর;—খুব হ'য়েছে!…

সেদিনের মত নিখিল আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং সেদিনের এত সামান্য আহারেও সে যত বেশী তৃপ্তি ও আনন্দ পাইয়াছিল জীবনে আর কোনও দিন বোধকরি সে এতটা পায় নাই।…

তাহার পর হইতে নিখিল আর কখনও অধিক বেলা করিয়া ফেরে নাই। হাজার কাজ থাকিলেও সে বেলা এগারটার মধ্যে বাসায় ফিরিয়া আসিত।…

সেদিন বৈকাল হইতেই কাল বৈশাখীর রুদ্র প্রতাপে সমস্ত সহরটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ঝড়ের গর্জ্জনের সঙ্গে বৃষ্টির যে অজস্র তীব্র ধারা সহরের বুকে বিপুল বেগে নামিয়া আসিতেছিল তাহার মধ্য দিয়া নিখিল কোনও রূপে ভিজিতে ভিজিতে যখন বাড়ী ফিরিল—তখন রাত্রি প্রায় ন'টা।

গৃহে ঢুকিবার পথে দরজা পার হইবার পরই মস্ত একটা নালা আছে এবং তাহার পরের পথটাও বিশেষ পরিষ্কার নহে। সে জন্য অন্ধকারে সে পথ দিয়া যাতায়াত করা একটু বিশেষ বিপদজনক হইয়া পড়ে।

সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া নিখিল সেদিনও দরজার নীচে পা দিতেই দেখিল—পাশের ঘরের জানালা দিয়া খানিকটা আলো আসিয়া সমস্ত পথটা তাহার চক্ষের সম্মুখে অত্যন্ত সরল করিয়া তুলিল। কোন্ করুণাময়ীর হাতের আলোয় যে আজ তাহার এপথ এমন আশাতীতভাবে আলোকিত হইয়া উঠিল নিখিল তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝিল। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া গর্ব্বস্ফীত বক্ষ লইয়া সে তাহার কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্রই দরজার অন্তরাল হইতে সে শুনিতে পাইল কোন্ অসীম করুণাময়ীর অনুচ্চ স্নেহ-কোমল কণ্ঠ—জামা কাপড় সব ভিজে গেছে, ওগুলো ছেড়ে ফেলুন।

সহসা নিখিল কোনই উত্তর করিতে পারিল না। এরূপ আশাতীত প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মানুষের অন্তর একটু অতিরিক্তই বিব্রত হইয়া পড়ে।

কয়েক মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিখিল কহিল,—না, বেশী ভেজেনিক ; জামাটা খুলে ফেলেছি।

—কাপড়টাও ছাড় ; তাতে ক্ষতি নেই কিছু ওটা আমি এখনই কেচে মেলে দিচ্ছি।—

নিখিল আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না ; ধীরে ধীরে নিজের কাচা কাপড়খানি টানিয়া লইয়া অৰ্দ্ধসিক্ত কাপড়খানা বদলাইয়া ফেলিল।

—ওই আলমারীর ওপর রেকাবীতে একটু জলখাবার আছে—

নিখিলের দুই চক্ষু সহসা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। মনে মনে সে ভাবিল,—তাহার মত অভাগার অদৃষ্টে এত স্নেহ কি ভাল ? একি সইবে ?—

আলমারীর উপর হইতে মিষ্টান্নের রেকাবীটা নামাইয়া লইয়া নিখিল কহিল,—তা না হয় নিলাম কিন্তু কথাই যখন কইলেন আপনি আমার সঙ্গে তখন আমার সাম্‌নে আস্‌তে কি কোনো দোষ আছে ?

নারী ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিখিলের পরিত্যক্ত বস্ত্রখানা জড় করিয়া তুলিয়া লইয়া আবার তেম্‌নি ধীরে ধীরেই বাহির হইয়া গেলেন।—কোনও কথাই কহিলেন না। নিখিল সেই অনন্ত করুণাময়ীর পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—পাড়হীন শুভ্র বস্ত্র পরিবৃত তাঁহার সারা অঙ্গ ছাপাইয়া একটা অপূর্ব সৌন্দর্য্য যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত চারিদিকে সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে, এবং সে সৌন্দর্য্য যে বাহিরের নয় ভিতরের—এটাও তাহার বুঝিতে একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।···নিখিল সেদিন স্পষ্টই উপলব্ধি করিল—নারীর প্রকৃত রূপ মানুষের গর্ব্বিত শিরকেও অতি সহজেই তাঁহার পায়ের তলায় নোয়াইয়া ফেলিতে পারে।···

জলযোগ শেষ করিয়া নিখিল তাহার শয্যার উপর শুইয়া ছিল। দুইচক্ষের উদাস

দৃষ্টিটুকু উপরের পানে নিবদ্ধ করিয়া সে ভাবিতেছিল—নারীর অন্তরের এই এক কণা স্নেহ ও করুণাই তাহার সমস্ত দেহকে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যেই না ভূষিত করে।

প্রায় আধঘণ্টা পর নারী তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—খাবে এসো।

এ কি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড আজ তাহার জীবনে ঘটিতে আরম্ভ করিল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিখিল শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল—চলুন।

যাইতে যাইতে নারী কহিলেন—আজ থেকে ভাই বোনের মাঝের ব্যবধানটা স'রে গেল, বুঝলে ত? কিন্তু বোনের ন্যায্য দাবী যেন ভায়ের কাছ থেকে পাই; বঞ্চিত না হই।

নিখিল চলিতে চলিতে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিরিয়া নিলীমার দুই পা স্পর্শ করিতেই সে তাড়াতাড়ি পিছনে হটিয়া কহিল—আহা-হা, করকি! আমি যে কায়স্থ।

প্রথমে নিখিল একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্তেই সে ভাব কাটাইয়া উঠিয়া সে কহিল—কিন্তু তবু ত আমার দিদি। ভাই বোনের মাঝে কি আবার জাতিভেদ থাকে দিদি? আত্মীয়তার সম্বন্ধ ত বাহিরের আবরণের সঙ্গে নয় দিদি—সে যে ভিতরের সঙ্গে ভিতরের সম্বন্ধ। ব্যক্তিত্ব বা জাতীয়ত্বের চেয়ে মনের দাম যে অনেক বেশী।

বারান্দায় আসিয়া এককোণে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তিনি কহিলেন—ঐখানে খাবার ঢাকা আছে; খাও।

সেদিন খাইতে বসিয়া নিখিল যেন কিছুতেই কিছু গিলিতে পারিতেছিল না। কি যেন একটা বাষ্পের আকারে তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

কোনওরূপে আহার শেষ করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

জীবনে আজ এই প্রথম নিখিল তার ভগ্নীর অভাব পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইল। বড় বোনের স্নেহের যে আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ের নিগূঢ় কন্দরে লুকাইয়া ছিল, তাহাই আজ যেন সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া নিখিলের সমস্ত অন্তর ছাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল—মরুপ্রান্তের তৃষ্ণার্ত্ত পথিক স্নিগ্ধ সলিলের সন্ধান পাইলে বুঝি এমনিই ব্যাকুল হইয়া উঠে।

গভীর রাত্রিতে সমস্ত গৃহটা যখন নিদ্রার মোহন মন্ত্রে স্তব্ধ নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে—নিদ্রাহীন মুক্ত আঁখি দুটির অপলক দৃষ্টিটাকে তখনও শূন্যের পানে নিবদ্ধ রাখিয়া নিখিল তাহার শূন্য শয্যায় পড়িয়াছিল! সে ভাবিতেছিল, তাহারই জীবনের কথা, তাহার দুঃখদৈন্যের অজস্র ব্যথা ভরা অর্থহীন অবস্থার কথা। আজপর্য্যন্তও তাহার একটা চাকুরী জুটিল না এবং জুটিবে কিনা সে বিষয়েও সে বিশেষ নিশ্চিত নহে।

সহসা তাহার মনে হইল—কাহার যেন মন্থর পদশব্দ তাহারই ঘরের পাশ হইতে সে শুনিতে পাইল। সভয় কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, কে?

অত্যন্ত নিচু গলায় উত্তর আসিল—আমি।

কে, দিদি?

হ্যাঁ, ভাই।

নিখিল আর কিছুই বলিল না। আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন।

আরও কয়েক সপ্তাহ সারাদিন অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর নিখিল একটা বড় সাহেবী দোকানে এক চাকরী পাইল। বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত তাহাদের কাজ কিন্তু মাহিনা মাত্র পঁচিশ টাকা।

এমনি করিয়াই কোনওরূপে তাহার দিন চলিতে লাগিল।

আর একদিন মধ্যরাত্রে নিখিল একবার বাহিরে আসিয়াছে—এমন সময় রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া সে দেখিল—দরজার নিকট দাঁড়াইয়া যেন দুইটি মানুষের অস্পষ্ট মূর্ত্তি। তাহারই মধ্যে একজনকে মনে হইল—শুভ্র বসন পরিহিতা এক রমণী এবং বোধকরি বা তাহার দিদিই হইবেন।

ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সে দরজার নিকট দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করার পর সে দেখিল নিলীমাই দরজা বন্ধ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে তাঁর শঙ্কিত সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। দরজার পাশেই আর একটু আড়ালে সরিয়া আসিয়া নিখিল নিজেকে লুকাইয়া ফেলিল।

নিখিলের সমস্ত মনটা মুহূর্ত্তে যেন কেমন এক তীব্র তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। স্নেহ ও করুণার মূর্ত্তিরূপিনী—একান্ত ভক্তি ও পূজার পাত্রী তাহার এই দিদিকে সে এতরাত্রে কাহার সহিত কথা কহিতে দেখিল? সে কে? এই শুব্ধ গভীর নিশীতে এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়া কেনইবা সে আজ এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল—এমন করিয়া গোপনচারিনী অভিসারিকার ন্যায়। একখানা কাগজও যেন সে তাহার হাতে দিয়াছে মনে হইল।

একটা মানুষের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কুভাবটা মানুষের দুর্ব্বল অন্তরের মধ্যে এত শীঘ্র দাগ কাটিয়া বসিতে বুঝি আর কিছুই তেমন করিয়া অত সহজে পারিয়া উঠেনা। নিখিল ভাবিল—প্রত্যুষে উঠিয়াই সে নিলীমাকে জিজ্ঞাসা করিবে তাহার শুব্ধ রাত্রের ঐ গোপন অভিসারের কথা—এবং কে সে যাহার উদ্দেশ্যে সে এমন করিয়া বিপদ ও কলঙ্কের পসরা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইতে সাহসী হইয়াছে?

কিন্তু প্রত্যুষে উঠিয়া নিলীমার সরল হাসিভরা মুখের পানে চাহিয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না। শুব্ধ বিস্ময়ে শুধু সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিল—কী অদ্ভুত এই নারীর মন! বাহির দেখিয়া ইহাদের অন্তর বিচার করিতে যাওয়া কি ভীষণ সমস্যার কথা।

ইহার পর মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সাত আটরাত্রি নিখিল নিলীমার এই পাপাচার

দেখিতে পাইয়াছে এবং শেষের একরাত্রিতে নিলীমাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার এ গোপন কার্য্য নিখিল ধরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে রাত্রে সে আর তাহাকে কিছুই বলে নাই।

সেদিন সকালবেলা নিখিল যখন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিল যে সে আজ তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে চাহে, তখন নিলীমা স্পষ্টই বুঝিল ইহার কারণটা কি। কিন্তু তাহার এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সে এককণাও করিল না। শুধু একবার তাহার দুই চক্ষের তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তাহার পানে চাহিয়া নিলীমা কহিল—বেশ যাও যদি ইচ্ছা হয়। কিন্তু ভুল ক'রলে। আর এ ভুলের জন্য একদিন তোমার অনুতাপও ক'রতে হবে।

নিখিল তাহার কথার কোনও জবাব না দিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় সে একবার নিলীমার নিকট হইতে একটু মিষ্ট কথায় বিদায় লইয়াও গেল না। শুধু তাহার দুই চক্ষের তিক্ত জ্বালাময় দৃষ্টি দিয়া সে দেখিল—নিলীমার দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রু টলমল করিতেছে।

ইহার প্রায় দুইমাস পরে এক প্রভাতে নিখিল এক পত্র পাইল। পত্র নিলীমার এবং সে তাহার সহিত একবার দেখা করিতে লিখিয়াছে। কিন্তু ঠিকানাটা বিভিন্ন।

পত্রখানা পড়িয়া নিখিল কয়েকমুহূর্ত্ত সেইখানেই দাঁড়াইয়া ভাবিল এবং তাহার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কার্য্যে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় নিলীমার বাসার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেই নিখিল দেখিল, নিলীমা উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সে ডাকিল—উপরে উঠে এসো।

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই নিখিল দেখিল প্রায় দশ বারজন রমণী চারিদিকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এবং তাহারা যে গৃহস্থ ঘরের সতী সাধ্বী নহে—এটীও তাহার বুঝিয়া উঠিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

উপরের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিতেই নিখিল দেখিল, এক শীর্ণাঙ্গী রুগ্না একটা মলিন শয্যায় একপ্রান্তে পড়িয়া আছে এবং তাহারই একপ্রান্তে বসিয়া তাহার দিদি—নিলীমা।

সম্মুখে বিস্তৃত একটা আসন দেখাইয়া দিয়া নিলীমা কহিল—বস। পরশু আমি এখানে এসেছি। এটা কি জায়গা বুঝতে পেরেছ বোধহয়? বলিয়া নিলীমা একটু হাসিল।

নিখিলের কথা কহিবার শক্তি প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। নিলীমার কথার উত্তর দিবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

নিলীমা আবার কহিল,—এখানে কেন এলাম জান ত? সেদিন রাত্রে আমার যে কাজ দেখে তুমি আমায় ছেড়ে এলে—সেই কাজই আর একদিন আমার শাশুড়ীরও চোখে পড়ে। তাঁর মুখ থেকে এবাড়ীর ওবাড়ীর লোকেও জান্‌তে পারল এবং তারপর পাঁচজনের মত আমাকেও বাড়ী ছাড়তে হ'ল।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল,—গেরস্থ ঘরের বৌ সেদিন প্রথম আমি একলা পথে এসে দাঁড়ালাম;—তখন রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে।

এ বাসাটার ঠিকানা আমার জানা ছিল; তাই একটা গাড়ী ভাড়া ক'রে এইখানেই এসে উঠলাম। সেদিন যা'র অভিসারে আমায় বেরুতে দেখেছিল সেটি কে জানত? আমারই স্বামীর ছেলে। এই হতভাগিনীই তার মা—বলিয়া নিলীমা তাহার পার্শ্বের নিদ্রিতা সেই রমণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

নিলীমার কথা শুনিয়া নিখিল যেন চমকিয়া উঠিল। নিলীমার স্বামীর পুত্র সে?

নিলীমা আবার কহিল,—সে প্রায়ই আমার কাছে যেতো অর্থের জন্য। আর আমার যথাসাধ্য আমি তাকে সাহায্যও ক'রতাম। স্বামীর ঋণ ত' আমারও ঋণ ব'লে মান্‌তে হবে। হ্যাঁ, জানত' স্বামীর যখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়স তখন তিনি দ্বিতীয় পক্ষে আমার গরীব বাপকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেন। তারপর আমার বাপও মারা যান্। ও ছেলেটি—যাকে তুমি পড়াতে সেটিও আমার নয়—আমার সতীনের।...মা হবার সৌভাগ্য আমার কোনোদিন ঘটেনি—যদিও নারী হ'য়েই জন্মেছি আমি। এবং স্বামী বেঁচে থাক্‌লেও যে আমি কোনও কালে সে সৌভাগ্য পেতাম তাও আশা করি না। যাক্!—...আমার বিয়ের ঢের পূর্ব্বে এই রমণীটি ছিলেন আমার স্বামীর বাড়ীর রাঁধুনী। আমার স্বামী একে প্রলোভন দেখিয়ে এর সমস্ত খুইয়ে একে সর্ব্বনাশের পথে টেনে নিয়ে আসেন। কিন্তু নিজের কীর্ত্তি যখন ধরা পড়বার মত অবস্থা হ'ল—তখন তিনি একে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন, আর তাঁর সমস্ত অপরাধই চাপিয়ে দিলেন একটা নিরপরাধী চাকরের উপর। তারপর এর যা' অবস্থা হ'ল তা' ত' বুঝতেই পারছো। শেষে যখন দুঃসময় এলো তখন এই ছেলেটিকে তিনি একদিন আমার কাছে পাঠালেন কিছু সাহায্যের জন্য। পরিচয় পেয়ে—অবশ্য এর পূর্ব্বেও আমি এসমস্ত জেনেছিলাম —আমি একে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হই। তাই এই ছেলেটি প্রায়ই আমার কাছে যেতো। দিনের বেলায় গেলে স্বামীর পুরাণ কীর্ত্তিটা পাছে আবার নতুন ক'রে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে—তাই আমি তাকে রাত্রেই আস্‌তে ব'লেছিলাম। জানিনা তা'তে আমার বিশেষ কিছু অপরাধ হ'য়ে ছিল কিনা। যাক্ সে কথা। এখন আমার সেই গোপন অভিসারের কথা শুনলে? বলিয়া নিলীমা একটু শুষ্ক হাসিল। সে হাসির রেখা বিদ্যুতের চাবুকের মতই সজোরে নিখিলের বুকে আসিয়া বাজিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নিলীমা আবার কহিল,—এর জীবন বোধকরি দু'তিন দিনের বেশী আর টিক্‌বে না। আমি মনে ক'রছি তখন ছেলেকে নিয়ে—এও ত আমারই ছেলে—কোনো এক দেশে চ'লে যাব। সেখানে গিয়ে সে কিছু কাজ ক'রবে —আর আমিও ঘরে ব'সে যাহা একটা কিছু ক'রব। দু'জনে মিলে কোনো রকম করে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবো। এরকম স্বার্থপর অন্ধ সমাজের মধ্যে থাকার চেয়ে নির্ব্বাসন ঢের ভাল।...আর ত বেশীদিন এখানে থাকবো না। তাই একবার শেষ দেখার জন্য আর তোমার ভুলটা ভেঙ্গে দেবায় জন্য তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

অশ্রুসিক্ত-কণ্ঠে নিখিল কহিল,—আর কি তবে কখনো দেখা হবে না দিদি ?

নিলীমা হাসিয়া কহিল,—গোপনচারিণীর সঙ্গে দেখা ক'রে নিজেও জীবনটাকে এখনও কলঙ্কিত করবার ইচ্ছা হয় ভাই ?

নিলীমার পা-দু'খানা সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া নিখিল কহিল,—আমায় ক্ষমা কর দিদি !

ছিঃ—ওকি ; এখুনি ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে—ছাড়।

নিখিল দৃঢ়স্বরে কহিল—না ; আগে বল ক্ষমা ক'রলে !

দিদির কাছে কি ভাইয়ের একটা সামান্য ভুল চিরদিনই অপরাধের মত হ'য়ে থাকে ভাই ?

নিখিল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া বসিল।

তার পরদিন আর একবার নিখিল নিলীমার সহিত দেখা করিতে গিয়া শুনিল—নিলীমার সেই রোগিনী নাকি কাল রাত্রেই মারা গিয়াছে এবং আজ সকালেই তাহারা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় যে গিয়াছে তাহা কিছুই বলিয়া যায় নাই।

অশ্রুসিক্ত-নয়নে অন্যান্য নারীগণের কঠোর ব্যঙ্গ হাস্তের মধ্য দিয়া নিখিল বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আর একদিনের মত সেদিনও তখন সমস্ত আকাশ ছাইয়া নিবিড় কালো মেঘ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহারই বুক চিরিয়া চিরিয়া বিদ্যুতের রক্ত শিখা ঢেউ খেলিয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

* * * * *

এখন তিনি কোথায় আর জান না ?

না।

একটা স্ফুরিত বিদ্যুতের তীব্র ঝলকে তরুণী দেখিল—শূন্যে নিবদ্ধ নিখিলের দুই চক্ষের কোণ বহিয়া তপ্তাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী।

খেয়াল খাতা

রবীন্দ্র বারমাস্যা

ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে।
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে,
আঁচলখানি দোলে ॥

* * *

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে ॥

* * *

সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে ॥

* * *

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে ॥

* * *

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব!
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে;
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে ॥

* * *

আয়লো সজনি সবে মিলে।
ঝরঝর বারিধারা, মৃদু মৃদু গুরুগুরু গর্জ্জন,
এ বরষা দিনে হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে ॥

* * *

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

* * *

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,
হৃদয় দুই হাতে চাপে।
আকাশ পানে চায়
ভরসা নাহি পায়,
তরাসে সারা নিশি যাগে,
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে॥

* * *

ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে!
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

* * *

ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে
চকিতে চপলা চমকে সঘনে।

* * *

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে?
ওগো নবঘন নীল বাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি?
তড়িৎ-শিখায় চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে?

* * *

তোমার দুখানি কালো আঁখি পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,

ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যুথীর মালা।
তোমারি ললাটে নব বরষায়
বরণডালা ॥

*   *   *

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি, লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যায়রে দেশ ॥

*   *   *

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে ছেলেবেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলাম পাতার ভেলা ॥

*   *   *

ধানক্ষেত বেয়ে বাঁকা পথখানি
গিয়েছে গ্রামের পারে।
বৃষ্টি আসিতে দাঁড়িয়েছিলাম
নিরালা কুটীর-দ্বারে ॥

*   *   *

গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহু, কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর ॥

*   *   *

যক্ষনারী বীণা-কোলে ভূমিতে বিলীন ;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন-শিথিল বেশ ;
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন ॥

নবমেঘ-পক্ষপরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিনী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্তকেশে, ম্লানবেশে সজল-নয়নে ?

* *

ওগো বঁধু দিনের শেষে, এলে তুমি কেমন বেশে !
আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে ॥

* *

চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলি,
থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী ॥

* *

আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে ॥

* *

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো গেলরে দিন বয়ে,
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে ॥

* *

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে ॥

* *

নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি,
নেরে, ও মন, নেরে আপন প্রাণে টানি ॥

* *

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে বলে'
রাজপুত্র। কোথা হতে হঠাৎ এলে চলে ॥

* *

আর্দ্রপাখা পাখীগুলি গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধ ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা॥

* * *

বৃষ্টিঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে, আষাঢ়ের গাথা॥

* * *

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত ?

* * *

পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল
আষাঢ়ে অনন্ত শূন্যে হেরি মেঘদল
স্বাধীন-গগনচারী, কাতরে নিশ্বাসি'
সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি
পাঠায় গগন-পানে।

* * *

কত সঙ্গীহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত বহুদীর্ঘ লুপ্ত-তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি॥

* * *

দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,
বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো।
সমস্ত আকাশ যোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া,
চিকৃমিকে বিদ্যুতের আলো॥

* * *

বহুপূর্ব্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগ নদী নগরী বাহিয়া।

* * *

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি "ভরা বাদরের" সুর ॥

* * *

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত ॥

* * *

বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝর্‌ঝর্‌ বরিষণে ॥

(ইন্দিরা দেবীর সঙ্কলন)

ইংরাজ, স্কচ ও আইরিশ

ইংরাজ, স্কচ ও আইরিশ এই তিনটি জাতির মধ্যে অর্থের প্রতি লালসা কার কতটা বেশী তারই বিচার করিয়া ইংলণ্ডের লেডী গ্লাভার নিম্নলিখিত গল্পটী তাঁহার কোন পুস্তকে লিখিয়াছেন—

শীতকালের রাত্রি। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে বরফের কুচি উড়ে এসে পড়ছে বন্ধ জানালার উপর। লণ্ডনের বিশাল রাজপথ একেবারে জনশূন্য।

এমন সময়ে তিনটি পুরুষ কোন আধুনিক নব্য হোটেলের একটী কক্ষে বসিয়া চা-পান করিতেছিল।

হঠাৎ একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা তুমি কি পেলে আজকের এই ভীষণ রাতটা বাইরে ওই খোলা মাঠটায় চুপ করে বসে কাটিয়ে দিতে পার, বলত ?

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হো হো করে হেসে উঠে বললে—সমস্ত ছুনিয়ার ধনসম্পত্তির বদলেও নয় !

অতঃপর তাহারা পরামর্শ করিল—এস এই নিয়ে একটা পরীক্ষা করা যাক্।

তারা পর পর তিনজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডেকে পাঠালে। প্রথম ড্রাইভার ইংরাজ। তাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে সে উত্তর দিল—এক 'সভারেণ' পেলে আমি এ কাজ করব। তাকে বিদায় দিয়ে দ্বিতীয় স্কচ ড্রাইভারকে ডেকে পাঠান হল। সে খানিকক্ষণ ভেবে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—আপনারা কতবেশী দিতে পারেন "লাখ—কোটী" তারা হেসে তাকেও বিদায় দিলে। তৃতীয় যে ড্রাইভারটিকে আহ্বান করা হইল, সে আইরিশ। প্রশ্ন শুনে সে হেসে বললে—ধন্যবাদ, আপনাদের কিছুই দিতে হবে না। ঠাণ্ডায় মারা পড়লে আমার পরলোকগত আত্মার টাকার প্রয়োজন হবে না।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

দান

(টুর্গেনিভ)

সংবাদ-পত্রে এই খবরটি বেরিয়েছে—

"কোটিপতি শ্রেষ্ঠী ধনপৎ অনাথ আতুরের আশ্রয়ের জন্য ৫০০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে অনাথ আতুরের বাস ও ভরণ পোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।"

পড়ে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল। শ্রেষ্ঠী ধনপতের অগাধ ঐশ্বর্য্য, অতুল সম্পত্তি। কিন্তু আজ থেকে ধনী বলে নয়, বণিক্‌শ্রেষ্ঠ বলে নয়, দানবীরদের অগ্রগণ্য বলে তাঁর নাম আমাদের দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ধন্য আমার দেশ যেখানে এমন দানবীরের জন্ম হয়েছে।

বিকাল বেলা বেড়িয়ে ফিরছি। পল্লীপথ, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। একটা ভাঙা পড়ো পড়ো কুটীরের সামনে দিয়ে চলেছি, হঠাৎ কানে এল ভিতরে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ। স্ত্রী বলছে "ওগো মধু কৈবর্ত্তের ছেলেকে নিয়ে এলে—খাওয়াবে কি? আমাদের দু'টিরই ত দু-সন্ধ্যা দু'মুটো জুটে না।" স্বামীর উত্তর এল, "তবে আমরা একবেলা খেয়েই থাকব, ও ছেলে মানুষ, ওকে দু'বেলা খাওয়াতেই হবে; মা-বাপ হারা ছেলে, সংসারে ওর কেউ নেই নিজেরা একবেলা উপোষ থাকব বলে ছেলেটা না খেয়ে মরবে এ দেখতে পারব না।" স্ত্রীর উত্তর শুনলুম,—স্বরে কি স্নেহ, কি করুণা, "ওমা, তা কি আবার কেউ পারে? আমরা কি একবেলা না খেলে মরে যাব?"

বাড়ীতে ফিরে এসে দানবীর ধনপতের মহাপ্রাণতার স্তুতি করে একটা প্রবন্ধ লিখব ঠিক করেছিলুম—সে আর মনেই রইল না।

ক্ষীরোদবিহারী।

আপদ ও বিপদ

সেকালে বর দেখিতে আসিয়া কোনও ভদ্রলোক বরকে প্রশ্ন করিলেন "হ্যা বাবাজী? বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছ ত? আচ্ছা বল দিকিন আপদ আর বিপদে তফাৎ কি?

বরও বেশ বিদ্বান ছিল, সুতরাং প্রশ্নের উত্তরে বর কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিল, "আজ্ঞে! বিপদ হচ্ছে এই কি না রাস্তায় যেতে যেতে যদি একটা হোঁচট খেলুম, কিম্বা ধরুন কোথাও বাড়ীর ছাদ থেকে মাথায় হঠাৎ একটা ইট পড়ে গেল? কি হয়তো পথে চল্‌তে চল্‌তে গরুর গাড়ীর চাকাখানা পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল—এই সব হ'ল বিপদ আর কি?"

ভদ্রলোকটি খুসী হইয়া বলিল "আচ্ছা বেশ কথা। এখন আপদটি কি বল ত?"

বর কিঞ্চিৎ মাথা চুলকাইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে? এই যে আপনি প্রশ্নটি করেছেন এইটিই আপদ আর কি?"

শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ মিত্র।

বেদানাকান্তের চিঠি

(চা-তত্ত্ব)

(অধ্যাপক—শ্রীমহেন্দ্রকুমার সরকার)

ও শ্রীশ্রীচা-ভরসা।

পঞ্চধারা-সম্পাদক-যুগল-করকমলেষু,—

শুনিতে পাইলাম আপনারা নাকি পঞ্চনদের সৈকতভূমিতে 'পঞ্চধারা'র মিলনমহোৎসবে ব্রতী হইয়াছেন। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ জলবিন্দু আপনাদের পঞ্চামৃতধারায় স্থান পাইলে কৃতার্থ হইব।

আমি কমলাকান্ত শর্ম্মার ছোট ভাই শ্রীমান্ বেদানাকান্ত। আমার দাদা নিতান্তই সেকেলে অহিফেনের ভক্ত ছিলেন; তাই ছোটলোকের 'ঝি' প্রসন্নগোয়ালিনীর শ্যামলা গাইয়ের সাথে তাঁহার খাতির ছিল। আমি আফিংএর দরবৃদ্ধি ও দুর্দ্দশা দেখিয়া বিংশশতাব্দীর বাবু-ঋষিদের উদর যজ্ঞের 'সোম্যং মধু' চা পান করিতে আরম্ভ করিয়াছি। চা-খোর বৈয়াকরণ-সমাজ আমাকে তাঁদের অতি আদরের 'চা-চন-চুঞ্চু,' উপাধি প্রদান করিয়া গুণ-গ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আমার দাদা একভরি আফিং পাইলে 'বঙ্গ-দর্শনে' প্রবন্ধ লিখিতেন; আমি সেই সুযোগ্য দাদার গুণধর ভাই, এক পেয়ালা চা পাইলেই 'পঞ্চধারা'য় প্রবন্ধজলকণা প্রেরণ করিতে সম্মত আছি. এখন আপনাদের সম্মতি থাকিলে বায়না বাবদ এক পয়সা দামের এক পুঁরিয়া চা ডাকযোগে পাঠাইবেন।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব (প্রেততত্ত্ব ?) ও ছোট গল্পের যুগ। যে মাসিকপত্রে এই দুইটী জিনিষ না থাকে তাহা একেবারে অপাঠ্য অথবা কুপাঠ্য না হইলেও দুষ্পাঠ্য সন্দেহ নাই। আমাদের বংশে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কাহারও (মূল চীনা বা জাপানী হইতে অনূদিত) ছোট গল্প লেখার অভ্যাস ছিল না, আমার দাদা কমলাকান্তও লিখেন নাই—আমি নিজেও লিখিতে পারি না সুতরাং প্রত্নতত্ত্বের গুলি ছাড়া আমাদ্বারা আর কোনরূপ প্রবন্ধ লেখার সম্ভাবনা নাই।

বহুদিন হয় কলিকাতা থাকিতে 'Gastronomical club' এর (১২নং পার্শীবাগান লেন) সভ্যবৃন্দ আমার অত্যধিক চা-প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া আমাকে 'চা-অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন। তদুপলক্ষে আমি খাঁটী স্বদেশিভাবে আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের 'লছমন ঝোলা' বেদ, পানিনিব্যাকরণ ও পুরাণসমুদ্র মন্থন করিয়া চা-তত্ত্ব উদ্ধারে প্রবৃত্ত হই। আজ আমাদের সেই 'Gastronomical club' এবং 'চা-অনুসন্ধান সমিতি কালের

---

* (লাহোরের স্থানীয় মাসিকপত্র পঞ্চধারার জন্য লিখিত অপ্রকাশিত ও লাহোর বঙ্গসাহিত্য সভার প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার অনুসন্ধানের ফল 'চা-তত্ত্ব' আপনাদের 'পঞ্চধারায়' প্রকাশিত করিয়া হস্ত কণ্ডুয়ন নিবৃত্ত করিব।

ঐতিহাসিকই বলুন আর দার্শনিকই বলুন, আজকাল কেহ কিছু লিখিতে গেলে তাহাকে প্রথম দেখিতে হইবে এ বিষয়ে বেদের কি মত। বেদ হইতে কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে না পারিলে লোক তাহার Researchএর মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সুতরাং আমিও একে একে সমস্ত সাত আটটী বেদে (হাসিবেন না,—বেদ অনেক আছে,—যথা ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ—জীবন বেদ আরও কত কি) চা-তত্ত্ব, খুঁজিতে লাগিলাম। এইরূপ পরিশ্রমের পর কোথাও কিছু মিলাইতে না পারায় আমার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন সন্ধ্যাকালে চা-পান করিয়া মনের দুঃখে ঝিমাইতেছি, (মনে রাখিবেন আমি কিন্তু আফিং খাই না) এমন সময় গৃহিণী আসিয়া দেবনাগরীতে লেখা একখানা জীর্ণ কাগজ আমার সম্মুখে রাখিয়া ললিত ঝঙ্কারে বলিলেন, "ওগো, তুমি ত পথে ঘাটে যত কিছু ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া পাও তাহার কোনটাই পড়িতে বাদ দেও না। এই কাগজখানার পাঠোদ্ধার কর দেখি।" আজ দুপুরবেলা 'প্রসন্নগোয়ালিনীর' বোনপুত রামাকে বাজার হইতে এক পয়সার চা আনিতে দিয়াছিলাম। সেই চা এই জীর্ণ কাগজে বাঁধা ছিল।

কাগজ খণ্ডের জীর্ণ ও কীটদষ্ট অবস্থা দেখিয়া আমার মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। আমি অতি আগ্রহে গৃহিণীর নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া উহার পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলাম, এতদিনে আমার সকল চেষ্টা ফলবতী হইল। পড়িয়া দেখি ছিন্নপত্রের শিরোভাগে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—'চা বেদ'। আমি পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে সেই বৈদিক সূক্তের মূল ও বঙ্গানুবাদ দিলাম, 'হেম্নঃ সংলক্ষ্যতেহগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা'—অগ্নিতেই সুবর্ণের বিশুদ্ধির পরীক্ষা হয়,—বৈদিক মন্ত্রের দোষগুণ সুধীগণই বিচার করিবেন।

'চা-বেদঃ'

কো নু বেদেতি প্রথমং সূক্তম্। পঞ্চর্চম্ চাণ্ডুলম্।

চাদেবতাকম্। 'যা তেনোচ্যতে সা দেবতেতি পরিভাষাবলাৎ।'

বঙ্গানুবাদ—'কোনু বেদ' ইহা সূক্তের প্রথমচরণ, প্রথম সূক্ত, ঋক্ পাঁচটী ঋষি চণ্ডুল, দেবতা 'চা' (যে সূক্তে যাঁহার বিষয় বর্ণিত থাকে তিনিই সেই সূক্তের দেবতা, এই পরিভাষা অনুসারে), উপরি উক্ত কয়েক পংক্তি সূক্তের মুখবন্ধ। Introduction.

'প্রথমা-ঋক্'

কো নু বেদ অমৃতস্য জামিং বনে জাতা যা গৃহস্য ধাত্রী,

অপাং যা পত্নী মধুনঃ সখী কদা সা দমে কুতঃ আয়াতা॥ ১

কং অ—অমৃতের দুহিতা, গৃহের ধাত্রী, সলিলের পত্নী, মধুর সখী অরণ্যজাত 'চা'-দেবী কখন কোথা হইতে গৃহে আগমন করিয়াছিলেন তাহা কে জানে?

টিপ্পনী—(চা দেবীকে অমৃতের কন্যা বলা হইয়াছে। সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃত হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, ঋষি কি ইহাই বলিতে চাহেন ?)।

অথ দ্বিতীয়া

গোশ্রীতা শোনা মধুরা সোমো ন।
যোষা ন ইস্রা উষসি চাপ্রৈতি ॥ ২

বং অ | (আস্বাদে) সোমরসের মত মধুরা, গোদুগ্ধ মিশ্রিতা ঈষৎ লোহিতবর্ণা চা-দেবী সদা হাস্যময়ী তরুণীর মত (ঢল ঢলে অঙ্গের লাবণি লইয়া) উষাকালে আগমন করেন।

টিঃ—(সোমের মত মধুর বলা হইয়াছে। ইহাই বৈদিক ঋষির আসল সোম নহে ত ?)

অথ তৃতীয়া

অগ্নি না সচা চমসং বরেণ্যম্।
সোমো ন গ্রহং বিশ্ববারা যুবতিঃ ॥ ৩

বং অ – সোম যেমন গ্রহে (পাত্রে) প্রবেশ করে সেইরূপ বিশ্বমানবের বরণীয়া, চিরন্তন যুবতি চা-দেবী ও অগ্নির সহিত (অর্থাৎ উত্তপ্ত হইয়া) উৎকৃষ্ট পাত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

টিঃ –(দুইটী মন্ত্রেই ঋষি তরুণীর সহিত চা-দেবীর তুলনা করিয়াছেন। উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য সুধীবর্গের বিবেচ্য ও রসিক উপাসকের উপভোগ্য ।)

অথ চতুর্থী

শ্রুধি সুনৃতে দিবঃ দুহিতা।
অধ্বরমেহি হৃদি ধীমহি ॥ ৪

বং অ—(৩টী ঋকে গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক ঋষি চা-দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বলিতেছেন।)

অমর দুহিতা, সত্যস্বরূপিণী—চা-দেবি শ্রবণ কর, তুমি আমার যজ্ঞে আগমন কর। আমরা হৃদয়ে তোমার ধ্যান করি।

টিঃ—(লক্ষ্য করিবেন—ঋষি চঞ্চল হৃদয়ে ধ্যান করিতে চাহেন—মনে নহে। বেশ রসিক ত !)

অথ পঞ্চমী

ওঁ দমে নঃ সায়ংপ্রাতঃ। তৎচামসং বরেণ্যম্।
রসং চা দেব্যাঃ পিবামঃ তৃপ্তিং যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৫

বং অঃ—(শেষ মন্ত্রে ঋষি চা গায়ত্রী জপ করিয়া মধুরেণ উপসংহার করিতেছেন।)

(এস বন্ধুগণ,) আমরা সকাল বিকালে দুই বেলা সেই উৎকৃষ্ট পাত্রস্থিত (চীনামাটীর পেয়ালায় নহে ত ?)চা-দেবীর মধুরস পান (ও উপভোগ) করি। তিনি আমাদের তৃপ্তি বর্দ্ধন করুন।

উপরি লিখিত সূক্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক ঋষি চণ্ডুলের নিকট ও চা-দেবীর যথেষ্ট সম্মান ছিল। ভট্ট মোক্ষ মূলারের (Maxmuller) ছাত্রবর্গের কেহ দয়া করিয়া চা-বেদ রচনার কাল নির্ণয় করিলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে।

বেদোক্ত চা'য়ের মহিমা স্মরণ করিলে প্রকৃতই চা কে আমার বিংশশতাব্দীর সভ্যজাতির উদরযজ্ঞের—'সোম্যং মধু' বলিতে ইচ্ছা হয়।

বেদের পরই বৈয়াকরণ পানিনির অষ্টাধ্যায়ী অতি প্রামাণিক গ্রন্থ, (অবশ্য ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদের)। এই ব্যাকরণের যথেষ্ট প্রচলিত টীকা আছে (ভয় নাই, ইহা প্লেগ বা বসন্তের টীকা নহে)। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক স্থলে মূলসূত্র অপেক্ষা সূত্রের ব্যাখ্যা অধিক দুরূহ বলিয়া মনে হয়। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' এই চলিত বাক্যটীর যাথার্থ্য সংস্কৃত পুস্তকের টীকাতে প্রায় সর্ব্বত্র প্রমাণিত হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকের আবার টীকার টীকা প্রটীকাও দেখা যায়। যথা—

অষ্টাধ্যায়ীর ভট্টজীদীক্ষিতকৃত টীকার নাম 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা (ভট্টজীর স্বকৃত) 'প্রৌঢ়মনোরমা'।

আবার দীক্ষিত মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র প্রৌঢ়মনোরমারও টীকা লিখিয়া দীক্ষিতকুলের কপালে রাজটীকা পরাইয়াছেন। এই সকল টীকার কচকচিতে আমি চায়ের নামগন্ধও পাইলাম না টীকা ও টীকীতেই যাঁহাদের আনন্দ তাঁহারা চায়ের মর্ম্ম কি বুঝিবেন ?

একবার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমাকে আসাম যাইতে হয়, সেখানে ব্রহ্মপুত্রজলে স্নান করিবার সময় একখানা জীর্ণপুস্তক পাইয়াছিলাম। (বোধ হয় মানস সরোবর হইতে নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছিল)। বহুকষ্টে উহার পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছি, পুস্তকটী তিব্বতদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ 'চিংলু' মহোদয়কৃত পাণিনির একখানি অভিনব ভাষ্য। সূত্রব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের বহুস্থলে 'চা' মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। চা-ভক্ত পাঠকগণের অবগতির জন্য দুই একটী প্রধান প্রধান সূত্রের ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল। 'চিংলু' ভাষ্যের ঘরে ঘরে প্রচার হইলে বাঙ্গালীর গুণগ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে;—গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ—গুণীর নিকটই গুণের আদর, নির্গুণের নিকট নহে।

চিংলুভাষ্য

(১) 'চা'র্থে দ্বন্দঃ (পা ২।২ ২৯) চায়ের জন্য বিবাদ হইয়া থাকে।

অমৃতের নিমিত্ত দেবাসুরের দ্বন্দ পুরাণপ্রসিদ্ধ। এই সূত্রে 'চা' শব্দ অমৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। (অমৃতের জন্য দেবাসুরের সংগ্রাম প্রতিযুগেই ঘটিতে পারে, কিন্তু চায়ের টেবিলে চামচ ও পেয়ালার ছোড়াছুড়ি হয় কি না জানি না)।

এই সূত্রে আমরা চায়ের উৎপত্তি ও চায়ের নিমিত্ত দেবাসুরের দ্বন্দ (দেবতাদ্বন্দে ?) হইয়াছিল, এই তথ্যের আভাস পাইলাম। যে সকল সূত্রে চায়ের গুণকীর্ত্তন আছে এখন তাহাই দেখাইব।

(২) চা'দয়ঃ অসত্বে—(পাঃ—১।৪।১৭),—সত্ত্ব শব্দের অর্থ শারীরিকও মানসিক বল। অসত্ত্বে অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতায় চা প্রভৃতি (কফি, কোকো ও বাদ যায় নাই) ব্যবহার করিতে হয়। (আহা, কি পাণ্ডিত্য! ধন্য চিংলো, আমরা তোমার বলিহারি যাই। তুমিই আমাদিগকে 'স্নায়বিকদৌর্ব্বল্যের' রুচিকর ঔষধ ব্যবহার শিখাইলে। তোমারই অনুগ্রহে ভীরু বঙ্গবীরের সাহস বৃদ্ধির tonic আবিষ্কৃত হইল।)

(৩) সর্ব্বনাম স্থলে 'চা'সম্বুদ্ধৌ (পাঃ ৬।৪।৮)—সম্বুদ্ধি শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসম্বুদ্ধি তাহার বিপরীত—বুদ্ধিমান্দ্য, মুর্খতা। অসম্বুদ্ধৌ অর্থাৎ কোন লোকের মস্তিষ্কের উর্ব্বরতায় অভাব হইলে, সর্ব্বনাম স্থানে—সকলস্থলে নির্ব্বিশেষে চা'য়ের ব্যবস্থা করা উচিত। কি আশ্চর্য্য গবেষণা! ছাত্রগণ, ভয় নাই, তিক্তব্রাহ্মীঘৃত সেবনের আর প্রয়োজন হইবে না। গণিতের শ্রেণীতে কাষ্ঠাসনের উপর 'লম্ব' হইয়া থাকার যন্ত্রণা ও অপমান হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় চিংলু আজ তোমাদিগকে শিখাইয়া দিল!)

(৪) ষষ্ঠী 'চা'নাদরে—(পাঃ—২।৩।৩৮)—, চায়ের অনাদর করিলে অকালে ষষ্ঠী অবস্থা (বৃদ্ধত্ব) প্রাপ্তি হয়; মতান্তরে ষষ্ঠীদেবীর কৃপা হয়। এই ব্যাখ্যা হইতে বেশ বুঝা যায় যে চা জিনিষটী জরা প্রতিষেধক চিরযৌবনলাভের মহৌষধ এই চা রসায়ন পানে অবহেলা করিলে অল্প বয়সেই মানুষ জরাগ্রস্ত হয়। সুতরাং সাবধান অনন্তযৌবনাকাঙ্ক্ষী, যদি অকাল বার্দ্ধক্যের হাত হইতে মুক্তি চাও তবে চা পানে অনাদর করিও না।

এখন এই সূত্রের মতান্তর ব্যাখ্যাটী একটু তলাইয়া দেখা যাউক। চা পানে অনাদর দেখিলে ষষ্ঠীদেবী কৃপা করেন, আপাত দৃষ্টিতে ইহাতে চায়ের অনুপকারিতাই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধহয়।

কিন্তু আজকাল এই কঠিন জীবন সংগ্রামের দিনে বহু সন্তানের জনকের (বিশেষতঃ কন্যার জন্মদাতার) নিকট মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহকে 'শীতলা'র কৃপায় ন্যায় নিগ্রহ ব্যতীত আর কি বলা যায়? অতএব একবার চায়ের উপকারিতা বুঝিতে পারিলে আর 'কন্যাদায়ের প্রতিকার' খুঁজিতে হইবে না।' সুতরাং হে ভবিষ্যৎ সন্তান জনক বঙ্গযুবক, 'চিংলু'র ব্যবস্থা অনুসারে চা পান করিতে আরম্ভ কর, তোমার জীবনের প্রধান সমস্যার মীমাংসা হইবে।

এইরূপ আরও বহুসূত্রে পাণিনি মুনি চাপানের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। আমি বাহুল্য ভয়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত হইলাম।

বৈদিক যুগে ও পাণিনির সময়ে চায়ের বহুল প্রচলন ও আদর ছিল তাহা আমি সপ্রমাণ করিয়াছি। এখন পুরাণ হইতে দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারিলেই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করা যায়।

পুরাণ সমূহ গুলিখোরদের উপন্যাসের মত অপ্রামাণিক, এবং ইহাদের অধিকাংশই 'নবীন' ও আধুনিক, প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণের অনেকেই এই মত পোষণ করেন। সুতরাং আমি অপ্রামাণিক

গ্রন্থের প্রমাণ গ্রহণে বেশী পরিশ্রম করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের বিরাগ ভাজন হইতে চাহি না।

আমার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ চম্পটীকান্তের একখানা খট্টাঙ্গ পুরাণ ছিল। আমি তাহা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পুস্তকের 'গঞ্জিকা' অধ্যায়ের একটী শ্লোক আপনাকে উপহার দিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিব।

উষ্ণজলং নমস্কৃত্য পাত্রস্থিতং চামিশ্রিতম্।

রোটীকাং গোক্ষীরং মধু ততোজয়মুদীরয়েৎ॥'

অবিশ্বাসী নাস্তিক হয়ত ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন। যাঁহারা নিজেরাই প্র-ক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ক্ষিপ্ত (উঃ কি পাষণ্ড!) তাঁহারা অন্যকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিক্ষেপ করিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

বেদ-পাণিনি-পুরাণের ত্রিবেণীসঙ্গমে চণ্ডুল-চিংলু-চম্পটীর প্রসাদে আমরা 'চা'ধারার সন্ধান পাইলাম। তাই 'উর্দ্ধবাহু-বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিৎ শৃণোতি মাম্',—আমি বাহু তুলিয়া তার স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছি কেহ আমার কথা শুনেনা,—যে 'চা এব অস্মাকম্ সোম্যং মধু'—'চা'ই আমাদের মধুর সোমরস,—চৈব নঃ অমৃতময়ম্ আনন্দম,—'চা'ই আমাদের অমৃতময় আনন্দ,—'চৈব নঃ আনন্দরূপম্ অমৃতম্'।

ওঁ মধু মধু মধু।

বেদানাকান্ত শর্ম্মা।

বাব্‌লা

২৭

বাড়ীতে বাবলার মন টিঁকিতেছিল না। মার প্রবল জ্বর, যাতনার অন্ত নাই—ডাক্তারের বাড়ী ছুটিয়া ঔষধ খাওয়াইয়াও সে যাতনা কমানো যায় না! সে কেমন অস্থির হইয়া পড়িল।

সে দিন কাগজ লইয়া বিক্রয়ের জন্য বাহির হইতেও মন চাহিতেছিল না। সারা দিন সে মার কাছে-কাছেই বসিয়া দাঁড়াইয়া কাটাইয়া দিল। বৈকালের দিকে শৈলর অস্বাচ্ছন্দ্য একটু কমিলে শৈল ডাকিল,—বাব্‌লা…

বাব্‌লা মার কাছে আসিয়া বসিল। শৈল আবার ডাকিল,—বাব্‌লু…

বাব্‌লা মার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। মার চোখে কি সে উদাস দৃষ্টি! বাব্‌লার বুক এক অসহ্য ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। সে মার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—কেন মা?

শৈল কোন জবাব দিল না, শূন্য দৃষ্টিতে বাবলার পানে চাহিয়া রহিল। বাবলা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—বড্ড যাতনা হচ্ছে মা?

শৈল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

বাবলা কাতর কণ্ঠে কহিল—কোথায় যাতনা বোধ কর্‌ছো মা? কি যাতনা?

মা বুকটার কাছে হাত দিয়া বলিল—বুকে। নিশ্বেস যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

বাবলা চারিদিক অন্ধকার দেখিল। ঘরের মধ্যকার আলোটুকুর উপর কোথা হইতে কালো ছায়া পড়িয়া তাকে ঢাকিয়া দিল! বাবলা স্থির নিস্পন্দ বসিয়া রহিল।

বহুক্ষণ এমনি থাকিবার পর শৈল বাবলার হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—আমি আর বাঁচবো না বাবলা।

এ কথায় বাবলার দুই চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। শৈল বলিল—কেঁদো না বাবা, ছি! মা-বাপ কারো চিরদিন থাকে না। আমার মা-বাপ যে কবে চলে গেছেন আমায় ছেড়ে, আমার তা মনেও পড়ে না। আমি কি কাঁদচি, তার জন্যে!

বাবলা ফুঁপাইয়া বলিয়া উঠিল,—ও কথা বলো না তুমি মা।

শৈল বলিল,—এতদিন তো বলিনি বাবা! আজ দায়ে পড়ে বলতে হচ্ছে। নৈলে আমার কি অসাধ সারতে! যদি সেরে উঠি সে তো ভালোই, তবে যদি এ অসুখ না সারে···

শৈলর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। যদি অসুখ না সারে, তাহা হইলে যে কি... বাবলার যে কি হইবে তা কল্পনাও করা যায় না। এত-বড় পৃথিবীর মধ্যে সে নেহাৎ একা, নিঃসহায় হইয়া কি-ভাবেই যে ঘুরিয়া বেড়াইবে···সে কথা মনে করিতেও শৈলর অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

বাবলা চুপ করিয়া মার পানে চাহিয়া রহিল। শৈল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—যদি না সারি, ঠাকুমার কাছেই থেকো। কেমন? মানুষ হয়ো বাবা। লেখাপড়া ছেড়ো না—কত বড় হবে। আমি স্বর্গ থেকে দেখে কত খুশী হব। তুমি বড় হলে আমাদেরও লোকে নাম করবে। ছেলেই বাপ-মার নাম রাখে।......তাঁর বড় সাধ ছিল, নিজে কষ্ট পেয়েছিলেন, লেখাপড়া শেখার সম্বল ছিল না,—তোমায় মানুষ করে তুলবেন···শৈল ক্ষণেক স্তব্ধ হইল, তারপর আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তার কিছুই হলো না! কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল...

বাবলা বলিল,—তুমি চুপ কর মা, ও-সব কথা বলো না আর। তুমি যদি না সারো, আমি তাহলে কোথাও ছুটে চলে যাব, দূরে, খুব দূরে, সব ছেড়ে—আমি এখানে থাকতে পারব না মা।

শৈল বলিল,—ছুটে পালিয়ে কি হবে?

বাবলা বলিল,—পালাবই আমি।

শৈল বলিল,—লেখাপড়া করবে না আর?

বাবলা বলিল,—না। সমস্ত পৃথিবীর উপর তার রাগ ধরিয়া গিয়াছিল। কেন তার এই

ছোট্ট সুখটুকু কাড়িয়া রাখিবার জন্য বাহিরে এ বিপুল চক্রান্ত চলিয়াছে! কেন? কেন, এ চক্রান্ত? বাপ নাই, কেহ নাই, শুধু এক রুগ্না মা—তাকেও তার পাশ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।...এ কি অত্যাচার! যদি এ দুনিয়াটাকে দুই হাতে উপড়াইয়া আজ ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত সে! ছেলের এ ভাব দেখিয়া শৈল বলিল—না রে পাগলা, আমি সেরে উঠবো বৈ কি! যা, তুই একটু ঘুরে আয়।

বাবলা বলিল,—না, আমি আর কোথাও যাব না মা।

শৈল বলিল,—কাগজ বেচ্‌বি নে? আমার জন্যে আঙুর বেদানা কিন্‌তে হবে না বুঝি?

বাবলা বলিল,—হ্যাঁ, জানি গো, জানি...তুমি তো ভারী খাও! একটুখানি মুখে দিয়ে সব আমায় দাও...

শৈল বলিল,—তুই খেলেই যে আমার খাওয়া হয়, বাবা!

বাবলা বলিল,—তুমি ভারী দুষ্টু!

শৈল হাসিল, হাসিয়া বলিল,—আমার ছোট্ট বাপ তুই,—না রে? কেবল শাসাচ্ছিস্!

বাবলা বলিল,—যাও, তোমার কেবলি ঠাট্টা!

এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে শৈল বলিল,—সেই বাবুটির কাছে যাবি নে?

বাবলা বলিল,—ঠিক বলেছ মা! তিনি বলেছিলেন, একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে তোমায় দেখতে আসবেন—তাই যাই মা...তিনি সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফেরেন...এতক্ষণে ফিরেছেন, বোধ হয়!...যাবো?...তুমি ভালো থাকবে, বল? অসুখ বাড়াবে না?

শৈল হাসিয়া বলিল—না রে, আমি খুব ভালো থাকবো। তুই একটু ঘুরেও আয়—সারাদিন ঘরে বন্ধ হয়ে আছিস্! এ যে তোর পক্ষে ভয়ানক ব্যাপার!

বাবলা বলিল,—হ্যাঁ, যাও, বারে, আমি বুঝি তাই বল্‌ছি!

শৈল বলিল,—না, না, তুই যা বাপু, ডাক্তারের জন্যেই যা...

বাবলা তখন ভগবতীকে ডাকিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল! যাইবার সময় শৈলকে বলিল, আমি এখনি আসবো।

বাবলা চলিয়া গেলে শৈল বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—ভবিষ্যতের কথাটা। তার অসুখ যে সারিবার নয়, সে তা বহুদিন বুঝিয়াছিল। তবু মনকে এ দুশ্চিন্তা হইতে প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিত।...বাবলাকে ছাড়িয়া যাওয়াও যায় না তো! তাঁর কাছে যাইবে... কিন্তু এখানে বাবলা...এ যে মস্ত বাঁধনে বাঁধা সে! তুমি কোথায়, ক্ষমা করিয়ো গো! এ বাঁধন কাটিতেও চাই না আমি!...

হায়রে, সে না চাক্, জোর করিয়া এ বাঁধন কার অদৃশ্য হাত ঐ যে কাটিতে উদ্যত হইয়াছে! তখন...? বাবলা তখন কি করিয়া থাকিবে, এ ঘরে কার কাছে সে আসিয়া দাঁড়াইবে! শৈলর দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

২৮

বাবলা প্রমোদের বাড়ীতে আসিয়া শুনিল, প্রমোদ বাড়ী আসিয়াছে। সে চুপ করিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া রহিল। মন অধীর হইয়া উঠিল—সেখানে মার অসুখ বাড়িল না ত! মা যে একলা পড়িয়া আছে।

বাবলা ধীরে ধীরে উপরে উঠিল—উপরের ঘরে প্রমোদ বসিয়াছিল, বাবলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি বাবলা, খপর কি!

বাবলা বলিল,—মার জন্তে আপনি যে ডাক্তার নিয়ে যাবেন, বলেছিলেন।

প্রমোদ অপ্রতিভ হইল, বলিল,—তাইতো, আমার মনেও ছিল না তো। আচ্ছা, কাল যাব নিশ্চয়, ভুল হবে না। তুমি এমনি সময় এসো,—কেমন?...তোমার মা কেমন আছেন?

বাবলা বলিল,—ভালো না। অসুখ বেড়েছে—বড্ড কষ্ট হচ্ছে মার।

প্রমোদের বুকে কে যেন ছুরি টানিয়া দিল। তাইতো, তাকে অত-বড় আশা দিয়া এ কথা প্রমোদ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে! সে বাবলার পানে চাহিয়া বলিল.—কাল ডাক্তার নিয়ে যাব আমি, নিশ্চয়।

বাবলা বলিল,—ভুলে যাবেন না?

প্রমোদ বলিল,—না।

তারপর বাবলা গমনোদ্যত হইলে প্রমোদ প্রশ্ন করিল,—কোথায় যাচ্ছ?—

—একবার হ্যারিসন রোডে যাচ্ছি। আপনি কি বেরুবেন?

প্রমোদ বলিল,—একবার বেরুব বটে, এখনি। একটা মকর্দ্দমার কাজে বেরুতে হবে আলিপুরে। আজ কত কাগজ বিক্রী করলে?

বাবলা বলিল,—আজ তো বেরুইনি মার অসুখের জন্তে।

প্রমোদ বলিল,—কাল তাহলে এমনি সময় এসো— ডাক্তার নিয়ে যাবই। বাবলা চলিয়া গেল।

প্রমোদের বাড়ী হইতে সে একেবারে হ্যারিসন রোডের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ তার হাতে কাগজ ছিল না—অন্য ছেলেরা কাগজ বেচিয়া ছুটাছুটি করিতেছে—ফুটপাথে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ তাদের লক্ষ্য করিয়া সে বরাবর পশ্চিম-মুখে চলিল।

গোঁড়াতলার মোড়ের কাছে আসিতেই তার নজর পড়িল একটা ট্যাক্সির পানে—ট্যাক্সিটা পশ্চিমদিক হইতে খুব বেগে পূর্ব্বমুখে আসিতেছিল! এত জোরে আসিতেছিল যে গাড়ীর বেগ দেখিয়া বাবলা শিহরিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ট্যাক্সিটা আসিয়া পথের মাঝখানে ট্রামের একটা পোষ্টে সজোরে ধাক্কা খাইল। গাড়ীর চাকা তখনি ভাঙ্গিয়া ছিটকাইয়া গেল। হৈ-হৈ শব্দে চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। বাবলাও আগাইয়া গেল—গাড়ীর আরোহী একটি বাঙালী তরুণী। বাবলা চাহিয়া দেখে, এ কি—এ যে তিনি···প্রমোদের গাড়ে যাঁকে সেদিন সে দেখিয়াছিল—যাঁর সঙ্গে প্রমোদের বিবাহ হইবে।

ট্যাক্‌সিতে ছিল বিভা। বিভা এ দুর্ঘটনায় একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—তবে গায়ে চোট্ লাগে নাই! খুব রক্ষা পাইয়া গিয়াছে!

বাবলা গিয়া সেখানে দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া ভিড় জমাইয়া দিল। সেই ভিড়ের মধ্য হইতে একজন মুসলমান বাহির হইয়া আর একটা ট্যাক্সি আনাইল ও মূর্চ্ছিতা বিভাকে ধরিয়া সেই ট্যাক্সিতে উঠাইল; উঠাইয়া নিজে ড্রাইভারের পাশে বসিল। ট্যাক্সিটা তারি ইচ্ছায় পূর্ব্বমুখে না আসিয়া উত্তর দিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। বাবলা স্তম্ভিত নেত্রে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া সেই ট্যাক্সির পিছনে ছুটিয়া গলির মধ্যে ঢুকিল।

আঁকা-বাঁকা গলিতে ট্যাক্সি খুব জোরে যাইতেছিল না। বাবলা ট্যাক্সি অনুসরণ করিয়া দুই-চারিটা মোড় ঘুরিয়া আসিয়া দেখে, একটা দোতলা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াইয়াছে ও মুসলমানটা মূর্চ্ছিতা বিভাকে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া লইয়া গাড়ী ঘুরাইল। বাবলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এখানে উঁহারা উহাকে লইয়া আসিল কেন? একটা আশঙ্কার উত্তেজনায় তার বুক কাঁপিয়া উঠিল, তার পর-মুহূর্ত্তেই সে গলি হইতে বাহির হইয়া হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত আসিয়া একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠিল এবং সেই ট্যাক্সিতে করিয়াই সোজা গিয়া প্রমোদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। প্রমোদ বাড়ীতে আছে তো?

কম্পিত বুকে বাবলা গিয়া উপরে উঠিল। এই যে প্রমোদ! আঃ! প্রমোদ বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। বাবলাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল,—কি বাবলা, আবার কি চাই?

বাবলা এক-নিশ্বাসে সমস্ত ঘটনাটা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া প্রমোদ বজ্রাহতের মত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল – তারপর বাবলাকে লইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া একেবারে থানায় চলিল। থানা হইতে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া যেখানে গলির মধ্যে সেই মুসলমানের বাড়ীর দ্বারে বিভার ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। বাড়ীর দ্বার তখন ভিতর হইতে বন্ধ।

পুলিশ আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। বহুক্ষণ করাঘাত করিবার পর একটা ছোকরা আসিয়া ভিতর হইতে সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া উঁকি দিল এবং বাহিরে পুলিশ দেখিয়া যেমনি ক্ষিপ্রভাবে দ্বার আবার বন্ধ করিয়া দিবে, অমনি প্রমোদ সজোরে দ্বারের উপর সমস্ত শরীরের ভর চাপাইয়া দ্বারটা একটু ঠেলিয়া দিল—তখন একটু ফাঁক পাইবামাত্র বাবলা চকিতে সেই ফাঁক দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল ও ছোকরাটার পায়ে সবলে দংশন করিয়া দিল। ছোকরাটা প্রবল আর্ত্তনাদ তুলিয়া দ্বার ছাড়িয়া পড়িয়া গেল। প্রমোদও পুলিশ সমেত অমনি সবলে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। বাবলা ততক্ষণে একেবারে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। পুলিশকে লইয়া প্রমোদও তাহার পিছনে গিয়া উপরে উঠিল। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কালের প্রবাহ

প্যাক্ট না প্যাচ ?

বোধহয় ১৯০৪ সালে মৈমনসিংহে বেঙ্গল প্রোভিন্সাল কন্‌ফারেন্সের বৈঠক হইয়াছিল। সে বৎসর সুহৃদ সমিতির ছেলেরা প্রতাপাদিত্য উৎসব উপলক্ষ্যে আমাকে ঠিক সেই সময় মৈমনসিংহে আমন্ত্রিত করিয়া লইয়া যায়। তাহারা লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি খেলার প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমঠএর অভিনয়ও তাদের প্রোগ্রামের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। মাননীয় সুরেন বাঁড়ুয্যে ভূপেন বসু আমার পিতৃদেব প্রভৃতি অনেক তৎকালীন কংগ্রেস নেতাগণ মৈমনসিংহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ছেলেদের ইচ্ছা ছিল সকলকেই অভিনয় দেখিতে নিমন্ত্রিত করিবে। সেই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় মুসলমানেরাও কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতেছিলেন। যখন সুহৃৎ সমিতির অধিবেশনে লাঠি খেলা প্রভৃতি চলিতেছে সেই সময় হঠাৎ ভিতরে ভিতরে কি একটা গোলমাল বাধিয়াছে অনুভব করিলাম। খানিক পরে সুহৃদ সমিতির সম্পাদক আমার কাণে কাণে বলিলেন—"একটি গুরুতর বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিবার আছে, একবার পাশের ঘরে আসুন।"

সভা হইতে উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া ব্যাপারখানা শুনিলাম। কন্‌ফারেন্সে যোগদানে বন্ধু মুসলমান সভ্যগণের সুহৃদ সমিতির অনুষ্ঠিত আনন্দমঠের অভিনয়ে আপত্তি। তাঁরা বলিয়াছেন মৈমনসিংহে ঐ নাটকখানির অভিনয় হইলে তাঁরা নাকি কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবেন না। সেক্রেটারী বলিলেন—"তাঁদের মনে আঘাত লাগার মত সমস্ত দৃশ্যগুলি আমরা বর্জ্জন করিয়াছি তৎসত্ত্বেও তাঁদের জিদ এই যে বঙ্কিমের ঐ নাটখানিই আমরা ষ্টেজে তুলিতে পারিব না, এখন কি করা যায় ?"

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ হয় "বন্দেমাতরম্" এই ধ্বনি বঙ্গদেশে সেই প্রথম সুহৃদ সমিতি কর্ত্তৃক আদরে অভ্যর্থনায় সভায় সমিতিতে সম্মানসূচক জাতীয় রবরূপে গৃহীত ও পরিচালিত হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমাদের মন কি বলে ?"

"আমাদের মন বলে এ বড় অন্যায় জিদ। যেখানে যেখানে মুসলমানদের বুকে আঘাত লাগার মত কোন অপভাষা আছে আমরা আপনা হইতেই বাদ দিয়েছি। কিন্তু ইতিহাস উল্টান আমাদের সাধ্য নয় এঁদের খাতিরে হিন্দু নেতারাও আমাদের পীড়াপীড়ি করিতেছেন "অনেক কষ্টে এবার এঁদের যোগাড় করা গেছে তোমাদের আনন্দমঠ খানা অভিনয় করায় যখন এঁদের আপত্তি তখন ছেড়ে দাও। কেন আপত্তি সে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত কিনা তাতে আসে যায় না এঁদের কন্‌ফারেন্সে দাঁড় করান চাই আমাদের। তোমাদের নাটক বন্ধ কর। অবস্থা, এই এখন আপনি যা বলেন।"

আমি বলিলাম—"বাছা বাছা হিন্দু ও সমস্ত মুসলমান নেতাদের ফের রিহার্সালে ডাক। উভয়ের মতে এখনও যেখানটা আপত্তি করা হয় ছাঁটিয়ে দাও। আনন্দমঠ নাটকখানাই যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যর জন্য বর্জ্জনীয় এ কথা আমি মনে করি না, এবং তোমরাও যে মান নাই ঠিক করিয়াছ।"

সেদিন ঐ পর্য্যন্ত। তারপর দিন আমি পিতৃদেবের সহিত যাঁর গৃহে অতিথি ছিলাম—পরলোকগত ব্যারিষ্টার নৃপেন্দ্রনাথ পালিত, তাঁকে প্রমুখ করিয়া মৈমনসিংহের স্থানীয় উকীল ব্যারিষ্টার প্রভৃতি নেতাগণ আমার নিকটে একটী ডেপুটেশন লইয়া আসিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় এই—"আমি যেন সুহৃদসমিতির ছেলেদের আদেশ করি কনফারেন্সে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের খাতিরে তাঁরা আনন্দমঠ বইখানির অভিনয় বর্জ্জন করে।"

এতগুলি বয়সে বুদ্ধিতে পদে মর্য্যাদায় জ্যেষ্ঠগণের আমার নিকট ডেপুটেশনে আগমনে আমি লজ্জায় অভিভূত হইলাম, বিশেষতঃ যখন তাঁদের মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নাই। আমি বলিলাম—"আমি ত অভ্যাগত মাত্র। এরা আপনাদেরই দেশের ছেলে আপনারাই বারণ করুন না?"

"তারা আমাদের বারণ শুনিবে না, তারা বলে আপনি যদি বলেন তবেই বন্ধ করিবে, নয়ত করিবে না।"

"তারা ত প্রস্তুত আছে আপনাদের সামনে রিহার্সাল দিতে। যদি রিহার্সাল দেখিয়া কোন অংশ আপনাদের মতে আপত্তিকর হয় সে অংশটা তারা বর্জ্জন করিবে তাদের হইয়া আমি এ কথা দিতে পারি।"

আগন্তুকদের মধ্যে একজন ধৈর্য্য সম্বরণে অক্ষম হইয়া উষ্ণতাসহ বলিলেন—"অংশ ফংশ নয় আপনি সাফ বলে দিন, মোটে ওটা অভিনয় হতে পারবে না। এর কমে মুসলমানদের মানান যাবে না। যখন ছেলেরা আপনার বিচারের উপর সব ছেড়ে দিয়েছে, তখন আপনি এই রকম নিষ্পত্তিই করে দিন।"

"যদি ছেলেরা আমার বিচারের উপর এতটা নির্ভর তখন অন্যায় বিচার করি কেমন করিয়া! মুসলমান ভাইদের অন্যায় আব্দারে প্রশ্রয় কেমন করিয়া দিই? জানেন ত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বিধানের জন্য আমি কতদূর সচেষ্ট। যতগুলি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার আন্তরিক মিত্রতা তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে বোনের মত মেলা-মেশা উঠা-বসা এত আপনাদের কারও নয় বোধ হয়। সেদিন এল্‌বার্ট হলে যে বক্তৃতা দিয়াছি তাতেএ-বিষয় কিছু বলিতে বাকী রাখি নাই। কিন্তু মুসলমানেরা আদুরে ছেলের মত অন্যায় জিদ্‌ রাখিয়া বসিলে তাহাও যে হিন্দুদের মানিতে হইবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যনীতির এ মূলমন্ত্র আমি স্বীকার করিনা।"

পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার মহোদয় উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা তাহলে রক্তের স্রোত বইবে। মুসলমানেরা বলেছে যদি আনন্দমঠ অভিনয় হয় তবে তাহারা অস্ত্রহাতে করে ষ্টেজ আক্রমণ করবে। আপনার ছেলেদের তখন বাঁচাতে পারবেন?"

"বাঁচবার চেষ্টা করব না। তাদের বল্‌ব লড়ো এবং মারো। ক্লাসিক থিয়েটারের লজ্জাকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি করো না গুণ্ডার ভয়ে খিড়কি দুয়োর দিয়ে পালিও না।"

নেতাগণ নিরাশ হইয়া ফিরিলেন, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া কালেকটর সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিয়া সম্ভাবিত শান্তি ভঙ্গের ওজুহাতে অভিনয় বন্ধ করার হুকুম জারি করাইলেন।"

সেদিন এই উপায়ে মুসলমানদের শান্ত করিয়া মৈমনসিংহের হিন্দুমুসলমানের প্রীতি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল কি না, তার পরেই ফুলারের রাজত্বকালে মৈমনসিংহের মুসলমানদের হাতে হিন্দুনারীনির্য্যাতনের রোমহর্ষণ ঘটনাবলী আরম্ভ হইল। আজ পর্য্যন্ত তার জের চলিতেছে।

হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী কোন পক্ষের অন্যায় আব্দারের উপর মজবুদ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। হিন্দুকর্তৃক মুসলমানের জবরদস্তি গো-ভক্ষণ নিবারণের উপর দাঁড়াইতে পারে না, মুসলমানকর্তৃক হিন্দুর বাদ্য বারণের উপরও দাঁড়াইতে পারে না। বেঙ্গল প্যাক্ট অনেকগুলি ড্যাবড্যাবে প্যাচে ভরা। এতগুলি সইবে কি? তালি দেওয়া ভাব কদিন টিকিবে? কথা-কথায় তালির জায়গাটা বেশী করিয়া ছিঁড়িবে—ইহারই বেশী সম্ভাবনা।

আপাততঃ সুবিধার জন্য এ স্বরাজী চুক্তি যুক্তিযুক্ত নহে, সুতরাং আমার মতে ভারতের প্রকৃত মুক্তির পরিপন্থী।

গুপ্ত খুন

(বেঙ্গল কন্‌ফারেন্সে গোপীনাথ সাহা বিষয়ক প্রস্তাব)

[সম্প্রতি ভারতীয় মহিলা বিদ্যা-পীঠের সিনেট মিটিং উপলক্ষে পুনরায় গিয়াছিলাম সেখানে তিলকের দেশ-বিশ্রুত পত্রিকা "কেশরীর সম্পাদক আমাকে 'ইন্টার্ভিউ' করিয়া গোপীনাথ সাহাকৃত খুন সম্বন্ধে ও বেঙ্গল কন্‌ফারেন্সে তদ্বিষয়ক প্রস্তব সম্বন্ধে আমার মন্তব্য জিজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তরের সার মর্ম্ম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বিষয়টি সরল হয় নাই। এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বক্তব্য নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি। [ভাঃ সং]

গুপ্ত খুন

অহিংসা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, হিংসা জাতি ধর্ম্ম। অহিংসা ব্রহ্মবল, হিংসা ক্ষাত্রবল। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় বল প্রয়োগ করিয়া পরাভূত হন। তাহাতে তাঁহার ব্রহ্ম-বললাভের তৃষ্ণা জাগ্রত হয় এবং তিনি বলেন—

ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং
ব্রহ্মতেজো বলং বলং।

কিন্তু পৃথিবীতে সচরাচর ক্ষত্রিয় বলের সঙ্গেই ক্ষত্রিয় বলের সংঘর্ষ হয়, তখন প্রবলের নিকট অল্প বল পরাস্ত হয়। ইহাতে যুদ্ধকামীগণ পরস্পরের ক্ষত্রিয় বল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাতেই

থাকেন, ব্রহ্মবল লাভের প্রবৃত্তি কাহাতেও উদ্রিক্ত হয় না। সে বিষয়ে প্রবৃত্তি অনুভব না করিলে, ভিতর হইতে হিংসা প্রধান ক্ষত্রিয় বলেরই দুর্দ্দমনীয় অনুপ্রেরণা থাকিলে জাতি, কুল, সমুদায় বা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে হিংসাই স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম বা সহজাত প্রকৃতিগত ধর্ম্মকে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, তাহাকে সওয়াইয়া সওয়াইয়া ভালর দিকে, চরম আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রাজ্ঞ পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহা অতি স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবে বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁদের চরম লক্ষ্য শিষ্যকে নিস্ত্রৈগুণ্য করা —"নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন"—হে অর্জ্জুন নিস্ত্রৈগুণ্য হও, গুণত্রয়ের অতীত হও।"

কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া যায় কেমন করিয়া? প্রথমে রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে পরাস্ত করিয়া, তারপরে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজকে মারিয়া এবং অবশেষে সমাধির দ্বারা সত্ত্ব, রজস্তম এই তিনটি গুণকেই আত্মার ভিতর বিলীন করিয়া—

—ইতি শুশ্রম যেন তদ্বাচ চক্ষিবে"

পূর্ব্ব ঋষিগণের নিকট ইহাই শুনা গিয়াছে। তবেই হইল—সর্ব্বসাধারণ তমোগুণী মনুষ্যের পক্ষে রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে দাবানই বিধান, এবং যাঁরা বেশী মাত্রায় রজোগুণী তাঁদের সত্ত্বগুণের দ্বারা রজকে সংযত রাখাই অনুশাসন। গীতার উপদেশের সার মর্ম্ম ইহাই আর কিছু নহে। তাই ক্ষাত্রধর্ম্ম হিংসাপ্রধান হইলেও সে হিংসার আশে পাশে অনেক বেড়া। এই বেড়ার ভিতর দিয়া সীমা রক্ষা করিয়া চলিলেই যথার্থরূপে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করা হয়, নতুবা ক্ষত্রিয় স্বীয়ধর্ম্মে পতিত হন, তাঁর হিংসা স্বধর্ম্মোচিত কর্ত্তব্য হয় না, তাহা ধর্ম্ম বিগর্হিত হত্যা হয়।

ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবেন অবশ্যই, কিন্তু তাঁর যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ হওয়া চাই। গুপ্তখুনের ভিতর এই ক্ষাত্রধর্ম্ম পাওয়া যায় কি?

মনুতে চারিবর্ণের স্বধর্ম্মের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ—

এযোঽনুলক্ষতঃ প্রোক্তা যোধধর্ম্মঃ সনাতন,
অস্মাদ্ধর্ম্মান্ন চাবেত ক্ষত্রিয়ো ঘ্নন্ রণে রিপুন্॥
ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুধ্যমানো রণে রিপুন্
ন কর্ণিভির্নাপিদিগ্ধৈ র্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিং
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনং॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধং
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতং॥
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতি পরিক্ষতং
ন ভীতং ন পরাবৃতং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥

সনাতন অনিন্দিত যে যোদ্ধৃধর্ম্ম কথিত হইতেছে—রণে রিপুঘ্ন ক্ষত্রিয় এই ধর্ম্ম হইতে যেন চ্যুত না হয়েন ॥

রণে রিপুর সহিত যুধ্যমান্ হইয়া গুপ্ত অস্ত্র বা কর্ণযুক্ত, বিষাক্ত জ্বলন্ত বা অগ্নিমুখী তীরের দ্বারা শত্রু হনন করিবেন না ॥

নিজে অশ্বারোহী হইয়া স্থলারূঢ়কে হনন করিবে না কিম্বা নপুংসককে কিম্বা জীবন ভিক্ষুককে কিম্বা "আমি তোমার" এই বলিয়া শরণাগতকে।

সুপ্তকে কিম্বা নিরস্ত্রকে, ধর্ম্মহীনকে বা নগ্নকে, দর্শকমাত্রকে, কিম্বা অপরের সহিত যুধ্যমানকে হনন করিবে না।

ভগ্নায়ুধকে কিম্বা শোকমগ্নকে, আহতকে, বা প্রাণভয়ে পলাতককে, সৎগণের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া যুদ্ধে হনন করিবে না ॥

গোপীনাথ কৃত গুপ্ত খুন উল্লিখিত কোনটার সঙ্গে মেলে কি মেলে না ? উপরোক্ত কষ্টি পাথরে তাহা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মোচিত বা তদ্বিপরীত ? দেশাত্মবোধে উন্মাদের গুপ্তভাবে দেশশত্রু-বধ ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ নহে, তাহা উন্মত্ততারই লক্ষণ। ধর্ম্মবিগর্হিত আচরণ যেমন সকলস্থলেই উন্মাদের কৃত হইলে ক্ষমা যোগ্য হয়, ইহাও তেমনি শুধু ক্ষমাযোগ্য, স্তুতি যোগ্য একেবারেই নহে। সভাসমিতিতে আমরা যদি এরূপ আচরণকে গৌরব দান করি আমরা হিন্দুনামের অযোগ্য হইব, দেশকে হিন্দুর আদর্শ হইতে বিপথগামী করিব !

১৯০২। ১৯০৩ সালে দেশাত্মবোধশালী একদল যুবকেরা ডাকাতীর ও গুপ্তহত্যার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশ উদ্ধারের প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেছিল। আমার লাঠিয়াল ছেলেদের কেহ কেহ তাহাতে প্রলুব্ধ হয়। আমি দেখিলাম সর্ব্বনাশ। সৈনিক বৃত্তির আত্মচরিতার্থতার খোলা পথ না পাওয়ায় তাহা এই জঘন্য গুপ্তপথ আশ্রয় করিতে চাহিতেছে। কোনদিন শুনিলাম—"আজ রাত্রে কোন নিঃসন্তান বিধবা বৃদ্ধার ঘরে ডাকাতি হইবে—বুড়ীর কেহ নাই, এক কাঁড়ি টাকা আছে—সেটা দেশের কাজে লাগুক, দেশ প্রেমিক দলের এই হুকুম হইয়াছে।"

কোনদিন খবর আসিল—"আজ আর এক জায়গায় কাজ আছে। সেখানে কোন স্বার্থপর ধনকুবের আছে ; নিরস্ত্র, নিঃসন্দেহ,—তার অর্থ সম্পত্তি লুটিয়া আনিয়া দেশমাতার পায়ে নিবেদন করা হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেশমাতা এদান গ্রহণ করিবেন কি এ সন্তান রক্ত কলুষিত অর্ঘ্য তাঁর পায়ে নিবেদন যোগ্য কি ? এতে দেশের কোন উপকারটা হইবে ? তোমাদের গুটিকতকের পেটে মটন চপ চা বিস্কুট পৌঁছিবে বটে। তোমরা যারা আজ দেশের দোহাই দিয়া অপরকে খুন ও ডাকাতি করিতে চাহিতেছ, কাল তারা ভাগবাঁটোয়ারার বেলায় পরস্পরকে হত্যা করিবে। দেশমাতার নাম নেওয়া একটা অছিলা মাত্র।"

ছেলেরা বলিল—"আপনি কেন আপত্তি করিতেছেন মা! তিলক মহারাজের ত এতে সম্মতি আছে।"

"আমি সে কথা বিশ্বাস করি না।"

"দেশ উদ্ধার দলের নেতারা ত বলিতেছেন তিলক হুকুম দিয়াছেন পুণার ছেলেরা যেমন ডাকাতী করিতেছে বাঙ্গলার ছেলেরা তেমনি করুক।"

আমার মন মানিল না। চলিলাম সেদিনে সেই বিশ বৎসর আগে সাহসে বুক বাঁধিয়া একাকিনী তিলকের সহিত দেখা করিতে পুণায়। তখন তাই মহারাজের মকদ্দমায় তিলক ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব বিব্রত, রাশিকৃত আইনের পুস্তক ও কাগজ-পত্রের মধ্যে তিনি নিমজ্জিত উত্তাল তরঙ্গাভিহত পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত। চারিদিকে ডিটেক্‌টিভেরা ঘরে বাহিরে তাঁকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমারও সহিত ডিটেক্‌টিভের শুভাগমন হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই আমার পার্শ্বে রক্ষকের মত আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। এতৎ সত্বেও তাঁর সহিত নিরালায় দুইতিন ঘণ্টাব্যাপি কথাবার্ত্তা হইল। তাঁর অন্তরঙ্গ মিত্র ও দক্ষিণহস্ত সঙ্গী একমাত্র মিষ্টার কেল্‌কার কথোপকথন কালে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ে কোন হুকুম পাঠাইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিলক তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। উল্টা বলিলেন—"আমি ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। পুণার যুবকদের ডাকাতীরও অনুমোদন করি না, কারণ ইহাতে কোন ফল নাই।"

আমি হাল্কা মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম,—আসিয়া আমার ছেলেদের জানাইলাম—"তিলকের সম্মতি নাই জানিও, তাঁর নাম মিথ্যামিথ্যি নেওয়া হইতেছে।"

সে সময় কেহ কেহ তর্ক করিতেন দেশসেবার্থে অর্থসংগ্রহের জন্য দেশের লোকের প্রাণহনণ গর্হিত হইতে পারে, সেখানে উদ্দেশ্য উপায়কে সাফাই করে না, সত্য কিন্তু আমাদের দেশ যখন নিরস্ত্র, সম্মুখ সমর যখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব তখন অত্যাচারী শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সুবিধা পাইলেই এরূপভাবে শত্রু বধ এক প্রকার Guerilla warfare হঠাৎ যুদ্ধ বা Lynch law। এমন সময় ছিল যখন আমিও এ যুক্তির সমর্থন করিতাম। কিন্তু তারপর অভিজ্ঞতায় দেখিলাম বিষবৃক্ষের ফল বিষময়ই হয়, কাপুরুষতা বৃক্ষের ফল, কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতাই হইয়া থাকে। এ দেশে যতগুলি না সিক্রেট সোসাইটির নাম শোনা গেল তার শতগুণ বেশী অ্যাপ্রুভার বা বিশ্বাস হন্তার নাম বাহির হইল। এখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যা সনাতন ধর্ম্ম যুদ্ধ সেই প্রশস্ত পথেই এ জাতির মঙ্গল। স্বরাজলাভের পন্থা অরাজকতা নহে—সেটা আগেই আমাদের হাড়ে হাড়ে যথেষ্ট জানা আছে। ডিসিপ্লিন্ বা সংযম ও বিশ্বাসরক্ষা বা স্বার্থদমন এই দুইটি এ জাতির সাধনীয় বস্তু—জাতির মেরুদণ্ড উহারই উপর নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

দেশবন্ধু যে আমার চেয়ে কম হিন্দু ধর্ম্মের বিশ্বাসী বা হিন্দু জাতির আদর্শ জাতীয় ব্যবহার বজায় রাখার কম পক্ষপাতী তা আমি মনে করি না। তবে তাঁর নেতৃত্বে এমনতর রেজলুশ

কিরূপে পাস হইল ? আমার মতে তার একমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে ঘূর্ণীতে পড়িয়া নেতা অনেক সময় ম্রীয়মান হন। স্রোতের তোড়ের মুখে পা ঠিক রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অতি কঠিন হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিলে, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখিলে পা জমাইয়া রাখাও অসাধ্য নয়। এই শেষবার নহে। দেশবন্ধুকে তাঁর নেতৃত্বকালে অনেকবার এরূপ সঙ্কট অবস্থায় পড়িতে হইবে। বিপ্লববাদ বল্‌শেভিজম্ ও গুপ্তহিংসা এ যুগের হাওয়ায় ভরিয়া রহিয়াছে।

এবারকার এ প্রস্তাবটি যেন মহাত্মা গান্ধির স্বধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই অহিংসার পথে জবরদস্তি বাঁধিয়া রাখায় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, দেশকে নিস্ক্ষত্রিয় করার বিরুদ্ধে দেশের যুবকদের বাঁধভাঙা প্রতিবাদ।

"কিন্তু স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্মো ভয়াবহ" যেমন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তেমনি সমগ্র ভারতের পক্ষেও এ কথা লাগাইয়া ভারতের আদর্শ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে ভারতীয় যুবকদের টিকাইয়া রাখায় যদি নিধনপ্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও শ্রেয় কিম্বা য়ুরোপের পরধর্ম্মে লাভবান্ হওয়ার চেষ্টায় তাহাদের প্রমত্ত হইতে উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য ইহা সম্যকরূপে বিচার করিয়া ভবিষ্যতে যেন এতদ্বিধ রেজলুশেনের স্রোতে দেশকে প্রবাহিত করা হইবে কি না স্থিরীকৃত হয়।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

মাসিক সাহিত্য পরিচয়

চুম্বক

অর্চ্চনা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

কান্তকবির প্রতিভা।—শ্রীঅভয়চরণ লাহিড়ী।

রজনীকান্তের হাসির কবিতায় সমাজের অন্ধকার দূর কর্ব্বার চেষ্টা আছে। তাঁর হাসির কবিতার কতকগুলি শ্লেষ, কতকগুলি সরল কৌতুক। বাকি শিক্ষামূলক মর্ম্মোচ্ছ্বাস। শ্লেষের কবিতায় কান্তকবি সমাজকে মিষ্ট চাবুক দিতেছেন। বাঙালী সাহেব, বরের বাপ, ডেপুটি প্রভৃতি সকল-স্তরের লোককে নিয়ে তিনি ঠাট্টা করে গেছেন, তাঁদের দোষগুলোকে সমাজের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন। তাঁর কৌতুক-কবিতায় শ্লেষ বাক্য ব্যবহার হয় নাই। শুধু একটা সরল সুন্দর হাসি আছে। তাঁর শিক্ষামূলক কবিতার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, 'কেরাণী জীবন'।......রজনীকান্তের প্রেমের গানে ভগবদ্ভক্তির ভাবটাই বেশী পাওয়া যায়। বিবাহ উপহার যে কয়েকটি তিনি লিখেছেন তার মধ্যে আছে হিন্দুনারীর আদর্শ জীবনের একটা আভাস। কবির ভক্তির কবিতাগুলি পর পর পড়লে আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের গতিটা বুঝতে পারি। কবি সংসারের খেলায় মত্ত ছিলেন ; সে খেলা ভেঙে গেল একদিন একটি আঘাতে। তখন প্রাণে তাঁর বিরাগ এল। ভগবানের উপর কৃতজ্ঞতা ও পরে ঈশ্বরে মমতা তাঁর প্রাণে এল।

কমলা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

কবি—অক্ষয়কুমার বড়াল।

'জ্যোতিহারা' লিখিত প্রবন্ধ। লেখক যা'বলেন তার মর্ম্ম এই:—অক্ষয়কুমার তেমন সুপরিচিত নন। তার কারণ তিনটি। (১) এখন দারুণ অন্নসমস্যায় ভাবপ্রবণ বাঙালীর মধ্যে কবিতার অনাদর বাড়ছে। কাজকর্ম্মের পর লোকে দু'একটা ছোট গল্প পড়তে পারে, কবিতা পড়ার ধৈর্য্য তাদের থাকে না। (২) অক্ষয়কুমারের কবিতা সাময়িক উত্তেজনার কবিতা নয়। তাঁর বিশেষত্ব উচ্ছ্বাস নয়, ভাবুকতা। কামে প্রেমে দ্বন্দ, ইহকাল পরকাল রহস্য এই সব চিরন্তন সমস্যায় তাঁর কবিপ্রাণকে নাড়া দিয়েছে। (৩) কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা, যা' কবির কাব্যকে জগতের আসরে সমাদরের স্থান দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দুজনেই কবি বিহারীলালের শিষ্য। কিন্তু কবি সম্রাট নানান্ দিকে নিজের প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু অক্ষয়কুমার শুধু গীতি কবিতার মধ্যে নিজের প্রতিভাকে আবদ্ধ রেখেছেন এবং গীতি কবিতায় তাঁর সাধনা বিফল হয় নি।

কবির প্রথম কাব্য 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলী'র মধ্যে যে একটা স্বপ্নাবেশ আছে তা' বড় সুন্দর। কিন্তু ও দুটি কাব্যে কবির ভাবরাশি তেমন স্পষ্ট ফুটে উঠেনি। 'শঙ্খ' কাব্যে আমরা প্রথম কবির স্পষ্ট কণ্ঠ শুনতে পাই। কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয় 'এষা'তে। স্ত্রীবিয়োগ কাতর হ'য়ে কবি এইকাব্য রচনা করেন। তাঁর শোক যেমন গভীর ও বাস্তব তাঁর ভাষাও তেমনি সরল ও নিরলঙ্কার। কবির প্রকৃতির ছবিগুলি ফটোগ্রাফের মতো সত্য কিন্তু তাঁর মনের রঙে রাঙা। তা' বলে মিথ্যা কল্পনা বা অত্যুক্তি তার মধ্যে মোটেই পাওয়া যায় না। তাঁর ভাবের মধ্যে অসংযত উচ্ছ্বাস বা উদ্দাম উত্তেজনা নেই, আছে—গভীরতা ও গাম্ভীর্য্য। আর সেই গভীরভাব সহজ এবং অল্প কথায় ব্যক্ত কর্ব্বার ক্ষমতা কবির অসাধারণ। অক্ষয়কুমারের সমস্ত কবিতার মধ্যে একটা সুর বাজছে—সেটা হচ্ছে বিষাদের সুর।

—

পল্লী সংস্কার—রায় রমনীমোহন দাস বাহাদুর এম, এ লিখিত।

ভারত সরকার থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেকগুলি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য পণ্ড হচ্ছে। তার প্রধান কারণ তিনটি। (১) সমবায়ের মূলনীতি সম্বন্ধে সাধারণ চাষারা অজ্ঞ। (২) তারা উন্নতভাবে চাষের কাজ চালাতে চায় না। (৩) ন্যায্য দামে ফসল বিক্রয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই।

(১) পল্লী সমবায় সমিতি যা' হয়েছে চাষারা সেগুলোকে কম সুদে টাকা পাওয়ার আফিস বলেই জানে, সে সম্বন্ধে আর কিছু তাদের জ্ঞান নেই। বাংলায় তবুও এসব সমিতির উদ্দেশ্য বোঝাবার অনেক রকমে অনেক চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আসামে সে রকম চেষ্টা একেবারেই হচ্ছে না। সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য কি। তা' না করলে কোনো চেষ্টারই ফল হবে না।

(২) আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আদৌ হয় না। তার কারণ চাষাদের গোঁড়ামি। জমির উর্ব্বরতা কমে যাবার দরুণ আগে যা ফসল হোত এখন তার চেয়ে অনেক অল্প হয়। ধান, গম, আলু আর আক, এই চারটে জিনিস এখানে খুবই প্রচুর হয় বটে; কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় তা' সামান্য মাত্র। তার কারণ আমাদের চাষারা বিজ্ঞানকে চাষের সাহায্যে মোটেই লাগাতে প্রস্তুত নয়। কতকগুলি কৃষি

সমিতি বাংলার অনেক জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু অর্থাভাব, সভ্যগণের লাভের অভাবও স্বার্থপরতার দরুণ সেগুলি উঠে গিয়েছে। মাত্র পাবনায় কতকগুলি কৃষি সমিতি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজকর্ম্ম কচ্ছে। এইরকম কৃষিসমিতি গ্রামে গ্রামে স্থাপন করতে হবে। এরকম হলে অন্ততঃ ক্ষেতে জল দেওয়া, নালা ও পুকুর কাটা প্রভৃতি কাজ অনায়াসে চলে যেতে পারে।

(৩) ন্যায্য দামে ফসল বিক্রয় করবার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে সমবায় সমিতির দ্বারা।

চাষারা কাঁচা মাল তৈরী করবার পর শিল্পীর কাজ আরম্ভ হয়। এদেশে শিল্পিদের অবস্থাও সচ্ছল নয়। তার কারণ দেশী কলের জিনিষ বাজার ছেয়ে গেছে আর শিল্পিদের হাতে এমন টাকা নেই যাতে তা'রা কল কিনে কাজ কর্ত্তে পারে। অনেকদিন থেকে গৃহ শিল্পের উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে বাংলা দেশে কিন্তু তার একটা বিঘ্ন আছে। এখন শিল্পীরা মহাজনদের করতলগত। মহাজনদের সরিয়ে সমবায় সমিতিগুলি যাতে শিল্পীদের টাকা দিয়েও সাহায্য করে, যন্ত্রপাতি কিনে দেয়, শিল্পীদের আর তাদের কারবারের দস্তুর মত তদারক করে তবে গৃহশিল্পীদের উন্নতির সম্ভাবনা।

পল্লী সমিতির বেবাক ভার কেন্দ্র সমিতির উপর। কেন্দ্র সমিতির একটা টাকার কারবার বা Banking Business থাকা উচিত। Bankএর মুলধন থাকা চাই; সেটা সংগ্রহ হবে সদস্তের কাছ থেকে। তা' ছাড়া মজুত টাকা Reserve fund থাকা দরকার। ব্যাঙ্কের কাজ চালাবার জন্যে ব্যাঙ্কে অল্প সুদে টাকা গচ্ছিত রাখে। কিন্তু এই গচ্ছিত টাকা মুলধনের আটগুণের বেশী হওয়া উচিত নয়। আর তা শোধ করবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা দরকার। এই নিয়মগুলো কেন্দ্র ব্যাঙ্কে চালানো আবশ্যক। তা' ছাড়া কেন্দ্র সমিতির সর্ব্বদাই দেখা উচিত যে পল্লীসমিতি ঠিকমত কাজ করছে। কেন্দ্রসমিতি যে সব টাকা ধার দেন তা' শোধ করবার জন্য একটা সময় নির্দ্দেশ করতে হবে।

সমবায় এইরকমভাবে কাজকরলে পল্লীর শ্রী ফিরে যাবে। সমবায় থেকেই গ্রামের রাস্তাঘাট প্রভৃতি তৈরী হতে পারবে।

নব্যভারত—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছায়াপাত। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

এ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে, প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর ছেলের এখনকার মতনই পাঁচ বছর বয়সে "হাতে খড়ি" হোত,। সে সময় শ্লেট চলিত ছিল না; তবে কালো কাঠ ফলকের উপর খড়ি দিয়ে কিম্বা সাদা ফলকের উপর কালি দিয়ে পাঠশালায় লেখা হোত। পাঠশালার গুরু মশাইরা সে সময় পুরুতগিরিও কর্ত্তেন আর বড় লোকের ছেলেদের কাছে বেশ কিছু মাইনে নিতেন। সেকালে বাংলা সাহিত্যের বড় চর্চ্চা ছিল না। তবে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতদের ভিতরও সংস্কৃতর বেশ চর্চ্চা ছিল। কবিকঙ্কণের সময় মেয়েরা শিক্ষিতাও ছিলেন, চিঠি পত্র পড়তে বা লিখতে পারতেন। সে সময় পুরাণ পাঠ খুবই প্রচলিত ছিল এবং তাতে লোক শিক্ষার বিশেষ নারী শিক্ষার যথেষ্ঠ সাহায্য হয়েছিল। চৈতন্যের সময় নবদ্বীপ ন্যায় ও স্মৃতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজেরা বরাবর পণ্ডিতের সম্মান ও সাহায্য করে গিয়েছেন। লেখক বেশীর ভাগ কবিকঙ্কণ থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদ।—শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার।

এটি একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ।—লেখক প্রমাণ দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীন ভারতেও ছিল তবে প্রাচীন ভারতে রাজারা নিজেদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করেও অপর একটি রাজার বশ্যতা স্বীকার করতেন।—ঋগ্বেদে 'সম্রাট' শব্দ পাওয়া যায় তৃতীয় মণ্ডলে। বৈদিক সাহিত্যে অধিরাজ, মহারাজ, একরাজ

চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শব্দ আছে যা দ্বারা বোঝাত সেই সব রাজাকে দ্বারা অনেক রাজার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সম্রাটকে বাজপেয় যজ্ঞ করবার বিধান দিয়ে তাঁকে রাজার চেয়ে বড় করা হয়েছে, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে মহাভারতে ও পুরাণে সম্রাটদের তালিকা দেওয়া আছে। তা'হলে প্রাচীনভারতে যে সাম্রাজ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই—তথন সাম্রাজ্য লাভ হোত অপরের রাজ্য কেড়ে নিয়ে নয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়া পেয়ে অপর রাজার রাজ্য ঘুরে আস্‌তো সে সব রাজাদের মধ্যে যারা ঘোড়া ধরতে সাহস পেতেন না, বা ধরে পরাজিত হোতেন তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করে যজ্ঞসভায় যোগ দিতে হোত। এই রকম একশো রাজা বশ্যতা স্বীকার করলেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোত। তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে, রাজারা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আর একজন রাজাকে সম্রাট বলে মেনে নিতেন। মহাভারতে এবং বাণভট্টের লেখায় এটা পাওয়া যায়।

পল্লী-শ্রী—বৈশাখ, ১৩৩১।

বাগানের মাসিক কার্য্য—

এই প্রবন্ধে জ্যৈষ্ঠ মাসে কি কি চাষ হতে পারে বলা হয়েছে।—আমন ধান, শাকআলু ও অরহরের বীজ বোনা, পাট আর আউশ ধানের ক্ষেত নিড়ানো, বেগুনভাঁটি বাঁধা, আদা, হলুদ কচু ও ওল বসানো জ্যৈষ্ঠমাসে ক্ষেতে এই সব কাজ। সজীবাগে এখন ভুট্টা, লাউ, কুমড়ো, ঢেড়স, পলাঝিঙে আর পলাশসার বীজ বুনতে হবে। মূলা ও শাকের বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে না হইলে বোনা চলেনা—ফুলবাগানে এখন জিনিয়া, দোপাটি, গাঁদা, ডালিয়া, কামরাঙ্গা, কক্সকোম্ব, আইনোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতরা মাটিনিয়া প্রভৃতি ফুলের বীজ বোনা উচিত।

তৈল।—শ্রীঅক্ষয়কুমার মজুমদার।

অয়েল্‌ পেণ্টীং আর অয়েল ক্লথ ও ওয়াটার প্রুফ কারখানায় তিষির তৈল ও পপি অয়েল প্রচুর ব্যবহার হয়। অক্‌সাইডে জ্বাল দিলে তিষির তেল শীঘ্রই বরফের মতো জমাট হয়ে যায়। রেড়ীর তেল বিলাত থেকে ক্যাষ্টর অয়েল হয়ে আসে। ক্যাষ্টর অয়েল জোলাপের কাজ করে তা' থেকে ওলাউঠার ওষুধ তৈরী হয়েছে। চুল বাড়ে আর চামড়া নরম ও মসৃণ থাকে।—ম্যাকেসার অয়েল জার্ম্মাণীতে তৈরী হয় এখানকার ছোটনাগপুরের মুগকেশরের বীজ থেকে। ইউরোপেই তা' ফুরিয়ে যায় কাজেই এখানে যা' চালান হয় সেটা নকল।—নারকেল তেল চুলের পক্ষে ভালো, কিন্তু তাতে একটা দুর্গন্ধ আছে যা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ পর্য্যন্ত দূর হয় নি।—কষ্টিক সোডা ও পোটাসের সঙ্গে চর্ব্বি ও তেল জ্বাল দিলে সাবান হয়। কঠিন সাবান হয় সোডা দিয়ে, আর নরম সাবান যেমন shaving soap তৈরী হয় পোটাস মিশিয়ে। ঢাকাতে চর্ব্বি থেকে আর কলিকাতাতে মৌয়া তেল থেকে কাপড় ধোয়া সাবান বিস্তর তৈরী হচ্ছে। তিল তৈল থেকে গায়ে মাখা সাবান তৈরী হয়। নারকেল তেল থেকেও সাবান তৈরী হয়। তার গুণ হচ্ছে এই যে, সমুদ্র জলের সঙ্গে ব্যবহার চলে, কিন্তু তা' মাখলে গায়ের চামড়া ফেটে যায়।

বঙ্গবাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

ভাষা আটপৌরে ও পোষাকী

(৩) সাহিত্যের ভাষার জন্মকথা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সাহিত্যের ভাষা হচ্ছে—সকল প্রদেশের ও সম্প্রদায়ের পোষাকী-ভাষা। মানুষের মুখে ভাষা ফোটার অল্পদিন পরেই এটা জন্মে; কাজেই এ ভাষা একটা গড়াপেটা জিনিষ নয় মোটেই। খুব প্রাচীনকালে প্রতি পরিবারে ভাষাটা একটু তফাৎ হয়ে গিয়েছিল তাদের উচ্চারণের তফাৎ অনুসারে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবার একজোটে কাজ করার সময় এমন ভাষায় কথাবার্ত্তা হোত যা' সকলেরই সমান বোধগম্য। আবার যখন

এক একটা পরিবার আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তখন ক্রমে একটা করে উপভাষার সৃষ্টি হতে লাগ্‌লো। যেমন সাঁওতালদের ভাষা খাঁটি কোল ভাষা হ'লেও, এখন সাঁওতালী ভাষা একটা উপভাষায় দাঁড়িয়েছে। ইংলণ্ডের মতো ছোট দেশেও অনেক প্রাদেশিক ভাষা আছে। কিন্তু সেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান সাহিত্যের ভাষায় চালানো হয় না। কেবল সময়ে সময়ে লেখকেরা উপন্যাস প্রভৃতিতে কোনো কোনো পাত্র-পাত্রীর মুখে প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুযায়ী ভাষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী আট-পৌরে ভাষা ব্যবহার করতে গেলেই নিছক কলকাতার ভাষা ব্যবহার করেন যেন সাহিত্যের আসরে অন্য প্রাদেশিক ভাষার স্থান মোটেই নেই। অন্য দেশে দেখা যায় যে প্রাদেশিক ভাষা গুলোর মধ্য থেকে ভালো ভাব প্রকাশের শব্দ বেছে সাহিত্যের ভাষায় চালিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের কয়েকজন সাহিত্যিক মনে করেন যে সাহিত্যের ভাষাটাকে দূর করে দিতে তো হবেই আর শুধু কলকাতার কথিত ভাষাকেই সাহিত্যে স্থান দিতে হবে। ভাষাকে সহজ করবার অছিলায় যাঁরা একটা প্রাদেশিক ভাষাকেই আদর্শ খাড়া করে তুলেছেন বিজ্ঞান তাঁদের মতটাকে কোনো আমলই দিতে পারে না।

কাগজের কথা।—শ্রীসুবোধকুমারমজুমদার।

বছরে ৭৫০০০ টন কাগজ যা' আমাদের দেশে খরচ হয়, তার ৩০০০০ টন মাত্র এ দেশের কারখানায় তৈরী। সে সব কারখানার লাভ যায় কিন্তু বিদেশী মহাজনের ঘরে। খৃঃ অব্দে ১৮৮১ গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া তাঁর রাজ্যে দেশী মূলধনে কাগজের কারখানা খোলেন; সেটিও ইংরেজের হাতে। আশ্চর্য্য এই যে বাংলায় দেশী কাগজের কারখানা মাত্র একটি আছে, তাও শুধু পোষ্ট-বোর্ড তৈরী করে; কিন্তু বাংলার মধ্যে কাগজ তৈরীর উপাদান আছে অনেক। কাগজ তৈরীর উপাদান হচ্ছে; (১) পুরানো কাপড়, (২) কাপাস বা অন্য তুলা, (৩) ঘাস (৪) বাঁশ ও (৫) একরকম কাঠ। এখানকার বাঁশ ও সাভানা ঘাস থেকে কাগজ তৈরী হবার একটা উদ্যোগ চলছে আর সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তে একটি করদ রাজ্যে বাঁশ থেকে কাগজের মণ্ড তৈরী করবার খুবই আয়োজন হচ্ছে। পুরাণো কাপড় বা কাপাস তুলা থেকে কাগজ তৈরী করা বেশি সহজ এই জন্যে যে, অল্প ক্ষারে সিদ্ধ করলেই সহজে আঁশ বের করা যায়। উদ্ভিদ থেকে কাগজ তৈরী করতে গেলে তার আঁশ শক্ত কিনা পরীক্ষা কর্ত্তে হয় আর যাতে সেলিউলস ছাড়া বাজে জিনিস কম থাকে সে রকম উদ্ভিদ বেছে নিতে হয়। কাগজ তৈরী করতে গেলে প্রথমে কাঁচা মাল ঝেড়ে বেছে ক্ষারে সিদ্ধ করে মণ্ড তৈরী করতে হয়, তারপর কাঁচি দিয়ে পরিষ্কার আঁশগুলো মাপমত কেটে তরল মণ্ডকে তারের জালের উপরে ঢেলে দিলেই কাগজ হয়। কাগজ কালীতে চুপ্‌সে না যায় সেজন্যে শিরীষ বা অন্য কোনো জিনিষ দিয়ে তাকে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে নিয়ে গরম বোলারের ভিতর চালিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। এইবার কাগজ বাজারে চালান করতে পারা যায়। কলের সাহায্যে জালের উপর উঁচু অক্ষর লিখে তার উপর তরল মণ্ড ঢেলে দিলে অক্ষরের অংশে কাগজের মণ্ড অল্প থাকায় আলোতে অক্ষর গুলো ফুটে উঠে। সেই গুলোই হচ্ছে জলের দাগ water mark আমাদের দেশে কাগজের ব্যবসা তেমন যে হয় না, তার কারণ আমাদের অভাব মূলধনের, সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তির আর ওস্তাদ কারিকরের।

—

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

দুর্ভিক্ষ ও মানব-সংখ্যা।—লেখিকা সাফিয়া খাতুন বি-এ

এই ধনধান্যভরা দেশে হাজার হাজার লোক যে দুর্ভিক্ষে মরছে এর কারণ কি?—মেটারলিঙ্ক বলেন, যে, হঠাৎ আবহাওয়া বদ্‌লালে দুর্ভিক্ষ হয়। গ্যারিবল্ডির মতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষের কারণ।

টলষ্টয় বলতে চান যে, অলসতাই দুর্ভিক্ষকে নিমন্ত্রণ করে আনে। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের কারণ এই তিনটি তো বটেই তা' ছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও আছে ;—অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির দরুণ যে দুর্ভিক্ষ হয় তা' দূর করা যেতে পারে যদি সরকার খাল কেটে যথেষ্ট জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করেন। -তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, রেল আমাদের দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। রেলের জন্য যখন জমি গৃহীত হয় তার দাম দেওয়া হয় খুবই নামমাত্র। তার পর, রেল হয়ে লোকে হাঁটতে চায় না, দু'চার আনা পয়সা অনায়াসে রেলভাড়ায় খরচ করে। তা'ছাড়া এক দেশের জিনিস আর এক দেশে চলে যাচ্ছে, কাজেই food stuff অভাব হচ্ছে চারদিকে। লাভ করে ব্যবসাদার এক জায়গায় চড়ান্ত দাম দিয়ে জিনিস কিনে আর এক জায়গায় বিক্রি করে আরো দাঁওয়ে। কাজেই যেখানকার জিনিস কেনা হচ্ছে বা যেখানে বেচা হচ্ছে কোনো জায়গায় গরীবেরা জিনিস কিনতে পারে না। তাই বড়লোক গরীবের তফাৎ দাঁড়াচ্ছে বেজায়। মানুষের জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। অনেক স্থানে মানুষ যত, তার উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যায় না। যেমন ঢাকা ও মৈমনসিংহ। সন্তানের জন্ম আমাদের রোধ করাতে হবে স্বামীস্ত্রীর সংযম দিয়ে। আজকাল যে সব দুর্ব্বল রুগ্ন শিশু জন্মগ্রহণ কচ্ছে ভিখারিণীর যে সন্তানভাগ্য অনেক সময় বিশেষ রকম দেখা যায়, এটা কি দেশের সুলক্ষণ? খাওয়া পরার সংস্থান না থাকলে সন্তানকে পৃথিবীতে আনা কি নিতান্ত নিষ্ঠুরের কাজ নয়? মোহম্মদ বলেছেন, "হে বিশ্বাসী, যদি সন্তানের ভরণপোষণ যথানিয়মে না করতে পার, তবে তাকে হতভাগা করে সংসারে এন না। কারণ, তাতে তোমার অধিকার নেই।" হিন্দুশাস্ত্র ও বাইবেল তাইই বলেন। কিন্তু কাজের বেলা আমরা কি তাই করি? সন্তান জন্মরোধ করবার কথা উঠলে বুড়োরা 'মহাপাপ' বলে' জবাব দেন। আমাদের দেশে শুধু সন্তানের সংখ্যা বাড়ছে যে তা' নয় অনেক কানা খোঁড়া হয়ে জন্মগ্রহণ করছে বাপ মা'র অসংযমের দরুণ! সে সব ছেলেদের দ্বারা দেশের ও দশের কাজ তো হয়ই না বরং তাদের জন্যে যে সব food stuff খরচ হয় তা' নষ্টই হচ্ছে বলতে হবে। এই রকম অযথা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।—দ্বিতীয়তঃ আজকালকার শস্যব্যবসায়ীরা দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকটা দায়ী। গ্রামের লোকের অভাব দূর না করেই তারা টাকার লোভে শস্য চালান দেয়। বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন বটে; কিন্তু দেশের অভাব দূর করে তবে অন্যদেশে চালান দিতে হবে, নইলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। পাটের চাষে চাষারা এত মেতে গেছে যে ধানচাষ তেমন হচ্ছে না। এ করলে চলবে না। অশিক্ষিত চাষারা জানে না কোন জমিতে কোন জিনিস ভালো চাষ হয়। তাদের শিক্ষা দিতে হবে। অনেক পোড়ো জমি আছে তাতে চাষ আবাদ আরম্ভ কর্ত্তে হবে। তা না হ'লে সব সময় দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকবে।

—

মানসী ও মর্ম্মবাণী।

সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম্‌-এ, বি-এল,

সমালোচকের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে আলোচ্য বইখানা একবারের বেশি ভালো করে' পড়া। ভালো ভালো বই যা' বাজারে বের হচ্ছে, সমালোচক সেগুলো আগে পড়েন, তাঁর কথামত আমরাও সেগুলো পড়ে শিক্ষা ও আনন্দলাভ করি। কাজেই সমালোচক বই পড়ার বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেন অনেক আর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সমালোচক আমাদের স্বাধীন চিন্তাটাকে অনেক সময় টুঁটি চেপে মারেন। কেন না, প্রায়ই সমালোচ্য বই পড়বার সময় আমার নিজের চোখ দিয়ে পড়ি না, সমালোচকের চোখ দিয়ে পড়ে থাকি। মতামত প্রকাশের সময় বড় বড় সমালোচকদের কথাই প্রতিধ্বনি করি, নিজেরা স্বাধীনভাবে ভেবে দেখি না বইখানার মধ্যে কি আছে। প্রকৃত সমালোচক যিনি তাঁর কাজ হচ্ছে লেখকের অপূর্ণ-

ভাবকে পূর্ণ করে তোলা, তাঁর তৈরী চরিত্রকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করা, লেখকের চিন্তার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা ও তার কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগানো। অনেক সমালোচক লেখকের ভাবকে মূর্ত্তি দিয়ে তার মধ্যে জীবনশক্তি সঞ্চার করে' দেন। যেটা আমাদের জানা বিষয় নতুন আলো ফেলে সেটা ফুটিয়ে তোলেন। আমাদের নতুন পথ দেখিয়ে সেই পথে নিয়ে যান। প্রকৃত সমালোচক সাধারণ রুচির পরিবর্ত্তন করেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে আমাদের থিয়েটার। আগে তা' কি ছিল আর এখন নাট্যসমালোচনায় কি হয়ে উঠেছে। অবশ্য ভালো সমালোচনা সব সময় পাওয়া ভার। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোনো কোন সমালোচক নিছক নিন্দা বা স্তুতি বা ব্যক্তিগত আক্রমণে তাঁদের সমালোচনা ভরিয়ে দেন। তা' বলে এটা বলা ঠিক না যে, সমালোচনার দরকার নেই। সমালোচনা উঠে গেলে ক্ষতি হবে অনেক। যাঁদের সময় কম তাঁরা জগতের বড় বড় সাহিত্যিকের মনের ভাবের সঙ্গে পরিচিত হতে পার্ব্বেন না। নবীন লেখকদেরও ক্ষতি হবে যথেষ্ট। সমালোচক না থাকলে কে তাঁদের কীর্ত্তি ঘোষণা কর্ব্বেন পাঠকদের কাছে? এই সব কারণেই সাহিত্যের বাজারে ভালো সমালোচনার আদর চিরকাল থাকবে।

মাতৃ-মন্দির—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

নারীর কথা।—শ্রীমতী মহামায়া দেবী।

নারীর লেখাপড়া তো চাইই, কিন্তু সবার চেয়ে চাই সংযমশিক্ষা। প্রথমে নারীর শিখতে হবে ব্রহ্মচর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যার ও দরকার এই জন্যে যে, যদি কখনো পুরুষের সাহায্য থেকে তাকে বঞ্চিত হ'তে হয়, সে যেন না মুষড়ে পড়ে পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা আমাদের দেশের নারীর দুর্ভাগ্য সেটা দূর করতে হবে, যতদূর সম্ভব। ব্রহ্মচর্য্য শিখলে নারীর সব নীচতা, হীনতা, দীনতা ধুয়ে মুছে যাবে। তার ভিতর বিবেক জাগবে। তখন সংসারের ভার যে নারীর গ্রহণ করা উচিত, সেটা আর তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

নারীর শিক্ষা ছেলেবেলা থেকেই আরম্ভ কর্ত্তে হবে। তার ভিতর ধর্ম্মভাব জাগাতে হবে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়ে, দেশাত্মবোধ জগাতে হবে ভূগোল ইতিহাস পড়িয়ে আর নানান শিল্প শিখিয়ে তাকে স্বাবলম্বিনী করে তুলতে হবে। কিন্তু সবার উপরে থাকবে তার সংযম সাধনা তার স্বাধীনতাকে চাপা না দিয়ে। এ শিক্ষার সময় চাই। কাজেই অল্পবয়সে বিবাহ বন্ধ করে দিতে হবে। এক কথায় স্থানে স্থানে নারী সাধনাশ্রম গড়ে তুলতে হবে—কিন্তু তারজন্যে প্রতি জায়গায় দু'তিনজন ত্যাগী সন্ন্যাসিনী শিক্ষয়িত্রীর দরকার, সে অভাব পূর্ণ হওয়াই কঠিন।

বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী।—শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার।

ভগবতী দেবী লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। কিন্তু তাঁর চরিত্রে গুণ ছিল অনেক। (১) তিনি মিথ্যাকে সত্য বলে' ছেলেদের বিশ্বাস করাতে ঘৃণা করতেন। তাই তিনি কখনো অন্য মায়েদের মতো ছেলেকে 'জুজুর ভয়' দেখাতেন না বা 'আকাশের চাঁদ ধরে দিবার আশ্বাস দিতেন না। (২) নিজের সন্তানের কাছে সংসারের অবস্থা তিনি কখনো লুকাতেন না। ছেলের আবদার সাধ্যায়ত্ত হলে তিনি তা পূরণ কর্ত্তেন, না হলে তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে দিতেন সংসারের দুরবস্থার কথা। (৩) সন্তানদের ভালো কাজ দেখলে তিনি তাদের উৎসাহ দিতেন। একদিন বিদ্যাসাগর ছেলেবেলায় একটি ছেলেকে ছেঁড়া কাপড় পরে নিজের ভালো কাপড় তাকে দান করে ছিলেন। ঘরে ফিরে এলে ভগবতীদেবী ব্যাপার শুনে বল্লেন। "এতো ভালো ছেলের কাজ, আমি তোমায় চরকায় সুতো কেটে নতুন কাপড় করে দিব।" (৪) লঘুপাপে গুরুদণ্ড তিনি ছেলেদের দিতেন না। একবার ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগরের গলায় একটা ধানের শুঁয়া আটকে গিয়ে জীবন সংশয় করে তুলেছিল। তাঁর মা ভর্ৎসনা না করে তখন এইমাত্র বলেছিলেন যে, "অমুক অমুক শস্যের শীষে শুঁয়া আছে, আর কখনো

চিকিৎসা।" (৫) লোকের আত্মবিশ্বাসের উপর তিনি কখনো আঘাত কর্ত্তেন না। (৬) কারো দোষ তিনি বড় দেখতেন না, গুণই দেখতেন। দোষ দেখলে গুণের কথা স্মরণ করিয়ে দোষটা শোধরাবার চেষ্টা কর্ত্তেন। এই রকমে তিনি বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলাকার দুষ্টামি শুধরে ছিলেন। (৭) তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ এবং সন্তানদের মনেও এই দুটি গুণ শিখাবার চেষ্টা তাঁর যথেষ্ট ছিল, তাতে সফলও হয়েছিলেন।

সংহতি—বৈশাখ, ১৩৩১।

ভাইকোম সত্যাগ্রহ ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ।—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে ভাইকোমে সত্যাগ্রহ হচ্ছে। তার কারণ এই যে, সেখানকার উঁচু জাতেরাই মন্দিরে প্রবেশ করতে পায়। পঞ্চম বা পেরিয়া যারা তারা মন্দিরে প্রবেশ করতে তো পারেই না, এমন কি, মন্দিরের সামনের বা পাশের রাস্তাদিয়েও চলা তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই পঞ্চম জাতের লোকেরা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার এখানো দাবি করে নি, তারা শুধু চায় যে মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে তাদের চলাফেরা করতে দেওয়া হোক। তাদের এই ন্যায্য দাবি কিন্তু সমাজ আমল দেয় নি তাই তারা মহাত্মার প্রদর্শিত পথে সত্যাগ্রহ করেছে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এককালে এই পেরিয়া জাত এখনকার চেয়ে ঢের উন্নত ছিল, এখন তারা সমাজের নিম্নতম স্তরে এসে পড়েছে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দরুণ যে সব অত্যাচার হচ্ছে তার প্রতিকারের সময় এসেছে। আগে বর্ণ ছিল ব্যবসায় গত। ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী এসেও তাদের ব্যবসায় অনুসারে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতের মধ্যে নিজেদের তুলে নিয়েছেন। তিব্বতে এখনো সম্ভ্রান্ত লোকেরা 'রাজপুত' হচ্ছেন, চাষা 'জাঠ' হচ্ছে। কাজেই পেরিয়াদের এই চেষ্টাটা নিতান্ত আব্দার নয়।

পেরিয়ারা এখন নিজেদের পঞ্চমশ্রেণীভুক্ত বলে পরিচয় দেয়। আসল তারা দ্রাবিড়ের অনার্য্য জাতি, বিজিত হ'য়ে তারা হিন্দু হোল বটে, কিন্তু বিজেতা আর্য্যজাতির ব্যবহারে সমাজের নিম্নতমস্তরে রয়ে গেল। এখন কথা হচ্ছে যে, একবার যখন তাঁদের হিন্দু বলে স্বীকার করা হয়েছে, তখন তাদের অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য বলে ঠেলে ফেলে রাখা কি ঠিক? তাদের আচার ব্যবহার হয় তো হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদিত নয়। তারা অনার্য্য। কিন্তু দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ওরাই বা কি? তাঁরাও গোড়ায় অনার্য্য ছিলেন। পরে তাঁদের ভিতর জাতি বিভাগ হয়। অনুকারীদের স্বভাবই হচ্ছে যে, তারা যাদের অনুকরণ করে তাদের দোষগুলো নিজেদের চরিত্রে অনেক গুণ বাড়িয়ে তোলে। দ্রাবিড়েরাও তেমনি অস্পৃশ্যতার সৃজন করে উত্তর ভারতের উঁচু জাতদের চেয়ে ও উপরে চলে গেছেন। পেরিয়াদের নিজ অধিকার দিতে হবে। দাক্ষিণাত্যেই তাদের সংখ্যা বিশ লাখের উপর। তাদের কোলে টেনে নিয়ে তাদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে, তা'হলে তারা সমাজের একটা বলিষ্ঠ অঙ্গ হয়েই দাঁড়াবে। আমাদের এই জাতিভেদের হেয়তা ও অস্পৃশ্যতার ছিদ্র দিয়ে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম যেমন ভাবের রোগের বীজাণুর মতো আমাদের সমাজ দেহে প্রবেশ করে বলক্ষয় করে দিয়েছে, তা'তে খুব শীঘ্রই হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে। বাংলায়ও অনেক অস্পৃশ্য জাত আছে। তাদেরও ন্যায্য অধিকার দিতে হবে। নইলে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে তারা হিন্দুর বলক্ষয় করে দিবে। তাতে কোনো পক্ষেরই শ্রেয়ঃ হবে না।

ভাইকোমে পেরিয়াদের দাবী সামান্য। উঁচু জাতেরা খৃষ্টান মুসলমানদের যে পথে চলতে দেন, তাঁদের নিজের ধর্ম্মের লোককে সেই পথ দিয়ে চলা ফেরা করতে নিষেধ করেন। এই anomalyটা দূর করা এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল।

... প্রেস শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৮শ বর্ষ } চতুর্থ সংখ্যা {শ্রাবণ, ১৩৩১

ধ্যানব্রহ্ম

১

আছ, চিন্তামণিময় গুহার আশ্রমে
মানস সহস্রদল পদ্মে সমাসীন
জ্ঞানগম্য ধ্যানব্রহ্ম, অটল সংযমে
আত্মানন্দে সমাহিত,—স্থির, স্পন্দহীন।

২

নিসর্গের রূপৈশ্বর্য্য অন্তর্মুখী হয়ে
অর্ঘ্যরূপে তব পদে হতেছে সঞ্চিত,
আরতির পঞ্চদীপ আনে ধীরে বয়ে,
ইন্দ্রিয় পুরন্ধ্রীগণ সংযম গুণ্ঠিত।

৩

দ্বাদশ ভাস্কর-দীপ্তি হয়ে কেন্দ্রীভূত
সান্দ্রোজ্জ্বল ললাটের তৃতীয় নয়নে,
নিখিলের জ্ঞানযজ্ঞে সর্ব্ব হোমহুত
সার্থক তোমার মহাবোধির বোধনে।

৪

জীবন তরঙ্গ যত—চরাচর মাঝে
কূটস্থ চৈতন্যে তব হয়ে গেল হারা,
তোমার আসনপদ্মে মধু হয়ে রাজে
বিশ্বমানবের চিত্তে যত রস ধারা।

৫

নিরুপাধি ব্রহ্ম হয়ে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তোমার লোচনে,
ভূমার বৈচিত্র্য 'একে' হয় অখণ্ডিত
মন্ত্রসূক্ত ভৃঙ্গ হয়ে গুঞ্জরে চরণে।

৬

বলিত লালসা, তব প্রজ্ঞারশ্মিজালে
বাঁধা তব যজ্ঞভূমে, সংযমের যূপে,
তোমারি শাসনে দৌত্য করে কালেকালে
কল্পনার স্বপ্ন, হেম মরালের রূপে।

৭

ত্রিকাল তোমার জ্ঞান চক্ষুর নিমেষ
ত্রিলোক বিম্বিত তব পাণির মকুরে,
ত্রিতাপ নয়নানলে হয় ভস্মশেষ,
ত্রিবেদ বিরাজে চির তব কণ্ঠপুরে।

৮

তোমার সৃজন শঙ্খ ধ্মাত মুখ বায়ে
কুহরে কুহরে বিশ্বে তুলে প্রতিধ্বনি,
জাগায় তপস্বিগণে তপোবন ছায়ে
সৃষ্টি প্রজাপতিগণ জাগেন অমনি।

৯

তীর্থে তীর্থে হয় তার মন্দির রচনা
মন্দিরে মন্দিরে জ্বলে উঠে দীপ ধূপ,
পাথরে জাগায় প্রাণ, দারুতে মূর্চ্ছনা,
কাব্যগীতি কারুশিল্পে ধরে চারুরূপ।

১০

জীবাত্মার ভববন্ধ শ্লথ হয় তা'তে
শিবজটা হতে ঝরে রস গঙ্গাধারা,
জাগেন জলধি হতে সুধাপাত্র হাতে
ধন্বন্তরি, পারিজাত, রমা সালঙ্কারা।

১১

নমি তোমা ধ্যান-ব্রহ্ম, তোমার প্রসাদে
বিকসিত ভারতের চিন্ময় নয়ান,
সর্ব্বদ্বন্দ উপদ্রব, লাঞ্ছনা, প্রমাদে,
অটল করেছ তারে হিমাদ্রি সমান।

১২

যুগে যুগে ভারতের ভাগ্য নিয়ামক,
মুমুক্ষু করেছ তার অধ্যাত্ম জীবন,
তোমারি মানস ব্যোমে তৃষিত চাতক
ভারতের ভবিষ্যৎ, হে ভূত ভাবন।

শ্রীকালিদাস রায়।

জীবনের রহস্য মন্দির

(বসু-বিজ্ঞান-মন্দির)

শৈশবে দিদিমারা যখন রূপকথার ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাইতাম সে রাজ্যে গাছ পালা, পশু, পাথর সকলেই মানুষের সাথে একই ডোরে বাঁধা—তাহারই মত তাহারা হাসে, কাঁদে, কথা কয়, সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া গৃহস্থালী করিয়া যায়। ছেলে বেলার সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যের চাবীও যখন বন্ধ হইয়া যায়, তাহার সন্ধানও হারাইয়া যায়। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধন, সে যোগ, সে ঐক্যও রূপকথার মত অলীক বোধ হইতে থাকে; কিন্তু ইহার সবটাই যে আর অলীক কল্পনায় ভরা নয় আজ তাহা শিক্ষিত জগৎ বড় গলায় কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারে না! কারণ, আজ বিজ্ঞান তাহার মোহনমন্ত্রে রূপকথার চেয়েও সহস্রগুণ সরস অথচ তাহার মাপকাটীর তুলার দণ্ডে ওজন করা যে সত্যের ভাণ্ডার চক্ষের সামনে খুলিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে করিয়া জানা যায় যে কি আশ্চর্য্য ঐক্যের বন্ধনে বিশ্বের এই প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড়জগতের মধ্যে একই প্রাণের লীলায়, একইভাবে স্পন্দিত হইতেছে—সে এক কোন অখণ্ড অজানা প্রাণ স্রোতের উচ্ছ্বাস হইতে প্রবাহিত হইয়াছে কে জানে! মনে করিলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়। কোথায় বা এ সবাক্ সচেতন চঞ্চল প্রাণী জগৎ আর কোথায় বা এই অচল মূক তরুলতার স্পন্দন মাত্র অভিব্যক্তি সম্বল, আর কোথায় বা একেবারে নিশ্চল নির্ব্বাক বর্দ্ধন রহিত জড়জগৎ! একই ধমনীর রক্ত চলাচল গতি, একই স্নায়ুর ক্রিয়া পরিক্রিয়া একই শৈত্য উষ্ণতা বোধ, একই সুখ দুঃখের ও সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি ঘাত প্রতিঘাতের আকুঞ্চন নিকুঞ্চন—জীবন মৃত্যুর রহস্য, ক্ষয়লয়ের ধ্বংসলীলা বাহ্যিক এতো বিভিন্নতা সম্পন্ন প্রকৃতি প্রাণী বস্তু ও উদ্ভিদ জগতে নিহিত!

কিছুদিন পূর্ব্বে সত্যই ইহা নিতান্তই রূপকথার অলীক কাহিনী বা কবির কবিতার অবাধ উচ্ছ্বাস বলিয়াই মানুষের ধারণা হইতে পারিত কিন্তু বহু বৎসরের অদম্য অনুশীলনা ও একাগ্র নিষ্ঠার ফলে যে বৈজ্ঞানিক আজ তাহা জগতের সম্মুখে এমনভাবে পরীক্ষিত সত্যে প্রতীষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহারই সৌম্য সাধনাগার "বসু বিজ্ঞান মন্দির" নামে পথিকের শিল্পী মন তাহার অপূর্ব্ব স্থাপত্যে মুগ্ধ করিয়া সহরের যে বিপুল জনস্রোত-পূর্ণ ও ইট প্রস্তর নির্ম্মিত ইমারত ঘেরা অংশে বিরাজ করিতেছে, সহসা সেখানে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করিতে পারে না, বিজ্ঞানের বাস্তব কঠোরতাপূর্ণ অপূর্ব্ব কৌশলময় যন্ত্রপাতি ভিন্ন এই পাষাণ প্রাচীরের দ্বার একবার অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেই একেবারে এক অচিন্ত্যনীয় স্নিগ্ধ শ্যামল তপোবনের দৃশ্য পথিকের প্রকৃতি-লুলোপ ক্লান্ত নয়ন দুটীকে এমনভাবে পরিতৃপ্ত করিয়া দিতে পারে!

বিজ্ঞান ও কবিতায় চির বিরোধ—কঠোর ও কোমলের চির বিভিন্ন প্রকৃতির ন্যায়; মানুষের এইই সর্ব্বকালীন ধারণা। কবি বিশ্বরূপের ধ্যানে, ভাবের উৎসে একটানা বান ডাকিয়া আনন্দে তন্ময় হইয়া কল্পনার স্রোতে একেবারে ভাসিয়া যান। বৈজ্ঞানিক, খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার কারণ ইতিবৃত্ত, স্বভাব, গঠন, বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন—প্রত্যেক পদে তাঁহাকে পূর্ব্ব পশ্চাৎ বিচার করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই বিচার প্রবৃত্তি কবির আনন্দের অন্তরায় আবার কল্পনা বৈজ্ঞানিকের কাছে তুচ্ছ ভাবের খেলা। এইভাবে উভয়ে চির বিভিন্ন রাজ্যে বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন ও বিপরীত রাজ্যের জীব বলিয়া পরস্পরকে প্রত্যাখান করিয়া সুদূরে অবস্থান করিয়াছেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যেই যে একই প্রেরণা, একই অনুভূতি, একই অদম্য আকাঙ্ক্ষা দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি লইয়া বিশ্ব সৌন্দর্য্যে সেই অজানা বিশ্ব কারণের রূপের সন্ধানেই ফিরিতেছে।—একই ছন্দ একই তারে উভয়ের হৃদয়কে স্পন্দিত করিয়াও বিজ্ঞানে কবিতায়, বাস্তবে কল্পনায়, কঠোর কোমলে যে কি সামঞ্জস্য বিরাজ করিতেছে, আজ তাহা প্রথম এই সাধক শ্রেষ্ঠই জগতের সম্মুখে প্রচার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক না বলিয়া "কবি বৈজ্ঞানিক" বলিয়াই অভিহিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বাস্তবিকই যে কবিতায় ও বিজ্ঞানে প্রভেদ শুধু বাহিরের সন্ধানের পন্থায়—প্রকৃতি ভেদে নহে তাহা ইনি তাঁহার সাধনা ও কর্ম্মে, পারিপার্শ্বিক প্রত্যেক দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়া দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

কবি সত্যকে বাদ দিয়া চলিতে পারেন না, কল্পনার উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়াও সেই এক সত্যের সন্ধানেই তাঁহাকে ছুটিতে হয়—সত্যের উপরই কবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বৈজ্ঞানিক ও কল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকে সাগ্রহে কখনই কোন কল্পনাতীত সত্যে পথের সন্ধানে অগ্রসর হইতে সক্ষম হন না। উভয়েই যে সেই একই বিশ্ব সত্যের পূজারী। তাই বৈজ্ঞানিকের জীবনও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় কবিতারই প্রস্রবন, সত্যকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষিত করিয়াও বাস্তবের কঠোর স্পর্শে যাহার কবিত্ব, যাহার মনোহারিত্ব দ্বিগুন বর্দ্ধিত ভিন্ন একটুও ম্লান হইবার আশঙ্কা নাই, কারণ তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই স্থাপিত।

বিজ্ঞান ও কবিতার এই ঐক্য তিনি তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যেমন, তেমনি এই সাধনাগারেও সর্ব্বত্র সুস্পষ্টভাবে আদর্শায়িত করিয়াছেন। সুদৃশ্য সাধনা মন্দিরের বৃহৎ বক্তৃতাগৃহে প্রায় ১৬০০ জন লোকের অনায়াসে স্থান হয় ও তাহা এমন সুদক্ষভাবে নির্ম্মিত যে বুঝি বা লজ্জাবতীর ক্ষীণ হৃদয়ের সলজ্জ মৃদু কল্পনাও প্রতি জনার কাছে ধরা পড়িয়া যায়।

বহির্ম্মুখীন হলটীতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রথম পরীক্ষার্থ যন্ত্রগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত। উপর ও নিচে অনেকগুলি কক্ষেই অক্লান্ত কর্ম্মীর দল নানা সূক্ষ্ম ও বিচিত্র যন্ত্র দ্বারা অবিরত সাধনায় তন্ময়—চারিদিকেই বাস্তবের সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম তৎপরতা।

ইহার পশ্চাতে পূর্ব্ব কথিত প্রাসাদ সংলগ্ন রম্য উপবন, শান্ত তপোবনের ছায়া সৃষ্টি

করিয়া বিদ্যমান। তাহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনখানি ঘাসের মেখলায় একখানি অপূর্ব্ব মসনদের মত দেখায়—কোথাও বা হরিণ শিশু সূক্ষ্মজালের বেষ্টনের মধ্যে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে—যেন সে তার প্রকৃতি মায়ের বুকেই নগ্ন শৈশব সুখ উপভোগ করিতেছে—বনের ধারেই জলাশয়েই যেন নিজের ছায়া দেখিয়া চকিতে পলায়ন তৎপর হইতেছে। আষাঢ়ের ঘনশ্যামের গুরুস্বনে পূর্ণ রাজপক্ষ বিস্তার করিয়া কোথাও মন্দতালে ময়ূরী নৃত্য করিতেছে—তাহারই পার্শ্বে হাস্যকর পাদবিক্ষেপে সারসপক্ষী চলিয়া বেড়াইতেছে। ময়দানের পশ্চাৎভাগে ছাউনী ঘেরা ফার্ণারী (fernery) -হিমালয়ের পাদনতা হৃষিকেশের অপূর্ব্ব বন শোভার একখণ্ড মনে হয় কে জানি কোন যাদু মন্ত্র বলে অথবা আলাদানের প্রদীপ সাহায্যে সদ্য যেন সেইখান হইতে আহরিত করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। "ফার্ণে" "মসে" নানারূপ "পাম" ও লতাগুল্ম বিশিষ্ট ছোট ছোট কৃত্রিম শিলাখণ্ডে ও জলের রেখায় সে স্থানটী এমনই সুন্দর করিয়া রচিত। তাহারই দুইধারে জালে ঘেরা বৃক্ষখণ্ড, নানাজাতীয় সুদৃশ্য পাখী কলরবে পূর্ণ।

ময়দানের চারিপাশে ছোট বড় নানাপ্রকার তরু ও পুষ্প বৃক্ষ শ্রেণীর শোভা—কিন্তু নিছক সৌন্দর্য্য ও কবিতার জন্যই তাহারা এতো যত্নে পরিবর্দ্ধিত নহে। তাহাদের অনেকের জীবনই বিজ্ঞানের মন্দিরে উৎসর্গিত। এক এক সময় পরীক্ষাগার হইতে নানারূপ বিচিত্র সূক্ষ্ম যন্ত্র ও তার দ্বারা কেহ বা আলিঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই মন এক অভিনব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে—এই যে আপাততঃ মূঢ় তরুলতা, না জানি সে কবি-সাধকের কি মোহন স্পর্শে তাহার চিররুদ্ধ গোপন হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহার জীবন কাহিনীর কি রহস্যই না এই মুহূর্ত্তে বিচিত্র লিপিতে বদ্ধ করিতেছে!

চারিটী বৃক্ষকাণ্ড সম্বল করিয়া সুকৌশলে তাহার উপর একটী নিকুঞ্জ করা হইয়াছে—যাহার উপর বসিয়া এই তরুলতা সম্বলিত তপোবনের দৃশ্য অতি মনোহর। এই কোলাহল পূর্ণ জনপদের অন্তরেই যে বসিয়া আছি তাহা যেন ক্ষণিকের জন্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতে হয়, এমনই মায়াময় এক শান্তির আবেশে দেহ মন পরিতৃপ্ত হইয়া এলাইয়া আসে। অদূরেই কুণ্ডাকারে সুদৃশ্য দু একটী জলাগার, নানাবিধ জলজ লতাগুল্মে পরিপূর্ণ—কখনও বা প্রস্ফুটিত কুমুদ কল্হারে সুশোভিত। চারিদিকেই একটী শান্ত সৌন্দর্য্যে সুনীরব কবিতা যেন মূর্ত্ত হইয়া বিরাজমানা। তাহাকেই ঘেরিয়া আবার সংলগ্নিত কক্ষগুলিতে বিজ্ঞানের অক্লান্ত কর্ম্ম মুখর পরিচর্চ্চা চির কবিতাময়ী পর্ব্বত দুহিতা প্রকৃতি সতী গৌরীর সাথে অক্ষয় পুরুষসিংহ মহাদেবের মিলনেরই লীলা যেন মানস পথে উদয় হইয়া উঠে। এখানেও জড় ও প্রাণী জগতের মত বিজ্ঞান ও কবিতার একি সুনিবিড় ঐক্যের বন্ধন!

উপরোক্ত নিকুঞ্জ স্থাপিত চারিটী বৃক্ষের মধ্যে দুইটী পূর্ণাবস্থায় স্থানান্তর হইতে সংগৃহীত। সাধারণভাবে এত বড় পূর্ণায়তন তরুর মূল উচ্ছেদ করিলে তখনই তাহা ধ্বংশ প্রাপ্ত হইত কিন্তু "ক্লোরোফরম" (chloroform) দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান অবস্থায় উৎপাটন করাতে

তাহাদের কোন প্রকার আঘাত বোধ না হওয়াতে ইহা প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়ায় নাই। মানবদেহে অস্ত্রাচার করিবার পূর্ব্বে তাহার আঘাতের বেদনা বোধকে যেমন লুপ্ত করিয়া দিলে তাহার পক্ষে সুফলজনক, উদ্ভিদ্‌দিগের ঠিক তদনুযায়ী। বিষ ও ঔষধের প্রতিক্রিয়া তাহাদের উপরও ঠিক সমানভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, এমন কি টিন ইত্যাদি ধাতব পদার্থও বিষদ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের ন্যায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। পরিশ্রমে তাহাদের মত ক্লান্ত ও বিশ্রামে অন্তর্বল পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা জগতে ও বসু মহাশয়ের এই আবিষ্কার অভিনব যুগের স্থাপনা করিতেছে, শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যত কিছু অবশ্য পরীক্ষনীয়, এ যাবৎ ভেক ইত্যাদি ইতর প্রাণীর উপর দিয়াই করা হইতেছে কিন্তু এক্ষণে উদ্ভিদাদির সহিত ও জীবদেহের এতাদৃশ শারিরীক সাদৃশ্য আবিস্কৃত হওয়ায় অনায়াসে সহজসাধ্য তাহাদের উপরও নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে।

মানবদেহে দুশ্চিকিৎস্য করাল ব্যাধি পক্ষাঘাতের প্রতিকার এ যাবৎ কেহই ঠিক করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই, তবে যে উহা স্থানীয় স্নায়ুপেশীর কোন কারণে অক্ষমতা হইতেই উদ্ভুত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তরুর দেহেও বসু মহাশয় কৃত্রিম উপায়ে তাহার কোন অংশ বিশেষে স্নায়ুর ক্রিয়া রহিত করিয়া পক্ষাঘাত উৎপন্ন করান ও পরে আবার উপযুক্ত প্রতীকারে সে স্থানকে নিরাময় করিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে তরুলতার উপর পরীক্ষা করিয়া ক্রমে পক্ষাঘাতের বিশেষ বিশেষ আক্রমন হেতু প্রতিকার ইত্যাদি আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে।

এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের দিক হইতে আলোচনা করা আজ আমার উদ্দেশ্য বা সাধ্য নহে তবে এই সব কার্য্য কলাপ, আবিষ্কার ও কর্ম্ম মন্দিরের অনুষ্ঠানের ভিতর নিছক বিজ্ঞানের পার্শ্বেও মূর্ত্তিমতী কবিতার যে অধিষ্ঠান ও বিশ্বসংসারের বিপরীত রূপলীলার মধ্যেও ঐক্যের যে সুমধুর বংশী ধ্বনির আভাষ পাইয়া মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাই একটু প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

শ্রীরমলা বসু।

হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরকার কথা

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধের উপসংহারে আমি এইরূপ বলিয়াছিলাম যে, গীতা শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান কিরূপ জ্ঞান এবং তাহার অনুশীলন করিলে আমরা কিরূপ ফল লাভ করিতে পারি তাহার বিশেষ সমাচার বারান্তরে দিব। এইবার আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গীতা শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান বিষয়ক যে কয়েকটি শ্লোক আমি বিগত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আরেকটি শ্লোক আছে যাহা আমি সে সময়ে উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। সে শ্লোকটি এই:—"দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়"। এ শ্লোকটির প্রকৃত ব্যাখ্যা এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমি কোনো স্থানেই খুঁজিয়া না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া আমার নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া উহার মধ্যে যতদূর পারি তলাইতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহার ফলে উহার মধ্য হইতে এক ভাণ্ড অমৃতরস যাহা আমি আহরণ করিয়া পাইয়াছি, তাহাই এক্ষণে পাঠকবর্গের সহিত একত্রে উপভোগ করিবার মানসে—যে কার্য্যটি সমাধা করিতে পূর্ব্ববারে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম—তাহারই উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গীতা বলিতেছে "জ্ঞানময় যজ্ঞ দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেয়।" যজ্ঞের সহিত দ্রব্যের যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা কাহারো জানিতে বাকী নাই—কিন্তু জ্ঞানের সহিত যজ্ঞের যে সেরূপ কোনো প্রকার সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে—এটা একটা নূতন ধরণের কথা। যজ্ঞাগ্নিতে কেবল ঘৃত ঢালা হয়, ইহাই আমরা প্রত্যক্ষে দেখিয়াছি, আর যুক্তিতেও তাহা খাপ খায় এইজন্য—যে হেতু অগ্নি ও ঘৃত দুইই এক জাতীয় পদার্থ—দুইই ভৌতিক পদার্থ। পক্ষান্তরে, জ্ঞান তো আর অগ্নির ন্যায় ভৌতিক পদার্থ নহে—জ্ঞানের ন্যায় অমন-একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক পদার্থকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে—এ বিষয়ের মীমাংসা যে পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্লোকটির নিগূঢ় অর্থের মধ্যে কাহারো দন্তস্ফুট হইতে পারা সুকঠিন। উহার মীমাংসা আমি করি এইরূপ:—

শাস্ত্রে বলে যে, জীবের বিজ্ঞানময়কোষে (অর্থাৎ মস্তিষ্কে) যেমন জীবের বুদ্ধি নিয়ত জাগিতেছে—প্রকৃতির শীর্ষস্থানে, সেইরূপ সমস্ত জীব-জগতের পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক মহতী বুদ্ধি নিয়ত জাগিতেছে। বুদ্ধি যদিচ নিজগুণে আধ্যাত্মিক পদার্থ নহে, কিন্তু তাহা সচ্চিদানন্দ আত্মার সংস্পর্শগুণে প্রকারান্তরে আধ্যাত্মিক পদার্থেরই সামিল;—এইজন্য বুদ্ধিকে বলা যাইতে পারে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক অবয়ব। বুদ্ধি প্রকৃতির মস্তক স্বরূপ এবং পৃথিবী প্রকৃতির পদদ্বয় স্বরূপ। যেখানে যত কিছু দ্রব্য আছে সমস্তই বুদ্ধি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, এবং ঐ দুই ল্যাজামুড়ার মধ্যে সন্তুক্ত রহিয়াছে।

এখন দেখা যাক্—যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে তাহা কতদূর যায়। ইন্ধনকাষ্ঠে পার্থিব পরমাণু বেশীর ভাগ রহিয়াছে—ঘৃতে জলীয় পরমাণু বেশীর ভাগ রহিয়াছে; অগ্নি দ্বারা এই ঘৃত ও কাষ্ঠ বাষ্পীভূত হইয়া ক্রমশ কত যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইতে থাকে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন; এমন কি, পরিশেষে উহার এক একটি পরমাণু এরূপ মাত্রাতীত সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে যে, তাহাকে সূচের আগা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী সূক্ষ্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ কাষ্ঠ ঘৃতাদি পদার্থগুলি মহাশূন্য আকাশে বিলীন হইয়াই কি থামিয়া থাকে? না তাহার আরো কোনো সূক্ষ্মতর পরিণাম আছে? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, অনেক যুগ যুগান্তর পরে পৃথিবী যখন জলে গুলিয়া যাইবে এবং সেই জলীভূত পৃথিবী যখন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে এবং—একা শুধু পৃথিবী না—সূর্য্যকে শুদ্ধ ধরিয়া সমস্ত সৌর জগৎ অতীব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন কোথাও আর উত্তাপের তারতম্য থাকিবে না—সমস্ত আকাশ একই রূপ শীতল অবস্থায় পরিণত হইবে; "ইহার পরে" (বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন) "পুনরায় পরমাণুগণের যোগাযোগ দ্বারা কিরূপে যে দ্রব্যাদি পুনর্গঠিত হইবে তাহার কোনো সম্ভাবনাই আমরা দেখিতে পাই না"। কেমন করিয়া তাহা দেখিতে পাইবেন? তাঁহারা যে শিবকে ছাড়িয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন—প্রকৃতির মস্তক ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাহার হস্তপদে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা যে সমূলে বিফল হইবে—ইহা ত ধরা কথা! পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা জলকে oxygen এবং hydrogen এই দুইরূপ পদার্থে বিভাগ করিয়াছিলেন—খুব পাকাপোক্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা। কিন্তু, তাহার পরে সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহাদের সংযোগ হইতে পুনর্ব্বার জল উৎপাদন করিতে কিছুতেই পারিয়া উঠিতেন না—তাঁহারা জানিতেন না যে, oxygen এবং hydrogen ছাড়া তৃতীয় আরেকটি পদার্থ জলের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে যাহার নাম তাড়িত পদার্থ। উঁহাদের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা oxygen এবং hydrogen বায়ু যথা পরিমাণে একত্রিত করিয়া তাহার মধ্যে যখন তাড়িত পদার্থটি চালাইয়া দিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা জলে পরিণত হইল। তেমনি, এই পৃথিবীর মধ্যে—এই মৃত্তিকা জল-বায়ু-অগ্নির মধ্যে—যে একটি চেতন পদার্থ জাগিতেছে, তাহা তাঁহারা আদবেই না দেখিয়া কল্পনা-যোগে সমস্ত সৃষ্টিকে এক মূল ভৌতিক উপাদানে নিঃশেষে পরিসমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। যাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না, তাহা এমন একটি অক্ষয় পদার্থ যাহা সৃষ্টির গোড়ায় ছিল মধ্যেও রহিয়াছে, এবং পরেও থাকিবে—যাহা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তিনেরই সঙ্গে অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকিয়া তিনকেই যথাবৎ প্রকারে নিয়মিত করিতেছে। কাষ্ঠ ঘৃতাদি স্থূল দ্রব্য সকল যজ্ঞাগ্নি সংযোগে যখন স্থূল হইতে সূক্ষ্মে পরিণত হইতে থাকে, তাহা বিনা চেতনে হয়ও না হইতে পারেও না; তেমনি আবার সূক্ষ্ম বাষ্প সকল যখন ঘনীভূত হইয়া শূন্য হইতে জলাকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে থাকে, তাহাও বিনা চেতনে হয়ও না—হইতে পারেও না। আমরা যদি বলি কাষ্ঠ ঘৃতাদি যজ্ঞীয় পদার্থ অগ্নি সংযোগে

আকাশে লয়প্রাপ্ত হইয়াই থামিয়া থাকে, তবে সে কথাটা অর্দ্ধ সত্য, তাহার বাকী অংশটি পূরণ করিয়া দিলে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সত্যে আমরা আধ-সহজে উপনীত হইতে পারি। শিবকে ছাড়িয়া দেওয়াতেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের যজ্ঞ অঙ্গহীন হইয়া গিয়াছে; শিবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইলে—পৃথিবী হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া পর্ব্বত বাহিয়া নভোমণ্ডলের কৈলাশ শিখর পর্য্যন্ত উত্থান করা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিকদিগের দেখাদেখি, আমরা যদি মাঝপথে কোথাও থামিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্ট হইবে। কাজ নাই তাহাতে—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানের পথে চলুন—আমরা আমাদের পথে চলি।

আকাশ পর্য্যন্তই দ্রব্যাদির চরম গতি এ কথায় আমরা ভুলি না। সমস্ত বহির্জ্জগতের একটি পরিপাটি মানচিত্র আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে। যোজন যোজন বিস্তৃত গিরি নদী সমুদ্র যেমন মানচিত্রে অতীব অল্প স্থানের মধ্যে সংকুচিত করিয়া প্রদর্শিত হয়—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মোট বৃত্তান্তটি তেমনি আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে সংকুচিত করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে—যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। আমাদের শরীরের অস্থি মাংস বৃহৎ পৃথিবীর সংকুচিত প্রতিলিপি; আমাদের শরীরের লোহিত রক্ত—বৃহৎ লবণাম্বুর সংকুচিত প্রতিলিপি; আমাদের শরীরের জঠরানল, ভূগর্ভস্থ বৃহৎ অনলের সংকুচিত প্রতিলিপি, আমাদের শরীরের প্রাণাদি বায়ু বাহিরের বৃহৎ বায়ুর সংকুচিত প্রতিলিপি। আমাদের শরীরের অন্তরাকাশ বহিরাকাশের সংকুচিত প্রতিলিপি। একদিকে এ যেমন দেখা গেল—আরেকদিকে তেমনি আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের শরীরের ভিতরকার অন্নময় যন্ত্র বাহিরের দ্রব্যময় যজ্ঞের সংকুচিত প্রতিলিপি। ঘৃতমিশ্রিত কাষ্ঠ যেমন যজ্ঞাগ্নি সংযোগে পরিশেষে শূন্য আকাশে পর্য্যবসিত হয়, রসরক্ত মিশ্রিত অন্ন তেমনি জঠরাগ্নি সংযোগে পরিশেষে আমাদের অন্তরাকাশে পরিণত হয়, এবং সেইখানে থামিয়া না থাকিয়া—এই অন্নময় যজ্ঞের সূক্ষ্মীভূত অর্থ যেমন ইন্দ্রিয় মনে উত্থিত হয়, এবং সেখান হইতে মস্তিষ্কে বাহিয়া উঠিয়া বুদ্ধির মূলে রস সঞ্চার করে, বাহিরের দ্রব্যময় যজ্ঞের সূক্ষ্মীভূত ঘৃতাদি উপকরণ সকলও সেইরূপ, শূন্য আকাশে থামিয়া না থাকিয়া প্রকৃতির শীর্ষস্থানীয় মহতী বুদ্ধিতে বিলীন হয়। এই যে, মহতী বুদ্ধি—ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যাইতে পারে—সকল সূর্য্যের আদি সূর্য্য, এবং উপনিষদের ভাষায় বলা যাইতে পারে পরমাত্মার হিরণ্ময় কোষ যথা :—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তৎশুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্ তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ"। হিরন্ময় কোষে বিরজ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন—তিনি সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি যাঁহাকে আত্মবিৎ জ্ঞানিজনেরা জানেন। যজ্ঞাগ্নি সংযোগে ঘৃতকাষ্ঠের সারাংশকে যেমন ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থান করাইয়া পার্থিব বিষয়ভোগকে স্বর্গীয় দেবভোগে পরিণত করা হয়—ঋষিগণ, সেইরূপ, তাঁহাদের মনকে ভূলোক হইতে ভুবর্লোক এবং ভুবর্লোক হইতে স্বর্গলোকের হিরন্ময় কোষে উত্থান করাইয়া—গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা স্বর্গলোকের মূলাধার জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি এবং জ্যোতি ধ্যান করিতেন, আর, সেই সঙ্গে তাঁহার নিকট বুদ্ধি প্রার্থনা করিতেন। ইহারই নাম

জ্ঞানময় যজ্ঞ। সেই গোড়ারজ্ঞান হইতে টাট্‌কাটাট্‌কা যেরূপ বুদ্ধি অবতীর্ণ হয় তাহা যে কীরূপ অমূল্য সামগ্রী তাহা পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যেমন জানিতেন—এমন আর কেহই না। শিশু যেমন মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্যদুগ্ধে তৃপ্তিলাভ করে না—তাঁহারা, সেইরূপ, জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তির প্রসাদে অনুপম জ্ঞানামৃত সে-যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ছাড়া অপর কোনপ্রকার জ্ঞানে তৃপ্তি মানিতেন না। এইরূপ দেবস্পৃহনীয় জ্ঞানের যে কতবড় মহাফল—তাহা বারান্তরে বিবৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আসামীর কাটগড়ায়

সমাজের আঁধার কোণ

ছেলেটা আসামীর কাটগড়ায়। নালিশ—পকেট মারা। দেখিতে ভদ্রলোকের ছেলের মত। বড় বড় চোখ, লম্বা নাক, শ্যামবর্ণ। পরণে পাতলা ধুতি, গায়ে আধার পাঞ্জাবী, পায়ে কাদা মাখান কার্পেটের জুতা। মুখের উপর একটা ধূর্ত্তামির ছায়ার নাচ, যেন চাঁদের উপর পাতলা মেঘ। নাম, পুলিশের কাছে দিয়েছে, তারাপদ রায়। মোদ্দা কথা, ছোকরা, আদালতে হামেসা যে রকম ছেলে দেখা যায়—এ তা নয়। আসামীর পক্ষে উকীল মিষ্টার ঘোষ। পুরা নামটা অপ্রকাশিত, ইংরেজি পোষাকে ঢাকা। এখন আদালতে এই রকম রীতিই প্রচলিত।

ফরিয়াদীর নাম কৃষ্ণ পাল, নিবাস রাজগঞ্জ। ইঁদুর মারা কল কিনিবার জন্য ইনি নূতন বাজারে আসেন। হেঁট হইয়া কলচালনার প্রণালী শিখিবার সময় ইহার বুকের পকেট হইতে একটা দশ টাকার নোট বাহির করিতে গিয়া আসামী ফরিয়াদীর হাতে ধরা পড়ে, নোটটা পায়ের কাছে মাটীতে পড়িয়া যায়,—রসিক দে নামে একব্যক্তি নোট কুড়ায়। আসামীকে বামাল সহ পুলিশে দিয়ে নালিশের সূত্রপাত।

ফরিয়াদী, রসিক দে ও পাহারাওলার সাক্ষীতে অপরাধ আপাততঃ সপ্রমাণ বলিয়া চার্জ্জ হয়। উকীল মহাশয় আসামীর পক্ষে বলিলেন যে, সে নির্দ্দোষী।

হাকিম আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভদ্রলোকের ছেলে?"

আসামী বলিল, "আজ্ঞা, না।"

"ভদ্রলোক কাকে বলে জান?"

আসামী পশ্চাদ্দিকে মাথা হেলাইয়া বলিল, "হাঁ, জানি বৈকি। মাথায় টেরী, সোনার

বোতামওয়ালা ফিনফিনে পাঞ্জাবী গায়ে, কোঁচান ধুতি পরা, পায়ে পাম্প জুতো, কব্জীতে ঘড়ী,—বলামাত্র পকেট থেকে টাকা লাফিয়ে পড়ে—এই সব থাকলে ভদ্রলোক। চোকে চসমা থাক্ আর নাই থাক্।"

"তুমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কখন ব্যবহার করেছ ?"

আসামী পূর্ব্ববৎ বলিল, "কেন ? আমাদের বাড়ীতে অনেক ভদ্রলোক আসে।"

"তাঁরা তোমাকে কিছু বলেন ?"

"হাঁ, তামাক সাজতে, মদ কিন্‌তে।"

"তোমায় তাঁরা কখনও কিছু দেন ?"

"হাঁ, টাকা, আধুলি, সিকি। একজন একবার একখানা পাঁচটাকার নোট দিয়েছিল।"

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে সব তুমি কি কর ?"

"বাড়ীতে জমা করেছি। তা না দিলে খালি মার খেতে পাই। তাছাড়া, আমি বাজারের জন্য রোজ দুটো করে পয়সা পাই।"

হাকিম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুপয়সায় কি বাজার কর ?"

"তরী তরকারী, মাছ, ডিম—এইরকম।"

"দু-উ পয়সায় এত জিনিষ পাওয়া যায় ?"

"পেতেই হয়। না হইলে আমার খাওয়া বন্দ।"

"পয়সায় কুলায় আর নাই কুলায় বাজার আনতেই হবে। তা হলে তোমার উপর সহজেই চোর বলে সন্দেহ হতে পারে—না ?

"কেন, ভিক্ষা নাই ? এতবড় সহরে ভিক্ষায় কত টাকা আসে—জানেন না ?"

"যাক্, ভদ্রলোকের মেয়ে কখনও কি দেখেছ ?"

এবার ছেলেটার মুখ ধূর্ত্ততার মেঘ মুক্ত হইল। চোখে একটা অশরীরী নিরাশার আশা মাখা আলো জ্বলিয়া উঠিল। ভাবটা যেন এই—"যা হয়েছে তা কি আর হবে !"

আসামী মাথা হেঁট করিয়া নীচু স্বরে বলিল, "আমি যখন ছেলে মানুষ ছিলাম আমার মা আমাকে মাঝে মাঝে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেত। সেখানে একজন সাদা রেশমী কাপড় পরা ভদ্র লোকের মেয়ে আমাকে আদর করত, মাথায় হাত দিয়ে বলত, "যেমন তোর অদৃষ্ট। দেখিস্ যেন ভদ্রলোক হস্, লেখাপড়া শিখিস্, সোজা পায় চলিস্, ভগবান তোকে রক্ষা করবেন, লোক সমাজে দাঁড় করাবেন। মাঝে মাঝে বলতেন, ছেলে ঠিক বাপের মত হয়েছে।"

হাকিম একটুকু আশ্চর্য্যের সঙ্গে বলিলেন, "তুমি কি লেখাপড়া শিখেছ—এখন কি পড় ?"

"আজ তিন পুজো হল তাকেও আর দেখিনি আর পড়াশুনাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার আগে আমি মাষ্টারের কাছে পড়তুম। ইংরেজীও পড়েছি। A ccck has wings"—এই

সেদিন এই পর্য্যন্ত। পরের দিনের দিন আসামীর উকিল সাক্ষীর জেরা করিলেন। জেরার উদ্দেশ্য ছিল এই— যে ফরিয়াদীর পকেট হইতে নোট লইয়াছিল সে অন্য কেহ—আসামী নহে। এই জেরা শেষ হইলে হাকিম বলিলেন, "মিষ্টার ঘোষ, আপনি যথা সম্ভব আসামীর পক্ষ সমর্থন করেছেন। এখন দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি আপনার সঙ্গে একমত হতে না পারি তা হলে কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিন। আর এ ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসা করুন যে সে দোষী কি নির্দ্দোষী। তারপর দেখা যাবে কিসে ভাল হয়। আসামীর সহিত পরামর্শ করে, উকীল মহাশয় বলিলেন, "আসামী দোষ স্বীকার কচ্ছে। আপনি ওকে দু'চার ঘা বেত দিয়ে ছেড়ে দিন।"

"ছেড়ে ওকে কার কাছে দেব? "হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে উকীল মহাশয় আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কেন? ওর মা আছে। তার জিম্মে দিন। কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারা মতে আপনার ত সে ক্ষমতা আছে।

"ওর মা কোথা?

"এই আদালতেই আছে—বাইরে। ডাকছি।"

ডাক শুনে একটী স্ত্রীলোক এলেন। বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি, নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা, দু'হাত ভরা গহনা, পরনে পার্সি সাড়ী, রেশমী ব্লাউস। চলন সসম্ভ্রম। জিজ্ঞাসিত হইয়া স্ত্রীলোকটী মৃদুস্বরে আসামীর মা বলিয়া পরিচয় দিলেন। চেহারা, চাল চলন দেখিয়া প্রস্তাবিত সম্পর্কের সত্যতায় সন্দিগ্ধ হইয়া হাকিম একটু কড়া ভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি আসামীর গর্ভধারিণী মা, ও তোমার পেটের ছেলে" উত্তর আসিল, "আজ্ঞে না, আমি ওর ধর্ম্ম মা, জন্মাবধি মানুষ করেছি।"

"তোমাদের খাওয়া দাওয়া, খরচপত্র কি করে চলে"? হাকিমের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার উকীলের উপর সমর্পণ করিয়া স্ত্রীলোকটি হেঁট মাথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। উকীল ইংরেজিতে বলিলেন, "ইনি একজন ধনী ব্যক্তির রক্ষিতা"।

"সেই জন্যই দু'পয়সা দিয়ে সমস্ত দৈনিক বাজার করান হয়। যা হ'ক্, এখন কি আর এর হাতে ছেলেকে ছেড়ে দিতে বলবেন? পরামর্শ করে দেখুন আর কোন রকম ব্যবস্থা হতে পারে কি না। উপায়ান্তর অভাবে এই ছেলেকে হাজারীবাগের স্কুলে দিতে হবে—অন্যপথ দেখা যায় না।"

স্ত্রীলোকটিকে উকীল মহাশয় ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার জন্য হাকিমকে অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, উপযুক্ত জামীন সংগ্রহের জন্য মোকদ্দমা স্থগিত থাকে। তদনুসারে মোকদ্দমা এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রহিল। আসামী জামিনে খালাস।

দিনের দিন একটি ভদ্রলোক আসিয়া জামিন হইতে চাহিলেন। ভদ্রলোকটি হাকিমের

মনোরক্ষার জন্য আপনি পাঁচ শত টাকায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত আছেন? নতুবা এ ছেলেকে নিয়ে আপনি কি ভাবে রাখবেন যে, এর একবৎসরের ব্যবহারের জন্য নিজে দায়িক হচ্ছেন?"

"আমি আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। তা না হলে পূর্ব্বেই প্রকৃত অবস্থা জানাতাম। সময়ান্তরে সমস্ত কথা জানাব কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে নয়। আমি জামিননামা সই করে দিচ্ছি। এর বেশী আর আইনে কি চায়?"

"আচ্ছা, এখন আইন যা চায় সেই হুকুম হ'ল। তার পর ছেলেটির যাতে ভাল হয় সে বিষয়ের পরামর্শ হ'তে পারবে।" এই বলিয়া হাকিম উঠিয়া খাস কামরায় গেলেন। কিছু পরে চাপরাসীর হাতে একটী চিরকুট পাইয়া ভদ্রলোকটীও সেখানে উপস্থিত। সম্ভাষনান্তে হাকিম বলিলেন, "তারপর, হরেন্দ্র এ ব্যবসা ধরেছ কতদিন? কি সব কাজে জড়িয়ে পড়েছ আর তো দেখাই হয় না। এখন কি পাটনাতেই প্র্যাকটিস স্থির?"

"তুমিত জান সেই বিধবা ভগ্নীর পূর্ণিয়ার জমীদারীর মোকদ্দমা নিয়ে অনেক সময় পাটনাতেই কাটাতে হয়। তাই যখন পাটনাতেই অনেক সময় কাটাতে হল তখন ওকালতী করে দু' পয়সা রোজগার করায় ক্ষতি কি? পুরাণো মক্কেলদের জন্য এখানেও আসতে হয়। তবে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে দেখা শুনা অসম্ভব।"

"যাহক, আজ এই জামিনদারীর খাতিরে দেখা হয়ে গেল। আজ রাত্তিরে এসে খাওয়া দাওয়া করো। পুরাণো স্মৃতি ঝালানো যাবে। এখন এ ছেলেটীর কি করবে বলত? তোমার ঘাড়ে এ ভার কিসে পড়ল?"

"সে অনেক কথা। আমার সেই বালিগঞ্জের বাগানে একদিন একলা রাত কাটাতে গিয়েছিলাম। আমার সেকালের পাগলামী জানত? সে আজ প্রায় বার বৎসর হ'ল। রাত্তির ১১টা আন্দাজের সময় কোন কারণে ঘরের বাইরে গেছি এমন সময় ও পারের বাগানে একটী জোয়ান বয়সের ভদ্রলোক এসে ঝোপের ধারে কাউকে ধরলে বলে সন্দেহ হল। ঝোপের আড়াল বলিয়া দেখা গেল না কিন্তু নিস্তব্ধতা বশতঃ প্রত্যেক কথা স্পষ্ট শোনা গেল।

"আপনার পায়ে ধরছি আমাদের মুখচেয়ে আপনি এ কাজ করবেন না।" গলা শুনে জানা গেল আমার বাগানের প্রতিবাসী বেণী। কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা শিশি ভাঙ্গার শব্দ হল। যাক্, সমস্ত কথার প্রয়োজন নাই। মূল মর্ম্ম এই যে, বেণীর বাপ যদু বাবু আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে নির্জ্জনে এসেছিলেন। তার কারণ তাঁর অবিয়া বিধবা কন্যা মন্দাকিনীর গর্ভ, তার কর্ত্তা বেণীর শালা,—যে ভগ্নীপতির আশ্রয়ে থেকে বি-এল পাশ করে এখন বিদেশে জজকোর্টে উকিল। অনেক দুঃখ আক্ষেপের পর পিতা পুত্রে স্থির হল যে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যাবার পথে তাকে রাত্তিরে গাড়ী থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর ফিরে এসে রটনা হবে যে, দৈব দুর্ঘটনায় অপঘাত মৃত্যু। এই শুনে আমি তাড়াতাড়ি নর্দ্দামা ডিঙ্গিয়ে

তাদের সামনে গিয়ে সমস্ত কথা জানালাম। ভয় দেখালাম, যে কৃতসঙ্কল্প যদি ত্যাগ না করেন তো আমি পুলিসে খবর দিব। বৃদ্ধ যদুবাবু আমার হাতে ধরে কেঁদে বল্লেন, 'বাবা যাতে আমাদের মুখ রক্ষা হয় কর।' কলঙ্কের হাত এড়াবার অন্য সহজ উপায় আছে এই বুঝিয়ে আমি তাদের আশ্বস্ত করলাম। পরামর্শ স্থির হল যে, মন্দাকিনী কোন হাঁসপাতালে গিয়ে প্রসব হবেন আর তার পূর্ব্বে কোন কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়ী এলে কোন রকমে ওজর বাহানা করে দেখা করবেন না। তারপর যে রকম ছেলে হবে সেই বুঝে ব্যবস্থা করলেই সব দিক বাঁচবে। কাজেও তাই হল। মা হাঁসপাতাল থেকে ফেরবার পথে ছেলেকে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই ছেলে তোমার আসামী, তারাপদ রায়।"

হাকিম বলিলেন, "তুমিত আচ্ছা লোক দেখছি। একটা বেশ্যার হাতে ছেলেটাকে দিলে। উৎপত্তি যে রকমই হউক। ভদ্ররক্তে ত জন্ম। আত্মীয়েরাও অবস্থাপন্ন, ছেলেটাকে খ্রীষ্টিয়ানদের হাতে দিলে না কেন? তাহলে ওর একটা গতি হত। দাঁড়াবার জায়গা পেত।"

"ভাল হাকিম ত দেখছি তুমি। সমস্ত না শুনেই রায় দিচ্ছ। ছেলেটাকে ভাল জায়গাতেই রাখা হয়। তারপর ঘটনাচক্রে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তুমি আমার ভগ্নীপতি রাধানাথকে ত জানতে, যার পূর্ণিয়ায় জমিদারীর মোকদ্দমা নিয়ে আমায় দেশত্যাগী হতে হয়েছে,—তাদের এক প্রবীন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিল নিবারণ। বাড়ী উল্টাডিঙ্গির খালের ধারে। যখনকার কথা হচ্ছে তখন সে মারা গিয়েছিল। তখন তার ছিল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আর তার পেটের বিধবা মেয়ে, ষোড়শী। তোমার আদালতে এসে সে তারাপদর ধর্ম্ম মা বলে পরিচয় দিয়েছিল। ষোড়শীর স্বামী মানুষ ছিল না। নেশাখোর, সর্ব্ব রকমে দুশ্চরিত্র। তার ফলে একটী এক বছরের ছেলে রেখে সে অল্প বয়সে মারা যায়। ছেলেটা লিভারের ব্যারাম নিয়ে জন্মায় আর দেড় বছরের হবার আগেই মারা যায়। সেই সময়ে তারাপদকে তাদের জিম্মা দেওয়া হয়। ষোড়শী এই ছেলেকে পেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে তাকে আপনার ছেলের মতন পালন করে। টাকার অভাব ছিল না। যদুবাবু মাসে মাসে পোনের টাকা দিতেন। মন্দাকিনীর কাতর প্রার্থনায় মাঝে মাঝে গঙ্গার ঘাটে তাকে ছেলে দেখান হত। আজ প্রায় চার বৎসর হল মন্দাকিনী মারা যান, তার পরেই যদুবাবুর স্বর্গারোহণ ঘটে। ছেলের জন্য যে টাকা সে আমার হাত দিয়েই যেত। ছেলের প্রতিপালকদের সঙ্গে আমারই পরিচয়, অপর কার সঙ্গে তাদের দেখা শুনা ছিল না। আমি খবর রাখতাম যে ছেলেটার অযত্ন না হয় আর ছেলেটা যথাকালে পড়া শুনা করে। যদুবাবুর মৃত্যুর পর ছেলের বাপের সঙ্গে ব্যবস্থার ফলে ছেলের খরচ পত্রের অভাব হয় নাই। এখনও পোষ্ট আফিসের কেয়ারে মাসে মাসে মণি অর্ডারে টাকা আসছে। ছেলেটার কপাল ভাঙলো ষোড়শীর মা মারা যেতে। তার ছোট খুড়োর ছেলে এসে ওয়ারিশ সূত্রে উল্টাডিঙ্গির বাড়ী দখল করে ষোড়শীকে তাড়িয়ে দিলে। সেই বাড়ীর পাশের বাগানে যে বাবু ছিল সে মাতৃ বিয়োগ হইবারপর আশ্রয় দেওয়ার বাহানায়

ষোড়শীকে কিছুদিন তার কাছে রেখে শেষে পাপপল্লীতে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে তারাপদ। আমি পাটনা প্রবাসী বলে এর কোন খবরই পাইনি। খালি মাসে মাসে ষোড়শীর পাত্র পাই যে তারাপদর কুশল। গেল সপ্তাহে আমার ভগ্নীর পত্রে জেনেছি যে, ষোড়শী তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলেছে। আর আমার অন্য প্রয়োজনের জন্য এখানে আসতে হল তাই তোমার আদালতে এই দেখা।" "সে সব ত শুনলাম। এখন ছেলেটার কি করবে বল"—হাকিম হরেন্দ্র বাবুর দিকে সাগ্রহে চাহিয়া রহিলেন।

"ওকে বোর্ডিং স্কুলে দেওয়া হবে। ওর বাপের সঙ্গে স্থির হয়েছে। হাকিম বলিলেন, তারপর, ওকে খৃষ্টিয়ান বা মুসলমান হতে হবে। হিন্দু সমাজে ওর স্থান নাই।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন।

"যৎ বিধের্মনস্থিতং তৎ ভবিষ্যতি।"

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভাষা শিখিবার সহজ উপায়

ভাষায় শিক্ষানবীশির উদ্দেশে, একটা সমস্ত পরিচ্ছেদ—শেষ-পরিচ্ছেদটা কেন উৎসর্গ করা হইল?

দুই কারণে।

প্রথমতঃ, যেহেতু কোন ভাষার পূর্ণ অনুশীলন হইতেছে,—সমস্ত শিক্ষা-কলার একটা সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ-স্থল। উহার অনুশীলনে বিবিধ বাক্-ভঙ্গী শেখা যায়,—জিহ্বার বাক্-ভঙ্গী, কণ্ঠের বাক্-ভঙ্গী, ওষ্ঠের বাক্ ভঙ্গী, দন্তের বাক্-ভঙ্গ :—ইহাই উচ্চারণ। কতকগুলি তথ্যও শেখা যায়; যথা, শব্দ-কোষ ও বিভক্তি,—বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতেরা যাহার নাম দিয়াছেন :—(Morphology)-শব্দরূপ তত্ত্ব। বিচার সিদ্ধ পদ-যোজনা-প্রকরণ পর্য্যন্ত যদি অনুশীলনের সীমা নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে কতকগুলি সিদ্ধান্তও শিখিতে পারা যায়।

জার্ম্মান ভাষার গদ্য ও পদ্যের কলা-সৌন্দর্য্য ধরিতে না পারিলেও, গেতে ও হাইনের লীলাময় শব্দ ঝঙ্কার ও অভিনব শব্দ প্রয়োগের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিলেও, শুধু যদি শব্দের রূপতত্ত্ব, বাক্যের পদ-যোজনা-পদ্ধতি আয়ত্ত করা যায়—বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে জার্ম্মান ভাষায় কথা কহিতে পারা যায় তাহা হইলেও অর্দ্ধেক শেখা হইয়া যায়। Fenelon বলেন, "দুর্ভাগ্য তাহার যে নিম্নলিখিত পদাবলীর সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না :—Fortunate senex, ergo tua rura manebunt!" "হে ভাগ্যবান সুখী বৃদ্ধ! তোমার ক্ষেত্রগুলি বজায় থাকিবে।" প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তি ল্যাটিন জানে না। অতএব ভাষা শিক্ষা যার পর নাই "আর্টিষ্টিক্," অর্থাৎ উহাতে কলা-সৌন্দর্য্য প্রভূত পরিমাণে আছে···তুমি দেখিতে পাইবে, বুদ্ধিবৃত্তির যত প্রকার প্রয়োগ হয়, সেই সমস্ত প্রয়োগেরই নমুনা এই ভাষাশিক্ষায় কিছু না কিছু পাওয়া যায়।

এই শেষ পরিচ্ছেদটা ভাষা শেখার আলোচনায় যে উৎসর্গ করা হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় কারণ :—আজকাল, অন্ততঃ ফ্রান্সে, ভাষা শিক্ষার প্রণালী—এমন কি ভাষা শিক্ষার সুযোগ সম্বন্ধেও অনৈক্য দেখা যায়। আমি স্বীকার করি, যাহারা এই অনৈক্যের জন্য দায়ী, তাহার মধ্যে আমিও একজন। নিম্নলিখিত মতটিকে (আমাদের সামরিক বিপদের পর ইহার জন্ম) আমি তেমন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি নাই :—"সর্ব্বাগ্রে বিদেশী ভাষা।" কিন্তু আমি যখন বলিয়াছিলাম—"প্রথমে তোমার মাতৃভাষা ভাল করিয়া শেখো"—এই কথায় একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল।...এই সমস্ত প্রশ্নটা পুনর্ব্বার এইখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক মনে করি। স্থানাভাবে এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিটা একটু শুষ্ক হইলে আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়।

প্রশ্নটা বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

জীবন্ত ভাষাগুলা শিখিবার প্রয়োজনীয়তাটা কী ?

প্রাচীন ভাষাগুলা (ল্যাটিন ও গ্রীক) শিখিবার প্রয়োজনীয়তাটা কী ?

নিজের ভাষা ছাড়া, প্রাচীন ও আধুনিক অন্যান্য ভাষা শিখিবার জন্য কিরূপ শৃঙ্খলা অনুসরণ করিতে হইবে—কেমন করিয়া শিখিতে হইবে ?

* *
*

অনেকের মনে হয় (বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত) বিদেশী ভাষা শেখাই মানসিক উৎকর্ষ-সাধনের একটা সুনির্দ্ধারিত পন্থা। উহা নব-বধুর যৌতুকের অঙ্গীভূত একটা অংশ ; উহা বিবাহার্থী পুরুষের সামাজিক অবস্থা ও পদমর্য্যাদা বাড়াইয়া তুলে ; ঐ ব্যক্তি ফরাসীরই মত ইংরেজি পড়িতে পারে...ঐ ব্যক্তি তিন ভাষায় কথা কহিতে পারে...আর কি চাই।

প্রথমে এই মতবাদের জলদজালকে ছিন্ন করা যাক্। অমুক পুরুষ কিংবা অমুক রমণী যেভাবে বিদেশী ভাষা শিখিয়া থাকে, তাহার সহিত চিত্তোৎকর্ষসাধনের কোন সম্বন্ধ নাই।

দৃষ্টান্ত :

একজন তরুণী মহিলা আমাকে বলিলেন, "আমি ইংরেজী জানি।"

আমি তাঁহাকে Westminster-এ লইয়া গেলাম, পার্লেমেণ্টের এক অধিবেশনে তাঁহাকে বসাইলাম। সেখান হইতে বাহির হইয়াই তিনি স্বীকার করিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই!"...আমি তাঁকে মেরেডিথের একটা উপন্যাস দিয়া বলিলাম :—এই পৃষ্ঠাটা তর্জ্জমা করুন...তিনি প্রত্যেক লাইনে এক একটা শব্দ ও কথার ভঙ্গীর কাছে আসিয়া হোঁচট্ খাইতে লাগিলেন। গ্রন্থকারের চিন্তাধারার আসল মর্ম্ম ও ভাবের সূক্ষ্মতা শুধু যে বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে, কথার অর্থও বুঝিতে পারেন নাই। বিরক্ত হইয়া তিনি বইখানা

—"এটা বড় শক্ত···আমি আপনাকে নিশ্চয় বল্‌ছি আমি ইংরেজি খুব ভাল জানি। আপনি কি দেখেন নাই, হোটেলে, রাস্তায়,—কিছুই আমায় আট্‌কায় না?"

"আমি আপনার শব্দ সংগ্রহের উপকারিতার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারি; বাস্তবিকই এ সুবিধাটা উপেক্ষনীয় নহে। কিন্তু এস্থলে মনের উৎকর্ষসাধনের কথা যেন পাড়া না হয়। কেননা, হোটেলের দ্বার-রক্ষক ৬টা ভাষায় কথা কইতে পারে,—ঠিক আপনি যে ধরণে ইংরেজি বলেন:—কিন্তু একথা আমি আপনাকে নিশ্চয় করে' বল্‌ছি, তার জমকালো কাপড়ের জড়িজড়া সত্ত্বেও, তার মনের চাষ হয় নি।"

এই বড় সত্যটা বড় বড় অক্ষরে আমি লিখিয়া দিতেছি:—

"পরিবারের মধ্যে যে ভাবে বিদেশী ভাষার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে মনের উৎকর্ষ লেশমাত্র সাধিত হয় না।"

কেহ হয়ত বলিবেন:—

আচ্ছা তাহা স্বীকার করিলাম। চিত্তোৎকর্ষণের কথাটা আপাততঃ শিকায় তুলিয়া রাখা হোক্। কিন্তু বিদেশী ভাষার শিক্ষাটা যে খুব কেজো একথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? বিদেশে গিয়া যাহাতে ভ্যাবাচাকা খাইতে না হয়—তাছাড়া বাণিজ্য ব্যবসায়ের কাজে, শ্রমশিল্পের কাজে···

এই বিষয়েই আমাদের প্রশ্নকারীকে অনুসরণ করা যাক্। কিন্তু আমাদের সময় কম। তাই, যারা বিদেশী ভাষা শিক্ষা করে তাহাদের মধ্য হইতে দুইটি শ্রেণীকে পৃথক্ করা যাক্:—ধনী ও দরিদ্র।

মজ্‌লিশী যুবাপুরুষদের পক্ষে, বিদেশী ভাষার একটা সহজব্যবহার্য্য শব্দকোষ (দোভাষীদের ও হোটেলের দ্বাররক্ষকদের শব্দকোষ) ব্যবহার করা—এক-কথায় যাকে ইংরেজী জানা বলে, জার্ম্মান জানা বলে—ইহাই সৌখীন কলাসমূহের মধ্যে সব চেয়ে কেজো তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কেননা, আধুনিক জনসমাজ আসলে বিশ্বনাগরিক; বিদেশী ভাষা জানা থাকিলে, কি রোম, কি ভিয়েনা, কি লণ্ডন, কি প্যারিস—কথা কহিতে কোথাও আট্‌কায় না। সেইরূপ নাচিতে জানা, টেনিস্ খেলিতে জানা, বরফের উপর পিছ্‌লাইয়া চলিতে জানা, ব্রিজ খেলিতে জানা এ সমস্ত মজ্‌লিসের পক্ষে সুবিধাজনক। মনে করিও না আমি একটা আজগুবি কথার মধ্যে বেমালুম আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে আমি সাংসারিকদ্রব্যের কথা, সাংসারিক সুখসুবিধার কথা, সৌখীনতার কথাই বলিতেছি। সাংসারিক জীবনযাপন করাই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাহারা লোকের অভ্যর্থনা করে, এবং অন্য কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হয়, ঘোড়দৌড় অনুসরণ করে, শীকার করে, গল্পগুজব করে, প্রেমের ভাণ করে, এবং এই সব ছাড়া আর কিছুই করে না তাহাদের পক্ষেই ঐ সব জিনিস্ খুবই দরকারী...আবার বড় অক্ষরে এই কথাগুলি লেখা যাক্:—

"বিদেশী ভাষাশিক্ষা—হোটেলের দরোয়ানের ধরণের হইলেও—মজ্‌লিসী লোকদিগের পক্ষে, সৌখীন কলার মধ্যে সবচেয়ে কেজো।

এইরূপেই এই ভাষাঘটিত বিশ্বনাগরিতা সমাজের ভিতর এত প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সামাজিক পদ-মর্য্যাদার সোপানে যতই উঠা যায় ততই ইহার প্রতিপত্তি আরো বেশী। রাজ-পরিবারেরা ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। শুনা যায়, রাজকুমারেরা, রাজকন্যারা নাকি সব ভাষাতেই কথা কহিতে পারে। তাছাড়া, অনির্দ্দেশ্য একটা অদ্ভুত টান্ দিয়া,—যে টান্ কোনও জাতির ভাষাতেই নাই—উহারা সব ভাষাই বলিতে পারে। কিন্তু কোন একটা ঠিক্‌ঠাক্ ধরণের কথা, সূক্ষ্মভাবের কথা, উহারা ব্যক্ত করিতে পারে না।

বেশ কথা। রাজকুমার ও রাজকুমারী বড় ঘরের লোক,—এই ত একটা বৃহৎ শ্রেণী:—কিন্তু সমস্ত মানবমণ্ডলীর ইহা একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সামাজিক সোপানের অন্য প্রান্তে আর এক শ্রেণী আছে যাহা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক এবং উচ্চশ্রেণীর মতই চিত্তাকর্ষক: এই সকল লোক বিশ্বনাগরিক ভাবে কখনই জীবন যাপন করে না; উহাদের অবসর নাই, জীবিকার উদ্দেশে উহারা অধিকাংশ সময় উৎসর্গ করে।

এইসব লোককে বলা হয়:—বিদেশী ভাষা শেখো। উহার দ্বারা তোমরা সহজেই জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

আমি তাহার উত্তরে এই কথা বলি:—কড়াকড় করিয়া দেখিলে, কথাটা সত্য। তবে বিদেশী ভাষার উৎসাহী প্রচারক ও আত্মবিশ্বাসী অভিভাবকেরা মনে করেন এই জীবিকার দ্বারা বেশ একটু "বড় মানুষী" রকমে থাকা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একটা ডাহা মিথ্যা।

এইটে হইতেছে নিছক সত্য, আসল সত্য:—১৭ বৎসরের একজন ফরাসীছোগ্‌রা যে সচরাচর-ধরণের ও বাণিজ্যব্যবসায়ের উপযোগী জার্ম্মান জানে, সে তড়িঘড়ি, মহাজনের কুঠিতে, তর্জ্জমার আফিসে হয়ত ১৫০ টাকার মতো একটা কাজ পাইতে পারে। ১৬ বৎসরের কোনও বালিকা, সে যদি অধিকন্তু হরফ-লেখক হয় তাহা হইলে ইংরেজী ভাষার কৃপায় ঐ আফিসেই হয়ত ২০০ টাকা পাইতে পারে। প্যারিস-বাসী সামান্য গৃহের পক্ষে ১৬ বৎসর অথবা ১৭ বৎসর বয়সে ১৫০।২০০ টাকা অর্জ্জন করা খুবই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমি স্বীকার করি।

হাঁ, কিন্তু…আর ৫।১০ বৎসর অতিবাহিত হোক্। আমরা আবার দেখিব, আমাদের তরুণ বন্ধুদ্বয়—অনুবাদক ও হরফ-লেখক—ইহাদের মধ্যে একজন অভিধান খুলিয়া বসিয়া আছে, আর একজন তাহার কলের সামনে বসিয়া আছে। খুব ঠিকঠাক কাজ করিলে, বেশ অভিজ্ঞ হইলে, ছোগ্‌রাটি হয়ত পাইবে ৩০০৲ টাকা এবং বালিকাটি পাইবে ৩৫০৲ টাকা। এই পারিশ্রমিকের টাকা অনির্দ্দেশ্য ভাবে বাড়িয়া চলিতে পারে না, কেননা, উহাদের কাজটা একই রকম থাকে, কাজটার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

একটা ভাষা জানার দরুণ, তাহাদের ভাগ্য গোড়া হইতেই একজায়গায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে...

এখন উহাদের পাশেই দেখ,—এক বুদ্ধিমান ছোগ্‌রা—যে কেবল প্যারিসের কথিত ফরাসী ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাই বলে না—সে কোন বাণিজ্য কুঠির ম্যানেজারের হর্করার পদে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে প্রথমে নিযুক্ত হইল—ম্যানেজার দেখিলেন ছোগ্‌রাটি বেশ চালাক চতুর ও বুদ্ধিমান, অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ তিনি তাহাকে শক্ত কাজের ভার দিতে লাগিলেন;—অপরিহার্য্য মধ্যবর্ত্তীর পদে তাহাকে উন্নীত করিলেন, ক্রমে তাহার প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল—সব শেষে সে প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া উঠিল। এটাও একটা আজগুবি কথা বলিয়া মনে করিও না। অধিকাংশ বড় বড় আফিসে, এই ছাঁচের লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ সব আফিসের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে, ম্যানেজারদিগকে জিজ্ঞাসা কর—দেখিবে দশের মধ্যে একজনও বহুভাষাজ্ঞ নহে। অ্যামেরিকান ধনকুবেরদের সঙ্গে আমি কখনো একত্র বাস করি নাই; কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, তাঁহারা ইংরেজি ছাড়া আর কিছুই বলেন না...

মোট কথা:—নানাভাষা শিখিলে কাজকর্ম্মে যে সুবিধা হয় সে সুবিধাটা পরিণত হয় কিসে?—না, দরিদ্র হইলে, অল্প বয়স হইলে, ছোট ছোট কাজ সহজে পাওয়া যায়; কিন্তু নিশ্চয়ই উহাতে উন্নতির স্রোত বন্ধ হইবার একটা আশঙ্কা আছে, উহা বড় বড় বিষয়ে সিদ্ধিলাভে একটুও সাহায্য করে না।

কাজকর্ম্মের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিদেশী ভাষা শিক্ষার একটা খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা শুধু খুব ধনী ও খুব দরিদ্রের মধ্যেই আবদ্ধ। মজা এই, মধ্যবিত্ত লোকেরা যাহারা বড় একটা বিদেশে ভ্রমণ করে না, বিশ্ব-নাগরিকদিগের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, দোভাষী অথবা হরফ-লেখকের কাজ করিয়া যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় না, তাহারাও এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে উন্মত্ত! ইহার চমৎকার ফল হইয়াছে এই:—ইংরেজি ভাষার কতকগুলা খারাপ উপন্যাস পড়িবার জন্য, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক সুন্দরী ললনা ফরাসী শিক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়াছে।

এই বিদেশী ভাষা শিক্ষা-বাতিকের আর একটা শোচনীয় ফল হইয়াছে এই যে, আমাদের ছাত্রদিগকে এক সঙ্গে দুই ভাষা শেখানো হইয়া থাকে। এবং সাধারণতঃ যে ব্যক্তি এই বিদেশী ভাষা শিশুদিগকে শেখায় সে বিদেশী ভাষা সামান্যই জানে, আর ফরাসী ভাষাও ভাল জানে না। এইরূপ শিক্ষা শিশুদের মনের ভিতর কিরূপ গোলযোগ বাধাইয়া দেয় তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

*

* *

পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা ভাষা শিখিবার প্রচলিত ধরণ সম্বন্ধে :—উহা পারিবারিক ধরণ ও ব্যবসায় স্কুলের প্রচলিত ধরণ।

কিন্তু আর একটা ধরণ আছে। সে ধরণটা কি ?—না, নিজের ভাষা একবার ভাল করিয়া জানা হইয়া গেলে তারপর আর একটা ভাষায়, আর একটা সাহিত্যে আপনাকে দীক্ষিত করা, অভ্যস্ত করা। তখন বাস্তবিকই আপনার উন্নতি সাধিত হয় ; তখন মন বিস্তার লাভ করে, উৎকর্ষ লাভ করে। এ শিক্ষাসাধনা হোটেলের দারোয়ানের উপযোগী নহে। এই উদ্যম চেষ্টার একটু লম্বা দম্ চাই। নিজের ভাষা (যাহা দারোয়ান জানেনা) শিখিতে হইলে বহু প্রয়াসযত্ন চাই, সুপ্রণালী চাই, অধ্যবসায় চাই। মাঝামাঝি বুদ্ধির কোন ছাত্র, বিদেশে এক বৎসর থাকিলেই সেই দেশের সচরাচর কথিত ভাষা শিখিতে পারিবে। ঐ একই ভাষা সাহিত্যিক হিসাবে শিখিতে হইলে তাহার পক্ষে ৪।৫ বৎসরের অভিনিবেশ এ অধ্যবসায় খুব বেশী নহে...তখনই তাহার চিত্তোৎকর্ষ একটু গভীরতা লাভ করিবে। নিজের হিসাবেও সে লাভবান হইবে ; ঐ ভাষা জানার দরুণ, সে একটা ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিতে পারিবে, সম্মানাদি লাভ করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি বিদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত, সে মধ্যমশ্রেণীর এন্‌জিনিয়ারের মত জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে—Institute তাহাকে লুফিয়া লইবে।

অত উচ্চ আকাঙ্খা যাহার নাই—যে ব্যক্তি, যে আধুনিক ভদ্রলোক, ভাষা শিখিয়া শুধু আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে চায় সে কিরূপভাবে কাজ করিবে ?

এই মনে কর—তুমি প্রিয় পাঠক—তুমি কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিবে ?

প্রথমতঃ বিশ্বনাগরিক ধরণে তুমি ইংরেজি কিংবা জার্ম্মান ফর্‌ফর্‌ করিয়া বলিবার দিকে মন দিবেনা। আত্মোৎকর্ষের হিসাবে উহাকে শূন্য অঙ্কের সামিল গণ্য করিবে। তুমি যেরূপ শিক্ষার নিয়মে অভ্যস্ত, তাহ'তে, ৬।৭ মাস বিদেশে থাকিলেই, কিংবা Berlitz-এর স্কুলে অধ্যয়ন করিলেই, যে কোন বিদেশী ভাষা ইচ্ছা করিলেই শিখিতে পারিবে।

তোমার নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রকৃত জ্ঞানলাভের কথা যদি বল—আত্মোৎকর্ষের হিসাবে তাহা উপেক্ষণীয় আদৌ নহে।

কিন্তু একথা ভাবিয়া দেখিবে, অনেকগুলি ভাষা শিক্ষার পক্ষে জীবনটা খুবই স্বল্পস্থায়ী ; নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিক্ষা করা অতীব শ্রমসাধ্য ; অন্য দুইটা ভাষা শিক্ষা করা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ইহার দরুণ নির্ব্বাচন নিতান্তই আবশ্যক :—নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা ভাল করিয়া শিখিলে, সাহিত্য হিসাবে উহার জ্ঞান অর্জ্জন করিলে, উহার ফলে,—আর যাই হোক—একটা উচ্চ মানসিক গঠন হয়, ব্যক্তিত্বের খুব একটা প্রসার হয়।

এখন যদি কোন ফরাসী পাঠক এই নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাহেন, আমি একটুও ইতস্তত না করিয়া এইরূপ উত্তর দিব :—

ফরাসী ভাষা বেশ আয়ত্ত হইয়া গেলেই, ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা কর। তোমার প্রথম

বিদেশী ভাষা যেন ল্যাটিন ভাষাই হয়। এই ল্যাটিন ভাষা শিক্ষাকল্পে একটা পদ্ধতিতে, একটা অপরিবর্ত্তনীয় পদ্ধতিতে, একটা সহজ পদ্ধতিতে আপনাকে অভ্যস্ত কর; ইহার দ্বারা তুমি আর সমস্ত বিদেশী ভাষা শিখিতে পারিবে, পরে এই পদ্ধতিই অন্য বিদেশী ভাষার শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে পারিবে।

প্রথমে ল্যাটিনই কেন ?

আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি :—

"এই নির্ব্বাচনের হেতু তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে; একটা বলবৎ হেতুর কথা বলি,—ইহাতেই সন্তুষ্ট থাক :—ল্যাটিন শিখিলে, ফরাসি শীঘ্রই শেখা যায়।

শুধু (tres grand) খুব বড় না বলিয়া, কেন স্থলবিশেষে (immense) "প্রকাণ্ড" বলিতে হইবে, যেমন করিয়া (douter) সন্দেহ করা এই ক্রিয়া হইতে বিশেষণ (indubitable) "নিঃসন্দেহ" উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি।

তাছাড়া সাধারণ শিক্ষানবীসের শিক্ষাপদ্ধতির অনুশীলনের পক্ষে ল্যাটিন,—বিদেশীভাষার একটা উত্তম আদর্শ। কি ভাষার মূল-প্রকৃতির হিসাবে, কি শব্দের হিসাবে, ল্যাটিন ফরাসীর খুব কাছাকাছি হইলেও, বিভক্তি ও ধাতুরূপের দরুণ উহা খুবই ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; এবং ল্যাটিনের পদবিন্যাস পদ্ধতির সহিত, ফরাসী পদবিন্যাসপদ্ধতির আদৌ মিল নাই। ইহার দরুণ বিশ্লেষণ বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক হয়।"

আরও এই কথা বলি, ল্যাটিন ভাষা মানসিক উৎকর্ষসাধনের যে অবসর দেয় তাহা গ্রীক ছাড়া আর কোন ভাষা দিতে পারে না।

ইহা একটা মস্ত সভ্যতার ভাষা এবং এই সভ্যতার ইতিহাস সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ল্যাটিন ভাষা, ল্যাটিন সাহিত্য, ল্যাটিন ইতিহাস আয়ত্ত করিলে, মনের একটা দৃঢ়তা হয় নিঃশঙ্কভাব হয়, একটা অতুলনীয় নিরুদ্বেগের ভাব হয়। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু আয়ত্ত করা যায়—একটা কিছু যাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হইবে না। জীবিত ভাষাগুলার সম্বন্ধে এরূপ কিছুই দেখা যায় না।

Voltaireএর বন্ধু দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক আমাদের ভাষা খুব ভাল করিয়া জানিতেন। কিন্তু Chateaubriand না পড়িয়া, Flambert না পড়িয়া, Balzac না পড়িয়া সমস্ত ফরাসী ভাষার ধর্ম্মভাব কি তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ?

*
* *

নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা কেমন করিয়া শেখা যাইতে পারে ?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কি প্রাচীন কি আধুনিক—উভয় ভাষা শিক্ষার প্রণালী একই :—

প্রথমে, স্মৃতি ও বুদ্ধিপূর্ব্বক শাব্দিক অভ্যাসের দ্বারা শব্দকোষ ও বিভক্তি শিক্ষা করা। কথা বার্ত্তা শুনিয়া ও পুস্তক পড়িয়া ব্যাকরণের গোড়ার নিয়মগুলা লক্ষ্য করিয়া দেখা।

অভিধান ও ব্যাকরণ চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা। ভাষা শিক্ষা হইয়া গেলে (কথাটা আজগুবি বলিয়া মনে করিও না) তারপর অভিধান ব্যাকরণ বাহির করিবার সময় আসিবে।

অভিধান ও ব্যাকরণকে বাদ দিতে বলিবার অভিপ্রায় আমার এই :—

কলেজের ক্ষুদ্রচেতা ক্ষুদ্র ল্যাটিন-পণ্ডিতদিগের একটা বর্ব্বর ধরণের প্রকরণ এই যে,—অভিধান হইতে উহারা একই শব্দ শতবার খুঁজিয়া বাহির করে, আর শতবার ভুলিয়া যায়। কথোপকথনের সাহায্যে ও সুশিক্ষকের মৌখিক বক্তৃতার সাহায্যে (মধ্যবিত্ত ফরাসীরা যেমন নিজের ছেলেমেয়েদিগকে জর্ম্মান ও ইংরেজি শিখাইবার জন্য একজন পাচিকাকে নিযুক্ত করে—এ যেন সেরূপ শিক্ষা না হয়) শব্দকোষ অব্যবহিতভাবে শেখা উচিত...এই পদ্ধতি যেরূপ ল্যাটিনের পক্ষে খাটে, গ্রীকের পক্ষে খাটে, সেইরূপ জীবিত ভাষাদিগের পক্ষেও খাটে। কোন ভাষা ১৫ শতাব্দী যাবৎ কথিত না হউক, তথাপি উহা চিরকালই ভাষা বলিয়া পরিগণিত। মানুষের কথা চালাচালির জন্য ভাষাই একমাত্র সাধনোপায়। শব্দ শুনিবার আগে শব্দ পাঠ করা এবং শব্দ উচ্চারণ করিবার আগে শব্দ লেখা—ইহাতে করিয়া বাক্য চালাচালির জোরটা কমিয়া যায়। যে যুগে সকল দেশের কৃতবিদ্য লেখকেরা প্রকৃতপক্ষে ল্যাটিন জানিত একমাত্র সেই যুগেই ল্যাটিন স্কুলের প্রচলিত ভাষা ছিল। এইরূপেই আমাদের Montagueকে শেখানো হইয়াছিল। তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য ল্যাটিনভাষাভিজ্ঞ একজন জার্ম্মান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই শিক্ষক ল্যাটিন ছাড়া আর অন্য কোন ভাষাতেই তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না। কিছুকাল পরে এমন হইয়াছিল যে মনে একটা আবেগ উপস্থিত হইলে, ফরাসী শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বাহির না হইয়া ল্যাটিন শব্দ বাহির হইত। প্রণালীটা চমৎকার, কেননা ল্যাটিন্ই ফরাসীভাষার স্বাভাবিক উপক্রমণিকা।

কিন্তু এটা লক্ষ্য করিও যে, Montaguer ল্যাটিন অধ্যাপক খুব একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। সফল প্রয়োগের পক্ষে, অব্যবহিত প্রণালী অনুসরণের জন্য, একজন খুব শিক্ষিত অধ্যাপক চাই—খামখেয়ালিভাবে নহে পরন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়া চাই। প্রত্যেক বাক্য বুঝা হইলে, পঠিত হইলে, উচ্চারিত হইলে, তাহার পরেই উহার ব্যাকরণ সংক্রান্ত নিয়মাদি লক্ষ্য করিয়া দেখা চাই :—এইরূপেই ছাত্রের মনে শব্দকোষের সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাকরণ গড়িয়া উঠে।

৭ বৎসর বয়সে মাতৃভাষা জানিবার মত একবার যদি কোন বিদেশী ভাষা তোমার জানা হয়—অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ শব্দকোষ তোমার আয়ত্ত হয়—বিভক্তি ও ভাষার গঠনভঙ্গী তোমার নিকট সুপরিচিত হয়, তখন মাতৃভাষারই মত বৈশ্লেষনিক ও সাহিত্যিক আলোচনার

তখন একটা সুলিখিত ব্যাকরণ কাজে আসিবে।

তখন, অভিধানের সাহায্যে (কেন না, একটা ভাষার সমস্ত শব্দকোষ কথোপকথনের ভিতর পাওয়া যায় না) প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারিবে, অনুবাদ করা যাইতে পারিবে। ইহা হইতে এক সঙ্গে দুইটি সুফল উৎপন্ন হয়। বিশ্লেষণ বুদ্ধি খাটানো হয়, এবং তোমার নিজের ভাষা ব্যবহারেও পটুতা জন্মে···

এইরূপেই ল্যাটিন শেখা যাইতে পারে, ইচ্ছা করিলে এইরূপেই গ্রীক শেখা যাইতে পারে। বেশ অনর্গলভাবে ল্যাটিন বলিতেছে এরূপ অনেক পাদ্রি সহজেই পাওয়া যায়। অ্যাথেন্‌সের উপাধিধারী গ্রীক অধ্যাপকমাত্রেই (সেকন্দর-শা যে গ্রীক বলিতেন) প্রাচীন গ্রীক্ শিখাইতে পারেন। আর জীবিত ভাষা সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা কর, ঐ জীবিত ভাষার শিক্ষক মেলা ত আরও সহজ। এ কথা স্বপ্নেও মনে করিও না যে একজন দাসীর নিকটে বিদেশী ভাষা শেখা যাইতে পারে। কোন আধুনিক ভাষা শিক্ষার পক্ষে, ঐ ভাষার দেশে কিছুদিন বাস করা নিশ্চয়ই খুব ভাল, তবে কিনা, সে শুধু কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে, সুশিক্ষিত দিগের মধ্যে, শিক্ষকদিগের মধ্যে বাস করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। যেমন মনে কর সেই দেশের কোন এক অধ্যাপকের বাড়ীতে গিয়া বাস করা। এই সব অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রীতিমত খাটিয়া-খুটিয়া তবুও যদি ছ'মাসের মধ্যে প্রথম সোপান ডিঙ্গাইতে না পারা যায় তাহা হইলে উহা নিতান্তই অমার্জ্জনীয়। ৭ বৎসরের সুশিক্ষিত বালক যে প্রকারে তাহার মাতৃভাষা জানে সেইরূপভাবে কোন বিদেশী ভাষা জানাই ঐ ভাষাশিক্ষার প্রথম-সোপান।

*
* *

এইবার আমরা এই দীর্ঘ পরিচ্ছেদের শেষে—সেইসঙ্গে গ্রন্থের শেষে আসিয়া পড়িয়াছি। কি ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে, কি সাধারণ শিক্ষার কলাকৌশল সম্বন্ধে—আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারিত, সে বিষয়ে আমি প্রতিবাদ করি না...প্রত্যেক শিক্ষানবীসের পক্ষে এইরূপ একটি গ্রন্থ যথেষ্ট নহে।

কিন্তু আমরা যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি, তাহা যে একেবারেই কিছুই নহে—এরূপ ধারণা আমার নহে।

প্রিয় পাঠক, তুমি বোধ হয় স্বীকার করিবে, কোন গ্রন্থই একেবারেই নিরর্থক নহে!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাজচিন্তায় নবীন দর্শন

(ধনদৌলতের রূপান্তর নামক অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকা)

প্যারিসের "সুহ্বেল রেহ্বিয়্য" নামেক পত্রিকায় পোল লাফার্গ প্রণীত ধনদৌলতের ক্রমবিকাশ বিষয়ক প্রবন্ধগুল ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। ফ্রান্সের এবং ইংলাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন জগতে এই রচনাবলী তারিফ করিয়া সেই সময়ে অনেকে নানা কথা লিখিয়াছিলেন।

বিলাতী বিজ্ঞান-লেখক হাক্স্লে ফরাসী প্রকৃতিপূজক সমাজলেখক সাহিত্যবীর রুসো কর্তৃক প্রচারিত মানবজাতির সাম্য ও ঐক্যের বিরুদ্ধে কলম চালাইয়াছিলেন। হাক্স্লের মত খণ্ডন করিয়া লাফার্গ প্রাচীন সমাজে সুপ্রচলিত ধনসাম্য এবং যৌথ সম্পত্তির ব্যবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। লণ্ডনের "ডেলি নিউজ" এবং "ডেলি টেলিগ্রাফ" ইত্যাদি দৈনিক পত্রে জাতিগত ধনদৌলত বিষয়ক তথ্যগুলা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তখনকার দিনে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে জার্মানির সোস্যালিষ্ট পন্থী রাষ্ট্রীয় দলের তত্ত্বাবধানে "সোৎসিয়ালে ডেমোক্রাটিশে বিব্লিওটেক" নামে সমাজ—সাম্যধর্মের গ্রন্থাবলী বাহির হইত। লাফার্গের গ্রন্থ তাহার অন্তর্গত হইয়া জার্মান আকারে দেখা দেয়। তাহার পর ইংরেজি, ইতালীয়ান, পোলিষ ইত্যাদি নানা ইয়োরোপীয় ভাষায় লাফার্গের তথ্য এবং মত প্রচারিত হইয়াছে।

১৮৯০ সালের "ফাসিও ওপেরাইয়ো" নামক ইতালীয় মজুরপন্থী রাষ্ট্রীয় দলের দৈনিক কাগজের এক সংখ্যায় সম্পাদক বলিতেছেন, "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা অনুসারে লাফার্গ ধনদৌলতের জন্ম এবং ধারাবাহিক রূপান্তর গ্রহণ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

সেই বৎসরই জার্মান সোশ্যালিষ্ট দলের "সোৎসিয়াল ডেমোক্রাট" নামক দৈনিকে নিম্ন লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়—"লাফার্গের পড়া শুনা আছে বিস্তর। প্রাগৈতিহাসিক যুগ বা মান্ধাতার আমল সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বিশেষরূপেই উল্লেখ যোগ্য। নৃতত্ত্ববিদ্যার নানাবিধ তথ্যের আলোচনায় ও ইনি সময় দিয়াছেন। কাজেই ধনদৌলতের ইতিহাস রচনার পক্ষে লাফার্গের যথেষ্ট যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। এই কেতাব যিনিই পড়িবেন তিনিই অনেক কিছু শিখিবেন এবং অনেক নূতন দিকে চিন্তা করিবার ইঙ্গিত ও সাহায্য পাইবেন।"

২

জার্মান কার্লমার্ক্‌স প্রণীত "কাপিটাল" (পুঁজি) গ্রন্থ লাফার্গের চিন্তায় বেদ বাইবেল কোরাণ স্বরূপ। কাজেই এই গ্রন্থের এক বয়েৎ লাফার্গের বইয়ের মলাটেই স্থান পাইয়াছে।

মার্কস হইতে উদ্ধৃত বাণী এই,—মানব সমাজের আর্থিক কাঠামের উপরই নরনারীর

স্মৃতি ও নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ আইন কানুন এবং রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আর্থিক জীবনের মাফিকই মানুষেরা সামাজিক জীব হিসাবে সু-কুর চিন্তা করিয়া থাকে। এক কথায় বলিতে পারি যে, মানুষের সামাজিক রাষ্ট্রীয় এবং আত্মিক জীবন তাহার ধনোৎপাদন প্রণালীর প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভাবার্থ :—ভাত কাপড়ের বিধি ব্যবস্থা অথবা জীবনের আর্থিক ধাক্কা যাঁহারা আলোচনা করেন না তাঁহারা কোনো জাতির দর্শন, ধর্ম্ম, সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, রীতিনীতি, জাতিভেদ, দলাদলি, "জমিদারি-মহাজনি," আচার বিচার, আইন আদালত, পুলিশ-পল্টন ইত্যাদি কিছুই পুরাপুরি বুঝিতে অসমর্থ। ইহার নাম "ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা" অথবা "সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি।"

লাফার্গের চিন্তায় আর একজন পণ্ডিত যুগাবতার বিশেষ। তাহার নাম, মর্গ্যান। এই ইয়াঙ্কি নৃতত্ত্ববিদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "এন্‌শেন্ট সোসাইটি।" (প্রাচীন সমাজ)। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নৃতত্ত্বসেবীরা বিশেষতঃ ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যাকারেরা এই কেতাবের ইজ্জৎ আর একখানা বেদ-বাইবেল-কোরাণের কোঠায় আনিয়া ঠেকাইতেন। মর্গ্যান-পূজা আজও কম বেশী প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু চলিতেছে।

লাফার্গ-উদ্ধৃত মর্গ্যানের এক সূত্র বর্ত্তমান কেতাবের মলাটেই খোদা দেখিতে পাই। মর্গ্যান বলিতেছেন :—"ধন দৌলত বিষয়ক চিন্তাধারার ক্রম বিকাশ বেশ খুঁটি নাটির সহিত সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইলে আমরা মানবজাতির আত্মিক (মানসিক) ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ঘরে আলোক ফেলিতে পারি।"

ধন বিজ্ঞান বিস্তার আলোচনায় মার্কস্ যে সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন সেই সিদ্ধান্তেই মর্গ্যান স্বাধীনভাবে নৃতত্ত্ব আলোচনার পথে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। মার্কস্-মর্গ্যানের সমাজ-দর্শন বর্ত্তমান জগতের অন্যতম বিশেষত্ব।

৩

জার্ম্মাণ এঙ্গেল্‌স প্রণীত "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" লাফার্গের ধন দৌলত বিষয়ক রচনার অগ্রদূত। এঙ্গেলসের গ্রন্থে যে সকল তথ্য আংশিক রূপে আলোচিত হইয়াছিল সেইগুলার উপর সকল নজর ফেলাই লাফার্গের উদ্দেশ্য। মার্কস-মর্গ্যানের সমাজ-দর্শন এই দুই কেতাবের সাহায্যে অনেকটা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

এই নবীন সমাজ চিন্তার সঙ্গে সজীব ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য বই দুইখানা ঘাঁটা দরকার। এই বুঝিয়া কেতাব দুইটা একসঙ্গে বাংলায় প্রচারিত করা গেল।

এই ধরণের রচনা ভারতীয় সাহিত্যে নাই। মারাঠী, পঞ্জাবী, মাদ্রাজী পণ্ডিতেরা ইংরেজিতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার ভিতর এ ধাঁচের কোনো চিজ ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। উর্দুতে শুনা যায় ইয়োরামেরিকান সমাজদর্শনের অনেক কেতাবই নাকি অনূদিত আছে। তাহার ভিতর মার্কস-মার্গ্যান তত্ত্ব ঠাঁই পাইয়াছে কিনা বলিতে

পারি না। হিন্দিতে ও যতটুকু পাড়িয়াছি শুনিয়াছি তাহার ভিতর এসবের নাম গন্ধ পাই নাই।

বাঙ্গালীরা ইংরেজিতে বাংলায় এই দিকে কখনো কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মৌলিক গ্রন্থ ত নাই-ই-বোধ হয় তর্জ্জমা ও বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করে নাই।

৪

বাঙ্গালীর সমাজ-চিন্তা দু'এক কথায় জরীপ করা যাউক। সেকালে ভূদেব "পারিবারিক প্রবন্ধ" "সামাজিক প্রবন্ধ" "আচার প্রবন্ধ" ইত্যাদি গ্রন্থের রচনা করেন। বঙ্কিম সাহিত্যের প্রবন্ধ বিভাগে সমাজ দর্শন বাদ পড়ে নাই। রামেন্দ্র সুন্দরে মাথায় নানা প্রকার চিন্তাই কিলবিল করিত। তাঁহার কোনো কথায় সমাজ বিষয়ক আলোচনা বাহির হইয়াছে। তাহা ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের এখানে ওখানে সমাজ লইয়া নাড়া চাড়া করিবার যুক্তি খেলিয়াছে।

খাঁটি সাহিত্যপদ-বাচ্য রচনা অর্থাৎ কাব্য নাটক উপন্যাস ইত্যাদির খতিয়ান করা হইতেছে না। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক লেখার কথাই বলা হইতেছে। যে চার জনের বাংলা লেখার উল্লেখ করা হইল এই ধরণের আরও বাঙালী লেখক ইংরেজিতে এবং বাংলায় সামাজিক জীবন লইয়া কিছু কিছু লিখিয়াছেন সন্দেহ নাই। সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

ভূদেব, বঙ্কিম, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি সকলের মাথায়ই দুনিয়ার সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। রামমোহনের কাল পূর্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙালীই গোটা জগতের উঠানামা, প্রাচ্যপাশ্চাত্যের তুলনা সাধন, বিশ্বসভ্যতার ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান, এক কথায় মানবজাতির ক্রমবিকাশ ইত্যাদির ভাবনা ঘাড়ে না লইয়া তিষ্টিতে পারেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা,—মানুষের পেটে যে ক্ষিধে পায়, এবং ক্ষিধে পাইলে অতিকষ্ট হয় এই সোজা কথাটা ইঁহাদের কাহারও মগজে প্রবেশ করে নাই। মধুচ্ছন্দার আন্তনের মাথায় ও যে ভাতকাপড়ের ধাক্কা আছে এই ধরণের কোনো বাঙালী দার্শনিকের প্রচারিত জীবন সমালোচনায় বা বিশ্বসমালোচনায় আজপর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিনা। এঙ্গেল্‌স্-লাফার্গের তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলা যুবক ভারতের গবেষক, লেখক ও স্বদেশসেবকগণের চোখে আঙ্গুল দিয়া তাঁহাদের একটা মস্ত অসম্পূর্ণতার মুলুক দেখাইয়া দিবে।

৫

এঙ্গেল্‌স্ লাফার্গের তথ্যগুলা ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিষয়ক। এই দুই ঘরের বস্তুই গোটা ভারতে বিরল। প্রথমত ইতিহাস বলিলে আমরা বুঝি একমাত্র ভারতবর্ষের কথা। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও আমরা সবে "হাতে খড়ি" সুরু করিয়াছি মাত্র। এই হাতে খড়ির যুগে চলিতেছে "প্রত্নতত্ত্বে"র আরাধনা। ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব এক জিনিষ নয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত ইতিহাস নামে যাহা কিছু চলিতেছে তাহা ইতিহাসের কাঠাম স্বরূপ প্রত্নতত্ত্ব। তাহা ইতিহাস নয়। খোট্টা বাদশা চন্দ্রগুপ্ত খড়ম পায়ে চলিতে চলিতে পল্টনকে ব্যূহ রচনার হুকুম করিতেন কি মেগাস্থেনীসের মারফৎ এসিয়া মাইনরের বাজার হইতে বুট আনাইয়া গ্রীক-মার্কা জুতা পরিয়া ঘোড় সওয়ার হইতেন; আওরাংজেব সকালে উঠিয়া বদনা হাতে পায়খানায় যাইতেন কি গাড়ু হাতে নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি পালন করিতে বসিতেন; বাঙালী সেনাপতি সোমনাথের নেতৃত্বে একসঙ্গে কত হাজার ফৌজ যুদ্ধ শিল্পে ওস্তাদ হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত, নেপালী দোঁহাগুলা বাংলা না প্রাকৃত, য়ুয়ান চুয়াঙের মাথায় টিকি শোভিত কি না, যৌবন ধর্ম্মের অবতার, অসাধ্য সাধনের প্রতিমূর্ত্তি ভাবুকশ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু কর্ম্মবীর শিবজি লোকটা নেহাৎ গণ্ডমূর্খ ছিল কি না,—এই সকল প্রশ্নের খাঁটি জবাব জানিবার প্রয়োজন আছে। সন তারিখ সমন্বিত ভাবে এই ধরণের লাখ লাখ খুটনাটি না জানিলে ইতিহাসের গোড়ায় আসিয়া পৌছানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই গুলোকে ইতিহাস বলিলে ভুল করা হইবে।

৬

মানুষের জীবনটাকে বুঝিবার প্রয়াস যেখানে নাই সেখানে ইতিহাস নাই। জীবনটাকে বুঝায় আর জীবন সম্বন্ধে কতকগুলা তথ্য আবিষ্কার করায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। ভারতবাসীর জীবনটাকে ধারাবাহিকরূপে "বুঝিবার" অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিবার ও সমালোচনা করিবার প্রয়াস কোনো লেখকই করেন নাই। এদিকে যেটুকু প্রয়াস হইয়াছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

কতকগুলা হাড়মাস, শিরানাড়ী, পেশীরক্তের জবরজঙ একত্র করিতে পারিলেই একটা জ্যান্ত জানোয়ার বা মানুষ খাড়া করিয়া তোলা যায় না। "অ্যানাটমি"তে চাই "ফিজিঅলজির" দস্তুল। তাহা হইলেই মরা হাড়ে ভেল্কি খেলিতে পারে, অর্থাৎ রক্তমাংসের জীবজন্তু পয়দা হয়।

প্রত্নতত্ত্বকে ইতিহাসে পরিণত করিতে হইলে এই ধরণেরই দস্তুল দরকার। কাঠখোট্টা পাণ্ডিত্য ছাড়া প্রত্নতত্ত্ব জন্মিতেই পারে না। কিন্তু একমাত্র পাণ্ডিত্যের জোরে ইতিহাস সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাহার জন্য চাই চিত্ত বিজ্ঞানে আধিপত্য, তাহার জন্য চাই বিশ্বশক্তিগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা তাহার জন্য চাই হিংসাধর্ম্মী, বিজিগীষু শক্তিধর মানবের সনাতন অধ্যবসায়ের গতিবিধি দেখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাচিবার লাফাইবার উন্মাদনা। অর্থাৎ মেজাজ যাহার তাতিয়া উঠে না মাথাটা যাহার টগবগ করিয়া ছুটিতে শিখেনাই সে ব্যক্তি রক্তমাংসের মানুষের প্রাণস্পন্দনের সম্মুখে "রাগদ্বেষ বহিষ্কৃত" এবং নির্ব্বিকার থাকিতে। অর্থাৎ ইতিহাস রচনা তাহার কোষ্ঠীতে লেখে নাই।

ভারতীয় সাহিত্য হইতে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রত্নতত্ত্বের মালমশলায় ফিজিঅলজির দস্তুল লাগাইবার দৃষ্টান্ত বাহির করা কঠিন। এলাহাবাদের মেজর বামনদাস বসু

১৭৫৭ সালের পরবর্ত্তী শতবৎসরের ভারতকথায় কিছু কিছু দস্তুল দিতেছেন। লাজপত রায় জেলে বসিয়া প্রাচীনভারত সম্বন্ধে একখানা কেতাব তৈয়ারি করিয়াছেন। তাহাতেও ঐতিহাসিক দস্তুলের কিছু পরিচয় আছে। আর সে কালের চিন্তাবীর মাধব গোবিন্দ রাণাডে মারাঠা জাতির জীবন তথ্য আলোচনা করিবার সময় ভারতবাসীর জন্য কিছু কিছু দস্তুল বাটিয়া গিয়াছেন। আর সেই দস্তুল প্রয়োগের প্রয়াস যৎকিঞ্চিত দেখিতে পাই রমেশচন্দ্র দত্তের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যা কার্য্যে।

এই চার লেখকের কোনো রচনাই বাংলা ভাষার গৌরব নয়। সুতরাং ইতিহাস রচনায় যেটুকু আংশিক আরম্ভ ভারতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। কাজেই ঐতিহাসিক তথ্যমূলক এঙ্গেল্‌স্ লাফার্গের রচনাগুলির মতন সাহিত্য তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা—বাংলা দেশে দেখিতে পাইনা।

৭

এঙ্গেল্‌স্-লাফার্গের রচনাবলী—কোনো একদেশের তথ্যে ভরা নয়। মান্ধাতার আমলে যে সকল সভ্য অসভ্য জাতি দুনিয়ায় দাগ রাখিয়া গিয়াছে আর ইতিহাস-পরিচিত নানা যুগে দুনিয়ার নানা মুল্লুকে যে সকল সমাজ উঠাবসা করিয়া আসিতেছে, অধিকন্তু স্যাভেজ, বার্ব্বার ইত্যাদি নামে যে সকল অসভ্য জাতি আজও জগতের পথে বিপথে চলা ফেরা করিয়া থাকে,-সেই সকল নানা দেশবাসী—নানারক্তজ নরনারীর জীবন কথা এই সকল লেখার আলোচ্য।

এই ধরণের কেতাব বাঙালীর পক্ষে লিখিবার যোগ্যতা কোথায়? এইমাত্র বলিয়াছি প্রত্যেক বাঙালী মনস্বীকেই দুনিয়ার ভাবনা ভাবিতে হইয়াছে। আসল কথা এই ভাবনাটা অতি ভাসাভাসা হাল্কা ও তরল। বিদেশ সম্বন্ধে যত খানি নিরেট জ্ঞান থাকিলে মানুষ সজীবভাবে বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর আশাহর্ষ সু-কু আলোচনা করিতে অধিকারী হয় এতখানি জ্ঞান বাংলার জ্ঞানমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে নাই।

ভূদেব বোধহয় ইস্কুলপাঠ্য কেতাব হিসাবে গ্রীস এবং ইংল্যণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন ইহাতে স্বদেশের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্য্যন্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গ্রীক ও হিন্দু" সে যুগের এক তুলনামূলক গ্রন্থ আজকাল গ্রীকভাষা হইতে রজনীকান্ত গুহ মেগাস্থেনীস এবং সোক্রাতিসের রচনাবলী বাংলায় আনিয়াছেন ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক কথা কিছু কিছু পাওয়া যায় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কেতাবে। অধিকন্তু জাপান এবং আমেরিকা সম্বন্ধে দুএক খানা ভ্রমন বৃত্তান্ত ও বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় বিদেশী তথ্য লইয়া আলোচনা চালাইবার দৌড় বাংলায় এই তালিকা ছাড়াইয়া যায় না।

তাহা ছাড়া বাঙালীর, ইংরেজি-সাহিত্যে আছে ভূতত্ত্ববিৎ প্রমথনাথ বসু প্রণীত "সভ্যতার যুগপরম্পরা"। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতী ভূমি-স্বত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থের প্রণেতা

আর সম্প্রতি বাহির হইয়াছে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের হাতে "তুলনামূলক ধন বিজ্ঞান" এবং এশিয়ার স্বরাজ প্রতিষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ।

ফ্রান্স সম্বন্ধে কোনো কথা বাঙালী বাংলাভাষায় জানিতে পারে কি? জার্ম্মানি আর রুশিয়া ত আর ও দূরের কথা। কাজেই দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জীবনবেদ, ধর্ম্মকর্ম্ম এবং আচারব্যবহার সম্বন্ধে বাঙ্গালী মাথা খেলাইবে কিসের জোরে?

৮

আর এক কথা। ধনদৌলতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, আর্থিক জীবনের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তির ইতিহাস, সভ্যতার আর্থিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি বস্তুই মার্কস-মর্গ্যান প্রবর্ত্তিত সমাজ-চিন্তার প্রাণ। সেই প্রাণই এঙ্গেল্‌স্‌ লাফার্গের রচনাবলীতে বিশদরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। এই সকল দিকে বাঙ্গালীর মাথা কোনো দিন খেলিয়াছে কি?

টেকচাঁদের ভাই কিশোরীচাঁদ ইংরেজিতে এবং মাসিক বাংলায় এদেশের কৃষকইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু লেখা রাখিয়া গিয়াছেন। রমেশচন্দ্র বৃটিশ ভারতের আর্থিক ইতিহাস বিষয়ক ইংরাজি গ্রন্থে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। সেসব তথ্যের কিয়দংশ সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" হিসাবে বাংলাভাষীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছে। বৎসর দুতিনেক ধরিয়া দেখিতেছি ইংরেজিতে কোনো কোনো বাঙালী লিখিতেছেন রেলসম্বন্ধে, কোনো কোনো মারাঠা লিখিতেছেন মুদ্রাসম্বন্ধে, কোনো কোনো মান্দ্রাজী—লিখিতেছেন ব্যাঙ্ক" সম্বন্ধে। তাহা ছাড়া পল্লীবংশের রোমান্টিক পূজায় যোগ দেওয়া আজকাল ভারতের সর্ব্বত্র একটা বাতিকে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ষাট সত্তর বৎসর কাল আডাম স্মিথ, মিল, মার্শ্যাল এবং আজকাল ইয়াঙ্কি ধনবিজ্ঞান বিদ্‌গনের কেতাব মুখস্থ করিবার জোরে ভারতসন্তান এই পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছে।

সভ্যতার সঙ্গে মানবের আর্থিক অবস্থার যোগাযোগ আলোচনা করিবার সাধ্য ভারতে এখনো গজায় নাই। এত বড় বিশ্বজোড়া চিন্তায় মাথা খেলানো কঠিন ত বটেই। এমনকি ভারতের প্রাচীন এবং মধ্যযুগে যে সকল সমাজ ব্যবস্থা, দর্শন-বেদান্ত, শিল্প—রীতিনীতি গজিয়াছে মরিয়াছে সেইগুলার, সঙ্গে খাওয়াপরার কথাটা কতখানি জড়িত তাহা বুঝিবার দিকে ভারতীয় সাহিত্যের ঝোঁক নাই। এঙ্গেলস লাফার্গের রচনায় ধনদৌলতের "বিশ্বরূপ" বুঝিবার পক্ষে বাঙালীর সুযোগ জুটিবে। অধিকন্তু, কিরূপ আর্থিক খোলস বদলাইতে বদলাইতে "ভারতাত্মা" যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে সেই বিষয়ে খোঁজ চালাইবার জন্য অনেকের খেয়ালে জাগিবে।

৯

ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা বর্ত্তমান জগতের নবীনতম সমাজ-চিন্তার অন্যতম বিশেষত্ব। সত্তর আশী বৎসর পূর্ব্বের ইয়োরামেরিকান দার্শনিকেরা এই প্রণালীতে মানব জীবন বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই দর্শন যার পর নাই প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে।

বিগত দশ বৎসর ধরিয়া বিদেশের সহরে মফঃস্বলে, হাটে, বাজারে, বড় শড়কে গলি ঘোঁচে এই দর্শনের প্রভাব স্পর্শ করিয়া আসিতেছি। কাজেই "বর্ত্তমান জগৎ" গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগে ইহার ছায়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ, জাপান, এবং এমন কি চীন বিষয়ক গ্রন্থগুলায় দুনিয়ার এই নবীন আবহাওয়া তাহার শক্তি প্রকাশ করিয়াছে। কি পাঠশালায়, কি কর্ম্মশালায়, কি পণ্ডিতের বৈঠকে, কি মজুরদের মজলিশে কোথাও এই চিন্তার আওতা এড়াইতে পারি নাই।

১৯১৮-১৯ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবে জার্ম্মাণি গণতন্ত্রের স্বরাজে পরিণত হইয়াছে। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া যে "সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশ" দল জার্ম্মান মুল্লুক শাসন করিতেছে সেই দলের বেদান্তই এই সমাজ-চিন্তার গোড়ার কথা। বিশ বৎসর ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার পর বিলাতে মজুরপন্থী রাষ্ট্রবীরেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজা হইয়া বসিয়াছে। এই সকল লোকেরাও শয়নে স্বপনে এই দর্শনেরই সেবা করিতে অভ্যস্ত।

ফ্রান্সে আজকাল পোঁআকারে রাজত্ব করিতেছেন বটে। কিন্তু তাঁহাকে রাস্তায় ঘাটে সভায় কাগজে প্রতিদিন যে সকল লোক নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িতেছে তাহাদের চিন্তার খোরাক জোগায় এই সমাজ দর্শন। মুসোলিনি ইতালীতে ফাসিষ্ট ধর্ম্মের দিগবিজয় চালাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মপ্রণালীর প্রধান এবং একমাত্র মুগুরই হইতেছে এই দর্শন সেবী উত্তর ইতালীর সোশ্যালিষ্ট দল।

তাহা ছাড়া সোহ্বিয়েট রুশিয়ার মজুর সম্রাটেরা ত এক হাতে কার্ল মার্কস এবং অপর হাতে বোমা লইয়া দুনিয়ায় সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার যুগান্তর ঘটাইতে প্রয়াসী। এই চিন্তার আওতা হইতে আত্মরক্ষা করা ইয়াঙ্কিস্থান এবং জাপানের শাসনকর্ত্তাদের পক্ষেও এখন আর সম্ভব নয়।

১০

রাষ্ট্রনীতির মুল্লুকই এই চিন্তা প্রণালীর একমাত্র ল্যাবরেটরি নয়। ইয়োরামেরিকার সাহিত্য সমালোচনায়, সুকুমার শিল্পের গবেষণায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে চিত্তবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ কাণ্ডে সর্ব্বত্রই এই আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে। "ভট্টচাজ্জি পাড়া"র কোনো মিঞাই এই চিন্তারাশির সঙ্গে গা ঘেঁশা ঘেশি না করিয়া নিজ নিজ টোল চালাইতে পারিতেছেন না।

প্লণ্ট-হেগেলের প্রশিষ্যেরা প্লেটো-পাস্কালের প্রশিষ্যের প্রশিষ্যেরা,—বিলাতী ব্রাডলে-বোসাঙ্কে, ফরাসী বুত্রু-ব্যর্গস, জার্ম্মান অয়কেন, ইতালীয়ন ক্রোচে, ইয়াঙ্কি রয়স্ ইত্যাদি দর্শনবীরগণ "আত্মিক" "স্বধর্ম্মে"র ধ্বজা আজও জোরের সহিত খাড়া রাখিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের কেল্লার উপর হামলা চালাইতেছে হাজার হাজার বাস্তবনিষ্ঠ আর্থিক ভিত্তির ধুরন্ধরেরা! আর তাহাদের সকলের মুখেই বোল শুনিতেছি—"জয় কার্ল মার্কসের জয়।"

বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে যিনিই রিপোর্টার হইয়া আসুন তাঁহাকেই এই বিপুল আন্দোলনের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই লক্ষ্য করিতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের পরিচয় কিছু কিছু

দিয়াছি প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার ফাঁকে ফাঁকে,—যখন যেরূপ সুযোগ জুটিয়াছে। এইবার শ চারেক পৃষ্ঠা তর্জ্জমা করিয়া দুইখানা বইয়ের মারফৎ জ্ঞানকাণ্ডের কথা কি পরিচয় দিতেছি। এই নবীন সমাজ-দর্শনে সপক্ষে বিপক্ষে বাঙালী মাথা খেলাইতে অগ্রসর হউন।

১১

তর্জ্জমাগুলা খাঁটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। পূর্ব্বে "নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর" এবং ফ্রেডরিক লিষ্ট প্রণীত "স্বদেশী ধন বিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলার অনুবাদে যে প্রণালী অবলম্বন করা গিয়াছে বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই করা হইল।

গ্রন্থকারদের প্রত্যেক তথ্য বজায় রাখিয়াছি। একটা তথ্য ও নিজের তরফ হইতে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা করি নাই। গ্রন্থকারদের প্রত্যেক যুক্তিও যথারীতি রক্ষা করিয়াছি সমালোচনার ওজর করিয়া অথবা বিশদরূপে বুঝাইবার ছলে একটা যুক্তিও বেশীর ভাগ বসাইতে প্রয়াসী হই নাই। কাটিয়া ছঁটিয়া সংক্ষেপে সারিবার জন্য কোনো তথ্য বা যুক্তি কমাইতেও ঝুঁকি নাই। অধিকন্তু লেখকদের আসল পারিভাষিক শব্দগুলার ইজ্জদ বাঁচাইয়া চলা গিয়াছে। ফলতঃ মূলে গ্রন্থ দুইটার যতগুলা পাতা অনুবাদেও ঠিক ততগুলাই রহিয়া গিয়াছে।

তাহা সত্ত্বেও তর্জ্জমায় আর মূলে প্রভেদ লক্ষিত হইবে,—বাক্যে বাক্যে মিল দেখিতে পাওয়া যাইবে না। প্যারাগ্রাফে প্যারাগ্রাফেও মিলাইয়া দেখিতে গেলে গোলে পড়িতে হইবে। গ্রন্থকারেরা বাঙালী হইয়া বাঙালী পাঠকের জন্য বাংলা ভাষায় লিখিতে হইলে ১৯২৪ সালে তাহাদিগকে যে ধরণের বোল চাল ও লিখন কায়দা ব্যবহার করিতে হইত সেই বোল চাল এবং লিখন কায়দাই এই অনুবাদ-গ্রন্থ দুইটায় কায়েম করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

১২

ভারতীয় সমাজেও পণ্ডিতমহলে এই নবীন সমাজ-চিন্তা আজ আর অবজ্ঞাত হইবে না। পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধের আর্থিক ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রীয় জীবনে ধন দৌলতের প্রভাব, সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি,—সোজা কথায় "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্,"—ইত্যাদি কথা আজ ভারতবাসীর মরমে পশিয়াছে।

লড়াইয়ের পর হইতে ভারতে "শিল্প-বিপ্লবে"র ঢেউ রোজ রোজ রোজ নবশক্তি লাভ করিতেছে। মজুরদের ধর্ম্মঘট আর কিষাণদের দাঙ্গা আজকাল ভারতীয় গৃহস্থের নিজ সহচর। তথা কথিত মস্তিষ্ক জীবী "ভদ্রলোক" এখন আর "পেটে খিদে মুখে লাজ" নীতি অনুসরণ করে না। হরতালের আবহাওয়ায় মধ্যবিত্ত বাবুরা মজুর কিষাণদের সঙ্গেই হামদর্দ্দি করিতে অভ্যস্ত হইতেছে। অন্ন চিন্তার অগ্নিতাপে সামাজিক শ্রেণীগুলার ভিতর উঠা নামা সাধিত হইতেছে। সে সব চোখের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি।

এই আবহাওয়ায় দর্শনের উপর বাস্তবের প্রভাব যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষেই মন মাফিক কথা বিবেচিত হইবে। মার্কস মার্গ্যানের সমাজ-চিন্তা এঙ্গেল্‌স-লাফার্গের ব্যাখ্যার সাহায্যে যুবক ভারতে ও নবীন দুনিয়ার উপযোগী নবীন দর্শন গজাইয়া তুলিবে।

অপরাধিনী

(গী দে মোপাসার ফরাসী গল্প হইতে)

নির্দ্দোষ পবিত্র জীবনের শেষভাগে উপনীত হ'য়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—খুব শান্তিতে কোন যন্ত্রণা না পেয়ে। বিছানায় চিৎ করে তাঁর মৃতদেহ শোয়ানো হয়েছে আঁখি দুটি বুজে আছে, সমস্ত শরীরে যেন একটা শান্তি মাখানো, চুলগুলো এমন সযত্নে সাজানো আছে, যেন মৃত্যুর খানিক আগে তিনি প্রসাধন করেছেন। সাদা মুখের উপর যেন তাঁর আত্মার ছাপ স্পষ্ট আঁকা আছে—শান্ত, উদার, মহান্, আর তার মধ্যে যেন তাঁর সারাজীবনটা প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে—শান্ত, সরল, অনুতাপের লেশমাত্রহীন সে জীবন।

বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে তাঁর ছেলে আর মেয়ে মার্গারেট। ছেলে কোথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট, অত্যন্ত গোঁড়াধরনের লোক, মার্গারেট তখন সন্ন্যাসিনী হয়েছেন, নূতন নাম হয়েছে তাঁর ভগিনী ইউলালি, মৃতজননীর জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তে কর্ত্তে সে কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে।

তারা দুইভাইবোনে ধর্ম্মের বাঁধাবাঁধির-মধ্যে, কর্ত্তব্যের গণ্ডীর ভিতর খুব কঠোরভাবেই তৈরী হয়ে উঠেছে। ছেলেটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আইনের চাকর, কাজেই দুর্ব্বল ও ভ্রান্ত যারা তাদের বিচারে বড়ই নিষ্ঠুর,—মেয়েটির জীবনের উপর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সন্ন্যাসআশ্রমের প্রভাব বিশেষ বিস্তার হয়ে পড়েছে; তাই সে মানুষের উপর বিরক্ত হয়ে ভগবানে আত্মসমর্পন করে বসে আছে।

বাপের কথা তারা বড় কিছু জানেনা। সুধু এইটুকু জানে যে তাদের বাপ মায়ের জীবন খুবই অসুখী করেছিলেন। কেন—কি বৃত্তান্ত, এ বিষয়ে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

খাটের উপরে যে হাতীর দাঁতের খৃষ্টের মূর্ত্তি ঝোলানো আছে, তারি মতো সাদা মায়ের একটি হাত মেয়ে বার বার চুম্বন কর্ত্তে লাগলো। মৃতের আর একটি হাত শেষ যন্ত্রণার সময় যে রকমভাবে বিছানার চাদরটা আঁকড়ে ধরেছিল ঠিক সেই রকমই আঁকড়ে আছে।

ঘরের দরজায় ঠুক ঠুক করে দুবার শব্দ হতেই তারা মুখ তুলে দরজার দিকে চাহিল। খাওয়া দাওয়া সেরে পুরোহিত মৃতের ঘরের ভিতর আবার এলেন। উগ্র লালমূর্ত্তি; ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, কেন না, হজমের কাজ, বদ হজম বল্লেই ঠিক হয়, এইবার আরম্ভ হয়েছে। সারারাত জাগতে হবে বলে খুব বেশী করে কফি খেয়ে এসেছিলেন।

কর্ত্তব্যের খাতিরে যেন নিজের অজানিতে তাঁর মুখে একটা দুঃখের ভাব মাখানো ছিল।

"মা হারা ছেলে মেয়ে, দুঃখের রাত্রি কাটাতে তোমাদের সাহায্য কর্ব্বার জন্য এসেছি।"

কথাটা শুনেই ভগিনী ইউলালি হঠাৎ উঠে বল্লে, "শত ধন্যবাদ আপনাকে।—কিন্তু দাদা আর আমি মায়ের কাছে একলা থাকতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণ পরে তো আর তাঁকে চোখের সামনে দেখতে পাব না।......ছেলে বেলায় আমরা যেমন মায়ের সঙ্গে থাক্‌তুম, এই শেষের সময়টাও সেই রকমই ইচ্ছা করি...অনাথিনী মা আমাদের"...বলতে বলতে কণ্ঠরোধ হয়ে গেল, সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

পুরোহিতের মনে একটা শান্তি এল। তিনি তাহ'লে এখন তাঁর নরম বিছানায় শুয়ে পড়তে পারবেন—সারারাত আর জাগতে হবে না। "আচ্ছা, তাই হোক"—বলে' তিনি উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বল্লেন, "আহা, তোমাদের মা যে কি ছিলেন—সতী সাধ্বী, সতী সাধ্বী।"

মৃত জননীর পাশে ছেলে মেয়ে দুজনে বসে রইলো। একটা ঘড়ির টিক টিক শব্দ অন্ধকারের ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছিল। খোলা জানলার ভিতর দিয়ে দেবদারু গাছের সুগন্ধ ও চাঁদের কিরণ প্রবেশ কর্‌ছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ—সে মৃত্যু—ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ কর্‌ছিল সুধু ঝিঁঝিঁর একঘেয়ে ঝিঁঝিঁ রব। মৃতের শরীরটাকে ছেয়ে রেখেছিল একটা শান্তির যবনিকা।

ছেলেটি নতজানু হয়ে বসেছিল আর মাঝে মাঝে মা'র নাম ধরে ডাকছিল। মেয়েটি উন্মাদের মতো অস্থিরস্বরে কেবলি ভগবানের নাম উচ্চারণ কর্‌ছিল।

ঝড় থেমে গেলেই যেমন বৃষ্টি আরম্ভ হয় তেমনি তাদের ভিতরকার ঝড় কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল আর চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে লাগলো। খানিকক্ষণ যাবার পর তারা উঠে দাঁড়িয়ে মৃত জননীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

শৈশবের স্মৃতি একে একে তাদের প্রাণে ফুটে উঠ্‌লো। মনে পড়লো তাদের মৃত জননীর মধুরবাণী। কতবার তাদের জ্বালাতনে মাকে কাঁদতে হয়েছিল—সে কথা মনে পড়লো। আর মনে পড়লো সেইদিনের কথা—বাইরে বৃষ্টি—মায়ের কোলে বসে একটা অদ্ভুত ছবির বই দেখছিল তারা। জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী যাদের সাক্ষাৎ হয়েছে, মায়ের প্রতি তাদের একটা নতুন শ্রদ্ধা জন্মায়, বুঝতে পারে তারা যে মায়ের কোলে বসে যে সব সামান্য শিক্ষা তাদের হয়, সেই তাদের চরম ও যথার্থ শিক্ষা।

এতদিনে বুঝলে তা'রা কেন তা'রা একদিনের তরেও অসুখী হয়নি—তাদের সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াতেন যে তাদের মা, যিনি তাঁর নির্ম্মল অনাবিল ভালবাসা দিয়ে তাদের জীবনটাকে ঘিরে রেখেছিলেন।

এখন সেই মা তাদের ছেড়ে গিয়েছেন, সংসারে তারা বড় একলা। অন্য সকলেরই ঘর আছে, বাড়ী আছে, জীবনে সুখ আছে;—আর তাদের?—বুঝি, কিছুই নেই।

হঠাৎ মেয়েটি বলে উঠলো, "দেখ, দাদা, মা তাঁর পুরাণো চিঠিগুলো পড়তে বড় ভালবাসতেন। সেগুলো এখনো এই দেরাজে আছে।......এস সেই চিঠিগুলি পড়া যাক্;

কখনো তো তাঁকে ভাল করে জানবার সুযোগ পাইনি, এই চিঠিগুলি তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করে দেবে। তাঁর বিষয়ে তো কখনো ভাবতুম না।"

ভাই বল্লে, "ভুল কর্চো তুমি বরং তাঁর জন্যে যে আমরা এত ভাবতুম এইটে আমাদের এতদিন জানা ছিল না।"

* * * * * *

লালফিতে দিয়ে সযত্নে বাঁধা হল্‌দে কাগজে মোড়া কতকগুলি চিঠির তাড়া দেরাজের টানার ভিতর থেকে তারা বা'র করে ফেল্লে।

যে তাড়াটা প্রথম খোলা হোল তাতে ছিল সেই চিঠিগুলো যা' তাদের বাপ তাদের মাকে লিখেছিলেন। চিঠিগুলি সাধাসিধা, সাংসারিক কথাবার্ত্তায় ভরা, কিন্তু তার মধ্যে কোমল স্নেহময় প্রাণ লুকানো ছিল। মেয়েটি যেন মৃত জননীকে শোনাবার জন্যে বেশ উঁচু গলায় পরিষ্কার সুরে চিঠিগুলো পড়তে লাগলো; তার ভাই পাশে বসে সেগুলো শুনছিল মনের ভিতর খুব একটা আগ্রহ নিয়ে।

তাড়াটি শেষ করে মেয়েটি বলে উঠলো "শ্বেতপদ্মের মত ধবধবে চিঠিগুলো মা'র বিছানায় ছড়িয়ে দেওয়া উচিত, সুধু তাই নয়, মায়ের সঙ্গে এ গুলোরও যেন কবর হয়।"

আর একটি তাড়া খোলা হোল। প্রথম চিঠিটা মেয়েটি পড়তে লাগ্‌লো :—

"প্রিয়তমে,

পাগলের মতো আমি তোমায় ভালবাসি। কাল থেকে তোমার কথা ভাবচি, সে ভাবনা এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমায় ছাড়ছে না—কি ভীষণ যন্ত্রণা আমিই বুঝেচি। তোমার ঠোঁটের পরশ এখনো যেন আমার ঠোঁটে লেগে আছে, তোমার চোখের সলাজ দৃষ্টি আমার অন্তরটাকে এখনো মধুর করে' তুলছে—মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কত কাছে! ভালোবাসি, ওগো, তোমায় আমি ভালোবাসি। তুমি আমায় পাগল করেছ। বাহুদুটি বাড়িয়ে আছি তোমায় আলিঙ্গন কর্বো বলে'—আমার সমস্ত হৃদয় অহরহ তোমায় ডাকছে, প্রেয়সী আমার।"...

ছেলেটি হঠাৎ চমকে উঠ্‌লো। মেয়েটি পড়তে পড়তে থেমে গেল।...যুবক তার বোনের হাত থেকে চিঠিটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে সই আছে কিনা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পুরা নাম সই নেই, তলায় সুধু এককোণে লেখা আছে, "হেনরী।"

তাদের বাপের নাম তো জর্জ্জ।...যুবক তাড়া থেকে আর একটা চিঠি টেনে নিয়ে পড়তে লাগ্‌লো :—

"তোমার চুম্বন বিহনে আর আমি বাঁচতে পারি না"...

কাঠগড়ার ভিতর আসামীর দিকে যেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে চেয়ে থাক্‌তো ঠিক সেই রকমভাবেই ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলে তার মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইলো।...সন্ন্যাসিনী মেয়ে পাথরের মূর্ত্তির মতো নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলো—চোখ তা'র জলে ভসে যাচ্ছিল।

মৃতার পুত্র জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। ফিরে যখন এল তখন তার বোন নতজানু হ'য়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছে।

সমস্ত চিঠিগুলো টানার ভিতর গুঁজড়ে রেখে ছেলেটি মৃত মায়ের বিছানার মশারিটা ফেলে দিলে।......

দুঃখের রাত্রি কেটে গেল। ঊষার প্রথম কিরণ তখন সবে মাত্র বাতীর আলোকে যেন লজ্জা দিবার জন্যেই ঘরের ভিতর ঢুকছিল, ছেলেটি তার চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে পড়লো। তারপর মৃত জননীর দিকে একবারও না তাকিয়ে বোনের হাত ধরে বল্লে,—

"দুঃখিনী বোন্ আমার, চল, আর কেন?"

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

জনৈক বঙ্গদেশীয় জমিদার ও পণ্ডিত কাশীধামে এসে বাস করেন, এবং এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন যে, জীবনের শেষাংশ অভিমুক্ত ক্ষেত্র (কাশীধাম) পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইব না। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাদি ও শাস্ত্রজ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শি ছিলেন, এবং সাধন মার্গেও খুব উন্নত হইয়াছিলেন। বিভবশালী ব্যক্তি, পণ্ডিত ও অপর সাধারণকে দান করিতেন, কিন্তু নিজে কখনও প্রতিগ্রহ করিতেন না। তাঁহার মন উদার ছিল এবং দয়ার ভাবও বেশ ছিল।

প্রথম হইতে আমাদের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু দরিদ্র প্রতিকার সমিতি গঠন হওয়া অবধি তিনি ইহার একজন সভ্য ও পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া এই সমিতির পর্য্যবেক্ষণ ও আর্থিক সাহায্য করিতেন। পণ্ডিত শিবানন্দ যদিও পূর্ব্বকালীন প্রথানুযায়ী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেবা কার্য্য বা আর্ত্তের কোন প্রকার উপকার হয়, এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি বা অনুমোদন ছিল।

"রামকৃষ্ণ পুঁতি" পাঠ করিয়া পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ জন্মায়। স্বয়ং সাধক, এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা প্রণালী ও কঠোর তপস্যা তাঁহার হৃদয়কে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। পণ্ডিতজী শক্তি উপাসক ছিলেন এবং ভক্তি মার্গের লোক এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি উপাসনা তাঁহার এত প্রীতিকর হইয়াছিল। উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি পাঠ করিতেন এবং জ্ঞান মার্গের বিষয় ও তিনি জানিতেন কিন্তু ভক্তির ভাবটী তাঁহার ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ ইংরাজি জানিতেন না। তিনি স্বামীজীর ইংরাজি গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ ভাব গ্রহন করিতেন এবং তাহাতেই তিনি মোহিত হইয়াছিলেন।

নানা বিষয় আলোচনা করিতেন ও স্বামীজীর মত সমর্থন করিতেন। "আমি আকাশে পাতিয়া কাণ, শুনেছি তোমারি গান, সপেঁছি তাহাতে প্রাণ, বিদেশী বঁধু।" এইরূপে স্বামীজীর প্রতি তাঁহার অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়িতে লাগিল।

স্বামীজী ১৯০২ সালের প্রারম্ভে কাশীধামে আগমন করিলে, পণ্ডিত শিবানন্দজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানে ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যান। পণ্ডিতজী প্রেমিক ভক্ত। তাঁহার মন যেন বলিতে লাগিল, "প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অভিযুক্ত ক্ষেত্রের বাহিরে যাইব না।" স্বামীজী কলিকাতায় অপর স্থানে থাকেন তিনি একবার কাশীধামে আসিবেন না?" "তাঁকে আমি চোখের দেখা দেখে আসি, আমি ত অবলা নারী যাইতে না পারি, সে কি কভু একবার আসিতে না পারে সই! সই কারে কই, তাঁরে আমি ভালবাসি, তাঁরে আমি চোখের দেখা দেখে আসি।" স্বামীজী কাশীধামে আসিলে, পণ্ডিত শিবানন্দের প্রাণ যেন উথলিত হইয়া উঠিল।

পণ্ডিত শিবানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাটীতে যাইতেন এবং স্বামীজীর সহিত সখ্য ভাব স্থাপন করিলেন। কখনও বা তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা হইতেছে, ঠাকুরের ত্যাগের কথা, কঠোর সাধনার কথা, গভীর সমাধির কথা হইত। ভাবরাশি যেন স্বামীজীর দেহে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের বিষয় স্বামীজী মুখে যে ভাব-গুলি বর্ণনা করিতেছেন অনতি বিলম্বে সেই ভাবগুলি স্বামীজীর দেহে প্রস্ফুটিত ও প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। একেই দুই! দুইএক! পণ্ডিত শিবানন্দের ভাব ও শ্রদ্ধা আরও দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেন নাই কিন্তু পক্ষান্তরে স্বামীজীর দেহের উপরেই তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। "ন কারণাৎ স্যাৎ বিবিধেঃ কুমারঃ প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"।

কখনও বা পণ্ডিত শিবানন্দের সহিত শাস্ত্রাদির আলোচনা হইতেছে, কখনও বা কর্ম্ম সেবা এইটীই দেশের একমাত্র কল্যাণকর বিষয় এইটীই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছেন। এরূপ ওজস্বী ভাবে তাঁহাকে বুঝাইতেছেন যেন ভাবগুলি তাঁহার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে। এবং তাহার দ্বারা কাশীস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে এই ভাবটি প্রচলিত ও সন্নিবেশিত হয়। পণ্ডিতজী স্বামীজীর সহিত সখ্য ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। নানা প্রকার কৌতুক রহস্য ও আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। কোন প্রকার সংকোচ ভাব নাই। পণ্ডিতজীর যেন বলিতেছে 'মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়সে তারে যায়গো জানা,' তারা দু'একজনা, 'তারা রসে ভাসে রসে ডোবে, রসে করে আনা গোনা, কালার কথা কইব কি সই কইতে মানা।'

পণ্ডিত শিবানন্দ স্বামীজীর নামে সংস্কৃত ভাষায় একটী অভিনন্দন বন্দনা রচনা করিয়া কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়া আনয়ন করেন, কিন্তু মনের আবেগে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, অভিনন্দন পত্রখানি লইয়া যাইতে বিস্মৃত হইলেন। একদিন তিনি অভিনন্দন

পত্রখানি লইয়া স্বামীজীর আবাসে যাইতেছেন, আমি ও চারুবাবু তাঁহার শকটের এক পাশে বসিলাম, সকলেই স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাইতেছি। পণ্ডিতজীকে আমরা প্রশ্ন করিলাম, "পণ্ডিত মশাই আপনি স্বামীজীকে কি বলিয়া মনে করেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি স্বামীজীকে প্রকৃত যোগী বলিয়া মনে করি সেই কারণ আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। তিনি যে বক্তৃতাদির দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার শক্তির সামান্য প্রকাশ মাত্র ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। তাঁহার সঞ্চিত শক্তি তাঁহাতে নিহিত রহিয়াছে। বিকাশ দিয়া তাঁহাকে বুঝিতে যাওয়া অসম্ভব, ব্যক্ত অংশ অল্পই হইয়াছে। অব্যক্ত বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। কি মহান্ পুরুষ তিনি, তাঁহার কুল কিনারা বুঝিতে পারা যাইত না।"

পণ্ডিত শিবানন্দ সোৎসাহে হর্ষান্বিত হইয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে আমাদিগের ভিতর হর্ষ ও আনন্দ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। আমরা কিছু ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। স্থির হইয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এবং আনন্দের আধিক্য হওয়ায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলাম। আমাদের আর বাক্ উচ্চারণের ক্ষমতা রহিল না। আমরা তিনজনে যে গাড়ীতে বসিয়াছিলাম সেই শকট স্বামীজীর আবাসাভিমুখে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি স্বামীজী, মহাপুরুষ, (স্বামী শিবানন্দ), স্বামী গোবিন্দানন্দ, জনৈক সাধু, ভূঙ্গার রাজার বাগান বাটীর দিকে এক গাড়ী করিয়া যাইতেছেন। পণ্ডিতজী স্বামীজীকে পথে পাইয়া অতি আনন্দিত হইলেন, এবং উভয়েই যান সংরোধ করিলেন। পণ্ডিতজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অভিনন্দন পত্রখানি স্বামীজীর হস্তে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। স্বামীজী লিখিত শ্লোকগুলিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইলেন, এবং বিনীত ও নম্রভাবে কহিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় এ কি করিয়াছেন! আমি সামান্য ব্যক্তি এরূপ উচ্চ ও বহুল প্রশংসা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। সকলই তাঁর ইচ্ছায় হইয়াছে। তিনি জীবকে যা করান তাই হয়।" স্বামীজী কথাগুলি এরূপ বিনয় নম্র ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে কহিলেন যে, পণ্ডিত মহাশয় তদ্‌শ্রবণে আরও আকৃষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রতিষ্ঠা, যশ, মান যে স্বামীজীর চিত্তকে স্পর্শ বা চঞ্চল করিতে পারে নাই ইহাই পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যক্ষ করিলেন। "প্রতিষ্ঠা শূকর বিষ্ঠা" এই উক্তিটী পণ্ডিত মহাশয় আজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তাহার পর শকটদ্বয় আপন আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় যদিও অভিনন্দন পত্রখানি অর্পণকালে মুখে কিছু কথা বলিলেন না কিন্তু তাঁহার চক্ষু হইতে যেন একটী শ্লোক বাহির হইতে লাগিল, "তৎগুণৈঃ কর্ণমাদায় চাপলায় প্রণোদিতঃ" তদবধি পণ্ডিত মহাশয় স্বামীজীর গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন যে কাশীর বিদ্বৎসমাজেতে এবং প্রধান প্রধান অধ্যাপকের নিকট এবং রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহামহোপাধ্যায়ের নিকটেও স্বামীজীর গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এবং শাস্ত্র প্রমাণ

দ্বারা প্রতিপন্ন ও সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, এরূপ যোগৈশ্বর্য্য সাধারণ জীবেতে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র স্বয়ং শঙ্করেরই এরূপ বিভূতি থাকা সম্ভব এবং স্বামীজী স্বয়ং শঙ্করাবতার। ক্রমে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট পণ্ডিত শিবানন্দ মহাশয়ের তর্ক যুক্তিতে এবং স্বামীজীর জীবনী হইতে ঘটনা নিদর্শন করাইয়া পণ্ডিত সমাজে স্বামীজীকে মহাযোগী ও শঙ্করাবতার ইহা প্রতিপন্ন ও সকলকে অনুমোদন করাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রাচীনতম অধ্যাপক শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁহার সবিশেষ ছিল, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সাধক, উদার-চেতা, কিন্তু স্বামীজীর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে উভয়ের মধ্যে সখ্য ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সময় সময় রহস্য ও হাসি তামাসা হইত। পণ্ডিত মহাশয় কাশীত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন না এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল; সেইজন্য তিনি বলিতেন যে, স্বামীজী কৃপা করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

আর একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া রামাপুরার সে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আমাকে কহিলেন, গতকল্য রাত্রে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছে তাহাতে আমার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে," এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি নীরব রহিলেন। আমি ঘটনাটী জানিতে কৌতূহলী হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি অবশেষে বলিতে লাগিলেন, এবং আমাকে আদেশ করিলেন, "একথা কাহাকেও বলিবেনা ইহা অতি গোপনে রাখিবে," কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এখন গতায়ু হইয়াছেন, এবং স্বামীজীর দেহও এখন তিরোহিত হইয়াছে এজন্য এসকল কথা এখন ব্যক্ত করিতে কোন দোষ হইবে না এবং আদেশও লঙ্ঘন হইবে না, এই নিমিত্ত এ ঘটনাটী এখানে উল্লেখ করা হইল।

পণ্ডিত মহাশয় ভক্তি গদগদচিত্তে পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিলেন। "আমার পড়িয়া জ্ঞান ও ভক্তি যে চরমে একই স্থানে লইয়া যায়, ইহার বিষয় সন্দেহ ছিল। কল্য রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজের কৃপায় স্বপ্নে তাহার মীমাংসা হইয়াছে। গতরাত্রে যখন আমি মায়ের ধ্যানে বসিলাম তখন মায়ের মূর্ত্তির স্থানে কেবল স্বামীজীর মূর্ত্তি আসিতে লাগিল। আমি বারংবার সেটীকে সরাইয়া আবার মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু তাহা পারিলাম না। তখন তন্দ্রা আসিল ও অর্দ্ধ নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। তাহার পর দেখিলাম যেন আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্বামীজী মহারাজ কাশীর যে স্থানে আছেন সেইস্থানে উপনীত হইলাম। তথায় দেখিলাম যেন স্বামীজী এক খাটের উপর শুইয়া আছেন এবং তাঁহাকে বেড়িয়া নিয়ে কতকগুলি সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলী বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও দেখিলাম। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে গিয়া বসিলাম, এবং সকলেই যেন ধ্যানস্থ হইলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে স্বামীজীর কৃপায় যেন জ্ঞান ভূমি হইতে পুনরায় নামিয়া আসিয়া সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং স্বামীজীও আমাদের সহিত যোগ দিলেন। [illegible] সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। একরূপ

করিতে করিতে আমার মন ভক্তি ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বুঝিলাম জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য স্থল এক, জ্ঞান ভক্তি দুইই এক স্থলে লইয়া যায়, আমার সকল সন্দেহ চির জীবনের জন্য ঘুচিয়া গেল। তদবধি পণ্ডিত মহাশয়ের আমাদের প্রতি স্নেহ অধিকতর বর্দ্ধিত হইল এবং সর্ব্বদাই আমাদিগকে ভোজন করাইতে ও স্বামীজীর বিষয় চর্চ্চা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন।

ভূঙ্গার রাজা লক্ষৌয়ের নিকট একজন বিশেষ বিভবশালী জমিদার ব্যক্তি। ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে জীবনের শেষাংশ শ্রীশ্রীকাশীধামে অতিবাহিত করিবেন। পুণ্যক্ষেত্র কাশীধাম ছাড়িয়া এমন কি নিজের উদ্যান গৃহের বহির্দ্দেশে পর্য্যন্ত গমন করিবেন না। নিজের উদ্যান বাটীতে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়া দেহপাত করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া কাশীর দুর্গাবাটীর সন্নিকটস্থ ভূঙ্গা-ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সাধক ও এক প্রকার সন্ন্যাসী ছিলেন। স্বামীজী কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তিনি সোৎসুক হইলেন, এবং স্বামী গোবিন্দানন্দের সহিত নানা প্রকার ফল মূল ইত্যাদি ভক্ষ্য বস্তু স্বামীজীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ—স্বামী শিবানন্দজীর তথায় উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দানন্দজী আসিয়া, স্বামীজী ও শিবানন্দজীকে নমঃ নারায়ণ করিলেন এবং আসন গ্রহণ করিলেন। গোবিন্দানন্দজী ভূঙ্গার রাজার বিষয় কহিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামীজীকেও নিবেদন করিলেন, "ভূঙ্গার রাজা আপনার দর্শন পাইতে নিতান্ত ইচ্ছুক। কখন হইবে জানিতে পারিলে তিনি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও আপনার সমীপে আসিতে প্রস্তুত।" স্বামীজী তৎশ্রবণে শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "সেকি এরূপ : করা উচিত নয়। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা অবিধেয়। আমি স্বয়ংই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইব, রাজাজীর এখানে আগমন করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই।"

তৎপরে পরদিবস বা তৎপর দিবসই হউক স্বামী গোবিন্দানন্দজী আসিয়া স্বামীজী ও মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর সমভিব্যাহারে উদ্যান ভবনে গমন করিলেন, বাক্যালাপ যাহা হইয়াছিল তাহার মর্ম্মার্থ এখানে সন্নিবেশিত করা হইল। রাজাজী কহিলেন, "বুদ্ধ শঙ্কর যে শ্রেণীর, স্বামীজী আপনিও তৎশ্রেণীর।" এরূপ গম্ভীর ভক্তি ও সম্মানসূচকভাবে স্বামীজীর সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, এবং শাস্ত্রাদিরও কার্য্য প্রণালীর উল্লেখ করিতে লাগিলেন। কারণ রাজাজী পূর্ব্বাবস্থায় একজন বিশেষ কর্ম্মীছিলেন। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম ও সাধনার সহিত কর্ম্মের ভারও তাহার ছিল। তিনি স্বামীজীকে অনুনয় করিলেন যে শ্রীশ্রীকাশীধামেতে সেবাকার্য্য ও অন্য প্রকার কার্য্য প্রণয়ন করেন তাহাতে জন সাধারণের বিশেষ কল্যাণ হইবে। অর্থ ব্যয় বিষয়ে তিনি স্বয়ংই ভার গ্রহণ করিবেন। স্বামীজীর শরীর অসুস্থ ছিল, এই নিমিত্ত কর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন না। কেবল মাত্র কহিলেন এখন

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তাহার পর শরীর সুস্থ হইলে কর্ম্মের প্রতি মনোযোগ করিবেন। এইরূপ নানা বাক্যালাপের পর স্বামীজী ও মহাপুরুষ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিবস ভূঙ্গার রাজার এক কর্ম্মচারী আসিয়া স্বামীজীকে একখানি বদ্ধ পত্র দিলেন, তাহা উন্মুক্ত করিয়া ৫০০৲ শত টাকার একখানি চেক্ স্বামীজীর আতিথ্য সৎকারের জন্য লক্ষিত হইল এবং তৎ অন্তঃস্থিত পত্রেও তদ্রূপ উল্লেখ ছিল। স্বামীজী সন্নিকটস্থিত মহাপুরুষকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "মহাপুরুষ, আপনি এই টাকা লইয়া কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন করুন।" এই অর্থ লইয়া মহাপুরুষ একটী উদ্যান ভাড়া করিয়া "রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন" করেন। এবং সেই উদ্যান ক্রয় করিয়া বর্ত্তমানে স্বামী মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ)

বাণী-বিতান

বর্ষার গান

১

সুন্দরী সুন্দরী ওগো তুমি বরষা
তোমার চরণ পাতে ধরারাণী সরসা।
নিয়ে কোন্ অফুরান তৃষাহরা ঝর্না
এলে নামি মরতে গো মল্লিকা বরণা।
ছিলে কোথা নিরালায় কোন্ সুরপুরে গো?
ধরণীর লাগি চিতে সকরুণ সুরে গো
বেজেছিল কি যে গান—
বেদনার কি সে তান
অমনি গো এলে চলি সুন্দর-দরশা
বাজায়ে জলদবীন্ ত্রিম্ ত্রিম্ বরষা।

২

সুন্দরী সুন্দরী অতুলনা রূপসী।
কে গো চির অমলিন যৌবনা ষোড়শী—
নিদাঘের তাপ জ্বালা নিদূরিতে এস গো!

ধরাতল তল কর কর-পরশে।
ধান্যের ম ভরি দাও সুরসে।
ব লাগি গলিয়া—
উ ল ও হিয়া ?—
তারি কথা প্রাণে গাঁথা ওগো হিম-পরশা !—
তাপিতের তাপহরা তরলিত হরষা ! —

৩

সুন্দরী সুন্দরী দ্রবময়ী বরষ !
দুখ-সহা জগতের বরষের ভরসা !
আলো তব জল ধারে পীযূষের ধারা গো !
নিরাময় করি দাও আধ মরা যারা গো !—
দেবতার শুভাশীষ অঞ্চল ভরিয়া,
দিয়ে যাও, নিয়ে যাও জ্বালা ব্যথা হারিয়া।
ফুটাইয়া আস্যে —
প্রেমভরা হাস্যে—
এস মৃদু লাস্যে, মন্থরা অলসা।
বিদূরিয়া যাও চলি অন্তর-তমসা।

৪

সুন্দরী সুন্দরী—কোথা ছিলে বলনা ?—
কোন্ পুরী উজলিয়া কোন কুল-ললনা ?
কার তুমি অতুলনা রূপে গুণে ধন্যা
আদরের সোহাগের স্নেহময়ী কন্যা ?
কে জননী ওই মুখে খেয়ে বল চুমটী
আঁখি পাতি এনেছিল আরামের ঘুমটী ?
কার ডাকে টুটিয়া—
ঘুম গেল ছুটিয়া
এলে নামি মরতে গো সুন্দরী বরষা।
মঞ্জীর শিঞ্জনে হিয়া করি অবশা।

৫

সুন্দরী সুন্দরী কার্ তুমি বধূটী ?
কোন্ অমরার তুমি মন্দার মধুটী ?

কার্ স্নেহধারা বল ঝরিছে ও বক্ষে ?
কার্ প্রেম দিঠি ওই ঝলসিছে চক্ষে ?—
জীবগণে সুধাদানে কর আসি ধন্য।
বিদূরিয়া তাপ দাহ দিয়ে যাও অন্ন !
এসো প্রতি বরষে
যৌবন সুরসে
স্থবিরা ধরারে কর সুন্দরী-সরসা।
ধন্যা গো অয়ি চির যৌবন বরষা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।

মেঘের কোলে চাঁদ

মেঘের কোলে চাঁদ,—
ঘোম্‌টা আড়ে কোন্ রূপসীর—
চোখের চোরা ফাঁদ !
ফুলটি যেন কাঁটার বুকে
উঠ্‌ছে হেসে আপন সুখে,
পঙ্কে যেন কমল ফোটে
কি অপরূপ ছাঁদ !
মেঘের কোলে চাঁদ,—
বন্ধ্যা-বুকে সোনার ছবি
ঘটায় পরমাদ !
গোপন স্মৃতি তন্ত্রী মাঝে
হারাণো কোন্ গানটি বাজে,
বিরহ-বিষ মন্থি এ কি
সুধার পরসাদ !

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

ভাগ্য লক্ষ্মী

তুমি এলে উৎসবের আনন্দ মুখর এক রঙীন সন্ধ্যায়
সন্ধ্যা-মণি রজনীগন্ধায়
আবরিয়া তনুখানি ; লীলায়িত আনন্দের খনি,
আমার নয়ন আগে দাঁড়ালে যখনি
ভরিয়া সুবর্ণ ঝাঁপি কল্যাণের পঞ্চশস্য দিয়া
তখনি কাঁপিল মোর হিয়া
অজানিত আশঙ্কায় ;
মর্ম্মের সহস্র তন্ত্রী ব্যথিয়া উঠিল বেদনায় !
তুমি এলে, তারি সাথে এল, প্রিয়ে, সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাত !
তরুণ অরুণ দীপ্ত যৌবনের নির্ম্মল প্রভাত
দীর্ঘশ্বাসে হয়ে এল ম্লান ;
আমার সমস্ত প্রাণ
বক্ষ পঞ্জরের দ্বারে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম সম
তোমারি সকাশে প্রিয়তম
ছুটে যেতে ফুটে পল বারবার
দেখা তবু পেল না তোমার !
বসন্তের শুভ আগমনে
যে ফুল ফুটিয়াছিল মর্ম্মতলে নিকুঞ্জ কাননে ;
কুঁড়ির মাঝারে তার ফুটিবার বেদনা গভীর ,
সারা দিন বয়ে গেল দখিনা-সমীর
ব্যর্থ হ'ল আসা যাওয়া তার,
হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার
মর্ম্ম ছেঁড়া করুণ কাহিনী, ব্যক্ত হ'ল ভ্রমর গুঞ্জনে,
মধু গুঞ্জি ক্ষণে ক্ষণে
প্রলুব্ধ করিয়া শুধু বাড়াইল বিরহের ব্যথা ;
হৃদয় মাধবী লতা
এতটুকু পেল না আশ্রয় ;
কলি সে ত ফুটিবার নয় !
বসন্ত বিদায় নিল শুষ্ক কলি দীর্ণ কিশলয়ে
হৃদয় শোণিতে লেখা স্মৃতি রেখা রাখি কিশলয়ে ।

তুমি এলে সঙ্গে করে নিয়ে এলে অফুরন্ত হাসির সম্ভার
নিমেষে উল্লাসি' ওঠা সমুদ্রের তরঙ্গ অপার ;
দুলিয়া ফুলিয়া উঠি ধেয়ে এলে কল কল কল,
রৌদ্রতপ্ত বালু তট তল
ব্যগ্র বাহু আলিঙ্গনে ঘিরি'
ক্লেদসিক্ত ম্লান দেহে মুহূর্ত্তে পাথারে গেল ফিরি,
বুকে নিয়ে আঘাত নির্ম্মম !
প্রাণের অধিক প্রিয়তম
একান্ত নিকটে এসে হয়ে গেছে নিতান্ত সুদূর
নিয়ে এলে হাসি রাশি, রেখে গেলে ক্রন্দনের সুর।
অনন্ত এ সমুদ্র বেলায়,
শ্রান্ত দীর্ঘ অবেলায়
শুধু শুনি বেদনার বাঁশী—
রজনীর অন্ধকার ঢেকে দেয় দিবসের হাসি !
তুমি এলে শিরে বহি পরিপূর্ণ পূজার থালিকা,
যে নব মালিকা—
নিরালায় বসি তুমি সযতনে রচিলে সুন্দরী,
আপনার লাবণ্য মাধুরী
প্রতি পুষ্পে মাখাইয়া তার, দিলে মোর গলে
তখন কি জানিতে সরলে
কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ঙ্কর ?—
বিদীর্ণ করিয়া নিরন্তর
ফুল্ল কুসুমের মালা, মধুগন্ধ নিঃশ্বাসে নাশিয়া
বিদগ্ধ করিবে শুধু হিয়া ?
এনেছিলে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অন্তরের শেষ নিবেদন
সঙ্গে করে ফিরে গেলে মর্ম্মছেঁড়া গভীর বেদন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কচি।

চির আনন্দ অন্তরে মম
আমি সবুজের চিরসাথী,—
মরণের গলে মন্দার মালা
উৎসব-রাতে মধু বাতি।

চির তপ্ত ধরণীর বুকে
আমি বসন্ত ফুল দল,
আমি আষাঢ়ের নীরদ পুঞ্জ
আমি উচ্ছল চঞ্চল।
আমি যে মুক্ত অধীর সমীর,—
হাসি উল্লাসে ছুটে চলি
কুসুম-অধরে রূপসী-আঁচলে
সুন্দরী হৃদি চঞ্চলি ;
বন-বীথিকায় পল্লবে রচি
মর্ম্মর সুরে কত গান,—
কুঞ্জে পশিয়া সৌরভে লুটি
ফুল-বধূদের প্রেম-দান।
আমি উত্তাল সিন্ধুর মত অন্তরে উঠি কেঁপে কেঁপে,
অঙ্গের মোর রক্ত ধারায় চঞ্চল উঠি ক্ষেপে ক্ষেপে,
আমি অরণ্য-কুরঙ্গ সম প্রান্তর হয়ে হয়ে পার
হাওয়ার সাথে হাডুডুডু খেলি আমি দুর্দম দুর্ব্বার।
আমি বৈশাখে কালবৈশাখী ঝড়েরকেতনে দিয়ে নাড়া
গগন প্রান্তে অট্ট হাসিয়া জাগাই জীবন বুকে সাড়া
আমি সাহারার ব্যথা হাহাকার, শ্মশানের বুকে মহাডর,
আমি উল্কার পিশাচহাস্য নিষ্ঠুর হীন অন্তর।
আমি কুসুমের ললিত মাল্য, নয়ন-অশ্রু-জলধার
আমি মৃত্যুর প্রাঙ্গনে হাসি দানবের হাসি বার বার।
আমি প্রকৃতির খেয়াল-দুলাল
আমি বিধাতার গড়া কবি,
আমি হেঁয়ালীর কণ্ঠের হার
আমি স্বপ্নের মায়া ছবি।

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

"হারিয়ে গেনু আমি"

এম্‌নিতর আষাঢ় মাসের
বাদ্‌লা দিনের এক বেলা,
দূত সে এসে খবর দিলে
স্বর্গ-পথে আজ মেলা।

গাইবে নারদ বীণা নিয়ে,
বাজ্‌বে কত খঞ্জনী—
মেঘের গানের তালে তালে
বাজ্‌বে নূপুর নিক্কণী।
দেখ্‌নু চেয়ে বাহির পানে
রাজপথে আজ হট্টগোল
অপ্সরীরা দলে দলে
চলছে ধরি মধুর বোল।
যায়গো আকাশ, যায়গো বাতাস,
যায়গো ভ্রমর গুঞ্জনে—
যায়গো কত পক্ষীরা সব
নীরব প্রাণের শিঞ্জনে।
সাগর জলে নৌকা বেয়ে
কবির দলে হাল টানে,
প্রজাপতির পাল তুলে দেয়
দিগন্তেরই কোল পানে।
তারই মাঝে একটী বালা,
নামটী ছিল মঞ্জরী—
গলায় ছিল মোতির মালা
চলতেছিল গুঞ্জরি।
দেখ্‌নু চেয়ে করুণ হিয়ে,
উঠতেছিল মন্থনে—
অশ্রুবারি ছিল ভরি
কৃষ্ণতারা নয়নে।
আমার পানে মুখটী তুলে
আঁচল কোণে চোখ মুছে
কইলো বালা ধীরে ধীরে
আকুল করা নিশ্বাসে
ওগো পথিক, ওগো পথিক,
দিগন্তেরই কোল বেয়ে—
চলছিনু ঐ স্বর্গ-পথে

দেখনু নাচে শ্যামল মাঠে
অজানা এক কুরঙ্গ—
দেখনু নাচে সাগর পটে
অজানা এক তরঙ্গ।
দেখনু নাচে সবুজ ঘাসে
একটী ছোট ফুলের গাছ—
দেখনু নাচে দীঘির জলে
একটী চাঁদের কিরণ-কাঁচ।
দেখনু নাচে বৃষ্টি-ধারা
দোদুল দোলার দুলনে—
দেখনু নাচে আলোক মালা
সাতটি রঙের কিরণে!
দেখনু নাচে বক্ষ মায়ের
কক্ষভরা ইঙ্গিতে—
দেখনু নাচে হিয়াখানি
আবেগভরা সঙ্গীতে।
দেখনু নাচে একটী ময়ূর
প্যাখম তুলে আনন্দে—
দেখনু নাচে একটী কোকিল
পঞ্চ তানের সু-ছন্দে।
হিয়াখানি উঠ্‌লো কেঁপে!
দেখনু আমি চোখ্‌মেলি,
স্বর্গ পানের পথটী আমি
কোথা ফেলে এনু চলি।
"ওগো পথিক, ওগো পথিক,
চৌদিকে এই মর্ত্ত্যভূমি—
স্বর্গ পথটী ছেড়ে কোথায়
হারিয়ে আজি গেনু আমি।

২

আজকে দেখি আষাঢ় মাসের

ক্ষণে ক্ষণে আকাশ পটে—
মেঘের দলের খেলা।
চোখের পরে ভাসছে আমার
শ্যামল বনানী,
তারই মাঝে পক্ষীগণের—
কূজন গুঞ্জনি।
একটী গাভী চলতেছিল
সেই দিগন্তের মাঠে,

৩

আজকে দেখি আষাঢ় মাসের
ঠিক দুপুরের বেলা,
ক্ষণে ক্ষণে আকাশ পটে
মেঘের দলের খেলা।
সমুদ্রের পথ বেয়ে,
আসতেছিল ধেয়ে ধেয়ে
আমারি এক নেয়ে ;
তার পরে কি উঠ্‌লো ঝড়
সাগর তুফানে—
তারই মাঝে বজ্রগুলা
ডাকে সঘনে !
উদাস চোখে চেয়ে বলি,
আকুল করা ডাকে—
কোথায় তারে রেখে এলে
দিয়ে এলে কাকে
দূরদিগন্তে সাগর জলে,
আকাশ পড়ে চুমি—
তারই মাঝে বলে বালা—
"হারিয়ে গেনু আমি।"

শ্রীবরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুক্রম

(২৪)

লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বংশের ইতিহাস লিখিবার অছিলায় ফণীন্দ্র যখন তারাপদ বাবুর দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল তখন মণিমালিনী মনে মনে হাসিল, অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকের মত ফণি তারাপদ বাবুর পড়িবার ঘরে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে বিশ্বাস-ঘাতকের বংশের কথা শুনিয়া যাইত। তারাপদ বাবু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে ফণি লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বংশের কথা কিছু কিছু জানে সুতরাং তিনি প্রথম প্রথম যাহা বলিতেন ফণি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিত না। তথাপি সে একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ সাহিত্যসেবীর মত তারাপদ বাবুর কথাগুলি নোট বইতে টুকিয়া লইত। দুই চারিদিন পরে তারাপদ বাবু বুঝিতে পারিলেন যে সে কিছুই জানে না বা কিছুই পড়ে নাই কিন্তু তখনও তাহার উৎসাহ কমিল না। কারণ ফণি যেরূপ কষ্ট করিয়া নোট লিখিত তাহাতে ফণির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল।

তারাপদ বাবু ফণিকে লক্ষ্ণৌয়ের ইতিহাস শিক্ষা দিতেন তখন তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেন, মাঝে মাঝে তিনি মণিকে পড়িবার ঘরে ডাকাইয়া পাঠাইতেন কিন্তু মণি দূর হইতে ফণিকে দেখিতে পাইলে বীরবলকে পাঠাইয়া দিত, ফণি অবশ্য ইহাতে মনে মনে বড়ই চটিত কারণ অনুপম তাহাকে দার্জ্জিলিঙ্গের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল। একদিন তারাপদ বাবু গিয়াসুউদ্দিন্ হয়দার শাহের কথা বলিতে বলিতে একখানি পারসী কেতাব চাহিলেন, ফণি উঠিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল, হঠাৎ তারাপদ বাবুর মনে পড়িয়া গেল যে কেতাবখানি হাতে লেখা ও বড় দামী সেইজন্য সেখানা লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তিনি ফণিকে বসিতে বলিয়া মণিকে ডাকিতে পাঠাইলেন। মণি আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল তাহা দেখিয়া ফণি সুযোগ বুঝিয়া বলিয়া উঠিল, "মেয়েরা আসতে পাচ্ছেন না আমি একটু উঠে যাই না হয়?" তারাপদ বাবু বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "না না তুমি উঠে যাবে কেন? মণি তো দার্জ্জিলিঙ্গে সকলের সামনেই বেরুতো, তোমার সামনে বেরুতে তার যে কি আপত্তি তা বলতে পারিনি।"

এ ক্ষেত্রে ফণি জিতিল মণি হারিল কারণ তারাপদ বাবু তখনই ডাকিয়া বলিলেন, "মণি তুই ঘরের ভিতরে আয়না; ফণিবাবু ঘরের ছেলের মত হয়ে গেছেন তাঁকে লজ্জা কিসের?" মণি তাহার অঙ্গের মোটা কাপড়খানা ভাল করিয়া জড়াইয়া, মাথার কাপড়টা দেড় হাত টানিয়া দিয়া ঘরের এককোণে আসিয়া দাঁড়াইল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি বল্‌ছেন?" কিন্তু তারাপদবাবু তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না। তিনি যখন জিজ্ঞাসা

করিলেন, "কিরে এলি না ?" তখন মণি গলাটা একটু ছাড়িয়া বলিল, "এই যে এসেছি।" তারাপদবাবু পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "লোহার সিন্দুকের ভেতর থেকে পারসী পুঁথিগুলো নিয়ে আয়।"

মণি চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে এক রাশি লাল খেরুয়া বাঁধা পুঁথি লইয়া আসিয়া ফণি যেখানে বসিয়াছিল তাহার তিন হাত তফাতে রাখিয়া দিল। শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া তারাপদ বাবু দেখিলেন যে পুঁথিগুলা অনেক দূরে আছে আর ফণি তন্ময় হইয়া মণির দিকে চাহিয়া আছে, তিনি বিরক্ত হইয়া মণিকে বলিলেন, "পুঁথিগুলো এগিয়ে দেনা বাছা ? হাঁ করে কি দেখ্‌ছো ? ফণি দশ নম্বর পুঁথিখানা দাও!" মণি অগত্যা বাধ্য হইয়া পুঁথিগুলা আগাইয়া দিলেন আর ফণি বহু কষ্টে চক্ষুর প্রবল পিপাসা দমন করিয়া দশ নম্বর পুঁথি খুজিতে আরম্ভ করিল, মণি চলিয়া গেলে তারাপদ বাবু বলিলেন, তুমি একটু একটু পারসী পড়তে আরম্ভ করছে ? ফণি মণির কাপড়ের পাড় ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।"

উপরে উঠিয়া গিয়া মণি অনুপমকে বলিল, "নেড়া দা এ আপদটা কবে বিদেয় হবে ?" অনুপম তখন একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছিল সে কেমন করিয়া মণিকে দার্জ্জিলিঙ্গে ফিরিয়া লইয়া যাইবে সুতরাং মণির সমস্ত কথাগুলি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। মণি প্রথম হইতে রাগিয়াছিল, অনুপম তাহার কথা শুনিতে পায় নাই দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "কিসের ধ্যান করছ ? বলি ও আপদ বিদেয় হবে কবে ?" অনুপম কিসের ধ্যান করিতেছিল সে কথা ব্যক্ত না করিয়া বলিল, "কাকে বিদেয় করতে চাইছ মণি ?" মণি রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিল, "তোমার এই নতুন বন্ধুটীকে ?" অনুপম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "ফণির উপর চট্‌লে কেন মণি ? ওতো বেশ লোক, লক্ষ্ণৌয়ের ইতিহাস খায়, প্রেমের কবিতার কথা বললে দাঁড়িয়ে মূর্চ্ছা যায়।" মণি বলিল, "ভাল লোকও তো অনেক আছে নেড়াদা কেউ বা ছোলা ভেজে খায় কেউ বা ছোলা সিদ্ধ করে খায় তোমার এ বন্ধুটী ছোলা ভাজা কসমের লোক, চাউনির চোটে সম্মুখ দিয়ে চলবার জো নেই।" অনুপম বিস্মিত হইয়া মণির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছি, ছি, ওকি কথা বলছ মণি ? ফণি অতি ধীর শান্ত ভদ্রলোক, তিনি সাহিত্য সেবা করেন লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বংশের ইতিহাস ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁর নাই।" মণির মুখ দিয়া একটা কড়া কথা বাহির হইতেছিল সে অনেক কষ্টে রাগ চাপিয়া বলিল, "তাহলে মামা বাবুর মত তুমিও ঘুষনিদানা খেয়েছ নেড়াদা!" মণি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন অনুপম আবার দার্জ্জিলিঙ্গের কথা ভাবিতে বসিল।

ফণি জিতিল অনুপমের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে ও তারাপদ বাবুর সরল বিশ্বাসের জন্য ক্রমে সে মণির সহিত দু একটা কথা কহিতে আরম্ভ করিল। আশাতীত পুরস্কার পাইয়া ফণি অধ্যবসায়ের সহিত লক্ষ্ণৌয়ের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিল। দীর্ঘকাল শীকার

করিয়া ব্যাঘ্র বুঝিয়াছিল যে ব্যস্ত হইলে শীকার পলাইবে সেইজন্য সে মণির সহিত অতি সাবধানে কথা কহিত। তারাপদ বাবুর সম্মুখে ভিন্ন সে কখন মণির সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিত না কিন্তু মণি তাহাকে দেখিলেই দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া দিত। অনুপম কখনও তাহাদের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিত না, সে উপরের ঘরেই থাকিত এবং বাড়ীর মধ্যে কেবল মণির সহিত দু একটা কথা কহিত।

নিতাইসুন্দরের সঙ্গে ধীরেশ যখন মিসেস্ মজুমদারের ক্ষুদ্র কুটিরে গিয়া পৌছিল তখন বাজার হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। বেবিকে ডাকিয়া ধীরেশ নিতাইকে ড্রয়িংরুমে বসাইল, ঘরের দেওয়ালে মণির একখানা বড় ছবি টাঙ্গান ছিল, ধীরেশ পূর্ব্বে যখন মিসেস মজুমদারের বাড়ী আসিয়াছিল তখন ড্রয়িংরুমে এই ছবিখানা ছিল না, ধীরেশ ছবিখানা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া গেল, অনেকদিন পূর্ব্বে অনুপম যখন লুকাইয়া আপিসের মালীর কাছ হইতে মণির জন্য ফুলের তোড়া লইতে আসিত তখন ফুলের স্বামী তাহার একখানা ছবি তুলিয়াছিল, মণি দার্জ্জিলীং ছাত্রিরা যাইবার পরে মিসেস মজুমদার সেই ছবিখানি বোমাইডে বড় করিয়া ছাপাইয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন। ছবিতে মণি অনুপমের ফুলের তোড়াটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ধীরেশের চমক ভাঙ্গিল তখন সে হঠাৎ নিতাইসুন্দরের দিকে চাহিয়া দেখিল যে নিতাই কাঁদিতেছে। ধীরেশ স্বভাবতঃ কোমল-হৃদয় ভদ্রলোক কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে নিতাইকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "কাঁদিতেছেন কেন? মাসীমা এখনি ফিরে আসবেন। তিনি এলেই তাঁর কাছে মণির সমস্ত খবর পাবেন।" নিতাইসুন্দর চোক মুছিয়া বলিল, "ধীরেশ বাবু অধীর হয়ে কাঁদিনি নিজের কৃত কর্ম্মের ফল এই সঙ্গে ভোগ করছি। কেন কাঁদছি জানিনে, সে বড় দুঃখের কথা, বসুন আপনি আপনাকে বলি, আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে বোললেও আমার মনের ভার অনেকটা ঘুচবে। ধীরেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও সকল কথা আমাকে আর বলে কি হবে নিতাই বাবু? আমি কতক কতক মণির মুখে শুনেছি! আপনার মনে যখন অনুতাপ এসেছে, এখন ভগবান আপনাকে সুমতি দিয়েছেন, এইবার আপনার দিন ফিরবে। নিতাই সবলে ধীরেশের হাত ধরিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া বলিল, "না আপনি কিছুই শোনেন্‌নি ধীরেশ বাবু—আমি জানি যে মণি কখনও সে কথা প্রকাশ করবে না। আপনি হয়ত শুনেছেন যে আমি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—তাকে রোজগার করে খেতে বলেছিলুম, তা কেবল একশ ভাগের একভাগ—বাকী কথাটা আপনি শোনেন্‌নি—আমি জানি মণি প্রাণ থাকতেও সে কথা প্রকাশ করবে না। আজ বলি আপনি শুনুন—আজ আর মনের ভাব চেপে রাখতে পারছি না। বাপের কিছু পয়সা ছিল, আর রংটা একটু ফরসা ছিল সুতরাং লেখা পড়া ভদ্রতা বা সহবৎ না শিখে অল্প বয়সে মদটা গাঁজাটা ধরিছিলুম। গলার আওয়াজটা মিষ্ট ছিল সেইজন্য সখের থিয়েটারে অল্প বয়সেই নাম কিনেছিলুম। ভাব গতিক দেখে শুনে

বাপ মা অল্প বয়সেই একটী বড় সড় দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ কুলীনের মেয়ে, বাপের বাড়ীতে মানুষ, আমার পয়সা আছে শুনে ইচ্ছে করে এই বানরের গলায় ঐ মুক্তো সমর্পণ করেছিলেন; ধীরেশ এই সময় বলিয়া উঠিল "তাতে আর কি হয়েছে, আমাদের হিঁদুর অমন অনেকই হয়ে থাকে।" নিতাইসুন্দর একটু হাসিয়া বলিল, "তার পর অনেক হয়েছে ধীরেশ বাবু আপনি এখনও কিছুই শোনেন্‌নি। ক্রমে শুধু খাঁটিতে নেশাটা জোমতো না, দক্ষিন পাড়ার মুখুজ্জ্যেদের বাড়ী কিঞ্চিৎ চাবুক অভ্যাস করা গেল। আপনারা লেখা পড়া জানা ভদ্র লোকে কথাটা বোধ হয় কিছুই বুঝতে পারলেন না।—নিত্য এক বোতল কনট্রী ওয়াইন হজম করেও অচেতন হতে পারতুম না বলে তার পর দু-এক ছিলিম গাঁজা টান্‌তুম। তখনও বাড়ী আসতুম্‌। মণি কোনওদিন কিছু বোলতো না, দু-এক গাছা লাঠির ঘা কিম্বা দুটো একটা লাথি নীরবেই হজম কোরতো। তার পর ক্ষীরদার সঙ্গে দেখা। ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষিরি নাপ্‌তিনী দক্ষিণ পাড়ার মুখুজ্জ্যে বাবুদের ঝিয়ের মেয়ে, বিধবা, দেখতে বড় মন্দ নয় তার উপর বয়স অল্প সুতরাং জমিদার বাড়ী তখন তার পসার খুব জোর, অবশেষে রাত্রিতে বাড়ী ফেরা বন্ধ করলুম। মণি তা সইতে পারলে না। এতদিন এত অপমান এত লাঞ্ছনা সে নীরবে সয়ে এসে ছিল সে কেমন করে অমন ভাবে বেঁকে বসল তা বুঝতে পারলুম না। মণি রাগ করে মামার বাড়ী চলে গেল। তখন ক্ষীরদা আমায় পেয়ে বসেছিল, বাড়ীর লোকে পরিবার শাসন করে রাখতে পারিনা বলে অনেক কথাই শোনালে। নেশার ঝোঁকে রাগের মাথায় সদর রাস্তা দিয়ে মণির চুলের মুঠো ধরে টানতে টান্‌তে বাড়ী নিয়ে এলুম, জুতো শুদ্ধ লাথিটা অবশ্য ফাউ। ধীরেশ আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ মানুষ এমন পশু হয়"! নিতাই আবার একটু হাসিয়া বলিল, "হয় ধীরেশ বাবু, মানুষ হলেই মানুষ হয় না, ভদ্র লোকের ঘরে জন্মালেই ভদ্র হয় না, তার প্রমাণ আমি।' ধীরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এই অপরাধের জন্য আপনি মণির গায়ে হাত তুললেন?" "হাত নয় পা। এখনও সব শেষ হয় নি ধীরেশ বাবু। মণি কেমন করে জানতে পেরেছিল তা বলতে পারি না, শুনেছি স্ত্রীলোকে বুঝতে পারে পুরুষে বুঝতে পারে না। মণি কোন দিন আমার মুখের উপর কোন কথা বলেনি কিন্তু সে দিন সে বল্‌লে, তুমি যদি ক্ষীরদার কার্য্যে পড়ে থাক তাহলে আমি এখানে আর থাকতে পারব না। তখন জুতা শুদ্ধ লাথি মেরে তার একটী দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলুম। তারপর দিন ফিরে এসে শুনলুম যে মণি আবার পালিয়েছে!" ধীরেশ বলিয়া উঠিল, "আর বলে কাজ নাই নিতাই বাবু।" ধীরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া নিতাই তাহার দুইখানি হাত ধরিয়া বসাইল এবং বলিল, "আর একটু খানি আছে ধীরেশ বাবু সেটুকু না বললে আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে না, আর একটু খানি শুনুন্‌। তার পর কি করলুম জানেন, নিজের মুখে রটিয়ে দিলুম যে আমার পরিবার বেশ্যা তার উপপতির দেখা পায় না বলে পালিয়ে গিয়েছে। পাড়ার লোকে সমাজের লোকে সবাই বললে যে নিতাইয়ের কেন

দোষ নেই। পুরুষ বাচ্ছা অমন করেই থাকে, কিন্তু মেয়েটা নিশ্চয় খারাপ নৈলে দু দুবার পালাবে কেন? তার পর কি করলুম জানেন? পুরুষ বাচ্ছা হয়ে নিজের স্ত্রীকে নিরপরাধী জেনে তার সমস্ত আশ্রয় ঘোচালুম। তার মামাত ভেয়েরা তার কলঙ্কের কথা শুনে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে তার পরও মণি এসেছিল, মাপ চাইতে এসেছিল, তার মাকে সঙ্গে করে ক্ষমাভিক্ষা করতে এসেছিল—তখন কি বলেছিলুম জানেন? তখন পুরুষসিংহ হয়ে নিজের স্ত্রীকে বলেছিলুম—রূপ আছে—যৌবন আছে—রোজগার করে খেয়ো।"

ধীরেশের মুখ খানা তখন লাল হইয়া উঠিল তাহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নিতাইসুন্দর আবার একটু হাসিয়া বলিল "রাগছেন ধীরেশ বাবু, পায়ের জুতো খুলে নিয়ে আমায় মারুন" বলিতে বলিতে নিতাই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, এবং ধীরেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন তাকে ফিরে পাবার আশা আমি রাখি না। তবে তার সঙ্গে কেন দেখা করতে চেয়েছি জানেন? একবার কেবল মাপ চাইব"। তাহার ভাব দেখিয়া ধীরেশ শান্ত হইয়া বলিল, "নিতাই বাবু, মণির ঠিকানা জানি কিন্তু আপনাকে বলিনি। মণি আমার ছোট বোনের মত আমি তাকে ভাল রকমই জানি। তার মনটা বড় নরম, সে হয়ত আপনাকে মাপ করবে। আপনি একটু বসুন মাসীমা আসুন।" এই সময় মিসেস্ মজুমদার ফিরিয়া আসিলেন এবং ধীরেশের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া নিতাইকে বললেন, আজত আর গাড়ী নেই বাবা, আজকের দিনটা তুমি এই খানেই থাক। নিতাইকে না জানাইয়া মিসেস মজুমদার তারাপদ বাবুকে তার করিলেন, ধীরেশ সেই তার লইয়া বাজারের টেলিগ্রাফ আপিষে চলিয়া গেল।

রবি-রশ্মি

[১]

মন্দির

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে সোণারবরণ।

ভিক্ষুকের মনে এই দুঃখ যে সে চায় কিন্তু পায় না কিছু কেউ তাকে দিচ্ছে না এইটিই তার দুঃখ। আমাদের সকলের চেয়ে বড় দুঃখ যে দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু নিতে পারচিনে। অন্তরের সমস্ত স্পর্শশক্তি হর্ষিত হয়ে উঠে যে বলতে পারে না, এই যে আলো এসেছে এ তোমার প্রেম, সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে রয়েছে যে পূর্ণতা আমি সম্পূর্ণ করে তাকে গ্রহণ করলুম,— "এই অভাবটি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবনে সঞ্চিত হয়ে উঠছে, তাই অন্তরের এই নিদারুণ শূন্যতা।

কত সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, যাকে খুব কাছে পেতে চেয়েছিলুম তাকে পাইনি ;—নানান্ পাওয়া না পাওয়ার সুখ দুঃখ জীবনের সূত্র ধরে মালা গেঁথে চলেচে। কিন্তু সকল আশা আশঙ্কা, সকল সুখ দুঃখের গোড়ায় রয়ে গেল একটানা একটি বেদনা। সকলের চেয়ে বড় বেদনা। বিশ্বের এই রসের ক্ষেত্রে, আনন্দের মেলায় এলুম, এই দুই চক্ষু অপরূপের দীক্ষা পেল না ; কান খোলা আছে শুনতে পেলুম না, মনের মধ্যে চিন্তা করবার শক্তি পাথেয় স্বরূপ নিয়ে বসেছিলুম তবুও এই অমৃতের সদাব্রতে আনমনা হয়ে এর ভিতর দিয়ে চলে গেলুম, আমাকে দান করার ব্যবস্থা যে যুগেযুগান্তরে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, পেতে হবে বলেই এ ভূমণ্ডলে যে আমাদের ডাক পড়েছে, এ জানতেও পারলুম না !—যে নেবে সে উদাসী হয়ে যদি চলে যায়, তবে যিনি দিয়েছেন তাঁর দেওয়া সার্থক হয় না যে !

এই ঔদাসীন্য কেন ? এর মূলে একটি কথা আছে। 'আমি' বলে আমার যে ছোট রাজ্যটুকু আছে তারই সীমানা রক্ষা করবার সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চয় করতেই আমি ব্যস্ত, তারই প্রাচীর অভ্রভেদী করে তোলবার জন্য মাল মসলা জোগাড় করতে করতেই আমার সময় গেল। মনে করি 'আমি'র আড়ালে যা সঞ্চয় করব কেবল তাই আমার হবে ; প্রাচীর গড়তে গড়তেই হয়রান হলুম যে ধনটি সঞ্চয় করব, সে যে এই বিশ্বভরে রয়েছে, এ জানবারও সুযোগ হয় না। কানে গান আসছে কিন্তু তার অর্থ বুঝলুম না, কেন না নিজের 'আমি'র রাজ্যটিকে পাকা করবার জন্য আমার হাতুড়ীটার বিরাম নেই ; আমার কত ফৌজ, কত তাদের হাঁক ডাক !—দিনের পর দিন সকালের পর সকাল অন্তরের বাণী আকাশকে প্লাবিত করে যাচ্চে, না তাতে স্নান করলুম, না তা পান করলুম ;—আমার কত হিসাব, কত কাজ, হাঁসফাঁস করতে করতে দিন যায়। আশ্চর্য্য এই অমৃতের নিকেতন, আশ্চর্য্য এই শ্যামলাবসুন্ধরা, এর কোলে প্রাণের কি উৎস নিরন্তর উৎসারিত এখানে আমাকে যে খেয়া নৌকায় পৌঁছে দিলে, কোনও কালে তার পারানি দিয়েছি কিনা তা জানি না। এই প্রাণের সুরের নিকেতনে এসে দাঁড়িয়েচি, কোন মূল্য দিইনি, কিন্তু তাই বলে কি মনও দিতে হবে না ? এত সস্তায় পাব কি করে ? বাল্যকাল থেকে কত জানাই জানলুম—পড়া মুখস্ত করলুম, পাশ করলুম অর্থ আনলুম, লড়াই করলুম—দিন ক্ষয় হয়ে গেল, অসীমের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের মধ্যে যে রয়েছি তার কথা কেউ খবর দিলে না। মানুষ হঠাৎ একদিন বলে ওঠে সংসারে আমার দুঃখের আর অবধি নেই, সংসার আমার জেলখানা। সে মনে করে যে আঘাতটা পেলে, যে অভাবটা মিটল না, সেইটে নিয়েই বুঝি তার নালিশ। জানে না, সূর্য্যের আলো যদি ঘরে প্রবেশ না করতে পায়, তবে রোগের বীজ যেমন জোর পায়, তেমনি নিখিল বিশ্বের আলোক সমীরণ অন্তরে প্রবেশ পথ যদি না পায়, তবে মানুষকে তার যে সব রিপু জীর্ণ করছে তার বিষাদ অবসাদ, তার ঈর্ষা বিদ্বেষ ক্রোধ লোভ মোহ সবাই উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। এই সব রোগ তাড়াবার উপায়, ঘরের মধ্যে অন্ধকার না জমানো, অন্তরের দরজা জানালা সব উন্মুক্ত করে দেওয়া। আমাদের মধ্যে কোনও পাপ যখন দুর্দান্ত হয়ে ওঠে, তখন আমরা গুরুর

কাছে যাই, বলি, আমাকে উদ্ধার কর। গুরু যতই বলেন সংযত হও, জপ তপ কর তাতে কিছু হয় না, কেন না সে বাইরের ঔষধ, বাইরের চিকিৎসা সুধু তাতে স্বাস্থ্য পাওয়া যায় না। "আমি"র অন্ধকারটা থেকে নিজেকে মুক্ত কর, তার জানলা দরজা সব খুলে দাও, বাহিরে যে আরোগ্য নিকেতন আছে, তার উন্মুক্ত আলোকের স্পর্শ অন্তরে বার বার অনুভব করতে হবে। আকাশের কোনও জায়গায় শূন্যতা নেই, আমাকে সমস্তই নিবিড় করে বেষ্টন করে রয়েছে, যা কিছু আছে সমস্তের নিবিড় স্পর্শ অন্তরে যখন গ্রহণ করতে পারব, তখন রোগ তাপ থেকে মুক্তিলাভ হবে। এইজন্য যাঁরা সত্যকে পেয়েছেন তাঁরা সর্ব্বমেবা বিশন্তি, সমস্তর মধ্যে তাঁরা প্রবেশ করেন। সত্য লুকিয়ে নেই, দূরে নেই, বস্তুতঃ সত্যই আছে. আর কিছু নেই। তাকে অনুভব করবার অভ্যাস একেবারেই করিনি!

অথচ এই পাওয়াই সব চেয়ে বড় পাওয়া। একে পেলে অন্যকিছু পাওয়াকে বেশী বলে মনে হয় না, সকল পাওয়াই সেই পাওয়ার অন্তর্গত হয়। যে সত্যের দ্বারা সমস্ত ধরণী, সব মানব সমাজ পূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাকে পাওয়ার দ্বারা সংসারের সব পাওয়া সম্পূর্ণ হয়। মূলে অভাব আছে বলেই ক্ষণে ক্ষণে পাই, ক্ষণে হারাই, পেতে না পেতে শুকিয়ে যায়। সব পাওয়াকে ধারণ করা, সার্থক করার জন্য এই সব চেয়ে বড় পাওয়াকে পেতে হবে বিশ্বরূপের মধ্যে অতলে ডুবে বলতে হবে আমার সর্ব্বাঙ্গে মনে দুই চক্ষে কর্ণে তোমাকে পেলুম, এমন কোথাও কিছু নেই যাতে তুমি নেই—ব্রতে নিমগ্ন হয়ে প্রতিদিন যা কিছু আছে সমস্তের মধ্যে—ওঁ, তুমি আছ, আছ, স্বীকার করব,—জীবনে এই পাওয়া ব্যর্থ না হোক!

সুখ দুঃখ, প্রিয়জন, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সব পাওয়ার যে পূর্ণ অর্থ সেটি দিতে পারবে, যখন তিনি আছেন এই স্পর্শটি পাব। নইলে সবই ছিদ্রপূর্ণ ঘট ভরবার মত হবে; একটু পাই ত একটু পাইনা, কান্নার আর অন্ত থাকে না। সকলের চেয়ে বড় পাওয়া নিয়ত যেখানে পূর্ণ করে রয়েছে সেখানে কাঙালের মত সঞ্চরণ করছি যেখানে তার জন্য রাজসিংহাসন পাতা, যেখানে আসন গ্রহণ করতে পারছ না—এই অকৃতার্থতা থেকে মানুষকে কে উদ্ধার করবে—যে হতভাগ্য চোখ থাকতে দেখে না, তার মত অন্ধ কে!

সমস্তের সঙ্গে উপছে পড়ছে যা, পেয়ালা ভরে যে সত্যকে দেওয়া হয়ে গেল, সব প্রাণ মন বিশ্বাস ভক্তি দিয়ে কি করে তাকে পাব এই সাধনাই সকলের চেয়ে বড় সাধনা। জন্মাবামাত্র জগতের মাঝখানে চোখ মেলবামাত্র তাকে পেয়েছি চেয়ে দেখ এই যে পেয়েছি, বিশ্বাস করে বল্লে হল এই যে পেয়েছি! আমার চোখে পরশমণি ঠেকিয়ে দিয়েছে, পেয়েছি সব—এইজন্য আমাদের ধ্যানের মন্ত্র ওঁ—হাঁ—হয়েছে, ওঁ—কোথাও দীনতা নেই, মৃত্যু নেই, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হয়ে রয়েছে—ওঁ।

"শান্তি নিকেতন।"

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

[২]

গত ২৮শে জুলাইয়ের Young Indiaতে শ্রীযুত এণ্ড্রুজ সাহেব রবীন্দ্রনাথের জাপান প্রবাসের একটী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তার সার মর্ম্ম এই :—হং কং থেকে জাপানের দিকে চেয়ে ব'সে আছি আর সঙ্গে সঙ্গে এই কয় ছত্র লিখছি। এই মাত্র কবির কাছ থেকে তার এসেছে আমার কাছে, যে তিনি Suwa maru জাহাজে আমার কাছে আসছেন এবং আমাকেও Singapoe যেতে হ'বে। আগে যেরূপ স্থির ছিল যে তিনি দক্ষিণ চীনে যাবেন, এখন আর তা' হোয়ে উঠল না। আজই প্রভাতে Tokyo থেকে কবির ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি অতি চিত্তাকর্ষক বিবরণ আমার কাছে এসেছে। সেটি পড়ে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি, এবং আমি সেই আনন্দ সকলের সঙ্গে উপভোগ করতে চাই—তাই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রথমেই এতে আছে কবীন্দ্রের সঙ্গে শ্রীযুত Mitsuru Toyamaর সাক্ষাতের বিবরণ। ইনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মনীষী। ইঁহার সৌজন্য ও বীরোচিত চরিত্র দেশবিখ্যাত। প্রথম দর্শনে দু'জনেই মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর শ্রীযুত Toyama জাপানী প্রথায় কয়েক বার কবিকে অভিবাদন কল্লেন এবং কবিও হিন্দু প্রথায় যুক্ত করে ধ্যান নিমীলিত নেত্রে তাঁকে প্রত্যভিবাদন কল্লেন।

জাপানের এক প্রবীন পণ্ডিতের সহিত ভারতের এক তুল্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির এই পরিচয়। সমবেত জনতা সেখানে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; ঠিক যেন দেবমন্দির প্রাঙ্গনে দেবারতি দর্শন করছিল। ইহাঁদের এই পরিচয়ে প্রাচ্যের দু'টি ভূখণ্ড প্রীতিবন্ধনে বাঁধা পড়ল। এর আগের বারে জাপানে কবি একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে Anti-Asiatic immigration সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন, তাই এবারও সমবেত লোকেরা ভেবেছিল যে তিনি সেই বিষয়েই তাঁর বক্তব্য বলবেন, কারণ আজকাল জাপানে, শুধু জাপানেই বা কেন সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে এই বিষয়টী সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। কিন্তু কবি আরও সুমহান বিষয় একটী বেছে নিলেন। তিনি জাপানীদের তাদের আত্মার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সভাপতি মুখবন্ধে খুবই আবেগের সঙ্গে বলেন "কবি, আজ আপনার উপস্থিতিতে আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত, আপনি যা বলেছেন, সেগুলি আমাদের প্রাণে সত্যকারের সাড়া জাগিয়েছে। অতীতের দিনে আপনার ভারত ভূমি জাপানকে ঠিক এই ভাবেই সাহায্য করেছিল। ভারত আবারও তা করতে পারে। আপনাদের দার্শনিকপ্রবর বুধাগ্রগণ্যদের আমাদের কাছে যদি পাঠান, আমরা আপনাদের কাছে অশেষ রূপে ঋণী থাকবো।"

তাঁর উত্তরে কবি বলেন, "আট বৎসর আগে সেবার আমি যখন জাপানে এসেছিলুম, জাপানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার বেশ একটু উদ্বেগই ছিল। জাপানের অন্ধ বৈদেশিক অনুকরণ ও নাস্তিকতা আমার এই উদ্বেগের কারণ। কিন্তু আজ আমি বেশ দেখতে

পাচ্ছি সে অবস্থা জাপানের আর নেই। আপনারা আত্মোন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং আমার বাস্তবিকই সেজন্যে আনন্দ হচ্ছে। আপনারা আমাদের কাছে প্রবীণ লোক-শিক্ষক প্রার্থনা করেছেন ; কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নাই। আপনাদের নিজেদেরই সুবিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব নেই। প্রতীচীর অনুকরণ কর্ত্তে গিয়ে পূর্ব্বে আপনারা তাঁদের যথেষ্ট অবহেলা করেছেন। আর সেরূপ কর্ব্বেন না। তাঁহাদের নিজেদের প্রতিভালোক তাঁহাদেরও আর গোপন রাখা উচিত নয়। আপনাদের এটি বোঝা উচিত যে আপনাদের এই আত্মার উদ্বোধন—যেটি হচ্ছে সত্যিকারের সুখ—সে কখনও বাহির থেকে আসতে পারে না। ইহা প্রতীচী বা আর কোনও স্থান থেকে আস্‌বে না। এটি যদি আসে তাহ'লে আপনাদের নিজেদের মধ্য দিয়েই আসবে। আজকাল জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা এ নয় যে কিরূপে অর্থোপার্জ্জন কোরে ঐহিক সুখ লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হ'চ্ছে কিরূপে যথার্থ সুখ,—সে সুখ ভিতর থেকে আসে,—পাওয়া যায়। প্রাচ্য দর্শন এবং আপনাদের দর্শন-শাস্ত্রও ঠিক এই কথাই বলে। এই যে যুগ যুগ ধরে এসিয়া আত্মার ধর্ম্মকে পবিত্রজ্ঞানে পূজা করে এসেছে, সেই ধর্ম্মের জন্য আপনারা লজ্জিত হবেন না। আপনাদের ধর্ম্মের আদর্শের জন্য আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না। আজকাল আপনাদের প্রয়োজন হচ্ছে আত্ম-মুক্তির। এইটিই হচ্ছে এ জগতের সকলের যথার্থ প্রয়োজন। ঐহিক বাসনা-কলুষিত ক্ষণিক সুখ থেকে আত্মাকে মুক্ত করাই হচ্ছে জীবনের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন—এবং সে জায়গায় জাগিয়ে তুলতে হ'বে সেই আনন্দকে—যার সাড়া আমাদেরই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মেলে।

এর পর কবি দরিদ্রদের কথা তুললেন। এবং তাঁর কণ্ঠে উদাত্ত সুরে দরিদ্রের জয়গান বেজে উঠল যাঁরা আমাদের সেবা করেন, তাঁদের সেবা আমাদের ক'র্ত্তেই হ'বে। এই হ'চ্ছে এ জগতের ধারা—এ ধারা লঙ্ঘন কর্লে তার ফল বিষময় হবে। দরিদ্রেরা আমাদের সেবা করেছেন ; আমাদের উচিত সেই দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা। যেরূপে পারি তাঁদের এই দানের প্রতিদান দেওয়া, তাঁদের জীবন সৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত করা, তাঁদের জীবনে সুখের আলোক রেখা ফুটিয়ে তোলা,—এই-গুলিই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। জগতের যা' কিছু ভাল, যা' কিছু সুন্দর, সে যদি কেবল জনকতক ভাগ্যবানেরই সম্পত্তি হয়, তবে সভ্যতার বিনাশ এবং আমাদের এই যুগেরও ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী। শতাব্দের পর শতাব্দী ধরে দরিদ্রের উপর এই অত্যাচার আজ শেষ সীমায় পৌঁছেছে সর্ব্বত্রই অশান্তির সাড়া জেগেছে। সমগ্র জগৎ আজ ধনী নির্ধন, সুখী অসুখী, শ্রমিক ও বনিক,—এই দুটি মাত্র দলে রূপান্তরিত হয়েছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই অমানুষিক দলাদলি চলবে, ততদিন আমরা শান্তির তথা কল্যাণের মুখও দেখতে পাবোনা।

আপনারা আমার কাছে বিজ্ঞ লোকনেতায় প্রার্থনা করেছেন ; তাঁরা খুব সুলভ ন'ন্। আমার ইচ্ছা আমি আমার স্বদেশবাসী ভারতের দরিদ্রদের জাপানে নিয়ে আসি এবং

আপনারাও আপনাদের স্বদেশবাসী জাপানের দরিদ্রদের ভারতে নিয়ে যান্। বাস্তবিক সকল দেশের দরিদ্রেরা যদি নিজেদের মধ্যে অবাধে সংমিশ্রণের সুযোগ পায়, তা'হলে প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন ক্রমশই দৃঢ় হতে থাক্‌বে, কারণ এই দরিদ্রনারায়ণের মধ্য দিয়েই এবং শিশুদের উপলক্ষ্য' করেই মর্ত্ত্যে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হ'বে।"

উপসংহারে কবি বলেন্ যে তিনি নিজে কোনও প্রকার সম্মানের আকাঙ্ক্ষা রখেন্ না, কেননা তিনি প্রাচীন হয়েছেন সম্মানের প্রতি তাঁর কোনও লোভ নেই। তাঁর খুবই আশা হয়, তিনি তাঁর ভ্রমণ উপলক্ষ্যে এমন সব বীজ বপন কর্বেন, যা অদূর ভবিষ্যতে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হ'য়ে মানুষের ভিতর পরস্পরের প্রতি সখ্য ও সৌভ্রাত্র জাগিয়ে তুল্‌বে।

জাপানের বহুগণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তির সম্মুখে কবি তাঁর এই বক্তৃতা করেন,। এই বক্তৃতা শুনে ভারতের প্রতি জাপানীদের প্রীতির উদ্রেক হয়। আমেরিকা জাপানীদের বহিষ্কৃত করায় জাপানে বেশ একটু গুরুতর রকমেরই সাড়া পড়ে গিয়েছে। ঠিক্ এই সময়ে কবি এইরূপ বক্তৃতা করে জাপানীদের মনে ভারত সম্বন্ধে সহানুভূতির সাড়া জাগিয়ে তুলেছেন্।

এর আগের বারে কবি যখন জাপানে যান্, জাপান তখন তাঁকে অগ্রাহ্য করেছিল। প্রথমে অবশ্য সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তিনি যে মুহূর্ত্ত থেকে আত্মা সম্বন্ধে বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন, সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত জাপানী সংবাদপত্রের সুর বদলে গেল। তিনি বিজিত জাতির কবি; অতএব, তাঁর কথা তাঁরা শুনতে মানা কল্লেন্। সেই সময়েই কবি পরাজিতের গান লেখেন্।

এতদিন পরে জাপান যে আবার ভারতের কবির প্রতি ফিরে চেয়েছে, সেটি খুবই আনন্দের কথা। এ আনন্দপ্রকাশের ভাষা নেই। জাপান আর তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং অনুরাগে বলেছে ওগো তুমি এসো, আবার এসো; সকলকে নিয়ে আবার এসো।"

টোকিওর এই সভাতেই কবি বলেন্ যে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁকে অন্যান্য জায়গায় যেতে হ'বে; কেননা, তাঁর স্বদেশের বাণী শোনবার জন্যে তাঁর অন্যত্র থেকে আমন্ত্রণ এসেছে। এবার তিনি ইতালী ও তারপর দক্ষিণ আমেরিকায় যাবেন, অন্ততঃ তিনি এইরূপই আপাততঃ স্থির করেছেন।

শ্রীসুধেন্দুকুমার বসু।

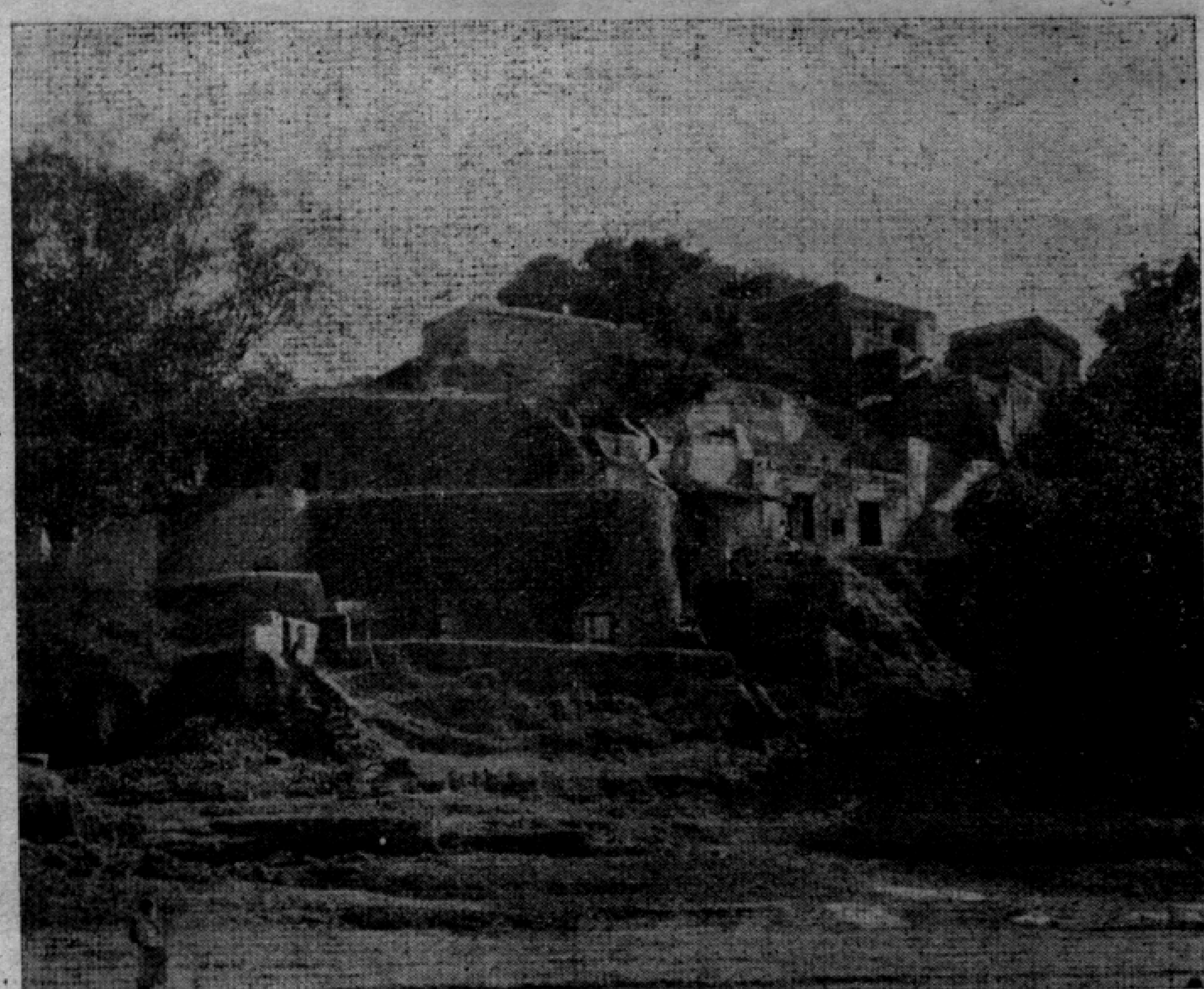
প্রতিষ্ঠানপুর ও জতুগৃহ

(ঝুসি) (লাক্ষাগড়)

প্রয়াগ দুর্গের পূর্ব্বদিক হইতে গঙ্গা যমুনা সঙ্গম স্থলের কিঞ্চিৎ উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গঙ্গার তীরবর্ত্তী ঝুসি নামক বিখ্যাত প্রাচীন গ্রাম ও তদুপরিস্থিত দুটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামটীই পৌরাণিক যুগের বুধের পুত্র চন্দ্রবংশীয় খ্যাতনামা নৃপতি ঐলবা পুরূরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর বলিয়া আবহমান কালাবধি কিংবদন্তি চলিয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে দেবী ভাগবতের একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সুদ্যুম্নেতুদিবংযাতে রাজ্যচক্রে পুরূরবাঃ।
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জন তৎপরঃ॥
প্রতিষ্ঠানপুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্ব নমস্কৃতম্।
চকার সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারঞ্জন তৎপরঃ॥"

(দেবীভাগবত ১।১৩।২-২।)



প্রতিষ্ঠানপুরের একটী দুর্গ

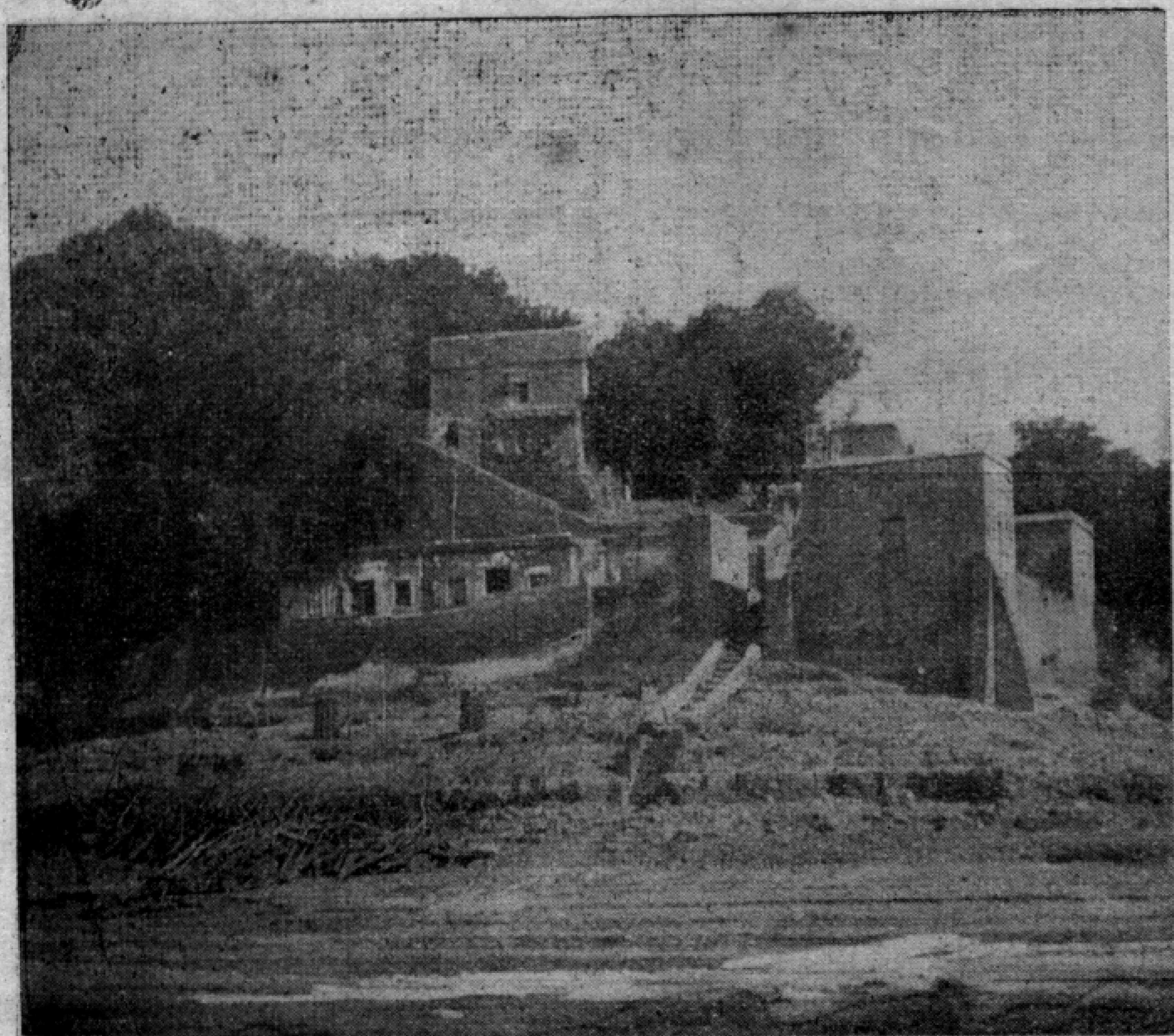
এতদ্ব্যতীত হরিবংশে আরও পরিষ্কার রূপে উল্লেখ আছে—

"সেই মহাযশস্বী পৃথিবীপতি পুরূরবা মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত পবিত্রতম প্রয়াগ প্রদেশে জাহ্নবীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠান নগরে রাজ্য করিয়াছিলেন।"

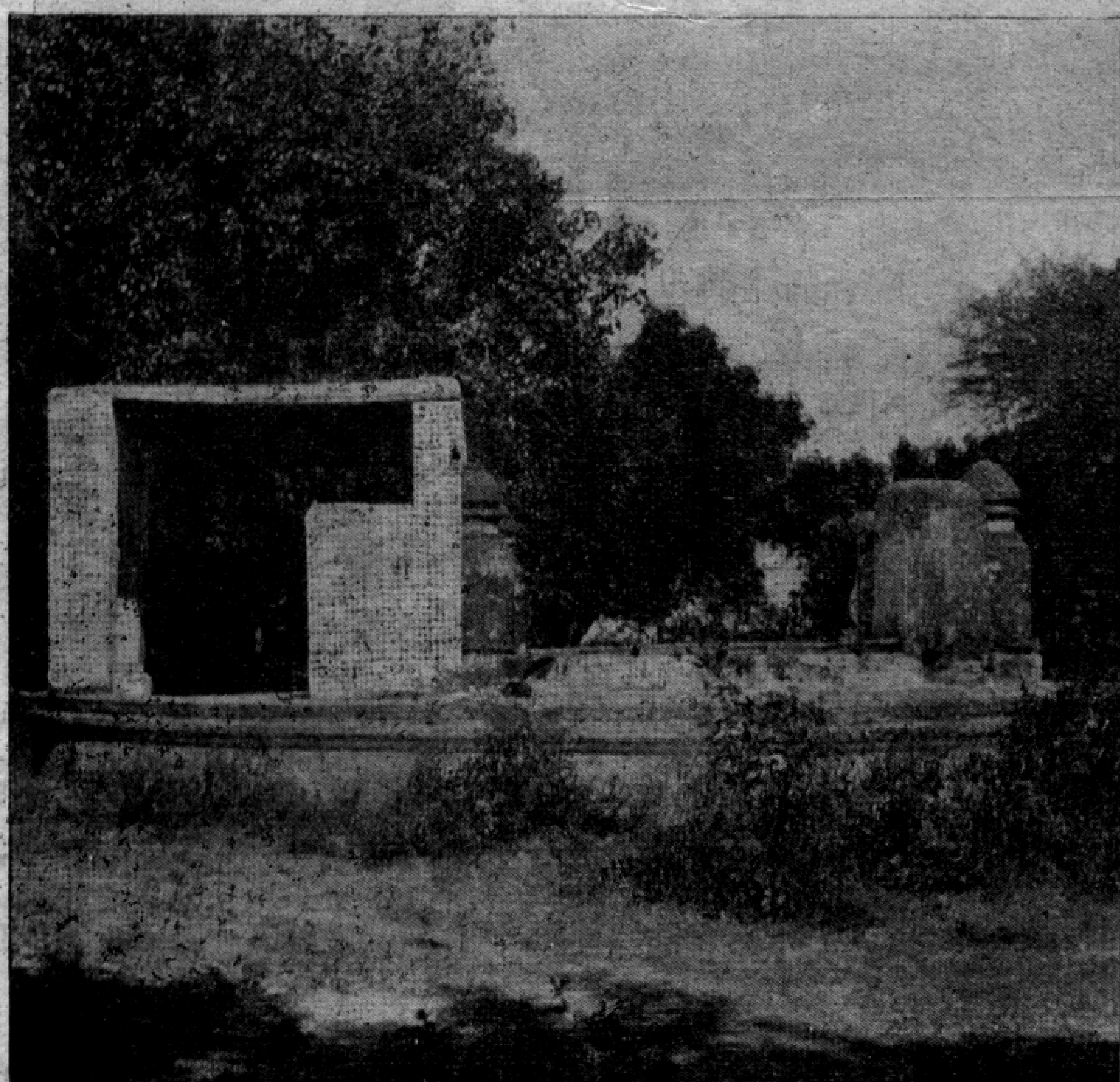
(হরিবংশ ২১ অধ্যায়ের শেষ)

কান্যকুব্জের অধিপতি পরিহার বংশের শেষ রাজা ত্রিলোচনপালের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পাওয়া যায়। তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে একদা এই প্রতিষ্ঠানপুরে আসিয়া তিনি রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ মগধের অধিপতি রাজা ভীমবশ কর্ত্তৃক তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলে এইস্থানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে কোন এক কালে এ স্থানে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ বাস



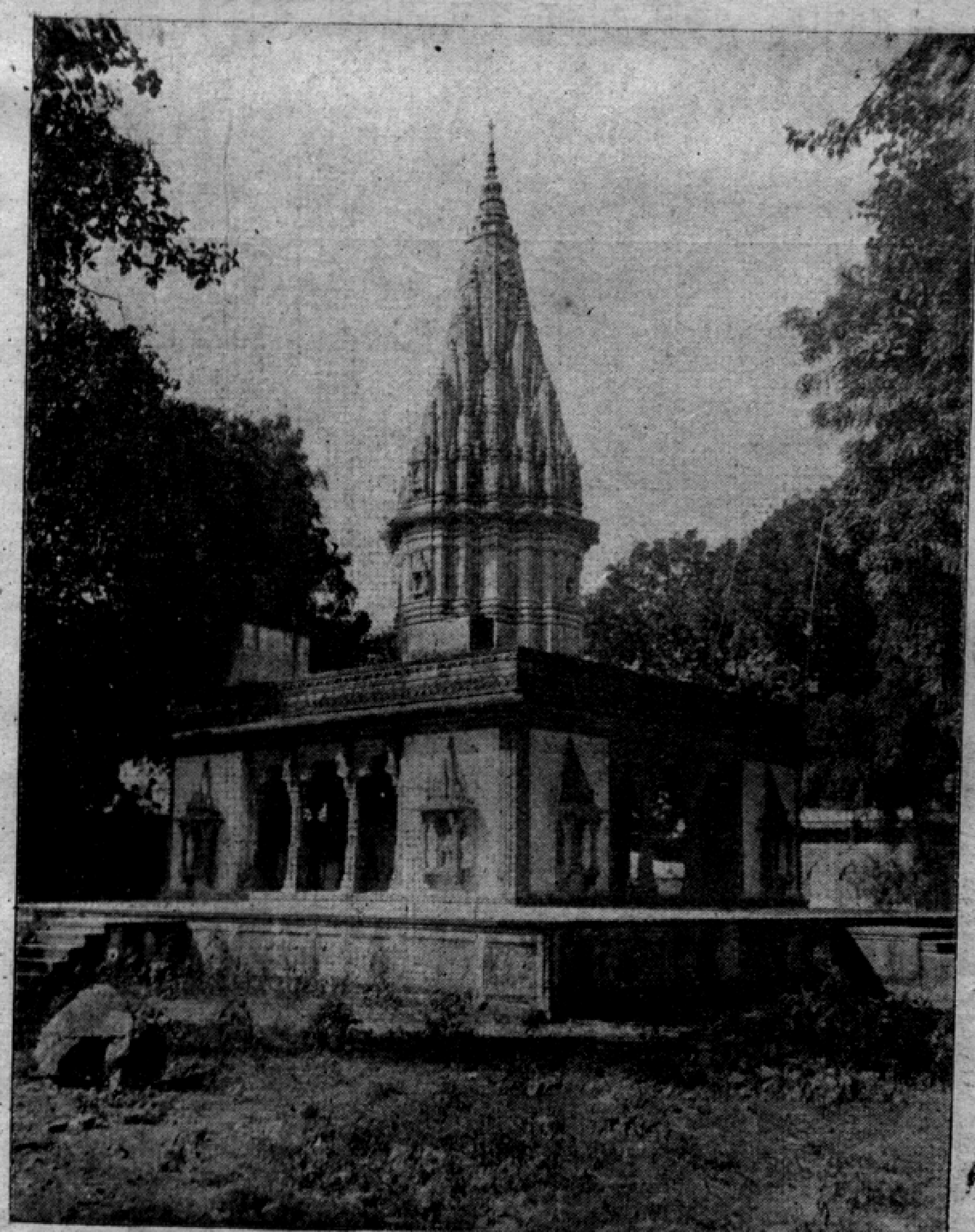
প্রতিষ্ঠানপুরের একটী দুর্গ



সমুদ্রকূপ—প্রতিষ্ঠানপুর ঝুসি

করিতেন। অবশেষে তাহারা এ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক এলাহাবাদ জিলার উত্তরস্থ প্রতাপ-গড় প্রভৃতি নানাস্থানে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

যে দুটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখানে আছে তন্মধ্যে একটী হর্ষগুপ্ত কর্তৃক এবং অপরটী সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। হর্ষগুপ্তের সম্বন্ধে কেহ কিছু না কহিলেও সমুদ্রগুপ্ত যে একটী দুর্গ স্থাপন করেন ইহা কেহ কেহ স্বীকার করে না ; কিন্তু ইহা বিচিত্র নহে যে মগধের অধিপতি সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্রাট উপাধি ধারণ করিবার জন্য যে সময়ে দিগ্বিজয় যাত্রা করেন সেই সময় তাহার দ্বারা এই দুর্গটী প্রস্তুত হইয়াছিল। যাহা হউক কুমারগুপ্তের কতকগুলি মুদ্রা এখানে প্রাপ্ত হওয়াতে একদা এই স্থান যে গুপ্তরাজাদের রাজধানী ছিল ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।



তেওয়ারীর মন্দির—প্রতিষ্ঠানপুর ঝুসি

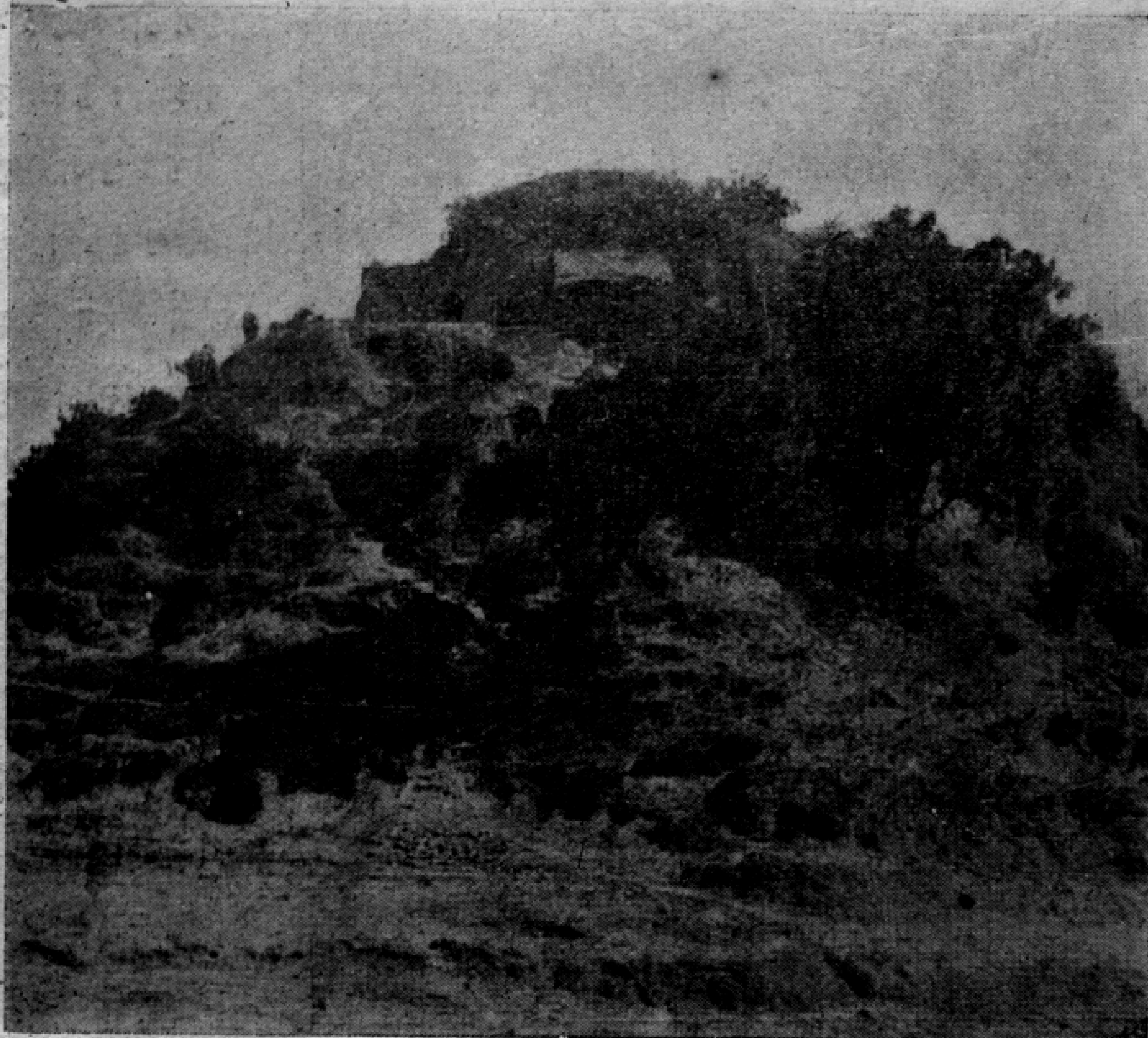
একাদশ খৃষ্টশতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষের হিন্দু নৃপতিগণ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া হীনবল হইয়া পড়িলে সেই সুযোগে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। ইতিহাস হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তৎকালে গুর্জ্জরাধিপতি আত্মরক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ স্থানে প্রাচীন যুগের চিহ্নের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুটী দুর্গ ব্যতীত সমুদ্রকূপ নামে সমুদ্রগুপ্তের নাম সমন্বিত একটী বৃহৎ কূপ বিদ্যমান আছে। দুর্গ দুটীর একটীতে একখানি আধুনিক ইষ্টক গৃহ নির্ম্মিত করিয়া কোন ব্যক্তি ইহার প্রাচীন সৌন্দর্য্যের খর্ব্ব করিয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

এখানে যে কয়টী মন্দির ও মুসলমানদের কবর ইত্যাদি আছে তন্মধ্যে জনৈক তেওয়ারীর প্রতিষ্ঠিত সুদৃশ্য মন্দিরটী দ্রষ্টব্য বটে। ঐ মন্দির অতি প্রাচীন বোধ না হইলেও নিতান্ত আধুনিক মনে হইল না। এলাহাবাদের জনৈক ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম যে ইহা দুই শত

বৎসরের কিঞ্চিদধিক প্রাচীন হইবে। এতদ্ব্যতীত শেখতকী নামক জনৈক মুসলমান ফকিরের দগরগাহের বিষয় উল্লেখ যোগ্য।

সোবহান্ উল্ মিল্লতের পুত্র সৈয়দ সদর উল্হক্ তকীউদ্দীন্ মোহাম্মদ আবুল্ আকবর ১৩২০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। ঐ ব্যক্তি শুদ্ধাচারী হইয়া সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ঈশ্বর উপাসনায় কালযাপন করিত। এজন্য আবালবৃদ্ধবনিতা আবহমানকাল পর্য্যন্ত তাহাকে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করে। ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কবরের উপর বর্ত্তমান দরগাহটী নির্ম্মিত হয়। এ দরগাহ্ একটী পবিত্র স্থান বলিয়া সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

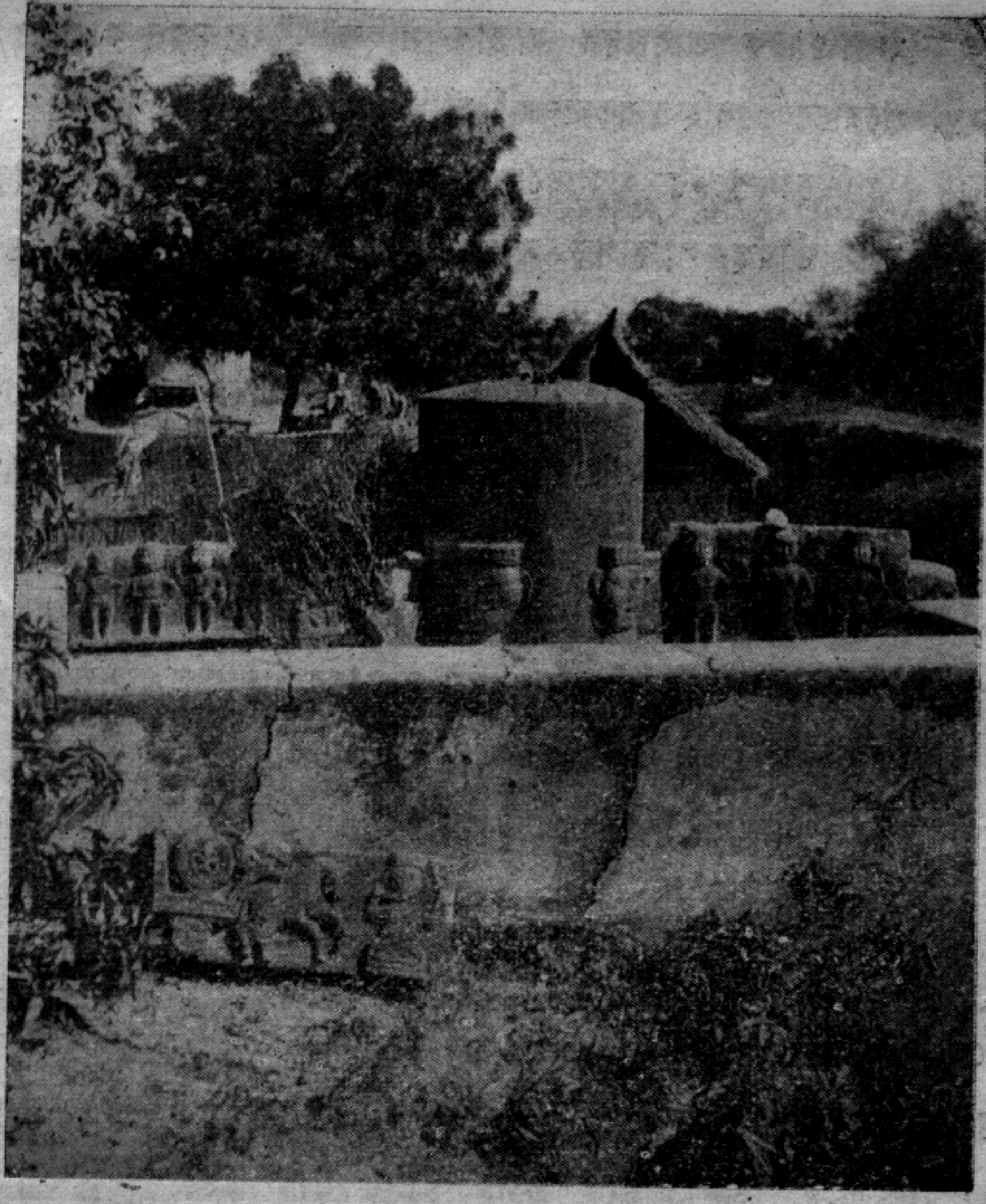


জতুগৃহ বা লাক্ষাগড়

১৭১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদসাহ মোহম্মদ মোঅজ্জম বাহাদুর সাহের মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়জ্জদ্দীন স্বীয় ভ্রাতাগণকে নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ পূর্ব্বক জহান্দার শাহ নাম ধারণ করেন। ইহার কিছু পরেই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরোখ সিয়র বঙ্গদেশ হইতে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য যুদ্ধ করিতে গমন করিবার কালে পথে উক্ত দরগাহে প্রবেশ করিয়া শেখতকীর উদ্দেশে ভক্তিভরে অভিবাদন পূর্ব্বক যুদ্ধ যাত্রা করেন।

পরম্পরাগত প্রবাদ হইতে জানা যায় যে একদা হরবং নামক জনৈক বাতিকগ্রস্ত রাজা

প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করেন। এজন্য এককালে এ স্থানের নাম হরবংপুর বা হরভুমপুর হইয়াছিল। উক্ত অদ্ভুত প্রকৃতির রাজার দ্বারা এরূপ অদ্ভুত নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে দিবাভাগে কেহই কোন কাজ করিতে পারিবে না। রজনীযোগেই হাট বাজার দেবার্চ্চনা রাজকার্য্য কৃষি কর্ম্ম ইত্যাদি সমস্তই নির্ব্বাহ হইবে এবং যৎসামান্য দ্রব্য হইতে মূল্যবান রত্ন কাঞ্চন পর্য্যন্ত এক পরিমাণে ও সমমূল্যে বিক্রয় হইবে। কোনরূপে কাহারও দ্বারা উক্ত নিয়মাবলীর কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে সেই ব্যক্তি গুরুতর রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। আমি



চতুর্ম্মুখবিশিষ্ট শিলাস্তম্ভ প্রোঞ্চ বেদী লাক্ষাগড়

এলাহাবাদে থাকিবার কালে এ সম্বন্ধে এক কৌতকাবহ হিন্দী কবিতা শুনিয়াছিলাম।। কবিতার দুই চরণ ব্যতীত আর কিছুই মনে নাই। সেই দুই চরণ—

"অঁধেরী নগরী অদ্ভুত রাজা,
চকসের ভূজাটকসেরখাজা।"

কিংবদন্তি হইতে আরও জানা যায় যে গোরক্ষনাথ ও তদীয় গুরু যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক রাজা হরবংএর রাজ্য ধ্বংশ হইয়া ঝুন্সির দুটী দুর্গ বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানেরা কহে যে ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আলীমুর্ত্তজা নামক জনৈক ফকীরের মন্ত্র বলে প্রচণ্ডবেগে ভূমিকম্প আসিয়া দুটী দুর্গের এরূপ শোচনীয় অবস্থা করিয়াছিল।

উল্লিখিত দুইটী দুর্গ প্রাকার ও তন্নিম্নস্থ ভূমি খনন পূর্ব্বক কতকগুলি গুহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন ও কয়েকখানি আধুনিক। তন্মধ্যে একটী গুহার ভিতর সোপানের দ্বারা অল্প নিম্নে অবতরণ করিলে এক মহাবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ঐ গুহা গুলির অভ্যন্তরে কতকগুলি গঞ্জিকা সেবী সন্ন্যাসীরা বাস করে।

জতুগৃহ (লাক্ষাগড়)

যে জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবকে তাহাদের মাতার সহিত জীবন্ত দহন করিবার জন্য দুর্য্যোধন তাহার কুচক্রী মন্ত্রী পুরোচনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সে স্থান এলাহাবাদ জিলায় এখনও বিদ্যমান আছে। প্রতিষ্ঠানপুরের পূর্ব্বদিকে প্রায় দশ মাইল দূরে হাণ্ডীয়া নামক গণ্ডগ্রামের অল্প দক্ষিণে গঙ্গার উত্তর তীরস্থ লাক্ষাগড় নামে যে এক পর্ব্বতপ্রায় বৃহৎ ও উচ্চ মৃত্তিক স্তূপ আছে, তাহাকেই ঐ প্রদেশের সর্ব্বসাধারণে সেই প্রাচীন জতুগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইহা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলই মহাভারত যুগে বারণাবত নামে পরিচিত ছিল বলিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গেজেটিয়র হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

এই মৃন্ময়স্তূপে একটী অতিজীর্ণ ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যেই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে পুরোচন নির্ম্মিত সেই জতু গৃহটি ছিল। বর্ত্তমান কালে ইহাতে গুহা খনন করিয়া কয়েকজন সন্ন্যাসী বাস করে। পল্লীবাসীদের মুখে শুনিলাম যে বৃষ্টির জলধারায় ঐ স্তূপের মৃত্তিকা গলিয়া পড়িলে তাহার মধ্য হইতে প্রাচীন কালের মুদ্রা ও তৈজস পত্রাদি কদাচিৎ কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এ মৃন্ময় স্তূপ হইতে অল্প দূরেই একটী ইষ্টক নির্ম্মিত চতুষ্কোন বেদীর উপর প্রায় দুইহস্ত পরিমান উচ্চ খোদিত চতুর্ম্মুখ বিশিষ্ট একখানি শিলাস্তম্ভ প্রোথিত আছে। এই চতুর্ম্মুখ বিশিষ্ট শিলাস্তম্ভ লোকে মহাভারতোক্ত পাণ্ডব দাহনের চিহ্ন স্বরূপ ব্রহ্মার বেদীরূপে নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে।

ঐ স্থানে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ কতকগুলি নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তর ফলক সংগ্রহপূর্ব্বক ঐ বেদীতে সজ্জিত করিয়া একখানি ফটোগ্রাফ তুলিয়াছি!

স্থানীয় লোকের নিকট জানিলাম যে পূর্ব্বে লাক্ষাগড় এক বর্দ্ধিষ্ট পল্লী ছিল। প্রতিবৎসর গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এখানে বহু লোক সমবেত হইত এবং তৎকালে নানাবিধ আমোদ উৎসব ও মেলা হইত। এখন আর সে সব কিছুই নাই। সমস্তই অতীত গর্ভে বিলীন হইয়াছে এবং পল্লীর অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

চিত্রকর কথিকা

(১)

সে ছিল চিত্রকর।

প্রভাত সূর্য্যের এক ঝলক কনকরশ্মি যখন ছড়িয়ে পড়ত চিত্রকরের কুটীরের উপর—অঞ্জলি ভরা স্বর্ণরেণুর মত—তখন চিত্রকর জেগে উঠত তার ঘুম থেকে—একটা নব আশা নব উদ্যম নিয়ে। তারপর সে এসে বস্‌ত তার কুঁড়ের সামনে একটী ঝাউ গাছের তলায় তার রঙ্‌ ও তুলি নিয়ে। তারপর তুলির আগায় রঙ লাগিয়ে সে ছবি আঁকত একমনে। সারাদিন সে ছবি আঁকত নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে। আবার যখন সাঁঝের আঁধার এসে সেই জায়গাটিকে ঘিরে ফেল্‌ত—বিশ্বকর্ম্মা তাঁর তুলি দিয়ে পশ্চিম গগনটা রাঙা করে দিত ঠিক আবীরের মত—ঝাউ গাছটা ভরে যেত পাখীর কাকলীতে—অস্তগামী সূর্য্যের শেষ দু একটা রশ্মি—ধরার কোল হতে দিনেকের তরে বিদায় নিয়ে লুকাইয়ে পড়িত কোন সাগরের পারে তখন চিত্রকর উঠত তার ছবি আঁকা শেষ—করে তারপর ক্লান্ত দেহখানা নিয়ে চলে যেত কুটীরের ভিতরে।

এমনি যাওয়া আসা করে সে কাটিয়ে দিলে তার জীবনের কৈশোরকে তারপর একদিন আপনার অলক্ষিতে হঠাৎ পা দিলে যৌবন সাগরে। এই সাগরে তার জীবন খেয়াকে সম্পুর্ণরূপে ভাসাতে না ভাসাতে—কার ফাল্গুনের হাসির কল্লোলে তার মন গেল উধাও হয়ে কোন অজানার তরে। তার সব খেই গেল হারিয়ে।

চিত্রকর চুপ করে উদাস প্রাণে উদাস মনে বসে থাকে। ছবি আঁকা আর তার ভাল লাগেনা। কার চিন্তা মনের কোণে অহরহ উঁকি মেরে মনটাকে রঙিয়ে দেয় কোন এক রঙীন নেশায়। কার বিরহ ব্যথা মনের মাঝে কাঁটার মত ফুটতে থাকে। তার বড় দুঃখ হয়—কেন সেদিন সে সেই জ্যোৎস্নাভরা রাতে—বসন্তের বায়ুর হিল্লোলে মেতে অধীর হয়ে বেরিয়ে এসেছিল আপন শান্তিময় কুটীর ছেড়ে—বিশ্বের মাধুরীকে তার চিত্রপটে ফুটিয়ে তোলবার মানসে? তার কি আবশ্যক ছিল? এসেছিল সে পুলকে ভরা মনখানা নিয়ে আর কুটীরে ফিরে গেল কি নিয়ে—একটা বেদনা—একটা ব্যথা একটা চিন্তা নিয়ে। এ সুখের কল্পনা তার মনে কেন উদয় হয়েছিল? পরক্ষণে তার রাগ হল রাজকুমারীর উপর—কেন সে ক্ষণেকের তরে এসে—দেখা দিয়ে তার মনটাকে এক রঙীন নেশায় মস্‌গুল করে দিয়ে গেল? কেন সে একবার সবে ফোটা ফুলের মত হেসে চিত্রকরের মনটা করে দিয়ে গেল অবশ—মুগ্ধ! তার জীবনের সব সুখ সব শক্তি হরে নিয়ে শুধু দিয়ে গেল তাকে ব্যথায় ভরা দুর্ব্বহ জীবনটা বইতে!

(২)

"আমায় ছবি আঁকতে শেখাবেন ?"

চিত্রকর তন্ময় হয়ে রাজকুমারীর চিন্তা কচ্ছিল একটা অজানা অচেনা স্বরে চমকে উঠল। একি ? এ কার কণ্ঠস্বর ? চিত্রকর বিস্মিত হল। তার হৃদয়ের সব তন্ত্রীগুলি আবার সেই বীণার সঙ্গে সুর মেশবার জন্য ঝঙ্কার উন্মুখ হয়ে উঠল!

"আমাকে আপনি ছবি আঁকতে শেখাবেন ? চিত্রকর মুখ ফিরিয়ে দেখলে রাজকুমারী রাজকুমারী আপনার স্তব্ধ চোখ দুটী চিত্রকরের পানে নিবদ্ধ করে রৈল। কই এত সুন্দর ভাবে ত সে সেদিন চিত্রকরকে দেখে নাই ? রাজকুমারীর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল সিন্দুরের মত। আপনাকে সামলে নিয়ে রাজকুমারী বল্লে "কই আপনি যে কথাই বলছেন না ? বলুন, কবে থেকে আমায় শেখাবেন ?" অতি কষ্টে লজ্জা সংবরণ করে চিত্রকর—বল্ল, "দেখুন আমি ছবি আঁকার কি জানি ? আর তা ছাড়া আপনার পিতার অমতে—কি করে—"

বাধা দিয়ে রাজকুমারী বল্লে, "তাতে কি ? আপনি যা জানেন আমায় তাই শেখাবেন—আর বাবার মত আমি করিয়ে নিয়েছি।"

চিত্রকর বল্লে—"আর দেখুন আমার এই জীর্ণ কুঁড়েতে এসে কি আপনার মত রাজকুমারী বসতে পার্বেন ? আমার ত আর ঘর দোর নেই!

উৎসাহের সঙ্গে রাজকুমারী বল্ল, "খুব পার্ব্ব—আপনি বসতে পারেন আর আমি পার্ব্ব না খুব পার্ব্ব—আপনি কবে থেকে শেখাবেন বলুন—"

রাজী হয়ে চিত্রকর বল্ল "যবে থেকে আপনার ইচ্ছে।"

"কাল থেকেই ?"

"বেশ" বলে চিত্রকর রাজকুমারীর মুখের পানে চাহিল।

"আজ তবে যাই" বলে রাজকুমারী অতি ধীরে ধীরে চলে গেল।

পরদিন থেকে চিত্রকর রাজকুমারীকে ছবি আঁকা শেখাতে লাগল। প্রথম দু একদিন খুব সঙ্কোচ হ'লেও পরে সব ঠিক হ'য়ে গেল।

(৩)

মুচকে হেসে রাজকুমারী বল্ল "ও কি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন কেন ? আমার মুখের দিকে বুঝি চেয়ে থাকলেই ছবি আঁকা শেষ হবে ? তা হ'লে আজকে আর হবে না। অপ্রস্তুত হ'য়ে চিত্রকর ছবিটা নাবিয়ে নিয়ে ছবিতে রং ফলাতে মন দিল।

"ও কি ওখানে ত লাল রং দিতে হবে ? আপনি সবুজ রং দিচ্ছেন কেন ? আঃ আপনার দ্বারা কিছু হবে না—দিন আমায় দিন আমি ঠিক করে দিচ্ছি। "দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিত্রকর বল্লে, সত্যি রাজকুমারী—আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।"

"রাজকন্যা তুলি রেখে চিত্রকরের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—"সত্যি আপনার কি হ'য়েছে

বলুন দেখি? আপনার আর কিছুতেই আজকাল মন লাগে না? হতাশ ভাবে চিত্রকর বল্লে" কি জানি রাজকুমারী কেন আমার কিছু ভাল লাগে না তা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।" "আচ্ছা আপনি ত আগে আগে খুব ভাল ভাল ছবি আঁকতেন, আজকাল আর আঁকেন না কেন?"

চিত্রকর বল্লে, "কি করে জানলেন যে আমি আগে খুব ভাল ছবি আঁকতুম?" আপনি এখানে রোজ বসে না খেয়ে দেয়ে ছবি আঁকতেন আর তা ছাড়া আপনার আঁকা ছবি ও দেখিছি; আজকাল আর কেন আঁকেন না? এমন ছবি আঁকবেন যে তাতে একটা কীর্ত্তি রেখে যাবেন। "বলছ ত কিন্তু মনের মত আদর্শ পাই কোথায়? আমার চিরকাল থেকেই ইচ্ছা যে একটা বিষাদের ছবি আঁকব—খুব করুণ ছবি কিন্তু আদর্শ পাই না।

রাজকুমারী বল্লে—কি ছবি? কেমন আদর্শ দরকার?"

চিত্রকর বল্লে, "এমন একটা ছবি—স্বামী স্ত্রী দুজনে মনের সুখে থাকে। কিছুদিন পরে তাদের মাঝে এক নূতন জীব এসে তাদের সুখের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলে। ভগবানের দেওয়া সেই আশীর্ব্বাদটী নিয়ে তারা বেশ দিন কাটাচ্ছিল—কিন্তু অত সুখ তাদের প্রাণে সৈল না—ছেলেটীকে ভগবান পুনরায় ফিরিয়ে নিলেন। মা ছেলেকে নিয়ে বসে আছে ছেড়ে দেবে না কিছুতে?"

রাজকুমারী ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল,—বল্ল, "না না ও ছবি ভাল না—ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। অন্য একটা আদর্শ দিন।

চিত্রকর বল্ল—"আচ্ছা আর একটা নমুনা দিচ্ছি"—উৎসুক হ'য়ে রাজকন্যা চিত্রকরের মুখের পানে চাইল।

চিত্রকর বল্ল, "তোমারই মত একজন রাজকুমারীর সঙ্গে আমারই মত একজন নগণ্য চিত্রকরের দেখা—এক শুভক্ষণে এক ভরা চাঁদনির রাতে। চিত্রকর রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হ'ল"।

পলকের জন্য রাজকুমারীর মুখখানা রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল—বল্লে "তারপর?"

"তারপর রাজকুমারীকে চিত্রকর সব জানালে। চিত্রকর বিমুখ হ'ল"—

সহসা রাজকুমারীর দুটী হাত ধরে চিত্রকর বল্লে—"রাজকুমারী এখনও বুঝতে পারনি রাজকুমারী কে ও চিত্রকর কে?" লজ্জায় রাজকুমারীর মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল বুকখানা যেন কে সহসা দুলিয়ে দিয়ে গেল, সে নত মুখে রৈল।

অধীর হ'য়ে চিত্রকর বল্লে—"বল রাজকুমারী একি একান্ত দুরাশা?"

রাজকুমারী হাত ছাড়িয়ে চলে গেল - যাবার সময় দুটী কঠোর কথা বলে গেল।

চিত্রকর বসে বসে কি ভাবছিল সেই জানে হঠাৎ তার চৈতন্য হ'ল দাসীর কথায়। দাসী রাজকুমারীর চিঠি দিয়ে চলে গেল। চিঠি পড়ে চিত্রকরের মুখখানা হ'য়ে গেল কাগজের মত সাদা। চিঠিতে লেখা ছিল—'কাল থেকে আর যাব না—আমারছবি আঁকবার আর রুচি নেই।

(৪)

এই ঘটনার পর প্রায় পাঁচ ছ বছর কালের কোলে ঢোলে পড়েছে। অনেক ঝড় ঝাপটা এই ক বছর চিত্রকরের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। চিত্রকর সব নীরবে সহ্য করেছে—চিত্রকর স্থির, ধীর। রাজকুমারীর চিন্তা একদিনের জন্যও তাকে আর বিচলিত করেনি। রাজকুমারীর অনেক আহ্বান অনেক ডাক সে অগ্রাহ্য করেছে যায়নি—কিন্তু যখন তার কাছে এবার কোন এক অজানার ডাক এল তখন সে স্থির থাকতে পাল্লে না। এক বাদল রাতে—রাজকুমারীর টানা টানা চোখ দুটী আঁকা শেষ করে সে কোন এক অসীম আধারে মিশিয়ে গেল।

* * * * * *

এমনি এক বাদল রাতে কি একটা স্বপ্ন দেখে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ তার মনে প'ড়ল চিত্রকরের কথা "রাজকুমারী এ কি একান্ত দুরাশা ?" সারা রাত্রি রাজকুমারী চোখের পাতা বুজতে পাল্লে না। তার প্রাণটা করুণায় ভরে উঠ্‌ল।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। সবে মাত্র সন্ধ্যাদেবী তাঁর কাল আচল খানি বিশ্বের কোলে বিছিয়ে দিচ্ছিলেন। সূর্য্যদেব অস্তে যাচ্ছিলেন—আকাশের ভালে একটী বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। রাজকুমারী চলেছে চিত্রকরের কুটীরে যেচে দেখা কর্ত্তে। কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত দেখে—রাজকুমারী আশ্চর্য্য হ'ল। কৈ চিত্রকর কৈ ? তবে কি চিত্রকর নেই ? রাজকুমারী ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখলে। ওকি তার ছবি না ? হাঁ৷ তারইত ? রাজকুমারীর ছবির পাশে চিত্রকরের ছবি—চিত্রকর যেন রাজকুমারীর হাত ধরে বলছে, "একি একান্ত দুরাশা রাজকুমারী ?"

ছবির নীচেই একখানা চিঠি রাজকুমারীর নামে। রাজকুমারী চিঠি পড়ল।

"একদিন না একদিন তুমি এখানে আসবে জেনে আমার কুটীরের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছি। সেই যে তোমায় একদিন ছবির কল্পনার কথা বলেছিলাম সেই ছবিটা কেমন হ'য়েছে—বেশ না ? আমার উপর যদি তোমার একবিন্দুও করুণা থাকে রাজকুমারী—যদি একদিনের জন্যও আমাকে ভালবেসে থাক ত আমার অনুরোধ এই ছবিখানি তুমি যত্ন ক'রে রেখে দিও—তাতেই আমি সান্ত্বনা পাব। আর আমার হৃদয় কুটীরের দ্বার চিরকালই তোমার জন্যে খোলা থাকবে—এ জগতে আর সে দ্বার রুদ্ধ হ'ল না—তোমার আশায় থাকব, দেখি মরণের পারে এসে তুমি দয়া করে সে দার রুদ্ধ কর কি না। যদি ভালবাসা নিতে আপত্তি না থাকে ত আমার প্রাণভরা ভালবাসা নিও।

ইতি অভাগা চিত্রকর।

রাজকুমারী স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তার নয়ন দুটী হ'তে অবিরাম অশ্রু ঝরতে লাগল—শ্রাবণের ধারার মত। সে ছবিখানিকে বুকের মধ্যে নিয়ে অজস্র চুম্বনে সেটাকে ভরিয়ে দিল। মনে মনে বল্লে "তোমার এ নীরব ভালবাসার মর্য্যাদা আমি অক্ষুন্ন রাখব প্রভু।

* * * * * * * *

ছবিখানি বুকে করে নিয়ে রাজকুমারী নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে প'ড়ল। স্বপ্নে দেখলে যেন চিত্রকর মরণের পার থেকে তাকে আহ্বান কর্চ্ছে। নিদ্রিতা রাজকুমারী সাড়া দিল "যাই প্রভু যাই।"

—— —   শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১

নদীর তীরে কুঞ্জঘেরা কুটিরে বসে চিত্রকর শুধু ছবিই আঁকে—ছবি আঁকা তার ব্যবসা নয়—ছবি আঁকা তার সারা জীবনের সাধনা।

সে পাখীর গান শুনে তন্ময় হয়ে যায়; ভোরের আলোতে দুরন্ত চঞ্চল শিশুর উজ্জ্বল হাসির মত নদীর জলের আনন্দ-চঞ্চল গতির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে; ম্লান আলোতে রক্ত ফাগের লালিমার আভায় যখন সাঁঝের আকাশ ছেয়ে যায় চিত্রকর তখন ভক্ত পূজারীর মত নির্নিমেশ নয়নে বসে থাকে—তারপর একাগ্রমনে তার ক্যানভাসের ওপর ফুটিয়ে তুলতে চায় সেই উজ্জ্বল হাসি, আর সাঁঝের সেই ম্লান আভা।

* * * * * এম্নি করেই দিন যায়—সেদিন ভোরের আলো তখনও রাতের আঁধার কাটিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌছায় নাই—সেই আলো-আঁধারে ছাওয়া নদীর বন-পথের ধারে চিত্রকর এসে দাঁড়ালো, রাজকন্যা তখন স্নান করতে নদীতে যাচ্ছিলেন—সেই আধেক-আলো আধেক-অন্ধকারের মাঝখানে রহস্য ঘেরা স্বপ্নের মত চিত্রকরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজকন্যার কবিপ্রাণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। চিত্রকর তার বিস্ময়ভরা চোখদুটো তুলে চাইতেই দুজনার চোখাচোখি হয়ে গেল—একটা সলজ্জ রক্তিম আভায় রাজকন্যার মুখ চোখ রঞ্জিত হয়ে গেল আর চিত্রকরের চোখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো প্রেমের শুকতারা।

* * * * * সেই থেকে আলো আঁধারের মাঝখানে প্রত্যেকদিন দুজনার দেখা হয়। কন্যা ভাবেন 'এই ব্যর্থ প্রেম দিয়েই জীবন দেবতার প্রথম আরতির দীপ জ্বাল্‌বো' আর চিত্রকর ভাবে 'ওগো মানসী তোমাকেই যে আমি যুগ যুগ ধরে চেয়ে আসছি—এই ব্যর্থ প্রেমের মধ্য দিয়েই নিজেকে আমি সার্থক করে তুল্‌বো।'

* * * * * সেই থেকে চিত্রকর আর সেই নদীর উছ্‌লে পড়া হাসি কিংবা সাঁঝের ম্লান হাওয়া ক্যানভাসের সাদা বুকে ফুটিয়ে তুলে না—নিজের সবটুকু দিয়ে আজকাল সে মানসীর মূর্ত্তিকে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়। ভোর বেলা দেখা হয়ে যায়—আর সারাদিন ধরে নিজের বুকের রক্ত দিয়ে একটু একটু করে মানসীকে রূপদান করে।

* * * * * দিনের পর দিন যায়—চিত্রকরের চোখে প্রেমের শুকতারা দিনের পর দিন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হতে থাকে আর সেই মাসে মাসে রাজকন্যার হাসিভরা চোখে বিজ্ঞানের রেখা গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠে।

* * * * মানসীর ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—চিত্রকর উৎফুল্ল হয়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালো আজ মানসীকে দেখে সে ছবির উপর শেষ রেখা টেনে দেবে। দূরে রাজ-পুরীতে তখন উৎসবের সুরে নহবত বেজে উঠেছে—আপনভোলা চিত্রকর সন্ধানই রাখে না কিসের এ উৎসব।

ধীরে ধীরে রাজকন্যা এসে দাঁড়ালেন—হাতে তাঁর সদ্যফোটা ফুলের গাঁথা একছড়া মালা। জলভরা চোখে একটুখানি ম্লান হাসি টেনে এনে মালাখানি দয়িতের গলায় পরিয়ে দিয়ে কন্যা শুধু বল্লেন "বিদায় বন্ধু বিদায়।"

* * * * সেই থেকে রাজকন্যা আর আসেন না। চিত্রকর প্রত্যেক দিন সেই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর যখন ভোরের আলো প্রথম মেঘের মত পৃথিবীর বুকে ফুটে উঠতে থাকে তখন একটা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলে সেই জায়গায় একটা সপ্রেম চুম্বন এঁকে দিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কুটিরে ফিরে আসে।

* * * * * * মানসীর দেওয়া ফুলের সেই মালা ম্লান হয়ে গেছে। চিত্রকর সেই শুকনো মালা গলায় পরে ব্যর্থ প্রেমের শোণিত দিয়ে দিনের পর দিন তার মানসীর মুখে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়—তার শেষ দিনের দেখা সেই সজল চোখে ঝরা সেফালীর কালিমার মত ম্লান মৃদু, হাসিটি।

শ্রীতরুণকুমার বসু।

বাবলা

২৯

ঘরের মধ্যে একটা শয্যার উপর বসিয়া বিভা—মুখে এমনি ভীত ভাব যে হঠাৎ দেখিলে তাকে চেনা যায় না। আর শয্যার একটু দূরে হেদায়েৎ, আর ... এ কি, বৃন্দাবন সামন্ত!

প্রমোদ বলিল,—এর মানে কি বৃন্দাবন বাবু?

বৃন্দাবন একেবারে অবাক হইয়া গেল, মুখে তার কথা জোগাইল না। সে মাথা নীচু করিল। পুলিশ বলিল,—এখন গ্রেপ্তার হয়ে থানায় চলুন,—wrongful confinent কেশ! হেদায়েৎ প্রমোদের পায়ের কাছে পড়িয়া বলিল,—আমি সব কথা বলছি, সাহেব,—আমার কোন দোষ নেই। এই যে ভদ্দর আদমী দেখছেন,—এই উকিল-সাব ইনিই যত কু-পরামর্শ দিচ্ছেন। আমার সর্ব্বনাশ করে দিলেন, অথচ আমি ওঁকে টাকা দিয়েছি কাঁড়ি কাঁড়ি, কোন দোষ করিনি!

হেদায়েৎ আগাগোড়া সব কথা খুলিয়া বলিল—উকিল বৃন্দাবন সামন্তর সঙ্গে সে

হাইকোর্টের এক কৌঁসলীর বাড়ী যাইবে বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল তার ছেলের কেশের আপীলের জন্য। ট্রামের রাস্তায় আসিয়া একটা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময় বিবির ট্যাক্সি ট্রামের পোষ্টে ধাক্কা খাইয়া এক কাণ্ড বাধে! সে যায় তাঁকে রক্ষা করিতে, তারপর যখন একটা ট্যাক্সিতে তাঁকে তুলিয়াছে, তখন বৃন্দাবন উকিল বলে, তোমার বাড়ী লইয়া চল, তারপর জ্ঞান হইলে ঘরে পৌছাইয়া দিয়ো! তাই হেদায়েৎ তাহাকে গৃহে আনিয়াছে এবং তার মর্য্যাদার কোন হানি করে নাই। তবে, এখানে আটকাইয়া রাখা! বৃন্দাবন আসিয়া পরিচয় পাইয়া বলে, ভারী মজা হইয়াছে ইহাকে আটকাইয়া রাখা, দ্বিজেন্দ্র-বাবু হাকিমের মেয়ে! একবার পল্টুকে সাজা দেওয়ার মজাটা দেখাই! হেদায়েৎ চুপ করিল, তারপর আবার বলিল,—শুধু এই বৃন্দাবন উকিলের জন্য! না হইলে সে কোন্‌কালে বিভাকে মাথায় করিয়া তার গৃহে রাখিয়া আসিত! এখন সে তো সব কবুল করিল, সাহেবের যে শাস্তি ইচ্ছা হয় দিন। প্রমোদ বিভার পানে চাহিল, কহিল,—এখানে এরা তোমার কোন রকম অপমান করেনি? বিভা কহিল,—না। এই লোকটিকে বাড়ী পৌঁছে দেবার কথা বলেছিলুম, ও দিচ্ছিলও, কিন্তু ঐ বাঙালী বাবুই বলছিলেন,—দাঁড়ান, বসুন, ব্যস্ত হচ্ছেন্ কেন? A very mean fellow! বৃন্দাবন তখনো কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া ছিল! প্রমোদ বলিল—এখন কি করা যায় বৃন্দাবনবাবু?

পুলিশ-ইনস্‌পেকটর বলিল,—এখন আমার হাতে ছেড়ে দিন—ভারী নজীর বার করেন, আইন দেখান, আইনবলে আমাদের চোখরাঙান এখনি সব ঠিক করে দেবখ'ন। মক্কেলদের সঙ্গে এক গারদে আসুনতো খানিকক্ষণ, চাই কি, কতকগুলি মক্কেলও সেইসঙ্গে কোন্ না জুটে যাবে! ছি, ছি, আপনি শিক্ষিত বলে নিজের পরিচয় দেন।

প্রমোদ বলিল,—আর উকিল! এত বড় professionটার আজ যে এই দুর্ণাম তা আপনার মত কতকগুলো ইতরের জন্য!

বৃন্দাবন উকিল একবার প্রমোদের পানে ও পরক্ষণে ইনেস্‌পেক্টরের পানে চাহিল এবং শেষে উহার পানে কাতর মিনতিভরা দৃষ্টিতে চাহিল। বিভা সে দৃষ্টি লক্ষ্যও করিল না।

পুলিশ বলিল—তাহলে মিছে দাঁড়িয়ে কি হবে! আসামী চালান দি।

ইন্‌সপেক্টর হেদায়েৎকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিবামাত্র বিভা বলিল,—না, ওকে ছেড়ে দিন,—না হলে বিপদ আরো যে কি হত জানিনা। ও খুব সম্ভ্রম করেছে, সম্মানও করেছে।

পুলিশ কহিল,—তবে এ সাক্ষী হবে'খন, আসামী তা হলে আমাদের বৃন্দাবনবাবু! তবে ভয় হয় আইনজ্ঞ মানুষ, আইনের সূক্ষ্ম নজীরে খালাস হয়ে যাবেন, এই যা ভয়!

নিজের নিরুপায়তার কথা ভাবিয়া বৃন্দাবনের চোখে জল আসিল সে বলিল, আমায় ক্ষমা করুন প্রমোদবাবু আমি কানমলচি নিজের আর কখনো কোন বেয়াদবির মধ্যে পাবেন না আমাকে।

প্রমোদ কহিল,—Try to make yourself worthy of the profession to which you belong. এই বারের যা traditon আছে তা বজায় রাখবার জন্য চেষ্টা করবেন এখন থেকে। ওকালতি ব্যবসা আর কোকেন বেচা ব্যবসা দুটোর মধ্যে প্রভেদ আছে। bullying করে পয়সা রোজগার করতে চান্ যদি কোর্ট ছেড়ে আর কোন জায়গা বেছে নিন! তারপর পুলিশের দিকে চাইয়া বলিল আর গণ্ডগোলে কাজ নেই—ওকে ছেড়ে দিন্। আমি অনতিবিলম্বে লাইব্রেরীতে সব ব্যাপার বলব'খন যে সমস্ত ব্যবস্থা করবেন, তাই চূড়ান্ত হবেখ'ন! কটা একথা মনে হচ্ছে—কথাটা এই, কলকাতা সহরে যত বদমায়েস গুণ্ডার বা কোকেনওয়ালা আছে তাদের দুর্বৃত্ততা এত প্রচণ্ড কখনো হতে পারতো না যদি তাদের পিছনে বৃন্দাবনবাবুর মত উকিলের সলা পরামর্শ না থাকতো আমরা অনেক সময় এদের বদমায়স হতে দিই, লেখাপড়া শিখে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে!

প্রমোদের এই কথাগুলা তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ হলেও বৃন্দাবনের মনে সেগুলা বিঁধিল না সে কেবলি ভাবিতেছিল, ভারী বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছে সে, তাই এতখানি উদ্বেগ ও আশঙ্কা। এই নিরুপায়তার মধ্য হইতে কোন মতে নিষ্কৃতি পাইলে সে এবার হুসিয়ার হইয়া এর প্রতিশোধ লইবে, তা এমনি প্রশস্ত হইবে যে,...সে শোধ যে কি করিয়া লইবে বৃন্দাবন বেশ করিয়া বুঝিয়া সুজিয়া তবে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবে! এখন কোন মতে এ দায় পরিত্রাণ পাওয়া চাই। বৃন্দাবন মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, এবারটি আমায় মাপ করুন, প্রমোদ বাবু। প্রমোদ বলিল, আমি যেন করলুম কিন্তু ইনি...কথাটা বলিয়া প্রমোদ বিভার পানে চাহিল। বিভার এ গোলমাল অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—এই বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্য হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়! এ দুঃসহ বন্দিদের এখনি চালান করা দরকার।

বৃন্দাবনের প্রতি দারুণ ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠিলেও বৃন্দাবন মাপ চাহিল যখন—বিভা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—আমি মাপ করেছি ওঁকে—এখন আমাদের চটপট্ বাড়ী ফেরবার বন্দোবস্ত করুন।

বৃন্দাবন বিভার পানে একটী ভ্রূকুটিপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—ধন্যবাদ আপনাকে! এখন আমি তাহলে যেতে পারি বোধ হয়!

পুলিশ ইনস্পেক্টর বৃন্দাবনকে বলিলেন,—আপনাদের লাইব্রেরীতে এ ব্যাপারটার কথা আপনি নিজেই বলবেন, না, একজন রিপোর্টারকে দিয়ে বলে পাঠাব?

বৃন্দাবন ছল ছল নেত্রে প্রমোদের পানে চাহিল। প্রমোদ বলিল—আমিই ওদের সেক্রেটারিকে বলবো একটা প্রায়শ্চিত্ত আপনার করা চাই বৃন্দাবনবাবু—এমনি মাপ চেয়ে বেকসুর চলে যাবেন, তাতে আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের একটু ছিনী থেকে যাবে যে!

বৃন্দাবন ভাবিল, এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলে পরে লাইব্রেরীতে যা হয়, সে পরে দেখা যাইবে, তাই সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

হেদায়েৎ প্রমোদ ও বিভাকে সেলাম করিয়া বলিল,—হুকুম করুন, গাড়ী বোলায় দি। প্রমোদ বলিল—দাও।

হেদায়েৎ তার এক অনুচরকে একটা গাড়ী ডাকিয়া দিতে বলিলে অনুচর বাহির হইয়া গেল। হেদায়েৎ তখন বৃন্দাবনকে একটা সেলাম করিয়া বলিল,—সেলাম উকিল বাবু—খুব সলা দিয়েছিলে! আর একটু হলে জেলে যেতে হতো! আর এ পাড়ায় ঢুকো না—আমরা খারাপ আদমি,—ইজ্জৎ রাখতে পারবো না!...পয়সার লেগে পকেট কাটতে সুরু করে দিন্ আপনার মগজ আছে ওকালতি ছোড়ে দিন্। কথাটা বলিয়া হেদায়েৎ হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিল। তার সে শব্দ বাজের আওজের মত বৃন্দাবনের প্রাণের মধ্যে ঝনঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সে আর কথা না কহিয়া বেত্রাহত কুকুরের মত নতমস্তকে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাবলা এক ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—প্রমোদ তাকে একেবারে উচ্ছ্বসিত আবেগে বুকের কাছে টানিয়া তার গায়ে হাত রাখিয়া বলিল,—বাবলা তোমার জন্যই আজ মস্ত ফাঁড়া কেটেছে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করচি; বাবলা—কোন কথা বলিল না।

তারপর গাড়ী আসিলে প্রমোদ ও বিভা পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল, হেদায়েৎ বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইয়া মাপ চাহিয়া কহিল,—আপনার তাঁবেদার আমি জানবেন, বাবু সা'ব—আর মায়ি, হামি তোমার লেড়কা, কসুর মনে রাখবেন না।

বিভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—ভালো হয়ো এবার থেকো।

হেদায়েৎ বলিল,—মায়ির কথা রাখবো। বদকাম ছোড়ে দিব।

প্রমোদ বলিল,—বাবলা, গাড়ীতে ওঠো আমাদের ওখানে চল—আজ তোমায় প্রাইজ দেব।

বাবলা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আজ থাক্—আমার মার বড় অসুখ বেড়েছে—আমার মনে ছিল না—আমি মার কাছে যাই...

প্রমোদ বলিল,—চল, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই।

বাবলা বলিল,—না, না—দরকার নেই। বলিয়া সে দৌড় দিবার উপক্রম করিল।

প্রমোদ বলিল,—এসো, গাড়ীতে এসো বাবলা, আমরা তোমার মার কাছেই যাব। এসো—বাবলার কাণে সে কথা পঁহুছিল না—সে তখন এক দৌড়ে সে গলির মোড় পার হইয়া গিয়েছে। বিভা প্রমোদের পানে চাহিল। প্রমোদ বলিল—এমন পাগল!

বিভা বলিল,...আচ্ছা ওর মার বড় অসুখ—বললে না!

প্রমোদ বলিল,—হাঁ। ওর ঠিকানা তো জানিনা—তারপর একটু থামিয়া বলিল,—ঐ মোড়ে কাগজয়ালারা আছে—তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবো, ওর মাকে দেখে তবে বাড়ী যাব কি বল?

৩০

কাগজওয়ালা ছোকরাদের কাছে বাবলার ঠিকানা জানিয়া লইয়া প্রমোদ যখন গাড়ী করিয়া তার ঘরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছাইল তখন রাত্রি অনেক। বাড়ী স্তব্ধ। প্রমোদ ও বিভা গাড়ী হইতে নামিয়া ডাকিল, বাবলা।

সে সাড়া দিল না। প্রমোদ বাড়ীর উঠানে গিয়া ডাকিল,—বাবলা…

বাড়ীখানা এমনি জমাট স্তব্ধতা বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে যে গা ছমছম করে!

বিভা প্রমোদের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়াছিল। এবারো কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া বিভা প্রমোদের পানে সকরুণদৃষ্টিতে চাহিল। প্রমোদ কহিল,—এখনো বাড়ী ফেরেনি বাবলা—তাহলে ঘুরেই আসি—কি বল?

বিভা কোন জবাব দিল না। প্রমোদ আবার ডাকিল,—বাবলা…

এবারো কোন সাড়া নাই। ব্যাপার কি! বাড়ীতে মানুষ নাই না কি?… ঐ যে একটী ঘরে আলো জ্বলিতেছে! প্রমোদ আলো লক্ষ্য করিয়া আগাইয়া গেল,—কহিল বাড়ীতে কে আছে? ভগবতী নিজের ঘরে বসিয়াই মালা জপ করিতেছিলেন—প্রমোদের কণ্ঠস্বরে তিনি দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন ও অতিথিদের দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সরিয়া গেলেন—ঘরের দ্বার প্রান্ত হইতে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন,—কাকে খুঁজচেন?

প্রমোদ বলিল,—বাবলাকে।

ভগবতী বলিলেন,—সে তো এখনো ফেরে নি।

প্রমোদ বলিল,—ফেরে নি!…প্রমোদ ফিরিতেছিল—আবার সে প্রশ্ন করিল,—তার মা কেমন আছেন? ইনি তার মাকে দেখতে এসেছিলেন।

ভগবতী বলিলেন,—অসুখ খুব! এখন ঘুমুচ্ছেন—সন্ধ্যার পর থেকেই বেশ ঘুম এসেছে তা আসবেন কি। বাবলা এখনি ফিরবে।

প্রমোদ বলিল,—বাবলা নেই, উনিও ঘুমোচ্ছেন, আচ্ছা একটু পরে আসবো আবার। বাবলাকে বলবেন,—আমরা আসবো।

প্রমোদ ও বিভা চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র বাবু বাহিরের ঘরেই বসিয়াছিলেন মুখে চোখে দারুণ উৎকণ্ঠার ভাব। প্রমোদ ও বিভা ঘরে আসিলে তিনি বলিলেন,—ব্যাপার কি বিভা?

প্রমোদ বলিল, খুবই বিপদ হয়েছিল।

বীরেন্দ্রবাবু চমকিয়া উঠিলেন,—বিপদ! কি বিপদ?

প্রমোদ সব কথা খুলিয়া বলিল। এবং বাবলার জন্যই যে এ যাত্রা মান ইজ্জত রক্ষা হইয়াছে বিভাকে অমন করিয়া ফিরাইয়া পাওয়া গিয়াছে, এ কথাও বিশেষ করিয়া বলিল।

শুনিয়া বীরেন্দ্রবাবু কিয়ৎক্ষণ বিস্মিতের মত চাহিয়া রহিলেন,—পরে কহিলেন,—বাবলা কে?

প্রমোদ তার পরিচয় দিল। বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—এখনি চল, আমায় নিয়ে চল—আমি তাকে দেখবো!

প্রমোদ বলিল,—তার মার কিন্তু বড় অসুখ।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—আমি তাদের এখানে নিয়ে আসবো তার মার চিকিৎসা করাবো। এত বড় বিপদে যে উদ্ধার করলে, তার এ দায়ে যদি না দেখি আমার তাহলে মহাপাপ হবে।...

বীরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন বিভাকে বুকের মধ্যে টানিয়া তার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন,—মা, মা...চল,—আমরা সবাই গিয়ে তাদের নিয়ে আসি। তুমি তার মার সেবা করবে কি বল?

বিভা বলিল—হাঁ বাবা। এ ছেলেটিকে দেখে অবধি এমন মায়া হয়েছে আমার!... এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালে না—আমরা গাড়ীতে উঠলুম—সেও ঝড়ের মত বেরিয়ে চলে গেল। তার বাড়ীতে গেলুম, এখনো এসে পৌঁছয় নি।

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—চল, সে ছেলেকে মাথায় করে রাখবো আমি—আর তার মাকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি তবেই এ ঋণের কতক শোধ হবে! ভাগ্যে সে দেখেছিল—দেখে প্রমোদের কাছে ছুটেছিল। সে-ও তো আর পাঁচটা কুঁড়ের মত শুধু দাঁড়িয়ে মজা দেখতে পারতো! তাহলে কি হতো...বীরেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপদের অতীত মুহূর্ত্তটা তার দারুণ নির্ম্মমতা লইয়া তাঁর চক্ষের সামনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

বিভা ডাকিল,—বাবা...

বীরেন্দ্রবাবুর চমক ভাঙ্গিল। বিপদ জাল কাটিয়া গিয়াছে! আঃ তিনি প্রমোদের পানে চাহিয়া বলিলেন—তুমি বিভাকে উদ্ধার করেছ, বিভা, আজ থেকে তোমাদের রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিবাহ হবে, হওয়া উচিত। আমি সে বিবাহ দেব। প্রমোদ কাছে এসো...

প্রমোদ কাছে আসিল, বীরেন্দ্রবাবু তার হাতখানি ধরিয়া বিভার হাতে সংস্থাপন করিলেন এবং আবেগকম্পিত স্বরে বলিলেন,—বিভা তোমার—বিভা আজ থেকে তুমি প্রমোদের স্ত্রী। সর্ব্বকর্ম্মে ওর সহকর্ম্মিনী সঙ্গিনী হবে—তোমরা পরস্পরে পরস্পরের সুখ দুঃখের ভাগী হবে।

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—শুভকার্য্য একটা শুভ লগ্ন দেখে সম্পন্ন করা যাবে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য বাবলাদের ওখানে যাওয়া। একটা গাড়ী আনাও। গাড়ী আসিলে বীরেন্দ্র বাবু প্রমোদ ও বিভাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী বাবলার গৃহ অভিমুখে ছুটিল।

... ...

স্তব্ধ ঘরে তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে। বীরেন্দ্রবাবু পাগলের মত গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন সঙ্গে প্রমোদ ও বিভা।

ঐ ঘর…ঐ যে বাবলা কাঁদিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। প্রমোদ ছুটিয়া কক্ষমধ্যে ঢুকিল। শয্যার জীর্ণ ফুলের মত ঐ…প্রমোদ ডাকিল বাবলা…বাবলা চকিতে চাহিয়া দেখিল—তারপর বাবলা ছুটিয়া আসিয়া প্রমোদকে জড়াইয়া ধরিল,—মা, আমার মা…নেই, নেই…নেই গো…

একি স্বপ্ন…না, কি এ! ভগবতী শৈলর দেহ কোলে তুলিয়া কাঁদিতেছিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন। সেই ঘুমই শেষ ঘুম বাবা—তবে সুস্থ। ঘুমোচ্ছে, আরে কেউ দেখলে না জানলে না, মা আমার নীরবে চলে গেল। ছেলেটাও কাছে ছিল না গরীবের উপর ভগবানের এমনি অবিচার!

বিভা আসিয়া শৈলর কাছে বসিল—বীরেন্দ্রবাবু স্তম্ভিতভাবে তাদের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রমোদ বাবলাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল বাবলা…

বাবলা নিজেকে ছিনাইয়া মার মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া পড়িল—কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত কহিল,—আমি ছেড়ে দেব না—মার সঙ্গে আমি যাব আমার মা! আমার মা! মা ছাড়া আমার কেউ নেই যে…সেই মাকে ছেড়ে আমি কোথায় থাক্‌বো! বিভার দুই চোখে জল পড়িতে লাগিল—এইটুকু আগে জীবনের আমাদের স্পন্দনে একি রাগিনী এ বাজিয়া উঠিল! সে যে গাড়ীতে বসিয়া কতখানি কল্পনা করিয়াছে নিজে নিজেদের ছোট পরিবারের মধ্যে বাবলা ও তার মাকে লইয়া গিয়া বাবলা ছেলেটিকে মানুষ করিবে…তার মাকে আপনার জন করিয়া গড়িবে এবং আজিকার সেই বিপদের ব্যাপার উপলক্ষ্যে বাবলার সঙ্গে কত কথা কহিবে।… একি হইয়া গেল!

বহুক্ষণ এইরূপ কল্পনা ও বিলাপের পর শেষ কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিল। বীরেন্দ্রবাবু ও বিভাকে গাড়ীতে তুলিয়া প্রমোদ বলিল—আপনারা যান্—আমি শেষ পর্য্যন্ত থাকবো তারপর কাল সকালে বাবলাকে নিয়ে ফিরবো। আমার বাড়ীতে একটা খবর দেওয়াবেন মা ভাববেন ওদিকে। বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তাই করা উচিত তোমার। আমরা বাবলাকে নেবার জন্য প্রস্তুত থাকবো।

… … …

প্রত্যুষে প্রমোদকে একা ফিরিতে দেখিয়া বীরেন্দ্রবাবু কহিলেন সে ছেলেটি কৈ? প্রমোদ বলিল—এলো না—তাকে আনতে পারলুম না। তার একমাত্র বন্ধন ছিল তার মা—সেই মাকে হারিয়ে সে আর লোকালয়ে আসবে না—ঢের চেষ্টা করলুম তবু আনা গেল না। সে সেই ঘাটে বসে রইলো। বললে কোথাও যাবে না সে তবে যদি মন হয় কোথাও যাবার আমার এখানে ডাকলেই আসবে।

বীরেন্দ্রবাবু একদৃষ্টে প্রমোদের পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, এলো না? প্রমোদ বলিল,—না।

প্রমোদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিভা ছুটিয়া আসিল, কহিল, বাবলা?

বীরেন্দ্রবাবু বলিলেন,—সে এলোনা মা—বাঁধনহারা হরিণশিশু আহা বেচারী !...আহা বলেছে যদি কোথাও যায় তো তোমার ওখানেই আসবে ! ভালো !...তা এক কাজ কর কাউকে পাঠাও, তাকে চৌকি দেবার জন্য···ছেলেটির মস্ত মন আর সেই মনের বলও আলোক প্রচণ্ড··যদি কিছু করে বসে ! সেইটুকু চৌকি দেওয়া দরকার, কাউকে পাঠাও।

প্রমোদ বলিল বেশ আমি লোক নিয়ে যাচ্ছি···

প্রমোদ তখনই একজন ভৃত্যকে লইয়া ঘাটে ফিরিল—ভৃত্যকে রীতিমত উপদেশ দিয়া বাবলার কাছে গিয়া ডাকিল—বাবলা...

সে ডাক বাবলার কাণে গেলোনা সে তন্ময় চিত্তে একদৃষ্টে নদীর পানে চাহিয়াছিল নদীর জল ছাড়িয়া ওপারের তীর ছাড়িয়া আকাশ ছাড়িয়া বাবলার দৃষ্টি দূরে আর বহুদূরে মার সন্ধানে ফিরিতেছিল তার মনে হইতেছিল আকাশের স্তর ভেদ করিয়া তার সোণার রথ ছুটিয়াছে মেঘের পর মেঘ কাটিয়া ঐ যায় সোণার রথ...ঐ রথে মা চলিয়াছে কোন্ সে আলোকময় মনোহর রাজ্যে যে রাজ্যেরোগনাই, শোক নাই...

প্রভাত সূর্য্যের আলোয় আলোকরা আকাশের মাঝে মাথার ঐ সোণার মুকুটে আলো পড়িয়া জলজল করিতেছে...উপরে তার মা চলিয়াছে—

গদগদ কণ্ঠে বাবলা ডাকিল,—মা, মা···

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শেষ

কালের প্রবাহ

প্রচণ্ড ফাঁকি

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহকে লর্ডলিটন একটা প্রচণ্ড ফাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে আমরা মহা খাপ্পা হইয়াছি। খাপ্পা হওয়া ভাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু তলাইয়া দেখা উচিত—এত বড় একটা শক্ত কথা বলিতে সাহসে কুলায় কেন, কাহারো ? কোথাও একটা কিছু গলদ আছে হয়ত আমাদের। সে গলদ যাঁহারা সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের নয়, যাঁহারা যোগ দেন নাই তাঁহাদের।

বিশ বাইশ বছর আগে পুরীর রাজাকে একজন ইংরেজ কালক্টর অপমানিত করেন। পুরীর রাজা হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শরীরী প্রতিরূপ। তাঁহাকে অপমান করা, তাঁর প্রাসাদে সবুট প্রবেশ করা, রথযাত্রার প্রতিবন্ধক করা—এ সকলই জগন্নাথদেবেরই অপমান করা। সংবাদ হিসাবে এ কথা সেদিনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা হইল এ ভাবে 'ভারতী' ছাড়া আর কোন ...

বিশেষ মন্তব্য হয় নাই—হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণে চোট লাগে নাই। ভারতীর প্রবন্ধ পড়িয়া সে সময় একজন সনাতনী হিন্দু বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে, আমাদের দেবতার অবমাননায় আপনি যে ব্যথা অনুভব করিলেন তাহা আমাদের বুকে প্রথমে বাজে নাই ইহাতে লজ্জা অনুভব করিতেছি।

সাকার ও নিরাকার উপাসনার ঝগড়ার বহুদিন বহির্ভূত হইয়াছি। সুতরাং দেবতা আমাদের বা তোমাদের এ ভেদ মানিনা। হিন্দুর দেবতা হিন্দুবংশীয়মাত্রেরই দেবতা। দেবতা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিলে, দেবতার প্রতি আস্থা হয় না। এ অবস্থার জন্য হিন্দুনামধারীরা গোঁড়া খ্রীষ্টানের পদতলে বসিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন। খ্রীষ্টানের নিজের দেবতার উপর যে জ্বলন্ত জাগ্রত বিশ্বাস শিক্ষিত হিন্দুর তাহা কৈ? অশিক্ষিত হিন্দু ক্রাইষ্টের কথিত সরল শিষ্য, বৈকুণ্ঠলোক তাদেরই জন্য। কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়বিধ হিন্দুরই মধ্যে যে ঘোর ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহা এই—প্রতাপের আতঙ্ক ও ছদ্মবেশী পাপকে যুদ্ধ দেওয়ার অনুদ্যম।

মুসলমান যখন হিন্দুর ধর্ম্মদ্বেষী হয় তাকে শত্রু বলিয়া স্পষ্ট চেনা যায়—কিন্তু সাধুতার মহিমায় মুকুটিত মোহান্তকে শত্রু বলিয়া ঠাহর করা কঠিন এবং তার শক্তি সামর্থ্যের বিরুদ্ধে খাড়া হওয়া আরো কঠিন, একটা সম্ভ্রম ও সমীহের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া মন সন্ত্রাস যুক্ত থাকে। এই মোহ ছিন্ন করার বল চাই, দেবতার প্রতি জ্বলন্ত ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে দানবের দানবত্বে প্রচণ্ড বাধা দেওয়ার উদ্যম চাই। নিজের ব্যাধি প্রাপ্তির জন্য বা যে কোন সাংসারিক মনোরথ পূরণকল্পে হত্যা দিলে ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে দেবতার জাগ্রতত্বে আমাদের বিশ্বাস আছে, কিন্তু পাপবারণের জন্য নিজেকে হত্যা দেওয়ার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ভোগ স্পৃহা ও নিশ্চেষ্টতা আমাদের প্রকৃতিকে এমন একটা ধাঁচে ফেলিয়া দিয়াছে যে, যাহা পুরুষকারের লভ্য তাহাও আমরা দেবতার উপর বরাত দিয়া নিরুপদ্রবে যথা লাভে কাটাইতে চাহি।

আমাদের উর্দ্ধে অধে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে—আকাশের প্রতি কণায় চৈতন্যবান্ শক্তি সমূহের অধিষ্ঠান রহিয়াছে—তাঁহারাই হিন্দুর দেব দেবী। পার্থিব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমরা তাঁহাদের সাহায্য আহ্বান করিতে পারি। তাঁহাদের উদ্বোধন করিতে পারি। কিন্তু সে জন্য যে পরিমাণ মানসিক শক্তি সাধনার আবশ্যক তাহা প্রচণ্ড, দীর্ঘসময়সাপেক্ষ এবং প্রক্রিয়ার তিলমাত্র ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে সর্ব্বনাশজনক, তাহার কণামাত্র অংশ নিজের ভিতরকার শক্তি উদ্বোধনে লাগাইলে পার্থিব বিষয়ে বেশী ফলোপধায়ী হইবে। যতক্ষণে আমার ইচ্ছাশক্তিকে এত প্রবল করিয়া তুলিতে না পারিব যে হাতের সাহায্য ব্যতিরেকে খাদ্য বস্তু আপনা আপনি মুখের ভিতর চলিয়া যাইবে ততক্ষণ হাত হাজার বার সেই কার্য্য সাধন করিয়া দিবে, এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সঞ্চিত রাখিলে মোটের উপর বেশী হিসেবিয়ানা হইবে। দেবতাদের উপর অত্যধিক

কাজের ভার ফেলিয়াদিয়া মনুষ্যত্বকে বেকার রাখিয়া আমরা মনুষ্যত্বকেও নষ্ট করিয়াছি এবং দেবতাদেরও তুষ্ট করিতে পারি নাই।

লর্ডলিটনের "প্রচণ্ড ফাঁকি" শব্দের তাৎপর্য্য এই।

জয় পরাজয়

"ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঈটনের ময়দানে জিত হয়" এ কথা ভারতবাসী পূর্ব্বে বলিয়াছে—আজ আমেদাবাদে চাক্ষুষ করিল দুইপক্ষের রথীগণ তুমুল সংগ্রাম করিয়াছেন। দুই পক্ষেই পরাজিতের হয় হইয়াছে, এবং ফলে জাতীয়লাভ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। কৰ্ম্মবীর গান্ধির নেতৃত্ব বজায় থাকিয়া জাতিকে কৰ্ম্মশীলতায় কায়েম রাখিয়াছে এবং অপর পক্ষের পণ ভঙ্গ হইতে না পারায় ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার দ্বার রুদ্ধ হয় নাই—একজনের বশীকরণগুণে বাকী সকলে মন্ত্রাহত জড় পুত্তলিবৎ হয় নাই।

সার্ব্বজনীন সূতোকাটা

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রত্যেক সদস্যের সূতা কাটা অবশ্য কৰ্ত্তব্য বলিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে সে বিষয়ে মতভেদ প্রযুক্ত মহাত্মা গান্ধির সহিত আমার পত্র ব্যবহার চলিতেছে। তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। উত্তর প্রত্যুত্তর যুক্ত লিপিমালা আগামী সংখ্যায় "ভারতীর" পাঠকগণের গোচর করিবায় ইচ্ছা রহিল। তাহা হৃদয়গ্রাহী হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

গ্রীষ্মাবকাশ।

১ ভোর।

শ্যাম দূর্ব্বাদল আঙিনা ছাইয়া,
পথ তার মাঝে দিয়া,
সাপের মতন এঁকে বেঁকে মেশে
সড়কের পরে গিয়া।
কাপড়েতে ছাঁকা গুঁড়োর মতন
ধুলো পুরু যেন কাঁথা,
পাফেলার সুখ পথের উপর
রয়েছে যেমন পাতা।

পথের কোণেতে ছাতিম রয়েছে
আকাশে তুলিয়া মাথা,
সরল দাঁড়ায়ে ভোরের ঘোরেতে
আঁধারের যেন ছাতা।
একটুকু পরে পথের দুধারে
কদম্ব রয়েছে, সারি,
ফাঁক দিয়ে তার আধা দেখা যায়
নীচেতে দীঘির বারি।
সিং দরোজার থামের মতন
বকুল বিপুল দুটি
মাথার উপর খিলান গড়েছে
শাখায় শাখায় জুটি।
ঘাটের চাতাল ধব ধব করে
দুদিকে বসান সান,
তবকে তবকে ছুটিয়া সোপান
জলে পড়ে হয় ম্লান।
চুমকুড়ি দিয়ে ডাকিছে দোয়েল
কাঁপায়ে বিরল আঁধা
এখানে-ওখানে, আবরে আবার
মনে লেগে যায় ধাঁধা।
পাতা ঢাকা ডাকে বউকথা কও
যেন আদরের চুম।
গরবিনী দিঠি ফিঙ্গে পড়ে পড়ে
তবু নাহি ছোঁয় ভূম।
লুকান রবির সোনা বাঁধা তীর
আঁধারের বুকে ফোটে,
ফোঁটা ফোঁটা করি বাহিরে শোণিত
চৌদিকে পড়িছে ছুটে।
দীঘির ওধারে জটা মাথা বট
অশথ কোটরে ভরা,
পুণ্যকীর্ত্তি রায় গৃহিনী মাতার
স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করা।

এধারে, ওধারে, ঝাড়ে ঝাড়ে বাঁশ,
হেঁট মাথা, দোলে বায়,
তেঁতুল আকন্দ, আগাছা অশেষ
ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়।
বাতাবিয়া লেবু, সাদা সিদে তলে
সবলে ছাড়ায়ে শির ?
প্রশান্ত গম্ভীর মধুর ছায়ায়
ছেয়েছে দীঘির নীর !
সুনীল দীঘির শ্যামল সলিল
ঝাঁঝি, দাম, গাঁজে ভরা,
শালুক সরস, রাগী পানিফল
বিরল—গরমে মরা।
না—জানি লোকের টুকুরা একটু
হেথা বসায়েছে আনি
বিজন নিশিতে নীরব দুপরে
কত অমানুষী প্রাণী
পুরুষ রমনী, মায়াবী শরীর,
কি খেলে হেথা কি জানি !

দ্বিপ্রহর

গ্রীষ্মের ছুটির দিন। ঘণ্টাপলচিহ্নহীন
সময়ের দীঘি— স্বচ্ছ, চোস্ত, দূর দূর।
কোথাও নাহিক শ্রান্তি, পড়া শুনা সব ভ্রান্তি
শরীর চঞ্চল চেষ্টা মনে একই সুর,
দুপরে তপন জ্বলে, পাটী পেতে গাছ তলে,
কতইযে ডাংপেটে কাজের ভাবনা
গাছের উপরে চড়ে সুরে রামায়ণ পড়ে
"নাম, নাম "বলে সুধু ঘাড় নাড়ে, "যাবনা।"
ডাকে জল খেতে আসি, ছেলে দলে মহা হাসি,
উর্দ্ধমুখে পড়া শুনে, রেগে বলে খাবনা।"
গাছ হতে আম পড়ে, লম্বা লম্বা ঘাড় নড়ে
যে যে খানে ছিল সব উঠে দিল ছুট,

পিয়াসে শুকায় ছাতি খুঁজি খুঁজি পাঁতি পাতি,
চারিদিকে পড়ে গেল বরগীর লুট।--
কুড়ায়ে অমনি রড়, পিছু হতে মারে চড়
মারা-মারি কাড়া-কাড়ি ঘাম বহে যায়,
পাটীতে দেহটী-পেড়ে, ঠাণ্ডা হয় হাঁফ ছেড়ে,
লুটের সামগ্রী যত ভাগ করে খায়।

সন্ধ্যা।

সাঁঝে স্নেহশীল বায়, আকাশের রাগ যায়,
ছেলে দলে হো হো করে নদীর চড়ায়।
ওপারে বাঁধের ধারে শিশু চাঁদ উঁকি মারে,
নদীর বালিতে কত মুকুতা ছড়ায়।
নিরমল নদী জল, উপরে উঠেছে তল,
জলকুমারীরা ধিরি ভয়ে ফেলে পায়।
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে, এ উহার ঘাড়ে চড়ে
মৃদু স্রোতে গা ভাসায়ে ভেসে চলে যায়।
ভেসে ভেসে নীলাকাশে, তারকা বালরা হাসে,
ঘুম ঘুম শান্ত জ্যোতি আঁখি আধমেলি।
বলিষ্ঠ বিশুদ্ধ অঙ্গ, নবীন যৌবন রঙ্গ
গোলাপী নেশায় যেন জলে করে কেলি।
বাস ছাড়ি কূলে উঠি চারিদিকে ছুটোছুটি,
ভিজে ভিজে চুল হাসে কতই ধরণে।
বালির উপরে কেহ, আনন্দে পাছড়ে দেহ,
আধ-শুয়ে বালি ছোঁড়ে চঞ্চল চরণে।
চাঁদের কিরণ রাশি উজলি মুখের হাসি,
কৌতুক তরঙ্গ তোলে কতই বরণে
হাতে হাতে কুলুপিয়া কেহবা বসিলা গিয়া
অধোমুখ, ডুবে উঠা নৌকার উপর।
বাহিরে বরণ বিন্দু, অন্তরে আনন্দ সিন্ধু,
পাখা শাটি উড়ে পাখী পিয়ে চন্দ্রকর।

নিঝুম নিঝুম ভাতি আগুসরি আনে রাতি,
দূরে জাগে রাখালের বাঁশরীর তান,
ফুলের সুবাস প্রায় অলক্ষিতে ভেসে যায়
মনের বাসনা বাহী অশরীরী গান।

রাত্রি।

নিঝুম রজনী, পাতাটি না নড়ে,
জগৎ ছবির প্রায়,
চণ্ডীমণ্ডপের ছাওয়ার উপর
নবীন কিশোর যায়,
মাদুর পাতিয়া বালিশ রাখিল
চাপড়ি সমান করে,
বাম পাশে শুয়ে পেটে ডান হাত
চাহিয়া আকাশ পরে।
বাঁ হাত গুড়ান সোজা বাম পায়
ডাহিন হাঁটুটি রাখি,
শুইল কুমার ফুরু ফুরু বায়
চাঁদের কিরণ মাখি।
দিনের দাপটে অবশ শরীর
তবুও মনে সে জোর
ভাবনা এই যে ঘুম ভাঙিবার
আগে হয় পাছে ভোর।
ঘোর ঘোর আছে এমন সময়
নদীতে করিব চান
ঘাটের উপর বকুল তলায়
শুনিব পাখীর গান।
ঠাকুর বাড়ীর সদর বাগানে
ফুটে রবে কত ফুল,
উষার কিরণে কতই বরণে

কেহ না উঠিতে, বেলা না ফুটিতে
তুলিব ফুলের রাশি,
ঠাকুরমায়ের পূজার সময়
ঢেলে দিব হাসি হাসি
"বেঁচে থাক" বলি জিজ্ঞাসিবে বুড়ী,
"নেয়ে তুলেছিস ফুল ?"
রাণী বুড়ী শুনে হেসে কুটিকুটি
গড়িবে ফুলের দুল।
ভোরের সময় উঠিবই আমি
নাহি কিছু ভুল তায়,
ঘুম কুমারিকা আসি গুটি গুটি
মিশাল তাহার পায়।
আকাশের পানে চাহিতে চাহিতে
মুদে এল আঁখি ধীরে,
ঘুম কুমারীর রাজত্ব আইল।
স্বপন রহিল ঘিরে।

খেয়াল খাতা

"রবীন্দ্র বারমাস্যা"

আষাঢ়

(১)

নিবিড় বন-শাখার পরে
আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল ভরা আলস ভরে
ঘুমায়ে আছে রাত ॥

*　　*　　*

নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাবে ঘনতর ছায়া ॥

*　　*　　*

নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধ-নীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘন মেঘদলে,
জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।

*　　*　　*

নবীন আষাঢ় যেমন এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি

*　　*　　*

আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা।

*　　*　　*

বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রইত বঁধুর আশে।

*　　*　　*

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে, ঘরের বাহিরে!

*　　*　　*

এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ।

* * *

এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।

* * *

আষাঢ় মেঘে হঠাৎ এলো ধারা
আকাশ-ভাঙা বিপুল বরষার

* * *

আজ আষাঢ়ে একলা ঘরে
কাট্‌ল বেলা,
ভাবতেছিলাম এতদিনের
নানান্ খেলা।

* * *

(২)

এ শুধু আষাঢ়-মেঘের আঁধার
এখনো রয়েছে বেলা।

* * *

যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়।

* * *

যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি
নদীর বালু পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টি-ধারা
আষাঢ়-অন্ধকারে।

* * *

আষাঢ় রাতের সভায় তব
কোন কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব
নিখিল আঁকড়ি

* *

আষাঢ় আঁধারে আকাশে মেঘের মেলা,
কোথাও বাতাস ছিলনা বনে।

* * *

কত আষাঢ় মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
সে সব ঘন ঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

* * *

যেম্‌নি মাগো গুরুগুরু মেঘের পেলে সাড়া,
যেম্‌নি এল আষাড় মাসে বৃষ্টি জলের ধারা,
পূবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে যেমনি পড়ল আসি,
বাঁশ বাগানে সোঁ সোঁ করে বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি--

* * *

"শ্রাবণ"

(৩)

কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে ॥

* * *

জানে না কিছুই কোন মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে ॥

* * *

ঘন শ্রাবন মেঘের মত
রসের ভারে নম্র নত ॥

* * *

কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে ॥

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দিঘির কালো জলের পরে মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে।

*

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথভোলা ॥
ভোর হল যেই শ্রাবণ শর্ব্বরী,
তোমার বেড়ায় উঠ্‌ল ফুটে
হেনার মঞ্জরী।

* *

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা,
নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যায়ব
অবলা কামিনী রে॥

* *

আজি এ বরষ নিবিড় তিমির,
ঝরঝর জল জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে,
জেগে বসি আছি একারে!

* *

(আজি) ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধুহে আমার!

* *

(৪)

শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে,
রহিনু পড়ি,
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোণার তরী ॥

* *

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গৃহহীন, হায় গৃহহারা।

*   *   *

এ ভরা বাদরে আর্দ্র আঁচলে
একলা এসেছ আজি,
এনেছ বহিয়া রিক্ত তোমার
পূজার ফুলের সাজি॥

*   *   *

তালপুকুরে জলের পরে,
বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়
ছেলেরা মেতে বেড়ায় জলে,
মেয়েগুলি কলসী নিয়ে
চলে আসে পথ দিয়ে
আঁধার ভরা গাছের তলেতলে॥

*   *   *

(৫)

অঙ্গবসন তব ভীগত মাধব,
বারি বিরাম না মানে!
নিষ্ঠুর শ্রাবণ ঘন ঘন তীখন
মুঝ হৃদয়ে শর হানে॥
বইস বইস পহু পুষ্প-সেজব,
পদযুগ দেহ পসারি,
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে
কুন্তলভার উঘারি॥

*   *   *

বেলা যায় বৃষ্টি বাড়ে,   বসি আলিশার আড়ে,
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন,   শুধু পান্থ দুই তিন,
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে॥

*   *   *

শ্রাবণ বরিষণে   একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

*   *   *

বৃষ্টিধারায় ঝাপসা মাঠে ডাকছে ধেনুদল,
তালের তলে শিউরে ওঠে বাঁধের কালো জল।
পোড়ো বাড়ীর ভাঙা ভিতে ওঠে হাওয়ার হাঁক,
শূন্য ক্ষেতের ওপার যেন এ পারকে দেয় ডাক ॥

* * *

ঐ দেখ মা জানলা দিয়ে আসে জলের ছাট,
বল্‌গো আমায়, কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ !

* * *

জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে,
জানি শ্রাবণ ধারা সম বাণ বাজিবে বক্ষে ॥

* * *

আজি শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ॥

* * *

(৬)

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে ॥

* * *

ঘন শ্রাবণ ধারা যেমন বাঁধন হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে ॥

* *

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমার ঐ সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে ॥

* *

আকাশে ঐ কালোয় সোণায়
শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার আলোর কোন্ খেলা যে কে জানে
আসা যাওয়ার মাঝখানে ॥

* *

মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে
যুথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে ॥

* *

শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ দিশান্তের বারি-ধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা ॥

* *

এই সব হেলা ফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটী বিস্মৃতি-বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার ॥

* *

(৭)

এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে ॥

* *

শ্রাবণে দিগন্ত পারে
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘ ভারে
দেখা দেয়—নব নীল অতি সুকুমার ॥

* *

সঘন বরষা গগন আঁধার,
হের বারিধারে কাঁদে চারিধার ॥

* *

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটী তীরে।

* *

শ্রাবণ গগন করে হাহাকার
তিমির শয়ন পাতি।

* *

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরি কূলে।

তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

*   *

এমনি করে শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে।

*   *

শ্রাবণ দিনে ভরা গাঙে দুকুল-হারা পাড়ি

(৮)

শ্রাবণের মোটা ফোঁটা বাজিল যূথীরে,
কহিল, মরিনু হায় কার মৃত্যু তীরে।
বৃষ্টি কহে, শুভ আমি নামি মর্ত্ত মাঝে,
কারে সুখরূপে লাগে, কারে দুঃখ বাজে॥

*   *

নিশীথের তারা শ্রাবণ-গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

*   *

ভরা শ্রাবণের নিশি দুপহরে
শুনেছিনু শুয়ে দীপহীন ঘরে
কেঁদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে
কাতর রবে।

*   *

তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের
দান,
শ্রাবণ ধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ।

*   *

পাতার কাঁপা ফুলের ফোটা,
শ্রাবণ রাতে জলের ফোটা

সাহিত্যিক প্রত্নতত্ত্ব

(a) বিভিন্ন জাতির ও দেশের ভাব ও ভাষাগত সম্বন্ধ।

ইংরেজী hostile শব্দের অর্থ ভীষণ বা ভয়ানক।

এ অর্থ সহিত বাঙ্গলা ভাষায় একটি কথায় আছে। আমরা ভাবিয়া দেখি কি ? হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যখন মহা ভীতির সঞ্চার হয় সেই সময় ত্রাস নাশক 'হরি-বল্' বলিয়া ঈশ্বরের নাম স্বভাবতঃ আমাদের মুখ হইতে নির্গত হয়।

ইংরেজী delapidated condition এর অর্থ শোচনীয় অবস্থা। শোচনীয় অবস্থাতেই কান্না আসে অর্থাৎ বিলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং এখন delap এর সহিত বাঙ্গালা বিলাপ শব্দের ভাব ও উচ্চারণ গত সাদৃশ্য বুঝা যাইতেছে,—

বাঙ্গালাতে যাহাকে আমরা ছিনিয়া লওয়া বলি, ইংরাজীতে তাহাকে snatch away বলা হয়। snatch ও ছিনিয়ার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে—।

ইংরেজীতে যে yes শব্দের প্রয়োগ আছে, সেটা আমাদের সংস্কৃত—"হ্যাঁ" শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাকৃতে আকৃতি ছিল 'হিয়ণ; ; হিয়ান্য়ো।

দুহিতা এবং ইংরেজী daughter কথা বিভিন্ন নহে।

ইং daughter-সংস্কৃত দুহিতর-Pers. দোক্তার।

এইরূপ, ইং father, সং পিতর্, pers. পেদার। (পূর্ব্বকালের মেয়েরা গো-দোহন করিত এই জন্য কন্যার একনাম দুহিতা, কিন্তু এই নাম এখনকার মেয়েদিগকে না দেওয়াই উচিত এরূপ অনেকেই বলিয়া থাকেন। আমার মতে দুহিতা এই নাম পূর্ব্ব কালীন কন্যাদের চেয়ে আধুনিক মেয়েদের পক্ষে অধিক প্রয়োজ্য ; কারণ তাহারা গো-দোহনের পরিবর্ত্তে অভিভাবকদের সর্ব্বস্ব দোহন করে।)

ইংরেজী 'dishevelled ও সংস্কৃত 'আকুলাকুল কথা বিভিন্ন নহে। এই শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'আলুলায়িত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে সাধারণ কথায় আউলায়িত বলে। এখানে ধ্বনিগত সুসাদৃশ্য অনেক আছে—।

ইং mamma-arabics আম্মা Beng আ! মা!

Hallo শব্দটী বাঙ্গালা "হ্যালো" কথার অবিকল অনুরূপ।

ইং obsolete এবং বাঙ্গালা 'অপ্রচলিত কথা দুইটী ঠিক্ একই। ভাষার ও অর্থে কোনও প্রভেদ নাই,—

(b) সাধারণ গ্রাম্য ভাষা বিশুদ্ধ নয় বলিয়া সে গুলি পরিত্যাগ করিতে আমরা বড়ই পটু, কিন্তু সে গুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে যত্ন লই না বা—চেষ্টাও করি না,—।

বাঙ্গালা 'উনান শব্দ ইংরাজী 'oven' হইতে আসিয়াছে।

বাঙ্গালা 'চুলা' শব্দ সংস্কৃত চুলী হইতে আসিয়াছে।

বাঙ্গালা 'আধা' কথা সংস্কৃত 'উষ্ণ' শব্দ প্রাকৃতে পরিণত 'উধা' হইতে আসিয়াছে।

সংস্কৃতে 'আপূপিক' শব্দে একপ্রকার পিষ্টক বুঝায়। আমার মনে হয়, এই 'অপূপ আমাদের 'পুয়াপিঠা' ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বাঙ্গালা ভিরকুটী' কথা সংস্কৃত 'ভ্রূকুটী' ও পরবর্ত্তী সংস্কৃত 'ভৃকুটী' হইতে আসিয়াছে।

পুরাকালে সম্মানসূচক 'অত্রভবান্' 'তত্রভবান্' প্রভৃতি শব্দে 'অত্রশব্দের প্রয়োগ ছিল। অদ্যাপি ঐ শব্দ আইন বিষয়ক শব্দে পর্য্যবসিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—অত্র আদালতে......ইত্যাদি।

(c) কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ আমরা খাঁটি বাঙ্গালা বলিয়াই জানি, কিন্তু সেটা ভুল। সেগুলি আমরা অন্য ভাষা হইতে লইয়াছি।

পর্ত্তুগীজগণ অল্প কিছুকাল ভারতে থাকিয়া যে কতদূর influence রাখিয়া গিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই।

'মাইরি' বলিয়া আমরা অনেক সময় প্রতিজ্ঞা শপথ করিয়া থাকি। এই শব্দ একটী পর্ত্তুগীজ শব্দ 'Marriah' হইতে আসিয়াছে। ইংরাজীতেও ঐরূপ শপথের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। Cf. Shakespear :—Marry to...?' (Othello). Act I. Sc. II.

Virgin Maryএর নামে শপথ করা হইয়াছে।

ইংরেজী Chairকে বাঙ্গালায় কেদারা বলিয়া থাকি। এই 'কেদারা' শব্দ বাঙ্গালা নহে। ইহা একটী পর্ত্তুগীজ শব্দ 'Cathedra'.

(d) কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বিপর্য্যয় হইয়া বাঙ্গলা শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা—

ক্রম = রকম, বলয় বয়লা বালা।

বাঙ্গালা ঘোড়সোয়ার্ শব্দে যে সোয়ার শব্দ ব্যবহৃত হয়, ঐ শব্দ সংস্কৃত অশ্বারোহী পদের 'শ্বরোহ' এই শব্দাংশ হইতেছে।

(e) কতকগুলি শব্দ ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ওলট্‌পলট্ ভাবে ব্যবহৃত।

যথা :—"Compassion" ও "অনুকম্পা" একই শব্দ উল্টা ভাবে অর্থাৎ বিপর্য্যস্তরূপে আছে।

(f) কতকগুলি শব্দ Prefix বা Suffix ও অগ্রশব্দাংশ অর্থাৎ first syllable বা অন্তশব্দাংশ অর্থাৎ last syllable বিভিন্ন ভাষায় একই প্রকার থাকে।

"auto" "আত্ম—e.g :—autobiography আত্মজীবন চরিত। autocracy ইত্যাদি।

"lic" ও "লোক" একই শব্দাংশ। সংস্কৃত 'লোক' শব্দটা Public বা জন সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(g) কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে পরিণত হইয়া directly বাঙ্গলায় পরিণত হইয়াছে।

"বড্ড" কথা প্রাকৃত 'সংবড্ড' [(শরীর সংবড্ডণাদিহিং) শরীর সংবর্দ্ধনা দিভিঃ] হইতে আসিয়াছে।

'বটে' কথা প্রাকৃত 'বট্টমানস্স' [সংবর্ত্তমানস্ত] হইতে আসিয়াছে।

'এত' বা সাধারণ কথা 'অ্যাত' প্রাকৃত এও (এওএন) হইতে আসিয়াছে।

এওএন এতাবতা (সং)

শ্রীপ্রতীপচন্দ্র ঠাকুর।

সুখ ও শান্তি

আমার দুইটি সন্তান—সুখ ও শান্তি। তন্মধ্যে আকারগত লক্ষণে বোধ হয় চিনিয়াছেন, সুখ আমার পুত্র আর কন্যার নাম শান্তি। সুখ বয়সে বড়, বলিষ্ঠ ও উদ্ধত স্বভাব। আর শান্তি বয়সে ছোট, ক্ষুদ্রকায়া ও নম্র-প্রকৃতি। সুখের অনেক সঙ্গী। সে সর্ব্বদা সঙ্গীদের নিয়ে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত। আর শান্তি—সে কখনও বেশী লোকের সঙ্গে মিশে না। নীরবে ধীরভাবে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যায়। কিন্তু এত অমিল সত্বেও ভাই বোনে বেশ ভাব। সুখ এত বলিষ্ঠ যে, মনে করিলে একটা হাতীর শুঁড় টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে, আর এত উদ্ধত স্বভাব যে, সদা সর্ব্বদা সপ্তমে চড়িয়াই থাকে, সে কিন্তু বোন্ শান্তির নিকটে সর্ব্বদাই নম্র ও বলহীন। শান্তির কেমন একটা আশ্চর্য্য গুণ আছে, ভ্রাতা যতই ক্রোধোদ্দীপ্ত হ'য়ে আসুক না কেন, এক নিমিষে তাহাকে জল করিয়া দিতে পারে। সাধারণ মানুষের ন্যায়, আমি ছোট সন্তান শান্তিকে ত একটু বেশী ভালবাসিই—তার উপর তা'র গুণপনায় আমি মুগ্ধ।

আমার শান্তির উপর জীবন-জোড়া মায়া। আমার তেমন কিছু ধনসম্পদ্ নাই। তাই শান্তি দরিদ্রেরই দুহিতা। বয়স তাহার অপরিণত। গরীবের মেয়ে ব'লে যে সে নিরাভরণা তা'তে তা'র একটুও দুঃখ নাই। সদাই তাহার প্রফুল্ল মুখ—সদাই সে হাস্যমুখী। আমি শান্তিকে নিয়েই এক প্রকার বেঁচে আছি। ভাব্‌ছি বয়স যখন তা'র পরিণত হ'বে—তখন ত তা'কে পরের ঘরে দিতে হবে—তা'কে ছেড়ে থাক্‌তে হবে—তখন আমার কি দশা হবে' ?—এইটা সময় সময় বেশই ভাবি আর চোখের জলে বুক ভাসাই। শান্তিকে পাত্রস্থ করিব কি ?—বন্ধু বান্ধবগণ কি বলেন ? যদিও আমিও তা'র গুণমুগ্ধ, কিন্তু দরিদ্রের নিরাভরণা (নিরালঙ্কারা) দুহিতা ব'লে কেহ তা'কে গ্রহণ কর্ব্বে কি ? শিক্ষাভিমানী উপার্জ্জনশীল যুবকগণ গরীবের মেয়ের গুণপণার দিকে লক্ষ্য কর্ব্বেন কি ?

যাই হো'ক—শান্তি ক্রমে বড় হইতে লাগিল। তার গুণপণা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রূপ লাবণ্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বিবাহের বয়স টানিয়া আনিল। আমি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল। একদিকে শান্তিকে পাত্রস্থ করিবার অনিচ্ছা—আদর যত্নে লালিত পালিত করিয়া তা'কে সর্ব্বদা কাছে রাখিবার ইচ্ছা—আর

অন্যদিকে, বিবাহের বয়স অতিক্রম করিলে লোকে কি বলিবে—স্ত্রীত্বের ও মাতৃত্বের প্রয়োজনেই বা সে বিবাহিতা না হইয়া থাকিবে কেন? এইরূপ ভাবনা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। একদিন কথায় কথায় তাহার বিবাহের কথা পাড়িলাম। উদ্দেশ্য,—শান্তির মনের ভাবটা জানিয়া লই। শান্তি বলিল, "বাবা, আমার জন্য ভেবো না। যাঁর কাজ তিনিই কর্ব্বেন। আপনি অনর্থক ভাবিয়া শরীর নষ্ট কর্ব্বেন না। তিনি মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তা, তাঁর উপর নির্ভর করুন।"

কথাটা বেশ মনে লাগ্‌লো। সেই দিন হ'তে আমার ভাবনা অনেকটা কমাইলাম। উদ্বেগের বোঝা অনেকটা ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় আশা ও সাহসে বুক বাঁধিলাম। এইরূপে দুই তিন বৎসর চলিয়া গেল। শেষে এক মাতৃ-পিতৃহীন শিক্ষিত যুবক শান্তির পাণিগ্রহণেচ্ছু হইল। যুবকটি বেশ সুন্দর, ধীর, উপার্জ্জনশীল। মনে করিলাম, পরম কারুণিক জগদীশ্বর এই সম্বন্ধ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়। জামাইটিকে নিজের ঘরে রে'খে দিলেই কন্যাকে দূরে পাঠাইবার ভাবনা থাকিবে না। আর জামাইয়ের সঙ্গে মিশতে মিশতে সুখও ভাল হ'য়ে উঠবে। বল্‌তে ভুলিয়াছি, জামাই সুখের চেয়ে ৩।৪ বৎসরের বড়। নাম—প্রজ্ঞান। আমি এই বিবাহেরই আয়োজন করিলাম।

যাই হো'ক—বিবাহ হইয়া গেল। এবারে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। প্রজ্ঞানের সংসর্গে উদ্ধত 'সুখে'র মতি—পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সে ক্রমে ভাল হইয়া উঠিল। শান্তি ও রূপগুণে স্বামীর আদরিণী হইয়া উঠিল। সে সংসারে শান্তিধারা ছড়াইতে লাগিল। কিছুদিন পরে শান্তি এক সুরূপা কন্যা প্রসব করিল। নাম রাখা হইল—মুক্তি। মুক্তি মায়ের ক্রোড়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। সংসার স্বর্গধামে পরিণত হইল। 'সুখ' 'শান্তি' 'প্রজ্ঞান' ও 'মুক্তি'র অপূর্ব্ব মিলনে সংসার-মরু নন্দন-কানন হইয়া উঠিল। ভাবিতাম, প্রণয়-তরু যে নন্দন-কাননের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বড়ই অদ্ভুত ও মনোরম। পাঠক পাঠিকারা মনে রাখিবেন—আমার নামই 'প্রণয়'।

শ্রীযতীশচন্দ্র রায় কাব্যনিধি।

বিদায়ের দিনে

কাল, বিদায়ের ক্ষণে
জলেভরা ডাগর নয়নে
বাতায়নে
ছিলে দাঁড়াইয়া

না চুমিয়া ম্লানমুখে
বেদনার সে কি ঝঞ্চা দুখে
বহি বুকে
সব এড়াইয়া

তবু যে আসিতে হোলো
প্রিয়তমে যদি নাহি ভোলো
বোলো বোলো
পুনঃ দেখা হ'লে
সে ব্যথা কি বুঝেছিলে ?
কেঁদে কেঁদে মোরে খুঁজেছিলে ?
বুঝেছিলে
আমি এসে চ'লে
প্রাণ-পেসা যাতনাতে
মরমের বহ্নি-দাহ সাথে ?
সুপ্ত রাতে
দেখেছিলে আমি
প্রিয় বাহু-বন্ধ লাগি
স্নেহভরে আছি পাশে জাগি
অনুরাগী
বিধিসাক্ষী স্বামী ?
আজি একা এ হৃদয়
আজি প্রাণ বাণী-স্মৃতিময়
মনে হয়,
বাঁধি আলিঙ্গনে
নিবিড় প্রণয়ে চুমি
ব'লেছিলে যেইদিন তুমি
"মনোভূমি
সাজিয়া যতনে
শ্যামলে, রজতে, হেমে
যাচে প্রিয় ! উচ্ছ্বসিত প্রেমে
চিরক্ষেমে
চরণ তোমারি
তোমারে ছুঁইয়া কই
নই, নই, ওগো তোমা বই
কারো নই
বঁধুগো আমারি"

বার বার পড়ে মনে
ঘুমঘোরে মোরে ক্ষণে ক্ষণে
হে শোভনে
ডাকিয়াছ রাতে
দূরে ফেলি গৃহকাজে
"নহ, নহে আর পারি না যে—
বক্ষোমাঝে"
বলিয়াছ প্রাতে।
কি স'য়েছি জানো তা'কি ?
বিচ্ছেদের ব্যথা-ভরা আঁখি
থাকি থাকি
আকুল সলিলে
ভরিয়াছে যেইক্ষণে,
লুটায়েছি অসহ বেদনে
ভাবি মনে
এ সারা নিখিলে
নিবে গেল সব আলো
জীবনের আনন্দ ফুরালো,
বিষে কালো
পরিহাস-শর
সেইক্ষণে হে কল্যাণী
প্রিয়জন, হৃদি পরে হানি—
সুখ মানি
বিঁধেছে অন্তর !
হোক্, তবু ল'য়ে আশা
ধরি' বুকে তব ভালোবাসা
সর্ব্বনাশা
দুখের আহবে
দিনু ঝাঁপ মনোরমে,
প্রেম কহে, জনমে জনমে
প্রিয়তমে
তুমি মোরি রবে।

আম দরবার

বরপণ

ভারতীতে গত বর্ষে বরপণ সম্বন্ধে একজন লেখক আলোচনা করিয়াছিলেন। লেখক মহাশয় কয়েকটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা অংশত ঠিক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উনি উহার গোড়ায় কারণ এবং প্রতিকারের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। বরপণের কয়েকটা কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল এবং কেন যে স্ত্রী, পুরুষের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেই বরপণ একেবারে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব তাহারও কয়েকটা যুক্তি দেখান হইল।

বরপণের প্রধান দুইটী কারণ হইল

(১) অর্থশাস্ত্রের demand ও supp'yএর নিয়ম। যখনই বিবাহার্থী পাত্রীর সংখ্যা হইতে কম হইবে তখন স্বভাবতঃই পাত্রের চাহিয়া বাড়িবে এবং উহা হইতে বরপণের সৃষ্টি হইবে।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে লোক গণনা অনুসারে মেয়ের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা অপেক্ষা কম, কিন্তু মেয়ের বিবাহের বয়স পুরুষের অনুপাতে বাড়ে নাই বলিয়াই পুরুষের চাহিদা বেশী। নিম্নে একটী উদাহরণ দিতেছি যাহা উহার বিপরীত বলিয়াই মনে হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে অথবা লেখক মহাশয়ের মতে বরপণের দরুণ ভদ্রসমাজে মেয়েদিগকে আজকাল অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই বিবাহ দেওয়া হয়। পরন্তু কৃষক, শূদ্র ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মেয়েদিগকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রথম শ্রেণীর সমাজেই বরপণ অত্যন্ত প্রচলিত আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ত বরপণ নাই-ই পরন্তু কনেপণ প্রচলিত আছে।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন পরনির্ভরতাই বরপণের প্রধান কারণ এবং মেয়েরা যতই শিক্ষিতা হইয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবে ততই বরপণ কমিয়া যাইবে। কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণে উহার বিপরীতই দেখা যায়। তবে কি বলিতে হইবে মেয়েরা যতই পুরুষের অসমকক্ষ হইবে ততই বরপণ কমিবে? নিশ্চয়ই না। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের পুরুষের সমকক্ষ বা সমান স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে পণ-প্রথার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। অবশ্য যদি এরূপ অবস্থা হয় যে মেয়েরা শিক্ষিতা ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিবে না বলিয়া বদ্ধ পরিকর হয় এবং তাহাদের supply কমাইয়া দেয় তবে অবশ্যই supply ও demandএর নিয়ম এখানে কার্য্য করিবে। কিন্তু এরূপ অবস্থা বিশেষ বাঞ্ছনীয় নহে।

(২) যখন দুই পক্ষ সমান না হয় অর্থাৎ যখন বর কন্যা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় তখন বরপণের এবং যখন কন্যা বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় তখন কন্যাপণের সৃষ্টি হইবে। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যে বরপণ নাই তাহার প্রধান কারণ এই যে বর ও কনে উভয়েই বিদ্যা, বংশ এবং আর্থিক অবস্থায় সমতুল্য। উভয়েই সমান অশিক্ষিত, ও সমান সামাজিক স্তরে অবস্থিত। পাত্রের আর্থিক অবস্থা ও পাত্রীর পিতার অবস্থা অধিকাংশস্থলেই সমান। কাজেই এরূপ স্থলে বরপণ থাকিতে পারে না যদি না কনের সংখ্যা বরের সংখ্যা অপেক্ষা অতিরিক্ত মাত্রায় বেশী হয়। কিন্তু কনের সংখ্যা বরং বরের সংখ্যা অপেক্ষা কম; কাজেই তাহাদের মধ্যে কনেপণ বর্ত্তমান।

আধুনিক শিক্ষিত ও ভদ্র উচ্চ সমাজেও পাত্রের সংখ্যা বেশী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপযুক্ত পাত্রও পাত্রীর মধ্যে প্রভেদ এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে এরূপ অবস্থায় পণ-প্রথা না থাকিয়া পারে না। যে

অন্যদিকে এমন পাত্রীর সংখ্যা অতি কম যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দিয়াছে। একজন বি এ, পাশ পাত্র 'প্রথম ভাগ, শিশু শিক্ষা' শিক্ষিতা পাত্রীকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে কিন্তু একজন 'প্রথমভাগ' শিক্ষিত কেন আই, এ, পাশ পাত্রকে যে একজন বি, এ, পাত্রী তাহার উপযুক্ত পাত্র মনে করিতে পারে তাহা বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজের কল্পনার বহির্ভূত।

মূল কথা এই যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যেরূপ পাত্রী খুঁজেন অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতা তাহাদের সংখ্যা খুবই কম অথচ তাহাদের তুল্য শিক্ষিতা পাত্রী অতি বিরল। কাজেই যখন পাত্র পাত্রী অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত ও উপযুক্ত তখন বরপণ থাকা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। আমাদের দেশের কৌলিন্য প্রথা এই অসমতাকে আরও বেশী করিয়া তুলে।

তৃতীয় বক্তব্য এই যে পণপ্রথার একেবারে উচ্ছেদ অসম্ভব। স্থান বিশেষে উহা বরপণ অথবা কন্যাপণ হইবে। যখন বংশহীন অথবা নিম্নশ্রেণীর অনুপযুক্ত বর উচ্চশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত কনেকে বিবাহ করিতে যাইবে তখন তাহাকে কনে-পণ দিতেই হইবে। অপর পক্ষে যখন ধনী পিতা তাহার কুৎসিতা কন্যাকে উচ্চবংশে উৎকৃষ্ট পাত্রের নিকট বিবাহ দিতে চাহিবে তখন তাহাকে অবশ্যই বরপণ দিতে হইবে।

আর একটা কথা লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে আমাদের দেশে বহু বিবাহ আইনতঃ প্রচলিত থাকায় স্ত্রীলোক credit কম। কিন্তু ইহা যে বরপণের কারণ তাহা মনে হয় না। বরং বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক ; কারণ যখন একজন পুরুষ একের অধিক বিবাহ করিবে তখন মেয়ের demand বাড়িবে এবং মেয়েদের অভিভাবকেরাও যাহার স্ত্রী আছে তাহার নিকট সহজে মেয়ের বিবাহ দিতে চাহিবে না।

বরপণ বা কন্যাপণ সবদেশেই অল্পবিস্তর আছে। তবে এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে বঙ্গদেশের উচ্চ-শিক্ষিত ও ভদ্রবংশীয় হিন্দুদের মধ্যে বরপণ এরূপ ব্যাপক কেন? লেখক মহাশয়ের মতে স্ত্রীলোকগণের পরাধীন ভাব এই বরপণের গোড়ার কারণ ; কিন্তু আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে উহা মোটেই কারন নয়। এমন কি যে সমাজে স্ত্রীলোকগণ অতি অধীনভাবে জীবন যাপন করে সেখানে অন্য কারণ হেতু বর-পণের পরিবর্ত্তে কনে পণই দেখিতে পাওয়া যায়—যথা হিন্দু কৃষক ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর সমাজ।

এই বরপণ প্রথা শুধু আমাদের উচ্চসমাজেই সর্ব্ব ব্যাপক কেন এবং তার প্রতিকারই বা কি, সে সম্বন্ধে আমার মত সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

(১) বরপণের একটী কারণ আমাদের বর্ত্তমান ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের বরের আদর্শ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিওয়ালা ছেলে হইলেই আমরা উপযুক্ত বর মনে করি। আমাদের এই আদর্শ বদলাইতে হইবে। আমাদের সকলেরই পাশকরা পাত্রের প্রতি ঝোঁক থাকায় তাহাদের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। অপর পক্ষে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা নয় অথচ উপার্জ্জনক্ষম, সচ্চরিত্র ও সুস্থ পাত্রের চাহিদা সুতরাং দর অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

কৌলিন্য প্রথাকে বরপণের ঠিক কারণ বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহা যেমন অনেকস্থলে বরপণের সৃষ্টি করিয়াছে অন্যদিকে আবার কুলীন ঘরের মেয়েদিগের পক্ষে বরপণ অনেকটা কমাইয়া দিয়াছে এবং স্থান বিশেষে কন্যাপণেরও সৃষ্টি করিয়াছে। তবে কৌলিন্যপ্রথা যে পণের সৃষ্টি করিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২) বরপণের সর্ব্বপ্রথম কারণ হইতেছে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও অসংখ্য বিভিন্ন প্রকার বর্ণ ও শ্রেণীর অবস্থিতি। আমাদের হিন্দুসমাজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে কোন এক সমাজে বিবাহযোগ্য উপযুক্ত পাত্রের সংখ্যা অতি কম তজ্জন্য পাত্রের দর বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু যদি একশ্রেণীর হয় তবে বিবাহযোগ্য পাত্র ও পাত্রী উভয়ের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইবে এবং পণপ্রথা অনেকটা কমিয়া যাইবে। বস্তুতঃ এই শ্রেণীবিভাগই এই বরপণের অতি প্রধান কারণ। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিম বঙ্গের বৈষ্ণ-

সমাজ ধরা যাইতে পারে। তাহাদের সংখ্যা এত কম (limited) যে উপযুক্ত পাত্র কদাচিৎ দুই একটী পাওয়া যায় এবং পাত্রীর পিতা choice করিবার কোন সুযোগ পায় না। কাজে কাজেই এরূপ পাত্রদের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। কিন্তু যদি সমস্ত হিন্দুসমাজ এক হয় এবং inter-caste বিবাহ অবাধে প্রচলিত থাকে তবে পাত্র ও পাত্রীর সংখ্যা অনেক হইবে এবং উভয়পক্ষই choice করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবে, এবং এরূপ অবস্থায় অতিরিক্তমাত্রায় পণ থাকিতেই পারে না। কিন্তু যেখানে সমাজ অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ এবং কাজে কাজেই choice করিবার কোন সুযোগ থাকে না তখন কদাচিৎ একটী ভাল পাত্র মিলিলে কন্যার পিতাকে বাধ্য হইয়াই অধিক মাত্রায় পণ দিতে হয়।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার একটা ধূয়া উঠিয়াছে। স্ত্রী স্বাধীনতার আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী; এবং স্ত্রীস্বাধীন মহারাষ্ট্রদেশে বাস করিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার সুফল প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে কোন সামাজিক প্রথা যাহাকে আমরা খারাপ বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার কারণ স্ত্রীপরাধীনতা বলিলে চলিবে না।

বরপণ যে একেবারেই খারাপ তাহা মোটেই মনে হয় না। যেখানে পুত্র পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে সেখানে মেয়ে যে কিছুটা অংশ পাইতে পারে তাহা খুবই ন্যায়সঙ্গত। তারপর বরপণ শুধু এক পক্ষীয় onesided নয়। কাজেই নৈতিক মত প্রচার করিয়া বরপণের উচ্ছেদ সম্ভবপর নয়।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের সঙ্কীর্ণ বিভাগই বরপণের প্রধান কারণ। এই প্রথা কমাইতে হইলে সমাজের সংস্কার আবশ্যক। সমাজের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া বিবাহের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে। এবং যখন পাত্র ও পাত্রীগণ বিভিন্ন groups বা অংশে অংশে বিভক্ত না হইয়াই একটা বিশাল ক্ষেত্রে পরিণত হইবে তখন আপনা হইতেই পণপ্রথা মন্দীভূত হইয়া আসিবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু।

মাসিক সাহিত্য পরিচয়

চুম্বক

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩১।

কয়লার কেরামতি—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে কার্ব্বলিকএসিড আকাশে বাতাসে বিরাজ করতো, গাছপালার আহার্য্য রূপে সেই এসিড তাদের দেহ পুষ্ট করতো। তারপর কালের ধ্বংসলীলাতে সেই সব গাছপালা মাটির ভিতর চাপা পড়ে গিয়ে পৃথিবীর ভিতরকার তাপে অঙ্গার হয়ে গিয়ে এখন কয়লা হয়ে দাঁড়িয়েছে।—কাঁচা কয়লাতে তাপ দিয়ে কোক কয়লা, liquid ammonia, আলকাতরা ও গ্যাস তৈরী হয়। কোক কয়লা ও গ্যাস জ্বালানী রূপে ব্যবহার হয় ammoniaর সঙ্গে Sulphuric acid মিশিয়ে একরকম সার তৈরী হচ্ছে। আলকাতরা যে মানুষের কত উপকারী তা' এখন জানা যাচ্ছে। আগে ধারণা ছিল যে, আলকাতরা থেকে 'ন্যাপথা' বলে তেলের মতো একটা জিনিস তৈরী হতে পারে। তাই থেকে ফ্যারাডে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে বেনজিন্ প্রস্তুত করেন যা খুব তরল আর সহজদাহ্য। পরে ম্যান্সফিল্ড আবিষ্কার করেন। আলকাতরাকে distil বা পরিস্রবন করলে এই কটা জিনিস পাওয়া যায়,—বেনজিন, টলুইন, জাইলিন, কার্ব্বলিক এসিড, ন্যাপথালিন, এনথ্রাসিন ও,

lubicrating oil, যে তলানী পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে "পিচ্" তা' থেকে বার্ণিস ও জুতার কালি তৈরী হয়, আর আমরা দেখেছি যে, 'পিচ্' পথে ঢেলে দেওয়া হয় আর তা দিয়ে কাঠ রক্ষা করবার কাজ হয়। ম্যান্সফিল্ড আলকাতরার এক মস্ত কারখানা খোলেন কিন্তু ১৮৫৫খৃঃ অব্দে সে কারখানাটি আগুন লেগে পুড়ে যায় আর আগুন নিভাতে গিয়ে ম্যান্সফিল্ড-ও প্রাণত্যাগ করেন। ঠাণ্ডা বেন্জিন্নাইট্রিক ও সাল্ফিউরিক এসিড মিশালে নাইট্রো বেনজিন নামে এক সুগন্ধ তেল তৈয়ারী হয়। এই নাইট্রো বেন্জিন্ aniline তৈরীর কাজে অনেক লাগে—যে aniline থেকে নানা রকমের রং প্রস্তুত হচ্ছে। রঙের জন্য ন্যাপ্থালিন, এন্থ্রাসিন ও নীল অনেক দরকার হয়। এই তিনটিই আলকাতরার থেকে তৈরী হচ্ছে। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে গার্ডেন ও ১৮৩২খৃঃঅব্দে ডুমাও ল'রে যথাক্রমে ন্যাপ্থালিন ও এনথ্রাসিন আবিষ্কার করেন। নীলের চাষের কথা আমাদের দেশে অনেকে শুনেছেন। ১৮৭৯খৃঃঅব্দে ব্যায়ার নামে একজন জার্ম্মান আলকাতরা থেকে নীল যে তৈরী হতে পারে এই তথ্য জগতে প্রচার করেন। এই রকম রাসায়নিক আবিষ্কারের দরুণ ২০০০ রকমের রং আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এক ইংলণ্ডেই এত রং বছরে তৈরী হয় যে, যদি তা' দিয়ে একফুট চওড়া কোনো কাপড় রঙানো যায় তাহ'লে সে কাপড় এত বড় হবে যে সে কাপড় পৃথিবীকে ২০০০বার বেড় দিতে পারবে,আর ২৫ বার পৃথিবীর বক্ষ থেকে চন্দ্রে যেতে পারবে। শুধু রং নয় অনেক ওষুধও এই আলকাতরা থেকে তৈরী হচ্ছে। Merchant of venice এ দেখি যে বিনারক্তপাতে এক পাউণ্ড মাংস কাটা ছিল। এখন তা' সম্ভব হয়েছে। Adrenaline নামে এক রকম ওষুধ আলকাতরা থেকে তৈরী হচ্ছে, যা একটু শরীরে কোনো অংশের মধ্যে দিলে বিনারক্তপাতে সেখানে অস্ত্র চালনা করা যায়। আলকাতরা থেকে আর একটা অদ্ভুত আবিষ্কার হয়েছে, সেটা হচ্ছে স্যাকারিন (Saccharine)। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে Fahlberg নামে এক জার্ম্মাণ যুবক আলকাতরা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। একদিন তিনি কারখানা থেকে গিয়ে চা ও রুটি খেতে খেতে দেখলেন রুটি এত মিষ্ট যে মুখে দেওয়া যায় না। ঝি বল্লে সে চিনি দেয়-নি, কেন না Fahlberg চিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। নিজের আঙ্গুল চেটে তিনি দেখলেন তাঁর আঙ্গুলেই মিষ্টি আছে। তখন কারখানায় গিয়ে তিনি স্যাকারিন আবিষ্কার কল্লেন যা' চিনির ৫৫০ গুণ মিষ্টি আর চিনির চেয়ে ঢের উপকারী। দুর্গন্ধ আলকাতরা থেকেই এক জার্ম্মানীতে বছরে কম করে ৩ কোটি টাকার নানা রকমের গন্ধদ্রব্য এসেন্স প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। আবার আলকাতরা থেকে কার্বলিকএসিড প্রভৃতি যা' পাওয়া যায় তা থেকে dynamite ও অন্য অনেক রকমের বিস্ফোরক ও ধুমহীন বারুদ পর্য্যন্ত তৈরী হচ্ছে। ছাপার ও লেখার কালি, ফোটোগ্রাফির ওষুধ, বার্ণিস, কাঙ্গা কৃত্রিম শিং, amber, electric insulator প্রভৃতি নানান্ জিনিস এই আলকাতরা থেকেই তৈরী হয় কাজেই দেখা যাচ্ছে কয়লা আমাদের কত উপকারী।

প্রাচী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

ভারতের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব।—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। রাজা অশোক ভারতে কেন, সিংহলে ভারতের পশ্চিমে যে সব যবনরাজ্য ছিল, সে সব জায়গায় মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় করেছিলেন। গাছ-গাছড়া অভাব পড়লে ভারতবর্ষ থেকে চালান হোত, সে সব দেশেও গাছ-গাছড়ার চাষ করা হয়েছিল ক্রমে সমস্ত এশিয়ায় বৌদ্ধদের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ বিস্তার লাভ করেছিল। চীন দেশে কাশগড় গ্রামে একটা বৌদ্ধস্তূপ থেকে গুপ্তযুগের অক্ষরে লেখা সাতখানি সংস্কৃত পুঁথি বেরিয়েছে—নাম তার বাওয়ার পুঁথি—তার ভিতর চারিখানি চরক সুশ্রুতের চেয়ে পুরাণো আয়ুর্ব্বেদের বই। তার চেয়ে পুরাণো পুঁথি ম্যাকার্টনি মধ্য এশিয়ায় বার করেছেন। সিংহলের রাজা বুদ্ধদাস অনেক চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন অশোকের

পরে। তিনি নিজেও একটা আয়ুর্ব্বেদের বই লিখেছিলেন তার নাম, "সারথ সংগ্রহ।" এ হচ্ছে ৪ শতকের কথা। ১৩ শতাব্দীতে 'যোগার্ণব' বলে আর একখানা বই লেখা হয়। তারপর আরো অনেক বই এ সম্বন্ধে সিংহলে লেখা হয়েছিল। তিব্বতে ৮ শতাব্দীতে চারখানি আয়ুর্ব্বেদ বইয়ের অনুবাদ হয়। পরে আরও অনেক বই অনুবাদ হয়েছে আর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তিব্বত থেকে মঙ্গোলিয়ান ও লেপচাদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে। পারস্যদেশে শাসানিয়ান ও আব্বাসাইডদের রাজত্বকালে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হয়। আরবীভাষায়ও এমন অনেক বইয়ের অনুবাদ হয় যার মূল এখন পাওয়া যায় না। আবু মনসুর মুয়াফফক নামে এক পারস্য লেখক ভারতে এসেছিলেন আয়ুর্ব্বেদ শিখবার জন্য। আরব ও পারস্যের ভিতর ইউরোপে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হয়। গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব যথেষ্ট। ১৭ শতাব্দীতে আরব চিকিৎসা ইউরোপে খুব বেশী ছিল ও আরবী ইবন সিনা,' আলরাজি' প্রভৃতি বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদে 'চরকে'র নাম প্রায়ই পাওয়া যায়। ভারতবাসীরা উপনিবেশ করেছিলেন, ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম, কম্বোডিয়া, আনাম, সুমিত্রা, যাভা প্রভৃতি দেশে। সে সব দেশেও আয়ুর্ব্বেদের প্রচার যথেষ্ট হয়েছিল কম্বোজরাজ যশোবর্ম্মনের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ৯ শতাব্দীতে কম্বোজে সুশ্রুতে'র কত আদর ছিল। অষ্টম জয়বর্ম্মনের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১২ শতাব্দীতে আয়ুর্ব্বেদ মতে অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছিল। লেখক একখানি শিলালিপি উদ্ধৃত করে তার কথা প্রমাণ করেছেন আর সে দাতব্য চিকিৎসালয় কেমন ছিল তাও দেখিয়েছেন। জয়বর্ম্মনের আরোগ্যশালায় ব্রাহ্মণাদি সবজাতেরই চিকিৎসা হোতো। প্রতিবারে ১জন পুরুষ রোগী বা ২জন স্ত্রীরোগী ও ২জন কবিরাজ থাকতেন। অন্য কর্ম্মচারীদের নাম ও সংখ্যা—নিধিপাল যিনি ওষুধ ভাগ কর্ত্তেন, ২জন, যজ্ঞহারী (ওষুধের ব্যবস্থাদাতা) ২জন, আরোগ্যশালায় ওষুধ ব্যবস্থা করবার জন্য ১৪ জন, দাসী ৮ জন, ব্রীহিকাঠ সংগ্রহ করার জন্য ২ জন, গাছ-গাছড়া সংগ্রহের জন্য ২, সবশুদ্ধ ৩২ জন কর্ম্মচারী আর ৬৬ জন রোগী একটা আরোগ্যশালায় থাকতেন। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তার তত্ত্বাবধান কর্ত্তেন। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'লেও এই আরোগ্যশালায় থাকা অবস্থায় কারো কোনো দণ্ড হতে পারত না, অথচ রোগীদের উপর সামান্য অত্যাচারে গুরু দণ্ড হবার ব্যবস্থা ছিল। এক জয়বর্ম্মনের রাজ্যেই এইরকম আটটি আরোগ্যশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর চেয়ে আয়ুর্ব্বেদের গৌরবের কথা আর কি হতে পারে।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

আমাদের সঙ্গীতের সংস্কার।—শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

প্রত্যেক ললিতকলা দু'ভাবে উপভোগ করা যেতে পারে, প্রবুদ্ধভাবে (intellectually) আর অনুভূতির দ্বারা (emotionally)। গানের মধ্যে যে technique আছে শুধু সেটা যখন উপভোগ করা যায় তাকে প্রবুদ্ধ উপভোগ বলা যাইতে পারে, আর যখন গানের ভাবটা প্রাণে আনন্দ দেয় তখন তাকে অনুভূতির উপভোগ বলা যায়। প্রথম যে আনন্দ, শিল্পটি সম্বন্ধে একটু জানা না থাক্‌লে তা' হয় না। দ্বিতীয় আনন্দ পাবার জন্যে তেমন কিছু দরকার নেই শ্রেষ্ঠ শিল্প তাই তা'তে এই দুইটি আবেদনের সামঞ্জস্য আছে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। intellectual আনন্দও সত্য বটে, তবে সেটা ঠিক ললিত কলার আনন্দ নয়। ওস্তাদী আর যা' কিছু হতে পারে, আর্ট নয়। আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর গানবাজনার যে আদর হয় না তার মূলকারণ [illegible] গানের সর্ব্বস্ব বলে বিবেচনা করেন। ভাব বা

গঠন পদ্ধতি দুরস্ত করা দরকার হয় তাহ'লে সমজদারের সংখ্যা দিনদিন কমেই যাবে। যে কোনো শিল্পের ভিতর যদি আন্তরিকতা থাকে তাহলে তার আদর পরে হবেই। উচ্ছাসই হচ্ছে শিল্পের প্রাণ।—আমাদের দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে বল্‌তে হয় যে, আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যায় সুর নিয়ে নীরস লাফালাফি তাতে উচ্ছাসের অস্তিত্বই নেই এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা একটা দুরূহ সাধনা দেখলে যে বিস্মিত হই তাকেই মনে করি আনন্দ।—মধুর স্বর না থাক্‌লে গান কখনই মর্ম্মস্পর্শী হয় না। আমাদের দেশের ওস্তাদেরা মধুর কণ্ঠস্বরের মোটে আমলই দেন না। আমি নিজে অনেক ওস্তাদের কাছে গান শিখেছি; মধুর স্বরের কথা কেউ বলেন নি এখানে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে, সেখানেও স্বরের মাধুর্য্য বাড়াবার কোনো চেষ্টা হয় না। আমাদের ওস্তাদেরা যদি কণ্ঠস্বরের মর্য্যাদা বুঝতেন তাহ'লে তাঁরা কখনোই এত গলাবাজি করতেন না। এমন অনেক ওস্তাদ আমাদের দেশে আছেন যাঁদের কণ্ঠস্বর কর্কশ হ'লেও কালোয়াতীর জোরে খুব নাম কিনেছেন। অনেক সমজদারের সঙ্গে আলোচনা আমি করেছি; কেউ বড় আমাকে স্বর সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেন নি। ওস্তাদেরা ছাত্রদের দিয়ে এত বেশী গান গাওয়ান যাতে স্বরের মাধুর্য্য বজায় রাখা যায় না। আরো দেখা যায় যে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ওস্তাদেরা কর্কশকণ্ঠ। অন্য দেশে তা নয়। ইউরোপে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য বাড়ানো প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়, এখানে তা মোটেই হয় না। এটার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে গানকে intellectual জিনিষ বলেই ধরাই হয়।—আমাদের দেশে সঙ্গীতের দিনদিন অবনতির আর একটা কারণ আছে। আমাদের ওস্তাদের মন কুশিক্ষা ও গোঁড়ামিতে ভরা, তাঁদের মধ্যে culture নেই।

সঙ্গীতের সংস্কার—প্রকাশভঙ্গী ও ব্যক্তিত্ব।—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

আমাদের সঙ্গীতকে গতানুগতিক হয়ে পড়তে দিলে চলবে না। কালের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মন বদলাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ললিত কলার অন্যতম সঙ্গীত স্থিতিশীল হয়েই রয়েছে। এটা কি ভালো? আমাদের সময়ের সঙ্গীতকলাকে decadent (অধোগামী) বলা যেতে পারে। কাজেই তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় এসেচে, যাকে বলে renaissance বা নবজীবন। তাহলে দরকার হচ্ছে এখন প্রাণহীন তানালাপের বর্জ্জন, অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ ও সবচেয়ে বেশী, নতুন প্রেরণার অভিনন্দন। ওস্তাদরা এই সব জিনিষেরই বিরোধী তাই তাঁদের সঙ্গীতচর্চ্চা একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীতের কোনো নতুন ভঙ্গী বা চালের ভিতর সত্যকার সৌন্দর্য্য থাকলে, ওস্তাদরা তা বুঝতে পারেন না বা চান না। নতুন কিছু যে শুধু তার নূতনত্বের জন্যই অনুচিত ও অশোভন, এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ নেই। সনাতনের দাম অনেক জায়গায় যথেষ্ট থাকে সত্য, কিন্তু তাই বলে নতুন যা' কিছু তাই যে অসার, এটা ঠিক তো নয়ই; বরং এ-মতে কোনো শ্রদ্ধা করা যায় না। আরো এক কথা হচ্ছে এই যে, সঙ্গীতে গায়কের স্বরূপতার প্রকাশভঙ্গীতে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। তা' যদি হয়, তাহলে গায়ককে তার নিজের প্রকাশভঙ্গী বিকাশ করার যতই স্বাধীনতা দেওয়া যাবে, গান তত ভালো হবে। অপরের গাইবার ভঙ্গী নিছক নকলকরে আর একজন কখনো তার সমান হতে পারে না। অবশ্য এটা স্বীকার্য্য যে একজনের প্রভাব অপরের উপর বিশেষরূপে বিস্তার হয়ে পড়ে। সেটা ছাড়া যায় না, ছাড়লেও ফল ভালো হবে না—নতুন জিনিষ অভিনন্দন করার যে শিক্ষা, তার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক চাই,—সে রকম শিক্ষকের অভাব থাকলে আমাদের সঙ্গীতে নতুন রসের আমদানী হওয়া অসম্ভব।

স্বাধীন চিন্তা নেই তাই ইউরোপের কাছ থেকে সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু আমাদের শিখবার আছে। Beethoven ও Wagner শুধু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। তাঁদের মন উঁচু ছিল, শিক্ষাও ছিল যথেষ্ট। Romain Rolland সত্যই বলেছেন, "চরিত্র মহৎ না হইলে মহৎ লোক, শিল্পী বা কর্ম্মী হওয়াযায় না।"

রবীন্দ্রনাথের বাণী—শ্রীসুখেন্দুনাথ বসু

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিচিত্রতার মধ্যে একটি সুর, সব সুরকে ছাপিয়ে আছে. সেটা হচ্ছে এই, যে, দুঃসময় হলেও সংসার পরম সুন্দর আর ভগবান নিজেকে এইখানেই নিত্য নূতনভাবে বিস্তার করে দিচ্ছেন। তাই কবি গেয়েছেন,—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।" সংসারের ভিতর থেকেই ভগবানকে লাভ করতে হবে। "অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।" "প্রকৃতির প্রতিশোধে" কবি এই ভাবটি ব্যক্ত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সব অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন-পাত্রের যত মধু নিঃশেষে পান করেছেন। জীবন তাঁর কাছে অনন্ত অর্থপূর্ণ। তিনি মানব জীবনকে ভালোবাসেন বলেই তার পূর্ণ-বিকাশ তিনি চান। তাই তিনি সামাজিক কুসংস্কারের প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বাঁধনে বাঁধনে এতই পীড়িত যে, বাইরের আলো বাতাস, শিক্ষা দীক্ষা, স্বাধীনতা সব থেকেই তাঁরা বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক কবিতায় তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন, আর বিশেষ করে পলাতকার সেই কবিতায় যেখানে একটি মেয়ে মৃত্যুশয্যায় তাঁর বাইশ বছরের দাম্পত্য জীবন তোলপাড় করে দেখছেন।— যৌবনের চলার বেগ আছে, একটা জিজ্ঞাসার আহ্বান আছে, তাব সে জীবনের বাণী বহন করে আনে। এই জন্যই এই অশ্রান্ত যৌবনের উপর কবির অসীম শ্রদ্ধা। যৌবনকে তিনি বলছেন যে,—"জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার বিবি।" কবি নিজের যুবক থাকবার, সকলের সাথে একবয়সী হবার, সকলের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন কর্‌বার ইচ্ছা—যা' "প্রভাত সঙ্গীতেও ব্যক্ত হয়েছে,—"জগৎ হয়ে রব আমি' একেলা রহিব না'—উপনিষদের ঋষির মতো আমাদের কবি জীবনকে আনন্দ স্বরূপই দেখেছেন। কবি মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন' দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে সত্যকে লাভ করেছেন, সুখের ভিতর আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করে ধন্য হয়েছেন কবি লিখেছেন,—

"মোর মরণে তোমার হবে জয়,
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।"

সাম্যবাদী; বৈশাখ, ১৩৩১

কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী, মুসলমান।

চৈতন্যদেবের প্রেমের বানে যখন বাংলা ডুবুডুবু' তখনই প্রথম বাংলা ভাষা সাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই আমরা জন্ম থেকেই বাংলাসাহিত্যকে কাব্যরূপে দেখতে পাই। চৈতন্যের প্রেমের প্লাবন একদিন ধর্ম্মের বাঁধ-ও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারই ফলে বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হয়েছিল। নসরৎখাঁ ও পরাগল খাঁ প্রভৃতি বাংলা মুসলমান সুবাদারেরা বাংলা কবিদের উৎসাহ দিতেন যথেষ্ট এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য অনেক টাকাও খরচ কর্ত্তেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবিরা চণ্ডীদাস' ও অন্যান্য হিন্দুকবিদের অনুকরণ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের প্রাণের সঙ্গে সে কবিতার সম্পর্ক না থাকায় রচনার প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন-নি। তারপর আলওয়ালি যুগ এসেছিল। সেযুগের মুসলমান কবিরা নানান্ বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছিল—কিন্তু সে সব কবিতার ভিতর মুন্সীয়ানার ভাবটা ছিল বড় বেশী আলওয়াল তাঁর পদ্মাবতী, ছয়ফলমুল্ক, হফতপয়কর প্রভৃতি কাব্যে খুবই বিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্য একেবারেই বাস্তব। যৌনপ্রেমই তার সার তথ্য। আলওয়ালের তুলনা আমরা পাই। ভারতচন্দ্রের কবিত্ব ও রসের দিক দেখতে গেলে তাঁদের তুলনা মেলা ভার। আলওয়ালী যুগের পরেই পুঁথি লেখাই মুসলমান কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য হ'য়ে পড়েছিল। এই সব পুঁথির বেশীর ভাগই উর্দ্দু ও পারস্যের অনুবাদ। আলেফলায়লা, কাছাছোল আম্বিয়া, আমীর হামজা এই সব অনুবাদ-পুথি মুসলমান-সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে। আমীর হামজার কবি সৈয়দ হামজার আশ্চর্য্য কবিত্ব ছিল। মৌলিক পুঁথিগুলির মধ্যে কবিত্ব নেই, আছে শুধু কামের বীভৎস লীলা। মুসলমান পুঁথি সাহিত্য লোকশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তৈরী হয়েছিল, আর সে হিসাবে তার দাম ও যথেষ্ট। কার্য্য হিসাবে সাহিত্যের আসরে তার স্থান কিন্তু অনেক নীচে।

... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৮শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩১ { পঞ্চম সংখ্যা

ভূত শুদ্ধি

হে অন্তর্য্যামি! আমার অন্তরে থাকিয়া তুমি আমায় যমন করিতেছ, আমায় সংহত করিতেছ, আমাতে শুভবুদ্ধির প্রেরণা করিতেছ, গুরু তুমি!

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

আমার শরীরাভ্যন্তরে তোমার স্থান কোথায়? এ মন্দিরে তোমার বসতি কোথায়? নিম্নাঙ্গে নহে, উচ্চাঙ্গে; মস্তকে, সহস্রারে। সাড়ে যাট লক্ষ নাড়ীতে জীব আমি শরীর মধ্যে বিচরণ করিতেছি। কোন নাড়ী দিয়া কর্ম্মোদ্যম চলিতেছে আমার, কোন নাড়ীর বৈদ্যুতী প্রবাহে শীতাতপবোধযুক্ত ও প্রেমদ্বেষ ক্রোধদুঃখ, সুখশান্তিময় হইতেছি, কোন নাড়ীপথে জ্ঞানে বিহার করিতেছি। হাজার হাজার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারের ন্যায় জ্ঞান ও আনন্দের কম্পনভরা সহস্রদল আখ্যাত সচেতন জটিল নাড়ীপুঞ্জে অবস্থিত তোমাতে, বাক্য শ্রবণ ও মানবের অগোচর অদৃশ্য মহাশূণ্য শান্তং শিবমদ্বিতীয়ং, জ্যোতিষাং জ্যোতি সত্যং জ্ঞানমনন্তং তোমাতে নিবিষ্ট হইয়া জ্ঞানময় হইতেছি। তুমি সহস্রদলবাসী গুরু, তুমি আমায় শুভবুদ্ধি প্রদান কর।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া শুদ্ধমপাপবিদ্ধ, জ্ঞানজ্ঞেয় ও জ্ঞানদাতা পরমগুরু তোমার মানসোপচারে পূজা করি, আমার পূজা গ্রহণ কর। আকাশাদি পঞ্চভূত ও তদুৎপন্ন এই শরীরের এবং শুদ্ধা আত্মা প্রকৃতির বিকার এই মনবুদ্ধি অহঙ্কারের হে পূর্ণ ব্রহ্ম, তোমার সহিত যোগদ্বারা সংস্কার করিয়া আমার ভূতশুদ্ধি কর। গুরু তুমি, শুভবুদ্ধি প্রদান কর।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

তোমাকে আমার অন্তর ও বাহিরস্থিত পঞ্চমহাভূত অর্পণ করিতেছি। হে পূর্ণ! আকাশরূপ পুষ্প, পৃথিবীরূপ গন্ধ, বায়ুরূপ ধূপ, অগ্নিরূপ দীপ, জলরূপ অমৃত ও সর্ব্বাত্মকরূপ ভোগ্য বস্তু গ্রহণ কর। যাহা তোমাকে উৎসর্গ করিলাম তাহাতে আমার আর অধিকার রহিল না। এই যে মহান্ আকাশ যাহাতে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, যাহা শব্দবাহী, যাহা জ্যোতির্ব্বাহী, যাহার কম্পনে কম্পনে ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ দোদুল্য হইতেছে, যাহারা সুনীল শূন্যতায় সব কিছু লয় হইতেছে তাহা তোমাকে দিলাম; এই যে বায়ু যাহা সহসা উত্থিত প্রভঞ্জনে ধ্বংস করিতেছে, যাহা পঞ্চপ্রাণে প্রাণ লীলা করিতেছে, যাহা সমীরণে সুগন্ধ ও সুখস্পর্শ বিলাইতেছে, তাহা তোমাকে দিলাম। এই যে অগ্নি যাহা বর্ণ, রূপ, তেজ ও সুষমায় বিকশিত হইতেছে, যাহা প্রাণাগ্নি হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে, যাহা ভাবাগ্নি হইয়া ভাবময় তোমাকে মিলাইতেছে তাহা তোমাকে দিলাম; এই যে জল যাহা সাগরতটিনী নদীনির্ঝরে মেঘবর্ষণে প্রাণীর প্রাণবহন, নয়নমোহন ও তৃষ্ণানিবারণ করিতেছে তাহা তোমাকে দিলাম; এই যে পৃথিবী জীবধাত্রী জননী, ভূধরে কাননে গুহায় প্রান্তরে ক্ষেত্রে খনিতে সুন্দরী সুখদা অন্নদা ধনদা তাহার অন্ন পুষ্প ধনধান্য ও অনন্ত মধুরিমা সহ তাহাকে তোমায় দিলাম।

পঞ্চমহাভূতের অপঞ্চীকৃত এক এক সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় তোমাকে দিলাম। পঞ্চমহাভূতের অপঞ্চীকৃত এক এক রজাংশ হইতে উৎপন্ন আমার কর্ম্মেন্দ্রিয় তোমাকে দিলাম। পঞ্চমহাভূতের মিলিত সত্ত্বাংশে উৎপন্ন আমার মনবুদ্ধি ও অহংকার তোমাকে দিলাম। পঞ্চমহাভূতের মিলিত রজাংশে উৎপন্ন আমার পঞ্চপ্রাণ বায়ু তোমাকে দিলাম। তাহার সহিত আমার প্রাণন কার্য্য, জীবনস্পন্দন, মনন, চিন্তন, স্পর্শন, দর্শন, গ্রহণ বিসর্জ্জন, বচন, শ্রবণ, বেদন ও নন্দন তোমাকে দিলাম। এ সকলে আমার ভোগাধিকার আর রহিল না।

হে শুদ্ধবুদ্ধ পরমগুরু তোমার শুদ্ধতায় সকলি নিবেদন করিলাম। তুমি ঐ নৈবেদ্য স্পর্শপূত করিয়া ভক্তকে ফিরাইয়া দাও। তোমার প্রসাদ একা উপভোগের জন্য নহে এই গুরুমন্ত্র দাও, তাহা সকলের মধ্যে বণ্টন করিতে দীক্ষা

দাও। আমার অশুদ্ধি, অশুদ্ধ মন, মলিন অহঙ্কার, আমার অপূর্ণ শক্তি অপূর্ণ সাধন তোমার পূর্ণ শুদ্ধ মুক্তধারায় ধৌত হইয়া সকলের সেবায় নিয়োজিত হউক। অযজ্ঞীকৃত, স্বার্থপর আনন্দ হইতে বিরত রাখ, যজ্ঞশিষ্ট প্রসাদভোগে নিয়ত রাখ। তোমার চিরানন্দে প্রতিষ্ঠিত কর, আমায় স্থিরপ্রজ্ঞ কর। গুরু তুমি, শুভবুদ্ধি প্রদান কর!

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

যেমন কূর্ম কোষ মধ্যে অঙ্গ সংহরণ করে তেমনি আমার ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সংহত করাও।

যথা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঙ্গানী সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

কূর্ম অঙ্গ বিচ্ছেদ করে না, নিজেরই ভিতর অঙ্গ সঙ্কোচ করে। আমারও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিচ্ছেদ সাধন না ঘটুক, শুধু বিষয় হইতে বিষয়ের মর্ম্মস্থলে আলোচিত হউক, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অভিনিবিষ্ট হউক। নাম ও রূপধারী বিষয়কে তাহার বীজস্বরূপ মাতৃকাবর্ণে, বীজবর্ণে সংহরণ করাও। বিষয়ের বীজ মাতৃকাবর্ণে, মাতৃকার বীজ তৎভাব মাত্র, ভাবেরও বীজ তৎশক্তি এবং শক্তির পারে শক্তিমান শিব যাহাতে সব কিছু প্রতিষ্ঠিত।

হে পরমশিব! আমার ভূতশুদ্ধি কর, মাতৃকার সংহৃত কর, মুল প্রকৃতিতে প্রলীন কর, মহাশূন্যে তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে মগ্ন করিয়া স্থিতধী কর। হে সহস্রারবাসি গুরো শুভবুদ্ধি প্রদান কর।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

নিপাননার স্বপ্ন

নিপাননা কুমার অভিজিতের বাগ্‌দত্তা।

কুমার অভিজিৎ কৌশাম্বীর যুবরাজ।

কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেই সুন্দরী নিপাননা কুমার অভিজিৎকে স্বহস্তে বীরবেশে সাজাইয়া দিল। সে যে ক্ষত্রিয়ের মেয়ে,—বীরই যে তাহার আরাধ্য।

কুমার অভিজিৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কুমারী নিপাননার মস্তক স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেলেন। নিপাননার বক্ষ গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। সে যে বীররমণী,—তাহার স্বামী যে বীর।

উন্নতবক্ষে নিপানন্দা গৃহে ফিরিয়া আসিল,—গর্ব্বভরে সখীদের কাছে তাহার বীরদেবতা ধর্ম্মযুদ্ধে গিয়াছেন,—বলিল। আনন্দের সহিত কবরী বন্ধন করিল;—আনন্দের সহিত সুকুমার বক্ষে কাঁচলি আটিল;—আনন্দের সহিত ক্ষীণ কটিতটে রঙিন বস্ত্র জড়াইল;—আজ যে তাহার আনন্দের দিন;—তাহার দেবতা ধর্ম্মযুদ্ধে গিয়াছেন।

মস্তকে পুষ্প-মুকুট পরিল,—কবরী—অগ্রে পুষ্প বন্ধন করিল;—গলদেশে সুদীর্ঘ মাল্য দোলাইয়া—বাহুতে অংসে শরীরের সর্ব্বত্র পুষ্পভূষণ পরিল,—তারপর স্বর্ণথালে অর্ঘ্য সাজাইয়া মন্দিরে চলিল পূজা করিতে।

পরদিন সখীদের সঙ্গে মনের আনন্দে জলকেলি করিল,—মাতার সঙ্গে পরমান্ন আহার করিল,—এবং সন্ধ্যাবেলায় পূর্ব্বদিনের মত পুষ্পভূষণে সজ্জিতা হইয়া দেবতার পূজার জন্য মন্দিরে গেল।

কিন্তু তৃতীয় দিনে তাহার যেন এ আনন্দ ভাল লাগিল না। তবুও পূর্ব্বদিনের মতই তাহার দিন কাটিল—

চতুর্থ দিনে বুঝিল,—স্বামীহীন জীবন আনন্দের নয়,—তবুও আনন্দহীনতার মাঝেই তাহার কর্ত্তব্য সমাপন করিল।

কিন্তু পঞ্চমদিনে আর পারিল না,—পতির বিরহ তাহার হৃদয়ের, তাহার প্রাণের, তাহার কর্ম্মের সবটাকেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সে দিন সে শুধু কাঁদিল।

ষষ্ঠদিনে চিন্তা করিতে লাগিল,—কিসে তাহার বিরহের অবসান হয়,—স্বামীর সহিত কিরূপে তাহার মিলন হয়।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর;—কুমারী নিপানন্দা আপন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিতেছিল। উজ্জ্বল আলোকে অস্ত্র শস্ত্র ঝক ঝক করিতেছিল,—উজ্জ্বল আলোকে মণিময় আভরণগুলি ঝলসিতেছিল,—উজ্জ্বল আলোকে তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

নিপানন্দা বর্ম্ম পরিল;—বামহস্তে চর্ম্ম ধারণ করিল—মস্তকে হীরক ভূষিত শিরস্ত্রাণ বাঁধিল,—পাদদ্বয়ে মুক্তাখচিত পাদুকা পরিল।

বীরবালা বামস্কন্ধে ধনু ঝুলাইল,—বামপার্শ্বে মণিখচিত তরবারি ঝুলাইল,—পৃষ্ঠদেশে তূণ ধারণ করিল;—দক্ষিণ হস্তে এক দীর্ঘ শূল লইল;—তারপর অশ্বশালায় চলিল।

যে সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ অশ্বটি মন্দুরায় দাঁড়াইয়া দর্পভরে পা ঠুকিতেছিল,—সেইটিই বীররমণীর উপযুক্ত বাহন। তাহাকে নিপানন্দা স্বহস্তে সজ্জিত করিল।

তারপর নিপানন্দা সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের পথে অশ্ব ছুটাইল;—প্রেমাস্পদকে ফিরাইয়া আনিতে নয়;—তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে;—সে যে ক্ষত্রিয়ের মেয়ে,—সে যে ক্ষত্রিয়ের প্রেয়সী,—সে ধর্ম্মযুদ্ধে যোগ দিতে চলিল।

সে একবার পিতামাতার কথা ভাবিল না,—সে একবার আজন্মের মনোরম ক্রীড়াভূমির

দিকে চাহিল না ;—সে সখীদের ভালবাসা ভুলিল,—সে যে বীরনারী,—বীরনারী কবে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে ?

বায়ুবেগে অশ্ব ছুটিল,—কিন্তু নিপাননার মন তড়িৎগতিতে চলিল,—অশ্বের ক্ষমতা কি, অত বেগে যাইবার ? কষাঘাতে অশ্বের পৃষ্ঠে রক্ত ছুটিল,—দারুণ শ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফেণময় হইল—তবুও বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—সুপ্ত মেদিনীকে কাঁপাইয়া অশ্ব ছুটিল।

কিন্তু আর পারিল না—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অতি তেজস্বী অশ্ব ভূমিতে পড়িয়া গেল—একবার মাথা তুলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল,—তারপর সব শেষ।

নিপাননা একবার অশ্বের গলদেশে হাত বুলাইয়া দিল,—আদর করিয়া তাহাকে ডাকিল,—তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

বিশ্রাম নাই—নিদ্রা নাই—নিপাননা ক্রমাগত চলিয়াছে,—কিন্তু তবুও সেই সুদীর্ঘ পথ শেষ হইতে দ্বাদশ দিন দ্বাদশ রাত্রি অতিবাহিত হইল।

ত্রয়োদশ দিনের সূর্য্য কিরণোজ্জ্বল প্রভাতে কুমারী নিপাননা যখন কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল প্রান্তরে প্রবেশ করিল—তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্রও নাই। মাত্র অষ্টাদশ দিবস অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর সুবিশাল বাহিনী সমস্ত ধ্বংস হইয়াছে,—এমনি সে যুদ্ধ,—বীরবালা নিপাননার বক্ষ গর্ব্বে ভরিয়া উঠিল। তারপর সে কুমার অভি-জিতের দেহ অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—বেলা বাড়িতে লাগিল,—জনমানবশূন্য বিশাল প্রান্তর শোকাতুরা বিধবায় ভরিয়া যাইতে লাগিল,—সকলেই পতির দেহ লইতে আসিয়াছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল,—নিপাননার ক্লান্তি নাই,—সে শুধু একের পর আর একটি করিয়া শবদেহ দেখিয়া চলিয়াছে। কোন রমণী তাহার পতির শবের উপর পড়িয়া কাঁদিতেছে,—কোন রমণী পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—কোন রমণী পতিদেহ না পাইয়া ক্লান্তদেহে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিতেছে,—কিন্তু নিপাননার অনুসন্ধান আর শেষ হয় না।

সূর্য্যদেব অস্ত যাইবার উপক্রম করিতেছেন,—সমস্ত প্রান্তর এক সিন্দুরের রংয়ে ঢাকিয়া গিয়াছে,—তাহার উপর রক্তাক্ত দেহগুলি পড়িয়া আছে, সে দৃশ্য বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী, হৃদয় বিদারক।

প্রান্তরের একপার্শ্ব হইতে বীরবর অর্জ্জুন এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন,—আজ—তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বর অবসান হইয়াছে,—বিশাল কুরুক্ষেত্রে আর ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন নাই,—অর্জ্জুনের মন উদাস হইয়া চোখে বুঝি এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে পড়িল,—

"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ" ॥

অর্জ্জুন চারিদিকে চাহিলেন,—দেখিলেন,—এক যোদ্ধা সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছে—তিনি আশ্চর্য্য হইলেন—কুরুক্ষেত্রে যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নাশ হইয়াছে—তবে এ কে ? অর্জ্জুন অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে ?"

যোদ্ধৃবেশধারিণী ক্ষত্রিয়বালা উত্তর দিলেন,—আমি নিপাননা,—কুমার অভিজিতের বাগদত্তা।"

অর্জ্জুনের মনে পড়িল,—কুমার অভিৎজিতের কথা;—বীর তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অমানুষিক বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে;—কর্ণের সুতীক্ষ্ণ অব্যর্থ শর নিক্ষেপে কুমারের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল; অর্জ্জুন তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—মুখে তাহার হাসি,—সে হাসি যে মর্ত্ত্যের নয়—সেই স্বর্গের হাসি মুখে, কুমার জানু দ্বারা ধনু চাপিয়া বাম হস্তে অবিরত তীর ছুঁড়িতে লাগিলেন, কর্ণের শরাঘাতে তাহার ধনু দুই খণ্ড হইয়া গেল,—তিনি তখন বামহস্তে তরবারি ধারণ করিয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন;—অগণিত শত্রু তাহার তরবারী আঘাতে ভূমি শয্যা গ্রহণ করিল,—কুমারের বাহু নিঃসৃত রক্ত, নিপতিত শত্রুগণের গাত্র রঞ্জিত করিতে লাগিল,—তথাপি বিরাম নাই, কাতরতা নাই,—আর মুখে সেই স্বর্গীয় হাসি,—ধন্য সে,—ধন্য সে ক্ষত্রিয় বীর,—ক্ষত্রিয়কুল তাহার বীরত্বে আজ ধন্য! সুতীক্ষ্ণশায়ক কর্ণের হাত হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে কুমারের হাসিমাখা মুখখানি উড়াইয়া লইয়া গেল;—ছিন্নমস্ত কুমার তাহার বাম বাহু বাড়াইয়া কাহাকে ধরিতে গেলেন,—তারপর তাঁহার দেহ পড়িয়া গেল;—মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই পবিত্র দেহের উপর দিয়া যোদ্ধৃবৃন্দ হুহুঙ্কারে ছুটিল,—সে দেহ দলিত হইয়া কোথায় যে গেল, কে তাহার নির্দ্দেশ করিবে?

তবু অর্জ্জুন বলিলেন,—চল ভগ্নি তোমার অভিজিতের দেহ খুঁজিয়া বাহির করিতেছি। উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চিমোত্তর পার্শ্বে চলিলেন,—নিস্তব্ধ ভাবে।

পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিলেন। নিপাননাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এই তরুণী কে? কোন বীরের কন্যা; কোন বীরের উপযুক্তা সঙ্গিনী?—অর্জ্জুন উত্তর দিলেন,—ইনি, বীরশ্রেষ্ঠ কুমার অভিজিতের বাগদত্তা—"নিপাননা,—কুমারের সন্ধানে আসিয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—কুমারকে এখানে কোথায় পাইবে,—সে যে স্বর্গে।

অর্জ্জুন বলিলেন,—তাহা ইনি জানেন, ইনি কুমারের পবিত্র শবের সন্ধান করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে একবার হাসি খেলিয়া গেল,—তিনি বলিলেন,—কুমারী, অভিৎজিতের দেহ লইয়া কি করিবে? সে দেহে মস্তক নাই, হস্ত নাই,—বিকৃত,গলিত দেহ কি করিবে তুমি?

সুন্দরী নিপাননা শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিল,—এ যেন এক নূতন কথা তাহার কাণে লাগিল। নিপাননা প্রশ্ন করিল,—আপনি কে?

অর্জ্জুন বলিয়া উঠিলেন,—ইনি যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ।" নিপাননা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল,—শ্রীকৃষ্ণ, আমি কুমারের দেহ দেখিয়া এ নয়ন সার্থক করিতে যাইতেছি। বীরের অঙ্গহানি হইলেও বীরের মর্য্যাদা নষ্ট হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন. যথার্থ বলিয়াছ তুমি, এ জ্ঞান কোথায় পাইলে?

নিপাননা সগর্ব্বে উত্তর দিলেন,—ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, ক্ষত্রিয়ের প্রেয়সীকে একথা শিখাইতে হয় না,—এ জ্ঞান তাহার অস্থি মজ্জাগত।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই এই উত্তরে বড়ই প্রীত হইলেন।

অভিজিতের পবিত্র দেহের সম্মুখে আসিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, ভগ্নি, ঐ তোমার বীরশ্রেষ্ঠ অভিজিতের দেহ রহিয়াছে, ধন্য ধরিত্রী আজ, তাঁহার সেই পবিত্র দেহকে কোলে করিয়া, আর ধন্যা তুমি নিপাননা এমন বীরের প্রণয়িণী।

নিপাননা কোন উত্তর দিল না, তাহার কমনীয় নারীত্ব জাগিয়া উঠিল, সে অভিজিতের ব বক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ নিস্তব্ধ ভাবে এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন,—সখা নিপাননাকে শান্ত কর ;—তাহাকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দাও।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন,—না।

অর্জ্জুন ক্ষুণ্ণ হইলেন।

বহুক্ষণ পরে নিপাননার শোকাবেগ হ্রাস হইল, সে কটিদেশ হইতে মণিময় সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিয়া আপনার বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। চতুর শ্রীকৃষ্ণ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,—কি করিতেছ ?

বাধা পাইয়া ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় বীরবালা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, শ্রীকৃষ্ণ, সতীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিও না, হাত ছাড়িয়া দাও আমি বীরের অনুগমন করি।

তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কেন ?

নিপাননা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, জাননা কি তুমি যদুপতি, পতি বিনা নারীর জীবন বৃথা, ক্ষত্রিয়বালা মরিতে ভয় পায় না, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে সে সর্ব্বদাই হাসিমুখে প্রস্তুত।

অর্জ্জুন এই উত্তরে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, নিপাননা, তোমার উপর বড়ই প্রীত হইলাম, কোথায় এ জ্ঞান পাইলে ?

নিপাননা ঘৃণাভরে বলিল,—ক্ষত্রিয়বালাকে এ কথা শিখাইতে হয় না, সে বীরের কন্যা, বীরের জায়া।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বীরের কন্যা, বীরের প্রেয়সী তুমি, অবীরোচিত কর্ম্ম করিতে যাও কেন! আত্মহত্যা কি বীরের ধর্ম্ম, নিপাননা ?

নিপাননা স্তব্ধ হইল। এ—যে নুতন কথা তাহার কানে বাজিল। শ্রীকৃষ্ণ কোমলভাবে বলিতে লাগিলেন, কুমার অভিজিৎ বীরশ্রেষ্ঠ,—পরের উপকারের জন্য, ধর্ম্মের জয়ের জন্য সে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছে,—তাহার অক্ষয় স্বর্গ, কিন্তু তুমি নিপাননা,—সেই বীরের প্রেয়সী হইয়া মিলনের স্বার্থপরতায় আত্মহত্যারূপ অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছ,—ইহার ফল স্বর্গ নয়,—আত্মহত্যা যে বীরের ধর্ম্ম নয়,—নিপাননা !

নিপাননা স্তব্ধ হইয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল পরে অতি স্নেহময় স্বরে নিপাননার অন্তরাত্মা শীতল করিয়া বলিলেন,—"নিপাননা এস, তুমি,—যাহাতে কুমারের সহিত

মিলিত হইতে পার, যথার্থ বীরের সহধর্ম্মিনীরূপে, তাহারই উপায় করিতেছি ; এস, তুমি।

নিপাননা পাণ্ডবশিবিরে উপস্থিত হইল। দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সখি, ইনি নিপাননা,—কুমার অভিজিতের বাগদত্তা,—তোমার নিকটে ইঁহাকে রাখিয়া দাও।"

দ্রৌপদী সস্নেহে নিপাননার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ভিতরে যাইয়া নিপাননা স্তব্ধ হইয়া রহিল। দ্রৌপদী তাহার যোদ্ধৃবেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া পরম রমণীয় বেশে সজ্জিতা করিলেন ; মস্তকে বেণী বাঁধিয়া দিলেন ; অঙ্গ, অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন ; নিপাননা মৃতের ন্যায় কিছুতেই আসক্তি বা অনাসক্তির পরিচয় দিলনা।

পরদিন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া নিপাননার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে দ্রৌপদী বলিলেন,—প্রভু, বালিকা বড় শোক পাইয়াছে,—তুমি উহাকে আনন্দ দাও ;—নহিলে সে মারা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

দ্রৌপদী ক্ষণকাল পরে বলিলেন,—প্রভু, আমার নিবেদন, তুমি নিপাননাকে গ্রহণ কর,—তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে সে সুখী হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,— সখী, তোমার অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না। নিপাননা আমায় ভালবাসিতে পারিবেনা।

দ্রৌপদী ক্ষুণ্ণ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিপাননার কক্ষে গমন করিলেন। সে উদাস ভাবে বসিয়া আছে,—চক্ষে পলক নাই, হস্ত পদ অবশ, মস্তক একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে,—দেহের কোথাও প্রাণশক্তির লক্ষণ পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ ডাকিলেন,—নিপাননা! নিপাননা যেন অন্য জগৎ হইতে ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল,—কি ?

শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করিতেছ কুমারী ?

নিপাননা স্নেহভাবেই উত্তর দিল,—বসিয়া আছি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—নিপাননা,—তোমার কুমার কে দেখিতে চাও কি ?

নিপাননার দেহে যেন প্রাণ শক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল,—সুন্দর চক্ষু দুটি উজ্জ্বল করিয়া নিপাননা বলিল, —চাই বই কি প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে অন্তরে হাস্য করিলেন, প্রশ্ন করিলেন,—জীবিত, না মৃত ?

নিপাননা উন্নত হইয়া বসিল,—কহিল,—মৃত তো দেখিয়াছি,—জীবিত দেখিতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কিন্তু তাহার দেহ নাই, সুধু জীবিত আকৃতি আছে। তাহা দেখিয়া তুমি সন্তুষ্ট হইবে ?

নিপাননা উত্তর দিলেদ,—একটু গর্ব্বভরে,—ক্ষাত্রয়াণী দেহের পুজা করে না,—সে প্রাণ

শক্তিরই পূজা করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন;—শুনিয়া সুখী হইলাম, নিপাননা, তুমি আজ রাত্রে কুমারকে পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

নিপাননা সেইভাবেই বসিয়া রহিল। রাত্রি হইল; চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল, নিপাননা কক্ষের মধ্যে একাকী অন্ধকারে বসিয়ারহিল,—কুমারের প্রতীক্ষায়। তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচঞ্চল,—মন শান্ত, প্রাণ নিষ্কম্প,—সে স্থির দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, প্রথমে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আলোকচ্ছটা আসিয়া অন্ধকারের শক্তি নাশ করিতে লাগিল;—তারপর ক্রমে মেঘে ঢাকা চন্দ্রালোকের মত আলোক আসিয়া স্থিতিলাভ করিতে লাগিল,—সেই আলোর আভা নীল, সেই আলোর স্পর্শ মধুর,—কিন্তু সেই আলোকে কিছু ভাল করিয়া দেখা যায় না।

ক্রমে সেই আলোক উজ্জ্বল হইতে লাগিল,—উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতর হইতে উজ্জ্বলতম হইল। সেই আলোকের আভা নীল হইতে ঈষৎ নীল, ঈষৎ নীল হইতে শ্বেত আভাযুক্ত নীল, এবং তাহা হইতে শ্বেত আভায় পরিণত হইল। সেই আলোকে প্রস্তরময় প্রাচীর স্বচ্ছ হইতে আরম্ভ করিল; স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর, তাহা হইতে স্বচ্ছতম স্ফটিকের আকার ধারণ করিল। সেই স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া নদ, নদী, গিরি, কান্তার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! দূর হইতে বহুদূরে, ক্রমশঃ তাহা অনন্তে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত জগৎ তাহার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বচ্ছের মধ্য দিয়া স্বচ্ছতার সেই অনন্তে গিয়া মিশিল। সেই আলোকে, সেই আভায়, জগৎ সংসার সুন্দর হইয়া উঠিল; সেই সৌন্দর্য্য সুন্দরতর হইল,—ক্রমে তাহা সুন্দরতম হইয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, তাহার মাধুর্য্য পান করিতে করিতে সুন্দরী নিপাননা আত্মহারা হইয়া গেল।

"নিপাননা, আমি এসেছি, নিপাননা!" নিপাননা চাহিয়া দেখিল, বিশ্ব-চরাচরের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে কেন্দ্রীভূত করিয়া পরম লাবণ্যময় কুমার অভিজিৎ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বচ্ছ শ্বেত আলোকে উদ্ভাসিত, যেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সূর্য্যের নিবিড় জ্যোতিঃ। নিপাননা আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিল।

"নিপাননা আমি এসেছি, নিপাননা," কুমার তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। সেই স্পর্শে নিপাননার শরীরে প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৈদ্যুতিক শক্তি খেলিতে লাগিল; সে পরম সুখকর,—সে বড়ই মাদকতাপূর্ণ। নিপাননা বিহ্বল হইয়া কুমারের দিকে চাহিল। কুমার তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

কুমার আবার বলিলেন,—"নিপাননা, আমি যে এসেছি, নিপাননা,—কি বলিবে বল।" নিপাননা কি বলিবে,—তাহার যে বলিবার কিছুই নাই,—তবু বহুকষ্টে জড়িত স্বরে বলিল,—"হাঁা, এসেছ, তুমি, কুমার!"

কুমার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, নিপাননা তাহার পার্শ্বে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল,—সমস্ত বিশ্বসংসার স্তব্ধ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কুমার নিপাননার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন,—নিপাননার সমস্ত শরীরে, প্রতি অণুপরমাণুতে অবাধ আনন্দের লহরী খেলিতে লাগিল,—জগৎসংসার আনন্দময় হইয়া উঠিল।

সেই পরম আনন্দের সাগরের আলোয়—সেই আলোকময় জগতের আলোয়,সুন্দরী নিপানা যেন মিশিয়া গেল,—তাহার চৈতন্য যেন লোপ পাইতে লাগিল,—সে কুমারের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। কুমার সযত্নে তাহার মস্তক আপনার অংসোপরি ধারণ করিলেন।

বহুক্ষণ পরে কুমার বলিলেন,—"নিপাননা আমি যাই।" শুনিয়া নিপাননা চক্ষু উন্মিলিত করিয়া কহিল,—কোথা যাইবে তুমি কুমার।"

অভিজিৎ বলিলেন,—"আমার স্থানে আমি যাই,নিপাননা।"

নিপাননা কুমারের হাত চাপিয়া ধরিতে গেল, কিন্তু পারিল না, নিজের হাতই ধরিল।

কুমার বলিলেন,--"নিপাননা, আমাকে তুমি ধরিতে পারিবেনা, আমি যে অশরীরী।" নিপাননা হাত নামাইল।

কুমার নিপাননার সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন, তাহাতে একটি সপ্রেম চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"যাই আমি নিপাননা।"

নিপাননা সেই চুম্বনে অবশ হইয়া পড়িল,—তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ সমস্ত মৃতের ন্যায় অবশ হইয়া গেল। তাহার কথা বলিবার শক্তি রহিল না। কুমার ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। জগৎসংসার আবার ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। বহুদিন পরে নিপাননা আজ প্রথম ক্লান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

সূর্য্য উদিত হইলেন; জগতের অন্ধকাররাশি দূর হইয়া গেল শ্রীকৃষ্ণ নিপাননার চক্ষে প্রবেশ করিলেন। নিপাননা পরম কৃতজ্ঞা, উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিল। শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন। সমস্ত দিন নিপাননার হৃদয়ের মধ্যে সেই হাসির রেশ বাজিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে নিপাননা সুন্দর সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে রত্নময় সিংহাসনোপরি কিশোর কৃষ্ণ বসিয়া ছিলেন,—এবং সখীগণ মিলিয়া তাঁহাকে পুষ্পাভরণে সাজাইতেছিল। নিপাননা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদতলে পুষ্প নিয়া রাখিয়া দিল; শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসি হাসিয়া তাহার মস্তকে হাত দিলেন। নিপাননার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

পরদিন আবার সে পুষ্প চয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদবন্দনা করিল, এবং এইভাবে প্রত্যহই করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে আর দুঃখ নাই, শোক নাই, মলিনতা নাই, সে এখন হাস্যময়ী, আনন্দময়ী সুন্দরী।

তাঁহার মস্তকে চূড়া বাঁধিয়া দিয়া তাহার উপর ময়ূরপুচ্ছশোভিত রত্নময় মুকুট পরাইয়া দিত; কোন দিন বনফুলের মাল্য পরাইয়া দিত। তাহার কর্ণে বৈদূর্য্যমণিখচিত কুণ্ডল পরাইয়া দিত, আবার তাহার উপর ক্ষুদ্র বনফুলের লতা আঁটিয়া দিত। তাঁহার গলদেশে প্রত্যেক সখীই একগাছি করিয়া স্বহস্তরচিত মাল্য প্রদান করিত; কেহ প্রস্ফুটিত পদ্মের মাল্য; কেহ সুগন্ধি যূথিকার মাল্য, কেহ বা রক্তবর্ণ জবা পুষ্পের মাল্য, কেহ বা কোমল-গন্ধী সেফালির মাল্য দিত। এবং মাল্য গলদেশে পরাইয়া দিয়া তাঁহার সেই সুন্দর মুখে চুম্বন করিত; কেহ তাঁহার কোমল কপোলে, কেহ তাঁহার সুবিশাল নয়নে, আবার কেহ চিবুকে, কেহবা রক্তবর্ণ ওষ্ঠে চুম্বন করিত। নিপাননা কিন্তু শুধু পাদবন্দনা করিয়া চলিয়া আসিত!

একদিন নিপাননা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত মল্লিকার দ্বারা দুইটি সুদৃশ্য বাজু রচনা করিল; তারপর নিয়মিত সময়ের বহুক্ষণ পরে সেই দুইটি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে চলিল; গোপনে শ্রীকৃষ্ণকে পরাইয়া দিবে বলিয়া। নিপাননা আজ ভালবাসিয়াছে; জানে না কাহাকে এবং কেন।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া নিপাননা জানু পাতিয়া উপবেশন করিল,—তাঁহার হাতে আজ প্রথম উপহার তুলিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিতে তাঁহার সুন্দর মুখখানি ভরাইয়া নিপাননাকে বলিলেন, "পরাইয়া দিলে না কেন, নিপাননা?"

নিপাননা কোন উত্তর দিল না, দিতে পারিল না, লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পলাইয়া আসিল।

তাহার পর হইতে সে সুন্দর সুন্দর পুষ্প চয়ন করিয়া প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের নানা অঙ্গের অলঙ্কার প্রস্তুত করিত; কিন্তু পরাইত না, তাঁহার পদতলে রাখিয়া চলিয়া আসিত।

কিন্তু মনটা কেমন এক অস্থিরতায় ভরিয়া গিয়াছে, একটা অস্বস্তি' বক্ষের মাঝখানে নিয়ত বাঁধিয়া আছে,—আর তাহার আনন্দ নাই,—মধুর ভাব নাই; তন্ময়তা নাই; কেমন উন্মনা, সব ছাড়া ছাড়া ভাব। এইভাবে আরও কয়েক দিন অতিবাহিত করিল।

একদিন স্নান করিতে গিয়া নিপাননা দেখিল, নীল পুষ্করিণীতে লাল পদ্ম ফুটিয়া আছে, তাহার বড় সুন্দর লাগিল, মনে হইল সেই শ্যাম কলেবরে এই পদ্ম কেমন সুন্দর দেখায়; সে কতকগুলি পদ্ম সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিল।

তারপর ধীরে ধীরে অতি নিপুণভাবে সেই প্রস্ফুটিত পদ্মের সুন্দর মাল্য রচনা করিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল,—কুমার অভিজিতের সুন্দর মুখখানি। এমনি করিয়া সে মালা গাঁথিয়া কুমারকে পরাইত। কিন্তু পরাইবার পূর্ব্বে একবার সেই অভীষ্টদেবের বাঞ্ছিত মাল্য নিজে পরিত,—সেও যে অভীষ্টদেবের বাঞ্ছিত।

ভাবিতে ভাবিতে নিপাননা স্বীয় অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের জন্য উৎসর্গীকৃত সেই মাল্য নিজে পরিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বিবেক ফিরিয়া আসিল,—সে লজ্জিত হইল,—অনুতপ্ত হইল—। স্থির করিল,—এ উচ্ছিষ্ট মাল্য দেবতাকে অর্পন করিবে না। কিন্তু মাল্য

রচনা করিতে বহুকাল গিয়াছে,—আর সময় নাই,—শ্রীকৃষ্ণকে আজ কি দিয়া সে পূজা করিবে।

কৃষ্ণের কথা মনে হইতেই তাহার সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব চলিয়া গেল; সে উঠিল,—মাল্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে উপস্থিত হইল।

আজ মন্দিরে কেহ নাই, শ্রীকৃষ্ণ একাকী রত্নময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন,—নিপাননাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন,—কহিলেন,—"আজ যে এত বিলম্ব, নিপাননা?"

নিপাননা মস্তক অবনত করিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—"প্রভু, আমি পাপ করিয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"কি পাপ, নিপাননা?"

নিপাননা হস্তস্থিত মাল্য দেখাইয়া কহিল,—"পরিয়া ফেলিয়াছি। আজ আপনাকে পূজা করিবার যে কিছুই নাই।"

শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন,—নিপাননার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—"এতদিন যে শুধু পুণ্যের মালাই দিয়াছ, নিপাননা,—আজ তোমার পাপের মালাই বা কেন ব্যর্থ হইবে? দাও এ মালা আমি পরিব।"

নিপাননা কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল, তারপর শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মাল্য অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গ্রীবা নত করিলেন; নিপাননা কিছু চিন্তা না করিয়া তাঁহার গলদেশে সেই মাল্য পরাইয়া দিল। পরাইতে গিয়া নিপাননার মস্তক শ্রীকৃষ্ণের চূড়া স্পর্শ করিল।

সেই স্পর্শে নিপাননার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল,—হস্ত পদ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িল, শরীরের রক্ত অতি শীতল হইয়া নামিয়া গেল,—নিপাননা একপার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিলেন,—নিপাননার পতনোন্মুখ দেহলতাটিকে ধরিয়া নিজবক্ষে রক্ষা করিলেন। তারপর সুন্দরী কুমারীর নিপাননার রক্তওষ্ঠে—তাঁহার রক্তাধর স্পর্শ করিলেন।

সেই আলিঙ্গনে, সেই চুম্বনে—নিপাননার অবশভাব দূর হইয়া গেল,—সেই মধুর আলিঙ্গনে, সেই মধুর চুম্বনে তাহার প্রতি অণুপরমাণুতে আনন্দের ধারা বহিল। প্রতি অঙ্গে সেই আলিঙ্গন, সেই চুম্বন অনুভব করিতে লাগিল; সহসা উজ্জ্বল আলোকে কুমারী নিপাননার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সে জাগ্রত হইয়া দেখিল,—সে কুমারী নয়, সে বাগদত্তা নয়,—সে অভিজিতের রাণী।

আর অভিজিৎ কুমার নয়, কৌশাম্বীর যুবরাজ, সে ত্রিলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ। এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে প্রতিপলে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, অক্ষৌহিণী কুমার অভিজিৎ বাহির হইতেছেন, আবার মিশিয়া যাইতেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ অক্ষৌহিণী কুমারী নিপাননা বাহির হইতেছেন, কুমারের সহিত বারেকের তরে মিলিত হইতেছেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই শ্রীঅঙ্গে মিশিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কুমার অভিজিৎ,—নিপাননার সখা ও স্বামী। জগৎ সংসারের একমাত্র পতি।

শ্রীরতিকান্ত পালিত।

নমঃশূদ্র সমস্যা

সাধারণ লোকের বিশ্বাস "নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল এক নিদানজ।" এই বাল্য-কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এতাবৎ বঙ্গের একটী প্রধান কৃষিবল জাতির প্রতি নানান্ সামাজিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছি। এই অত্যাচারের ফলেই আজ বাঙ্গালার নমঃশূদ্রগণ খৃষ্ট বা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে সমুদ্যত। আমরা দেখাইব যে নমঃশূদ্রগণ জাতিতে চণ্ডাল নহেন এবং নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল এক নিদানজ নহে। ভগবান মনু বলিতেছেন :—

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ ১২-১০

শূদ্র পিতা হইতে বৈশ্য কন্যার গর্ভে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ের গর্ভে ক্ষত্তা ও ব্রাহ্মণী গর্ভে অধম চণ্ডাল জাতি সমুদ্ভূত। ইহারা প্রতিলোমজ বলিয়া বর্ণসঙ্কর। মহাত্মা মনুর এই বাক্য যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে বাংলার নমঃশূদ্রগণ ও চণ্ডালগণ এক নিদান সমুত্থ নহেন। কেন? এই উভয় জাতির শৌচাচার সম্পূর্ণ পৃথক। ভগবান মনুর—

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥"

এই বাক্যানুসারে বিলোমজগণ শূদ্রের ন্যায় সমান ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং ইহাদিগের শূদ্রের ন্যায় অশৌচাদি ধারণ করা বিধেয়। কারণ ভগবান মনুই বলিয়াছেন :—

শুধ্যেৎ বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি॥"

ব্রাহ্মণ দশ দিন, ক্ষত্রিয় বার দিন, বৈশ্য পনের দিন ও শূদ্রগণ একমাস অশৌচ ধারণ করিয়া শুচি হইবেন। কিন্তু বাংলার নমঃশূদ্রগণকে আমরা এক মাস অশৌচ ধারণ করিতে দেখি না বা কেহ শুনে নাই। জন্মান্তরে উহারা দশাশৌচ ধারণ করেন! এবং

"বামুন চাঁড়াল মুচি।
এগার দিনে শুচি॥"

এই প্রবাদ বাক্যেরই সত্যতা সপ্রমাণ করে। হাঁ বাংলায় এই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত রহিয়াছে বটে কিন্তু উহা অমূলক ভিন্ন সমূলক নহে। কেন? নমঃশূদ্রগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত "কুন্দর জাতি" তাই উহাদের অশৌচ ব্রাহ্মণের ন্যায়! তথাহি

"ব্রাহ্মণ্যা ঋষিবীর্য্যেন ঋতোঃ প্রথমবাসরে।
কুৎসিত চোদরে জাত কুন্দরস্তেন কীর্ত্তিতঃ।
তদশৌচং পিতৃতুল্যং পতিত ঋতু দোষতঃ॥"

১১৫।১১৬।১০ অ ব্রহ্ম খণ্ড।

কোন ঋষি আপনার ব্রাহ্মণী পত্নীতে ঋতুর প্রথম দিবসে উপগত হইলে, যে সন্তান হয় তাহার নাম "কুদর"। তাহার অশৌচ পিতৃতুল্য। ঋতুদোষ করায় তাহাদিগের পাতিত্য জন্মিয়াছে।

এখন চেতস্মান্ সামাজিকগণ দেখুন, যাঁহাদের অশৌচ পিতৃতুল্য, যাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁহারা কি শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল ও বর্ণসঙ্কর হইতে পারেন?

শাস্ত্রের বিধান অনুসারে চণ্ডালের ও বর্ণসঙ্করগণের এক মাস অশৌচ ধারণ বিধেয়। পক্ষান্তরে "নমঃশূদ্রগণ" "কুদরগণ" দশাশৌচভাগী। সুতরাং এই দুই জাতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিদানজ তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবেন?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারও বর্ণসঙ্করগণকে "মাতৃধর্ম্মা" বলিয়াছেন (মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ) চণ্ডালের মাতা ব্রাহ্মণী, অতএব উহাদের অশৌচ দশদিন এবং নমঃশূদ্রগণেরও অশৌচ দশ দিন, সুতরাং এই হিসাবেও এই উভয় জাতি এক হইতে পারে, না। তাহা হইতে পারে না, কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" এই উক্তি মন্বাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও অগরীয়সী। কারণ—

"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন, শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করাঃ॥"

শুদ্ধিতত্ত্ব।

বর্ণসঙ্করগণের শৌচ ও অশৌচ ধারণ শূদ্রবৎ হইবে, পরন্তু মাতৃবৎ নহে * আর যদি বর্ণসঙ্করগণ ও বিলোমজগণ মাতৃধর্ম্মী হইতেন তাহা হইলে সূত, মাগধ, বৈদেহ, আয়োগব মাতাকে যথাক্রমে আমরা দশ বার দিন অশৌচ ধারণ করিতে দেখিতাম কিন্তু উহারা কি সকলেই মাসাশৌচি নহেন? যাঁহারা কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দেন, যুক্তি ও বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করেন, তাঁহারা পারিবেন কোন শাস্ত্র বচন দেখাইয়া দিতে যে নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল এক পদার্থ? যাহা হোক, এতাবৎ সপ্রমাণ হইল যে নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল এক নহে। এখানে আমরা নমঃশূদ্রগণের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়াও আমাদের এই উক্তির সারবত্তা সপ্রমাণ করিব।

মনু বলিয়াছেন—

"চণ্ডাল শ্বপচানান্ত বহি গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ"
আপাপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যাধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কার চ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥"

চণ্ডাল ও স্বপাকেরা গ্রামের বাহিরে বাস করিবে ইহারা কোন পাত্র ব্যবহার করিতে

প্রকৃত বর্ণসঙ্কর কে? ইহা আমরা প্রতিলোম বিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছি। "আলোচনা"—১৩২৯ ফাল্গুন দ্রষ্টব্য।

* এতদ্‌ বিষয় আমরা অশৌচ ধারণ প্রথা" প্রকরণে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

পারিবে না, কুকুর ও গর্দ্দভ ইহাদিগের ধন। ইহারা মড়ার কাপড় পরিবে, ভাঙ্গা পাত্রে খাইবে ও লোহার অলঙ্কার ধারণ করিবে, ইহারা একস্থানবাসী নহে। বর্ণনা দৃষ্টে মনে হয় যে ডোম ও মুর্দ্দফরাসগণই শাস্ত্রোক্ত চণ্ডাল জাতি। পক্ষান্তরে বাংলার নমঃশূদ্রগণ আমাদের দশজনের ন্যায় নিয়ত গৃহবাসী ও গ্রামের অভ্যন্তরে বাস করেন এবং তাঁহারা কৃষি ও সূত্রধরের কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন ও কেহ কেহ বা আমাদের ন্যায় শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত হইয়া অন্য রকমে দিনপাত করেন ও করিতেছেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় কাংসপাত্রে ভোজন করেন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করেন। এতদ্ব্যতীত যদি আমরা তাঁহাদিগের বংশগত উপাধিগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহা হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে উহারাও আমাদের ন্যায় তথা কথিত উচ্চজাতির মধ্যে একজন। * যাহা হোক এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা নমঃশূদ্রগণকে চণ্ডাল জাতি বলিয়া মনে করেন তাঁহারা কতদূর ন্যায়পথভ্রষ্ট ও জাতিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ তাহা বিবেকবান ও শাস্ত্র কৃতশ্রম সামাজিকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। অবশ্য মন্বাদিশাস্ত্রে নমঃশূদ্র নামের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতে শাস্ত্রোক্ত নাম কয়টা জাতির আছে? ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান দেবল অর্থাৎ লগ্নাচার্য্যগণ, বা পারশবগণ কি বাংলায় "আচার্য্যি-বামুনে" পরিণত হন নাই? ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান "অম্বষ্ঠগণ" কি বাংলার "বৈদ্যজাতি" বলিয়া পরিচিত নহেন? আবার সেই বৈদ্যগণই কি ভারতের নানাস্থানে মূল ব্রাহ্মণ এবং "অম্বষ্ঠ-কায়স্থ" বা "বৈদ্য" উপাধিক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত নহেন? বৈশ্য হইতে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তান "করণগণই" কি ভারতের বিভিন্নস্থনে "কায়স্থ" বলিয়া পরিচয় দেন না? ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠকন্যার গর্ভজাত সন্তান "আভীরগণই" কি বাংলার সদ্গোপ বা "জাতি গোয়ালা" বলিয়া সুপরিচিত নহেন? উপনাম গ্রহণ ও আসল নাম ত্যাগের আর কত দৃষ্টান্ত দিব। অন্যান্য শাস্ত্রে কুদরজাতির নাম নাই বলিয়া যাঁহারা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উক্তি অবিতথ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে নারাজ তাঁহারা যদি নমঃশূদ্রগণের আচার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাঁহাদিগকেও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে উহারা নীচবংশ প্রভব নহেন। আর এক কথা, সাঙ্কর্য্য দোষে দূষিত বলিয়া যাঁহারা অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন তাঁহারা একবার স্থির মনে তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ—ব্যাস, বশিষ্ট, সত্যকাম, জাবাল, পরশুরাম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু প্রভৃতির জন্মের কথা ভাবিয়া দেখুন। পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার মুসলমান যুগের শেষ সময়ের কথা ভাবিয়া দেখুন—দেখিতে পাইবেন ভারতের পনের আনা হিন্দু যবন ও অন্যান্য সংমিশ্রণে দূষিত। আমাদের মনে রাখা উচিত

---

* এতদ্ বিষয় মদ বিরচিত "উপাধি রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ "নব্যভারত" ভাদ্র, ১৩২৮ ও "কৌলিক উপাধি" [illegible]

"আকৃতি গ্রহণাজাতি" মানব মাত্রেই সেই অমৃতের সন্তান ও এক নিদান সমুথ! জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারাই আজ আমরা উচ্চবর্ণ বলিয়া স্ফীত বক্ষ। মর্য্যাদা ও উন্নতির পথ কাহারও নিজস্ব সম্পদ নহে—উহা ভূমা ন্যায়বান ভগবানের সাধারণ দান। প্রতিভাও উন্নতির পথ কাহারও কুলক্রমাগত হইতে পারে না। জ্ঞান কর্ম্মের সেবা করিয়া যদি কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তাহা অর্গলিত করিলে বিষময় ফল ফলিবে। একজন অন্যের প্রতি অযথা অত্যাচার করিবে ইহাও মহান্ ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে। একজন স্পৃশ্য ও অন্যজন অস্পৃশ্য ইহাও ভগবৎ উদ্দেশ্য নহে।

এই বিংশশতাব্দীর মহাপরিবর্ত্তন ও সত্যের যুগে সঙ্কীর্ণতামূলক "ছুঁৎ মার্গের" স্থান নাই। বৃথা আভিজাত্যগৌরবে মত্ত হইয়া ভারতবাসী আমরা কিরূপ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ও হইতেছি তাহা অধীয়ানবৃন্দের অবিদিত নাই। উচ্চজাতির দেহ যে উপাদানে গঠিত নীচ জাতিগুলির দেহও সেই উপাদানে বিরচিত। ভগবানের রাজ্যে জন্মগত উচ্চ ও নীচ বলিয়া কোন ভেদাভেদ নাই। উহা আছে কেবল আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের মধ্যে। এই বর্ব্বরতামূলক সঙ্কীর্ণতাকে যতদিন আমরা পদ দলিত করিয়া উন্নতমনা না হইতে পারিব ততদিন আমাদের নিস্তার নাই—ভারত "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে। হে ভারতের ভবিষ্যৎ ও আশার স্থল বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ তোমরা এই সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিও না—বৃথা আভিজাত্য গৌরবে মত্ত হইয়া ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। কেবল নমঃশূদ্র নহে ভারতের তথাকথিত নীচ জাতিগুলিকে প্রেমভরে মমতাজ্ঞানে আলিঙ্গন কর—"ছুঁৎ মার্গকে" দূরে পরিহার কর—ভারতের মঙ্গল হইবে—জগৎ সমক্ষে তুমি মানব বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইবে—জগৎপিতার করুণনেত্র তোমার উপর পড়িবে।

শ্রীললিতমোহন রায়।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

সম্প্রতি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে লইয়া একটী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে; একদল বলিতেছেন—গিরিশচন্দ্র বড়,—অন্যদল বলিতেছেন,—প্রতিভার বর পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু কি কারণে একজন বড়, আর একজন ছোট, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা কেহই করিতেছেন না। Calcutta Review পত্রে Modern Bengali Literature প্রবন্ধে অধ্যাপক সেন মহাশয় এমন সব হাল্কা মতামত জাহির করিয়াছেন যাহা পড়িলে হাসি পায়। তাঁহার বিভিন্ন মতামত এ আলোচনার অঙ্গীভূত নহে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তিনি যে সব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা
[illegible] দ্বিজেন্দ্রলাল বড় ছিলেন,—কারণ তিনি কিছুদিন ইউরোপে ছিলেন—

and he was a brilliant graduate." দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার চমৎকার ব্যাখ্যা। একদল আবার এই প্রবন্ধের আলোচনায় বলিয়াছেন,—"সাগরের সহিত যদি গোষ্পদের তুলনা শোভন হয়, তবেই গিরিশচন্দ্রের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনা শোভন হইবে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনি সাহানসাহ বাদসাহ, দ্বিজেন্দ্রলাল উজীর মাত্র"—ইহা যুক্তিহীন পক্ষপাতী মতের একটা নমুনা। অন্যদল ইহাদের "মূর্খ" প্রভৃতি বলিয়া গোলে হরিবোল দিয়াছে আর এমন সব কথা বলিয়াছে,—যাহা বালকের মুখেই মানায়।

বাংলা সাহিত্যে জনকয়েক উপন্যাস-সম্রাটের আবির্ভাব হইয়াছে, গল্পের রাজা বাদসারও অভাব নাই; কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের মণিময় সিংহাসনে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের অভিষেকের পর, কোন নাট্যকার তাঁহাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইবার মত প্রতিভা লইয়া দেখা দিলেন না। গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয়ের পর হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু পর্য্যন্ত বাংলা নাট্য-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ; এমন মহেন্দ্র-যোগ ভারতে নাট্যসাহিত্যে আবার হইবে কিনা,—কে জানে!

১৮৯৭ সনে দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন, তাঁহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র নট ও নাট্যকাররূপে সাহিত্যাকাশে উদিত হন। প্রথমে সধবার একাদশী ও মাইকেলের কয়েকখানি নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁহাকে আমরা অভিনেতারূপে দেখিতে পাই। তখন বাংলায় স্থায়ী রঙ্গালয় ছিল না, তিনিই সর্ব্বপ্রথম ১৮৭০ সনে ন্যাসন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বঙ্কিমের কয়েকখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তন ও নিজে দোললীলা, রাবণ বধ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। অতঃপর তিনি নির্দ্দিষ্ট বেতনে থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং দশ বৎসরের মধ্যে সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জ্জন প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক রচনা করেন। ইহার পর গিরিশচন্দ্র ষ্টার, এমারেল্ড ও মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ও এই রঙ্গালয়গুলির জন্য প্রফুল্ল, বিল্বমঙ্গল, নল দময়ন্তি প্রভৃতি অসংখ্য নাটক রচনা করেন। এইখানে নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্রের মনীষা, প্রতিভা ও কার্য্য কুশলতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, এই অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি রঙ্গালয় স্থাপন দৃশ্য-পটাদির বৈজ্ঞানিক উন্নতি, অভিনেতা অভিনেতৃগণকে শিক্ষা দেওয়া, তাহার উপর রঙ্গালয়ের জন্য অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করা, একা গিরিশচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। ১৮৯২ সন হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি পাণ্ডব গৌরব, জনা, বলিদান প্রভৃতি অসংখ্য নাটক রচনা করেন; তাঁহার মীরকাশিম ও সিরাজদ্দৌলা দ্বিজেন্দ্র-লালের সমসাময়িক রচনা। অর্থাৎ—বাঙালী গিরিশচন্দ্রকে যখন নাট্যসম্রাট ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহার নাটক রচনা যখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে,—তখন দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৫ সনে দ্বিজেন্দ্রলাল অভিনয়ের জন্য প্রথম নাটক লেখেন, তখন তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, ইহার পূর্ব্বে তিনি

সীতা, পাষাণী ও তারাবাই লিখিলেও নাট্যকার নামে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। বিভিন্ন কবিতা, গান ও হাসির গানের ভিতর দিয়া সাহিত্যে যে মৌলিকতার ধারা তিনি আনিয়াছিলেন, তাহাতেই বাঙালী তাঁহাকে সাহিত্যরথী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল এবং ১৯০৫ সনে রাণা প্রতাপ লইয়া যখন তিনি নাট্যামোদীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন এই সাহিত্যরথীকে দর্শকের দল সসম্ভ্রমে বরণ করিয়া লইয়াছিল। রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারীগণ দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য প্রতিভার সন্ধান খুব শীঘ্র পাইয়াছিলেন, কারণ, মিনার্ভা থিয়েটার তাঁহার "দুর্গাদাস", অভিনয়ের জন্য লইয়া, রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্রকে হারাইয়াছিল। যেহেতু তিনি অপরের রচিত নাটক অভিনয় করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না।

নাট্যকার হইবার আগেই গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ নট বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও আপন অভিনয় কৌশল এবং অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া নাট্যকাররূপে পরিণত হইয়াছিলেন, আর দ্বিজেন্দ্রলাল মার্জ্জিত রুচি ও মৌলিকতার মিশ্রনে এক অভিনব চিত্র অঙ্কিত করিয়া নাট্যকারের গৌরবময় আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র একাধারে নট ও নাট্যকার, থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের তাড়ায় তিনি নাটক লিখিতেন, দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার কাব্য-সৌন্দর্য্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ নাটক লিখিয়া নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির দিকেই তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল,— এই দুই ভিন্ন কারণে উভয়ের নাট্য-সাহিত্য স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হইয়াছে।

অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্য্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি উজ্জ্বল। গিরিশচন্দ্র গতানুগতিকের শৃঙ্খল ভাঙিতে পারেন নাই; মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি রথীগণের প্রচলিত প্রথায় তিনি নাটক লিখিতেছিলেন, নবীন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এমন একটা সুশ্রী ভাব, ভাষা, নূতনত্ব ও মৌলিকতার ছাপ দিয়া তাঁহার নাটকগুলিকে দর্শকের সামনে তুলিয়া ধরিলেন, যাহাতে এই বিশেষত্বই সর্ব্বপ্রথম জনগণের চোখে পড়িল। দর্শকবৃন্দও তখন একটা নূতন কিছু দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষগণ দৃশ্যপটের চাকচিক্যে, সাজ-পোষাকের জাঁক-জমকে, তাহাদের অন্তরের তৃষ্ণা নিবারণে ব্যস্ত; ঠিক এমনি সময়ে— পরিবর্ত্তনের এই মহেন্দ্র লগ্নে নূতনত্বের পসরা লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যখন প্রচলিত প্রথার অনুসরণে নাট্য-সাহিত্যশিখরে সমারূঢ়,—দ্বিজেন্দ্রলাল ভগীরথের মত নূতন পথে মৌলিকতার যে অলকানন্দা স্বর্গ হইতে মর্ত্তে আনিয়া ফেলিলেন, বাংলা নাট্য-জগতে তাহা নবযুগের জয় ঘোষণা করিল। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্যে সৌধের যে মণিকোঠা বন্ধ হইয়াছিল,—দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাহার আর এক রত্নমণ্ডিত সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়াছিল। গিরিশ-প্রতিভা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের নিকট ঋণী, দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা পাশ্চাত্য কবি ও নাট্যকারগণের,—বিশেষ সেক্সপীয়রের নিকট ঋণী।

গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক পৌরাণিক ও সমাজ-সমস্যামূলক, তাহার কারণ, ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের ভিতর দিয়া তাঁহার নাটকগুলি রচিত; দ্বিজেন্দ্রলাল যখন নাটক রচনা

আরম্ভ করেন, বাংলায় তখন যুগ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, স্বদেশী বিপ্লবে বাংলা তখন প্লাবিত,—তাই তাঁহার সমস্ত নাটকই প্রায় ঐতিহাসিক ও স্বদেশ-হিতৈষণাপূর্ণ। নাটক সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক,—গীতিনাট্য বা ফার্সমূল অভিনয় শেষে মধুরেন সমাপয়েৎ গোছের চাটনি। সামাজিক নাটক—আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখেরই একটা ছবি আর সেইজন্য ঐ শ্রেণীর নাটকের ঘটনার সহিত আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাই সামাজিক নাটক আমাদের কাছে শীঘ্রই নীরস হইয়া পড়ে। পৌরাণিক নাটকের ঘটনা কতকটা আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, তবুও রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনা যখন মূর্ত্ত হইয়া আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। সামাজিক বা পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও মনোরম—ঐতিহাসিক নাটক। কারণ, তাহাতে একদিকে রাষ্ট্রবিপ্লব হইতেছে,—অন্যদিকে হৃদয় বিপ্লব চলিতেছে রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে নাটক উজ্জ্বল। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার সহিত প্রেমিক প্রেমিকার মান-অভিমানের ছবি প্রাণকে এক অজানা আবেশে মাতাল করিয়া তোলে, তাই চরিত্রের জটিল ঘাত-প্রতিঘাতময় ঐতিহাসিক নাটক সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক।

গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক ও সামাজিক;—অশোক, কালাপাহাড়, সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম এই চারখানি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক; শেষের দুইখানি দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক রচনা। দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ নাটক ঐতিহাসিক,—বস্তুতঃ ঐতিহাসিক নাটকেই তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে; ভীষ্ম, সীতা ও পাষাণী তাঁহার পৌরাণিক এবং পরপারে ও বঙ্গনারী তাঁহার সামাজিক নাটক। নাটকীয় সৌন্দর্য্য হিসাবে তাঁহার পৌরাণিক নাটকত্রয় তেমন উৎকৃষ্ট হয় নাই, তবে কাব্য সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া নাটক তিনখানি অতুলনীয়। তাঁহার সামাজিক নাটক দুইখানি বঙ্গ-নাট্য-সাহিত্যে ঐ শ্রেণীর নাটকের মুকুটমণি। পরপারের ত কথাই নাই,—কোন নাটকই—এমন কি গিরিশচন্দ্রেরও কোন সামাজিক নাটকই এই নাটকখানির পাশে দাঁড়াইতে পারে না, বঙ্গনারী সংশোধন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারণের হাতে দিয়া যাইতে পারেন নাই,—তবুও ইহা শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটকের সহিত একাসনে বসিবার দাবি রাখে।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকে সর্ব্বত্র ইতিহাস বা পুরাণ বর্ণিত ঘটনার আখ্যান ভাগ যথাযথ বজায় রাখিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, তাই তাঁহার নাটকে অসামঞ্জস্য প্রায় নাই, তাঁহার শেষ বয়সের নাটক সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমে বিবৃত আখ্যান ভাগে কোথাও তিনি ইতিহাসের অমর্য্যাদা করেন নাই,—অথচ ইতিহাসের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া নাটক দুইখানি নীরস বা বেখাপ্পা হয় নাই,—ইহা গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন। মাঝে মাঝে গিরিশচন্দ্রও পুরাণ ও ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছেন, তবে দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বত্রই ইতিহাসকে অমান্য করিয়া কল্পনাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন।

এই ইতিহাস অমান্য করার কৈফিয়ৎ তিনি রাণা প্রতাপের ভূমিকায় এইরূপ দিয়াছেন,—"নাটক কাব্য—নাটক ইতিহাস নহে।" নাটক ইতিহাস নহে সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া নাটকে ইতিহাসকে একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলাও উচিত নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সমস্ত নাটকে ইতিহাসকে জবাই করিয়াছেন। সাজাহান নাটকে সাজাহান তাহার নিজের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া একটা মস্ত অনৈতিহাসিক ও অস্বাভাবিক চরিত্র হইয়াছে। ইতিহাসে দেখি সাজাহান নিজে পিতার বিরুদ্ধে বার বার অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, ভ্রাতা ও আত্মীয়দের হত্যা করিয়াছিলেন। যখন সেই ভূতপূর্ব্ব পিতৃদ্রোহী সাহাজান বলেন,—"এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা, যে আমার পুত্রের হাতে আজ বন্দী!" মর্ম্মান্তিক বিতৃষ্ণায় তিনি বলেন,—"তাদের হাসিটি দেখবার জন্য আর স্নেহের হাসি হেস না।" তাঁহার এই সব উক্তি আমাদের কাছে হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। প্রথম দৃশ্যে ভ্রাতৃ হত্যাকারী সাজাহান যখন বলেন,—"এই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ!—দেখি ভেবে দেখি!" তখন আমরা বিস্মিত হই, সাজাহানের সর্ব্বত্রই এইরূপ ঐতিহাসিক অনৈক্য দৃষ্ট হয়। দুর্গাদাস দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হইলেও নাটকান্তর্গত কতক গুলি ঘটনা অস্বাভাবিক, ঘটনার অসামঞ্জস্য ছাড়া কালের অনৈক্য নাটকখানিতে বেখাপ্পা হইয়াছে। যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর নাটক আরম্ভ হইয়া ঔরংজীবের মৃত্যুতে তাহার যবনিকা পতন হইয়াছে, এই সময়টুকু অন্তত ত্রিশ বৎসর হইবে। ঐতিহাসিক নাটকগুলি নিজ কল্পনালোকে উজ্জ্বল করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল এত ব্যস্ত ছিলেন যে, সময়ের তারতম্য তাঁহার মনে পড়ে নাই,—কাজেই জায়গায়-জায়গায় নাটকখানি অস্বাভাবিক হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে আমরা চুপড়ীর মধ্যে সদ্যোজাত অজিতসিংহকে রাজসিংহের আলয়ে দেখি, শিশুকে লক্ষ্য করিয়া কাসিম বলিতেছে—"আবার পুটপুট করে তাকানো হচ্ছে।" আবার চতুর্থ অঙ্কে অজিতকে রাজিয়ার সহিত প্রেমালাপ করিতে দেখি। কিন্তু অজিত যখন চুপড়ীর ভিতর হইতে পুটপুট করিয়া তাকাইতেছিল, রাজিয়া তখন ওস্তাদিগানে গুলনেয়ারকে বিস্মিত করিতেছিল। রাজিয়া নাট্যকারের কল্পনা, কাযেই নাটক ছাড়া তাহার বয়স প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। উভয়ের বয়সের পার্থক্য কাসিম আমাদের বলিয়া দেয়; দুর্গাদাস যখন রাজিয়াকে অজিতের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইল, তখন কাসিম বলে—অজিতের বয়স ২৫ বৎসর তবেই প্রেম করিবার সময় রাজিয়ার বয়স অন্তত ৩৫।৩৬ বৎসর, এই বয়সের তারতম্য নিতান্ত বিসদৃশ নয় কি? নাট্যকারের এক কৈফিয়ৎ আছে,—নাটকোক্ত সমস্ত চরিত্রের যৌবন স্থির, কারণ স্থির-যৌবন না হইলে নাটক জমে না। বোধ হয় এই যুক্তির বলেই কমলা ও জয়সিংহের প্রেমালাপ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একই রকম চলিয়াছে, আবার ঐ যুক্তির বলেই বৃদ্ধ দুর্গাদাসের প্রতি গুলনেয়ার আসক্ত!

বর্ণিত ঘটনা, স্থান ও কালের (unity of plot, place and time) অল্প বিস্তর অনৈক্য প্রায় সব নাট্যকারের রচনায় পাওয়া যায়, সব সময়ে সকলে এই ঐক্য বজায়

রাখিয়া নাটক লিখিতে পারেন না, কিন্তু নাট্যকারের যদি নট হইবার সৌভাগ্য হয়, তবে তাঁহার রচিত নাটকে এই অনৈক্য প্রায় থাকে না। গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও রঙ্গমঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাই তাঁহার রচনায় নাটকীয় ঘটনা, স্থান বা কালের অনৈক্য খুব কম। তবুও রঙ্গমঞ্চের সুবিধা অসুবিধা, ব্যবসার দায় ও দর্শকের রুচি অনুযায়ী তিনি এত দ্রুত আর বেশী লিখিয়াছেন যে কোন কোন নাটকে নাটকীয় ঘটনার ঐক্যানৈক্যের দিকে মোটেই লক্ষ্য রাখেন নাই। তাছাড়া তাঁহার অধিকাংশ নাটক পৌরাণিক ও সামাজিক, তাই ঐ শ্রেণীর নাটকীয় ঘটনার অনৈক্য পাঠক বা দর্শককে বিশেষ ব্যস্ত করে না।

নাট্যকারের প্রতিভার পরিচয় তাঁহার চরিত্রচিত্রনে পাওয়া যায়। রহস্যময় মানব-চরিত্রসৌধের বিভিন্ন মহলে ছোট বড় অলি গলির মধ্যে যে প্রতিভাশালী লেখক সন্তর্পণ-সন্তর্পণে আসা যাওয়া করিয়াছেন ও করেন, তিনি বিভিন্ন মানব-মনোবৃত্তির সমন্বয়ে অপূর্ব্ব ও বৈচিত্র্যময় স্বাভাবিক চরিত্র অঙ্কনে সমর্থ। সংসারের স্থূল অভিজ্ঞতা ও দর্শনের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কৌশলের সহিত কবি-সাহিত্যিকের সাধনার অনুভূতিময় নিপুণ তুলিকায় যে ছবি অঙ্কিত হয়,—তাহা আদর্শ—অতুলনীয়—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ঐ গুণগুলিতে যিনি যত অভিজ্ঞ, তাহার অঙ্কিত চরিত্র তত বৈচিত্র্যময় ও মনোরম। এই অভিজ্ঞতার বিশেষত্বও কম বেশীর হিসাবেই গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের মানস সন্তান সন্ততিগণের বিশেষত্ব ও মৌলিকতা আমাদের চোখে পড়ে।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার নট ও নাট্যকার জীবনে নানা শ্রেণীর লোকের সংসর্গে আসিয়াছিলেন। বিশ্ব-বন্দিত নরদেবতা রামকৃষ্ণ দেব হইতে আরম্ভ করিয়া ভদ্রাভদ্র, জুয়াচোর, চরিত্রহীন, মাতাল, বেশ্যা প্রভৃতির সহিত তিনি মিশিয়াছিলেন, সাংসারিক সুখ-দুঃখের ধারা প্রবাহের ভিতর দিয়া তাঁহার দিন কাটিয়াছে,—অন্যদিকে তাঁহার অদ্বিতীয় সাহিত্য প্রতিভা সংসারের এই বাস্তব ছবিগুলি আঁকিতে তাঁহাকে খুবই সাহায্য করিয়াছে, কাযেই অন্তর ও বহির্জগৎ হইতে গৃহীত অভিজ্ঞতাকে যখন তাঁহার অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভা দীপ্ত করিয়া তুলিল, তখন তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি এক একটি মণি মাণিক্যের মত জ্বলিয়া দিক আলো করিয়া দিল। এই বিপুল অভিজ্ঞতার ফলেই তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও নিতান্ত স্বাভাবিক। গিরিশচন্দ্রের রাজা-জমীদার হইতে চোর, মাতাল, বেহারা সকলে এতই স্বাভাবিক যে রঙ্গমঞ্চে তাহাদের দেখিয়া মনে হয়, যেন ইহাদের কোথাও দেখিয়াছি, তাহাদের কার্য্য ও কথাবার্ত্তার মধ্যে এমনি একটা সামঞ্জস্য আছে যাহাতে মনে হয় এই প্রকৃতির মানুষ এ অবস্থায় এইরকম কাজই করিয়া থাকে এবং এইরকম কথাই বলে তাঁহার প্রফুল্লের যোগেশ, বিল্বমঙ্গল, মীরকাসিম, সিরাজ প্রভৃতি চরিত্রগুলি নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতে ও চরিত্রগতবিশিষ্টতায় এত স্বাভাবিক ও সুন্দর, যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গিরিশচন্দ্রের ছোট বড় সব চরিত্রই এমন কথা কয়, যা একেবারে প্রাণের দরজায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। হলওয়েলের উক্তি "তবে কি কর্ণ্যপণটি খাইটে খাইটে ডেশে

যাইল।" প্রফুল্লের নিকট মাদুলীর নামে সুরেশের মাকড়ি গ্রহণ, বিল্বমঙ্গলের যাওয়া আসার মধ্যে পাখিটাকে জল ছোলা দিতে বলা ও মেড়াটা যদি সিং ঘসে, যেন বারণ না করা হয়, ইত্যাদি বাজে অছিলায় চিন্তামনির সহিত কথা কওয়ার অদম্য তৃষ্ণা, সাধকের সহিত থাকোর কৃষ্ণপ্রেম আলোচনা, সাপ ধরিয়া বিল্বমঙ্গলকে পাঁচিল ডিঙাইতে দেখিয়া ভিক্ষুকের "লোকটা যদি চোর হত" ইত্যাদি স্বাভাবিক উক্তি ও ঘটনা গিরিশচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার পরিচয়। মাঝে মাঝে গিরিশচন্দ্রও স্বভাবের গণ্ডির বাহিরে আসিয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছেন। বলিদানে দুলাল চাঁদ পাগলির কথায় নিজেকে সংশোধন না করিয়া ফেলিলেও, নাটকে দুলাল চাঁদও ছিল আবার কিশোরীও ছিল, কাযেই করুণাময়ের গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করা খুবই অস্বাভাবিক আর সে জন্য সমাজকে দায়ী করা নাট্যকারের একটা বড় রকমের ত্রুটী। প্রফুল্লের ভজনলাল, বলিদানের দুলাল চাঁদ প্রভৃতি চরিত্র একান্ত অস্বাভাবিক ও গিরিশ প্রতিভার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নাটকের ঘটনা হিসাবে যোগেশ আদর্শ ও মহৎচরিত্র, তবুও আমাদের মনে হয় চরিত্রটি অস্বাভাবিক হইয়াছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যকার জানাইয়া দিয়াছেন, কপর্দ্দকহীন যোগেশ মা ও ভাই দুটিকে লইয়া সংসার পথে যাত্রা সুরু করিয়া ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। যোগেশ বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ও কার্য্যকুশল, কিন্তু তাহার মধ্যেও একটু দোষ ছিল, সে পানদোষ। নাটকের প্রথম দৃশ্যে যোগেশকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী দেখি, তারপর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মন্তুদ ট্রেজেডিতে নাটকের অবসান। এই ট্রেজেডির নায়ক যোগেশ, জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল মরিল, উমা পাগল হইয়া শেষ দৃশ্যে মূর্চ্ছায় মরণের কোলে শান্তি পাইল, যাদব ও সুরেশ সুখেই সংসার করিতে লাগিল, রমেশ ও আর সকলে শাস্তি পাইল বাঁচিয়া রহিল কেবল যোগেশ। তাও পাগল হইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিত এবং যাহা পাইত মদ খাইত, গত দিনের স্মৃতিটুকু নেশার ঘোরে ঢাকা দিবার চেষ্টায়, সে স্মৃতি কিন্তু মাঝে মাঝে বাহির হইয়া পড়িত—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।" নাটকের শেষ পরিণাম বড়ই মর্ম্মদাহী, জ্বালাময় ও শোচনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বুদ্ধিমান, চতুর ও কর্ম্মকুশল যোগেশের এই পরিণতি, তাহার চরিত্রগত বিশিষ্টতার হিসাবে অস্বাভাবিক হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই, যখনই তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বিফল হইয়াছেন, প্রফুল্ল তাঁহার কল্পিত আদর্শ হইতে অনেক নীচে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখনই রক্ত মাংসে গড়া দোষগুণযুক্ত মানবকে তিনি রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাইয়াছেন, তখনই সে চরিত্র স্বভাবের পূর্ণতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিল্বমঙ্গল, কালাপাহাড়, থাকো, সাধক প্রভৃতি চরিত্র স্বাভাবিক। বিল্বমঙ্গলে তিনি দর্শক ও পাঠককে এমন একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলিয়াছেন, যে অনেক ভাবিয়া সমঝদার দর্শককে তাহার উত্তর দিতে হয়। প্রকৃত জগতে এক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীন যুবক একদিনেই ভক্তসাধকে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, বিল্বমঙ্গল যখন সংসার ত্যাগ করিয়া গেল, থাকো চিন্তামণিকে তখন এই কথা বলিয়াই সান্ত্বনা

দিতেছে। কিন্তু যাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয়, এই অঘটন যখন ঘটে তখন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, ধারাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের অগোচরে এমন একটা বিশেষত্ব, এমন একটা শক্তি তাহার মধ্যে লুকান ছিল, যাহাতে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়াছে, চরিত্রগত এই বিশিষ্টতাই ঘটনা বিকাশের প্রধান সহায়। বিল্বমঙ্গলের মধ্যে যে শক্তি যে বিশেষত্ব ছিল, তাহা—যে জিনিষকে সে একবার প্রয়োজনীয় মনে করিত, তাহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষায় বিল্বমঙ্গলের সাধনা সার্থক হইয়াছে, তাই বিল্বমঙ্গল নাটক সুন্দর, স্বাভাবিক ও সৌন্দর্য্যময়। বিল্বমঙ্গল চরিত্রের এই বিশিষ্টতা গোড়াতেই ফুটিয়াছে, ঘোর দুর্যোগে চিন্তামণির জন্য নদী পার হইবার দুঃসাহস এবং শব দেহে ভেলা ভ্রম, সর্পে রজ্জু ভ্রম তাহার চরিত্রগত বিশিষ্টতারই একটা দিক, এই বিশিষ্টতা একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া পরিণতিতে অগ্রসর হইয়াছে। সে যখন বুঝিতে পারিল কত বড় মিথ্যাকে হৃদয়রক্তে পালন করিয়াছে, তখন হৃদয়ে তাহার বিপুল দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল, আত্মগ্লানিতে অন্তর তাহার ভরিয়া উঠিল, তাই সে চিন্তামণিকে বার বার বলিল,—"তবু কি বুঝতে বাকি আছে চিন্তামণি, যে আমি উন্মাদ কিনা?" তত্ত্বদর্শী হ্যামলেটের মত বিল্বমঙ্গল প্রশ্ন করে না To be or not to be that is the question. সে যাহা চায় প্রাণ দিয়াই চায়, ইহাই বিল্বমঙ্গল চরিত্রের বিশিষ্টতা আর এই বিশেষত্বেই নাটকখানি স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল।

গিরিশচন্দ্রের মত দ্বিজেন্দ্রলাল সংসারে ছোট বড় সকলের সহিত মিশিবার বা পরিচিত হইবার অবসর পান নাই, স্বীয় অসামান্য প্রতিভার প্রেরণায় তিনি বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র নিম্ন ও সাধারণ শ্রেণীর চরিত্রগুলি যেমন নিখুঁত ভাবে আঁকিয়াছেন, ঐ শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কনে দ্বিজেন্দ্রলাল তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রতিভাজাত অভিজ্ঞতার দ্বারাই ঐ সকল চরিত্র আঁকিয়াছেন আর গিরিশচন্দ্র ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া নিপুণ শিল্পীর মত নিখুঁতভাবে তাহাদের ছবি তুলিয়াছেন, এই ভিন্ন কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কনে স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা ফুটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ছোট বড় বাদসা ভিখারী সকলেই যেন কল্পলোকে বাস করে, কথা কয় তাহারা কবিতার ভাষায়, দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলি তাঁহার কবিকল্পনা প্রসূত, সাংসারিক অভিজ্ঞতার ছাপ তাহাতে খুব কম। সংসার অভিজ্ঞ না হইয়াও দার্শনিক কবি অভিজ্ঞ নাট্যকারের মতই নিখুঁত ছবি আঁকিয়া থাকেন তাঁহারা সাধারণ এবং অসাধারণ উভয় চরিত্র চিত্রণেই সিদ্ধহস্ত। সেক্সপীয়রের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনা হয় না কিন্তু আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেক্সপীয়র হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেক্সপীয়রের মত সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিভাবিকশিত হয় নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র মৌলিক কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। মেহের, হেলেন,—পিয়ারা তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ও মৌলিক, কিন্তু তাহারাই আবার অন্য নাটকে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নাম বদলাইয়া—ছায়া—মানসী—রাজিয়ারূপে দেখা দিয়াছে

বীর, মহৎ ও বিদূষক চরিত্র দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও মৌলিক। কিন্তু তাঁহার এক শ্রেণীর বিভিন্ন নাটকের ভিন্ন চরিত্রে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাহারা একই রকম কথা কয়, কার্য্যকলাপ তাহাদের একই রকম।

অসাধারণ ও বিরাট চরিত্র অঙ্কনই দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব ও তাহাতেই তাঁহার গৌরব। এই রূপ চরিত্র আঁকিয়া তিনি আমাদের প্রাণের একটা উচ্চ তারে ঝঙ্কার দিয়াছেন। কবি-প্রতিভা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক গুলিকে আশ্চর্য্য রকম উজ্জ্বল করিয়াছে আবার এই কবি-প্রতিভা স্থানে স্থানে তাঁহার নাটকগুলিকে আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। উপযুক্ত চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল যখনই কাব্যশক্তি আরোপ করিয়াছেন, তখনই সেই চরিত্র স্বাভাবিক ও নিখুঁত হইয়াছে, এইরূপ চরিত্রের মধ্যে নুরজাহান, শক্তসিংহ, প্রতাপ, চাণক্য বিশ্বেশ্বর, মহিম, অমর সিংহ, ঔরংজীব, মহামায়া, হেলেন, লীলা, ও সময়ু উল্লেখযোগ্য। আবার এই কবিকল্পনা যখন তিনি অযোগ্য চরিত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, তখনই তাহা অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর হইয়াছে। অজিতের সহিত রাজিয়ার কথাবার্ত্তা, জয়সিংহের "নারীর রূপ" ব্যাখ্যা, নাদিরাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালিকা জহরতের-"মা তোমার চক্ষে জল ত কখন দেখি নাই, ইত্যাদি অসংখ্য উক্তি ও কার্য্য চরিত্র-গত বিশিষ্টতার দিক দিয়া একান্ত অশোভন হইয়াছে। ইহাদের একের উক্তি অনায়াসে অপরের মুখে দেওয়া যায়, বয়োবৃদ্ধের মত বালককে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। নাট্যকার যখন আদর্শ চরিত্র আঁকেন, তখন সে চরিত্রকে অস্বাভাবিক বলা অন্যায় কারণ সে চরিত্রের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। কিন্তু যখন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে কোন চরিত্র নিজ বিশিষ্টতায় ফুটিতে থাকে, সে চরিত্র যদি অস্বাভাবিক হয়,—তাহার জন্য নাট্যকার দায়ী, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলি,—"প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার নাট্যকারের আছে, কিন্তু উপেক্ষা করিবার অধিকার নাই।" অথচ দিজেন্দ্রলালের নাটকে প্রায়ই এই উপেক্ষা চোখে পড়ে।

যে সকল দোষের উল্লেখ করা হইল, তাহা দ্বিজেন্দ্র প্রতিভাকে খর্ব্ব করিয়াছে বলিয়াই,—নতুবা উল্লেখযোগ্য নহে।

তাঁহার সৃষ্টির প্রধান বিশেষত্ব মৌলিকতা, গর্ব্ব করিয়া পরকে দেখাইবার মত আমাদের নাট্য-সাহিত্যে যদি কিছু থাকে, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট অমূল্য চরিত্রগুলি। দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা যে সকল চরিত্র সৃজনে নিজ মৌলিকতায় শত মুখে বিকশিত হইয়াছে, আমরা সেই সকল চরিত্রের বিশিষ্টতার কথা বলিব।

দুর্গাদাস দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কল্পনা, এই চরিত্র সংশ্লিষ্ট ঘটনার সমস্ত উপাদান ইতিহাস হইতে সংগৃহীত, এ বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে দ্বিজেন্দ্রলাল নিপুণভাবে সাজাইয়াছেন। দুর্গাদাস বীর, প্রভুভক্ত ও নির্ভীক, তাহার চরিত্রগত গাম্ভীর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিক চিন্তা ও কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নাট্যকার ঔরংজিবের দ্বারা প্রকৃত কথাই বলাইয়াছেন,—"তুমি কেবল প্রভুভক্ত ভৃত্য নও, চতুর রাজনৈতিক।" প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া তিনি

দুর্গাদাসের নিকট যশোবন্তের রাণী ও শিশুকে চাহিয়াছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন—"আমি এ শ্রেণীর লোকের একটু উপরে।" তাঁহাকে বন্দী করিতে যাইলে-"এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছি" বলার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে কূটরাজনীতিজ্ঞ ঔরংজীব স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—"জানতাম তুমি প্রভুভক্ত, বীর, চতুর, সাহসী, কিন্তু তোমার যে এতদূর স্পর্দ্ধা হবে, তা ভাবি নাই। নির্ভীক দুর্গাদাস চরিত্রের সুন্দর ব্যাখ্যা। বিভিন্ন ঘটনার আশ্রয়ে দুর্গাদাস চরিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকবরকে আশ্রয় দানে সে চরিত্রের একটা দিক উজ্জ্বল, রাজিয়াকে হারাইয়া উদ্ধত অজিত যখন তাহার নামে উৎকোচের অভিযোগ আনিল, তখন দুর্গাদাসের হৃদয়ে একই সঙ্গে আত্মসম্মানজ্ঞান ও প্রভুভক্তি জাগিয়াছিল। এতগুলি শ্রেষ্ঠগুণ সত্ত্বেও দুর্গাদাস চরিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই,—তাহার কারণ দুর্গাদাস চরিত্র অঙ্কনে দ্বিজেন্দ্রলাল কোথাও ইতিহাসের অমর্য্যাদা করেন নাই। সাহাজানের কুটিল কর্ম্মকুশল ঔরংজীব চরিত্রের যে বিশিষ্টতাও অন্ত-বিপ্লবের ছবি দ্বিজেন্দ্রলাল আঁকিয়াছেন, তাহা যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের শ্লাঘার বিষয়। দরবার দৃশ্যে তাহার অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য ও উক্তি, বিচারে দারার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক,—চিত্তাকর্ষক ও মৌলিক। লিয়রের সহিত সাজাহানের তুলনা হয় না, সেক্সপীয়রের ভাবরাশি সাজাহানে উপযোগ করিয়া নাট্যকার ইতিহাসের সাজাহানের সহিত নাটকের সাজাহানের বিরোধ বাধাইয়াছেন, কিন্তু কাব্যসৌন্দর্য্যের দিক দিয়া সাজাহান বাংলা নাট্য-সাহিত্যে এক অভিনব চরিত্র। সন্তানের কৃতঘ্নতায় ক্রুদ্ধ সাজাহান বলিতেছেন, যেন তোর পুত্র না হয়, লিয়র কন্যাকে নিঃসন্তান হইবার অভিশাপ দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যদি সন্তান হয়ই, তবে যেন এমন সন্তান হয়,—"A babe to honour her. সাজাহান কিন্তু সর্ব্বত্র সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, যেন শত্রুর ও পুত্র না হয়। আমাদের মনে হয় দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভা এইখানে সেক্সপীয়রের কল্পনাকেও পরাজিত করিয়াছে, ক্রুদ্ধ লিয়র কন্যাকে নিঃসন্তান হইবার অভিশাপ দিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, এই সেবাপরায়ণা মমতাময়ী নারীর কথা, তাই তিনি বলিলেন যেন এমন সন্তান হয়—that she may feel how sharper than a serpents' tooth it is to have a thankless child. কিন্তু সাজাহান মাত্র ঔরংজীবের অত্যাচারে এমনি ক্ষিপ্ত ও অন্ধ হইয়া ছিলেন,যে দারা ও জাহানারার কথা একেবারে ভুলিয়া তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন, যেন শত্রুরও পুত্র না হয়, অত্যাচারক্ষিপ্ত সম্রাটের এই স্বাভাবিক উক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ নিজস্ব। লিয়রের সহিত সাজাহানের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও, দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার অপূর্ব্ব কৌশলে উহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। ঐতিহাসিক সাজাহানের জন্য আমরা ইতিহাস পড়িব, আবার নাট্যকলা ও কাব্য সম্পদ উপভোগের জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান পড়িব।

কল্পনার আশ্রয়েই তাঁহার প্রতিভা ছাড়া পাইয়া এমন সব সজীব চিত্র আঁকিয়াছে, যাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হই। কল্পনা অনুযায়ী চরিত্র সৃষ্টির পথে যখনই ইতিহাস অন্তরায় হইয়াছে, তখনই তাহাকে তুচ্ছ করিয়া তিনি কল্পনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাঁহার এই ধরণের কবিকল্পিত ঐতিহাসিক চরিত্র সাজাহান। আবার যখন তাঁহার কল্পনা সুবোধ বালকের মত ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছে,—তখন সে চরিত্র তাঁহার কল্পিত ঐতিহাসিক চরিত্রের মত প্রাণময় হয় নাই,—দুর্গাদাস তাঁহার এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র। দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা শতমুখে বিকশিত হইয়াছে চন্দ্রগুপ্তে। চাণক্যচরিত্র সৃষ্টিকৌশলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে। গত যুগের অস্পষ্ট ইতিহাসের আখ্যান ভাগ লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইতিহাসের কঠিন নিগড়ে তাঁহার মোহময়ী কল্পনা বাধা পায় নাই, বরং তাঁহার কল্পনার আশ্রয়েই ইতিহাস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রবাদের অন্ধকারময় গুহা হইতে বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের কঙ্কালগুলি জড় করিয়া মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদের জীবন্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বের কূট তর্কে যে ইতিহাস নীরস,—ইতিহাসের সেই প্রায় অন্ধকার নীরস অধ্যায়, দিনের আলোর মত দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের চোখের উপর তুলিয়া ধরিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে কল্পনাই ইতিহাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে সেকেন্দার সাহের কবিত্বময়ী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপর হইতে সুদূরের যবনিকা অপসারিত হইয়া, দৃশ্যের পর দৃশ্যে হিন্দু ও গ্রীক সভ্যতাও সংঘর্ষের যে হৃদয়গ্রাহী চিত্র ধীরে ধীরে ফুটিতে থাকে,—তাহা যে কোন দেশের যে কোন ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকারের শ্লাঘার ও গৌরবের বিষয়। এই মনোমুগ্ধকর ঐতিহাসিক আখ্যান বস্তুকে স্বীয় অসামান্য প্রতিভার রশ্মিরেখাপাতে সমাজ, রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনার সমাবেশে বাহিরের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যের চরমে আনিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষান্ত হন নাই, এই বিপুল বহির্দ্বন্দ্বের আড়ালে সেই যুগের এক স্বনামধন্য চরিত্রের অলৌকিক হৃদয়বৃত্তির শতমুখী ভাবধারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, চরিত্র সম্বন্ধে প্রচলিত মাত্র দু' এ'কটি প্রবাদ অবলম্বনে কল্পনার সাহায্যে তিনি যাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই তিনি বিশ্ব-বরেণ্য নাট্যকারগণের সহিত একাসনে বসিবার অধিকারী। একটা বিরাট মনোরাজ্যের বিপ্লবময়ী উত্থান-পতনের প্রাণস্পর্শী চিত্র এই চাণক্য। যাহা একদিন স্নেহমমতায় পূর্ণ ছিল, জীবনের কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে দুর্ভাগ্যের নৃশংস আক্রমণে তাহা শুষ্ক মরুতে পরিণত করিলে সেই উত্তপ্ত ঝটিকাক্ষুব্ধ ঊষর মরুপথে পথহারা চাণক্যের উন্মাদ হৃদয় বৃত্তি হাহাকার ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ক্ষমতাও প্রভুত্বের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিলেও, শেষে হারান স্নেহের পূত পুণ্যপ্রবাহে সে মরু বুকে আবার স্নেহের প্লাবন দেখা দিল, তাহা শ্যামলতায় ভরিয়া উঠিল। এক ক্ষুদ্র বালিকার কোমল করস্পর্শে চাণক্যের মত একটা দুর্দ্দান্ত দৈত্য কেমন করিয়া শান্তভাব ধারণ করিল,—হারান স্নেহ ফিরিয়া পাইয়া

চাণক্য। নন্দের পৌরহিত্য স্বীকার করিয়া কাত্যায়নের সহিত প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে,—মানবের মজ্জাগত স্নেহ-মায়া-মমতা প্রভৃতি কোমল হৃদয়বৃত্তির সহিত বিচ্ছেদের ইঙ্গিতে চাণক্য চরিত্রের সূচনা হইয়াছে, আর শেষ দৃশ্যে আত্রেয়ীর হাত ধরিয়া নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সেই বৃত্তির সহিত পুনর্মিলনে তাহার পর্য্যাবসান। এই বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যবর্ত্তী সময়ের চাণক্য হৃদয়ের যে অন্তর্বিপ্লবের ছবি দ্বিজেন্দ্রলাল আঁকিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। শ্মশানে প্রেতের তাণ্ডব নৃত্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর, নীরোর আজ্ঞায় প্রজ্জ্বলিত রোমের গগনস্পর্শি অগ্নিশিখার অস্বাভাবিক আলোকে রঙিন।

নুরজাহান দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠদান। নাটকের ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন,—চরিত্রটি বিশেষ জটিল হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় নুরজাহানের অন্তর্বিপ্লবের জটিল সমস্যা থাকিলেও নুরজাহান চরিত্র জটিল হয় নাই, তাই বলিয়া নাটকখানি কোন দিক দিয়া দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। ক্লিয়োপেট্রার অনুকরণে তিনি নুরজাহানকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম সমালোচকের মত তিনি সেক্সপীয়রের ক্লিওপেট্রা আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন,—চরিত্রটি জটিল ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাতে দুর্ব্বোধ্য, তাই নিজের নুরজাহান সম্বন্ধে সমালোচকগণকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল,—"চরিত্রটি জটিল হইয়াছে,"—এইরূপ ভ্রমপূর্ণ ও রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নুরজাহান চরিত্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং এই চরিত্র চিত্রনে তিনি আংশিক সাফল্যলাভ করিলেও, চরিত্রটি ক্লিয়োপেট্রার মত নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই।

শব্দ সংগ্রহ ও বিন্যাস কৌশলের বিভিন্নতাই এক কথায় গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্বের পরিচয়। আমাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের কথা পরকে জানাইবার জন্য মহা সমারোহে ঘটা করিয়া আনন্দ করি এবং দুঃখে ধুমধাম করিয়া কাঁদি। আমাদের অনুভূতি অপরকে জানাইবার জন্য যে অত্যুক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা ভাবের অভিব্যক্তি, সাহিত্যে ইহা প্রকাশ করিতে গিয়াই যত অলঙ্কার, উপমা, ও অনুপ্রাসের সৃষ্টি, আর নাটকে তাহা দর্শকবৃন্দকে জানাইবার জন্য যত কলা,—সৌন্দর্য্য ও নাট্যশিল্পের আবির্ভাব। দ্বিজেন্দ্রলালই নাটকে আগাগোড়া গদ্য ভাষার প্রবর্ত্তক এবং সে ভাষা কাব্যসৌন্দর্য্যময়। তাঁহার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র তাঁহার বিভিন্ন নাটকের স্থানে স্থানে গদ্যভাষা প্রয়োগ করিলেও তেমন জমাইতে পারেন নাই, দ্বিজেন্দ্রলালই সর্ব্বপ্রথম জানাইয়াছিলেন,—নাটক গদ্যে রচনা করিলে যেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়, পদ্যে তেমন হয় না, তাঁহার কবিত্বময় ঝঙ্কৃত শব্দবিন্যাস কৌশল গিরিশচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই শব্দ বিন্যাশকৌশল ও কাব্য সম্পদ একটা আর্ট, এবং তিনিই এই অনাবিষ্কৃত মহামূল্য নাটকীয় আর্টের আবিষ্কারক। বর্ত্তমানে রচিত যে কোন নাটকের পাতা উল্টাইলে তাঁহাকে অনুকরণ করিবার ব্যর্থ ও নিষ্ফল চেষ্টা দেখি। দ্বিজেন্দ্রলালের শব্দ সম্পদ ও কাব্য শক্তি তাঁহার নাটকগুলিকে যে অপূর্ব্ব শ্রীসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল করিয়াছে, তাহা নাটকের দোষ গুণের উপর আপন মহিমায় মহিমান্বিত।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার অধিকাংশ নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটক গদ্যে লিখিয়াছেন, কিন্তু শব্দ সম্পদ, নাট্য-সৌন্দর্য্য ও কবিত্বের হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য নাটকের সহিত গিরিশচন্দ্রের পদ্য নাটকের তুলনাই হয় না। ঐতিহাসিক নাটকে—এমন কি বিল্বমঙ্গলের মত নাটকেও একই চরিত্রের দ্বারা কখন গদ্য কখন পদ্য বলান নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের অঙ্কিত কোন চরিত্রের মধ্যে যখনই ভাবের উদয় হয়, তখনই সে গদ্য ছাড়িয়া পদ্যে তাহা ব্যক্ত করে, ইহাতে নাটকীয় ঘটনার মাত্র রসভঙ্গই হয় না, উপরন্তু তাহা বড়ই বিসদৃশ মনে হয় এবং অভিনেতার যথেষ্ট কৃতিত্ব সত্ত্বেও মনে হয় যে অভিনয় দেখিতেছি। মীরকাসিম ও সিরাজের এইরূপ পদ্য ছন্দে বক্তৃতা নাটকীয় সৌন্দর্য্যকে অনেকখানি খর্ব্ব করিয়াছে, আর বিল্বমঙ্গলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাষার পরিবর্ত্তন গিরিশচন্দ্র রচনাকৌশল হিসাবে প্রয়োগ করিলেও তাহাতে নাটকের রসভঙ্গ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যের ভিতর কবিতার শব্দ ও ভাবরাশি প্রকাশ করিয়া এবং গিরিশচন্দ্র পদ্যে গদ্যময় ঘটনা প্রকাশ ও চরিত্র চিত্রন করিতে গিয়া নিজ নিজ নাটকের স্থানে স্থানে চরিত্রগত বিশিষ্টতার সহিত ভাষা ও ভাবের যে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই এই দুই নাট্য-সম্রাটের দোষ। মীরকাসিম বা সিরাজ প্রভৃতি চরিত্রের মুখে কবি জনোচিত ভাষা যেমন অশোভন, দুর্গাদাস জয়সিংহ প্রভৃতির মুখে নারীর রূপ সম্বন্ধে মন্তব্য, রাজিয়ার, জেঠাইমার মত বক্তৃতা, মাতার চক্ষে জল দেখিয়া বালিকা জহরতের দার্শনিক উক্তি তেমনি অশোভন। চরিত্রগত বিশিষ্টতা খর্ব্ব করিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা পদ্যেই হোক বা গদ্যেই হোক।

অনেক সময় দেখা যায় কোন সমস্যার সমাধান ও শিক্ষা প্রচারকল্পে নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক, নাটক বা উপন্যাস লিখিয়াছেন এবং এইরূপ শিক্ষা-সমস্যামূলক নাটক উপন্যাসের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যেই বেশী। ভাবপ্রবণ বাঙালী কোন একটা হুজুক পাইলে শীঘ্রই ভাবে বিভোর হইয়া হুজুকে মাতিয়া উঠে এবং ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ সাময়িক সমস্যামূলক নাটক বা উপন্যাস খুব উৎকৃষ্ট হইলেও যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মৃতকল্প হইয়া পড়ে। এইরূপ নাটক সাময়িক খ্যাতি লাভ করিলেও, সাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের,—বলিদান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাটক আর দর্শককে তেমন আনন্দ দেয় না, কারণ সেগুলি সাময়িক শিক্ষা-সমস্যা মূলক। বিল্বমঙ্গল সমস্যাপূর্ণ হইলেও কোহিনুরের মত চিরদিন বাংলা নাট্য সাহিত্যের অমূল্যরত্ন বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের কোন নাটকই কোন বিশেষ সমস্যা বা উদ্দেশ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বিভিন্ন নাটকের ভূমিকায় তিনি সমালোচকগণকে সজাগ রাখিবার জন্য এক একটি সমস্যার নির্দ্দেশ করিলেও, তাঁহার নাটক যে, কোন একটা বিশেষ সমস্যা অবলম্বনে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যখন যাহা ফুটাইতে চাহিয়াছে, তাহা এমনি সতেজ ও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়াছে যে, তাহাতে

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত মতামত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। যতদিন বাঙালীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল, পাণ্ডবগৌরব, প্রফুল্ল, চৈতন্যলীলা, জনা, তপোবল, শঙ্করাচার্য্য, গৃহলক্ষ্মী, মীরকাসিম ও সিরাজদ্দৌলা আর দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবারপতন, সাহাজান, চন্দ্রগুপ্ত ও পরপারে সাদরে পঠিত ও অভিনীত হইবে। সত্যকার প্রতিভা কি আশ্চর্য্য কৌশলে অন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সংস্পর্শে নিজ বিশিষ্টতায় ফুটিয়া উঠিতে পারে, দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভা তাহার উদাহরণ। তাঁহার সাজাহান লিয়রের অনুবাদ নহে,—প্রভাব, নুরজাহান ক্লিয়োপেট্রার ছায়া নহে, প্রাণময়ী অন্যতম ক্লিয়াপেট্রা, তাহাদের সহিত ডেসডিমনার তুলনা হয় না, বালক বেশ ধারণ করিয়াও লীলা রোজেলিণ্ডকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, হেলেন ও মানসীর বিশ্বপ্রেম সেক্সপীয়র কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই, কুবেণী লেডী ম্যাকবেথের পাশে দাঁড়াইবার দাবি করে। পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রনে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের যে শ্রীসৌন্দর্য্য দ্বিজেন্দ্রলাল বাড়াইয়াছেন,—তাহা অতুলনীয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন যজ্ঞের হোতারূপে নাট্য-সাহিত্যে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিক হাস্যরস, তাঁহার অসামান্য প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। গিরিশচন্দ্রের হাস্যরসেও যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক। প্রকৃতিকে বেশী রকম বিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়া, কোথাও বা তাহাকে বিসদৃশভাবে বর্ণন করিয়া গিরিশচন্দ্র হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। প্রফুল্লের ডাক্তার ও তাঁহার গৃহিণী, বলিদানে দুলাল চাঁদ, বেল্লিকবাজারে দালাল, উকীল প্রভৃতি এইরূপ নোংরা হাস্যরসের উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস সর্ব্বত্রই শুভ্র ও নির্দ্দোষ, পরিহাস-প্রিয়তায় উজ্জ্বল। বর্ণনভঙ্গি ও শব্দ বিন্যাস পারিপাট্যে তাহা নাট্য-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। রসিকতার আড়ালে তিনি উপদেশ দিয়াছেন, সমাজ ও জাতির কুসংস্কারকে বিদ্রূপ করিয়াছেন, প্রাণের বেদনা ব্যঙ্গে ফুটাইয়াছেন, এমন ভাবে,—এমন ভাষায় এবং ভঙ্গিতে যাহা তিনি ছাড়া কেহ পারিত না বা পারেন নাই। গান ও তাহার ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক মৌলিক সৃষ্টি, তাঁহার পূর্ব্বে এইরূপ সুরলয়যুক্ত সম্পূর্ণ নূতন ধরণে গান কেহ রচনা করেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের গান ও তাহার ছন্দের আলোচনায় প্রবন্ধের কলেবর বাড়াইব না, তবে বাংলা গীতিসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালই কোরসের সৃষ্টিকর্ত্তা, এ কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ অভিজ্ঞতা না থাকিলে, গানের সুর লইয়া এমন খেলা করা যায় না।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি বিশেষত্বের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। অভিনয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া একজন সমালোচক বলিয়াছেন, জগদ্বিজয়ী সম্রাট সিন্ধুনদের তীরে একা না থাকিয়া হাবসী ক্রীতদাস, মিশরী নর্ত্তকী, পারসী বীণবাদক, চাটুকার প্রভৃতি বেষ্টিত থাকিলে ভাল হইত। অবশ্য দৃশ্য হিসাবে তাহা খুব জাঁকালো হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকের সৌন্দর্য্য হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের প্রথম দৃশ্য মাটি হইয়া যাইত। গিরিশচন্দ্রের নাটক কয়েক দৃশ্য অভিনয়ের পর ধীরে ধীরে জমিতে থাকে এবং অল্পে অল্পে দর্শককে অভিভূত করিয়া

ফেলে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক একেবারে দর্শকের প্রাণের দরজা খুলিয়া ঢুকিয়া পড়ে, তাঁহার রচনার অসাধারণত্ব, ঘটনা সন্নিবেশ কৌশল ও সমারোহ প্রথম দৃশ্যেই দর্শককে অভিভূত করিয়া ফেলে, যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় মহিমার বিরাট সমারোহে দর্শক স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাঁহার সব নাটকের প্রথম দৃশ্যে এই সমারোহের আয়োজন আছে। রাণাপ্রতাপের প্রথম দৃশ্য, দুর্গাদাসের প্রথম দৃশ্য, চন্দ্রগুপ্তের প্রথম দৃশ্য, সাজাহান প্রভৃতি নাটকের প্রথম দৃশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের ঘটনা সন্নিবেশ কৌশলে উজ্জ্বল। যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের হাত ধরিয়া তিনি ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মাঝে দাঁড় করাইয়া দেন, অনুভূতির এমন একটা উচ্চ তারে আঘাত করেন, যাহাতে দর্শকের দল প্রথম হইতেই আনন্দ, কৌতূহল, বিস্ময় ও আতঙ্কে মগ্ন হইয়া যায়। ঐতিহাসিক নাটকের স্বাভাবিক সমারোহের সহিত ঘটনা সন্নিবেশ কৌশল ও অপূর্ব্ব শব্দ বিন্যাসের সাহায্যে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা যে ইন্দ্রজাল রচনা করে, মুগ্ধ দর্শক মোহাবিষ্টের মত শেষ পর্য্যন্ত তাহার আকর্ষণ অনুভব করে, যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া পড়ে, কি দেখিল বা শুনিল সে আলোচনা করে না, শুধু বলে—Sensatioanl দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষত্ব তাঁহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী কোন লেখকের মধ্যে নাই।

কোন কোন বিষয়ে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা গিরিশচন্দ্রকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, আবার কতকগুলি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের অনেক নীচে রহিয়া গিয়াছেন। বিশেষ চেষ্টা ও ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা উভয়ের দোষ গুণ ভাল করিয়া দেখাইতে পারিলাম না, তবুও বাংলা নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র যে একমেবাদ্বিতীয়ং আর দ্বিজেন্দ্রলাল উজির বা সভাসদ, সে কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। নিপুণ ভাবে উভয়ের নাট্য-সাহিত্য ও প্রতিভার বিশিষ্টতা আলোচনা না করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার কাহারও নাই; গিরিশচন্দ্রকে যেমন নাট্য-সম্রাট বলি; দ্বিজেন্দ্রলালকেও তেমনি মুক্তকণ্ঠে ঐতিহাসিক নাট্য-সম্রাট বলিব। নাট্যকারের ভাষায় বলি—"নাট্য-সাহিত্যাকাশে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল বৃহস্পতি ও শুক্রতারা; প্রতিভার যমজপুত্র!"

আগামী সংখ্যাতে বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্য ও পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনা করিব এবং সেই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

নারী-নির্য্যাতন

যখন খুব ছোট ছিলাম তখন কাগজে জামালপুরে নারীর প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের কথা পড়েছিলাম। কথাটা বিশেষ ক'রে মনে থাক্‌বার কারণ এই যে ব্যাপারটাকে নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞান করে মাষ্টার মহাশয়কে এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম এবং প্রশ্নের উত্তরে তিরস্কার লাভ ঘটেছিল। তারপর থেকে ক্রমাগত শুনে ও দেখে ব্যাপারটা যে অসম্ভব নয় তা সেই ছেলে বেলাতেই ভাল ক'রে অনুভব ক'রেছি। সেই শৈশব আর আজকার এইদিনের মধ্যে অনেকগুলি বৎসর কেটে গেছে কিন্তু আজও সেইসব ঘটনারই পুনরভিনয় দেখছি আর মনে হচ্ছে যে বহুদিন আগে যে রাক্ষস জামালপুরে গুণ্ডার রক্তে নৃত্য ক'রেছিল আজও সে বেঁচে আছে এবং জাতির শ্রেণীবিশেষের চিন্তা, চেষ্টা ও শক্তি তার পায়ে বিক্রীত। অবকাশ পেলেই স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করা তাদের কাজ। তার প্রমাণ পূর্ব্বে এবং অল্পদিনের মধ্যে যেখানেই দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'য়েছে সেখানেই স্ত্রীলোকের উপর অল্পবিস্তর অত্যাচার ঘটেছে। পুরুষে পুরুষে মারামারি দাঙ্গাহাঙ্গামা—তারমধ্যে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কেন? সকলস্থানেই এই কুৎসিত প্রবৃত্তিটাই আত্মপ্রকাশ কেন করে? জামালপুরী কীর্ত্তির কীর্ত্তিমানেরা সম্ভবতঃ অনেকেই পৃথিবীতে নেই। কিন্তু তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই জঘন্য প্রবৃত্তিটা তো মরে-নি; নারী-ধর্ষনের কাহিনী চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। এই স্ত্রীধর্ম্ম অপহারক নারকীদের মধ্যে অনেক যুবক ও আছে—জামালপুরী আমলে তারা হয়তো শিশু কিংবা বালক ছিল; তখন তাদের মনে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কর্ব্বার কল্পনা ছিল না—কিন্তু যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রবৃত্তি কে তাদের মনে জাগিয়ে দিল? জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই সব পাষণ্ডদের সামাজিক এবং পারিবারিক কর্ত্তৃপক্ষেরা কেন এ রাক্ষসী প্রবৃত্তিটাকে গলাটিপে মারলেন না? আমার মনে হয় সেকালের সেই জামালপুর ও সম্ভঃ পরবর্ত্তীকালের দু'একটা ঘটনার পরেই যদি দেশের সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক কর্তৃপক্ষগণ সচেষ্ট হ'তেন আজ সমস্ত দেশ জুড়ে এই পৈশাচিক ব্যাপারটি এমন ব্যাপকভাবে দেখা দিতনা।

পূর্ব্বেই বলেছি এই প্রবৃত্তিটা শ্রেণীবিশেষের অস্থিমজ্জাগত হ'য়ে আছে ও বহুব্যাপক হয়ে প'ড়েছে। সংবাদ পত্রে যত কাহিনী প্রকাশ পায় তার অন্ততঃপক্ষে বিশগুণ নারী নির্য্যাতন এই বাঙ্গালায় ঘটে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাঙ্গালায় ক'খানা সংবাদপত্র আর ক'জনাই বা সংবাদদাতা? এমন অসংখ্য পল্লী বাঙ্গলায় আছে যেখানে বৎসরে একখানা সংবাদ পত্র কিংবা একজনও বাহিরের জগতের লোক পৌঁছেনা। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন সে সব গ্রাম থেকে কুড়ি মাইলের বাইরে। থানা ১২। ১৪ মাইল। চৌকীদার সে গ্রামের হাকিম, মোড়ল সে গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। সেগ্রামে প্রকাশ্য দিবালোকে

সদর রাস্তার উপরে স্ত্রীধর্ম্ম অপহৃত হ'লেও সে খবর বাইরে আস্‌তে পারে না। রন্ধ্রহীন পাষাণ সমাধির জীবন্ত বন্দীর আর্ত্তনাদের মত নির্য্যাতিত নারীর হাহারব সে গ্রামের আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যায়। চিত্রটী যে কল্পনা নয় তা' যাঁরা বাঙ্গালার পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কিংবা সত্য পরিচয় লাভের আশায় যত্নবান্ তাঁরা জানেন।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন যদি যেরূপ শোনা যাচ্ছে তাই হয় অর্থাৎ এইসব অত্যাচার যদি সাম্প্রদায়িকভাবে অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে তবে বুঝতে হবে যে অবস্থা বাইরে থেকে যা দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে ঢের গুরুতর। কারণ তা হ'লে এ পাপাচরণের গতিরোধকরা শক্ত হবে কেননা এই বাঙ্গলার অধিকাংশ পল্লীতেই হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি বাস করে। কোথাও বা হিন্দু প্রবল, কোথাও বা মুসলমান বলবান। মুসলমানের পল্লীতে যদি হিন্দু প্রতিবেশিনীর এবং হিন্দুপল্লীতে যদি মুসলমান নারীর সতীধর্ম্ম বিপন্ন হয় এবং অত্যাচারীর নিজ সম্প্রদায় যদি এই ব্যাপারে তাকে সহায়তা করে কিংবা রাজশাসন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে তবে অবস্থা শুধু গুরুতর না ব'লে ব'ল্‌তে হবে ভীষণ।

এখন কথা এই যে এই প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার যে একটা কথা উঠেছে সে কথাটা উঠবার কারণ কি? অত্যাচারী, হিন্দু মুসলমান সব সম্প্রদায়েই আছে। হিন্দু অত্যাচারী, হিন্দুনারী ও মুসলমান নারী উভয়েরই উপরই অত্যাচার করে, মুসলমান অত্যাচারীও তাই করে; অত্যাচারিতার আচরিত ধর্ম্ম বাছে না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে নারীধর্ষনের যতগুলি ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা গেছে অধিকাংশস্থলেই অত্যাচারী মুসলমান আর তার কামাগ্নির আহুতি হিন্দু নারীর ইজ্জৎ। এমনও দেখা গিয়েছে যেখানে বারোজন দুর্ব্বৃত্ত একটী বালিকার সতীধর্ম্ম নাশ ক'রেছে—অত্যাচারী বারোজনই মুসলমান এবং ধর্ষিতা নারী হিন্দু। এবং যেস্থানে এ ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হ'য়েছে সেটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। যখনই দেখি যে এতবড় একটী বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমানপ্রধান গ্রামের এক ব্যক্তিও এই জঘন্য অত্যাচারের প্রতিরোধীরূপে দাঁড়ায়নি তখনই মনে হয় যে লোকে এইসব ব্যাপারের যে সাম্প্রদায়িক রূপ দিচ্ছে তা' ভ্রান্তধারণা প্রসূত হ'য়ে থাকলেও সে ভ্রান্তিটা নিতান্ত অহেতুক নয়।

অপর পক্ষে এ কথাও উঠতে পারে যে কোনো অনির্দ্দিষ্ট কারণে শুধু মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনারী নির্য্যাতনের কথাই লোকের শ্রুতিগোচর হচ্ছে, হিন্দুদুর্ব্বৃত্তের দুষ্কৃতির কথা শোনা যাচ্ছে না। হ'তে পারে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। যতগুলি ঘটনা শোনা গেছে অন্ততঃ তার এক চতুর্থাংশও সত্য ব'লে যদি নেয়া যায় তবে তাতেই সমগ্র সমাজের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সমাজ দৃষ্টতঃ নির্ব্বিকার। এই নির্ব্বিকারত্ব সমাজের স্বাভাবিক জড়তার পরিচয় হ'লেও উৎপীড়িত যদি একে স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য আখ্যা দেয় তবে সে অন্যায় কর্ব্বে না।

পাপাচরণের সঙ্গে লড়বার প্রধান অস্ত্র দুটি—প্রতিকার ও প্রতিরোধ। অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতির কর্ত্তার শাস্তিবিধানের নাম প্রতিকার ও কদনুষ্ঠানকে বাধা প্রদানের নাম প্রতিরোধ; পরিতাপের

বিষয় এই যে, দেশ এই দুইটী অস্ত্রের একটিকেও যোদ্ধার মত গ্রহণ করে-নি। প্রতিরোধের কথা দূরে থাক্ প্রতিকারের চেষ্টাও সমস্ত দেশ জুড়ে জাগেনি। কচিৎ দু' একটি স্থানে নারী রক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা শোনা যায় কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেগুলি কর্ম্মীর অভাবে পঙ্গু, অর্থাভাবে অসহায়।

এই পাপবৃত্তির প্রতিকার ও প্রতিরোধ যাঁদের দ্বারা সম্পূর্ণ না হোক্ আংশিকভাবে সম্ভব হতে পার্ত্ত—দুঃখের বিষয় দেশের সেই রাষ্ট্রীয় জননায়কেরা এ কার্য্যে অগ্রণী হন না। যখন নারীনিগ্রহের কথা ক্রমাগত প্রকাশ পেতে আরম্ভ কর্ল্ এবং যখন দেখা গেল বারম্বার স্বজাতির নারীনির্য্যাতনের কথা শুনে সম্প্রদায় বিশেষের কেহ কেহ ব্যাপারটিকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে সুরু কর্চ্ছেন তখনই দেশের রাষ্ট্রসভার সম্পূর্ণ বল এই চিত্তদাহী পশ্বাচরণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করা উচিত ছিল। নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য না হোক্, অন্ততঃ নবজাত হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে বাঁচিয়ে রাখবার খাতিরেও। কারণ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সাধনার সাধ্য। রাষ্ট্রনায়কের এই ঔদাসীন্যের ফল ফল্‌ছে। দেশের লোকে তাঁদের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন। বিগত দু'বৎসরের মধ্যে পল্লীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলির অর্দ্ধেক ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে; যেগুলি আছে তাদেরও অধিকাংশ টলমল। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাতাদের মতবিরোধের তরঙ্গ তাহাদিকে ক্রমাগত আঘাত করছে। ফলে পল্লীবাসীর নির্ভর করবার আর কেউ নেই। দু'বৎসর আগে যেখানকার লোকে কংগ্রেস কমিটী বল্‌তে বুঝ্‌ত দেশী আদালত; কংগ্রেস কমিটীর বিচার বাদীপ্রতিবাদী নির্ব্বিচারে চরম ব'লে মেনে নিত, সেখানকার লোকে আজ কংগ্রেসের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছে। শুধু দু'একজন লোক গান্ধীরাজার' কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ক'রে জনচিত্তের উপর কংগ্রেসের বিলুপ্ত প্রভাবের স্মৃতিটা জাগিয়ে তোলে মাত্র।

আমি গ্রামে যাই। অনেক সময় লোকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেক সুখদুঃখের কথা বলে। প্রয়োজনমত উপদেশ দিই। কিন্তু যখন অসহায়া নারীর প্রতি প্রবল পাষণ্ডের অত্যাচারের অভিযোগ করে এবং পুলিশের সাহায্য নেবার অভিপ্রায় জানায় তখন অসহযোগের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে নীরবে বসে থাকি, 'পুলিশের সাহায্য চেয়োনা' বল্‌তে নিদারুণ লজ্জা হয়। অপহৃতসতীত্ব নারীর স্বামীকে আদালত বর্জ্জনের উপদেশ দিতে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। আমি নিজে যা'কে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বনা অপরের সাহায্য নিয়ে সে যদি আপনাকে রক্ষা কর্ত্তে প্রয়াস পায় তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার বাধা দেবার কোনো অধিকার আছে ব'লে আমি মনে করিনে।

এখনও সময় যায়-নি। এখনও রাষ্ট্রনায়কেরা এ বিষয়ে সচেতন হলে সুফল লাভের আশা করা যায়। এই নারীনির্য্যাতন নিয়ে কোনো কোনো স্থানে আজও সাম্প্রদায়িক রেষারেষি চল্‌ছে। অত্যাচারীর শাস্তিবিধানের জন্য একদল বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়িয়েছেন আর অত্যাচারীর স্বধর্ম্মীরা তার পক্ষ নিয়ে আদালতে লড়ছেন। এ সব ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান

জননায়কদের উপস্থিতি প্রয়োজন এবং অনুসন্ধানে অত্যাচারীর অপরাধ প্রমাণিত হ'লে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তার শাস্তি বিধানের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।

এই পন্থা অবলম্বন করলে অত্যাচারী বুঝবে তারই পাপাচরণের জন্য সে তার স্বধর্ম্মীর চোখে ঘৃণিত, নির্য্যাতিতার পক্ষ বুঝবে যে এ কুকীর্ত্তি একান্ত পাষণ্ড বিশেষেরই কাজ তার পিছনে তার স্বধর্ম্মীর কোনো সহানুভূতি নেই।

কিন্তু কেবলমাত্র রাষ্ট্রনায়কদের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। এই সমস্ত ব্যাপার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেরই গুপ্তব্যাধির বাহিরের লক্ষণ মাত্র। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সামাজিক নেতৃগণকে এর প্রতিকারের জন্য অবহিত হতে হবে। আজও যদি তাঁরা সতর্ক না হন তবে অদূর ভবিষ্যতে উভয়কেই অনুতাপ কর্ত্তে হবে, কারণ জন্তু বিশেষ যখন ক্ষিপ্ত হয় তখন পথচারীমাত্রকেই দংশন করে বর্ণ, ধর্ম্ম, জাতি বা গোত্রের বিচার করে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

শিশুর প্রেম

সামান্য একপসলা বৃষ্টির পর ভাবলুম একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। কলকাতার রাস্তা একটুতেই কর্দ্দমাক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু আবহাওয়াটা তেমনি মনোরম স্নিগ্ধ মনে হল।

ফুটপাতে পা দিতেই দেখি একটী ছোট্ট ফুট্‌ফুটে শিশু তার অভিভাবকের সঙ্গে আস্‌চে। সে একে শিশু, তারপরে সুন্দর এবং শিশু ও সৌন্দর্য্যের প্রতি আমার চিরদিনের আকর্ষণ আমার বন্ধু-জগতে বিখ্যাত। আমি তাকে দেখে একটু আদর করবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারলুম না।

আমি শিশুটীর পাশ দিয়ে যেতেই তাকে ছোট একটু ধাক্কা দিলুম, অতর্কিত সে তাতেই মাটিতে পড়ে গেল। তক্ষুণি তাকে আমি কোলে তুলে, সেই সুযোগের অবসরে তার কচি মুখে কয়েকটী চুমু খেলুম। তার নিশ্চয়ই বেশ লেগেছিল। ভেবেছিলুম কাঁদবে, কিন্তু আশ্চর্য্য; আমার কোলে উঠে তার খুসী যেন বেড়ে গেল। তার যমুনার জলের মতো নীলাভ কালো চোখ দুটীর সরল দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে ফেললে।

ইতিমধ্যে ভদ্রলোকটী, তার বাবাই হবেন্, আমাকে রূঢ় স্বরে বল্লেন, "কেমন ছোক্‌রা হে তুমি? পথ চল্‌তে জানোনা? যেন উট-মুখো হয়ে চলেছ।"

আমি সবিনয়ে তাঁকে জানালুম যে উক্ত প্রাণীর সহিত আমার কোনই সাদৃশ্য নেই, তাতে তিনি আরো চটে বল্লেন, "আমরা বিয়ে বাড়ী যাচ্ছি, দেখত খোকার পোষাকের কি দশা করেচ?"

আমি দেখে বল্লুম, "তাই ত ! পোষাকটা কাদা লেগে একেবারেই মাটি হয়ে গেছে। দেখচি। তা আসুন, আমার বাড়ী এই কাছেই, আমি খোকার পোষাক বদ্‌লে দিচ্চি।"

বলে একরকম জোর করেই খোকাকে নিয়ে চল্লুম। ভদ্রলোকটী অগত্যা আমার অনুসরণ করে বৈঠকখানায় বসে রইলেন, আমি খোকাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলুম।

আমাদের বাড়ীতে খোকা কেউ ছিল না যে, খোকার পোষাক থাক্‌বে, খোকার পোষাক ছাড়িয়ে চাকরকে ডেকে সেই মাপের দামী ভালো পোষাক আন্‌তে বাজারে পাঠিয়ে দিলুম। এরমধ্যে খোকার সঙ্গে আমার মৌখিক-আলাপ জমে গেল।

গোলাপের মতো তার মুখখানি, গোলাপের মতোই তার স্পর্শ ! তাকে দেখে দেখে আমার দেখার তৃষ্ণা মেটে-নি, চুমু দিয়ে দিয়েও চুমোর জ্বালা জুড়োয়-নি।

এদিকে খোকার বাবা ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন, এবং বারবার খোকাকে নিয়ে যেতে ডেকে পাঠাচ্ছিলেন, আমি খোকার বদলে আমার ডেস্ক থেকে রবিবাবুর "শিশু" ও শিশুদের নিয়ে রচিত আরো কয়েকখানা কাব্য পাঠিয়ে দিলুম, তিনি হঠাৎ আপত্তি সহকারে পড়তে সুরু করে সহসা এত মজে গেলেন, যে সময় স্থান ও তাঁর পাত্রের কথা একান্ত বিস্মৃত হয়ে বইয়ের মধ্যেই ডুবে গেলেন।

খোকাকে আমি অবাধে ও মনের সাধে একই সময়ে যত বিভিন্ন রকমের আদরে অভ্যস্ত করেছিলুম তা সেই পেলব ক্ষুদ্র মানুষটীর পক্ষে হয়ত অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়—কিন্তু সেটা তখন আমাদের দু'জনের কারুর মনে পড়েনি। আমি যখন তাকে আমার সব জোর দিয়ে বুকে চেপে ধরেছিলুম তখনো সে কাঁদ্‌তে ভুলে গিয়ে হাসছিল। তার হাসি কি মিষ্টি !

খোকা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "তুমি কে ?" আমি উত্তর দিয়েছিলুম "আমি তোমার মনো-দা হই।"

"তুমি আমাবাড়ী যাবে ?"

"যাবো। কিন্তু আমাকে তোমার মনে থাক্‌বে ত ?"

"উঁহু। মাকে বল্‌বো।"

"কি বল্‌বে ?"

"বলবো মনো-দা—"কি যে তার বক্তব্য তা তার ছোট্ট বুক পর্য্যন্ত হয় ত ব্যগ্র হয়ে এসেছিল কিন্তু মুখে ব্যক্ত হোলো না—কিন্তু সেই অব্যক্তের আভাস তার বড় বড় দুটী চোখে ফুটে উঠ্‌ল ! আমি হেসে তার চোখ দু'টীতে চুমু দিলুম তার গালদুটী আমার চুমুর স্পর্শে টুকটুকে আপেল হয়ে উঠেছিল।

চাকর পোষাক কিনে ফিরে এলে আমি নিজে তাকে সাজিয়ে দিলুম, তারপর কোলে করে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলুম।

কাব্যচর্চ্চার রসভঙ্গে আহত দৃক্‌পাত করে যখন তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, দু'ঘণ্টা কেটে

গেছে হৃদয়ঙ্গম করলেন তখন তাঁর বিকৃত মুখ দেখে ঠিক বোঝা গেল না, তিনি ঘড়ির বা আমার ওপরে বেশী চটেছেন।

খোকাকে কোলে নিয়ে তার রাঙা গাল দু'টী লক্ষ্য করে তাকে প্রশ্ন করলেন তোর গালে কি হয়েচে?

খোকা অম্লান বদনে বল্লে দাদা চুমু খেয়েচে!

তখন তিনি এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে আমার সত্য বোধ হল, তাঁর এক চোখে বিস্ময় আর এক চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠেচে। তাঁর তৃতীয় নয়ন থাক্‌লে তিনি বোধকরি, আমার এই অবৈধ ভালবাসার জন্যে আমাকে ভস্ম করেই ফেল্‌তেন।

তারপরে তিনি পোষাকের দিকে তাকিয়ে বল্লেন এটা কালই পাঠিয়ে দোব। "তোমার নামটী কি?"

"মন্মথ।"

"অনেক দেরী হয়ে গেচে। এখন আসি তাহলে।"

আমি নমস্কার করলুম, তিনিও একটু ঘাড় নাড়লেন।

খোকা বাবার কোল থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছিল, আমি কাছে যেতেই আমার মুখে তার কচি হাতখানি রেখে 'দে 'দে' বলে হয়ত চুমোই চাইছিল কিন্তু আমি তার গালে ছোট একটী টোকা দিয়েই বিদায় নিলুম। বিদায় কালে শিশুও যে উপন্যাসের নায়িকার মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌তে জানে এই প্রথম লক্ষ্য করে তারি বিশ্লেষণ ও গবেষণায় সেদিন গভীর রাত পর্য্যন্ত কাটিয়েছিলুম।

খোকার জামার ভেতরে কৌশলে সেফটীপিন্ দিয়ে এক টুক্‌রা চিঠি আট্‌কে দিয়েছিলুম খোকার মাকে লক্ষ্য করে লিখেছিলুম—"মা, খোকাকে খোকার দাদা এই পোষাক দিয়েচে। ফেরৎ পাঠালে তার মনে দুঃখ থাক্‌বে।' সে পোষাক ফেরৎ আসে-নি বটে, কিন্তু খোকাও আর কোনদিন তার হঠাৎ দাদার বাড়ী বেড়াতে আসে-নি। হয়ত মা খোকার জামার মতো খোকাকে পাঠাতে সাহস করেন-নি, ঐ রকম গাল নিয়ে প্রাণে প্রাণে ফিরে যাবার পর খোকার ফাঁড়া গেছে ভেবে হয়ত কালীঘাটে তিনি পূজাও মেনে থাক্‌বেন।......

আমার তরুণ বয়সে আমি দ্বিতীয়বার শিশুর প্রেমে পড়েছিলুম তার তিনচার বছর পরে হাজারিবাগে। যদিও এবার যাকে ভালো লেগেছিল তাকে শিশু বলা চলে না, কেননা তার বয়স অন্ততঃ সাত আট হবে। কিন্তু এরও ছিল ঠিক তারই মত দৃষ্টি, তারি মতো অপূর্ব্ব মিষ্টি হাসি!

সমস্তদিন কিছুই ভালো লাগ্‌ছিল না, খেলার মাঠে বেড়াতে গেলুম মাঠও মনোরম ঠেক্‌ল না, কিন্তু অকস্মাৎ ভালো লেগে গেল!

সেই ছেলেটী হিন্দুস্থানী দরোয়ানের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিল তাকে দেখেই আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

খেলা চল্‌ছিল কিন্তু খেলার দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না, হঠাৎ সেদিকে তারও মনোযোগের একান্ত অভাব দেখা গেল। আমরা দু'জনের দিকে ফিরে ফিরে চাইছিলুম, কখনো কখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলুম। পাঁড়ে গোছের লোকটী বেশ মজার মজার কথা বল্‌ছিল তাই শুনে সে হাস্‌ছিল, ভারি মিষ্টি হাসি, আমার দিকে তাকিয়ে হাস্‌ছিল।

আমিও হাসছিলুম। ঐ হাসি আর দৃষ্টির ভিতরে আমাদের পরিচয় সুরু হয়েছিল। বড়লোকের ছেলে হবে ভেবে এই প্রথম দেখাতেই, পাঁড়ের বাধাকে এড়িয়ে তার সঙ্গে মিশ্‌তে সাহস করি-নি।

আমি আর একদিন তাকে সেই মাঠে দেখেছিলুম সে ছুটোছুটি করছিল সেদিনও আলাপের অবসর ঘটে-নি! তারপর মাঠে সে আমার চোখে পড়ে-নি, একদিন এক পথ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি তারই বাড়ীর রকে সে বসে আছে। তার সঙ্গে আমার চোখ মিল্‌তেই কেন জানিনা সে হেসে ফেল্‌লে, আমিও হেসে নিজের পথে গেলুম।

তার এই হাসির অভিনন্দনটুকু সেদিন আমার সমস্ত মন আনন্দে বিধুর করে তুলেছিল। আরও বহুবার সেপথ দিয়ে চলাচলি করে আর দুবার মোটে তার দেখা পেয়েছিলুম, দুবারই সে হাসিমুখে চেয়েই ছিল। যেন তার চোখ দুটী বল্‌ছিল—

"ওগো চিনেছি তোমারে আমি চিনেছি।
তুমি মোরে ভালবাস জেনেছি॥"

আলাপ পরিচয় কিছুই ঘটে-নি, একটীও কথা হয়-নি, অথচ চোখের এই মুখর বাচালতা এমন মোহের সৃজন করেছিল যে এই মিষ্টি মোহ টুকুকে অত শীঘ্র ভেঙে দিয়ে, পারলেও, কথার পরিচয় সুরু করতে মন চায়-নি। অবশেষে হঠাৎ আমাকে দুহপ্তার জন্যে কলকাতা চলে আস্‌তে হয়, কলকাতায় এসে আমার মন ভারী উচাটন হয়ে উঠেছিল, কেন তার সঙ্গে কথা বলি-নি, কেন তার হাসি মুখে চুমু দিই-নি-এইসব ভেবে ভারী আপশোস্‌ হচ্ছিল।

হাজারিবাগে ফিরে গিয়ে তার দেখাই পাইনা, দৃঢ় সংকল্প ছিল এবার তাকে ভালোবাসব প্রাণভরে আদর করব তাকে, আমার ছোট্ট ভায়ের মতো নিয়ে বেড়াবো—এইসব অনেক কল্পনা ছিল।

মাঠেও তাকে দেখিনা, তার বাড়ীর পথে কতবার গেলাম তার একটা সাড়াও পেলুম না। বাড়ীর রকে ঠিক সেই জায়গাটীতে একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলে বসে ছিল, সে ছেলেটীর কেউ হ'তে পারে অনুমান করে গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "এই রাস্তা দিয়ে প্রায়ই যাই, সব সময়েই আপনাকে বসে থাক্‌তে দেখি।"

সে নিরুৎসাহভাবে উত্তর দিলে, "এটা আমাদের বাড়ী।"

"ও! বেশ বাড়ীতো! তা আপনার কি এরমধ্যে অসুখ হয়েছিল?"

"আমার? না! আমার ভায়ের খুব অসুখ হয়েছিল।"

"আপনার কোন্ ভাই ?" "ছোট ভাই ?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা, আপনার সঙ্গে একটী ছোট ছেলেকে প্রায়ই দেখ্‌তুম এই সাত-আট বছরের—ভারি সুন্দর ছেলেটী।

"সে কোথায় ?"

"সেই ত দামু। আমার ছোট ভাই। কাশীতে মামার বাড়ী গিয়ে তার কলেরা হয়েছিল।"

"কলেরা ? কতদিন আগে সে কাশী গেছে ?"

"এই ত দু'তিন হপ্তা হবে। কলেরা ভালো হয়েছিল।

"ভালো হয়েছে ! আঃ বাঁচলুম।"

কলেরা সারলে তার নিউমোনিয়া হয়। তাতে বাঁচবার আশা রৈল না। শেষে মরবার সময় ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল।

আমার সমস্ত শরীর শিটিয়ে উঠ্‌ল।

সে বলে চল্‌ল, ধনুষ্টঙ্কার হবার আগে পর্য্যন্ত সে দিব্যি কথা বল্‌ছিল, তার কোন্-এক মনো-দার কথা বল্‌ছিল ?

"কার কথা ?" আমি যেমন-স্বরে প্রশ্ন করেছিলুম তাতে একটু চম্‌কে গিয়ে ছেলেটী বল্‌লে, কোন্ এক মনো-দার কথা। তাকে আমরা কেউ চিনিনা কখনো নামও শুনি-নি। বাবাও বুঝতে পারলেন না কার কথা সে বল্‌ছিল।"

"মনো-দার কথা কি বল্‌ছিল।"

"হাস্‌ছিল আর বল্‌ছিল। কলকাতায় আমার দাদা আছে, মনো-দা, সে আমায় খুব ভালোবাসে। আমি তার কাছে যাবো। এই সব যা-তা আবোল তাবোল বক্‌ছিল।" সাহেব ডাক্তার শুনে বল্লেন প্রলাপ।

আমার সমস্ত দেহ-মন-আত্মা যেন জমাট্ বেঁধে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আমি চুপ্ করে ভাব্‌তে লাগলুম এ কি করে সম্ভব ? এই দামু আমার সেই শিশু প্রিয়তম যদি সত্যিও হয়, তাহলেও তার সেই জ্ঞানহীন শৈশবে দু'ঘণ্টার আদর আর বিমূঢ় বালক বয়সের কয়েকবারের চোখাচোখিতে কি আমি তার মনে এতখানি আসন পেতে পারি ? মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হঠাৎ তার কাছে বিস্মৃতির দুয়ার ঠেলে অজ্ঞাত শৈশবের দিন ফিরে এলো—কিম্বা তার শিশু হৃদয়ের মধ্যে বিরাট অথচ বিমুগ্ধ আত্মার জাগরণ সম্ভব হল। ভগবান, আত্মা ও জগত সব কিছুর ওপরেই এককালে বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়ে জ্বালাময় অশ্রুজলে আমার মনে শুধু একটী প্রশ্ন জাগ্‌ল, যদি দু'দিন আগে আমি তাকে আদর করতুম তাহলে কি ভগবান আমার বাহুপাশ থেকে তাকে কেড়ে নিতে পারতেন ?

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী।

বেড়ালের স্বর্গ

(Emile Zola)

আমার খুড়ী মা আমাকে একটা 'অ্যাঙ্গোরা' বেড়াল দিয়ে গেছেন। এর-মত নির্ব্বোধ জানোয়ার আমি আর কখনো দেখি-নি। একদিন শীতের রাতে আগুণের সম্মুখে বোসে, আমার বেড়ালটা এই কথা আমাকে বলেছিল :—

১

"আমার তখন দুইবৎসর বয়স, বেশ নাদুস-নুদুস শরীর, খুব সরস অন্তঃকরণ। এই সুকুমার বয়সে, এমন একটা জানোয়ায়ের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করতে লাগলেম—যারা গৃহস্থ জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য অবজ্ঞা করে। কিন্তু বিধাতা তোমার খুড়ীর কাছে আমাকে রেখে দেওয়ায়, আমি বিধাতার নিকট খুব কৃতজ্ঞ। ঐ ভাল মেয়ে মানুষটি আমাকে যারপরনাই ভালবাস্‌তো। থালা-বাসন রাখবার আলমারীর ভিতর, আমার একটা প্রকৃত শয়ন-কক্ষ ছিল—পালোকেব গদী ও তিন-ফের দেওয়া লেপ। খাবারও ঘরের খাবারের মত। রুটি না সুপ না,—মাংস ছাড়া আর কিছুই না—বেশ তাজা লাল মাংস! বেশ! এই বিলাসের মধ্যে থেকে আমার শুধু একটি বাসনা—একটি স্বপ্ন ছিল, সেকি? না,—খোলা জানলা দিয়ে গলে ছাদের উপর ছুটে যাওয়া। আদর আমার ভাল লাগত না, নরম শয্যায় শুয়ে আমার গা-বমি-বমি করত, আর আমার দেহের স্থূলতা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সমস্তদিন সুখে থেকে মনের মধ্যে একটা বিরক্তির ভাব এসেছিল।

একদিন জানলা থেকে গলা বের করে সম্মুখে একটা ছাদ দেখতে পেলেম। সেইখানে চারটে বেড়াল ঝগড়া করছিল—তাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, তাদের ল্যাজ উপর দিকে তোলা—ভরপুর দিনের আলোয় ছাদের নীল শ্লেটের উপর গড়াগড়ি দিচ্চে, আর মনের সুখে গালাগালি করছে। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবি-নি। এখন থেকে কতকগুলো বিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। সযত্নে বন্ধ করা ঐ জান্‌লার পিছনে যে ছাদটা আছে সেই ছাদেই প্রকৃত সুখ।

আমি পালাবার একটা ফন্দি ঠিক্ করলেম। জীবনে লাল মাংস ছাড়া আর কিছু চাই।—সেই অজানা কিছু—সেই মনের ধ্যেয় বস্তু। একদিন ওরা রান্নাঘরের জান্‌লা বন্ধ করতে গিয়েছিল। সেই জানলার ঠিক্ নীচে যে ছোট্ট একটা ছাদ ছিল সেই ছাদের উপর লাফিয়ে পড়লেম।

২

এই ছাদগুলো কি সুন্দর! ধারে ধারে বড় বড় নর্দ্দামা; তার থেকে সুমধুর গন্ধ আসছে। আমি আহ্লাদের সহিত এই সব নর্দ্দামার ভিতর দিয়ে চল্‌তে লাগলেম—এক

জায়গার একটা সুন্দর কাদায় আমার পা ডুবে গেল—এই কাদার মাধুর্য্য ও উষ্ণতা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। মনে হচ্ছিল যেন আমি মখমলের উপর দিয়ে চল্‌চি। সূর্য্যের বেশ একটা উত্তাপ গায়ে লাগছে—সেই উত্তাপে গায়ের চর্ব্বি যেন গলে পড়ছে।

এ কথা তোমার কাছে আমি গোপন করব না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছিল। আমার আনন্দের মধ্যে একটা ভয়ের ভাব ছিল। বিশেষতঃ আমার মনে পড়ে, আমি এমন ভয় পেয়েছিলুম যে আর একটু হলে আমি নীচে মেঝের উপর পড়ে যেতাম। তিনটে বেড়াল—যারা একটা বাড়ীর ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল—তারা ভীষণ ভাবে "ম্যাও ম্যাও" শব্দ করতে করতে আমার কাছে এসে পড়ল। আমি প্রায় মূর্চ্ছা যাবার মতো হয়ছি দেখে তারা আমাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ মনে ক'রে আমার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করতে লাগ্‌ল।" আমাকে বল্লে, 'শুধু মজা করবার জন্য আমরা ঐ রকম ম্যাও ম্যাও শব্দ করছিলাম।' তখন আমিও তাদের সঙ্গে "মিউ মিউ" করতে লাগলেম। সে ভারা মজার। এই আমুদে বেড়ালদের গায়ে আমার মত বিশ্রী চর্ব্বি ছিল না। এই আমুদে দলের একটা বুড়ো বেড়ালের সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'ল। সে বল্লে, 'আমায় শিক্ষা সম্পূর্ণ করে দেবে?"—আমি কৃতজ্ঞতার সহিত এ প্রস্তাবে রাজি হলেম।

খুড়ী-মার সেই আরামের শয্যা হ'তে এখন আমি কত দূরে! আমি নর্দ্দামাতেই আহারাদি করতে লাগলেম। এখানকার চিনি দেওয়া দুধ আমার এমন মিষ্টি লাগল—এ রকম আমি আর কখনও খাই-নি। এখানকার সবই ভাল—সবই সুন্দর মনে হতে লাগল। এই সময় একটা মাদী বেড়াল আমার পাশ দিয়ে গেল—মনমুগ্ধকর অপূর্ব্ব সুন্দরী!—তার মেরুদণ্ড কেমন নমনীয়! এই রকম অপূর্ব্ব সুন্দরীদের আমি কেবল স্বপ্নেই দেখেছি। আমি ও আমার তিন সঙ্গী আমরা তাকে অভিবাদন করবার জন্য, তার কাছে ছুটে গেলেম।

আমি সকলের আগে ছিলেম—দু' একটা প্রশংসার কথা সুন্দরীকে বলতে যাচ্চি এমন সময়—আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন, আমার ঘাড়ে এক কামড় দিলে। কামড় খেয়ে আমি চীৎকার করে উঠ্‌লেম।

বুড়ো বেড়ালটা আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লে;—"ফোঃ এ রকম সুন্দরী আরো ঢের মিল্‌বে।"

৩

একঘণ্টা কাল ঘোরাঘুরি করে আমায় ভয়ানক ক্ষিদে পেল।

আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেম—

"বাড়ীর ছাদের উপর খাবার কী আছে?" বন্ধু বিজ্ঞভাবে উত্তর করলেন:—

"যা পাওয়া যায় তাই।"

উত্তরটা আমায় ভাল লাগ্‌ল না। আমি খুব খোঁজাখুজি করেও কিছুই পেলেম না। শেষে দেখতে পেলেম, এক কোঠার ছাদের অধঃস্থ ঘরে, অল্পবয়স্ক এক মজুরণী মধ্যাহ্ন

ভোজনের আয়োজন কর্‌ছে। জানলার নীচে একটা টেবিলের উপর ক্ষুধা-উদ্রেককারী একটা টুক্‌টুকে 'কাটলেট্' রয়েছে। আমি সরল অন্তঃকরণে মনে মনে ভাবলেম—আমার ঠিক মনের মতন হয়েছে। আমি তখনি টেবিলের উপর লাফিয়ে পড়ে—কাটলেট্‌টা খেতে গেলেম। স্ত্রীলোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে আমার শির-দাঁড়ায় ঝাড়ু দিয়ে খুব এক ঘা বসিয়ে দিলে। আমি মুখ থেকে মাংসটা ফেলে দিয়ে দে ছুট। বুড়ো বেড়ালটা আমাকে বল্লে ;—"তোমার নিজ গাঁয়ের বাইরে যাও কেন ? টেবিলের উপর মাংস রাখা হয়, দূর থেকেই তার ঘ্রাণেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়। মাংস পেতে হলে নর্দ্দমা খুঁজতে হয়।"

"রান্নাঘরের মাংসের উপর যে বেড়ালের অধিকার নেই এ-কথা আমি কখনই বুঝতে পারি-নি। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলছিল।" বুড়ো বেড়ালটা বল্লে—"রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।" আমি হতাশ হয়ে পড়লেম। তার পর রাস্তায় নেমে জঞ্জালের ঢিবিগুলো খুঁজে দেখতে হবে। রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা! ও তো কঠোর তত্ত্বজ্ঞানীর মত বেশ শান্তভাবে আমাকে উপদেশ দিলে। কিন্তু লম্বা উপোস করতে হবে মনে করেই যে আমার মাথা ঘুরচে—আমার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে।

৪

ধীরে ধীরে রাত্রি এসে পড়ল। টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। খুব শীত করতে লাগল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল—বৃষ্টির ধারাগুলা খোঁচা-খোঁচা অন্তর্ভেদী, দম্‌কা বাতাসের যোগে যেন চাবুক মারছিল। একটা সিঁড়ি দিয়ে আমরা নামলেম। রাস্তাটা এমন বিশ্রী মনে হ'ল কি বলব! সেখানে আর রদ্দুরের তাপ নেই, রদ্দুর-লাগা গরম ছাদে গিয়ে যে একটু রোদ পোয়াবো তার জো নেই। তেলা বাঁধানো রাস্তার উপর আমার পা পিছ্‌লে যাচ্ছিল তখন আমার সেই তিন ফের দেওয়া লেপ, আমার সেই পালোকের গদি মনে পড়ল।

রাস্তায় পৌঁছিয়েই আমার বন্ধু বুড়ো বেড়াল থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তার পর সে শরীরকে কুঞ্চিত করে খুব ছোটো হয়ে, বাড়ীগুলো ঘেঁসে-ঘেঁসে ছুটে চল্‌তে লাগলো। আর আমাকে বল্লে, শীগগীর তার পিছনে পিছনে আসতে। একটা গাড়ীর দরজা সাম্‌নে পেয়ে তার ভিতর আমরা তাড়াতাড়ি ঢুকে লুকিয়ে রইলুম ও আনন্দে রোঁয়া ফুলিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগলেম। আমি জিজ্ঞাসা করলেম, আমাদের পালাবার কারণটা কি ? সে বল্লে :—

"একটা ঝুড়ি ও একটা আঁক্‌ড়া লাগানো ছড়ি হাতে একজন লোককে দেখো-নি কি ?"

"হাঁ, "দেখেছিলেম।"

"আচ্ছা! সে যদি আমাদের দেখতে পেতো, তাহলে নির্ঘাত আমাদের মাথায় সেই

"আমাদের পুড়িয়ে খেয়ে ফেল্‌তো! তাহ'লে, রাস্তাও আমাদের না? আমরা খেতে পাচ্চিনে ওরা উল্টে আমাদেরই খেয়ে ফেল্‌বে?"

যাহোক লোকেরা তাদের দরজার সম্মুখে জঞ্জাল জড়ো করে রেখেছিল। আমি হতাশ হয়ে সেই জঞ্জাল রাশি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেম। আমি দুই তিনটে মাংসহীন হাড় পেলেম—পোড়া কাঠের সঙ্গে এসে পড়েছিল। তখন আমি বুঝতে পারলেম, তাজা যকৃৎ কেমন রসালো! আমার বন্ধু বুড়ো বেড়াল মিস্ত্রীদের মতো জঞ্জালের উপর নোখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগ্‌লো। সকাল পর্য্যন্ত সে আমাকে দৌড় করিয়েছিল—ব্যস্ত না হয়ে প্রত্যেক পাকা রাজ পথে গিয়ে খোঁজাখুজি করছিলেম। প্রায় ১০ ঘণ্টা আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলেম। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। চুলোয় যাক্‌ রাস্তা! চুলোয় যাক্‌ স্বাধীনতা! তখন আমার সেই কারাগারে যেতে আমি কতই লালায়িত হলেম।

ভোরের বেলা, বুড়ো বেড়ালটা, আমার পা টান্‌ছে দেখে একটা অদ্ভুত মুখের ভঙ্গী করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে :—

"তোমার সাধ মিটেছে কি?" আমি উত্তর করলেম :—

"হাঁ।"

"তুমি কি বাড়ী যেতে চাও?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু বাড়ীটা খুঁজে যাব কেমন ক'রে?"

"আমার সঙ্গে এসো। আজ সকালে তোমার মতো মোটা বেড়ালকে দেখে, আমি ঠিক্‌ বুঝতে পারলেম, স্বাধীনতার কঠোর আনন্দ তোমাদের জন্য নয়। তোমার বাসা আমি চিনি। আমি দরজা পর্য্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দেবো।—এই কথা সে সাদাসিধে ভাবে বল্লে। যখন আমরা পৌঁছলেম, সে মনের আবেগ কিছুমাত্র প্রকাশ না করে শুধু বল্লে :—

"আসি তবে। বিদায়!" আমি বলে উঠলেম :—

"না, তা হবে না। এই রকম করে বিদায় নিলে চলবে না। আমার সঙ্গে তোমায় আস্‌তে হবে, এক শয্যা এবং এক খাদ্য মাংস আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে। আমার মনিব খুব ভালো মেয়েমানুষ…" সে আমার কথা শেষ করতে দিলে না :—

"চুপ কর। তুমি অতি নির্ব্বোধ। তোমার পালোকের গদির ভিতরে থাকলে আমি ম'রে যাব। গোলাম জাতের বেড়ালদের পক্ষে তোমার ধরণের সংসার যাত্রা ভালো। একটা কারাগারের মূল্য দিয়ে, স্বাধীন বেড়ালরা তোমার শয্যা, তোমার খাদ্য কখনই ক্রয় করবে না। বিদায়।"

সে আঁচড়-পাঁচড় কেটে আবার ছাদের উপর উঠে পড়ল। আমি দেখতে পেলেম—তার পাতলা দেহযষ্টি উদীয়মান সূর্য্যের আলোয় কাঁপছে। যখন আমি বাড়ী ঢুকলেম, তোমার খুড়ীমা আমাকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে দিলেন—অতি আনন্দের সহিত আমি সেই প্রহার সহ্য

তিনি আমাকে প্রহার করছিলেন, এখনি আবার তিনি আমাকে মাংস খেতে দেবেন, আর সেই মাংস খাবার যে কত সুখ, আমার কেবল তাই মনে হচ্ছিল।

আগুনের কাছে চার পা ছড়িয়ে দিয়ে আমার বেড়াল শেষে আমাকে এই কথা বল্লে:—"দেখুন প্রভু, যে ঘরে খাদ্য থাকে সেই ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকা আর মার খাওয়া—এই হচ্ছে প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত স্বর্গ।

আমি বেড়ালের মুখপাত্র হয়ে এই কথা বলছি।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুর্শীদ্যা গান

মুর্শীদ্যা গান—কান্নার গান। চোখের জলের বাঁধন-হারা ধারায় সিক্ত এর সুর।—গেঁয়ো কৃষকের কাঁদন ধোয়া কণ্ঠে এর স্থিতি।

কত যুগ যুগান্তরের কান্নাই না চলিয়া গিয়াছে, গ্রামের বুকের উপর দিয়া কত বেহুলার নয়ন গলান প্রেমে 'গংকুড়ের' আকাশ ছোঁয়া তরঙ্গে ভেলা ভাসাইয়া মরা পতিকে জিয়াইয়া আনিয়াছে কত 'আমীর সাধুর' বিরহী সারীন্দ্যা দূর দেশে বেলয়ার সন্ধানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুমরিয়া মরিয়াছে, গ্রাম কেবল দেখিয়াছে আর অঝোরে কাঁদিয়াছে। তার সাপলা ভরা বিলের ধারে কলসী ভরিয়া কত গ্রামের মেয়ে আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দূর দেশে পতির উদ্দেশ্যে চোখের জল ফেলিয়া গিয়াছে। গ্রাম তার সে কান্না ভুলে নাই। রাখালী, কেচ্ছা ও বারমাসীর গানে গ্রাম তা বুকে আঁকিয়া রাখিয়াছে।

এই সব গান কান্নার হইলেও ইহাতে গ্রামের তৃপ্তি হইল না, বাহিরের এই কান্নার সাধনা যেদিন তার অন্তরের ঠাকুরকে জাগাইয়া তুলিল সেদিন বাউল কবির একতারায় এক নূতন সুর বাজিয়া উঠিল—

"তুমি দাও দেখা সোণার চান আমারে—
তুমি কও কথা দয়াল চান আমারে।
তোরে না দেখিলে প্রাণ আমার—
বাঁচে নারে॥"

বাহিরের যে কান্না শুধু বারমাসী ও রাখালী গানে বাজিয়া উঠিত সেই কান্নাই সেদিন দয়ালচানকে ডাকিয়া আনিল। আর এই দয়ালচান যে গ্রামকে দেখা দিয়া কথাও কহিয়াছিল তাহা যারা একবারও কোন মুর্শীদ্যা গানে যোগ দিয়াছেন তারাই সাক্ষ্য দিবেন।

কান্নার সাধনা করিয়া গ্রাম এই গান আবিষ্কার করিয়াছে তাই কান্না এর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে বাজে। কবে যেন কোন্ গ্রামের মেয়ে তার বুক-ফাটা কান্নায় নিশীথ রাতের বুকে বেদনার ঢেউ তুলিয়া দূর দেশে তার হারান ধনকে খুঁজিতেছিল। কে যেন এক নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া সেই বেদনার সুরে 'সারীন্দ্যার' তার মিশাইয়া মুর্শীদ্যা গানের সৃষ্টি করিয়াছে।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউল কবি এ গান গাহিয়াছে আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া গ্রাম এ গান শুনিয়াছে তাই কথা এই গানে নাই, আছে শুধু সুর আর কান্না। শুধু মাঝে মাঝে এক একটী কথা আসিয়া হৃদয়কে তীরের মত বিদ্ধ করিয়া যায়।

কবে যে এ গান প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তবে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেও এ গান ছিল তাহা অনুমান করিলেও বোধ হয় নিতান্ত ভুল হইবে না। ১১৬ বৎসরের এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি, তার ছেলে বেলায় এ গান বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বিশেষ জাঁকজমকের সাথেই গাওয়া হইত। তবে সহজেই বোঝা যায় যে এ সময়েরও অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এ গান ছিল; মাণিক চাঁন্দের গানের একস্থানে আমরা পাইয়াছি—

তুমি হবু বট বৃক্ষ আমি তোমার লতা
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়ে লমু পালাইয়া যাবু কোথা।

আর একটী মুর্শীদ্যা গানে আছে—

তুমি হবা বট বিরিক্ষ আমি শিয়ালতা
চরণে জড়ায়ে রব ছাইড়ে যাবা কোথা।*

এখানে দুইটি অনুমান করা যাইতে পারে। এক হয়ত গ্রাম্য গানের প্রভাব হইতে পূর্ব্ব কবিরা মুক্ত ছিলেন না কিম্বা কবিদের পুঁথি সকল সুর করিয়া গ্রামে গাওয়া হইত। তাহারই পদ গ্রামের গানের সাথে মিশাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত ধারণাই বিশেষ সমিচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ গ্রামের অনেক প্রভাব প্রাচীন কবিদের মধ্যে দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী গ্রাম হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মুর্শীদ্যাগানকে আরও প্রাচীন বলিয়া ধরা যায়। ইহা বোধ হয় আমাদের বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন। আমাদের গ্রামের লোকেরা বহুদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিল। পরে মুসলমান ও হিন্দু হইয়া ইহাদের অনেকে বাহিরের কাঠামটী বদলাইলেও অন্তরের বৌদ্ধভাবটী ছাড়িতে পারে নাই। আর যারা হিন্দু ছিল তারাও মুসলমান হইয়া হিন্দুভাব অনেকটা বজায় রাখিয়াছে। তাই বহু মুর্শীদ্যাগানেই বুদ্ধদের মায়াবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। জগৎটা যে কিছু না, ছাড়িয়া যাইতেই যে হইবে এইরূপ অনেক মুর্শীদ্যাগান আছে। লুই সিদ্ধাইর গুরুবাদ যে মুর্শীদ্যাগানে বিশেষ করিয়া আপন অস্তিত্ব রাখিয়া গিয়াছে তাহা বোধ হয় প্রমাণ করিতে হইবে না। কারণ মুর্শীদ শব্দের অর্থ গুরু। যে গানে গুরুর প্রশংসাদি আছে তাই মুর্শীদ্যা গান। কেবল নিছক মানুষ ভজনের জন্ত আর কোন গানই আমাদের দেশে নাই। * বৌদ্ধরা যে নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রেত আনয়ন করিতেন এ বোধ হয় তাহারই একটী নিদর্শণ। কারণ এখনও অনেকে এ গান গাহিয়া গাছা আনে এবং তাহাদের উপর দেবতা আসিয়া নানারূপ কথা বলিয়া যায়।

* প্রবাসী, বঙ্গবাসী ও Dacca Reviewএ স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবু ও শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাঙ্গলার ইতিহাস বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক আজকাল এ গান আর পূর্ব্বের মত শোনা যায় না এক মুরুল্ল্যাপুর শানাল দরগায়ই এখন বিশেষ করিয়া এ গান গাওয়া হয়, এবং তিনি নিজেও বহু মুর্শীদ্যা গান রচনা করিয়াছেন। আর তাঁকে বাদ দিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে তাহা একেবারে অসম্পূর্ণ হইবে। দুঃখের বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে প্রাচীন কোন লিখিত বিবরণই পাওয়া যায় না। কারণ তাঁর শিষ্যেরা অনেকেই লেখাপড়া জানিত না, তারা যা মনে করিয়া রাখিয়াছে তার সবই অসম্ভব কাহিনীতে পূর্ণ। বহুকষ্টে তারই দুই একটা আমরা যা সংগ্রহ করিয়াছি, এখানে তাহা বিবৃত করিব। ফরিদপুর জেলার গোলডাঙ্গির একটী বৃদ্ধের নিকট এবং শানালের দৌহিত্র গৈজাদ্দি ফকীরের নিকট আমরা প্রথমে এই কাহিনীগুলি শুনি, পরে শানালের অনেক ভক্তের মুখেই এগুলি শুনিয়াছি।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুরুল্ল্যাপুর গ্রামে শানালের জন্ম হয়। ইহার প্রকৃত শুদ্ধ নাম শাহ্‌লাল। গ্রামের লোকেরা সংক্ষেপে শানাল বলিয়া থাকে। শানালের বাড়ী পদ্মানদীর তীরে। সেই সময়ে পদ্মানদীর ওপারে ঝাউমাহাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ ফকীর দাশু সিদ্ধাইর আবির্ভাব হয়। বাল্যকালে ইহার নিকট হইতেই শানালের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ছোট ডিঙ্গি বাহিয়া সন্ধ্যা বেলা ওপারে ঝাউমাহাটী গুরুর বাড়ী যাইতেন। সারা রাত্রি গুরুর কাছে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া সকালবেলা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। যেদিন যাইতে না পারিতেন সেদিন পদ্মার তীরে বসিয়া সারীন্দা বাজাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাইতেন

"ওপার আমার মুর্শীদের বাড়ী ;
এ পার বইসে কান্দি আমি রে।
বিধি যদি দিত রে পাখা,
উইড়্যা যায়া দিতাম দেখা ;
উইড়্যা পড়তাম দাশুসার পায় রে।"

এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল। ওপারে গুরুর কাছে কি কি শিখিয়াছিলেন তাহা জানিবার যো নাই। তবে প্রথম জীবনে সারীন্দা বাজাইয়া কান্নার যে সাধনা তিনি করিয়াছিলেন সেই সাধনাই তাঁকে বাংলার নিভৃত পল্লীক্রোড়ে আজ অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে একটী ঘটনা তাঁকে লোক সমাজে প্রচার করিয়া দিল। পূর্ব্বে চৈত্র মাসে বৃষ্টি না হইলে কৃষকেরা নানারূপ অনুষ্ঠান করিত।

কেহ 'সিন্নী' করিত, কেহ 'নৈল্যা' গান করিত আবার কেহ কেহ খোদার নামে নামাজ পড়িত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে এখন বৃষ্টি না নামিলে এই সব অনুষ্ঠান করা হয়। বলা বাহুল্য যে এই সময় কৃষকের মেয়েরাও নানারূপ অনুষ্ঠান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কুমারী মেয়েরাও 'বদনা বিয়ের' গান গাহিয়া 'আড়িয়া' মেঘ 'কালীয়া' মেঘকে ডাকিয়া সারাগ্রাম মুখরিত করিয়া তুলিত। সেবার যখন কিছুতেই বৃষ্টি হইল না তখন

নুরল্লাপুর হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী কৃষকেরা শানালের গুরুদাও সিদ্ধাইকে আহ্বান করিল। সারাদিন মন্ত্র তন্ত্র পড়িয়াও যখন মেঘ নামিল না, তখন অনেকে ফকীরকে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কথিত আছে ধ্যান বলে সানাল তাহা জানিতে পারিয়া ১২ ক্রোশ পথ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তার পর সীজদায় বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন। তার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ শূন্য আকাশ হইতে অবিরল বৃষ্টিতে মাঠ ঘাট ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তখন গুরুকে কাঁধে করিয়া লইয়া সানাল বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

আর একবার রাজনগরের জমিদারের একটি ঘোড়া মারা যায়। শোনা যায় সানাল সেই মরা ঘোড়াকে বাঁচাইয়া দেন। ইহাতে উক্ত জমিদার সানালের বাড়ী পাকা করিয়া দিতে চাইলে সানাল বলিয়াছিলেন, "আমার বাড়ী পাকা করিলে কি হইবে। উহা পদ্মায় পাঁচবার ভাঙ্গিবে। মৃত্যুর পর এ পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ী পদ্মায় তিনবার ভাঙ্গিয়াছে, শিষ্যদের বিশ্বাস আরও দুইবার ভাঙ্গিবে।"

বুদ্ধিমন্ত ঠাকুর নামে একজন ব্রাহ্মণ সানালের শিষ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্য হইবার কাহিনী এইরূপ।

একদিন নদীতে আহ্নিক করিয়া কোন বটগাছের তলে বসিয়া জলযোগ করিবেন এমন সময় এক মুসলমান ফকীর—আসিয়া সামনে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া অবজ্ঞা ভরে বলিলেন, "তফাত থাক। ছুঁইস্ না।" ইহাতে ফকীর মৃদুভাবে উত্তর করিলেন "বাবা! কে মুসলমান, কে হিন্দু। সবই ত সেই একজনেরই সৃষ্টি। তুমি যে নদীতে ফুল ভাসাইয়া দিলে, ফুল ত উজান বাহিয়া গেল না। দেখ আমি পূজা করি ফুল কোন্ দিকে যায়। এই বলিয়া নদীর ধারে আসিয়া খোদার নাম করিয়া একটি ফুল জলে ভাসাইয়া দিলেন। ছোট ফুলটী উজান বাহিয়া চলিতে লাগিল। ফকীরের অসীম শক্তি দেখিয়া ঠাকুর তার পায়ে পড়িয়া গেলেন। বলা বাহুল্য এই ফকীর সানাল ব্যতীত আর কেহ নহে। তিনি বুদ্ধিমন্তকে সস্নেহে উঠাইয়া নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই বুদ্ধিমন্ত সানালের একজন প্রধান শিষ্য হইয়া পড়েন। ইনি দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

এইরূপে সানালের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁর শিষ্য হইল। আমরা সানালের কোন বংশধরের নিকট শুনিয়াছি তাহাদের প্রায় এক লক্ষেরও বেশী হিন্দু শিষ্য আছে। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই নমঃশূদ্র। তবে অনেক অন্যলোকও আছে। তাহারা সানালের বংশধরদের পায়ের ধূলা মাথায় লয়, দরগার 'সিন্নী' খায়, তাহাদের মন্ত্রপড়া জল পান করে, কিন্তু তাহাতে ইহাদের জাতি যায় না।

তাঁর শিষ্যদের বিশ্বাস গুরুকে না ভজিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না! তাই তাহারা

মুর্শীদ্যা গান করে। মুর্শীদ্যা অর্থ গুরু। সে গানে গুরুর প্রশংসা ইত্যাদি থাকে তাই মুর্শীদ্যা গান। কিন্তু বাস্তব পক্ষে মুর্শীদ্যা গানে ঈশ্বর সম্বন্ধেও বহু গান পাওয়া যায়। এবং অনেকে মুর্শীদ্যা অর্থে ভগবানকেই মনে করে।

তবে সানালের নাম লইয়া ও তার শিষ্যেরা অনেক গান গাহিয়া থাকে। গানের মাঝে মাঝে তার বংশধরদের নামও লওয়া হয়।

সানালের ধর্ম্মমত জানিতে হইলে তার শিষ্যদের ধর্ম্মমত জানিবার প্রয়োজন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ মতই ইহাদের নাই। আল্লা বরকত ফতেমা শ্মশানকালী ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় হিন্দু-মুসলমানের দেব দেবীরই ইহারা ভজনা করিয়া থাকে। হিন্দুকেও আমরা মান্দার ফতেমা ও আল্লাজীর চরণ বন্দনা করিতে দেখিয়াছি আবার মুসলমানকে ও গৌর কালীর নাম লইয়া চোখের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। ফল কথা যে গানে ভাব আসে সে গানই তারা গায় তা সে গান কৃষ্ণেরই হউক আর আল্লাজীরই হউক।

এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা ভাবের উপাসক। আর এই ভাবের উপাসকই ছিলেন সানাল। লোক সভ্যতার অন্তরালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারীন্দা বাজাইয়া গ্রাম্য বাউল কবি আপন মনে মুর্শীদ্যা গান গাহিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই কান্নার গান তাঁর শিষ্যেরা আজ গাহিয়া থাকেন এবং আজ কালকার মুর্শীদ্যা গায়কের অধিকাংশই শানালের ভক্ত। তবে গণী ফকীর, কুসুম দিয়ার ফকীর ও লইমদ্দি ফকীরের শিষ্যেরাও অনেকে এই গান গাহিয়া থাকে।

ঢাকা ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার কৃষকদের মধ্যেই এই গান আজ বিশেষ ভাবে প্রচলিত. এই গান গাওয়ার প্রধান যন্ত্র সারীন্দা। লম্বা চুল-ওয়ালা ফকীরেরা সারীন্দা বাজাইয়া এই গান গাহিয়া থাকে।

প্রায় ১০৫ বৎসর জীবিত থাকিয়া সানাল দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পুত্র বেচুসা, খোদা জান ও আছিম শা ফকীর হন। ইহাদের মধ্যে বেচুসা ৮৫ বৎসর, খোদাজান ৯৫ বৎসর ও আছিম সা ৭৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

বেচুসার পুত্রদের মধ্যে বর্ত্তমানে গইজদ্দিসাই জীবিত আছেন, এবং শান'লের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহার অনেক কথাই তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি। ফেলুসা আইজদ্দিসা ও আলভফসা খোদাজানের বংশধর। আজ দুই বৎসর ফেলুসা মরিয়া গিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কাহিনী শুনা যায়। আছিম শার কোন পুত্র ছিল না। তাঁর চারি কন্যা এখন ফকীরী পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে সানালের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। এমন কি কবর হইতে তাঁহার অস্থি উঠাইয়া আনিয়া সিন্দুকে ভরিয়া পৃথক পৃথক স্থানে পুতিয়া দরগা করিয়াছেন। নদীতে বাড়ী ভাঙিলে উক্ত সিন্দুক উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র পুতিয়া রাখা হয়। এবং প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার প্রত্যেক

সেই উৎসবে লক্ষ লক্ষ শিষ্য নানারূপ উপহার সামগ্রী লইয়া দরগায় হাজত দেয় ও সারা রাত্রি জাগিয়া মুর্শীদ্যা গান করে। এই সময়ে প্রত্যেক শিষ্য আপনাপন গুরুদের মাথায় তেল দেয় ও প্রণাম করে। মাঘীপূর্ণিমার দিন শেষরাত্রে ধামাইল হয়। ধামাইল হিন্দুদের যজ্ঞের অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নহে। প্রথমে একটী চৌকণা স্থানকে ভাল করিয়া লেপিয়া রাখা হয়। ধামাইলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিষ্যেরা তার চারিদিকে বহু মোমবাতির আলো জ্বালাইয়া দেয়। ধামাইলের সময় প্রধান ফকীরেরা গলায় ফুলের মালা ও মাথায় গাঁদা ফুলের গুচ্ছ জড়াইয়া খাস দরগা হইতে সেই চৌকণা স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সম্মুখে ধামাইলের বাঁশ লইয়া শিষ্যেরা অসুরের মত পা ফেলিয়া চলিতে থাকে। শানাইয়ের সুরে সে সময় এক গম্ভীর আওয়াজ বাজিয়া উঠে। ঢাকীদের বাদ্য সে গাম্ভীর্য্যকে আরও জমাট করিয়া তুলে। বলা বাহুল্য যে ফকীরের দরগা হইতে সামান্য কিছু কাঠ প্রত্যেকেই মাথায় করিয়া লইয়া যায়। পরে সেই ধামাইলের স্থানে আসিয়া মধ্যখানে আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ধামাইলের বাঁশ লইয়া শিষ্যেরা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জনতাকে দূরে রাখে। আতপ চাউলের আটার সহিত মাংস মিলাইয়া অনেকগুলি ছোট ছোট পোঁটলা কলার পাতায় বাঁধিয়া পূর্ব্বেই পোড়ান হয়। সেইগুলি এখানে আসিয়া ভোগ দেওয়া হয়। তারপর অনেক প্রকার মন্ত্র পড়ার পর প্রধান ফকীর সেই আগুনে পা দিয়া একটি নাড়া দিয়া দিলে শিষ্যেরা ধামাইলের বাঁশ লইয়া ঐ আগুনের উপর নাচিতে থাকে। এই সময়ে সেই কলার পাতায় বাঁধা সিন্নির জন্য চারিদিক হইতে ভীষণ কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। ইহাকে সকলে লুটের সিন্নি বলে। ফকীরেরা পূর্ব্বেই ইহার বহু সংগ্রহ করিয়া রাখে। শিষ্যেরা চাহিয়া লয়। তাহাদের বিশ্বাস ইহা খাইলে রোগ ভোগ কিছুই থাকে না। এখানে এই ধামাইলের সাথে হিন্দুদের চৈত্র পূজার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চৈত্র পূজায় যেমন বেত হাতে সন্ন্যাসীরা নাচিয়া নাচিয়া সমস্ত মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া তুলে ধামাইলের মধ্যেও বাঁশ লইয়া সন্ন্যাসীরা সেইরূপ নাচিয়া থাকে। এই স্থানে ধামাইলের বাঁশ সম্বন্ধে দুটি কথা বলিতে চাই। জোড় বাঁশ না হইলে ধামাইলের বাঁশ হইবার যো নাই। সেইজন্য ছোট থাকিতেই দুটী বাঁশকে একত্রে বাঁধিয়া রাখা হয়। তারপর বড় হইলে কাটিয়া আনিয়া ধামাইলের বাঁশ তৈয়ার করা হয়। প্রত্যেক ফকীরেরই আট দশটী করিয়া বাঁশ থাকে, এবং এক একটীর নাম মান্দারের বাঁশ আলীর বাঁশ গাজীর বাঁশ আল্লার বাঁশ। ইহার ভিতর মান্দারের বাঁশই সবার চেয়ে বড় ও আল্লার বাঁশ সবার চেয়ে ছোট। উৎসবের ১৫।১৬ দিন পূর্ব্ব হইতেই শিষ্যেরা এই বাঁশ লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাউল তরকারী পয়সা কড়ী ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনে। বলা বাহুল্য যে এই সময় তাহারা বাঁশগুলিকে কখনও মাটীতে ছোঁয়ায় না। যদি রাখিতে হয় তবে চাউলের ধামার উপর রাখিয়া কোন কিছুর ঢেলান দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখে।

যাহা হোক এইরূপে ধামাইল সারা হইলে শিষ্যেরা আরও দুই একদিন থাকিয়া যে যার বাড়ী চলিয়া যায়। সানালের বাড়ী যে ধামাইল হয় তাহাতে সওয়া সের তেঁতুলের চলার

বেশী পোড়ান হয় না। কিন্তু আমরা কোন কোন স্থানে দেখিয়াছি বুকসমান আগুনের উপর ফকীরেরা বাঁশ লইয়া নাচে। দুই একখানা আগুন আমরা হাতে করিয়াও দেখিয়াছি। হাত পুড়ে নাই।

সানাল বহুদিন মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁর ভক্তেরা এখনও তাঁকে ভুলিতে পারেন নাই। সানালের শিষ্য হইয়া তাহাদের লাঞ্ছনার সীমা হয় নাই। মুসলমান মৌলবীরা তাহাদের এক-ঘরে করিয়াছে, তাহাদের জট কাটিয়া দিয়াছে। সারীন্দা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তবু তারা সানালকে ছাড়ে নাই। বুকফাটা কান্নায় তাহারা গাহিয়াছে :—

"তোরা বাজারে আইস্যারে আমার
গ্যাল জাতি কূল রে।

এই জাতি দিয়া কূল দিয়া তারা সানালের অশ্রুজলের সাধনা করিয়াছে। কত রকমেই না সানালকে তালাস করিয়াছে। অন্তরের দরদের সারীন্দা বাজাইয়া বাজাইয়া তাহাদিগকে সমাজের বা'হির করিয়া সেই চিরব্যথিতের সন্ধানে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

"চল যাইরে—আমার সানালের তালাসেরে
মন চল যাইরে।"

পথে 'হালুয়া' ভাইকে দেখিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া গাহিয়াছে।

"হাল বাও হালুয়া বাইরে হাতে গোঠার নড়ি
এই পথ দ্যা নি দেখছাও যাইতে
আমার সানাল চান বেপারীরে।"

হাতে সোণার ডুরী 'হালুয়া' ভাইকে দেখিয়া এই একই গান তারা গাহিয়াছে। তাহারা উত্তর দিয়াছে—

"দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমার সানাল চান বেপারী—
ও তার হাতে আশা বোগলে কোরাণ
গলায় ফুলের মালারে।"

কি যাদুই সানাল জানিতেন। যার বলে কঠোর সমাজশাসন উপেক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান আজ সানালের নাম লইয়া আপনাদের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে। এ ভক্তি দেবতায় নহে, ভগবানে নহে কিম্বা সম্মানিত কোন বিদ্বানের জন্যও নহে। সহর হইতে অনেক দূরে মূর্খ বাঙ্গাল এক বাউল কবির জন্য। যার সম্বলের মধ্যে ছিল এক চোখের জল আর কয়েকটী মুর্শীদ্যা গান। হয়ত সানালের জীবনের মহত্ত্ব ছিল; হয়ত অনেক অশ্রুজলের ইতিহাসই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন নিজের জীবনটী দিয়া, সে সব না জানা আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য হইলেও তার ভিতর দিয়া আমরা এমনই একজন মহাপুরুষের দেখা পাই, যিনি গড়িয়া উঠিয়াছেন আমাদেরই দেশের মূর্খ গেঁয়ো কৃষকের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া তাদের

সহজ সুন্দর কবিত্বের কনকাসনে। তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত খুঁটীনাটী ঘটনাগুলিকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া বাংলার পল্লীজীবনের যে এক বিরহী হৃদয়ের ছবি তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন তাঁর মুর্শীদ্যা গানের ভিতর দিয়া তাহা চিরদিন থাকিয়া যাইবে।

গ্রামে কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলেই গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া মুর্শীদ্যা গানের বৈঠক দেয়। প্রথমে একখানা ঘরকে আলাদা মাটী দিয়া লেপা হয়, সে দিন কেহ মাছ মাংস খায় না। সন্ধ্যার পর সেই ঘরে ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া সকলে কুণ্ডলী করিয়া বসিয়া গান আরম্ভ করে। শীতকাল ব্যতীত, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বাহিরে উঠানেই গান হয়। গানের সময় নারিকেলের ছোবড়া পোড়াইয়া আগুন করিয়া সকলে তামাক খায়। ঘসীর আগুনে কেহ তামাক খায় না। সে প্রধান ফকীর, তাহার সামনে একখানা কুলা রাখা হয়। কুলাটী ধান দূর্ব্বা ও সিঁদুর দিয়া রঞ্জিত করা হয়। তার কাছে ধূপের সরা থাকে, এবং পার্শ্বে সন্দেশ বাতাসা এবং সিন্নী রাখা হয়।

প্রথমে একটী বন্দনা গাওয়া হয়। এই গানে বহু দেব দেবতার নাম করা হইয়া থাকে। সারীন্দা বাজাইয়া বাজাইয়া গ্রাম্য ফকীর গানের পর গান গাহিয়া যায়। গানের সাথে সাথে ধারার পর ধারায় তার বুক ভাসিয়া যায়। তারপর সর্ব্ব অঙ্গে পুলক দেখা দেয়। শরীর ঘর্ম্মাক্ত হয় ও কদলী পত্রের মত কাঁপিতে থাকে। শেষে আর সারিন্দা বাজাইতে পারে না। একটী পদই বার বার গাহিতে থাকে। তারপর গাহিবারও আর শক্তি থাকে না কেবল কাঁপিতে থাকে ও মুখ দিয়া ফেণ দেখা দেয়। বলা বাহুল্য যে এই সময় অনেকেরই এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। কেহ হয়ত কাহারও গলা জড়াইয়া ধরিয়া অবিরল রোদন করিতে থাকে। এই সময় এক একজনের উপর গাছা আসিতে থাকে। গাছা আসা মানে কোন দেব দেবী একজনের উপর আবির্ভাব হইয়া নানারূপ কথা কহিতে থাকে। কাহার উপর কালী আবির্ভূত হন, আবার কারও উপর মান্দার আবির্ভূত হন। গ্রাম্য লোকেরা তাহাদের কাছে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। গাছা তাহার যথাযথ উত্তর দেয়। কিছুক্ষণ পরে গাছা ছাড়িয়া গেলে লোকটী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অনেকের দাঁত লাগিয়া যায়। তেল জল দিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করা হয়।

এখানে আমরা যেরূপ বর্ণনা করিলাম সব থানেই যে গাছা এরূপভাবেই আসে তাহা নহে। অনেক স্থানে গানে একটু ভাব হইলেই 'চালানের' মন্ত্র পড়িয়া 'গাছা' আনা হয়। কোন কোন স্থানে কয়েকটী গান গাহিয়া তারপর 'জেকের' করিয়া গাছা আনা হয়। 'জেকের' হিন্দুদের নাম সংকীর্ত্তনেরই অনুরূপ। তবে মুসলমানী জেকের দুই ভাগে বিভক্ত। বহিরঙ্গ জেকের—যা বাহিরে মুখে উচ্চারণ করিয়া গাওয়া হয়—আর অন্তরঙ্গ জেকের যা দেহের আঠার মোকামে গুরুর উপদেশ অনুসারে উচ্চারণ করিতে অভ্যাস করা হয়।

তবে মুর্শীদ্যা গানে বহিরঙ্গ জেকেরই করা হয়। ইহার দুই একটির সুর এমনই যে ১০ ১৫ মিনিট গাহিলেই গা কাঁপিয়া উঠে।

এখানে একটীর নমুনা দেওয়া গেল—

"পহেলা অ ল্লা দুয়ামে মত্তলা
তিয়ামে মহম্মদ
চৌঠাতে হজরত আলী—
পঞ্চমে বরকত মারে—
হরদমে আল্লার নাম।"

এই বিংশ শতাব্দীতে কেহ হয়ত এই 'গাছা' আসা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু ইহা যে মিথ্যা জাল তাহা ত মনে হয় না। কারণ ভগবানের নামে এমন করিয়া যাহারা কাঁদিতে পারে তারা যে মিথ্যা একটা অভিনয় করিবে তাহা ত মনে করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর যে জিনিষটা এতদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহার ভিতর যে সত্য আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে।

মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিলে এইরূপ অবস্থা অনেকের দেখা যায়। গৌরাঙ্গদেবের জীবনেও আমরা এইরূপ ভাব দেখিয়াছি। একবার শ্রীবাসের বাড়ীতে ভাবের আবেশে বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিয়া ভক্তদের নানারূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব ও এইরূপ ভাবে বিভোর হইয়া নানারূপ কথা বলিতেন। এমন কি হজরৎ মহম্মদও এইরূপ মহাভাব সমাহিত হইয়া কোরাণের আয়াত সকল বলিয়া যাইতেন। শিষ্যেরা লিখিয়া লইতেন। এইরূপেই মহাগ্রন্থ কোরাণসরীফের সৃষ্টি হইল।

ইহা সেই ধর্ম্মজীবনের উন্নত অবস্থা কিম্বা প্রেত আনিবার পন্থা তাহা বলিতে পারি না। অমৃতবাজারের শিশিরবাবুরা এইরূপে সাত্বিকভাবে কীর্ত্তন করিয়া প্রেত আনয়ণ করিতেন। প্রেততত্ব বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা এ বিষয়টী অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন।

বহু ফকীর সারীন্দা বাজাইয়া মুর্শীদ্দ্যা গান গাহিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাতে নাকি অনেকের রোগ সারেও। এক ফকীর ছাড়া বৈঠক ভিন্ন প্রায়ই লোকে মুর্শীদ্দ্যা গান গাহে না। আর বৈঠকেও যে দিন ভাব হয় না সে দিন গান গাহিতে পারে না। মুর্শীদ্দ্যা গানের এই একটা বিশেষত্ব যে অন্তর কাঁদিয়া না উঠিলে এই গান কেহ গাহিতে পারে না। পূর্ব্বে আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে অনেকে গাছা আসার নামে ভণ্ডাও করে। তাহা অতি সহজেই ধরিতে পারা যায়। কারণ সত্যিকার গাছা দেখিলেই চেনা যায়।

চট্টগ্রাম ব্যতীত পূর্ব্ব বঙ্গের প্রায় গ্রামেই মুর্শীদ্দ্যা গানের ফকীর দেখা যায়। এ গানের কে রচয়িতা তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ প্রায় গ্রাম্য গানের শেষেই একটা ভনিতা থাকে কিন্তু কোন মুর্শীদ্দ্যা গানেই ভনিতা পাওয়া যায় না। মেয়েরাও যে কেহ কেহ এ গান রচনা করিয়াছেন তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি, কারণ মেয়েদের বিবাহের

অনেক গানের সুর আমরা মুর্শীদ্যা গানে পাই এবং অনেক স্ত্রীলোক এই গান গাহিয়া থাকে।

"আমি জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরি, আওল্যা কেশ নাহি বান্দি হে
আমি তোরো জন্তে হৈলাম পাগলিনীরে।"

প্রভৃতি পদ পড়িয়া মনে হয় এই সব গান মেয়েদের রচিত।

এই গানের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা নিখুঁত পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বিরচিত। পূর্ব্ব বাঙ্গলার কথা এমন মিষ্টভাবে আর কোন গানেই সংযোজিত হয় নাই। ইহার কোন পদ সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করিলে আর ইহার লালিত্য থাকে না। যেমন,—

"তুমি আমারে বারায়্যা গ্যালারে কানাই
রাখাল ভাবে।"

এই গানটী গাহিবার সময় গায়ক আমারে বারায়্যা বলিয়া যে একটী টান দেয় তাহা অন্য কোন কথায়ই হইবার যো নাই। কিম্বা

"আমার দোরদীর টুন কইও খবর
আমার তালাস য্যানরে লয়।"

এখানে দোরদীর টুন কথাটী যেমন মিষ্টি শোনা যায় দোরদীর কাছে বলিলে তেমন শুনাইবে না।

অথবা, "আমি বায়্যা যায়্যা কোন্ ঘাটে
ভিড়াব নৌকাখান।"

প্রভৃতি পদগুলি কেমন মিষ্টি। এইখানে আমাদের একটী কথা মনে হয় যে কলিকাতার ভাষা যেমন এক রকমের ভাব প্রকাশের সহজ পন্থা, সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায়ও এক প্রকারের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, যাহা অন্য কোন ভাষায়ই হইবার জো নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বাউল কবির গান যাঁরা অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁরাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, "কেচ্ছা, রাখালী, বারমাসী ও মেয়েদের বিয়ের গান হইতে মুর্শীদ্যা গানের ক্রম পরিণতি হইয়াছে। যেমন 'মাধবের' গান ছিল।

"হাল বাও হালুয়া বাইরে
হাতে সোনার নড়ি
মাধবেরে সারাইতে পারলে
দিব টাকা কড়ি রে
প্রাণের মাধব গাতল।"

অনেকগুলি মুর্শীদ্যা গানে পাওয়া যায়—

"হালবাও হালুয়া বাইরে হাতে সোনার নড়ি
এই পথখানি যাইতে দেখছাও আমার সানাল চান বেচারী।"

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ফল কথা মুর্শীদ্যা গান গ্রামের সকল গান ছানিয়া অমৃতের খনি। সুর ও কান্না এই গানের সব। এই সুরও কান্না বাদ দিয়া শুধু কথা প্রকাশের সঙ্কোচ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তবে এক আশা এই সব কথা শুনিয়া যদি কেহ এই গানের সুর শিখিতে চান। কারণ আমাদের গ্রাম্য গানগুলি এখন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীনকালে অনেক সুন্দর সুন্দর সুর ছিল এখন তাহা প্রায়ই কেহ জানে না।

মাঝির গান

পূর্ব্ব বাঙ্গলা নদীর দেশ। ভাটির পানে নাও ভাসাইয়া পরাণ-দোরদীকে ডাকিয়া কত নায়ের মাঝির বুক ফাটিয়া গিয়াছে। তাদের সেই কান্নার মধ্যেই ভাটির মায়ায় ঘের উদাসী ভাটিয়াল সুরমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। পরে মুর্শীদ্যা গানে এই সুর স্থান পাইয়াছে, কিন্তু মাঝিরাও এ গান গাহিয়া থাকে। মুর্শীদ্যার বৈঠকে এই সব গানের বিশেষ আদর।

(১)

"ঘাটে লাগাও রে নাও
আমি চিনে লই বেপারীরে
নাও ঘাটে লাগাও রে।
কাল হেন মাঝি হারে বিটা নৌকা বায়্যারে যায়
(১)মরণকাষ্ঠ ধইর্য্যারে কান্দে, ও সাধু তোমার বাপ মায় রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।
আগা নৌকায় ঝামুর হারে ঝুমুর পাছা নৌকায় রে (২) দুয়া
তারি মদ্দি বইস্যারে আছে মনুয়ারে (৩) তনু হেলান দিয়া রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।
নায়ের কাটা নৈলাম কাছিরে নইলাম আরও নৈলামরে গুণ
জনম ভইরে টাইনেরে মইলাম আমি না পাইলাম তার কূল রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।
এই না লৌকার, আগা বায়্যা ওঠে ঢেউরে পাছা বায়ারে যায়
মরণ কাষ্ঠ ধইরে রে মোনাই-ও মোনাই কান্দে হায় হায় রে
নাও ঘাটে লাগাও রে।"

গায়ক—রহিম মল্লিক।
বয়স ৪০, গ্রাম গোবিন্দপুর, জেলা ফরিদপুর।

১। মরণ কাষ্ঠ—বোধ হয় মাথা কাঠ   ২। দুয়া—দুই   ৩। মনুয়া—মন

(২)

"আমার হ'য়্যা জন্ম বৃথা গ্যাল ভাই
নাও আন রে
নাও আনরে বাই—না—ও আন রে।
ঘাটে বান্ধা আছে রে নাও গুরা সমান পাণি
আমি নিশ্চয় জাইন্যাছি এই নাও ছুইট্যাছে গহিনীরে (১)
বাই নাও আন রে।
(২) গুরুজীর বানাইন্যা নাও শগুণ কাণ্ডারী
বনের শৃগাল বলে আমি এই লোকার বেপারী রে
বাই নাও আন রে।"

গায়ক—বেয়াজদ্দি
বয়স ৩০, খাবাসপুর, ফরিদপুর।

(৩)

"ধীরে ধীরে বাইওরে লোকা
দয়াল চানরে ধরি রাঙা পায়।
আমি কি অপরাধ কইর‍্যাছি
শান'ল চানরে তোমার রাঙা পায়।
লাভ করিবার আইস্যারে তবে আমি
খালি হস্তে যাই।
মহাজনের ভরা নাও আমি
ডুবাইয়া দেই।"

গায়ক—গণী মোল্লা।

(৪)

"ও সোনারমুরসীদ
জানলে তোর বাজা লোকায় চ'ড়তাম না।
লোকার গোলই বাজা, তলী চেরা গাব গাহিনী (৩) মানে না ;"

১। গহিণী—গভীর জলে, এখানে বিপদে। ২। গুরুজী—যে সুন্দর নাও আমাকে দিয়াছিল আজ অনেক পাপে সেই নৌকাকে আমি কলুষিত করিয়াছি। তাই বনের যে তুচ্ছ শৃগাল সেও এই নায় বেপারী হইতে চায়।

৩। গাব গাহিনী—প্রতি বৎসর নৌকা পরিস্কার করিয়া গাব দিয়া তবে ঘ্যাস্ দিতে হয়। ঘ্যাস্—কয়লার গুঁড়ো গাবের আঠা দিয়া নৌকার জোড়ায় জোয়ার দিতে হয়।

সহজে খাটাও বাদাম চাঁচড়ে (১) যেন ঠেকে না ॥
নয়্যা নাও গড়াইলে রে মোনা 'ব্যাপার' ক'রল্যা না
ভাবতে ভাব্‌তে হৈলাম সারা কূল কিনারা পাইলাম না ॥

গায়ক—কোরমান্‌ ফকীর।

(৫)

উমুর ঝুমুর বাজে নাও আমার
নিহাইল্যা বাতাসেরে মুরসীদ
রইলাম তোর আশে
পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘ রে স্তাওয়ায় দিল রে ডাক
আমার ছিড়িল হাইলির পানস (২) নৌকায় খাইল পাক(৩) রে
মুরসীদ রইলাম তোর আশে
আগা বায়া ওঠে ঢেউরে পাছা বায়্যারে যায়
আমার হিরালাল মানিকিকর বারা, সোতে (৪) বাইয়্যা যায় রে
মুরসীদ রইলাম তোর আশে।

জসীম উদ্দীন।

১। চাঁচড়—নদীতে যেখানে অল্প জলের তলেই বালুর চর থাকে সেখানকার স্রোতকে চাঁচড়ের ধার বলে।

২। পান্‌স—হালের দড়ী। ৩। পাক—ঘূর্ণী। ৪। সোতে—স্রোতে।

অনুক্রম

২৫

একমাস কাল কাশীবাস করিয়া অনুপম অধীর হইয়া উঠিল। তাহার অধীরতা মণির দৃষ্টি এড়াইল না। সে সাবধান হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। একদিন সকালবেলায় মণি দেখিল যে, ফণি তখনও আসিয়া পৌছায় নাই আর অনুপম উপরের তলায় জোরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া মণি মনে মনে দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল,—"নেড়া-দা' বাড়ীর জন্যে মন কেমন কচ্ছে বুঝি?" অনুপম ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাড়ী যাবার কথাই ভাবছিলুম মণি, তুমি কেমন করে জানতে পারলে?" মণি একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার মনটা এতই সরল নেড়া-দা, যে তুমি কথা না কইলেও তোমার ভাব বুঝতে কারো বিলম্ব হয় না।" "বাড়ীই যাব মনে কচ্ছি কিন্তু তোমার জন্যে যেতে পাচ্ছিনে।"

"আমায় ছেড়ে যেতে পাচ্ছ না ?" "হাঁ, তোমায় না নিয়ে যাব না মণি। তুমি চলে এসেছ বলেই আমি কাশীতে এসেছি।"

অনুপম কি জন্য কাশী আসিয়াছিল তাহা সে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও মণি অনেকদিন পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছিল কিন্তু এখন সে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলায় মণি একটু ভয় পাইল। সে বলিল, "তোমার কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়েছিল ত নেড়া-দা ?" "ঘুম অনেকদিন হচ্ছে না মণি, মনের কথাটা অনেকদিন ধরে তোমায় খুলে বল্‌ব বল্‌ব মনে করে বল্‌তে পারি-নি। আজ কেউ নেই বলে', বলে ফেল্লুম, মণি আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না, তুমি আমার বিশ্ব-সংসার, আমি তোমার জন্যে পাগল হয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছি।

অনুপম যদিও কাতরভাবে কথা কয়টী বলিয়াছিল তথাপি মণি চটিয়া গেল। তাহার মুখখানা রাগে লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "নেড়া-দা, আপনাকে দাদা বলে ডাকি। আমার আপনার ভাই নেই, সেইজন্যে আপনাকে, ধীরু-দাকে আর হারু-দাকে মায়ের পেটের ভায়ের চাইতে ভালবাসি, আপনার এ কি রকম ব্যবহার ?" অনুপম কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিল, "ব্যবহার কিছুমাত্র দোষের নয় মণি,—আমার ব্যবহার পুরুষের যোগ্য ব্যবহার। যেদিন থেকে তোমায় প্রথম দেখেছি সেইদিন থেকেই তোমাকে ভালবেসেছি। প্রথমে বুঝতে পারি নেই মণি যে, তুমি আমার নয়নের তারা। পরে বুঝতে পেরেও তা মুখ ফুটে বল্‌তে পারি-নি। যেদিন তুমি দার্জ্জিলিঙ্গ ছেড়ে চলে এলে, সেদিন আমার চোখে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল, তারপর পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে পড়লুম। কাশীতে এসে তোমাকে পেয়ে এতদিন শান্ত ছিলুম।" মণি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, "নেড়া-দা, আপনি জানেন যে, আমি আর একজনের স্ত্রী।" "জানি মণি, স্বামীর সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্পর্ক তাও জানি, তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছেন ভগবান তাও আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। হিন্দুর সমাজে তুমি সে হতভাগার স্ত্রী হতে পার। কিন্তু ভগবানের কাছে সে তোমার কেউ নয়। ভগবানের চোখে তুমি আমার স্ত্রী, কারণ প্রথম থেকে আমি তোমাকে ভালবেসেছি। আমার যতদুর শক্তি তত দুর চেষ্টা করে তোমার পায়ে কাঁটাটি পর্য্যন্ত বিঁধতে দিই-নি, চল মণি, আমার সঙ্গে চল, আমি খৃষ্টান হয়ে তোমায় বিয়ে করব। তোমার প্রতি হিন্দুসমাজের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি কখনও সহ্য করব না। আর তুমি ভিন্ন আমার জগৎ অন্ধকার মণি, তুমি আমার দুনিয়া আলো করে থাকবে চল।" মণি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "নেড়া-দা, আপনি আমাকে ভালবাসেন তা আমি জানি কিন্তু সে ভালবাসাটা আমার চোখের নেশা বলেই বোধ হয়, বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হলে এ নেশাটা কেটে যাবে। আপনি বাড়ী ফিরে যান। জেনে রাখবেন যে, সকল স্ত্রীলোক সমান হয় না, স্বামী পরিত্যাগ করলেই আর একজন পুরুষকে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে না। আমার স্বামী যাই হউন, তিনি আমার স্বামী ; আর এ যাত্রায় তিনিই আমার স্বামী থাকবেন।"

মণির কথা শুনিয়া হঠাৎ অনুপম স্থির হইয়া গেল, তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। সে

মনটাকে শক্ত করিয়া শরীর নিজের বশে আনিল, অনেকক্ষণ মণির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, "মণি, আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না।" হঠাৎ মণির চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে ধরা গলায় বলিয়া উঠিল, "তবে তুমি আমাকে এ আশ্রয় ছাড়া করবে নেড়া-দা' ?" অনুপম সেই রকম স্থিরভাবে বলিল, "তুমি যেথানেই যাবে আমাকে সেইখানেই যেতে হবে মণি।" "তা পারবে না। এখনও বলছি দেশে ফিরে যাও নেড়া-দা।" অনুপম কোন কথা না কহিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। মণি সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

অনুপমের কথা শুনিয়া মণির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, মামার আশ্রয়ে আসিয়া সে কতকটা শান্ত হইয়াছিল কিন্তু এখন সে বুঝিল যে, তাহাকে সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল, সে ভাবিতে লাগিল—ভগবান কি সত্য সত্যই আছেন, যদি তিনি থাকেন তাহা হইলে যে দুর্ব্বল যে শক্তিহীন তাহাকে তিনি সবলের হাতে এমন করিয়া পীড়িত হইতে দেন কেন ? দুর্ব্বলের কি আশ্রয় নাই ? সবলের অত্যাচারের কি কোন প্রতিবিধান নাই ? তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ তাহার রূপের জন্ত তাহাকে অধিকার করিতে চাহে কেন, ভাবিতে ভাবিতে চোখের জলে মণি অন্ধ হইয়া গেল। সে কোথায় যাইবে ? মাতুলের আশ্রয় ছাড়িয়া আবার কোথায় আশ্রয় পাইবে, তাহা সে ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ পরে সে মনে মনে স্থির করিল যে, তাহাকে কাশী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। কোনও দূর দেশে যেখানে তাহার স্বামী অথবা অনুপম তাহার সন্ধান পাইবে না, সেইস্থানে তাহাকে নূতন আশ্রয় খুঁজিতে হইবে।

অকস্মাৎ তারাপদ বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। তারাপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মণি, তুই অমন করে ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন রে ? কি হে ফণি, তুমি কখন এলে ? ভেতরে না এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে ?" মানসিক যন্ত্রণায় মণি ফণির অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, সে তারাপদ বাবুর কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। ফণির লোলুপ দৃষ্টি হয়ত অনেকক্ষণ তাহার অনাবৃত দেহকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে এই কথা ভাবিয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় সে মরমে মরিয়া গেল। সে তারাপদবাবুর কথার উত্তর না দিয়া সর্ব্বাঙ্গের বসন সংযত করিয়া অনুপমের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মণি দেখিল যে, অনুপম বালিশের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে এবং তাহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। মণি যখন বুঝিল যে, ফণি তারাপদ বাবুর সহিত তাহার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াছে তখন সে আস্তে আস্তে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল।

সেই রাত্রিতেই মণি তাহার সামান্য সম্বলের ভরসায় এক বস্ত্রে নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইল। ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারকেশ্বরে পূজা দেওয়া

একখানি চটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিকে দেশবন্ধুর সাকার উপাসনাকে ঠাট্টা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ কাহারো উপাসনার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করা অভদ্রতা, দ্বিতীয়তঃ তাহা ছিব্‌লে ভাষায় ব্যক্ত করা একান্ত অশোভন। এরূপ ছিব্‌লেমির সাহিত্য-পংক্তিতে স্থান পাওয়া উচিত হয় নাই। বিষয়টির গুরুত্বে দেশবন্ধুর প্রতি ভণ্ডামির অভিযোগটা ভিত্তিমূলক কি না তাহা অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দেখা যাক্।

সাধুভাষায় গুপ্তনাম লেখকের বক্তব্য এই—"একটা কথা বিশ্বাস হইতেছে না। শুনিলাম তিনি তারকেশ্বরে পূজা দিয়াছেন। ছেলে বয়স হইতে প্রবীণ অবস্থা পর্য্যন্ত একেশ্বর এবং নিরাকারে বিশ্বাসী থাকিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া তিনি পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেন ইহা ভাবিবার কথা।"

ভাবিবার কথা সত্য, কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কথা নয়। লেখক যদি সাধারণ ব্রাহ্ম-পরিবার ভুক্ত হন,—পত্রিকার মুদ্রালয় ও কার্য্যালয়ের ঠিকানা দেখিয়া যাহা অনুমিত হয়—তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অনুধাবন করিলে জানিতে পারিবেন, ৺শ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু সংখ্যক ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্ম পর্য্যায়ভুক্ত ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী "পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মে" পুনর্বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বোধ হয় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য নহেন, কিন্তু তিনিও আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্ম-সামাজীর তালিকা হইতে নিজের নাম খারিজ করিয়া লইয়াছেন, নিজেকে সাকারবাদী বৈষ্ণব বলিয়া জগৎকে জানিতে দিয়াছেন, তাঁহার পুত্রকন্যার বিবাহাদি অনুষ্ঠান পৌত্তলিক হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি "ছেলেবেলা হইতে প্রবীণ বয়স পর্য্যন্ত একেশ্বর এবং নিরাকারে বিশ্বাসী থাকিয়া হঠাৎ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বাসী হইয়াছেন, এ কথা সত্য নহে। যদিবা তাহাই হইত তাহা হইলেও তার দরুণ আক্রোশের পাত্র কেন হইবেন? হঠাৎ—একদিনে, একরাত্রে, একমুহূর্ত্তে লোকের মনের ও হৃদয়ের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়—তাহা জগতের ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। পূজ্যপাদ মাতামহ মহাশয়— স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তমা দিদি মা'র শবদাহ দর্শনে একদিনে অন্তরে বৈরাগী হইয়া গেলেন এবং ঐশ্বর্য্যের ভোগবিলাস আর তাঁর চিত্তের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিল না। মন্তুপ ইয়ারবৃন্দে পরিবৃত পাকপাড়ার লালাবাবুর বৈঠকখানার পাশ দিয়া চলৎ পথিকের এক লাইন গান শুনিয়া—"বেলা যে গেল"—মোহভঙ্গে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, আর গৃহে ফিরিলেন না। লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ রূপসী অভিনেত্রী অকস্মাৎ বৈরাগিনী হইয়া কুষ্ঠরোগীদের সেবার্থে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

এককালে "একেশ্বর এবং নিরাকারে বিশ্বাসী" হইয়া পরে কখনও পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী কেমন করিয়া হওয়া যাইতে পারে তাহা ভাবিবার কথা বটে। ব্যক্তি নিরপেক্ষ হইয়া তাহাই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাক্।

'পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম, কথাটার মানে কি? মৃণ্ময়, প্রস্তরময়, ধাতুময় বা চিত্রলিখিত মূর্ত্তির প্রতি দেবতা বিশ্বাসে যে ভক্তি তাহাই বোধ হয়। বাইবেলের ইহুদিজাতির ধর্ম্মনায়কেরাও ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ইহুদিদের অন্যতম প্রফেট্ ডেভিড্ মূর্ত্তি পূজকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"Their idols are silver and gold, the work of man's hands.

They have mouths, but they speak not : eyes have they, but they see not :

They have ears, but they hear not : neither is there any breath in their mouths : noses have they, but they smell not :

They have hands, but they handle not : neither speak they through their throat."

"উহাদের প্রতিমারা সোনারূপার, মানুষের হাতে গড়া। উহাদের মুখ আছে, কথা কয় না; চোখ আছে, দেখে না; উহাদের কাণ আছে, শোনে না; উহাদের শ্বাসও নাই; নাক আছে, সোঁকে না; হাত আছে, গ্রহণ করে না; না তাদের কণ্ঠে ভাষা বাহির হয়।" এই ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীন, নির্জীব, জড় ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাসী তার পূজা দেওয়ায় আপত্তিকারী কারা? না যাদের ঈশ্বর মনুষ্যকল্প শরীরবান্, ইন্দ্রিয়বান্ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিযুত; যিনি হস্তপদমুখবিশিষ্ট; যিনি চলেন ফেরেন, যিনি মানুষের প্রত্যক্ষগম্য, যিনি ইহুদিবংশের আদিপিতা ইব্রাহিমের সঙ্গে "প্যাক্ট" করিয়াছিলেন, যিনি মূসাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁর সহিত কথা কহিয়াছিলেন, যিনি ইহুদিদের জাতীয় সৈন্যের সেনানায়ক হইয়া অগ্রে অগ্রে গিয়াছিলেন, যাঁর বাসধাম জায়ন পর্ব্বত। ডেভিড বলিতেছেন—"মূর্ত্তিপূজকেরা যদি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের ঈশ্বর থাকেন, কোথায়,'—আমরা জানাইয়া দিব—"তিনি স্বর্গে থাকেন, জায়ন নামক পর্ব্বতের উপরে এবং সেখান হইতে যথেচ্ছা গমনাগমন করেন, যা ইচ্ছা হয় করেন।"

যে জাতির গুরুরা বা মহাপুরুষেরা একের পর এক ঈশ্বরের ইন্দ্রিয়গোচরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের উপকারের জন্য ঈশ্বর তাঁহার উচ্চালয় হইতে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে জাতি আপত্তি করিতে পারে মানুষের হাতে গড়া নিশ্চল নির্ব্বাক মূর্ত্তিগুলিকে কেন পূজা দেওয়া হইবে—পূজা দেওয়া হউক তাঁহার উদ্দেশ্যে, বলিদান দেওয়া হউক তাঁহার উদ্দেশ্যে যিনি জায়ন পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

খাঁটি হিন্দু যাঁরা বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে ঈশ্বরের বসতি বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁদের

পূর্ব্বপুরুষদের নিকট বৈকুণ্ঠ বা কৈলাস হইতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বারবার অবতীর্ণ হইয়া দর্শন দিয়াছেন, কথা কহিয়াছেন, বর দান করিয়াছেন, অবতার-রূপ ধারণ করিয়া তাঁদের শত্রুদলন করিয়াছেন, তাঁহারা আপত্তি করিলেও করিতে পারিতেন ; বাইবেলেরই সম্মানক খৃষ্ট-মিসনারিদের মত বলিতে পারিতেন—যে সকল মূর্ত্তির চোখ থাকিলেও দর্শন শক্তি নাই, কর্ণ থাকিলেও শ্রবণ শক্তি নাই, হাত থাকিলেও গ্রহণ শক্তি নাই, পা থাকিলেও যাঁহারা চলে না, মুখ থাকিলেও বলে না. নাক থাকিলেও শ্বাস লয় না—তাহাদের কেন পূজা দেওয়া ? তাঁহারা যে আপত্তি করেন না, তাহার অন্য কারণ আছে ; তাহা পরে আলোচনা করিব।

খাঁটি হিন্দু ও খাঁটি ইসাই আসলে এক পংক্তির পূজারী, উভয়েই সাকার পূজক—দেশভেদে ও ভাষাভেদে ইহুদির ঈশ্বরের নাম জিহোবা বা জানা এবং তাঁর চির বাসভূমির নাম জায়ন—হিন্দুর ঈশ্বরের নাম শিব বা বিষ্ণু এবং তাঁর অমর ধামের নাম কৈলাস বা বৈকুণ্ঠ।

কিন্তু বিশেষ বিশেষ সাধক বা মহাপুরুষের নিকটই কেবল ইহুদিদের ঈশ্বর সশরীরে আবির্ভূত হইতেন, সর্ব্ব সাধারণের নিকট নহে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তিনি তেমনই অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য যেমন তোমার আমার পক্ষে। সমগ্র হিন্দুজাতির ঈশ্বর-দর্শন সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। পুরাণে, ইতিহাসে কথা-কাহিনীতে পাওয়া যায়, কোন কোন সাধকের সম্মুখে তিনি শরীরী হইয়া আবির্ভূত হইতেন, বাকী সকলের পক্ষে তিনি অদৃশ্য, অনুমেয়,—এইখানেই হিন্দু-তত্ত্বদর্শী ও ইসাই-তত্ত্বদর্শীদের সাকার উপাসনার ভেদ। হিন্দুদের সাকারত্ব ব্যাপক, ইসাইদের সাকারত্ব পরিচ্ছিন্ন। ঈশ্বর বৈকুণ্ঠবাসী হইলেও, হিন্দুরা জানিতেন তিনি সমস্ত জগৎই ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু"

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই একই দেবতাকে সেই একেশ্বরকে তাঁহারা কেহ বা কখনো বা অগ্নিতে কখনো জলে, কখনো ওষধিতে, কখনো বনস্পতিতে, কখনো মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে, কখনো জড় প্রস্তরে, কখনো ধাতুতে, কখনো বিশ্বভুবনে বারবার নমস্কার করিতেন ; এবং যে জনসাধারণের কখনো ঈশ্বর দর্শন হয় নাই তাহাদের বস্তুমাত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া পূজা দেওয়ায় আপত্তি করিতেন না, বরঞ্চ উৎসাহিত করিতেন তাঁহারা জানিতেন।

"এষো সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥
যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করা হয় ব্রহ্ম তাহার অন্তরস্থিত অনির্ব্বচনীয় গূঢ়াত্মা। সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করুন।

সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুরা তাই সাকারবাদী ও নিরাকার বাদী দুই-ই,এবং সাকার পর্য্যায়ে সীমাবিশিষ্ট চেতন বা জড় দ্বিবিধ আকারেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে বিশ্বাসী। পৌত্তলিক হিন্দুর সাকারবাদ আমিষাশীর খাদ্য ভূতের সমতুল। নিরামিষাশী বলিলে বুঝায় যে মাংস স্পর্শ করে না শুধুই উদ্ভিজ্জ খায়। আমিষাশী বলিলে বুঝায়, যে উদ্ভিজ্জও খায় মাংসও খায়। হিন্দুর সাকারবাদ সেইরূপ, তাহা নিরাকারকে বর্জ্জন করে না এবং ঈশ্বরের সর্ব্ব আকারে অস্তিত্বও স্বীকার করে। সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ ইসাইতে এখন এই প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু জনসাধারণ তত্ত্বদর্শীদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সীমার ভিতর অসীমকে উপলব্ধির সহজ মার্গ অনুসরণ করেন। মূর্ত্তিকে মনঃসংযোগের অবলম্বনস্বরূপ, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহুদি সাধকেরা এই সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দেন নাই, তাঁরা মূর্ত্তিপূজাকে স্থূলভাবে দেখিয়াছেন, একটা মস্ত মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের পাশ কাটাইয়া গিয়েছেন—নূতন করিয়া য়ুরোপ আবার যার কিছু কিছু সন্ধান আজকাল পাইতেছে। (রোমান ক্যাথলিকরা এ তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন শুনা যায়)।

তাই ইহুদিরা ও খৃষ্টান-মিশনারিরা মূর্ত্তির উপর এত খড়্গহস্ত। ঈশ্বরের কেবলমাত্র সচল মানুষ মূর্ত্তি তাঁরা মানেন, তাই তাঁর অচল ধাতবমূর্ত্তি পরিকল্পনায় তাঁদের ঘৃণা ও দ্বেষ। খাঁটি হিন্দুরা মানেন সচল ও অচল, জড় ও চেতন, অণু ও বৃহৎ সব রকম মূর্ত্তিবান ঈশ্বর, এবং অমূর্ত্ত ঈশ্বর। তাঁহারা সাকার ও নিরাকারবাদী দুই-ই, মূর্ত্তিপূজক ও অমূর্ত্তিপূজক উভয়ই। তাঁহারা মানেন—

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥"

তিনি চলেন, তিনি চলেন না ; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন ; তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি সকলের বাহিরেও আছেন তিনি

"অপাণিপাদো জবণো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ
স শৃণোত্যকর্ণঃ॥"

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার কর্ণ নাই তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি— "সর্ব্বানন শিরোগ্রীবঃ
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥"

নানা শিরো-মুখ-গ্রীবা-বিশিষ্ট সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং সর্ব্বগত এবং মঙ্গলস্বরূপ।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততং ॥"

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তুকে দর্শন করে সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সেই পরম পদকে জ্ঞানবান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দর্শন করেন।

এই ত গেল মূর্ত্তিপূজকদের কথা। এখন মূর্ত্তি-অপূজক শুদ্ধ নিরাকারবাদীদের ভাবটা একটু ভাবিয়া দেখা যাক্।

ঈশ্বর কে ভাই?—যিনি এই জগতের অধিপতি।

"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা॥"

কে কবে দেখিয়াছে তাঁকে? তিনি যখন নিরাকার তখন ত তাঁকে চোখে দেখার যো নাই, তাঁর কথা কানে শোনার যো নাই; তিনি ইন্দ্রিয়ের দর্শন স্পর্শনের বাইরে। তাছাড়া তিনি যখন নিরাকারী, নিজেই অশ্রোত্র অচক্ষু তখন তিনিই বা আমাদের কথা শোনেন কেমন করিয়া, আমাদের দেখেন কেমন করিয়া? তিনি যে চক্ষু না থাকিলেও দৃষ্টি করেন, এবং কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন এ কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ শুধু আমাদের মনের একটা বিশ্বাস, যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগীদের কথায়—অর্থাৎ শ্রৌত প্রমাণ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম শ্রৌত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার আরম্ভেই আছে—ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি॥

ব্রহ্মবাদিরা কি বলেন?—তাঁহারা বলেন—

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। যদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং॥"

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম যেন শুব্যাচচক্ষিরে॥"

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন। আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না; এবং ইহাও জানি না যে, কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমা-দিগকে ব্রহ্ম বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন তাঁহাদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন—

"অপাণিপাদো জবনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং॥"

তাঁহার হস্ত নাই তথাপি তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন, তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান্ করিয়া বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবাদিরা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারী ধীরেরা, বা পূর্ব্ব আচার্য্যেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই শুনিয়া শুনিয়া, তাহাই অনুধ্যান করিয়া আমার মনে একটা ভাব উৎপাদিত হইয়াছে। এই

যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, এই যে ঋতুমাস সম্বৎসর, এই যে নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত মরুকানন, এই যে ভূচর খেচর জলচর ব্যোমচর কীটপতঙ্গ সরীসৃপ নানা জীবজন্তু, এই যে আকর্ষক বিকর্ষক চুম্বক নানা জড় পদার্থে নানা শক্তির বিকাশ, এই যে জন্ম মৃত্যু আনাগোনা, মিলন বিচ্ছেদ, সুখ দুঃখ, হিংসা দ্বেষ এই সকল পরিদৃশ্যমানের পশ্চাতে কোন অদৃশ্য মহা চৈতন্য আছেন যাহা আমার শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য, জ্ঞানগম্য—তিনিই আমার ঈশ্বর। অর্থাৎ ঈশ্বর বস্তুটি আর কিছু নয়, মানুষের মনেরই একটি সৃষ্টি, হাতের সৃষ্টি নহে, তিনি আমার ভাবনার দ্বারা ভাবিত তত্ত্ব। মানুষের ভাবনা যত বিস্তৃত হইবে, যত মহৎ হইবে, যত শুদ্ধ হইবে—তাঁর সত্তাও তাঁর পক্ষে তদনুরূপ হইবে। যে কোন একজন মানুষের ভাবনা সমস্ত মনুষ্য জগতের—সম্পত্তি, তাঁরই ভাবনা ধরিয়া ধরিয়া চলিতে চলিতে আমারও ভাবনা তৎকল্প হয়।

যে উপনিষদের উপদেশের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সেই উপনিষদের ঋষিরা ভাবনা করিয়াছেন ঈশ্বর আকারহীন, অনুপম।

"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।
অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘ লোহিতমস্নেহমচ্ছায় মতমো
হবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধ মচক্ষুষ্কমশ্রোত্র
মবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণ মমুখমমাত্রম্॥"

হে গার্গি ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম, স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক প্রাণবিহীন, মুখবিহীন; কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

তথাপি—"তৎপরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ধীর ব্যক্তিরা সেই ব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন। কিরূপে তাহা সম্ভব? ইহার কোন নিশ্চিত উপায় আছে কি যাহা অবলম্বন করিলে ধীরগণের তুল্য আমাদের ও ব্রহ্ম দর্শন সম্ভব হইতে পারে?—উপায় আছে, এবং সে উপায় পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আনুপূর্ব্বিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সকলেই তার অনুসরণ করিতে পারি। কিন্তু আমরা দর্শন আকাঙ্ক্ষা রাখি না, তাই সে উপায় গ্রহণ করি না। নিরাকার ব্রহ্মের বর্ণনা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া তাঁর সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট উড়ো উড়ো ভাবে বিহার করি মাত্র, জ্ঞানী হই না, শুধু জ্ঞানের অভিমানে অহঙ্কারী হই।

ঈশ্বর দর্শনের উপায় একমাত্র—মনের চাঁদমারী।

"প্রণবধনুঃশরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ॥"

ওঙ্কার মন্ত্র ধনুস্বরূপ, জীবাত্মা অর্থাৎ তদীয় মন শর স্বরূপ এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদশূন্য হইয়া সেই প্রণব ধনুর অবলম্বনে মনরূপ শরের দ্বারা ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে। শরে যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত

হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইবেক। এইরূপেই—"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" অধ্যাত্মযোগের দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তিরা হর্ষ:শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

জ্ঞানমার্গীর ঈশ্বরলাভের পন্থা নাই। কিন্তু সকলের প্রকৃতি জ্ঞানমার্গ অবলম্বনের অনুকূল নহে। তিনি জ্ঞানীর সংশয় রহিত বুদ্ধিগম্য হইলেও ভক্তের ভক্তির দ্বারা সহজলভ্য। বহুশাস্ত্রে এই কথার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মসমাজেও জ্ঞানমূলক উপনিষদ তত্ত্বের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি সেইজন্য এত অধিক লোকরঞ্জক হইয়াছে—তাহারা ভক্তের সহিত ভক্তবৎসলের—মিলনের সোজা সেতু বাঁধিয়া দিয়াছে।

ভক্তি কিন্তু নিরালম্ব হইতে পারে না, পাত্রের অপেক্ষা রাখে, একটা বাস্তবের অবলম্বন চায়, সাকারের দর্শন স্পর্শনের আকাঙ্ক্ষা রাখে। তাই নিরাকারবাদী ইস্লামধর্ম্মী ও ভক্তির চুম্বনে চুম্বনে মক্কার 'কাবা'কে বিবর্ণ করিয়াছে, নিরাকারবাদী শিখেরা গুরুদ্বারার প্রস্তর সোপান মর্দ্দনের দ্বারা গুরুপাদ সেবা-কল্পনায় ধন্য হইতেছে; শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা তথাগতের মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে দেশ ছাইয়া দিয়াছে, এবং খৃষ্টানেরা যীশুর ক্রশে ও ফটোতে জগৎ আচ্ছন্ন করিয়াছে।

উপনিষদও ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব মনন করিয়াছে,—

"সতপোতপ্যত।"

তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবিতি পঞ্চমঃ॥"

ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে মেঘ ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে।

"এতস্য বা: অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ
বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥"

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবৌ
বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥"

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে হে গার্গি, দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। মনরূপ শরকে এই পুরুষে বিদ্ধ করিবার জন্য পঞ্চভূতের কোন একটার ভৌতিক অবলম্বন চাই। উপনিষদের অনেক সাধকেরা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। অন্য বহুসাধকেরা মৃণ্ময় বা প্রস্তরময় মূর্ত্তির অবলম্বনে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সদা চঞ্চল উড়ন্ত মনকে একটা কোন সীমার ভিতর আবদ্ধ করা লইয়া কথা সেই সীমা ভ্রূমধ্যবিন্দু, হৃদপদ্ম বা ব্রহ্মরন্ধ্র

হোক, কিম্বা প্রস্তরখণ্ড হউক, পট হোক, ঘট হোক, জ্যোতি হোক, মৃণ্ময় মূর্ত্তি হোক বা মনুষ্যরূপ হোক।

উপনিষদ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ ও একাগ্র করিয়া মনীষা দ্বারা তাঁহাতে মগ্ন হইতে হইবে। এই যে 'মনীষা' শব্দটি যাহার অর্থ, সংশয় রহিত বুদ্ধি, তাহার ভিতর একটা বড় মনোবৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সংশয় রহিত বুদ্ধি কি না—অটল শ্রদ্ধা, অনন্ত বিশ্বাস। এইখানে ভক্তিমার্গের সহিত জ্ঞানমার্গের সম্মিলন হয়।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"
"ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

এই শ্রদ্ধাতত্ত্ব যীশুখৃষ্টের উপদেশের নিগূঢ় রস।

"I tell you, God can raise up children for Abraham from these stones."

"As you believe so your prayer is granted."

"The disciples came to Jesus in private and said—"why could we not cast the devil out? He said to them—"Because you have so little faith. I tell you truly, if you had faith the size of a grain of mustard seed, you could say to this hill—"move form here to there,—and remove it would; nothing would be impossible for you."

এই অনন্ত শ্রদ্ধা য়ুরোপে auto-suggestion নামক নূতন মনোবিজ্ঞানের মূল উপাদান। পাতঞ্জল যোগসূত্রেরও ইহাই মূলমন্ত্র এবং ভক্ত মহাপুরুষদের ইহাই প্রধান অবলম্বন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখাপড়া জানা বিজ্ঞ লোকেরা নিজেরা শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় নিরক্ষর অজ্ঞ লোকের শ্রদ্ধাকে তাচ্ছিল্যজনক মনে করি—এবং লেখাপড়া জানা লোকের শ্রদ্ধাকে ভণ্ডামি ও উপহাসজনক বিবেচনা করি—লাটনের মত উহাকে একটা Colossal hoax বলিতে চাই। নিরাকারবাদী আমরা না-জ্ঞান মার্গের দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করি—না-ভক্তিমার্গের দ্বারা ভাবে ভোর হইয়া তাঁহাতে তন্ময় হই। তাই যীশু বলিয়াছেন,

"Unless you turn and become like little children you will never get into the Realm of Heaven at all."

"I praise thee father, Lord of Heaven and earth, for hiding all this from the wise and learned and revealing it to the simple minded." এই "wise and learned কারা? যারা জ্ঞানীম্মন্য মাত্র, প্রকৃত জ্ঞানী নহে। কেননা প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া কঠিন, জ্ঞানের পথ—"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা" ধারাল ক্ষুরের ধারের উপর দিয়া চলার পথ।

আমরা যদি উপনিষদ্ উপদিষ্ট জ্ঞানবান্ হইতাম তবে জ্ঞানীও হইতাম এবং বিনয়ীও হইতাম। তাহা হইলে বলিতাম

যদি

মন্যসে সুবেদেতি তদভ্রমেবাপিনূনং ত্বং
বে ব্রহ্মণোরূপম্।

যদি এমন মনে করি, যে, আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছি।

এবং চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তুকে দেখে তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দেখিতাম—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারকায়ও দেখিতাম, হৃদপদ্মেও দেখিতাম এবং বিশ্বেশ্বর ও তারকেশ্বরের শিবমন্দিরেও দেখিতাম। যদি শ্রদ্ধাবান্ বিশ্বাসী ভক্ত হইতাম তবে ঐ প্রস্তর মূর্ত্তিই চৈতন্যবান্ হইয়া আমার সহিত কথা কহিতেন, আমার কামনা পূরণ করিতেন। সেই ভক্তি চাই, যে ভক্তিতে স্তম্ভ হইতে প্রহ্লাদের রক্ষাকর্ত্তা নির্গত হইয়াছিলেন, সেই ভক্তি চাই, যে ভক্তিতে বিকট বনে হরি আসিয়া বালক ধ্রুবকে দর্শন দিয়াছিলেন, সেই ভক্তি চাই, যে ভক্তিতে যীশু মৃতকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানী না হইলেও জ্ঞানীগণের বাক্যেও যদি শ্রদ্ধাবান্ হইতাম তবে আমরাও তারকেশ্বরে পূজা লইয়া যাইতে দ্বিধা বিচলিত হইতাম না, কেন না, আমাদের ঈশ্বর শুধু জায়নে নাই, শুধু বৈকুণ্ঠে নাই, শুধু কৈলাসে নাই।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ
স পুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ ॥

তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে; তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে; তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। জ্ঞানী হইলে বা জ্ঞানীদের কথায় শ্রদ্ধাবান হইলে আমরাও

সর্ব্বং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ
সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

যুক্তাত্মাধরদেবতুল্য সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাক সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলে প্রবিষ্ট দেখিতাম।

শেষ বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পৌত্তলিক হিন্দুই একেশ্বরবাদী, তাঁহারা বহুঈশ্বরবাদী নহেন। এক ঈশ্বরের অনন্ত বিভূতি বা শক্তি তাঁহারা সম্ভ্রমভরে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের দেবতা আখ্যা দিয়া থাকেন। স্থলের দেবতা, জলের দেবতা, অগ্নির দেবতা এই সকলই তত্তৎ শক্তির নাম, সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির উপর এক মহাশক্তিমান পরমেশ্বর যিনি কখন সৃষ্টি, কখন স্থিতি, কখন প্রলয় কার্য্যে ব্রহ্মাবিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিধাত্মক দেখান। নিরাকারবাদী ব্রাহ্মধর্ম্মও অনেক ঈশ্বরের উপর একজন ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করেন,

ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক দেবতার উপর এক পরম দেবতাকে মানেন।

"তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ॥"

"ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বৈশ্মৈ দেবাবলিং মাহরন্তি।

মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, তিনি ব্রহ্ম, সকল দেবতারা ইঁহার পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদয় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।

সেই অন্তরতর যে দেবতা তিনি

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"—পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। সেই প্রিয়তমকে যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে পারিবেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী।

শ্রীমতী সরলা দেবী

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

His name, his association, his place, the persons he talked with, the things he touched, are all sacred to me, as they belong to my Beloved. I live, move and have my being talk and smile because my Lord is pleased with it. I cannot be miserable because he never likes it. Even if any misery comes, I must rejoice, as it is a special gift from the my Beloved. It is not the "I" of the body that suffers, but "I" of the Most-Beloved. I cannot hate others because He never hates them. It is for His sake my mind spontaneously flows towards others; every creature on earth belongs to Him, I am His, so are they mine. He is my Lord, my master, the very pupil of my eye, the smile on my lips, the very blood that courses through my veins, heart of my heart, the very pith and marrow of my bones: I am His entirely, absolutely."

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের পুণ্যকীর্ত্তির বিষয় প্রথম আমি আরা সহরে এক পাঠাগারে জনৈক প্রধান উকিলের মুখে শুনি যে, একজন বাঙ্গালী যুবক সন্ন্যাসী আমে-

রিকার সিকাগো Chicago নগরে ধর্ম্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তথায় বহুশত পৃথিবীস্থ ধর্ম্মযাজক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে সমস্ত প্রধান ধর্ম্ম সমূহ এই সনাতন ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম এবং আমার মনে হইল যে আমার যেন কেহ পরম আত্মীয় এরূপ যশোলাভ করিয়াছেন।

সাধু মহাপুরুষদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, পূর্ব্ব জন্মান্তরিক সম্পর্ক মনুষ্যের মধ্যে সুষুপ্ত অবস্থায় প্রথিত থাকে, এবং কোন কালে প্রসঙ্গ উঠিলে সেই সুষুপ্ত ভাব জাগ্রত হইবার চেষ্টা করে এবং অস্পষ্ট-বিস্পষ্টরূপ ধারণ করিয়া অদ্বোচ্ছাস ভাবে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয় শাস্ত্রকারগণ এমন কি মহাকবি কালিদাসও শকুন্তলাতে হংসপদিকার গীত শ্রবণে দৃশ্যান্তর ও ভাবান্তর প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে ইহা উদ্ভূত হয় তাহার বিচার এস্থল নহে। কেবল মাত্র ইহা বুঝিতে পারিলাম যে "প্রিয়মত্যন্তবিলুপ্ত দর্শন" সহসা দর্শন পথে উপস্থিত হইলে যেরূপ আনন্দ ও হর্ষ হৃদয়ে উপস্থিত হয় আমারও স্বামিজীর বিষয় শ্রবণে তদ্রূপ হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে আমি আরা হইতে ইংরাজী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে আমার এক সহোদর বিয়োগে মাতা এবং সন্তপ্ত অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সহিত কাশী আগমন করি। সে সময় আমি একজন বৈষ্ণব মহাপুরুষের সংস্রবে আসিয়া, তাঁহার উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনা করিতে আরম্ভ করি। দৈবক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই ৺ সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী ও উক্তি পড়িয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। কিছুদিন পরে সেই বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয় মহাষ্টমীর দিনে আমার এক বন্ধু শ্রীযুত জগদুর্ল্লভ ঘোষ মহাশয়ের সহিত দুর্গাবাড়ীর মায়ের দর্শন লাভার্থে গমন করি এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজের দর্শনার্থ আমিঠি (Amittei) রাজার বাগানে গমন করি, এবং তথায় দর্শনাদি করিয়া ফিরিব এমন সময় আমরা দেখিতে পাইলাম দুইজন সন্ন্যাসী এবং দুজন অন্য ভদ্রলোক একত্রে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন হৃষ্টপুষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। এবং মনে হইল যেন ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ হইতে পারেন। প্রথমোক্ত সাধুটী স্বামী ভাস্করানন্দজীকে 'নমো নারায়ণ' করায় ভাস্করানন্দজীও তাঁহাকে 'নমোনারায়ণ' করিলেন এবং উভয়েই নানারূপ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কথা ও ভাব ভঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম যে, স্বামী ভাস্করানন্দের সহিত ইহঁাদের পূর্ব্বেই পরিচয় ছিল এবং কিছু ঘনিষ্ঠতাও ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উত্থাপিত হইলে স্বামী ভাস্করানন্দজী অতি নম্র ও কাতর ও ব্যগ্রভাবে মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "ভাইয়া স্বামীজী সে এক মর্ত্তব্য স্বামীজীকে দর্শন করাও", গৃহ মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও ভাস্করানন্দজী পুনঃ পুনঃ স্বামীজীর কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন যেন তখনই দর্শন পেলে তাঁহার শান্তি হয় নইলে আর কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। এরূপ যোগীর

যে স্বামীজীর দর্শন লাভের জন্য চিত্ত এরূপ বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেলিত হইয়াছে আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কারণ সচরাচর ভাস্করানন্দজীর চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইত না। সম্মুখস্থিত বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটি বলিলেন "হাঁ মহারাজ হ্যাম অবশ্য উনকো লিখেনগে, উয়ো য়্যাভি দেওঘরকো বায়ু পরিবর্ত্তনকে লিয়ে গিয়া হ্যায়।" স্বামী ভাস্করানন্দজী উক্ত সন্ন্যাসীদিগকে পুনরায় রাত্রিকালে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিবার পর আমি তাঁহাদিগের সঙ্গী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে, ইনিই স্বামী বিবেকানন্দজীর গুরুভাই, এবং সমকক্ষ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

এইরূপে কিছুকাল যাইবার পর একদিন সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়াছি এমন সময় চারুবাবু যেয়ে উপস্থিত এবং আমাকে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর উদ্বোধনের গ্রাহক সংগ্রহার্থ আদেশ জানাইলেন। কিন্তু আমি সেই দিনই নির্জ্জনে বাসের জন্য উদ্যোগী হইতেছিলাম বলিয়া দুঃখের সহিত অক্ষমতা প্রকাশ করিলাম। আমি নির্জ্জন বাসের জন্য অসি ঘাটের এক বৈষ্ণব মঠের ব্যবস্থা করিবার জন্য যাইব শুনিয়া তিনিও আমার সহিত যাইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্টতার সূত্রপাত হইল; এবং স্বামীজীর বিষয় তাঁহার নিকট বিশেষ শ্রবণ করিয়া এবং স্বামীজীর জ্ঞানযোগ প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার কাছে পাঠ করিয়া দিন দিন স্বামীজীর উপর আমার ভক্তি দৃঢ় হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার এবং তাঁহার গুরু ভ্রাতাদিগের সাধন জীবনের বিষয় নানা রূপ আলোচনা দুই বৎসর কাল শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেদার নাথ মৌলিক (স্বামী অচলানন্দ) এবং চারু বাবু (স্বামী শুভানন্দ) বাড়ীতে আলোচনা হইবার পর স্বামীজীর কর্ম্মযোগ চারুবাবু বিশেষভাবে আমাদের বাড়ীতে পাঠ করেন এবং আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করান। ইহার অল্পদিনের মধ্যে তিনি শ্রীযুক্ত যামিনী রঞ্জন মজুমদার, কেদার নাথ মৌলিক, বিভূতি প্রকাশ ব্রহ্মচারী, হরিনাথ ওহেদার, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ ও পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে লইয়া সেবাশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর এম, এ মহাশয় স্বামীজীর উপদেশানুসারে এই কার্য্যে যুবক মণ্ডলী ব্রতী হইয়াছেন শুনিয়া, তিনিও পরম উৎসাহের সহিত যোগদান করিলেন এবং স্থানীয় ভদ্র মহাশয়দিগকে লইয়া একটি সভা গঠন করিলেন, এইরূপে কার্য্য চলিতে লাগিলে পর, কিছুকাল পরে মিত্র মহাশয়ের কাশী লাভ হইল। পরে স্বামীজী মহারাজের আদেশ অনুসারে উক্ত আশ্রম, কাশীস্থ ভদ্রোমহোদয়গণের সম্মতিক্রমে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিছুদিন পরে আমাদের বালক সঙ্ঘের ভিতর খবর আসিল যে স্বামীজী বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ৺কাশীধামে আগমন করিতেছেন, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাটীতে তাঁর থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সঙ্ঘের প্রতিনিধিস্বরূপ আমি পুষ্পমালা ও পুষ্পগুচ্ছ লইয়া সেইখানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গেলাম। ষ্টেসন্ পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি আসিতেছেন তখন আমি চারুবাবু প্রভৃতিরা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমি স্বামীজীর গলদেশে অভ্যর্থনাসূচক মালা বিন্যস্ত করিয়া দিলাম, এবং

চরণে পুষ্পাদি উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। ক্ষণমুহূর্ত্তে আমি স্বামীজীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম পূর্ব্বস্মৃতি আমার জাগরুক হইয়া উঠিল, স্বপ্নাবস্থায় ইতঃপূর্ব্বে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই ব্যক্তি, সেই মুখ, সেই অবয়ব, স্বামীজী মৃদুস্বরে কহিলেন, "বালকটী কে ?" এবং আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। কবিতে যেরূপ বর্ণনা করে আমার মনেও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল, "My ears have not drunk hundred words of that tongue's utterance, yet Iknow the voice." ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রে যাহাকে second sight বলে, ইহা কি তাই ? যুগপৎ হর্ষ ত্রাস ও নানারূপ দ্বন্দ্ব ভাব আমার চিত্তকে প্রমথিত করিতে লাগিল, আমি কখনও স্বামীজীও তাঁহার সঙ্গিগণ, ষ্টেসনও জনসমূহকে অস্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সব লয় হইয়া গিয়াছে, শূন্য, শূন্য মহাশূন্য কোথায় যেন উঠিয়া যাইতেছি, দেহ নাই, মন নাই, চিন্তা নাই, এরূপ নিস্তব্ধ স্থানে থাকিতে পারিতেছিনা। আবার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নামিয়া আসিতেছি, এবং অস্পষ্ট ভাবে এবং অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় পূর্ব্বস্থান ও মনুষ্য জনকে দেখিতেছি। কিছু বুঝিতেছিনা, কিছু বলিতেও পারিতেছি না। হস্ত পদাদির রহিত হইয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনা তিরোহিত হইয়াছে ; কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য একই হইয়াছে ; কিন্তু অন্তরে নিশ্চল নিস্পন্দ আনন্দ রাশি ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস করিতেছে, স্বামীজীর চরণে পুষ্প প্রদত্ত হইল, তিনি পার্শ্বস্থিত অপর ব্যক্তিদের দিকে মুখ ফিরাইলেন, এবং এর ওর সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রেমপূর্ণ নেত্রে আমায় নিরীক্ষণ করিলেন, আমিও তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, এবং নয়নে নয়নে মিলিয়া গেল। সময় হিসাব করিলে এক মিনিটের সহস্রাংশের একাংশ কিন্তু স্বামীজীর নেত্র হইতে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি যেন অবাচনিক ভাষায় কহিতে লাগিলেন, Deny thy father, deny thy name and for that which thou leavest take all myself." পিতাকে ত্যাগ কর, নাম যশ ত্যাগ কর, এবং এই ত্যাগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইবে। আমার প্রাণ আমার অন্তস্থল যেন নড়িয়া উঠিল এবং গম্ভীর সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল, "I take thou at thy word," এই কথার মত তোমাকে গ্রহণ করিব।

কবিতে যাহা বর্ণনা করে—আমি জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাই এরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি—। ইহা যে আনন্দ ঠিক তাহাও নয়। কিন্তু তাহার উপর যদি কিছু থাকে তাহাই আমি চকিতে দর্শন করিয়াছিলাম, এবং সেই স্মৃতি ও চকিত দর্শন স্পষ্ট আমার চোখে ভাসিতেছে। তাহার পর তাঁহার সহিত একত্রে চারুবাবু, যামিনীবাবু, আমি, আর একজন কে, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের বাঙ্গালায় গিয়া রাত্রি যাপন করি, সেই সময়ে তাঁহার সহিত পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামি শিবানন্দজী মহারাজ স্বামি নির্ভয়ানন্দজী ও মিষ্টার ওকাকুরা ছিলেন। ওকাকুরা জাপান গবর্ণমেণ্ট হইতে আদিষ্ট হইয়া স্বামিজীকে লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন বেলুড় মঠেও বাস করিয়াছিলেন। কাশীতে স্বামি নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ

থাকাতে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান বাটীতে পূর্ব্ব হইতে সমস্ত আয়োজন যথাযথ রাখিয়াছিলেন।

স্বামিজী নিরঞ্জনানন্দ শিবানন্দ মিঃ ওকাকুরা প্রভৃতিরা সুখাসনে উপবিষ্ট আছেন, আমি ও চারুবাবু গিয়া উপস্থিত হইলাম; সময় অপরাহ্ন, স্বামিজী জন মণ্ডলীর সহিত নানা রকম কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। মাঝে মাঝে ওকাকুরার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, বিষয়টা বোধ হয় ভারত ভ্রমণের। আমি সাষ্টাঙ্গে স্বামিজীকে প্রণিপাত করিলাম। যদিও গৃহে কয়েকটী সুখাসন ছিল, তথাচ স্বামিজীর সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করা অবিধেয় মনে করিয়া আমরা নিম্নস্থ গালিচা বা আস্তরণের উপর বিনীতভাবে উপবেশন করিলাম। ইহা দেখিয়া স্বামিজী কথা বন্ধ করিয়া ঘন ঘন আমার দিকে সস্নেহ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বাক্যতে যত নাহি হউক, মুখ, ভঙ্গি ও দৃষ্টিতে স্নেহপূর্ণ ভাব অত্যন্ত প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমি একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলাম। স্বামিজী অতি স্নেহ পূর্ণ করুণস্বরে যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন এইভাবে আমাদের উভয়কে পুনঃ পুনঃ অতি করুণ মিনতি স্বরে বলিতে লাগিলেন, উঠে বস বাবা উঠে বস। বুঝিলাম যেন মানুষের ভিতর উঁচু নিচু ভাব তাঁহার কষ্টদায়ক হইতে লাগিল। কারণ সকলের ভিতরেই সেই এক ব্রহ্ম এবং সকলেই এক আসনের অধিকারী—ইহা তাঁহার মুখভঙ্গী এবং কথাতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে সুখাসনে গিয়া বসিলাম। এইরূপ প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণে এরূপ আকর্ষণ ও অন্তরের লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল যে আমরা তন্মুহূর্ত্তে অজ্ঞাত ভাবে তাঁহার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিলাম, ইহাই হইল আমাদের প্রকৃত দীক্ষার সময় ও দীক্ষার স্থল। জ্বলন্ত ও সুস্পষ্ট ভাবে সেই চিত্রটী সর্ব্বদাই আমার চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাত্রিকালে আমি চারুবাবু ও হরিদাস চাটুয্যে স্বামিজীর আবাসে প্রায় থাকিতাম। ভোজনের সময় প্রায় সকলে একত্র বসিতাম। ভোজনের সময় যে জিনিষটা সুস্বাদু লাগিত অতি স্নেহ পূর্ণভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া স্বহস্তে সেইটী তুলিয়া আমাদিগের পাত্রে দিতেন, এবং তৎপ্রদত্ত বস্তুটী আমাদের সুস্বাদু লাগিয়াছে কিনা জানিবার জন্য আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং আনন্দ করিয়া প্রশ্ন করিতেন, কিরে কেমন লাগ্‌লো, তোর ভাল লাগলো কি? খা খা বেশ করে খা, জিনিষটা আমার বেশ ভাল লেগেছে তাই তোকে দিচ্ছি।” জগৎমাতার সন্তানের প্রেম কি রকম এবং বাৎসল্য ভাব কাহাকে বলে দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া তাহা বিশেষ বুঝা—যায় না। স্বামিজীর সেই মধুর স্বরে স্নেহ পূর্ণভাবে নিজের পাত্রস্থ নিজের প্রীতিকর বস্তু আমাদিগকে আদর করে খেতে দিতেন, তাহাতে বাৎসল্য প্রেম কি তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইল। ইহা কেবল মাত্র প্রসাদ নয় কিন্তু গভীর প্রেম, একান্ত ভালবাসা পীতিকৃত হইয়া খাদ্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদের মুখেতে আসিতে লাগিল, ইহাতে বস্তুর স্বাদত্ব বা স্বামীজীর প্রেম কোন্‌টার আধিক্য ছিল ইহা প্রতীয়মান্ করা কঠিন।

ষ্টেসন হইতে স্বামীজী কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় উঠিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর সহিত কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আসিয়াছিলেন ওকাকুরা (জাপানী) অক্রুড় খুড়ো—অর্থাৎ অক্রুর যেমন মথুরা হইতে কৃষ্ণ লইতে আসিয়াছিলেন সেইরূপ ওকাকুরা মহাশয়ও জাপান হইতে স্বামীজীকে লইতে আসিয়াছেন; সেই কারণেই আমরা তাঁহাকে অক্রুর খুড়ো বলিয়া থাকি। স্বামী নির্ভয়ানন্দজী, কানাই স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ) গৌর নাড়ু (বালকদ্বয়) এবং শিবানন্দ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ স্বামী কাশিধামেই অবস্থান করিতেছিলেন। ইহাঁরা সকলেই একত্রিত হইয়া কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের "সৌধাবাসে" অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের প্রায় তিন বছর পরে এই ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

আমরা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসায় প্রথম প্রথম নিত্য যাতায়াত করিতাম; এবং মাঝে মাঝে রাত্রিবাসও করিতাম। তদানীন্তন সেবাশ্রম হইতে পাঁচ মাইল দূর হওয়াতে আমরা সব সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতাম না। একদিন শিবানন্দ স্বামী সকলকে দীক্ষা দিবার জন্য স্বামীজীর সহিত কথা উত্থাপন করেন। স্বামীজী তাহাতে সম্মত হন কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই। চারু, হরিদাস ভট্টাচার্য্য আমাকে স্বামীজীর নিকট কথা উত্থাপন করিতে বলায় আমি তাঁর নিকট দীক্ষার বিষয় বলিলাম। তিনি রহস্যচ্ছলে বলিলেন, "কেন তোরা তো রামানুজি বৈষ্ণবভাবে দীক্ষিত, বিষ্ণুমূর্ত্তি তো ভাল, তোর দীক্ষায় তো আমি কোন প্রয়োজন বুঝ্‌ছি না।" আমি বলিলাম "আপনার ন্যায় যোগীর নিকট আমার দীক্ষা নিতে ইচ্ছা।" এই কথায় তিনি হাসিয়া সম্মত হইলেন। ইহার পর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি ডাক্তার ছিলেন তাঁহার তিরোধান হওয়ায় আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই; যেন বন্দুকের গুলি আসিয়া আমার হৃদয় বিদ্ধ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই শোকের উপশম হইল। আমার মনে হইল ইহাই স্বামীজীর বিশেষ কৃপা। তার পরদিন প্রাতঃকালে আমার মাতাঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা দানার্থ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আত্মার অমরত্ব পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

নির্ভয়ানন্দ স্বামী স্বামীজীর আহারের আটা আনিবার জন্য একটী টাকা দিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি শোকসন্তপ্ত হৃদয়েও আশ্রমে আটা লইয়া গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, পাছে তাঁহার কষ্ট হয়। স্বামীজীর প্রতি আমার অনুরাগ এত প্রগাঢ় হইয়াছিল যে আমি ভ্রাতৃবিয়োগ জনিত সমস্ত কষ্ট ভুলিলাম। কিছুদিন পরে আমি স্বামীজীর নিকট যাই এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোর নাকি ভাই মারা গেছে, তোর কিরূপ বোধ হল, মাকে কি বল্‌লি। প্রত্যুত্তরে আমার মনের অবস্থা এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমার ভায়েদের যদি এমন হইত আমার বড় কষ্ট হত। তিনি এই কথা অত্যন্ত কাতরভাবে বলেন এবং তাহাতে আমার মনে যে অল্প কষ্ট ছিল তাহা মুছিয়া গেল। বুঝিলাম ইনিই আমার প্রকৃত সখা ও সুহৃদ এবং তদবধি তাঁহার চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলাম।

একদিন আমার ভ্রাতার উর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া হইবার পূর্ব্বেই স্বামীজী আমাদিগকে সেইস্থানে

রাত্রিবাস করিতে আদেশ করেন, এবং আমার এই অশৌচ অবস্থা সত্ত্বেও আমাদিগকে প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। আমরা স্নান করিয়া ও বস্ত্র পরিয়া সংযত ভাবে রহিলাম এবং স্বামীজীর আদেশ ও আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে আমাদের সকলকে যাইতে আহ্বান করেন। চারুবাবু আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আমি যাইয়া দেখিলাম স্বামীজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন "তুই প্রথম এসেছিস্, আয় চলে আয় এই বলিয়া আমাকে একটি ছোট কক্ষে লইয়া গেলেন, তারপর নিজে একটি আসনে উপবেশন করিলেন এবং আমাকে আর একটি আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন।

স্বামীজী অল্পক্ষণের ভিতর ধ্যানস্থ হইয়া সবিকল্প সমাধিতে চলিয়া গেলেন, শরীর স্থির, মেরুদণ্ড উন্নত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিস্পন্দ, নয়নস্তিমিত ও জ্যোতিঃপূর্ণ, বদনমণ্ডল ভাবশক্তি প্রেম ও আনন্দে উচ্ছলিত হইতেছে কিন্তু গাম্ভীর্য্যের ভাব অপর সকল ভাবগুলিকে ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যে স্বামীজী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং আহ্লাদ করিয়া আমাকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সে স্বামীজী আর নাই। পূর্ব্বদেহ, পূর্ব্ব কান্তি এবং পূর্ব্ব ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আসনে উপবিষ্ট। যে পুরুষ জগৎকে পদদলিত করিতে পারিতেন, উচ্চ উচ্চ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে পারিতেন, অভয় বাণী শুনাইয়া ম্রিয়মাণ জগৎকে গর্জ্জন করাইতে পারিতেন, এবং মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর করতলামলকবৎ সেই মহাশক্তিমান পুরুষ স্বামীজীর দেহাভ্যন্তর হইতে জাগ্রত এবং সুস্পষ্টভাবে আবির্ভূত হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ সমাধিতে অবস্থান করিয়া তিনি মনকে নিজবশে আনয়ন করিলেন, এবং দক্ষিণ কর দিয়া আমার দক্ষিণ কর গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েক মুহূর্ত্ত তদবস্থায় রহিলেন। তাহার পর তিনি আমার পূর্ব্বতন সকল বিষয় বলিতে লাগিলেন। "তোর ছাপরায় যাওয়ার সময় ষ্টীমারে কাহারও কথা শুনিয়া প্রথম কি জ্ঞান হইয়াছিল? আমি বলিলাম, "আমার স্মরণ নাই" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা মনে করে দেখিস্।" তাহার পর তিনি আমাকে তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিলেন (স্বামীজীর মূর্ত্তি) অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, "মনে কর আমার রূপটী ঠাকুরের রূপ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ঠাকুরের রূপ বিগলিত হইয়া গণেশের রূপ হইয়া যায়।" তাহার পর তিনি আদেশ করিলেন, "তুই ঠাকুরের বাহ্যপূজা মাঝে মাঝে করবি আর মানস পূজা রোজ করবি। স্বামীজী যখন আমার করস্পর্শ করিয়াছিলেন তখন আমার মন হইতে সকল বাসনা, সকল চিন্তা তিরোহিত হইয়াছিল। ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই, বাসনাও নাই আকাঙ্খাও নাই, ভুক্তি মুক্তি সকলই তিরোহিত হইয়াছে। সব শান্ত, জগৎ শান্ত, স্থির গম্ভীর। সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি নাই, আনন্দ পরিপূর্ণ। আনন্দ পরিপূর্ণ, এবং আনন্দের উপর এক বস্তু ছিল যাহা আমি ভাষায় বর্ণিতে অক্ষম, তাহাই উপভোগ করিতে লাগিলাম। শান্তি, শান্তি, মহাশান্তি। সর্ব্বব্যাপী শান্তি। হিংসাদ্বেষ উঁচু নিচু ইত্যাদির কোন সম্পর্ক বা

নাম শব্দ নাই। এক মহা শান্তির ব্যোমের মধ্যে যেন উড়িয়া যাইলাম এবং তথায় স্থির হইয়া অচল অটল ভাবে বসিয়া রহিলাম। ইহা শূন্য অথবা পূর্ণ কিছুই নয়, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এবং বোধগম্য হইবারও কোন বিষয় নহে কারণ বোধ চিত্তচাঞ্চল্য হইতে উদ্ভূত হয়। অসীম শান্তি ব্যোমে সর্ব্ব ব্যাপ্ত যেন এইটীই স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম। মূর্ত্তিরূপ কিছুই নাই।

"কভু একাকার নাহি আর হিল্লোল কল্লোল," কালের হিল্লোল স্থির সমুদয় নহি, নহি, ফুরাইল থাক্, বর্ত্তমান বিরাজিত।" আলোক ডুবিল, অন্ধকার তিরোহিত হইল, নাহি রাত্র নাহি দিবা, নিস্পন্দ স্বজন।'

সেই সময় হইতে আমার এই শান্তি পূর্ণ ব্যোম, যাহা স্বামীজী আমাকে দেখাইয়াছিলেন সেইটী ধ্যান করিতে আমার ভাল লাগে, মূর্ত্তি বা রূপ ধ্যান করিতে তত ইচ্ছা হয় না। কারণ ইহাতে একটু কল্পনা বা সীমা ও পরিধির আভাস থাকে। "মহা ব্যোম, যথায় গলে যায় রবি শশি তারা" সেইটী আমার বড় প্রিয়। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আমি মূর্ত্তি পূজা করিতাম এবং তাহাই আমার বড় ভাল লাগিত। কিন্তু স্বামীজী করস্পর্শ করাতে আমি সেই মহাব্যোম ধ্যানপ্রিয় হইয়া গিয়াছি। যাহাকে যোগীরা সবিকল্প সমাধি বলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইতে বহু বৎসরের প্রয়োজন, মাত্র স্বামীজীর করস্পর্শে আমার মন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি তখন গৃহ দেখিতে পাইতেছিলাম না নিজ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত দেখি না, সম্মুখে স্বামীজী আমার গুরু তাঁহাকেও পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না। সমস্তই এক মহাশূন্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। খণ্ড বা বহুত্ব কোন জ্ঞান নাই, অন্তর বাহ্য বলে কোন শব্দ নাই। আমার শরীর নিশ্চল ও নিস্পন্দ কোন চিন্তা নাই কোন ভাব নাই। এমন কোন শব্দ ভাষায় নাই যদ্দারা সেই ভাব ব্যক্ত করিতে পারি।

"নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
যেন ভাসে ব্যোমে, ছায়া সম ছবি, বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে জগৎ সংসার ভাসে।
উঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমিই এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্যে মিলাইল,
অবাঙমনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে মন।"

তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম তাহা আমার মনে নাই। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম আমার মন সেই উচ্চাবস্থা হইতে নামিয়া দেহতে প্রবেশ করিতেছে, তখন অস্পষ্টভাবে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গৃহ ও অপরাপর বস্তুর আভাস মাত্র দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনটিই ঠিক বলিয়া তেমন বুঝিতে পারিতেছি না। যেন জগৎ নূতন, গৃহ নূতন, সবই নূতন। আবার মন যেন সেই

মহাব্যোমে উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দেহস্থ শক্তি তাহা প্রতিরোধ করিতেছে। এই নিদ্রিত জাগ্রত অবস্থায় থাকিয়া আমার শরীরে উষ্ণতা আসিতে লাগিল। ধমনীতে ধীরে ধীরে শোণিত বহিতে লাগিল। এবং বাহ্য-বস্তু সকল ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। স্বামীজীকে ও আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবার স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু একটি নূতন জিনিস প্রকাশ পাইল। যেন সকল বস্তুর উপরে এক মাধুর্য্য ও শান্তি বিরাজমান। প্রত্যেক বস্তুই যেন অতি পবিত্র, প্রত্যেক বস্তুই যেন আমার অতি প্রিয় ও প্রণম্য। আমি দেখিলাম বায়ু পবিত্র, আকাশ পবিত্র, জল পবিত্র, চতুর্দ্দিক পবিত্র, প্রত্যেক সৃজিত জীব পবিত্র।

ক্ষণকাল পরে স্বামীজী আমাকে অন্য লোক পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুমতি করিলেন। তাহার পর চারুবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁরও পূর্ব্ববৎ দীক্ষা হইল এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের হইল।

বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে শক্তি সঞ্চার বা Transmission of energy বিষয়ে শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের মধ্যে বিসপ (Bishop) বা মোহান্ত হইবার সময় অপর মোহান্ত (Bishop) আসিয়া নূতন ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া থাকেন এবং ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকেন এবং ঐ ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। ইহাকে "consecration" বলা হয়। পূর্ব্বতন প্রথানুযায়ী এখনও পর্য্যন্ত এইরূপ প্রক্রিয়া হইয়া থাকে, এবং উহা প্রাণহীন আচার পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা, ধর্ম্ম কতকগুলি আচার পদ্ধতি। কতিপয় নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই ধর্ম্মার্জ্জন করা হয়। ইউরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা মনে করেন তর্ক বিতর্ক বাক বিন্যাস ধর্ম্ম। উচিত অনুচিত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা ও তদনুযায়ী অপর সকলকে বিচার করা ও ন্যূনতা ও হীনতা অনুযায়ী অপর সকলের বিষয় অনুযোগ করাকেই ধর্ম্ম কহে। কিন্তু ইহা ছাড়া, ইহা ব্যতীত এক স্বতন্ত্র বস্তু আছে, তাহা ইহারা কখনও অনুভব করেন নাই। গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্ম নাই। জীবন্ত ব্যক্তি তাহার কাছে ধর্ম্ম আছে, জীবন্ত ব্যক্তি অপরকে ধর্ম্ম দেখাইতে পারে ও দিতে পারে। যেরূপ অন্য দ্রব্য সামগ্রী হাতে করিয়া ধরা যায়, অনুভব করা যায়, খাদ্য হইলে খাওয়া যায় এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারে, ধর্ম্মও ঠিক তদ্রূপ, ইহাকেই প্রাণ বলে। কেবল মাত্র সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম দিতে ও দেখাইতে পারেন যিনি আপনার ভিতর এই প্রাণ বা শক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দেহের নিম্নস্তরে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্নায়ুতে যখন শক্তি প্রবুদ্ধ হয়, তখন জগৎ ও বস্তু সমূদয়ের সম্পর্ক ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। দার্শনিকরা ও বৈজ্ঞানিকরা যে সকল মহাসত্য আবিষ্কার করেন, তাহা, মনকে এই ব্যোম বা চিদাকাশে তুলিয়া স্থির করিয়া রাখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সবিকল্প সমাধিতে মন রাখিলে তবে তার খণ্ডত্ব ও পূর্ণত্ব জ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

ধর্ম্ম যে জীবিত ও প্রত্যক্ষ, আমি স্বামীজীর কৃপায় ও করস্পর্শে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, এবং অপরাপর দেয় বস্তুর ন্যায় ইহা স্পষ্ট হাতে হাতে পাইলাম। দেখিলাম, শব্দ তর্ক বিদ্যা

বুদ্ধি কিছুই নয়, সব লয় হইয়া গিয়াছে। সবই এক—এক—এক জীবন্ত; জীবন্ত বা এক চিৎ অসীমভাবে বিরাজ করিতেছে। আবার পরক্ষণে দেখিলাম—সেই অসীম প্রাণ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের সৃষ্টি হইতেছে। সকলের ভিতরই সেই এক প্রাণ; অসীম সসীম ও সসীম অসীম। রূপ দেখি, অবয়ব দেখি, রূপ দেখিলে অসীমকে দেখিতে পাই না। যদিও রূপের ভিতরই অসীম রহিয়াছে, কিন্তু আবার যখন অসীম ও দেখি নাম রূপ দেখি না। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে এক হইতে অপরটি কিরূপে ধারাবাহিকরূপে আসিতেছে তাহা আমি বিশেষ বুঝিতে পারিলাম না। কারণ এই গুরু ব্যাপারটি এত চকিতের ভিতর হইতে লাগিল যে আমি ভাবিবার বা চিন্তা করিবার অবসর পাইলাম না। শুধু স্বামীজীর কৃপায় এই মাত্র বুঝিলাম যে ধর্ম্ম জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষের বিষয়।

মহাত্মাদিগের নিকট শুনিয়াছি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতরও এই ভাব ছিল, তিনি ইচ্ছামাত্র অপরের মনটীকে উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারিতেন, এবং তর্ক যুক্তির অতীত স্থানে মন তুলিয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত প্রাণ শক্তি দেখাইতে ও সঞ্চার করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীজীর ভিতর এই শক্তিটী আমি স্পষ্ট ভাবে দেখিয়াছি। এবং ইহাকেই দীক্ষা বলে। শক্তির সঞ্চার করিতে না পারিলে তাহাকে দীক্ষা বলা হইতে পারে না।

আমাদের দীক্ষার পর আমরা সেই স্থানে আহারাদি করি এবং তৎপরে সেবাশ্রমের কার্য্যের জন্য চলিয়া আসি; এই সময় স্বামীজীর ভাব লইয়া তিন বৎসর পূর্ব্বেই একটি সেবাশ্রম গঠিত হইয়াছিল এবং কার্য্যও সামান্য ভাবে চলিতেচিল। সেবাশ্রমের কর্ম্মীদের মাধুগিরি বা অপর স্থানে ভিক্ষা করিয়া সেবাশ্রমের কাজ করাতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। স্বামীজীর প্রিয় কার্য্যতে বালকরা প্রাণপাত করিতেছে। অর্দ্ধাশনে শরীর কৃশ হইতে লাগিল দেখিয়া স্বামীজী মনে বড় ব্যথা পাইলেন। স্বামীজী সকলকেই ভাল ভাবে আহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। মাছ, মাংস ভক্ষণ করিয়া শরীর সবল ও পুষ্ট রাখিতে বলিলেন এবং বলিলেন কার্য্য আমাদিগকে করিতেই হইবে। তেজস্কর আহার না করিলে রোগীর সেবা ভালরূপ চলিবে না; স্বামিজী তাঁহার সহিত আমাদিগকে আহার করিতে বলিলেন। এই সময়ে কেহ স্বগৃহে আহার করিত। সেই জন্য তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্য বারংবার আজ্ঞা করিতেন, এবং আমরা মাঝে মাঝে সুবিধা পাইলে তাঁহার সহিত আহার করিতে যাইতাম।

আমাদের মধ্যে একটি বালক কৃশ ছিল। স্বামীজী তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াছিলেন। স্বামীজীর সেবাশ্রমের কর্ম্মিদিগের উপর কিরূপ দয়া ও স্নেহ ছিল, তাহা এই বালকটির উপাখ্যান বিবৃত করিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে।

এই সময় জনৈক অল্পবয়স্ক যুবক দেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যুবকটি অনন্যোপায় হইয়া আশ্রমের কর্ম্মে যোগ দিল। তাহার শরীর দুর্ব্বল ও রুগ্ন; যুবকটী একদিন স্বামীজীকে দর্শন করিতে যায়; স্বামীজী তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত পরিচয় লইলেন; শরীর রুগ্ন ও কৃশ দেখিয়া স্বামীজী ব্যথিত ও উন্মনা

হইয়া পড়িলেন এবং মধুরস্বরে তাহাকে বলিলেন, বাবা "তোমার শরীরটা দুর্ব্বল, তুমি প্রত্যহ দিনের বেলা এখানে আসিয়া খাইবে, পেটে না খাইলে কাজ করা যায় না; তা তুমি রোজ দুপুরবেলা এসে আমার সঙ্গে খাবে। যুবকটীর সেবাশ্রমের কাজ করিয়া আসিতে কখনও কখনও বিলম্ব হইত। স্বামীজীর শরীর অসুখ, তাঁহার সময় মত স্নানাহার না হইলে পীড়া হইতে পারিত, সকলে তাঁহাকে সময় মত স্নানাহার করিতে বলিল; বহুমূত্র রোগীর আহারের অনিয়ম হইলে শরীর বিশেষ খারাপ হয়। ডাক্তার ও তাঁহার গুরু ভাইরা সর্ব্বদা তাঁহাকে আহারের বিষয় নিয়মিত হইবার জন্য মিনতি করিতেন এবং স্বামীজী সে বিষয়ে বিশেষ বুঝিতেন; কিন্তু স্নেহ এমনই জিনিষ, এমনিধারা তাহার প্রবল শক্তি যে বিধি নিয়ম ও পীড়ার বৃদ্ধি কিছু মানে না; সকল নিষেধ অতিক্রম করিয়া নিজের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যুবকটির জন্য স্বামীজীর মন আহারের পূর্ব্বে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত; সর্ব্বদাই তিনি পাদচারণ করিতেন এবং প্রতীক্ষা করিয়া এদিক ওদিক চাহিতেন, দরজার দিকে ও রাস্তার দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকিতেন, এবং সে সম্মুখে আসিত তাহাকেই কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেন, "ছেলেটি কি আসিয়াছে? আজ এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? আহা ছেলেটা এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খায়নি, রোগা শরীর, অল্প বয়স, তারপর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ইত্যাদি।"

কোন অতীব বৃহৎ কার্য্যেতে যদি বিশেষ শক্তি ও মনোনিবেশ আবশ্যক হয়, সেই সব কাজেতে স্বামীজী চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া, স্থির গম্ভীর স্নেহপূর্ণ উন্মনাবস্থ হইয়া থাকেন, এই যুবকটির আহারের বিলম্ব নিবন্ধনে তিনি সম্পূর্ণভাবে সেইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, সেই উন্মনা, সেইরূপ অভীষ্ট বস্তু কিছু লাভ হইবে, তাঁহার মনের ভাব ঠিক তদ্রূপ হইত। ছোট বা বড় কার্য্য তাঁহার কাছে ভিন্ন ছিল না। সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর সাম্নে বেদান্ত চর্চ্চা করা, উচ্চ অঙ্গের ধ্যান ধারণা করা এবং এই ছেলেটিকে ভোজন করান সবই তাঁহার কাছে এক ছিল। একই মন, একই ক্রিয়া, একই সিদ্ধিলাভ।

আহারের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে বিশেষ অনুনয় করিত,হয়ত তাঁহার স্নান সমাপন হইয়াছে, শুষ্ক বস্ত্র পরিয়াছেন। আহার্য্য সামগ্রী অশুষ্ক হইয়া যাইতেছে, অপর সকলেই আহারের জন্য ব্যগ্র ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু স্বামীজীর পূর্ব্বে কেহই ভোজন করিতে ইচ্ছুক নন্।

মনে মনে সকলেই বিরক্ত হইতেছে, স্বামীজীর সে দিকে কোন দৃকপাত নাই, তাঁহার সে বিষয়ে স্মরণ নাই, স্বামীজী পাদচারণ করিতেছেন এবং নানা প্রকার ভঙ্গী করিয়া মনে তীব্র ভাব প্রকাশ করিতেছেন, ওষ্ঠ, নেত্র, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আবেগের প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যেন কোন প্রিয় বস্তুর অদর্শন হেতু উন্মনা ও ব্যথিত হইয়া সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং অনিমিষ নয়নে পথের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি করিতেছেন এবং স্থির চিত্তে, "আকুল বেণী, ধাইল রাণী, ঘনশ্বাস বহে তাহে, ননী লয়ে করে, স্তনে ক্ষীর ঝরে, অনিমিখ পথ চাহে" এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, যাহা যে বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়, বাৎসল্য প্রেম যে কি তীব্র আবেগ হৃদয়ে আনে, তাহা স্বামীজীর ভিতরে আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি। এবং বৈষ্ণব

গ্রন্থে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থে পড়িয়া যা না বুঝিয়াছি, স্বামীজীর ভাব দেখিয়া আমরা অক্ষরে অক্ষরে তাহা অনুভব করিলাম।

অবশেষে ছেলেটি ক্ষিপ্র গতিতে প্রবেশ করিল। বৎসহারা ধেনু পুনরায় বৎস পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, বালকটীকে দ্বারদেশে দেখিয়া স্বামীজীর মুখভাব তদ্রূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। চিন্তিত, কুঞ্চিত উদ্বিগ্ন ভাব তিরোহিত হইল। মুখ হরষে পরিপূর্ণ হইল, স্মিত মুখে মধুর স্বরে স্বামীজী বালকটীকে প্রশ্ন করিলেন,"কিরে বাবা এত দেরী হ'লো কেন? কাজ বড্ড পড়েছিল? সকালে কিছু জল খেয়েছিলি? তোর জন্যে এখনও আমি কিছু খাইনি। হাত পা ধুয়ে নে, শিগগির শিগগির খাইগে চল্। আমার অসুস্থ শরীর, সময় মত না খেলে অসুখ বাড়ে। একটু সকাল সকাল আস্‌বার চেষ্টা কর্‌বি। তবে কাজের ঠেলা কি কর্‌বি বল।"

বালকটী কথা কহিয়া কোন কৃতজ্ঞতা বা আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু বালকটী নয়নাপাঙ্গ দিয়া সরলভাবে স্বামীজীকে ক্ষণে ক্ষণে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং সে যে বিশেষ অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছে নম্র মুখ, লজ্জিত অধোবদন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারিল। স্বামীজী বালকটীকে আপনার পশ্চাতে লইয়া আহার করিতে গেলেন। সকলে উপবেশন করিলে স্বামীজী বালকটীর দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিলেন এবং আপনার পাত থেকে সুস্বাদু জিনিষ লইয়া বালকটীকে দিতে লাগিলেন। বালকটী নির্ব্বাক ও আনন্দে পুলকিত হইয়া, তাহা অতীব দুর্লভ অমৃত তুল্য বস্তু বোধ করিয়া আহার করিতে লাগিল। যতক্ষণ পেটে ধরিতে পারে, স্বামীজী নিজের পাতা হইতে উঠাইয়া সুস্বাদু ও মিষ্ট জিনিষ তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। নিজে খাইলেন কি না তাহা একবারও তাঁহার মনে হইল না। হয়ত নিয়মিত আহারেরও কিঞ্চিৎ কম হইল; কিন্তু নিরাশ্রয় গরীবদের সেবা করা এবং বালকটী নিরাশ্রয় ও অল্পবয়স্ক বলিয়া ইহাকে আহার করানো যেন মহৎ কার্য্য। স্বামীজী এই কার্য্যে আনন্দিত পুলকিত হইয়া আপনার আহার বিস্মৃত হইয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে নিজ নিজ খাদ্য খাইতে লাগিলেন কিন্তু স্বামীজীর প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ ও বালকটী আহার করিতেছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দ ও মুখ চোখের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, তাঁহারা নিজ নিজ আহার্য্যের বিষয় বিস্মৃত হইয়া স্বামীজী ও বালকের ভোজনলীলা দেখিতে থাকিতেন ও মাঝে মাঝে আনন্দ করিয়া স্বামীজীকে অনুনয় করিতেন, "স্বামীজী আপনার আহার হইতেছে না, আপনি একটু আহার করুন।" কিন্তু কাহাকেই বা বলিতেন, কেই বা শুনিতেন। স্বামীজী যেন আত্মহারা হইয়া বালকটীকে ভোজন করাইতেছেন। যেন প্রত্যক্ষ গোপালকে আহার করাইতে-ছেন, শুধু অভ্যাস বশতঃ মাঝে মাঝে নিজে খাইতেন। ভোজন গৃহটী যেন আনন্দ উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা মানবলীলা কি দেবলীলা তাহা বিচার করা সুকঠিন। আনন্দ আনন্দকেই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আনন্দ স্বয়ংই প্রত্যক্ষ। বস্তু তাহারা তো নিমিত্ত মাত্র। এরূপ আনন্দের ভোজন পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া মনে সর্ব্বদাই ইহা জাগরুক রহিয়াছে।

স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ)

হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরকার কথা

গতবারের প্রবন্ধের শেষভাগে বলিয়াছি যে গোড়ায় বিশুদ্ধজ্ঞানকে উদ্বোধন করিয়া তুলিলে তাহা হইতে যে আমরা কত বড় মহৎ ফল পাইতে পারি তাহা বারান্তরে বলিব। এক্ষণে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমবারের প্রশ্নকর্ত্তা বাস্তবিক সত্তা কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিলেন। মনুষ্য জ্ঞানবান জীব আর সেইজন্য সকল মনুষ্যই আপনার জ্ঞানের আশ মিটাইবার জন্য বাস্তবিক সত্তাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। চায় বাস্তবিক সত্তা মনুষ্য মাত্রই, অক্ষয় জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে সকল লোকেই; কিন্তু সে যে অক্ষয় জীবন—পায় তাহা অতি অল্পলোকই,…সহস্রের মধ্যে হয় ত একজন। পশু পক্ষীদের নিকট সমস্তই বাস্তবিক; তাহাদের কাছে তাহাদের খাবার জিনিষ বাস্তবিক, বাচ্ছারাও বাস্তবিক, নীড়ও বাস্তবিক। কোন কিছুকেই তাহারা অবাস্তবিক বলিয়াও জানেনা, অস্থায়ী বলিয়াও জানে না, নিষ্ফল বলিয়াও জানে না;—জানে না এইজন্য——যে হেতু মনুষ্যের ন্যায় তাহাদের জ্ঞান নাই। মনুষ্যের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবামাত্রই দৃশ্যমান জগতের অস্থায়ীত্ব তাহার অন্তশ্চক্ষুতে ধরা পড়ে। মনুষ্যের অন্তরাত্মা চায় স্থায়ী সত্য কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান রীতিমত পরিস্ফুট না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত—চায় সে স্থায়ী সত্য পায় সে অস্থায়ী সত্য, কাজেই সে নিরানন্দে ও নৈরাশ্যে নিমগ্ন হয়। সাধনার দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান চক্ষু যখন রীতিমত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন তাহার অন্তরাত্মা যাহা চায় তাহাই সে জ্ঞানে পায়; আর তাহার সেই প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়া এক সঙ্গে মিলিয়া পরম আনন্দে পরিণত হয়।

তিনটি পৃথক পৃথক আলোচ্য বিষয় আমরা এখানে পাইতেছি। প্রথম পাইতেছি অক্ষয় জীবনের বাস্তবিক সত্তা, দ্বিতীয় আমাদের জ্ঞানে সেই বাস্তবিক সত্তার প্রকাশ, তৃতীয় সেই জ্ঞানের প্রসাদে পরম আনন্দ লাভ করিয়া মনুষ্য জীবনের চরিতার্থতা সাধন। শ্রেয়ঃকামী মনুষ্য সাধনের সোপান অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত চরম কৃতার্থতায় উপনীত হন। শাস্ত্রে বলে সাধন সোপানের প্রথম ধাপটি হচ্ছে নিত্যানিত্য বিবেক, দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে অনিত্য বিষয় হইতে মনকে টানিয়া লইয়া নিত্য সত্যে তাহাকে সমাহিত করা। সাধনের অপরিপক্ক অবস্থায় মনকে অনিত্য বিষয় হইতে টানিয়া লওয়া যে হেতু অতীব সুদুষ্কর এইজন্য তৃতীয় আর একটী সোপান অবলম্বন না করিলে সাধক পদে পদে বাধা বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া মধ্য পথে তাহার হস্তপদ এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে যে তাহার উর্দ্ধে আর একপদও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য থাকে না। সেই তৃতীয়

সোপানটি হচ্ছে ঈশ্বরোপাসনা। আগে জ্ঞানের উদ্বোধন, তাহার পরে সেই উদ্বোধিত জ্ঞানকে নিত্য সত্যে সমর্পণ, এবং তাহার পরে পরম আনন্দে স্থিতিলাভ।

এইরূপ একধাপ মাড়াইয়া দ্বিতীয় ধাপে ও দ্বিতীয় ধাপ মাড়াইয়া তৃতীয় ধাপে উত্তরোত্তর পৌঁছান আমাদের নিকট ক্রম সাপেক্ষ; পরন্তু আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা উপনিষদাদি গ্রন্থে তাঁহাদের অভিপ্রায় যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে এটা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে পারমার্থিক রাজ্যে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনের মধ্যে কণামাত্র প্রভেদ স্থান পাইতে পারে না। পারমার্থিক রাজ্যে অর্থাৎ স্বরূপ রাজ্যে বাস্তবিক সত্তাই পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান এবং প্রাণের সত্য সেই জ্ঞানে প্রকাশমান থাকা কারণে সেই জ্ঞানই পরমানন্দের প্রস্রবন। যোগী পুরুষেরা সেই গোড়ার সৎচিদানন্দের সহিত আপনাদের অন্তঃকরণের সুর মিলাইয়া সেই ধন লাভ করেন যাহা লাভ করিলে,—গীতা বলেন "সাধকের আর কোন লাভই তাহা অপেক্ষা অধিক মনে হয় না।" বীণা যন্ত্রে সুর বাঁধা হইলে তাহা হইতে যখন যে গীতধ্বনি বাহির হয় তাহাই যেমন শ্রোতৃবর্গের শ্রবণে অমৃত বর্ষণ করে সেইরূপ গোড়ায় সৎচিদানন্দের সহিত সুর বাঁধা হইলে সাধক যখন যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইতেই কল্যাণের অমৃত ধারা জগৎ সংসারে বর্ষিত হইতে থাকে। তখন সাধকের অন্তঃকরণে অনুপম আনন্দের হিল্লোলে সমস্ত দেশকালের ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া গিয়া, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন সুরের পরস্পরের সহিত একতানে যোগ বাঁধিয়া যায় এবং সমস্ত জগতের সমস্ত রন্ধ্র পরিপূর্ণ করিয়া গভীর মন্ত্রস্বরে ওঙ্কার ধ্বনিত হইতে থাকে।

এইরূপ ব্যবধান বিলোপের মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য চাপা দেওয়া রহিয়াছে; রস ভঙ্গের ভয়ে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না; বারান্তরে তাহা বিবৃত করিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেয়াল খাতা

"রবীন্দ্র বারমাস্যা"

(শ্রাবণের জের)

হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসো এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে শ্রাবণ বরিষণে।

* * *

ডাক দিয়েছ ঝড় তুফানে
বোবা মেঘের বজ্রগানে
ডাক দিয়েছ মরণ পানে
শ্রাবণ রাতে উতল ধারে।

* * *

ভাদ্র

(১)

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি
আজ আমাদে ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি॥

* * *

(২)

বাদর ঝর ঝর গরজে মেঘ
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ
স্বপনে কেটে যায় রাতি॥

* *

(৩)

শরৎ প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা * *

* * *

(৪)

শরৎ মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহ কাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোত কুজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাত প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা।

* * *

(৫)

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য, গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী
পরেছে কিরীট কনক কিরণে, মধুর মহিমা হরিতে হিরণে
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে দাঁড়ায়েছে মোর জননী॥

* * *

অমল শরত শীতল সমীর বহিছে তোমায় কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বন-পথে ফুল যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া,
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি ভরেছে তোমার ডালা॥

* * *

আজ তোরা দেখ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানী।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টি-ভরা ঈশান-কোণের নব মেঘের বাণী॥

*

যেন শরতের মেঘখানি ভেসে,
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েচ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি।

* *

শরত-প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বনতল শিশির-সুশীতল,
পুলকাকুল তরুবল্লরী॥

* *

এই শরৎ-আলোর কমল বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে ।

* *

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয় !
আজকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায় ।
পতঙ্গ যেন ছবি সং আঁকা
শৈবাল পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক
গাছের ছায় ॥

* * *

কলস পাকড়ি আঁকড়ি বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমির নিবিড় ঘন ঘোর ঘুমে
তারি সোণার কাঁকণ বাজে স্বপন প্রায়
আজি প্রভাত কিরণ মাঝে
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ॥

* * *

শরৎ আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে ।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ॥

* * *

শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় উঠে চঞ্চলি ॥

* * *

এস গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্ম্মল নীল পথে ।

* * *

শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে,
আনন্দ-গান গা রে হৃদয়, আনন্দ-গান গা রে।

* * *

আজ শরত তপনে, প্রভাত স্বপনে,
কি জানি পরাণ কি যে চায়!

* * *

বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘ জাল,
মৃদু শীত বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

* * *

শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

পার্লামেন্টে মজার বক্তৃতা" ভাগ্য শিলা"র কথা

গত ১১ই জুলাই Commons সভায় Mr. Kirkwood এই অনুমতি প্রার্থনা করেন যে Scottish Stone of Destiny (Scotlandএর ভাগ্যশিলা) Westminster Abbey থেকে Holyrood palaceএ (Edinburgh) স্থানান্তরিত করার জন্যে তিনি পাণ্ডুলিপি পেশ্ কর্ত্তে চান্। তিনি বলেন যে প্রবাদ Bethelএ Jacob এই পাষাণখণ্ড উপাধানরূপে ব্যবহার করেন। তখন তিনি তাঁর ভাই Esauএর জন্মগত—অধিকার হরণ করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। Jacob পরিবারেরই কেও সেখানি Egyptএ কিম্বা Bible অনুসারে, সেখানি Goshen রাজ্যে নিয়ে যান্। বহুদিন সেখানি Egyptএর রাজাধিকারে থাকে। সেখানি Egypt থেকে Ireland এ নিয়ে যাওয়া হয়, এবং Tart's hillএ সেখানি খৃঃ পূঃ ৭০০ বৎসর আগে ছিল। প্রবাদ যে ঘটনাটি এইরূপই; অবশ্য সত্য মিথ্যা তিনি নিজে জানেন না। তবে তিনি এইটুকু জানেন পাষাণটি Scotlandএর বালুকাময় একখণ্ড প্রস্তর। Sconeএ এটি প্রায় ৫০০ বছর পড়েছিল, তারপর সুরু হ'ল Bruce আর Baliol এ কলহ। সেই কলহে মধ্যস্থ মানা হয় Edward ফার্ষ্টকে; তাঁকে সবাই "Scotland এর পিট্‌নি" এই আখ্যা দিয়েছিল। মধ্যস্থ হ'য়ে Edward তো চল্লেন Scotlandএ,—England থেকে। তিনি সকলের জবানবন্দি নিলেন্, দলিল দস্তাবেজ্ সব "তন্ন তন্ন" ক'রে খুঁজলেন; শেষে,—Professor Innesএর "Ancient Inhabitants of Scotlandএ যেরূপ পাওয়া যায়—তিনি সবশুদ্ধ Englandএ ফিরে এলেন্। আমি Professor Innes এর বইখানি সদস্যদের পড়তে অনুরোধ কচ্ছি; অনেকের কাজে লাগতে পারে।"

যাঁরা আত্মসম্মানজ্ঞানী ইংরাজ বলে পরিচয় দেন্, তিনি তাঁদের অনুরোধ কর্লেন্ যে তাঁরা যেন তাঁর কথাটির বেশ করে বিচার করে দেখেন্, যদিও প্রকৃতপক্ষে কথাটি তাঁর নয় কেননা, সেটি নেওয়া হ'য়েছে Profefsor Tytlerএর Scotlandএর ইতিহাস থেকে (এবং সেজন্যেই স্কচরা পাষাণ খণ্ডটি Scotlandএ ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত)। কথাটি হ'চ্ছে এই—যখন Edward I পাষাণখণ্ডটি Englandএ নিয়ে যান্, তিনি ভাবলেন্ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তিনি Scotlandএর স্বাধীনতাও নিয়ে যাচ্ছেন্। পাষাণখণ্ডটি "স্কচ" দেশাত্মবোধের প্রতীকস্বরূপ। এটি খুবই শ্রদ্ধার সামগ্রী, এবং ঠিক্ এইজন্যেই Scotland বারবার এটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। ১২৯১খৃষ্টাব্দে Edward I ভাবলেন তিনি Scotlandকে সম্পূর্ণ জয় করেছেন এবং যেটুকু দেশাত্মবোধ তার মধ্যে ছিল সেটুকু নিঃশেষে নিষ্পেষিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সেরূপ কর্ত্তে পারেন্নি। কেন না, তিনি (Mr Kirkwood) সেই অপরাজিত জাতির মুখপাত্ররূপে তাঁদের সাম্নে আজ দাঁড়িয়েছেন। বৎসরকাল যেতে না যেতেই Scotlandএর জাতীয় বীর Wallace রঙ্গমঞ্চে নাম্লেন এবং ইংরাজদের একেবারে বহিস্কৃত কর্লেন।

১৩১৪ খৃঃ অব্দে Bannockburn এর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হ'য়ে ইংরাজেরা সন্ধিপ্রার্থনা কর্লে। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে Northamptonএর সন্ধি অনুসারে Scotlandকে পাষাণখণ্ডটি ও অন্যান্য চিহ্নগুলি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু ইংরেজদের মনোভাব ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বলে তখন সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।—তাঁকে ও তাঁর বন্ধুদের "বস্তুতান্ত্রিক" বলা হ'য়েছে কিন্তু এ অভিযোগ মিথ্যা ; তাঁরা দেশবাসীর জন্যে আহার ও আবাস তো চানই সেই সঙ্গে তাঁরা সুন্দর মনোজ্ঞ দ্রব্যও দাবীও করেন। ধর্ম্মের অতীতের ও ভাবের যে সকল বন্ধন জাতিটিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছে,—সেই সকল বন্ধন তাঁরা ভালবাসেন,—কেননা—জীবনের নিছক সাংসারিক বস্তুগুলি রুটিরই মত—মুখে দিলেই ধূলিতে পরিণত হয়। তাঁরাই সত্যকারের বস্তুতান্ত্রিক যাঁরা কোনও জাতির নিজেদের দেশাত্মবোধের প্রতীক ও চিহ্নগুলি ফিরে পাবার ও পূজা করবার সঙ্গত দাবী অগ্রাহ্য করেন্ ও সেই জাতিকে বিদ্রূপ করেন। Lord Apsley (Southampton, U). বল্লেন যে Mr. Kirkwood ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত অনুসারে বলেছেন্ যে পাষাণখণ্ডটি Kenneth Mc Alpin Scone এ নিয়ে আসেন। Scotlandকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করায় তিনি সেটি Popeএর জনৈক অনুচরের কাছ থেকে উপহার পান্ ; আমাদের মাননীয় সদস্য মহোদয় যা ব'লেছেন সে'কথা যদি সত্যই হয় তা'হলে তাঁর পক্ষে এটি মোটেই সুখের হ'বেনা, কেননা শিলাখণ্ড যদি Jacob এরই হয়, তবে সেখানি যেখানকার সেইখানে, Jewদের কাছে দিয়ে আসা উচিত। আর তিনি যে মজার প্রশ্নটি তুলেছেন যে শিলাখণ্ডটি Scotlandএর রক্তশিলা ছাড়া আর কিছুই নয়, তিনি আরও বিশদ করে বল্তে পারতেন যে তাঁকে খুবই কষ্ট করে Hill of Bethelএ অনেকগুলি রাত্রি যাপন কর্ত্তে হয়েছিল, এবং সেখানেও সেই রক্তশিলা

ছিল। যাক্, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এটি খুবই সৌভাগ্যের কথা যে প্রবাদ মোটে এই একটি নয়; আরো অনেক আছে। তাদের মধ্যে আবার সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য প্রবাদ হচ্ছে এই—Ericএর ছেলে Fergus এই শিলাখণ্ড নিয়ে আসেন এবং তিনিই Ireland থেকে Dalriadদের নিয়ে এসে Scotia অথবা Scotlandএর প্রতিষ্ঠা করেন্।

Scotland এবং Ireland—এই দুই জায়গাতেই স্থানীয় প্রবাদ, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই শিলাখণ্ড স্কচদের অধিকারে ছিল।—ভাগ্যশিলাখণ্ডের উৎপত্তির আর একটি মজার ইতিহাস আছে। Odin দেব অন্য আর একটি দেবতার উপর খুবই ক্রুদ্ধ হ'য়ে (তিনি নাকি Odin প্রিয়ার দিকে অভদ্রভাবে তাকাচ্ছিলেন্!) এই শিলাখণ্ড ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু সেই দেবতাটির সৌভাগ্যবশতঃ শিলাখণ্ডটি তাঁর মাথায় না লেগে একেবারে Scotlandএ এসে পড়ে। তারপর থেকে স্কচেরা সেই শিলাখণ্ডকে পবিত্রজ্ঞানে পূজা করে আস্ছেন। তাঁদের বিশ্বাস যে এ মর লোকের কেহ যদি সেই অমর দেবতার ন্যায় অপরাধ করেন, তবে তাঁর ভাগ্যেও ঠিক্ সেই রকম শাস্তিই আছে! বোধ হয় ঠিক এইজন্যেই তাঁরা তাঁদের রাজগণের রাজ্যাভিষেক এই শিলাখণ্ডের উপরই সম্পন্ন কর্ত্তেন্। গ্রীকেরা আবার Odin এর জায়গায় করেন্ Zeus। যাঁরা, স্কচরা যে Pyrrhas এর ছেলের সঙ্গে উত্তরগ্রীস্ (বর্ত্তমান Albania) থেকে আসেন,—এ গল্পে বিশ্বাস করেন,—তাহাদেরই মনোরঞ্জনের জন্যে তিনি এ কথাটির উল্লেখ কচ্ছেন।—তাঁর বিশ্বাস যে Albaniaতেও শিলাখণ্ড পাওয়া এবং সে শিলাও রক্তবর্ণ। সুধী ভূতত্ত্ববিদেরা এই শিলাখণ্ডের উৎপত্তি বিষয়ে যদি গবেষণা করেন্ও এই জাতির আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রভৃতি আলোচনা করেন,—তবে সেটি খুবই শোভন ও সুখের হয়।—

বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে Mr. Kirkwood ঠিকই বলেছেন যে Scotland থেকে শিলাখণ্ড Edward I নিয়ে যান। কিন্তু এ কথা কেবল Whig ঐতিহাসিকেরাই (যাঁরা বাস্তব ঘটনার কোন ধারই ধারেন না) বল্বেন যে খালি নিছক মজা দেখার আর রাজা হবার জন্যেই Edwrd I স্কট্ল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। দু' বছর আগে Franceএর সঙ্গে Baliol যে সন্ধি স্থাপন করেন, সেই সন্ধিরই সর্ত্ত অনুসারে Edward কে Scotland এর বিরুদ্ধে বিজয় অভিযানে যাত্রা কর্ত্তে হয়েছিল;—তার ফল হয়েছিল Scotland কর্ত্তৃক বার কতক Englandএর বিরুদ্ধে নৃশংস অভিযান; তখন Reparation Commission ও ছিল না, আর না ছিল League of Nations; তবে তখন ছিলেন পোপ যিনি চরম মীমাংসা কর্ত্তেন; কিন্তু মজা এইটুকু যে সত্যিকারের গোলমালের কারণ যেখানে থাক্ত, কোন পক্ষই তাঁর মীমাংসায় কর্ণপাত করত না।—এই সব বেশ করে বিবেচনা করে Edwrd ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই ভাগ্য শিলাখণ্ডই রেখে দিলেন। আর বোধ হয় তাঁর সময়ে এ কাজ করে তিনি দস্তুর মত সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, কেননা

পরবর্ত্তী যুগে স্কচেরা যখন "পণমূল্যে" পঞ্চম Jamesকে মুক্ত করে নিয়ে যায়, সে "পণ" আর তারা দেয় নি। সেইজন্যে, শিলাখণ্ডও ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি।

উপসংহারে তিনি বলেন্ এই 'বিলের' প্রতিকূলে তিনি দাঁড়াচ্ছেন এমন গুটিকতক কারণে যেগুলি হয়তো কুসংস্কার বলে ভ্রম হ'তে পারে। তাঁর নিজের শিরা ও ধমনীতে স্কচ শোণিত প্রবহমান; এই শিলাখণ্ডের সম্বন্ধে লাতিন কবিতার (যার উৎপত্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত) দুটি চরণ আছে যার ভাবার্থ এই—

"ভাগ্যলক্ষ্মী যদি না নিদয়া হ'ন্,
স্বপন না যদি শুধুই স্বপন হয়,
রহিবে যেখানে এ পূত পাষাণখণ্ড,
হইবে সেখানে কেবলি স্কচের জয়।"

তিনি মোটেই চান্ না যে তাঁর স্বদেশ এবং এই সাম্রাজ্য স্কচ মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু এই একটি মাত্র কারণেই তিনি এই Billএর প্রতিকূলে দাঁড়াতে পারেন।

শেষকালে কিন্তু Bill পেশ করবার অনুমতি Mr. Kirkwood পেলেন। তাঁর স্বপক্ষে ২০১ ভোট ও বিপক্ষে ১৭১ ভোট দেওয়া হয়। যখন ভোটের ফল বের হ'ল, চারিদিক থেকে হাস্য ও কলরোল তাঁকে অভিনন্দন কল্ল'। তিনি যখন Bar থেকে টেবলে Billটি রাখলেন, তখন আর একদফা হাসির তরঙ্গের সঙ্গে মেঘমন্দ্র জয়ধ্বনি উঠে তাঁর অভিনন্দন সুসম্পূর্ণ কল্লে'।

শ্রীসুধেন্দুকুমার বসু।

চারের চতুরাই

আমি চার। আমার বিক্রম ও বিস্তৃতির ব্যাখ্যা শুনিয়া যান। প্রথমেই আমার অস্তিত্ব দেখুন কিরূপ জগৎব্যাপী ও 'দমে ভারী' কারণ হিন্দুধর্ম্ম বলিতে যে প্রধান গ্রন্থ বেদকে বুঝায় তাহা আমাকেই লইয়া—বত্রিশ পাটি বেদ হিন্দুদের মোটেই নাহি, তাহা মাত্র চারখানি, সাম যজুঃ ঋক ও অথর্ব্ব সুতরাং আমাকে লইয়াই যখন বেদ তখন আমিই হইলাম হিন্দুধর্ম্মের কিরীট। তাহার পর ধর্ম্মের যে পাদ তাহাও দেখুন চারিটি (যদিও কলিকালে তিনটি পদেরই না কি এমপ্যুটেশন হইয়াছে ও ধর্ম্ম মহাশয় সন্তান-স্নেহরূপ একটি পদে কষ্টে সৃষ্টে কোনও রকমে 'নীল ডাউন' হইয়া আছেন, তথাপি মূল পাদ চারিটি ত ?) আচ্ছা তাহা হইলে দেখা গেল যে ধর্ম্মের চারি বেদে ও চারি পাদেই আমিই আছি, আর চারিদিকে যে আমি আছিই তাহা ত চারিদিক কথাটাই প্রমাণ করিয়া

দিতেছে ; তাহার পর ধরুন হিন্দুধর্ম্মের যে প্রধান পর্ব্ব মহাপূজা, তাহাতেও আমিই আছি, মহামায়াকে দুইবার বা তিনবার আনিলে চলিবে না, চারিবারই আনিতে হইবে (অবশ্য একবারও অনেকে আনেন বটে—কিন্তু কেবল আমার শত্রুতা সাধনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য)। আবার দেখুন হিন্দু দেবতাদিগের মধ্যে যদিও তিনটি দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরই প্রধান, তবুও মহাকাল আদ্যাশক্তি কালীকে ত আর ছেঁটে ফেলা চলে না, অতএব সেই হরে দরে চারই দাঁড়ায়। ব্রহ্মার আবার চারিটি মুখ, বিষ্ণুর চারিটি হাত ও তাহাতে শঙ্খ চক্র, গদা, পদ্ম এই চারিটি দ্রব্যই সদাই বিরাজিত থাকে। দুর্গা পূজা প্রকৃত পক্ষে চারিদিনই হইয়া থাকে ; এই সব ব্যাপারে অতি সরলভাবেই প্রমাণ হইয়া গেল যে ধর্ম্মের আষ্টে পৃষ্ঠে আমারই বন্ধন।

আচ্ছা এই ত গেল ধর্ম্মের কথা, তাহার পর অন্যান্য ব্যাপারেও আমার আধিপত্য কিরূপ বিস্তৃত তাহাও দেখুন। একটি মার্জ্জারের হাত পা ও লেজ ধরিবার জন্য তিনটি লোকই যথেষ্ট কিন্তু তাহার 'মেও'টি ধরিবার বেলায়ই চতুর্থের প্রয়োজন অর্থাৎ আমিই আহুত হই! এই যে মানব জন্ম যাহার সার্থকতা মনে করুন বিবাহ দ্বারাই সম্পন্ন হয়—সেই বিবাহের প্রধান অঙ্গ যে চারি চক্ষুর মিলন তাহাও আমাকেই লইয়া (কণে কি বর কাণা বা অন্ধ হইলে অবশ্য আমি 'ফেল্' হইলাম তাহা মানিয়া লইতেছি।) আর চারি হাত এক হইলেই যে বিবাহিত দম্পতী মুক্তির অধিকারী হয় তাহাও সকলেই বিদিত আছেন। সাবেক কালের বিবাহের বর সাধারণতঃ চতুর্দ্দোলে চাপিয়া বিবাহ করিতে আসিত। স্ত্রী আচার বাসি বিবাহ ইত্যাদি যে স্থানে সম্পন্ন হইত তাহার চারিকোণে চারিটি কলার তেউড় রাখা হইত (আজকাল ও যে তাহা না হয় তাহা নহে।) আজ কালকার অনেক বরও চৌঘুড়ি চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। 'অভাগার ঘোড়া মরে' প্রবাদ হিসাবে চতুর্থপক্ষের বিবাহিত পুরুষ 'মোহিত বাবু' অপেক্ষা কম সৌভাগ্যশালী নহেন।

পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে অনেক ভাল ছেলে প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রাইজ না পাইলে শেষ পৈঠা আমাকেই বরণ করিয়া লয়। পৃথিবীতে বাঁচিতে হইলে আহারের যেমন প্রয়োজন তেমনি বাসগৃহেরও প্রয়োজন, আর সেই বাসগৃহ অর্থাৎ ঘর নির্ম্মাণ করিতে কয়টি দেওয়ালের প্রয়োজন হয় তাহা অত্যন্ত আনাড়ী রাজও' জানে (অবশ্য কেহ যদি বদ্ধপরিকর হইয়া সহরময় জলটুঙ্গিই গড়িয়া বেড়ান তাহা হইলে আমি নাচার)। তাহারপর ধরুন একটু সুখে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে হয়তো আপনি একখানি বাগান করিবেন, তাহা হইলেও তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে যদি সেই বাগানের চারি তরফ খোলা থাকে, চারিধার দিয়ে হাওয়া খেলে, চতুষ্কোণবিশিষ্ট পুষ্করিণী থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি কেমন ঠিক কি না ? তাহলে আমার প্রভাব পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে দেখিতে পাইতেছেন ত।

আরও দেখিয়া যান,—মোটরকারের চাকা হচ্ছে চারখানি, ঘোড়ার গাড়ীরও তাই,

টারামারেরও (tramway) তাই, রেলের ইঞ্জিনেরও তাই, তবে অদন্ত্য বর্ব্বর যে গরুর গাড়ীটা, যাহার ক্যামাক ষ্ট্রীটে চলিতে মানা—সে অবশ্য আমাকে খাতির না করিয়া দুই চাকাতেই চলিয়া যায় কিন্তু নেটিভ যে তাহাকে মহামান্য ফিরিঙ্গি পুঙ্গব ডিক্রুজও নেটিভ বলিবে সুতরাং তাহার আবার মূল্য কি? না হয় সে আমাকে নাইই মানিল।

মনুষ্যের স্বভাবের উপরেও আমার প্রভুত্ব বড় কম নহে, লোকে অধিক রাগিয়া গেলে শত্রুকে চার চড়ে সিধা করিতে যায়।

ফিরিওয়ালা যদিও এক টাকায় তিনখানি কাপড় বিক্রি করে কিন্তু একখানি ফাউ থাকাতে মোট্ হয়ে দরে চারখানাই দাঁড়ায়। হাতের আঙ্গুল এক তরফায় চারটিই থাকে (অবশ্য বৃদ্ধ একধারে একাই একশো বটে)। বর্ষাকালে হরিচরণের চারভাজা রসিক জনকে কম আমোদ দেয় না। কেবলমাত্র মৎস্য ধরিতে যে চার লাগে তাহা আমার নামের ট্রেডমার্ক ব্যবহার করিলেও সংখ্যা হিসাবে তিনি আমার কেহই নহেন—মাত্র প্রকৃত প্রতারক ও প্রলোভিত করিবার একখানি—আমার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে এই মাসিক পত্রে ছাপাইয়া দিয়া স্বীকার করিতেছি (চার খেয়েও যদি কেহ বেলতলায় যান তবে আমাকে আর যেন পরে দোষী করিবেন না আমি যথেষ্ট সতর্ক করিয়া দিয়াই খালাস।)

সংসারে বাঁচিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, সেই অর্থের অস্থি মজ্জাতেও আমি কিরূপ ভাবে জড়ীভূত তা' দেখুন। চারিটি পয়সা হইলেই একটী আনা হয়, চারিটি আনি হইলেই একটি সিকি হয়, আর চারিটি সিকি হইলেই বোধ হয় টাকাটি ট্যাকে মজুত হ'ল কেমন কি না? সাধারণত লোকের বড়, মেজ সেজ, ছোট চারিটি ছেলেই হয় (অথবা দিনকাল হিসাবে অভাগার মেয়েই হয়)। বন্ধুও দেখুন প্রায় চারিটিই হয় 'চার ইয়ারী ক'থাই তার প্রমাণ। চারিজন জুটিলেই তাশ পাশা দশ পঁচিশ ইত্যাদি খেলা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। সে কালের রূপকথাতেও চারিটি বন্ধুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র সদাগরপুত্র (সেনাপতি বা কোটাল) পুত্র। ব্রাকেটের অঙ্ক যাঁরা কশিয়াছেন তাঁহারা সহজেই ব্রাকেট্‌টিকে শিকায় উঠাইতে পারিবেন। প্রবাদ বাক্যও আমার কিরূপ সম্মান করে দেখুন: একে শুণ শুণ, দুইয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল আর চারে হাট অর্থাৎ কিনা একেবারে বাজার বসিয়ে দিই। পৃথিবীতে যদিও ৭টি আশ্চর্য্যই প্রধান, কিন্তু তবুও আজকাল চারিটি ডেমিআশ্চর্য্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, যেমন বায়স্কোপ, বিমানপোত, বেতার বার্ত্তাবহ, বন্দেমাতরং ইত্যাদি। শেষোক্তটির আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে যাঁহার সন্দেহ আছে তিনি যেন সরকারের 'হুমো আফিষের' আভ্যন্তরিক হৃদিস্পন্দনের মাপের তুলনা সম্ভবপর হইলে, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ের সহিত একবার করিয়া লয়েন তাহা হইলেই তাহার দ্বিধাও খণ্ডিবে ও রাধাও নাচিবে। সাধারণ বিভাগে-বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌড় চারি পাশ অবধি ম্যাট্রীক্

আই. এ. বি. এ. ও এম্-এ। হিন্দু শাস্ত্রে যুগও চারিটি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। আবার দিক্‌ও চারিটি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এবং কোণও চারিটি অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈঋত। পৃথিবীও ভৌগলিক হিসাবে চারিটি মহাদেশে বিভক্ত—এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ইউরোপ। 'কতভাবে বিরাজিত বিশ্বমাঝারে মত্ত এ চিত তবু তর্ক বিচারে—'আমার মহিমাও যে কত ভাবে বিরাজিত তাহার সংখ্যাই বা কে করে আর কতই বা তা' বলিব। এই যেমন এদেশে চারিতলা বাড়ী হচ্ছে সঙ্গতির লক্ষণ, প্রশস্ত যে রাজপথ তাহার নাম আমারি মহিমার জন্ত চারপথ, রীতিমত যে বীর ও যোদ্ধা তাহার নাম চারভট, এই দারুণ গ্রীষ্মে শরীরের উপর যিনি ঝির ঝির করে বয়ে মন ও প্রাণ শীতল করেন তাহার নাম চারবায়ু, এই যে পঞ্চভৌতিক দেহ যাহার গুমরে সদাই আমরা ধরাকে ধ স্থানে স' এর আদেশ দিয়ে দেখি, তার শেষ পরিণতি চারিটি স্কন্ধোপরি শবরূপে চার পাইয়েতে শ্মশান পানে চারিটি বাক্য হ-রি-বো-ল (গভীর নিশীতে একেলা শুইয়া শুনিলে রাগিণী বলিয়া যাহা মোটেই ভ্রম আনয়ন করে না) উচ্চারণ সমেৎ দ্রুত ধাবন, এবং কন্যা সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে চতুর্থ দিনেই চতুর্থী শ্রাদ্ধে অন্ততঃ অৰ্দ্ধসদ্গতি লাভ, বাস। নিপাতনে সিদ্ধি লাভ।

একটী আদর্শ সংসার গড়িতে হইলে চারি ব্যক্তির প্রয়োজন, কর্ত্তা, গিন্নি ঝি ও বামুন। আমার সম্মান এত বেশী বলিয়াই স্কুলগুলির মাহিনা আজকাল দুই টাকা স্থলে চারটাকায় দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ নামের উপরেও আমার প্রভাব বড় কম নয়, চারি অক্ষরযুক্ত নাম পৃথিবীতে দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হয় যেমন আশুতোষ, অরবিন্দ আকবর, আরংজেব, আরথার, অভিমন্যু, আলিবাবা, কৃষ্ণধন, কাউপার কালিদাস, ক্রমোয়েল, কুম্ভকর্ণ, গোল্ডস্মিথ, জগদীশ, টেনিসন, ড্যালহৌসী, দশানন, দুর্য্যোধন, দীনবন্ধু, নারায়ণ, বাইরণ, বেদব্যাস, বলরাম, মিলটন, মেঘনাদ, মহাদেব, রঙ্গনাথ, লাজপৎ, সিন্ধুবাদ, হেমচন্দ্র ইত্যাদি ইত্যাদি কতই বা আর বলিব ?

আবার দেখুন চার সংখ্যারও হাওয়ার গাড়ী খানি রোলস্ রয়েস মেকারের, চার চার চার (ফোর ফর্‌টি ফোর) রাইফেল অসম্ভব শক্তিশালী বন্দুক। সংসারিক ব্যাপারেও লোকে আমার কিরূপ কদর করে তাহার সেরা প্রমাণ এই সামান্য দৃষ্টান্তটা থেকেই বুঝুন না কেন, যে লোকে দুচার টাকা পাইলে যত খুসী হয় এত বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না বলা বাহুল্য যে যদি চার টাকা পায় তবেই যতটা খুসী হয় ততটা আর দুটাকাতে হয় না।! কেমন কি না ? পর পর চারিটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলে বঙ্গ সংসারে নারীর মান কত ? চারিধাম যিনি ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহার মতন তীর্থ যাত্রীকে ?

অমন যে বায়োস্কোপ যাহা একবার দেখিতে পাইলে মানব জন্ম সার্থক হয়, তাহার দর্শনীয় মূল্য মাত্র চারি আনা। ফুটবল খেলাতে কলিকাতাবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা এত মাতিয়া থাকেন, সেই ফুটবল খেলাতেও দেখুন যদি মোহনবগান বিপক্ষদের চারিখানি গোল প্রথমেই দিয়া রাখিতে পারেন, তাহলে সেদিন আর তাঁহাদের পরাজয়ের কোনোও সম্ভাবনাই

থাকে না। চতুর্থ বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'পাশ' পূর্ব্বে অনেকেই হইতেন। আজকাল লেফাপার মূল্য চার পয়সা করাতে 'সরকার' আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

চারিটি রাস্তা যে স্থলে মিশে তাহার নাম চৌমাথা বা চৌরাস্তা (অথচ শ্যামবাজারে পাঁচ মাথা সপত্নী রাহু হইয়া তাহার এ গৌরবকে অনবরতই গ্রাস করিতে চেষ্টা করে বটে!) অমাবস্যা বা পূর্ণিমার অগ্রদূত হচ্ছেন চতুর্দ্দশী। বৈদ্যুতিক পাখার মধ্যে চারিখানি হাতাওয়ালা পাখাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উত্তম উত্তম পোষাক পরিচ্ছদগুলিই লোকে চারপাট করিয়া তুলিয়া রাখে। শুচিবাই যুক্ত স্ত্রীলোকেরা সক্‌ড়ি আবড়ি ইত্যাদি চার যায়গা করিলে, একেবারে নাচিয়া ওঠেন। চারি মিনিট ধরিয়া ভূমিকম্প হইলে ধরার জীবের রসাতল বেড়াইবার সৌভাগ্য ঘটে। চার সেকেণ্ড কাল স্থায়ী হইলে তবেই একটি চুম্বন কায়েমী (estd) হয় (সিকাগো এডমিনিষ্ট্রেটিভ রিপোর্ট ১৯০৪।) চারবার দাস্ত হইলে মেডিকেল সার্টিফিকেটের অধিকারী হওয়া যায়, রাইটার্স্ বিল্ডিংএর চুড়ায় চারিটি 'মটোর' প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। দ্বীপান্তরে যাইতে কয়েদীর চারদিন সময় বাজে নষ্ট হয়। এক চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি কোনোও পাঠশালার সম্মুখ দিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ যাইতে থাকেন তাহালে তাঁহার দর্শনে তৎক্ষণাৎ পাঠশালার সমস্ত পড়ুয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া নামতা পড়িবে "চার পোণে এক চোখ্" "এক চোখ্" ইত্যাদি।

চারিটা বাজিলেই ইস্কুলের ছুটি। ভারতবর্ষের সমস্ত ঘড়ির সময় রেলওয়ে হিসাবে চারিটা বাজিলেই মাদ্রাজ হইতে ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রবন্ধটি লিখিতে লেখকের চারি পয়সার নস্য খরচা হইয়াছে ও চারিদিন সময় লাগিয়াছে ; এইবার "আমার কথাটি ফুরাইয়াছে" পাঠকেরাও এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে দু চার চাল দাবা খেলুন গে' কি দুচার বাজী পাশা পাড়ুন গে'—

শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ মিত্র।

বাণী-বিতান

বুদ্ধ

আজকে রাতে আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি—উঠ্‌ছে ঠেলে
একখানি মেঘ ধূম্র উদার—আজকে সে যে দেবে ঢেলে
বক্ষভরা বৃষ্টিরি দান—আপনাকে সব নিশেষ করে' ;
উদার বিরাট আকাশ তারে ধর্‌ছে স্নেহে আদর-ভরে।

সীমাবিহীন আকাশ গায়ে জলভরা-মেঘ-লীলা দেখে
মনের মাঝে একটী ছবি উঠ্‌ল ভেসে—মহান্, একে !—
এ ছবি যে বুদ্ধ গুরু !—সেই মহাপ্রাণ সেই মহীয়ান্ !
দুঃখ-ভরা স্নেহ-ভরা প্রেম পরিপুর সাশ্রু-নয়ান।
ব্যথার ভারে দয়ার ভারে সেই টলটল সেই ছল ছল,
আপনাকে সব বিলিয়ে দেবার সেই মহানর—ব্যাকুল উতল।
আকাশ-পটে আজকে আঁকা জলভরা মেঘ বৃষ্টিমাতা।
বিশ্ব-পটে এই যে আঁকা মহামহিম বুদ্ধ ত্রাতা !
নম্র করুণ উদার মধুর শান্ত শুদ্ধ বুদ্ধ ছবি
চিত্ত মাঝে মেঘের মত আজকে দেখে ক্ষুদ্র কবি !
আজ মনে হয় ছিল মরু—পীড়ায় জ্বালায় অত্যাচারে
দিকে দিকে আগুন যেন জ্বল্‌তেছিল হাহাকারে,
নেই দয়া নেই, নেইক মায়া, নেইক স্নেহ, তৃষার বারি,—
এম্‌নি কঠোর ধরার শিরে দাঁড়াল এই ছত্রধারী—
ছত্রী ধরে' আতপ হতে করল ছায়া রচ্‌ল ছায়া,
নয়ন হতে' ঝর্‌ল বারি, হৃদয় হতে ঝর্‌ল মায়া,
হাত হতে তার ঝর্‌ল আশীষ, ললাট হতে শান্তি-ভাতি,
মুখ হতে তার করুণতা, দীপ্তি তারি তাড়ায় রাতি !—
এম্‌নি উদার এম্‌নি মহান্ দাঁড়াল ঐ বুদ্ধ গুরু ;
মেঘের মত বুকটী তাহার প্রেমের ভারে গুরু গুরু !
আড়াই হাজার বছর আগে শুষ্ক কঠোর ধরার' পরে
দাঁড়াল ঐ বুদ্ধ-ছবি সকল বেদন বক্ষে করে'—
বলি-দেওয়া ছাগের বেদন, ভিক্ষুকেরি গোপন ব্যথা,
অত্যাচারে-দলা জনের মর্ম্ম-দহা কাতরতা,
সকল বেদন সকল জ্বালায় নিবাস দিয়ে বুকের মাঝে—
দাঁড়াল ঐ বুদ্ধ দাঁড়ায়,—প্রেম-করুণা-মূর্ত্তি রাজে !
অভয় বাণী জাগ্‌ল দিশি !—নেই ক রে ভয়—এই বারতা
বায়ুর সাথে দিকে দিকে ছুট্‌ল যেথায়—ক্লিষ্টা নতা
শোক বিভোলা জননী রয়, দুঃখপেষা লক্ষ জনা ;—
চৌদিকেতে ঝর্‌ল অঝোর বুদ্ধ-হৃদির প্রেমের কণা।
মুখ তুলে চায় নরনারী—ভূতলশায়ী ছিল যারা—
পায়নি ক পথ খুঁজে খুঁজে, পিষছিল যায় বাঁধন-কারা—

দুখের বাঁধন, পীড়ার বাঁধন, শোকের বাঁধন, জরার বাঁধা ;
সকল বাঁধন মুক্তি পেল, থাম্‌ল যেন সকল কাঁদা।
কে এল রে কে এল রে—চক্ষে লাগে কাহার জ্যোতি !
বক্ষে পশে কাহার নিশাস করুণতায় কোমল অতি !
কার এ আলো উজ্‌লে দিল জগৎ-আঁধার, মনের আঁধার,
শুষ্কধরার কঠোর বুকে কে ঢালে রে প্রেম-পারাবার !—
নয়ন মেলে তাকিয়ে দেখে লক্ষ কাতর নরনারী,
তাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাসে সৌম্য-শুচি এক ভিখারী,—
এক ভিখারী গৌররূপী, দেহের ভাতি অনুপমা,
দেহ হতে চক্ষু হতে ঝর্‌ছে দয়া ঝর্‌ছে ক্ষমা !
লুটিয়ে পড়ে চরণে সব,—এই বটে সেই, এই দরদী,
এরেই দেব বেদন মোদের পিষছে যাহা নিরবধি,
বেদন নিয়ে গরল নিয়ে এই ত দেবে ফিরিয়ে সুধা,
এই মিটাবে সকল জ্বালা, এই তাড়াবে সকল ক্ষুধা ;
বুদ্ধ দাঁড়ায়, বুদ্ধ দাঁড়ায়, চক্ষু হতে অশ্রু ঝরে,
বুকখানা তার কাঁপছে ঘন, সব বেদনা সে বোধ করে !
হাত পেতে সব চরণ মূলে দাঁড়ায় ঘিরে বুদ্ধ প্রভু,—
যা পেল তা শ্রেষ্ঠ পাওয়া, এমন পাওয়া পায়নি কভু !
একটী দানে বুদ্ধ জুড়ায় সকল দুখের মহামারী;
মহান্‌ সে দান, তুলনা নেই—সে দান প্রেমের শীতল বারি !
আড়াই হাজার বছর আগের বুদ্ধ গুরুর সেই সে ছবি
বক্ষ মাঝে দেখছে আজি বেদন-নত ক্ষুদ্র কবি।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

স্বপ্ন

যাক্‌ বাঁচা গেছে !
এতদিনে পারিয়াছি আসিতে ছাড়ায়ে
সে বিষম কাল।
বিধাতার হস্তধন নিয়েছে ফিরায়ে—
যৌবনের রূপ,
সহস্র ভাবনা-ঘেরা সে যেন রে সোনা !

আজ রাজ পথে
নির্ভয় হৃদয়ে তাই করি আনাগোনা।
চারিদিক হতে
ছুটে আসা বিষদিগ্ধ খর-দৃষ্টি-শর,
মুহুর্ম্মুহু পড়ি,
আর ত তনুরে মোর করেনা জর্জ্জর!
যাক্ বাঁচা গেছে,
আকাশে বাতাসে ফাঁদ নাহি দিন যামী!
রূপের আড়ালে
যে পাখী যতন ভরে রাখিয়াছি আমি,
তারে ধরা সোজা নয়—সে যে সাবধানী!
মাতৃ সম্বোধন,
নারীর একান্ত কাম্য, পশে দিবাযামে,
কাণে অনিবার
ভগীরথ-শঙ্খ শুনি গঙ্গা ওই নামে—
গলিয়া ঝরিয়া
হৃদয়ের স্নেহধারা—ভুবন পাবন!
করি অনুভব,
নিখিল-জননী-আমি, কোলে শিশুগণ!
ধন্য মোর পরমায়ু, ধন্যরে জীবন!
আজি দেহ মোর—
ভাঙিয়া টুটিয়া পড়ে আঘাতে জরার,—
অইমাত্র শুধু।
হৃদয়ে পশিতে নারে সে কালাপাহাড়
নিরাপদ ঠাঁই,
চলে সেথা দেবতার নিত্য আরাধনা,
পূর্ব্বেরি মতন
ভূত ভবিষ্যৎ সেথা করে আনাগোনা—
কত স্মৃতি, কত আশা,—কতনা কল্পনা!

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

ছায়াময়ী

ঝাপ্‌সা মনের নীহারিকায়
　　কেবল আমার পরাণ কাঁদায়।
ভাবনা যত পথ হারালো
　　প্রহেলিকার জটিল ধাঁধায়।
শুনি কাহার পায়ের ধ্বনি
পিছন পানে উঠ্‌ছে রণি
চম্‌কে দেখি কেউ ত নাহি
　　লুটাই অবশ ধুলায় কাদায়।
ভাবি কেবল এলো এলো
　　ঐ এলো কে চতুর্দ্দিকে ;
লক্ষ জনম কেটে গেলো,
　　চেয়েই রলেম নির্নিমিখে।
সকল কাজের মধ্যে ঘুরি
কেবল ছায়ার লুকোচুরি ;
আঁক্‌ড়ে-ধরা সহজ পথে
　　কে যে শুধুই আপদ বাধায়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক।

শেষ-বিদায়ের ফুল

ওগো　শেষ বিদায়ের ফুল,
　　সন্ধ্যা রবির স্বর্ণ-আলোয়
　　　　স্বপ্ন সমাকুল!
চির চলার পথের পাশে আছ কি ঐ চেয়ে
নীরব নিশা নাম্‌বে কবে তারায় আকাশ ছেয়ে,
অচিন্‌ লোকের আসবে বাণী পারের হাওয়া বেয়ে
　　　　চঞ্চল বিপুল।
　　ওগো　শেষ বিদায়ের ফুল।
ওগো　শেষ বিদায়ের ফুল
　　না জানি কোন্‌ অকূল স্রোতে
　　　　দিল তোমায় ভুল?

শ্যামলা এই ধরার কোণে নীল আকাশের দেশে
এই যে প্রাণের পাপড়ি তোমার ফুটিয়েছিলে হেসে
কালের কালোনীরে কি হায় সবই যাবে ভেসে
হবে কি নির্ম্মূল ?
ওগো শেষ বিদায়ের ফুল।

ওগো শেষ বিদায়ের ফুল
বিভোল বুকে জেগেছিলে প্রথম মিলন-ভুল !
মনে পড়ে সেই সে দিনের পুলক-ঘন ব্যথা
গানের ঘোরে হারিয়ে-যাওয়া মধুর ব্যাকুলতা,
গোপন প্রাণের অন্তবিহীন একটি করুণ কথা
মদির মঞ্জুল।
ওগো শেষ বিদায়ের ফুল।

ওগো শেষ বিদায়ের ফুল
ভাবি আবার কোথাও কি হায়
মিল্‌বে নূতন কূল !
চলার পথে যেতে হেথায় স্বপ্ন যদি জাগে
স্মৃতিটুকু রয়না বাকি ! আশার রঙিন রাগে
ধূসর বরণ শূন্য হানি' হঠাৎ এসে লাগে
মরণ-অঙ্গুল।
ওগো শেষ বিদায়ের ফুল।

ওগো শেষ বিদায়ের ফুল
দিগন্ত আজ অস্ত বেলার
বেদন-ব্যাকুল।
অবসানের করুণ তোমার সুরভি ঐ বাসে
মর্ম্মে আমার ধীরে ধীরে আবেশ ঘিরে আসে,
এবার দোঁহে যে ঘুম-ঘোরে ডুবব পাশে পাশে
নাইক তাহার ভুল !
ওগো শেষ বিদায়ের ফুল।

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হাফিজ

গাইছ সাকী? কণ্ঠে তোমার
নবীন সুরে
উঠুক নবতান,
প্রাণ-মাতানো রক্ত-সুরা
নবীন প্রাণে
ক'রব আজি পান।
গোপন সে মোর প্রিয়ার ঠোঁটে
চুমোর পরশ
লাগছে আজি নব,
আজকে নবীন সুরায়, সাকী,
পাত্রখানি
পূর্ণ করি নেব।
পেয়ালাটুকু ভরপুর উঠে
পেয়ালা ছাড়া—
কোথায় আছে প্রাণ?
পেয়ালাবুকে প্রিয়ার পরশ—
স্মৃতির খেয়াল—
তাতেই যে মোর ত্রাণ!
নবীন রূপে ফুটছে নিতুই
প্রিয়া সে মোর
আমার চিত্ত চোরা—
জাগবে সে সুখ পেয়ালা মাঝে
মরণ-রাত্রি—
আস্‌বে যখন ঘোরা!

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

শাসন সংস্কারের কথা

প্রায় একপক্ষ হতে চল্‌ল সিম্‌লাতে সংস্কার পরীক্ষা সমিতির অধিবেশন হচ্ছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে ও বাহিরে যে ক্রমবর্দ্ধনশীল আন্দোলন চল্‌ছে তাহারই ফলে ভারত সরকার এই সমিতি গড়েছেন। ঐ সভায় স্যার্ ম্যালকম্ হেলী যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেই এই অনুসন্ধানের স্বরূপের অল্পস্বল্প আভাস পাওয়া যায়! ভারত শাসন আইনের স্পষ্ট প্রতীয়মান গলদ্‌গুলির অনুসন্ধানের ও নিরাকরণের জন্যই এ পরীক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা। অবশ্য এই সমিতি যদি বলেন্ যে এই আইনের সমূহ সংস্কার সম্ভবপর নয়, অথচ বেশ বড়গোছের সংস্কারেরও প্রয়োজন—তাহ'লে সেটি স্বতন্ত্র কথা। এই সমিতি বড়গোছের সংস্কারের অনুমোদন কর্ত্তে পারেন কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অনুসন্ধান যদৃচ্ছ চল্‌বে, অথচ সমিতি কর্ত্তৃক প্রতীকারের উপায় সীমাবদ্ধ,—সে জন্য যে সকল সাক্ষী এ সমিতির কাছে তাঁদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁরা সবাই ঠিকই বলেছেন্ যে এ সমিতির ক্ষমতা খুবই কম।

এ পর্য্যন্ত দশ এগারো জন ভদ্রলোকের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তাঁদের নাম যথাক্রমে, Mr. S. M. Chitnavis, ও Mr. L. N. Kelkar (মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী), Mr. Kunzru ও Mr. Gokranath Misra (যুক্তপ্রদেশের লিবার‍্যাল্ দলের প্রতিনিধি), L. Harkishenlal (পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী), Mr. Surve (জনৈক অব্রাহ্মণ M. L. C. বোম্বাই) Mr Chintamani (যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) Mr. Barkat Ali (লাহোরের মোস্‌লেম সভার সহকারী সভাপতি) Mr. B. S. Kamat (ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য) ও Mr. Pradhan (বোম্বাই)

এঁরা সবাই, বিশেষ করে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীরা, বলেছেন যে দ্বৈতশাসন নিস্ফল হয়েছে এবং বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন খুবই দরকার; প্রজাদের আরও ক্ষমতা দিতে হ'বে এবং সিভিলসার্ভিসের ক্ষমতা খর্ব্ব কর্ত্তে হবে। আমরা এবার সাক্ষ্যপ্রদানকারিদের কথার একটু বিশেষ আলোচনা কর্ব্ব। প্রধানতঃ চারটী কথা এই প্রসঙ্গে উঠে—(১) প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন (২) সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কার (৪) ভবিষ্যৎ সংস্কার।

দ্বৈত শাসনে মন্ত্রীদের অবস্থা সম্বন্ধে Mr. Kelkar অনেক কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীদের কোনও ক্ষমতাই নেই। L. Harkishenlal, Mr. Kelkar ও Mr. Chitnavisএর মতের সমর্থন করেন; মন্ত্রীদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে তাঁদের খুব জমকালো নাম আছে আর তাঁরা আর কিছু না পান্ ষ্টেশনে ষ্টেশনে খুব বড়

গোছের অভ্যর্থনা পান। পাঞ্জাবে মন্ত্রিদের মধ্যে পরামর্শ অভাবে সেখানে শাসনের অবস্থা খুবই শোচনীয়, তাঁর মতে পাঞ্জাবে প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি সরকার আছে,—দুজন মন্ত্রি, সদস্য দুজন ও প্রধান সেক্রেটারী। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিরা সকলেই অর্থবিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। মন্ত্রিদের এ ব্যাপারে কোনই ক্ষমতা নাই; এমন কি সাধারণ কেরাণীরাও মন্ত্রিদের পরামর্শ অগ্রাহ্য কত্তে পারে। শাসন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করার আগেই খরচ করার ক্ষমতা প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর হাতে দেওয়া হয়েছিল; কাজেই, যখন মন্ত্রিরা বাস্তবিক মন্ত্রিত্ব কত্তে গেলেন তাঁরা দেখলেন বড় বড় মৎলবের মোটেই অভাব নাই, অভাব যা কেবল টাকার!

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ক্ষমতা সম্বন্ধেও দু'একজন ছাড়া সকলেরই মতের মিল হ'য়েছে। Mr. Chitnavis, Mr. Kelkar, Mr. Chintamani, Mr. Harkishenlal প্রমুখ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিরা বলেছেন যে এটির গলদ অসংখ্য; প্রথম কারণ,—যে দেশ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে,—সে দেশে ইহা থাকা উচিত নয়। যেখানে যেখানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে সেখানেই পরস্পরের মধ্যে দলাদলি, দ্বেষ, হিংসা, বেশী। দ্বিতীয়তঃ এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের মূলে যে নীতি রয়েছে সেটি খুবই ভ্রমাত্মক। সম্প্রদায় গড়ে তুল্‌তে হবে এমন করে যাতে সাধারণের উপকার হয়; শুধু ধর্ম্মের পার্থক্য অনুসারেই সম্প্রদায় গড়লে চল্‌বে না। তার ফলে হবে,—যেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী সেখানে হিন্দুদের প্রাধান্য আর যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, সেখানে মুসলমান প্রাধান্য। Mr. Barkat Ali এই পদ্ধতির সমর্থন কর্ত্তে গিছলেন, কিন্তু পূর্ণকাম হন নি। যতদিন এদেশের লোকেরা ধর্ম্মের নির্দ্দেশ মত চিন্তা করা না ছাড়ছে, ততদিন তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচিত হবে না। ব্যাপারটি এখন দাঁড়িয়েছে খুবই অশোভন। সাধারণে এই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন চায় না; চায় যারা শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত; আর মজার কথা এইটুকু, যে এদের সকলেরই লক্ষ্য সরকারী চাকুরীর দিকে।

বঙ্গের এই অজ্ঞাত M. L. C. ছাড়া সবাই বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারে আরও বেশী ক্ষমতা প্রজাদের দেওয়া খুবই উচিত। অবশ্য অনেকে স্বীকার করেছেন যে অর্থবিভাগ, সৈন্যবিভাগ প্রভৃতি সাধারণের হাতে না দেওয়াই ভাল, কিন্তু তাঁরা কি ভেবে এ কথা বলেছেন ঠিক্ বোঝা গেল না। ভারত চায় প্রকৃত দায়িত্বপূর্ণ শাসন; ব্রিটিশসাম্রাজ্যের আর কোনও উপনিবেশই এইসকল বিধি নিষেধ মান্‌তে স্বীকৃত হবে না। শুধু প্রাদেশিক সরকারে নয়, কেন্দ্রীয় সরকারেও সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রার্থনা করা হ'চ্ছে। একজন সাক্ষী একথাও বলেছেন যে দেশের প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষকে ভোট দেবার অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত থাক্‌বে; অবশ্য প্রয়োজন হ'লে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রাদেশিক সরকারকে থাক্‌তে হ'বে।

এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে সম্প্রতি সিমলাতে নারীদের ভোট দেবার ও প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদানের জন্যে একটি বৈঠক বসেছিল। অবশ্য বৈঠকটি খুব বড় হয়নি, তবু এটি খুবই সুখের কথা বল্‌তে হ'বে যে এ বৈঠকে যোগদান করেছিলেন জনকতক প্রখ্যাত বিপ্লববাদীর ঘরণী এবং তাঁরা চেয়েছেন পুরুষদের তুল্য-অধিকার।

শৈলশিরে যে মূক-অভিনয় চলেছে, অল্প কথায় এই প্রবন্ধে সেটিই বিবৃত করা হয়েছে। যিনি এই অনুসন্ধানের ফলে কোন বড় গোছের কিছু সংস্কারের আশা করেন তাঁর বুদ্ধি একেবারে নাই। দুটি মিষ্টি কথা, মুসলমানদের দু'চারটি স্তোকবাক্য, শাসন আইনের দু এক জায়গায় দু'একটি কথার পরিবর্ত্তন, জমিদারদের একটুখানি উৎসাহ প্রদান, দু'একজনের মাইনে বাড়ানো,—এ'ছাড়া এই পরীক্ষা সমিতির কাছ থেকে বাস্তবিকই আর কিছু পাওয়া যাবে না।

শ্রীকান্‌হাইয়ালাল গৌবা।

কালের প্রবাহ

অবলা-বল দল।

এই সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত "নারী-নির্য্যাতন" নামক প্রবন্ধ লেখকের নিম্নলিখিত পত্রটি তাঁহার বেদনার আন্তরিকতা ব্যক্ত করিতেছে।

"বাঙ্গালার পল্লীর অবস্থা শোচনীয়, অধিকাংশ স্থলেই হিন্দু বড় অসহায়। ঐক্যের অভাবে, সামাজিক উদারতা অভাবে সে খণ্ডিত দুর্ব্বল। চারিদিক্ দিয়া বাঙ্গালী পল্লীর বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করিয়া জাতিকে বাঁচাইবার উপায় স্থির করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আশা করি আপনি এ বিষয়ে অগ্রণী হইবেন, আপনার উপর এ জাতির অনেক আশা।"

উত্তরে আমার বক্তব্য এই, যেখানে তীব্র অনুভূতি সেইখানে প্রতিকারের অদম্যতা আত্ম বিকাশ করিবে। যদি লেখকের ন্যায় এক একটি যুবক প্রতি গ্রামে জাগ্রত হন, তবে নারী অপমান দূর পরাহত হইবে। হাজার হাজার কলেজ ছাত্রেরা King Arthur and his Round table"এর নাইট্‌সদের কাহিনী পড়িয়াছেন। যে কিছু মানসিক খোরাক গ্রহণ করা যায় তাকে নিজের রক্তে মাংসে পরিণত করিলেই তবে তার উপযোগিতা; দেশ কালের প্রয়োজন ভেদে তাকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া নারীর নিগ্রহ নিবারক একটি তরুণ-সঙ্ঘ, যদি King Arthur এর নাইট্‌সদের 'শিভালরি'র উচ্চভাবকে বরণ করিয়া, অবলার বল্ স্বরূপ একটি দল গঠন করেন তবে তাঁহারা আদর্শ ছাত্র ধর্ম্মে নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করিবেন এবং দেশে নারী-নির্য্যাতন পরিক্ষীণ হইয়া আসিবে। ইহার সিদ্ধিকল্পে দুইটি আনুষঙ্গিক বিষয়ে মনোনিবেশ

করা চাই, হিন্দু মুসলমান প্রীতিবর্দ্ধন এবং হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মীর তরুণগণের মধ্যেই এই বীরোচিত ভাব জাগ্রত করিতে হইবে, এবং দুজনকেই এই একই দলভুক্ত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বা কংগ্রেস বা প্রাদেশিক সমিতি কিছুরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। বাহিরের সাহায্য পাইলে ভাল, না পাইলেও কুচপরোয়া নেই—এই ভাবে চলিতে হইবে। আত্মশক্তি প্রবুদ্ধ করিলে সহাধ্যায়ি আত্মীয় বন্ধুতেও শক্তি সঞ্চারণ দুরূহ হইবে না। প্রথমে নিজে কতটুকু করিতে পার দেখ, নিজের অঙ্কপাতটা ঠিক রাখিয়া অন্যের সাহায্যে যোগ দাও। নিজের শক্তির ঘরটায় শূন্য দেখিলে ফলে সবটাই বিয়োগ হইবে। হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকা দেশবন্ধুর প্যাক্টের উপর হিন্দুনারী নির্য্যাতনের সমগ্র দায়টা ফেলিয়া বলিতেছেন—

এই প্যাক্টের প্রবর্ত্তনের হুজুগে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যে কি অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে তাহা আমরা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র হিন্দু-নারী নির্য্যাতনেই বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের তথাকথিত এংলো-হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ হিন্দুনারীর সতীত্বের মর্য্যাদা বুঝেন কিনা জানি না কারণ এই বাংলা দেশে মুসলমান কর্ত্তৃক অন্যায় ভাবে বহু হিন্দুনারী নির্য্যাতিত হইতে থাকিলেও প্যাক্টে এই গুরুতর বিষয়টির কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, জানা যায় নাই।

অন্যের ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী থাকা কেন? যারা বিরোধ করিবে করুক বিরোধের অপহার শুধু নিজের দিক দিয়া মিলন ঘনীভূত করিলেই হইতে পারে।

শেষ অধ্যায়

কবি রবীন্দ্রনাথের পত্রোত্তরে লর্ড লীটন যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে আমাদের আহত জাতীয় মানে শীতল প্রলেপ পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছিলেন—ভারতে লোকমতের জোর কি নাই? তাহা থাকিলে কি লর্ড লীটন এ রকম কথা বলিতে সাহস করিতেন? লোক মতের জোর যে আছে তাহা দেশ দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাও এবার সপ্রমাণ হইয়াছে যে শুধু জোরাল লোকমতেও কার্য্যসিদ্ধি হয় না। যতদিন শুধু মিটিং ও বক্তৃতায় তাঁহাকে আক্রমণ করা গিয়াছিল ততদিন লর্ডলীটন অচল অটল ছিলেন। কবির সুনম্র সৌম্য ভদ্রতায় তিনি টলিলেন, তাঁর নিরুত্তরতার পাষাণ গলিল। তিনি এখন যাহা বলিয়াছেন তারপর আর তাঁহার সহিত আমাদের এ বিষয়ে ঝগড়া টানিয়া রাখা সঙ্গত নয়।

জব্বলপুরে পুরুষের পশুত্ব

একটী ভিখারিণী মেয়ের উপর একজন গোরা দিনদুপুরে প্রায় পঞ্চাশ জন দর্শকের জ্ঞানগোচরে পাশবিক অত্যাচার করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

পশু কে? সেই গোরা একা, কিম্বা যে পঞ্চাশজন 'কালা আদমী' ষ্টেসনমাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া যাত্রী ও পুলিশ কনষ্টেবল পর্য্যন্ত গোরার অত্যাচার হইতে স্ত্রীলোককে রক্ষা করিবার জন্য কোন চেষ্টা করে নাই।

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি
বুঝি পিতা তারে ভুলে গেছ তুমি!

শ্রীমতী সরলা দেবী।

মাসিক সাহিত্য পরিচয়

চুম্বক

ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩১

জমিদারী বন্দোবস্ত—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

বাংলাদেশের জমি থেকে দেশের লোকের যে রকম টাকা কড়ি হওয়া দরকার জমিদারী বন্দোবস্তের দরুণ তা হচ্ছে না। এ বন্দোবস্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিল বটে। কিন্তু এখন দেশের অবস্থা বদলে গেছে।—সংস্কার করতে গেলে আগেকার জমিদারী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দিয়ে জমিগুলির এমনভাবে বিলি করতে হবে যাতে চাষের সুবিধা হয়।—চাষের উন্নতি শুধু জমিদারদের উঠিয়ে দিয়ে চাষিদের মালিক করে দিলেই হবে না—চাষের উন্নতি করতে গেলে একদিকে প্রত্যেক চাষীর জমির পরিমাণ বাড়াতে হবে, আর জমি সব একরূপে রাখতে হবে, অপর দিকে চাষীর হাতে যথেষ্ট মূলধন থাকা দরকার।—কেউ কেউ বলেন যে, চাষা ও চাষের উন্নতি করতে হইলে জমিদারদের একেবারে উচ্ছেদ করে জমি সব চাষাদের ভিতর ভাগ করে দিতে হবে এই সর্ত্তে, যেন তারা চাষা ভিন্ন অপরকে সে জমি বিক্রি না করে।—জমিদারের উচ্ছেদ করলে জাতির একটা প্রধান অংশ হঠাৎ নিরন্ন হয়ে পড়বে, কেন না জমিদার উচ্ছেদ মানে সমস্ত ভদ্রলোক গোষ্ঠীকে সমূলে বিনাশ করা।—লেখক এ মতের পোষকতা করেন না।—তাঁর মতে প্রথম জমির consolidation করতে হবে পাঞ্জাবে যেমন হয়েছে বাংলায়ও সেই রকম কো-অপারেটিভ সোসাইটি দ্বারা এ কাজ হতে পারে। তাতে চাষাদের মূলধন বাড়বে, ধার পাবার ও সুবিধা হবে আর সব চেয়ে উপকার হবে এই যে, চাষারা রীতিমত উন্নত প্রণালীতে চাষের যোগ্য যথেষ্ট জমি পাবে। এরপর চাই এমন একটি বিধান, যার ফলে চাষী ইচ্ছা করলে থোক টাকা দিয়ে জমিদারকে খাজনা দিবার দায় থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। তার জন্তে যে টাকার দরকার, সে টাকা কো—অপারেটিভ সোসাইটির সাহায্যে ধার করে চাষী কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। এমনি একটা ব্যবস্থা হ'লে সমস্ত প্রজা ক্রমে চাষী-মালিক হয়ে উঠবে, অথচ জমিদারেরও ক্ষতি হবে না।

মাতৃ-মন্দির, আষাঢ়, ১৩৩১

কন্যাদায় ও তাহার প্রতিকার।—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

আমাদের দেশের কন্যাদায়ের প্রতিকারের নিম্নলিখিত উপায়গুলি লেখক দিয়াছেন।—১। প্রত্যেক মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতে হবে, যাতে তাদের ভিতর মনুষ্যত্ব জাগে, তারা পুরুষের হাতের পুতুলের মতো মন্ত্রচালিতভাবে জীবনযাপন না করে। সব মেয়ের বাপেরা একজোটে একাজ কলে বরপণ প্রথা নিশ্চয়ই উঠে যাবে। ২। রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক প্রভৃতি নানাশ্রেণীর ভিতর পুত্রকন্যার আদান প্রদান কর্ত্তে হবে। কৌলিন্যপ্রথার দরুণ অনেক কুলীনের ঘরের মেয়ের বিয়ে হওয়া দায়। এই কুসংস্কার, জাতির অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিচ্ছে। একে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে। ৩। আমাদের দেশে আগে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল। তাদের মনুষ্যত্বের উপর জাতির শ্রদ্ধা ছিল। আমরা এখন মেয়েদের সে স্বাধীনতাকে আমলতো দিইই না, এমন কি টু' শব্দ করতেও তাদের মানা। বিবাহ সম্বন্ধে মেয়েদের একটা কথা কইবার জো নেই। পণ প্রথার এ একটা কারণ। নারীর ব্যক্তিত্বপ্রকাশের অবসর দিতে হবে, তা নাইলে পণপ্রথা দেশ থেকে কখনোই উঠবে না। নারীর শক্তি সামান্য শক্তি নয়। সমাজ নারীকে পুরুষের ক্রীতদাসী করে রেখেছে। পাষণ্ড স্বামীকে-ও দেবতা বলে, ভক্তি-করতে হবে, আমাদের সমাজ, মেয়েদের এই শিক্ষাই দেয়। কাজেই তাদের এই হীন অবস্থা। যদি নারীকে মনুষ্যত্ব-বিকাশের অবসর ও অধিকার দেওয়া যায়, তাহ'লে সে জোরগলায় বলতে পার্ব্বে,—"আজীবন কুমারী থাকবো, তবুও টাকা দিয়ে কারো ক্রীতদাসী হবো না। "তাহলেই পুরুষ সায়েস্তা হবে। অন্য উপায়ে হবে না। বেশি বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রেখে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে—তাদের মনকে উন্নত করে তুলতে হবে। হিন্দুশাস্ত্রের তাই কথা;—

কামমামরণাৎ রক্ষেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

—মেয়েকে ঘরে আজীবন কুমারী রাখবে তাও ভালো, কিন্তু কখনো তাকে গুণহীন স্বামীর হাতে দিও না।—এই শাস্ত্র বাক্য আমরা ভুলে গেছি, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

কলিকাতা—২২ সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৮-শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩১ { ষষ্ঠ সংখ্যা

গান

আকাশভরা সূর্য্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীম কালের যে হিল্লোলে
জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেচে তার টান,—
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।

কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ ॥

১৯ পৌষ, ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাচঘর

আমার মায়ের পায়ে বাজে সদাই
ছয় রাগ আর
ছত্রিশটি রাগিণী।
এমন নূপুরধ্বনি শুন্‌বি যদি,
অনেক শোনায়
হতে হবে বিরাগিনী।
ওরে মহাকালের বুকের পরে
নাচঘর সেই
নাচে যেথা রঙ্গিণী।
সে যে পায়ের ফেরায় হাসায় কাঁদায়
জগৎ ভোলায়
জগৎ-অনুরাগিণী।
তার নূপুর মাঝে বাজে সদাই
ছয় রাগ আর
ছত্রিশটি রাগিণী।

মন এ গান গাহিয়া উঠিল কবে? যে দিন শুনিল, কোন স্বামীজী অধ্যাত্মতত্ত্বের উপর বক্তৃতা করিবেন, উদ্যোগকর্ত্তা নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন, যুবকেরা তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "আমাদের এখনো ও সবের বয়স হয়নি মশায়, সময়ও নেই। নাচঘরে যেতে হবে।"

নাচঘরেই ত যেতে হবে রে ভাই; সকলেরই,—যুবা ও বৃদ্ধের। যেতে হবেই বা কি? যেয়েই ত আছি, সবাই ত নাচঘরেই বসে রয়েছি। এই জগতের নাচঘরে—যেখানে হৃৎকমলে নাচে শ্যামা—সেখানে কি দেখিতেছি?

"তুমি মধুর অঙ্গে নাচগো রঙ্গে
নূপুর ভঙ্গে হৃদয়ে

স্রষ্টার হৃৎকমলে ত্রিগুণাতীতা সৃষ্টিশক্তি নাচিতেছেন ও তাঁহার চরণে ত্রিগুণময় ঘুঙুর বাজিতেছে। সেই সৃষ্টি-প্রণয়িণীর মঞ্জীরচরণযুগলার প্রতি মঞ্জুচরণপাতে মানবজীবনে সুর গুঞ্জরিয়া উঠিতেছে। কখনো ভৈরব কখনো করুণ, কখনো ললিত কখনো ভীষণ, কখনো দীপক কখনো মূর্চ্ছন, কখনো বিচ্ছেদ, কখনো মিলন—কত কি সুর

"নয়নে বচনে বসনে ভূষণে গাহ গো !
মোহন রাগরাগিনী
ওগো পরাণবিলাসিনী !"

এই সৃষ্টিপ্রেমে অধীরার কণ্ঠ-মদিরা যার প্রাণপাত্রে একবার ঢালা হইয়াছে, এই জগৎ-প্রাণবিলাসিনীর নাচ যার চোখে একবার পড়িয়াছে, যে তাঁর পা ফেলা শুনিয়াছে পেলব ও কঠোর, মন্দ্র ও জলদ্

ধ্রা—ধ্রা !
ধিমে কিটে তাক্ ধ্রা—ধ্রা !
ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্
ধ্রিন্ !

তার আর কোনো নর্ত্তকীর নাচ রুচিবে না, আর কোনো নাচঘরে তার মন ভরিবে না। সে বিস্তৃত আকাশে সদাই চোখ মেলিয়া দেখিবে

রঙ্গিনী নাচে, নাচেরে, নাচে
ঐ নাচে !

কাণ পাতিয়া শুনিবে

মঞ্জীর ঝিমি ঝিমি বাজে রে বাজে
ঐ বাজে !

আর বুক পাতিয়া দেখা ও শোনার সব রসটুকু গ্রহণ করিবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

কংগ্রেস কি দেশের প্রতিনিধি ?

জাতীয় জীবন অপূর্ব্ব রহস্যময় ।

বাঁধাকপির পাতা খুলতে খুলতে, যেমন পাতাই মেলে—শাঁস পাওয়া যায় না। জাতীয় জীবনের সমস্যা বিশ্লেষণ করতেও কেবল সমস্যাই মেলে শেষ পাওয়া যায় না।

আজ প্রায় বিশ বছর ধরে দেশের বুকে রকম রকম সমস্যার ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে কিন্তু যার জন্য সাধনা, সেই সাধনের নিধিরাজস্ব এখনো দূরে। যেদিন দেশাত্মবোধের প্রথম বিকাশে এদেশের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ সাড়া দিয়ে ছিলেন, যেপথ সেদিন তাঁরা ধরেছিলেন, এবং তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করতে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তার কর্ম্মবিধান একালে ভিক্ষাবৃত্তি বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলি সেকালে যা' করেনি একালে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিও এখনো তা' করছে না! সমস্যা নিয়েই আছে,—পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা জগতের শক্তিতত্ত্বের মূল অনুসন্ধান করে শক্তি আয়ত্ব করতে যেমন শক্তির বিভিন্ন বিভূতির চর্চ্চা করে যাচ্ছেন, আর সেই বিভূতির বিকাশে মুগ্ধ হয়ে মূলকেই দূরে রাখছেন, তেমনি এদেশের রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞেরা রাষ্ট্রীয় সমস্যার একটার উপর একটার অনুসরণ করছেন—আর আসল সত্যকেই দূরে ফেল্‌ছেন। মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, কাউনসিল প্রভৃতি স্থাপনের সঙ্গে দেশ জাগরণের পূর্ব্বধারা ছেড়ে দিয়ে নেতৃবর্গ ঐ সকল অনুষ্ঠানের অনুগামী হয়েন। এই প্রতিষ্ঠান সমূহ যাই কিছু করুকনা, আসত কাজটা করতে পারেনি। দেশমধ্যে আত্মবোধের সাড়া কাউনসিল, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা মিউনীসিপালিটী তুলতে পারেনি। আমাদের সংসার যাত্রার নিত্য সঙ্গী সুখদুঃখের ভাগী বলে এসব প্রতিষ্ঠান আমাদের মনে স্থান পায় নি। তা যদি হত তবে নির্ব্বাচনের রঙের টেক্কা নিয়ে সাধারণে কেমন খেলত তা দেখবার জিনিষ হত। দেশাত্মবোধের নায়কগণ ভেবে ছিলেন তাঁদের কাজ বুঝি কাউন্সিল লীলায়,, বোর্ড বিহারে, কংগ্রেসের বক্তৃতা মঞ্চে!—সেইখানে যে ভুল হ'য়েছিল, এখনো সেই ভুল চলছে।

বঙ্গবিভাগের আন্দোলনে নেতৃগণের মনে পড়ল জনসাধারণ বলে একটা কিছু আছে। তাঁদেরই শক্তি সংহতি বীরভদ্রের জন্ম দান করবে। কিন্তু এই মনেই পড়ল, আর মনেই রইল বীরভদ্রকে আর জাগান হইল না। মালা মুকুট পরেই তাঁরা তৃপ্ত হলেন। যজ্ঞ শিবহীন হয়েই চলতে লাগল। এমনি করেই এক যুগ কেটে গেল। তারপর ফুট্‌বলের মত পদাঘাত খেয়ে কত নেতার হাতে হাতে চালিত হয়ে, কত মহাপ্রাণ হেতায় হোতায় লুণ্ঠিত হ'য়ে কাল সাগরে বিলীন হয়ে গেল! সে দুঃখ সে জ্বালা প্রাণের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। অকস্মাৎ পূর্ব্বাকাশে কি আলোক দেখলুন! কি মূর্ত্তি ফুটে উঠলো—জড় নয়—সজীব। তিনি ঈশার মত বুদ্ধের মত এক নব বাণীর প্রচার করলেন। আবার আশায় উদ্দীপনায় মানুষ

উন্মুখ হ'য়ে উঠ্‌লো ! কিন্তু হায় ! তাও বুঝি ছাই চাপা পড়ে ! মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বাচার্য্যদের মতই বল্লেন,আত্মানম্ বিদ্ধি ! আপনার উপর নির্ভর কর ; দাস মনোভাব ত্যাগ কর।"

কিন্তু এই মহাবাণী যে মহাজাগরণ আনাতে চায় তার পথ অবরোধ করে দাঁড়াল অসহযোগ সমস্যা, Council Entry সমস্যা, Civil disobedience সমস্যা প্রভৃতি। এই সমস্যা গুলা বিভিন্ন অবস্থায়—বিভিন্ন অস্ত্র। এগুলার প্রয়োগবিধি কখন ? যখন জাগরিত দেশ জয়ধ্বনি করে বলবে "পেয়েছি পেয়েছি !"

তাই বলছি দেশের কি সেই অবস্থা এসেছে ? দেশ কি কংগ্রেসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে ! আর কংগ্রেসই কি প্রকৃত দেশের মুখস্বরূপ—হয়ে দাঁড়িয়েছে ? উদ্বোধিত জনসাধারণ কি এখন কংগ্রেসের মুখ চাইতে শিখেছে ! একথা কখনই জোর করে বল্‌তে পারিনে যে কংগ্রেস দেশের প্রতিনিধি ! দেশের শিক্ষিত সাধারণ আশা করে যে কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব করুক। কিন্তু দেশের সহস্র মূক সাধারণ আছে—কংগ্রেসকে চেনে না। জানে না, কংগ্রেস কি—কংগ্রেস তাদের কি দিতে পারে বা দিয়েছে ! শিক্ষিতের মধ্যেও কত আছেন, তাঁরা উদাসীন ! কত সহস্র চাকুরীজীবি আছে, তারা অসহায় ! এদের ত কোন সহায়তা নেই কংগ্রেসে ! তবে কেমন করে সর্ব্বজন প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেস পেয়েছে ! হ'তে পারে কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাগুলা সর্ব্বলোক হিতকল্পে গৃহীত হয়। কিন্তু গ্রহণ করে কারা ? প্রতিজ্ঞাত পথ অনুসরণ করে কারা ? কংগ্রেসের কয়দিন যে চাঞ্চল্য দেখা যায়, তারপর যাঁরা প্রতিনিধিত্বের দাবী করে সভায় যান তাঁদের মনে আসেনা যে তাঁরা কাদের প্রতিনিধি। নেতৃত্বের কর্ত্তৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসে কামড়াকামড়ী ধস্তাধস্তি চলে, আর সারা দেশটা ঘুমায়, শত্রু হাসে—বিদ্রূপকারী টিট্‌কারী দেয়। জানি এ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করা উচিত নয়, কিন্তু বুকে দুর্ব্বলতা নিয়ে কংগ্রেস যদি সবলতার বড়াই করে—সেটা ত শোভন হয় না। কাজের কাছে এলেই যে সে দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে যায় ! এমন ব্যাপারে কংগ্রেসের দুর্ব্বলতা বাড়বে বই কমবে না। তাই একথা না বলেও থাক্‌তে পারি না। কংগ্রেস বরাবরই এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিল, এখনও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি মাত্র। কারণ যে গুলা নিয়ে কংগ্রেস আলোচনা করেছে, এবং যে আলোচনার ফলে একটা সুফলও দেখা গিয়েছে, তা সর্ব্বগ্রাহ্য, জনসাধারণের অন্তরঙ্গ কখনই হয়নি। তাই এত বড় অসহযোগ-সমস্যা ব্যর্থ প্রয়াসের মত বোধ হয়। যাদের বলে কংগ্রেস ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করবে তাদের মনটা বশ না করেই যদি কোন প্রতিজ্ঞা স্থির হয়, তবে সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হবারত কোন আশা নেই। আর সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হচ্ছে বলে যদি কংগ্রেস বড়াই করে—বা সর্ব্বজন-মত-সম্মত বলে দাবী করে, তবে কংগ্রেস হাস্যাস্পদ হবে তার ভুল নেই। আমরা কংগ্রেসকে বলীয়ান্ দেখতে চাই। তাই কংগ্রেস নেতৃগণকে বলি চেয়ে দেখ লক্ষ মূক অশিক্ষিতের প্রতি ! চেয়ে দেখ নানা সম্প্রদায়ের প্রতি। আগে প্রাণের যোগ কর ! এই প্রাণের যোগ করলে গ্রামের প্রতি দৃষ্টি চাই !

ত্যাগ করে সেবাভিমানী হও। মানুষ যাতে আত্ম-নির্ভরশীল হয়, নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করতে যাতে পর-নির্ভর না করতে হয়, হিংসা দ্রোহ ভুলে, বিকৃত স্বার্থের মায়া ত্যাগ করে যাতে সঙ্ঘ শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কংগ্রেস এই কাজটি সম্পন্ন করতে না পারলে, শক্তিশালী হবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ না হলে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের প্রেম মিলন না হলে, সঙ্ঘশক্তি বলবান হবে না। আজ রাষ্ট্রব্রতে দ্রোহ, পবিত্র সাহিত্য-যজ্ঞে দ্রোহ, সামাজিক আচার বিচারে দ্রোহ, মানুষে মানুষে দ্রোহ। ভাই বন্ধু পিতা পুত্র মাতা ভগ্নি স্ত্রী সকলের মধ্যেই দ্রোহের ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে পরস্পরের মিলন সম্ভাবনা রয়েছে, সেই প্রাণের যোগ সূত্র আজ অটুট নেই। এই বিরাট দ্রোহ বুকে করে কোন্ সাহসে জাতির জাগরণ কর্ম্মে হাত দেওয়া যায়। সে কাজত অসফল হবেই! সহরের কথা ছেড়ে দিই। সেখানে পাশের বাড়ীর খবর কেউ নেয় না। কিন্তু পল্লীপ্রাণ শুষ্ক হয়ে গেল! ম্যালেরিয়া, অনাহার, জলাভাব যা না করেছে, এই আত্মদ্রোহ, সব শ্মশান করে ফেলছে। আমাদের বাল্যকালে সমাজের যে সাড়া দেখেছিলুম, আজ তা শান্ত হ'য়ে গেছে। আজ আর হৃষ্টপুষ্ট গোপাল, গোধূলির বেলা গোষ্ঠ হতে গ্রাম্যগৃহে ফেরে না। পল্লীতলবাহিনী নদীর বুকে পণ্যতরী আর পাল তুলে চলে না– মাঝি মাল্লার সারি গান বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রাম্য যুবকগণের কুস্তির আখড়া উঠে গেছে; বিকালে মাঠে আর পল্লীবালকদের চঞ্চল ক্রীড়া দেখা যায় না। গ্রাম্য চণ্ডিমণ্ডপে পাশার কড় ২ ডাক শুনা যায় না—আর সন্ধ্যায় সঙ্গীতের বৈঠক বসে না। মনসার ভাসানের গানে কৃষকপল্লী মুখরিত হয় না। মহরমের উৎসবে হিন্দুমুসলমানের একত্র লাঠিখেলা উঠে গেছে। চড়কের সংযাত্রায় আর আগ্রহ নেই! এই ত গ্রামের চিত্র!

একবার সকল দলাদলি ভুলে, সকল মতের নেতারা কংগ্রেসকে জাগিয়ে তুলুন, জনমত যাতে কংগ্রেসে আত্ম প্রকাশ করে তার ব্যবস্থা করুন। এ সময় কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করে মিলিত হোন। কংগ্রেসের ক্রোড়ে এখন সকল পন্থীকে স্থান দিন। যে ছুঁতমার্গ পরিহার করতে এখন সবারই একটা আকাঙ্খা দেখা যাচ্ছে, সকল মতের লোককে মিলনের স্থান না দিলে কংগ্রেসে ত সেই ছুঁত মার্গেরই স্থান দেওয়া হবে। মুক্তির জন্য যদি বন্ধের মধ্যে ঢুক্‌তে হয়, তবে সেটা গ্রাহ্য কেউ করবে না। কংগ্রেসে যদি দল বিশেষের স্থান না হয় তবে সেই দল অন্যভাবে দল পুষ্টি করবে। আজ গণ্ডীর ফলে ব্যোমকেশ প্রভৃতি কংগ্রেস ছাড়া। তাঁরা কি দেশের কেউ নন? না দেশ তাঁদের ছেড়ে দিতে পারে?

কত মহাজন, জমিদার,শিল্পী, উকীল, ডাক্তার,এটর্ণী, ব্যারিষ্টার দেশের মানুষ তাদের ছেড়ে কি দেশ দাঁড়াতে পারে। ঐ যে ম্যাথর মুর্দ্দাফরাস শ্রমজীবি যারা, রেল মিউনিসিপালিটি কল কারখানায় কাজ করছে—তারা কি কো-অপারেশন করছে না?—তারা কি দেশের সন্তান নয়? কংগ্রেস কি তাদের প্রতিনিধি? ঐ যে লেংটি পরে রোদে জলে ভিজে কত কৃষক

কষ্টে দিনপাত করছে—যাদের চালে খড় নেই, পেটে ভাত নেই, উপার্জ্জিত ধন মহাজনের ঘরে তুলে দিচ্ছে, তাদের দুঃখ দূর করতে কয়জন নেতা গ্রামে ঢুকেছেন? তারা কি দেশের বাইরে? যাঁরা এ সকলের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন, তাঁরা কোথায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন? কোন্ কংগ্রেস কমিটি গ্রামে ২ দেশ জাগরণের ভার নিয়েছেন। আমরা কংগ্রেসের মুখ চেয়ে দেশ নেতাদের মুখ চেয়ে বসে রয়েছি। কেমন করে কংগ্রেস গ্রামে কাজ করবেন, কেমন করে যে দেশের আশা ভরসার স্থান হয়ে কংগ্রেস শক্তিশালী হবে, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা; প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য। কিন্তু আজ যে দেশের সকল শক্তির একত্র সমাবেশ দরকার সেইটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। এই কংগ্রেসের পবিত্র ক্ষেত্রে কাকেও ত্যাগ করলে চলবে না। মতভেদে যে আসলটাই ভুলতে হবে এমন নয়। যখন কোন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয় তখন নানা মত হয়ে থাকে। সেই নানা মত নানা প্রকারে কার্য্য করে—তাদের প্রত্যেকের কার্য্যে বাধা দিলে চলে না।

এ দেশে জাতীয় জীবন আজও দানা বাঁধে নি। এমন কোন প্রত্যক্ষ দ্রষ্টার প্রভাব দেশ অনুভব করে নি, যে সব ছেড়ে ব্রজগোপীর মত শ্যামচাঁদের জন্য যমুনা কূলে ছুটবে। গণ্ডী দিয়ে যদি কংগ্রেস বলে যে সে দেশ প্রতিনিধি, তবে দেশের অপর লোকে হাসবে।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! বর্ত্তমান যুগের দেশাত্মবোধের মহর্ষি মহাত্মাও স্বরাজদলের সঙ্গে কংগ্রেসে মিলে কাজ করতে পারছেন না!—আর তিনি ও স্বরাজ কেউ মডারেট দলকে কংগ্রেসের বুকে টানতে পারছেন না। ভারতবর্ষ মধ্যে গান্ধি মহাত্মা, এক মাত্র পুরুষ যিনি সত্যের আলোকে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝেছেন! তাঁর দুর্ব্বোধ সত্য চিরন্তন। ঐ চিরন্তনকে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন দেশের অন্তরে প্রকট করে তুলতে যে খুব বেশী যত্ন হয়েছে তা' মনে করি না। মহাত্মা যে মনে ঐ সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁর চেলারা ত তা পারেন নি। ঐ জিনিসটা ঘোলা ময়লা করে অপরে গ্রহণ করেছে। কাজেই তিনি যদি স্বরাজ দলকে, কংগ্রেসের কাজ ছাড়াতে চেষ্টা করেন তবে কর্ত্তৃত্বের সমস্যাই প্রবল হয়ে উঠবে। এইজন্য—ভারতবর্ষে এখন সর্ব্বজন নিয়ে কংগ্রেস কর্ত্তৃত্ব করা উচিত।

বিলাতী পার্লিয়ামেণ্টের সাদৃশ্য এখানে খাটে না। লিবারেল, কনসারভেটিভ, ও লেবর, তাদের মতভেদ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সব এক; মর্লি বা সলস্‌বেরি, লয়েডজর্জ্জ বা র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড ভারতবর্ষ বিষয়ে যা মত প্রকাশ করছেন তাতে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে। কংগ্রেস আগে পূর্ণ বলে বলীয়ান হোক তখন সাম্প্রদায়িক কর্ত্তৃত্বের কথা উঠানো চলবে।

মহাত্মাজীর উপর লোকের গভীর শ্রদ্ধা আছে। তাঁর প্রতি ভক্তির প্রকাশে কেউ পশ্চাৎপদ নয়। তিনি অনুজ্ঞা করলে মানুষে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু তাঁর হুকুমে দেশ সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার মত মনের অবস্থা কারো বোধ হয় নেই। তাঁর কাছে সবাই নত হবে কিন্তু স্বদেশ ব্রতে যেখানে মতভেদ আছে, তাতে তাদের মত থেকে তারা

ভ্রষ্ট হবে না। তিনি যে একনিষ্ঠ স্বদেশসাধক সে বিষয়ে কারো মতভেদ নেই। সে দিন মনীষি নেহেরু বলেছেন স্বরাজদল, মহাত্মার কর্ম্মক্ষেত্রের জঙ্গল সাফ করছেন। কিন্তু তাঁদের জঙ্গল সাফ করা কাজ তাঁরা ছাড়বেন না।

স্বরাজদল মহাত্মার সঙ্গে কার্য্য প্রণালীতে যে যে স্থানে এক হতে পারেন নি সে কথা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেছেন ; কিছু ঘোলা রাখেন নি। কিন্তু যাঁরা মহাত্মার কথা প্রতিপালিত হ'লনা বলে ডঙ্কা বাজাচ্ছেন, তাঁরা ত কিছুই করেন নি। আচার্য্য প্রফুল্ল যে অমানুষিক পরিশ্রম করে খদ্দর ব্রত প্রচার করছেন, সে কাজে ত কোন চেলা বা কোন প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হয় নি। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তাঁরা ত এই সংগঠন কাজটা করতে পারতেন—না হয় কাউনসিলগামী তাঁরা নাই হলেন। এখন যদি মহাত্মাজী স্বরাজদলকে তাড়াবার মানস করেন, তবে অনেকেরই কর্ত্তৃত্ব লালসায় জিভে জল ঝরবে।—হায়রে দুর্ভাগ্য দেশ! কাউনসিলে গিয়ে যে খুব সুবিধে হবে এ বিশ্বাস অনেকেরই নেই তবু স্বরাজ দলের কর্ম্মোদ্যমের উপর শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না। গয়া কংগ্রেসে যে দিন, দেশবন্ধু সভাপতি হয়েও পরাজিত হলেন সে দিন থেকে তাঁর অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও অমানুষিক অধ্যবসায় বলে ভারতবর্ষে যে নব সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সঙ্ঘকে যে তিনি কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করে রেখেছেন, এটা তাঁর গভীর ভূয়োদর্শনের ফল। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলে কংগ্রেস শক্তিহীন হ'য়ে পড়ত। এইজন্য দেশবন্ধু নেহেরু প্রভৃতির নিষ্ঠার উপর ভক্তি দৃঢ়তর হয়। এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ফলে কাউনসিল নির্ব্বাচন কালে স্বরাজ দল এত প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। নতুবা কাউনসিল গেলেই যে আমাদের সুবিধা হবে এ বিশ্বাস পোষণ করে স্বরাজ্য দলের সাহায্য করে নি। স্বরাজ্য দল গঠন মূলক কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। তাঁরা সেই দিকে কতদূর কি করেন, এই জন্য সবাই আশা করে আছে। কিন্তু এখন যদি কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব-যুদ্ধে তাঁদের নাম্‌তে হয়, তবে গঠনের কাজ দূরে যাবে। আর গঠন-মূলক কাজ না হ'লে কোন প্রকারে শক্তি সংহত হবে না।

যারা কাউন্‌সিলগামী না, তাঁরা যদি উদাসীন না হয়ে কংগ্রেস-ভুক্ত থেকে গঠনের দিক পরিচালিত করতেন, তবে কংগ্রেস যে পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করত, সেটা হত দেখার বিষয়।

সে দিন বিলাতে লালা লাজপত রায় বলেছেন absolute non-co-operation is impossible এ সব ত মহাত্মাজী বুঝেন না। হিন্দু যেমন অস্পৃশ্য বলে বহু জন বল কে তফাত রেখে এমন অসহায় হ'য়ে পড়েছে ; তেমনি সকল দলকে যদি কংগ্রেস কোলে না নেয় তবে কংগ্রেসের বল থাকবে না। বিভিন্ন মতবাদীর একমাত্র সমাবেশে গোল বাড়িয়ে, কর্ত্তৃত্ব নিয়ে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি করে, মূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব কে লোপ করে দিতে পারে—এ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেখানে মহাত্মা আছেন যেখানে নেহেরু দেশবন্ধু আছেন যেখানে মালব্য থাক্‌বেন সেখানে এমন হবে কেন? বৈচিত্র্যকে পরিহারের চেষ্টা প্রলয়মুখী। বিশ্ব বিচিত্ররূপেই

ফুটে ওঠে। এই বিচিত্র বিশিষ্টতার মধ্যে যেটা এক, ধ্রুব সেটাকে গ্রহণ করতে হবে কত সুরেন্দ্র উমেশ, কত মেটা, কত চিত্তরঞ্জন নেহেরু, কত মহাত্মা উঠবে যাবে কিন্তু হিমাচলের মত অনন্ত কাল স্থায়ী হয়ে যাতে কংগ্রেস থাকে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। এই কংগ্রেসের পীঠে সকলের স্বার্থ সমন্বয় করে নিতে হবে। ভারতের আকাশে যে মুক্তির মালা দুলে দুলে ঘুরছে, ঘরে দিব্য জ্যোতিতে নয়নে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে, যার মোহন সঙ্গীত "মহাসিন্ধুর ও পার থেকে "আয় চলে আয়" বলে নিয়ত আহ্বান করছে, সে আলোকদ্যুতির পরশ পেয়ে, সে আহ্বান শুনে, ভারত অস্থির হ'য়েছে। ঐ বিজয় মাল্য পরবার জন্ত যদি বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘিত করতে, "ভাঙ্গবারি আনন্দে" উৎফুল্ল হয় তবে সেটা আশ্চর্য্য হবে না। এই নর্ত্তনানন্দে যদি বেতালে পা পড়ে তবে সেই বেতালা দুঃখ পাবে। আর দু চারটা বেতালা নাচের বেসুরা ঘুমুরের আওয়াজ যে পাওয়া যাবে না, তা নয়। কিন্তু তাই বলে, আজ যখন বুঝতে পারছিনা আকাশের চাঁদ এয়ারোপ্লেনে চড়ে ধরি, কি লাফ দিয়ে ধরি, তখন একটা অনির্দ্দিষ্ট বিশিষ্টতায় ভারতের প্রয়াসকে নিবদ্ধ করতে হবে, আর তার বাইরে গেলেই সব অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা হ'লে ত ঐ ছুঁত মার্গকেই ডাকা হবে।

একটা প্রতিহিংসা পোষণ করে, প্রতিশোধ দিবার খাতিরে কোন কাজ করা চলবে না। মহাত্মাজি এই পথের সন্ধান দিয়েছেন। সেই পথের পথিক হতে হলে, যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেটা কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্বপ্রয়াস মাত্র লোভই নয়, council entry or non co-operation or civil disobedienceই মাত্র উপায় নয় —সেটা হচ্ছে আত্ম নির্ভরতা, দাসমনোভাবের পরিহার।

কংগ্রেসের বুকে থেকে যাদের যা বিশিষ্ট মত তা' অনুসরণ করতে বাধা দেবার মত সঙ্কীর্ণতা এখন কংগ্রেসের না থাকাই উচিত। কিন্তু আত্ম নির্ভরতা জাগাতে—স্বপ্রতিষ্ঠ হতে সকলেই একমত হতে পারেন। যে মত সর্ব্বলোকহিতকর হবে সেখানে জনমত স্বতঃই সংহত হবে।

সময় সময় ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি জনসাধারণকে অভিভূত করে। সেই ব্যক্তি বিশেষের মত ভ্রান্ত হলেও, এক ইন্দ্রজাল প্রভাবে সাধারণ মুগ্ধ হয়। কিন্তু চিরকালই পৃথিবীতে এমন হয় না। আমি বিশ্বাস করি জগতের অতীত ইতিহাসের আলোচনা করে মানুষের সভ্যতা এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ছে যখন মানুষ কিছুই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করবে না। যিনি বিশ্বের অন্তরালে দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের মত লুকিয়ে আছেন, তিনি যে চিরদিনই অব্যক্ত থাকবেন—রহস্যময় থাকবেন এমন কি কথা! লক্ষ লক্ষ যুগের অস্ত্র ঝঞ্ঝনা, বিপ্লবের মধ্যে, কত দানবীয় হিংসা দম্ভ নির্ঘোষ মধ্যে, ঐ শক্তি ধীরে ধীরে প্রাংশুজাল ভেদ করে উঠছেন, তাকে রোধ করে অগ্রাহ্য করে কার সাধ্য?

তিনি একের নয়, দুয়ের নয়,—তিনি সর্ব্ব জনের! সকলকে ভুলে বিশেষকে ধরার দিন চলে গেছে। এ যুগ সমন্বয়ের—আর এই ভারতবর্ষ—ত্রিবেণী-সঙ্গম!

শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

৬

চারুবালা

সে বৎসর চৈত্র মাসের আরম্ভেই ইষ্টারের ছুটি পড়িয়াছিল। একটুকু নিরিবিলি থাকিবার জন্য ছুটির সময় একজন বন্ধুর গঙ্গা তীরস্থ বাগানে আসিয়া বাস করি। বাগানটি ছোট খাট, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সামনে বাঁধা ঘাট। ঘাটের চাতাল দিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত সরু রাস্তা,—মোটা সুরকী বিছান। রাস্তার দুই ধারে ফুলের গাছ, কেয়ারী করা। কেয়ারীর অপর ধার দিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথ। চাতাল হইতে যে রাস্তা গিয়াছে তাহার শেষে সম্মুখের বারান্দায় উঠিবার তিন ধাপ সিঁড়ী, ঢাকা বারান্দা। সেখান হইতে বসিয়াই গঙ্গার উভয় কূল দেখা যায়। বারান্দার পরে বড় বৈঠক খানা; তাহার দুই পার্শ্বে দুইখানি শোবার ঘর। সেইখান দিয়াই দরোয়াজা। প্রত্যেক শোবার ঘরের সংলগ্ন একটী করিয়া স্নানের ঘর। এ ঘরের শ্রেণীর অপর দিকে অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত বারান্দা। এ বারান্দার ছাদ গড়ানিয়া, রাণীগঞ্জ টালীর। বারান্দা হইতে নামিলে উঠান। তাহার শেষে রাঁধিবার ও লোকজনের ঘর ও অন্য প্রয়োজনীয় স্থান। এই গুলির পশ্চাদ্দিকে সরকারী রাস্তা। বাগানের দুইধারে খালি জমি। উত্তরের জমির পর প্রকাণ্ড নালা, সাঁকো দিয়া পার হইতে হয়। তাহাই অন্য একখানি বাগানের দক্ষিণ সীমা। অপর খালি জমীর পর এক বাহাদুরী কাঠের আড়ৎ। পূর্ব্বে নেপালী শালের কাঠ নদীতে ভাসাইয়া আনিয়া এখানে বিক্রয়ার্থে রক্ষিত হইত। এখন আড়তের ভগ্নাবস্থা, রাত্রে একজন দরোয়ান মাত্র জিম্মায় থাকে। ফলে এ বাগান বাটী নির্জ্জন, কাহারও সহিত সংস্রব নাই। খালি আমার দোসর ছিল ভজহরি সমাদ্দার। ভজহরি এখন ছুটিতে। কিছুকাল জাহাজে কাজ করিতেছে। কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন আর অন্যদিকে কলম্বো পর্য্যন্ত সব বন্দরের খবর দিতে পারে। জাহাজ ডুবি, নৌকা ডুবি, মানুষ ডুবির অনেক বিবরণ মুখস্থ; ভজহরি সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণ। রন্ধনে পারদর্শী, জিনিষ পত্রের হেপাজাতে সুদক্ষ, ইংরেজি বাঙ্গালা লেখা নকলে পটু। তাহা ছাড়া বাঁশী বাজাইতে, পদ গাহিতে হীন শক্তি নহে। সাইকেলে চড়িয়া বাজার করিত। সে কার্য্যে তাহার প্রতিভা সমুজ্জ্বল। তাহার দোষ ছিল এক। দুইবেলা আহারান্তে জাগিয়া থাকিতে অক্ষম। আর সাপের ভয়ে বুদ্ধির পরাভব। একদিন বাগানে এক নেবু গাছে একটা লাউ ডগা সাপ দেখা অবধি বিশেষ শঙ্কিত ভাবে চারিদিক পরীক্ষা না করিয়া বাগানের মধ্যেও ভজহরি এদিক ওদিক করিত না।

সে রাত্রি ছিল শুক্লা চতুর্দ্দশী। সহরের তুলনায় রাত্রি বেশী হয় নাই। কিন্তু নৈশ

জীবনের অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তারিত। রাস্তা নিঃসাড়া, চলাফেরা একেবারে বন্ধ। দূরে মণিহারির দোকানে কে বেহালা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। ক্রমে গান থামিয়া গেল। দোকানী সশব্দে দোকান বন্ধ করিল। সেই শব্দে নিঃস্তব্ধতা যেন কাঁপিয়া আরও ঘন হইয়া উঠিল। এ দিকে গঙ্গার উপর নিমুক্ত দৃষ্টিতে যেন মনের বাঁধন খুলিয়া যাইতেছে। সব স্থির, কেবল দুইটি পদার্থ চঞ্চল, চন্দ্রের উর্দ্ধতর গতিতে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি আর স্রোতের কলধ্বনি। হঠাৎ একটা গান যেন তীরের মত আসিয়া কাণকে চমকাইয়া সজাগ করিল। ভজহরি মাদুর পাতিয়া বারান্দায় ঘুমাইতেছে। শ্রোতা সঙ্গীতের বিশেষ পরিচয় লাভার্থে সিঁড়ির উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন যে কাঠের আড়তের নীচে প্রায় জল ছুঁইয়া একখানা ভাঙ্গা নৌকা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার উপরে বসিয়া একটী যুবক গাহিতেছে।

"কাল্ বলে সে মাধব গেছে—
সে কালের আর কদিন আছে ?"

কি শুভ যোগে প্রেম আপনি উদয় হয় তাহা দুর্নির্ধার্য্য। সহজ অশিক্ষিত সুরে গীত এই কয়টা গৌরব হীন কথায় যে বিরহীর অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করাইতে পারে, এটা এখন ভাবিলে লজ্জা মাথা বিস্ময়ে অভিভূত করে। যুবক উঠিয়া গেল। এদিকে একদল ছোট পাখী বুকে পাখা সাঁটিয়া চন্দ্রমার সম্মুখে নানা লীলা ভঙ্গী প্রকটিত করিতেছে। দূরস্থ একখানি জেলে ডিঙ্গি যেন স্বেচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছে। আরোহীর মূর্ত্তি অলক্ষিত। ডিঙ্গি হইতে একটা গান যেন উড়িয়া আসিল।

"জ্ঞান দাস কহে শুন বরনারী—
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া পীরিতি করিলে
দুখ রহে তার ঠাঁই।"

এ গানকে গান বলিয়া মনে হয় নাই। যেন আমাদের সমগ্র দেশের হৃদয়বধূ চির যৌবনা, মৃদু হাস্যময়ী—বড় আপনার। অনন্তর মনোযোগভ্রংশ জন্যই হউক আর সত্য সত্যই হউক, অবগুণ্ঠিতা গঙ্গা দৃশ্য, ঘটনা শূন্য। বাগানের বাহিরে কাঁটাল গাছ হইতে পেঁচার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান বাস্তব অন্তরে প্রবেশ করিল, কল্পনার কুহক ভাঙ্গিল। একটী বন্ধুর রচিত কবিতার আবৃত্তির সাহায্যে ভাঙ্গামন জোড়া দিবার চেষ্টা হইল।

খুঁজিছে চন্দ্রমা লভিতে পুর্ণিমা, কল কল জলরব।
অশরীরী গান, ছুঁতে নারে কান, মনে শুধু মহোৎসব॥
চাঁদে ঘিরে তারা ঢালে গীতি ধারা নেচে সুরধুনী পরে।
পৃথিবী অম্বর মাঝে চরাচর হাসেমৃদু শান্ত করে॥

নীরব ধরণী করেছে পরনী উজ্জ্বল বিস্মৃতি বেশ।
বায়ুর নিশ্বাস স্তুতির উচ্ছ্বাস, দিনের শ্রমের শেষ ॥
স্বকার্য্যে মরম হতেছে বিভ্রম, বাহ্যজ্ঞান ঘুমে জাগা।
বাস্তব যেমন, অবস্তু এখন, কার নাই গোড়া আগা ॥
বাহির ভিতর, নব বধূবর, হয়ে আছে মুখামুখী।
কোথায় কি জানি সুখবর আনি,না-জানি প্রেমের উঁকি ॥
আছি কিবা নাই, ভেবে নাহি পাই, আছে কিবা নামরূপ।
মধুর বিভ্রম, এই কি সে ক্রম মিশে যাহে প্রেম-ভূপ ॥

আবৃত্তি শেষ হইয়াছে মাত্র। তখনও কর্ণে ছন্দের পূর্ণ ঝঙ্কার। এমন সময় এক আর্ত্ত চিৎকার ও জলে পড়িবার শব্দ আসিয়া বিপ্লব ঘটাইল। দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বিকল হইয়া চক্ষু চারিদিকে দৌড়াইয়া অস্থির।

(২)

নালার পরপারের বাগান আর যেখানে ছুটিতে উপনিবেশ এ দুইটী বাগান একই ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল। তাহার অবস্থান্তর বশতঃ লেখকের বন্ধু একটি খরিদ করিয়া তাহার নানারূপ উন্নতি করিয়াছেন। অপরটীর ক্রেতা বৎসর পার না হইতেই সেই বাগানে পরলোকগত হন। মৃত্যুকালে ছিল তাঁহার বিধবা পত্নী ও দুইটী নাবালক পুত্র। এই দুর্দ্দৈববশতঃ গৃহিনীর, বাগানটীকে অপয়া বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। পতিবিয়োগের পর তিনি আর বাগানের মাটী মাড়ান নাই ও ছেলেদিগকেও আসিতে দেন নাই। ছেলেরা নাবালক না হইলে নিশ্চয়ই বাগান বেচিয়া ফেলিতেন। এখন ভাড়া দিয়া দিয়াছেন। অনাদৃত বাগান বিশেষ বেমেরামৎ অবস্থায় ভাড়া দেওয়া হয়। অন্য যাহা হউক, ঘাটের অবস্থাটা একটু আশঙ্কার বিষয়। জল-তপ্ত সিঁড়ির কএকটা স্থান ভাঙ্গিয়া অসংলগ্ন। ভাঙ্গা গোটা ইষ্টক স্থানে স্থানে এমনই স্তূপাকার যে তাহাতে উৎপন্ন কৃত্রিম স্রোত হইয়া অসাবধান দুর্ব্বল স্নানার্থীর পক্ষে যথার্থই বিপদের আস্পদ। চারুবালা মজুমদার নামে এক অবস্থাপন্ন বিধবা মহিলা বাগানটির ভাড়াটিয়া মনি বাগান বাড়ীর প্রয়োজন মত মেরামত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘাটে হাত পড়ে নাই। কথা ছিল যে গরমের সময় আরো জল মরিলে তাহার সংস্কার হইবে। বড়দিনের সময় হইতে চারুবালার পুত্রকন্যা লইয়া বাগানে বাস। মেয়ে সুবালা বড়,ছেলে রমেশ ছোট,উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান চারিবৎসর। সুবালা যোল বৎসর বয়সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া এখন ফলের প্রতীক্ষা করিতেছে। রমেশ পড়িবার জন্য কলিকাতায় যায়। বড়বাজারের ঘাট পর্য্যন্ত জাহাজের মাসিক টিকিট। তাহার পর ট্রাম যাত্রা। নদীর বাতাসে আর যাতায়াতের পরিশ্রমে রমেশ সুস্থ সবল। বার বৎসরের ছেলে দেখতে ১৪।১৫ বৎসরের মত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে চারুবালা সুশিক্ষিতা। বাঙ্গলায় সুলেখিকা, ইংরেজীতে চলনসহি। সংস্কৃতে শ্রীধরের টীকা সমন্বিত ভগবদ্গীতা পড়িয়াছেন।

বলিতেন, পরমেশ্বরের থাকা না থাকা শিক্ষার পক্ষে যখন একই তখন তাহাতে সামাজিক সম্ভ্রম ও অর্থ লাভের যতই সুবিধা হউক না কেন তাহা প্রকৃত পক্ষে হিতকর হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে শৈশবে ছেলে মেয়ে একত্রে একই শিক্ষয়িত্রীর অধীনে শিক্ষা না পাইলে উভয়ের যথার্থ শিক্ষার উপায়ান্তর নাই। এই বুদ্ধিতে তিনি রমেশকেও খ্রীষ্টিয়ানী মেয়ে স্কুলে বিদ্যারম্ভ করান। বার বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে অন্য স্কুলে দেবেন স্থির করিয়াছেন। কন্যা যাহাতে আত্মরক্ষায় শক্তিমতী হন সে বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। বার বৎসর বয়সে সুবালাকে মিসনারী স্কুলে বোর্ডিঙে দেওয়া হয়। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সাহচর্য্যে আত্মরক্ষা শিক্ষা হইবে—উদ্দেশ্য ছিল এই। চারুবালা মেয়েকে ছুটির সময় জাহাজে রেলে ট্রামে একেলা পাঠাইতেন। শিক্ষা ছিল যে কাহারো কোনো সাহায্য চাহিতে না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত বাঙ্গালীর পক্ষে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক রেল পথে অবৈধ ভাবে সম্ভাষিত হইয়া চৌদ্দবৎসরের সুবালা করধৃত শোভিত দণ্ডের দ্বারা তাহাকে এরূপ দণ্ডিত করেন যে সে শিক্ষার ফল সারা জন্ম ফলিবে মনে হয়, চারুবালা বুঝিলেন, স্বজাতীয় অরক্ষিতা রমণীর প্রতি আমাদের যে হতাদর তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ বিদেশীয় পরিচ্ছদের নিকট আমরা ভূমি চুম্বিত নতশির। যথাযথরূপে ঘটনার তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া চারুবালা কন্যাকে সোণার হার গড়াইয়া দিলেন আর সেই অবধি দূর যাত্রার সময় সুবালার বিলাতী পরিচ্ছদ ধারণের আরম্ভ। স্কুলে সুবালা লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতী আর সেই সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস খেলায় সিদ্ধহস্ত। ছাত্রীদিগের টুর্ণামেণ্টে স্বর্ণপদক সুবালার ভাগ্যে পড়ে। এখন সুবালা সুগঠন, ক্ষীনাঙ্গী উজ্জ্বল নেত্র, প্রসন্ন মুখ। অঙ্গ-সৌষ্ঠবে সুবালা সদ্‌ভাব-সম্পন্ন, চক্ষু মাত্রেরই প্রিয়। সুবালাকে দেখিয়া বয়স্থ লোকের একই বুলি—"কি মেয়েলী মেয়েটী!" দেশের অবস্থা দেখিয়া চারুবালা স্থির করিয়াছিলেন যে কন্যার ভালরূপ হিন্দী ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা এইবার করিবেন।

যে দিনের কথা সেদিন সুবালা ও রমেশ নিমন্ত্রিত হইয়া বর্দ্ধমানে এক বন্ধুর বাড়ী গিয়াছিল! চারুবালা বাগানে একাকিনী। এক মালী ভিন্ন রাত্রে কোন চাকর বা দাসী বাগানে থাকিত না। আর সে মালী থাকিত বাগানের শেষ দিকের ঘরে। সেইরাত্রে গঙ্গার নৈশ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চারুবালা ঘাটের রাণার শেষের দিকে বসিয়া কি ভাবিতেছেন তিনিই জানেন। নিশ্চয়ই তাহার মন বাহিরের দিকে নির্ব্যাপার ছিল। তখন নিদ্রা জাগরণের সন্ধিবশতঃই হউক আর আকস্মিক ফেরুধ্বনিতেই হউক অনির্দ্দিষ্ট কোন কারণে চারুবালা জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া যান। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে জানুদ্বয়ে সুদৃঢ় ভাবে ধৃত বায়ুপূর্ণ সেমিজ ও সাড়ী তাহার জীবন রক্ষার একটা হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার অচেতন প্রায় দেহ আমাদের বাগানের ঘাটে তুলিবা মাত্র ভজহরি ভায়া অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নেহের সহিত তাহাকে বারান্দায় লইয়া বৈজ্ঞানিক

উপায়ে পুনরুজ্জীবনের জন্য যত্নে নিবিষ্ট হইল। আর্দ্রবস্ত্র ছাড়িয়া শুষ্ক বস্ত্রধারী বন্ধুকে কিংকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়া সর্প-ভয় বিস্মৃত ভজহরি সাইকেলে চড়িয়া বাহির হইল। অবিলম্বে ডাক্তারবাবু ভজহরির সহিত আসিলেন। চিকিৎসা শুশ্রূষার ফলে রাত্রি শেষে চারুবালা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া অনুনয় করিলেন যে, তাঁহার সন্তানদ্বয় ফিরিবার পূর্ব্বেই যেন তাঁহাকে নিজস্থানে রাখা হয়। ডাক্তার বাবুর তত্ত্বাবধানে কার্য্যেও সেইরূপ হইল।

(৩)

রমেশ সুবালা বাড়ী আসিয়া দেখিল মাতা শয্যাশায়িনী। ডাক্তার বাবুর মতে রোগ নাই, কেবল বায়ুর তাড়না (nervous shock)। যে দুর্ঘটনায় ইহার উৎপত্তি তাহার বিবরণ ছেলে মেয়েকে বলা হয় নাই। ঔষধাদির আয়োজন অল্পই! কেবল সেবা-শুশ্রূষারই বিশেষ প্রয়োজন। মানসিক উদ্বেগ হইতে রক্ষাই একমাত্র চিকিৎসা। রমেশের বিদ্যাভাসের ধারা অক্ষুণ্ণ। সুবালা সংসার চালনা ও মাতার শুশ্রূষায় দক্ষতার জন্য অপর সকলের বিস্ময়ানন্দ এবং ডাক্তার বাবুর প্রশংসার পাত্রী। ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার স্কুলের সহপাঠী। হরেন্দ্র প্রায়ই বলিতেন" কি মেয়ে,ভাই। বলামাত্রই কথা বোঝে আর বর্ণে বর্ণে তা কাজে আনে। মায়ে মেয়েতে কি একটা গুপ্ত সংকেত আছে। বিনাবাক্যে পরস্পরের মনের আদান প্রদান। দেখে আশ্চর্য্যও হই খুসীও হই।" ভজহরি ও আমি প্রতিদিনই চারুবালাকে দেখিতে যাই। অতিরিক্ত, ভজহরি সাংসারিক কার্য্যে সুবালার দক্ষিণ হস্ত। দৈনিক বাজার, কলিকাতা হইতে জিনিষপত্র আনয়নে, ভজহরি অক্লান্ত। চারুবালার আহারে রুচি উৎপাদনার্থে ভজহরির রন্ধন নৈপুণ্যের প্রায়ই প্রয়োগ হইত। প্রতিসন্ধ্যায় যখন চারুবালা পুত্র কন্যা লইয়া বারান্দায় বসিয়া গঙ্গা দেখিতেন তখন ভজহরি তাহার মনঃপ্রাসাদের জন্য বাঁশী বাজাইত। একদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। চারুবালার অসুখ তখন একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। চারুবালা বলিলেন, "ভজবাবু আপনি কি গান গাইতে পারেন? নিশ্চয়ই পারেন। একদিন পানসিতে বসে গান গাইছিলেন, আমি শুনেছি।"

আমি ভাবিলাম এ দেখছি ভবী ভাত খাবি? না, হাত ধোব কোথায়?

চারুবালার অনুরোধে ভজহরির সমস্ত মুখে একটা আনন্দের আভা ফুটিল,—স্বর প্রফুল্ল হইল। "দেখুন মা, মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে সুখী করিতে পারা সৌভাগ্য মনে করি। আপনার অনুমতি পেয়ে পালা সাঙ্গ করে গান গাইব। গাইতে পারি আর না পারি যখন আজ্ঞা পেয়েছি তখন সঙ্গীত দেবী মুর্ত্তিমতী হয়ে আমার গলায় বসবেন। আমি বলিলাম, "কিছু শিরোপা চাই।"

"মায়ের খুসীই যথেষ্ঠ শিরোপা। তোমার মত বে-রসিকের কাছে গান গাওয়া একটা শাস্তি, জেলখাটা, বেত খাওয়া।"

ভজহরির কথায় চারুবালার দুর্ব্বলতায় মলিন অধর ওষ্ঠে বর্ষার মেঘ মুক্ত চন্দ্রকরের ন্যায় হাসির জ্যোতিঃ ক্ষণেক দেখা দিল। তাহার আকর্ষণে ভজহরির গান জাগিল।

"প্রথমে সূচনা" এই বলিয়া গান আরম্ভ হইল। গানগুলি ভজহরির নিজের রচনা ; আর বলেন সে শীঘ্রই ছাপা হইবে। নামরূপ নারায়ণ।

সূচনা

এটা সেটার তরে লোকে কত দুঃখ সয়
তোর মুখ চেয়ে যেন ছাড়ি নিন্দা ভয়।
তোর নামে রচে কথা
ঘোচে মরমের ব্যাথা
সুরে-বেসুরে গেয়ে মন জানে যে

সুখোদয়।

গান শেষ করিয়া চারুবালার মুখের দিকে চাহিয়া লব্ধ উৎসাহ ভজহরি বলিল, "এখন পালা আরম্ভ। রূপনারায়ণ প্রাপ্তির আশা।

গান

আমি শীতের দিনে নাইতে গেলাম
রূপ সাগরের জলে !
আমি দাঁতই মাজি, মুখই যে ধুই,
কোঁচার খুঁট না খুলে।
মনে করি ঝাঁপ দে পড়ি,
শীতে আবার হি-হি করি,
আমি জল দেখি আর ডাঙ্গা দেখি
সাহস যদি মিলে।
দিলে বিপদের ছিটে ভাবনা সব গেল মিটে।
আমি তড়াক করে লাফিয়ে পড়ি
সাত সতের ভুলে।
সে জানে ব্যথীর ব্যথা, মনে মন নাইক কথা,
সবে সব মিলিয়ে দিলে
এটা সেটা গেল চলে।

চারুবালা বলিলেন, "ভজবাবু গানের ভাষা সহজ আর চিত্রটি ঠিক চোখের সামনে।"
প্রশংসা ভজহরির অপরিচিত। সলজ্জ ভাবে বলিল, "তারপর সংকল্প।"

গান

আমি রূপ সাগরে ঝাঁপ দিব—
এই পণ করেছি সার।
আমি ডুবে যাব, তলিয়ে যাব
ফিরব নাকো আর!
ওতে হতে চুপে চুপে ভিতরটা মোর টানে রূপে
পরাণ পুরুষ ফুঁপে ফুঁপে
করে হাহাকার।
রূপ সাগরের তরল আলো
ভিৎরে বাইরে মেলায় ভাল
(আমার) হেঁটেতে রূপ উপরে রূপ
রূপের একাকার।"

চারুবালার চোখে ফুটন্ত প্রফুল্লতা। ভজহরি নিবিষ্ট চিত্তে বলিল, "তার পর সংশয়।"

গান

(আমার) রূপের ঘাটে, না ডুবি আজ
হয় বুঝিরে ভাই।
(আমার) হাল ভেসেছে, দাঁড় ভেঙ্গেছে
লগীতে যে পাই নে থাই।
(মনের) হাওয়া এলো মেলো এই এসেছে এই যে গেল,
(আমি) কোথায় ছিলাম কমনে যাব—
তার কোন ঠিকানা নাই।
(পরের) কথায় ভেসে ভেসে
এলেম যদি রূপের দেশে
রূপ দেখি যে সর্ব্বনেশে—
যা আছে সবার বালাই।
(রূপ বলে,) "তুই আমি হনা—"
তাতে আমার মন সরে না—
রূপ সে যে রূপ আমি হলে
আমার মুখেই পড়ে ছাই।
আঁখি বলে রূপসে দেখি,
মন বলে তায় ধরে রাখি

(আমি) ছাড়তে নারি ধরতে নারি
রূপের দিশে নাইক পাই।

ভাবের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া ভজহরি বলিল, "তার পর সাধন।"

গান।

আমার বাপের ঘরে যা আছে রে
দিয়ে রূপ কিনে দেনা।
(ও তার) জলুস অতি, হীরে মতি,
পান্না চুনি, রূপো সোনা।
(রূপ বলে) তা নেব না, মিছে তোর আনা গোনা
(তোর) সোনা চাঁদির রূপের খাতির—
সে রূপে এ রূপ মেশে না।
ছাড় ছল খুঁটি নাটি
কর বার ভিতর খাঁটি
প্রেমের জলে মনটি ধুলে
আমি রূপতো আছি—ই কেনা"।

"বাহ্যিক ত্যাগ নিষ্ফল" এই কথা ভজহরি যেন আপনার মনেই বলিয়া গাহিল।

(আমি) জনম ধরে রূপের তরে
চেয়ে আছি পথ পানে।
(আমি) নয়ন ভরিয়ে সেরূপ হেরিয়ে
মিলে যাব মনে প্রাণে।
(তার) চরণ মূলে আপন ভুলে
ঢেলে দেব যত আশা।
দিয়ে ভুল চুক, খালি করে বুক
চাব শুধু ভালবাসা।
আমারে যে জন চাহে না কখন
আমি চাব শুধু তারে।
পাই কি না পাই যেন ভুলে যাই
কেঁদে কেঁদে বারে বারে।

"এবার সমাপ্তি যার নাম পাগলামিই বল আর মাতলামিই বল আর সিদ্ধিই বল।"

ফুটেছে রূপের কলি খুঁজি তাই একই ধ্যানে।
সুবাস তার ছুটে এসে বলে গেছে কানে কানে।

হাসি তার দিবানিশি, শিরে শিরে আছে মিশি,
দেখা সেই ছায়া ছায়া কোথায় কবে—কে জানে ?
সে যেন কেমন শুঁড়ি
চুইয়ে নেয় রূপের কুঁড়ি
ঢেলে দেয় প্রেমের সরাব
ছোটে প্রাণ নেশার টানে"।

"এখন নেশার ফল দেখ," বলিয়া ভজহরির শেষ গান।

(আমি) খুপরি ভরা রূপের সুরা
খেয়েছিরে ভাই।
(সে) আগা গোড়া জ্যান্ত মরা
ভাঁটিতে চোয়াই।
(সে) রী রী করে জড়িয়ে ধরে
পালাতে না পাই।
(এ) কাটামোটা নেশার কোটা
ধরা ছাড়া নাই।
(এ) মগজ ফুটে গেঁজে উঠে
এক ভাবে সদাই।
(আমার) মনের ব্যথা, সন্দো কথা
নেশাতে হল ধোলাই।
(আমার) সমান হল মন্দ ভাল
মরা বাঁচা একই ঠাঁই"।

ছুটি যত বড়ই হউক শেষের দিকে একটু অতৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কর্ত্তব্যের লাগাম টানিয়া মনঘোড়াকে ফেরানোর সময় প্রায়ই ঘোড়া শিরপাঁও হয়। ডাক্তারের অনুমতি লইয়া চারুবালা সপরিবারে আমাদের সঙ্গেই কলিকাতায় ফিরিলেন। বিদায় কালে সুবিধামত তাঁহার বালীগঞ্জের বাটীতে দেখা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইলাম। সেরূপ নিমন্ত্রণ লাভ সৌভাগ্য, "না" বলা অসাধ্য।

(৪)

চারুবালার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তাঁহার প্রতি সৌজন্য মাত্র নহে। শীঘ্রই নিজের একটা সখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালীগঞ্জের বাড়ীটি সর্ব্বাংশে মনোগ্রাহী। সুরক্ষিত বড় বাগান। মাঝে বাড়ীখানি, তুলনায় বড়ই ছোট। দোতালা বাড়ী। উপরে নীচে গণনায় আটখানি ঘর। ঘরগুলি বড় বড়, যেন বাতাসের খেলিবার স্থান। সম্মুখের পুষ্করিণী নির্ম্মলসলিলা। গেটের কাছে আস্তাবল, মালী ও দরোয়ানের ঘর। গেটে ঢুকিলেই মনে হয় যেন বায়ু পরিবর্ত্তনের

জন্য সহর ছাড়িয়া আসিয়াছি। গাড়ী বারান্দায় নামিতে হাস্যমুখী চারুবালাকে দেখিলেই মনে হয় যেন নীরব মূর্তিমতী অভ্যর্থনা। কার্য্যে ফিরিবার পূর্ব্বে ভজহরি একবার সঙ্গে আসিয়াছিল। গৃহ ও গৃহস্বামিনীর যে বর্ণনা করিয়াছিল তাহা অনেক দিন মনে থাকিবে।

"ভায়া, বাড়ীটা যেন লেংড়া আম। রেলিঙ্গের বেড়া তার পাতলা ছাল। তার ভিতরে যেখানটাই চোখ দিয়ে কামড়াই না কেন সুস্বাদ সুখ, তারপর বাড়ীটা যেন ঠিক সেই পাতলা আঁটি। চারদিকেই চোখের মিষ্টি। আর চারু মা যেন বিজলী আলো। পরিষ্কার কাঁচে আঁটা। ভিতর বার সব দেখা যায় কিন্তু ছোঁবার যো নাই।"

যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বটবৃক্ষ তেমনই আকস্মিক আরম্ভ হইতে দীর্ঘকালব্যাপী ঘটনার স্রোত-লীলা। ছুটিতে বাগান বাস হইতে চারুবালার সহিত পরিচয় ও তাহার পরিণতি সম্পূর্ণ অচিন্ত্য-পূর্ব্ব। জীবনটাই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমষ্টি। পরীক্ষোত্তীর্ণা সুবালা লব্ধবৃত্তি এখন ডাইয়োসিসান কালেজের ছাত্রী। রমেশ সাউথ সার্ব্বান স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। চারুবালা ছেলে মেয়েকে লইয়া কার্সিয়ঙ্গে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাইয়াছেন। কয়েক মাস আর আমার সহিত দেখা শুনা বা পত্র ব্যবহার নাই। আমিও একটা বৈষয়িক কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত। একখানি ডাকের চিঠির শিরোনামায় চারুবালার হস্তাক্ষর দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলাম। পত্রে জানাইয়াছেন যে, কোন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাহেন। উত্তরে সেইদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সম্ভাষণান্তে তিনি যাহা বলিলেন তাহা যথাসম্ভব তাহারই কথায় পত্রস্থ হইল। কেবল কয়েকটী প্রকৃত নাম ছদ্ম নামে আবৃত।

চারুবালার জীবন বৃত্তান্ত জানে এমন কোন লোক এখন জীবিত নাই। যে ভাবে সে রাত্রে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার ইতিহাস আমাকে জানাইলে শান্তি পাইবেন। আর যে বিষয়ে আমার সাহায্য চাহেন ইহাতে তাঁহার সুবিধার সম্ভাবনা। কলিকাতার অদূরস্থ রিসড়া গ্রামে লোক দৃষ্টিতে সদ্ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম। পিতা অধ্যাপক পণ্ডিত, চারুবালার জন্মের অনতিপরে পরলোকগত হন আর ১২ বৎসর বয়সে চারুবালা মাতৃ-হীনা। জ্ঞানের আরম্ভ অবধি চারুবালা মায়ের সঙ্গে হবিষ্যান্নে মানুষ হন। মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থীর শ্রাদ্ধান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়ার মুখে চারুবালা শুনিলেন যে আড়াই বৎসর বয়সে বিবাহের পরেই তাঁহার বৈধব্য ঘটে। আহারের দোষ হয় নাই বলিয়া পণ্ডিতদিগের মতে অন্ন প্রায়শ্চিত্ত নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে হাতের দুখানি রূপার বালা খুলিতে হইবে ও বৈধব্য বিহিত বারব্রত উপবাসাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় চারুবালার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংসারে বাস। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুইটী বিবাহ, এক ঘর ছেলে মেয়ে। কোন প্রকারে শিষ্য যজমানের সাহায্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ। ভাগ বিভাগ বশতঃ পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর জমীর ফসলে সম্বৎসরের অন্ন সংকুলান হয় না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিনটী সন্তান চারুবালার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। দুই সতীনের বিদ্বেষ ও কলহে সংসারে শান্তি নাই। রন্ধন মার্জ্জন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের ভার চারুবালার উপর। সতীনেরা পরস্পরের লাঞ্ছনার জন্য বলিতেন যে, চারুবালার বৈধব্যই

তাহাদের সৌভাগ্য নতুবা তাহাদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য সংসার বিনষ্ট হইত। চারুবালার শ্বশুরকুল নির্ব্বংশ বলিয়া তাহাকে শ্বশুরঘর করাইয়া এক সতীন অপরকে বিপন্ন করিতে পারিতেছে না এই মহাদুঃখ। ছোট বৌয়ের ইচ্ছা ছিল চারুবালাকে বাড়ী ছাড়াইয়া বিপদ ঘটায়। কাজে তাহাই ঘটিল। পৌষ মাস, শনিবার, অমাবস্যা। কালীঘাটে কালী দর্শনের মহাধূম। ছোটবৌ বিধবা ভগ্নী ও ভাগীনেয়ের সহিত কালীঘাট যাইবে। স্বামীকে বলিয়া চারুবালাকে সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা হইল। কালী দর্শনের প্রতীক্ষায় চারুবালা উপবাসী। হাঁটিয়া রেল ও ঘোড়ার ট্রামে কালীঘাটে পৌঁছাইল। বেলা তৃতীয় প্রহর। ঠাকুর দেখিবার পর চারুবালা সঙ্গীদিগকে আর দেখিতে পায় নাই। চারিদিকে বিফল অনুসন্ধানে শ্রান্ত, উপবাস ক্লান্ত চারুবালা অচেতন প্রায় হইয়া গঙ্গার ঘাটের ধারে সন্ধ্যার সময় পড়িয়াছিলেন। এইভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গেল বোধ নাই। পরে স্বপ্নের ন্যায় দেখিলেন যেন আকাশ হইতে এক দেব যুবক আসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। বেদানার দানা টিপিয়া মুখে দিতেছে। ক্রমে দুই একটা করিয়া আঙ্গুর কমলা লেবুর রস মুখে প্রবেশ করিল। একটুকু দম পাইয়া চারু-বালা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁগা তোমরা কে? আমার ভাজ কোথায়?" যুবক বলিলেন, "সে কথা পরে হচ্ছে। এখন রাত হয়েছে। এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চল তোমাকে এখানে কোন ভাল জায়গায় দিয়ে যাই। তারপর সব ব্যবস্থা হবে"। যুবক গাড়ী চড়াইয়া চারুবালাকে একটা বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সে বাড়ীর কর্ত্তা চারুবালাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, ও-সব কন্য রাত্রে চুরী করে পালিয়ে যাবে"। পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বালীগঞ্জের বর্ত্তমান বাড়ীতে উপস্থিত। বাড়ী তখন ছিল অন্যরূপ—দুখানি একতলার ঘর। বাগান, পুকুর কিছুই ছিল না। চারুবালা একটা মাদুরে পড়িয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিলেন, আসিবার পথে তাহার বাড়ীতে খবর দেওয়া হইয়াছিল। মানসিক উদ্বেগ, অনশন ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমই রোগের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইল। চিকিৎসার ফলে কএক দিনের মধ্যে চারুবালা প্রকৃতিস্থ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নবীন বাবু পরিচয় পাইয়া রিসড়ায় চারুবালার দাদার সহিত দেখা করিলেন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দাদা চারুবালাকে বাড়ী আনিতে চাহিলেন। বড় বৌয়েরও তাহাতে আগ্রহ কিন্তু ছোট বৌ অগ্নি মূর্ত্তি। সতীনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুই ত সে কুলটাকে আনতে চাইবি-ই। এক গোয়ালের গরু কিনা? মরবার বয়স হ'ল এখনও কীনু মুখুজ্জেকে ভুলতে পারলি না। তোর এতে লাভই। পালার খাটুনি বাঁচবে কিনা আর আমাকে জব্দ করতে পারলেই তুই হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাবি! তোর ত মেয়ে নেই। আমার তিনটা আইবুড়ো মেয়ে কিনা। তেমন বাপ হলে এতদিনে বিয়ে দিয়ে দিত। তা তাকে আন না। একদিক দিয়ে সে আসবে আর একদিক দিয়ে আমাকে মড়া বের করবে। স্পষ্ট বলে দিচ্ছি" ছোট বৌয়ের মুখের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। বড় বৌ কুটনো ফেলিয়া বঁটী হাতে বাহির হইতেছেন দেখিয়া দাদা বাহির হইতে ঘরে শিকল দিয়া তাহাকে আটক করিলেন।

এদিকে নবীন বাবুকে বলিলেন, "চলুন চারুকে দেখে আসি। তার পর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

নবীন বাবুর পরিচয়। তাঁহার পিতা নিঃসন্তান বিপত্নীক অবস্থায় পশ্চিমে ডাক্তারি করিয়া অর্থ ও সম্মান অর্জ্জন করেন। সেখানে এক বাল্য বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত। যদিও দম্পতি লোকদৃষ্টিতে একবর্ণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বার বছরের মা-মরা নবীন কলিকাতায় পিতৃসুহৃদের আশ্রয়ে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে প্রেসিডেনসি কলেজ হইতে সসম্মানে, বি, এ, পাশ করিয়া বিলাত যান। সেখানে কেম্ব্রিজে ইতিহাসে উচ্চ ডিগ্রী লইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফেরেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বোম্বাইয়ে নামিয়া তারে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। পিতার বন্ধুদিগের সাহায্যে বৈষয়িক সুব্যবস্থার পর করিয়া কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্টারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। তখন বালীগঞ্জের বাড়ী কেনেন। নবীনের আয় বৃদ্ধির সহিত বালীগঞ্জের বাড়ীরও বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। বিলাত ফেরত নবীনের দেশী ভাব ও সাদা সিধা চাল চলনের ব্যতিক্রম হয় নাই। যেরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সাধারণের প্রত্যাশ সে প্রত্যাশা নবীন ভঙ্গ করেন নাই।

নবীনের সঙ্গে দাদাকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া গিয়া চারুবালা তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। দাদা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদান্তে বলিলেন, "চারু যা অদৃষ্টে ছিল হয়েছে। এখন সৎপথে তোর জীবন কাটে, এই দেবতারা করুন।" শুনিয়া চারুবালার বাড়ীর খবর লইবার উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গেল। নির্ব্বাক মাথা হেঁট করিয়া দূরে গিয়া বসিল। দাদাও চক্ষের জল মুছিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় নবীনের স্বীকার উক্তি পাইলেন যে তিনি চারুবালাকে সৎপথে রাখিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবেন। ইতঃপর চারুবালা পিতৃকুল ও জন্মগত আত্মীয়দের সহিত নিঃসম্পর্ক, কেবল তিন বৎসর পূর্ব্বে গুরুদশাগ্রস্ত বড় ভাই-পো পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় নাই।

চারুবালা মায়ের কাছে বাঙ্গালা ও সামান্যরূপ সংস্কৃত শিখিয়াছিলেম। নবীন বাবু তাহারই শিক্ষার জন্য যথা সম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দেন। যে প্রবীণা মেমের হাতে চারুবালার শিক্ষার ভার পড়ে তিনি বহু বৎসর এদেশে বাস করিয়া দেশের হালচাল উত্তম রূপ বুঝিতেন। পরামর্শান্তে স্থির হয় যে, প্রচলিত পরীক্ষার জন্য চারুবালার প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে শিক্ষিত সমাজে অপদস্থ না হইয়া আত্মরক্ষার ক্ষমতা হয় তাহারই প্রয়োজন। চারিবৎসর এইরূপ শিক্ষার ফল লাভ প্রত্যক্ষ। যিনি যেরূপ বুঝেন বুঝিবেন। চারুবালা যতদূর শিখুন আর নাই শিখুন শিখিবার ইচ্ছা সদাই জাগ্রত। শিক্ষা সমাপ্তির কালে মেম চারুবালাকে বলিলেন, "চারু, তুমি যদি নবীন বাবুর কৃত উপকার ভুলিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও তিনি তাহাতে অতুল সৌভাগ্য লাভ মনে করিবেন।" চারু

লজ্জায় রক্তিম মুখে কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমারও সে সৌভাগ্য।" এখন কি প্রকারে বৈধ বিবাহ হইতে পারে তাহারই নির্ণয়ার্থে তখন নবীন বন্ধুদের সহিত পরামর্শে নিযুক্ত হইলেন। আইন অনুসারে বিবাহ উভয়েরই অনুপাদেয়। হিন্দুধর্ম্ম বর্জ্জন স্বীকার করিতে উভয়েরই অনিচ্ছা। ফলে যথাসম্ভব হিন্দু প্রথানুসারে বিবাহ হইল। মনুষ্য জীবন অপ্রত্যাশিত জীবনের ধারা মাত্র। আজ পাঁচ বৎসর হইল—অপস্মার রোগে নবীনের জীবন শেষ হইয়াছে। জীবদ্দশায় তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে সসন্তান চারুবালার অর্থ কষ্টের সম্ভাবনা নাই। তবে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চারুবালার অভিপ্রায় যে, সুবালা স্বেচ্ছায় একটী সৎপাত্রে বিবাহিত হয়। সেই বিষয়ে আমার সাহায্য চাহেন। আর যাহাতে আমি তৎকার্য্যে সক্ষম হই সেজন্য আমাকে জীবন বৃত্তান্ত শুনাইলেন। সুবালার বয়স এখন উনিশ। মায়ের ইচ্ছা যে কুড়ি বৎসর পূর্ণ হইলেই যেন সুবালার বিবাহ হয়। বিধাতা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। গতমাসে বিলাত ফেরত ডাক্তার লেফটেন্যাণ্ট মুখার্জি আই, এম, এসের সহিত সুবালার বিবাহ হইয়াছে। সকলে নব দম্পতির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করুন!

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"নারীর মূল্য"

১

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা বড় ঔপন্যাসিক বলেই জান্‌তাম; কিন্তু তিনি যে চমৎকার প্রবন্ধ লিখ্‌তেও পারেন এ আমরা আবিষ্কার কর্‌লাম তাঁর "নারীর মূল্যে"। এ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২০র "যমুনা"য় শ্রীঅনিলা দেবী ছদ্মনামে। শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র সরকার এটিকে পুস্তকাকারে বাহির করে সারা বঙ্গের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। "নারীর মূল্যে'র পর সাময়িক পত্রে শরৎচন্দ্র আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি তাঁর গল্প-উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য তো হয়েছেই, অধিকন্তু ভাষার সৌষ্ঠবে তাদের ছাড়িয়ে উঠেছে; এর কারণ সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের তেজস্বিনী ভাষা তাঁর গল্পের মাঝে মাথা তুল্‌তে পারে না—গল্প বল্‌তেই তিনি এতটা নিবিষ্ট থাকেন যে ভাষায় সৌন্দর্য্য অজ্ঞাতসারে গল্পের সৌন্দর্য্যের কাছে খাটো হয়ে যায়। প্রবন্ধে কিন্তু তা নয়। এখানে factএর প্রধান্য, fictionএর নয়। আর fact, fictionএর মতো চিত্তাকর্ষক হবে না যদি না তার সঙ্গে থাকে আকর্ষণী শক্তি বিশিষ্ট ভাষার আবরণ। Fact যে কত সরস হতে পারে, যুক্তিতথ্যের কঙ্কালে কতকখানি প্রাণ সঞ্চার করা যেতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য।" শরৎচন্দ্রের কোনো

লেখা যে dull হতে পারে, এ আমরা কল্পনাই করতে পারিনে। এর প্রধান কারণ, শরৎচন্দ্রের লেখার একটি বিশিষ্ট গুণ প্রাণের প্রাচুর্য্য ; "নারীর মূল্য" লেখকের প্রাণ আছে, আর সে প্রাণ নারীর দরদ বোঝে। জীবন্ত নারীর চরিত্র অঙ্কনে যে তিনি খুব সফল হয়েছেন তার কারণ তিনি নারীর সুখ-দুঃখ-বাসনা-ব্যথা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন, তাঁর লেখার সর্ব্বত্র একটা সহানুভূতির অন্তঃসলিলা ফল্গু প্রবহমান। এই সহানুভূতির রস পেয়ে তাঁর কল্পনা কুঞ্জের কুসুমগুলি জীবন্ত কুসুমের মতো সজীব বৈচিত্র্যের অধিকারী। "নারীর মূল্যে" আমরা তাঁর হৃদয়-ভরা সহানুভূতির আর একটা দিক্ দেখলাম। প্রাণরস তার ভাষাকে বেগ দিয়েছে, কিন্তু যুক্তিতথ্যের প্রাচুর্য্য দিয়েছে, ধীরতা। আন্তরিকতা (sincerity) তাকে তেজ দিয়েছে, কিন্তু মিষ্টযৌক্তিকতা (sweet reasonableness) দিয়েছে স্নিগ্ধতা। এই সমস্ত বিরোধী গুণের সমাবেশে "নারীর মূল্যের" ভাষা হয়েছে অপূর্ব্ব শক্তিমতী। ভাষার এই তীব্র সংযম, লিখন রীতির এই বিচিত্র কৌশল, হৃদয়ের পর্দ্দায় পর্দ্দায় ঝঙ্কার তোলে। মস্তিষ্কের স্তরে স্তরে তীরের মতো বেঁধে, মানুষকে ভাবিয়ে দেয়, কাঁদিয়ে দেয়।

আর নারীর মূল্যের ভাব ?

সেই কথাই আজ বিশেষ করে বল্‌ব।

সত্যকে যাঁরা খোলা চোখে দেখেন,

শরৎচন্দ্র তাঁদের একজন। কোনো সংকীর্ণতার রঙীন চশমা তাঁর সরলদৃষ্টির অন্তরায় হয়নি, চোখের সাম্‌নে ভ্রান্তদৃষ্টির মরীচিকা রচনা করেনি। "ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে" কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য তিনি অনুভব করেছেন বলেই তাঁর সত্যবোধের নিকট সাম্প্রদায়িকতা, স্বাজাত্য বা সংস্কারের স্থান নেই। অতীতের প্রতি অতিভক্তি তাঁর সবুজ প্রাণের নবীনতাকে ভারাক্রান্ত করে নি। তাই তাঁর "নারীর মূল্যে" দেখি, তিনি যেখানে যতটুকু সত্য পেয়েছেন তাকে খোলা মনেই গ্রহণ করেছেন। বেদ ও বাইবেল, মনু ও Spencer যেখানে যতটুকু সুযুক্তি পেয়েছেন সযত্নে আহরণ করেছেন এবং বিচার বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করে, হৃদয়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করে প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই বইখানির একটি বিশেষত্ব এর লেখক শুধু যে জ্ঞান দিয়ে সত্যকে পেয়েছেন তা নয়, প্রাণ দিয়েও পেয়েছেন। "যে সত্য আমি হৃদয়ের ব্যথার ভিতর দিয়া বাহির করিলাম, সে সত্যকে কোনো মহামহোপাধ্যায় যে উড়াইয়া দিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি"—এ তিনি নিজেই বলেছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের "নারীর কথা"য় মনীষার পরিচয় পাই, সহৃদয়তার নয়। তাই সেখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছে, সরস হয়নি। আবার, নারীর অধিকার সম্বন্ধে যে সব মহিলা লেখেন প্রায়ই তাঁদের লেখায় হৃদয়াবেগ যতখানি থাকে মনের জোর ততখানি থাকে না। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধে কিন্তু এদুটি বস্তুর সামঞ্জস্য দেখতে পাই। তাই তাঁর লেখা দর্শনও হয়নি কাব্যও হয়নি। যা হয়েছে তাকে এক কথায় সাহিত্য বল্‌তে পারা যায়।

২

কোনো জিনিষের মূল্যবিচার কর্‌বার সময় আমরা সাধারণতঃ সেই জিনিষটার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের দিক্ থেকেই দেখি এবং তাদের সে জিনিষটি কতটুকু সুখও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কর্‌বে, কতটুকু অভাব পূরণ করবে, কতটুকু কাজে লাগবে সেইটেই বিচার করে থাকি। এ হিসাবে সোনার কোনো মূল্যই থাকেনা যদি তাকে ব্যবহার কর্‌বার—তাকে ক্রয় কর্‌বার জন্যে কেউই প্রস্তুত না থাকে। তাই কোনো জিনিষের মূল্য সম্পর্কগত বা relative; এ মূল্য ওঠানামা করে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক্ষমতার বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে। এবং বস্তুটির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের বৃদ্ধি ও হ্রাস বা বস্তুটির নিজেরই বিরলতা বা বহুলতার সঙ্গে সঙ্গে। নারীর মূল্য বিচার করতে হলেও এই নৈসর্গিক নিয়ম মান্‌তে হবে।

কিন্তু মূল্য বিচার করবার অন্য একটি দিক্‌ও আছে—যদিও এদিক্‌টি সহজে চোখে পড়ে না, সচরাচর গণনাই করা হয় না। এটি হলো জিনিষটার নিজের দিক্। এ মূল্য অন্যকারুর উপর নির্ভর নয়, নিজেরই উপর নির্ভর। অর্থাৎ এ মূল্য relative নয়, absolute, subjectier নয়, objective. মানুষ যদি নাও থাকে পৃথিবীর একটা মূল্য থাকবেই, অবশ্য এ মূল্য ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য নয়। এ মূল্য হচ্ছে সেই জিনিষ যাকে আমরা কখনো বলি utility কখনো বলি property. একটিও মানুষ যদি না থাকে তবুও পৃথিবীর একটা মূল্য থাক্‌বে, যদিও মানুষের কাছে এ মূল্য কখনো বাড়ছে, কখনো কম্‌ছে, কখনো কাজে লাগছে, কখনো কাজে লাগছে না। এবং মানুষের কাছে এ মূল্য relative হয়ে পড়ে। নারীর এই objective বা absolute মূল্যকে আমরা এক-কথায় নারীত্ব বল্‌তে পারি।

মোট কথা, নারীর মূল্য বিচার কর্‌তে গেলেও দেখতে হবে পুরুষের কাছে নারীর মূল্য কি ছিল কি আছে এবং কি হলে ভাল হয়। আবার এও দেখতে হবে পুরুষের সম্পর্কের দিক্ থেকে না দেখলেও নারীর স্বনির্ভর মূল্য কি ছিল, কি আছে ও কি থাক্‌লে ভাল হয়। শরৎচন্দ্র এদুটি দিক থেকে নারীর মূল্য বিচার করেছেন, প্রথমটিকে যেমন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন, দ্বিতীয়টিকে তেমন করেন নি। এর প্রধানতঃ দুটি কারণ। একটি, স্থানাভাব, অন্যটি দ্বিতীয় মূল্যের গৌণতা ও প্রথম মূল্যের মুখ্যতা। হয়তো তিনি অন্য প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বল্‌তেন কিন্তু ঘটনাক্রমে তা হয়ে উঠেনি; এ প্রবন্ধে কিন্তু পুরুষ নারীকে কি মূল্য দেয় এইটি আগে আলোচনা কর্‌বার কারণ, মূল্য বল্‌তে আমরা সাধারণতঃ relative মূল্যই বুঝি এবং নারীর relative মূল্যই পুরুষের নির্ভর।

নারীর পুরুষ প্রদত্ত সাধারণ মূল্য আলোচনা কর্‌বার আগে তিনি এই কথাটি বল্‌তে চেয়েছেন যে অবস্থা বিশেষেও নারীর একটি বিশেষ মূল্য আছে। "সাধারণতঃ বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলিয়া স্ত্রীটি বেশী দামী। আবার এই বিধবা ভগিনীর দাম কতকটা চড়িয়া যায় স্ত্রী যখন আসন্ন প্রসবা…তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে নারী ভগিনী সম্পর্কে নারী ভার্য্যা সম্পর্কীয়ার অপেক্ষা অল্প মূল্যের। ইহা সরল

স্পষ্ট কথা। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। একটা শ্লেট পেন্‌সিল লইয়া বসিলে নারীর বিশেষ অবস্থার বিশেষ মূল্য আঁক কষিয়া কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত বাহির করা যায়।

এর পরে নারীর সাধারণ মূল্য। "নারীর মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবা-পরায়ণা', স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে! এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী! অর্থাৎ পুরুষের লালসার প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এছাড়া যে আর কোনো পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।

সত্যিই তিনি অজস্র প্রমাণ দিয়ে দাম কষেছেন। "নারীর মূল্য" সমস্ত পৃথিবীর নারীজাতির দুর্দ্দশার ইতিহাস, পুরুষের কলঙ্কের কাহিনী।

পুরুষের সুখ ও সুবিধার দিক্ থেকে দেখতে গেলে "সতীত্বের বাড়া নারীর গুণ আর নাই।" আর সব দেশেই পুরুষ এই কথা বোঝে কেননা এটা পুরুষের কাছে সব চেয়ে উপাদেয় সামগ্রী"; এই সতীত্বের দাবীর corollary হচ্ছে স্বামীর অত্যন্ত বাধ্য হওয়া "তিনি অতি বড় পাষণ্ড হইলেও তাঁহাকে মনে মনে তাচ্ছিল্য করার মতো দোষ আর নাই।" অথচ এই সতীত্বেরও আনুগত্য যাতে এক তরফা হয় সেবিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি নেই। শাস্ত্রকারেরা সতীত্বের সমার্থক পুরুষের প্রতি প্রয়োজ্য একটাও শব্দ করেনি, বরং "তাহার প্রবৃত্তি নারী সম্বন্ধে যত রকম হাত-পা ছড়াইয়া খেলিতে পারে তাহার জায়গা রাখিয়া গিয়াছেন।"

সতীত্বের স্বাভাবিক পরিণতি সহমরণ। এ প্রথা universal না হলেও বহুদেশেই প্রচলিত ছিল। শরৎচন্দ্র অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। "সহমরণ গৌরবের কাজ হইলে আর্য্যজাতি ভিন্ন আরো অনেক নীচজাতি আছে। যাহারা তুল্য গৌরবের অধিকারী।" পুরুষ যে সহমরণের পক্ষপাতী ছিল, তাহার কারণ "প্রথম, পরলোকে সেবা করে কে? দ্বিতীয়, ভাগ্যদোষে যে স্ত্রী বিধবা হইয়া গেল তাহার দ্বারা কি বিশেষ কাজ পাওয়া যাইবে? বরং ভবিষ্যতে অশান্তি উপদ্রবের সম্ভাবনা।" একটি ভাববার কথা এই যে "যে দেশে বিধবা বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ সে দেশে পুড়াইয়া মারা যে বিশেষ হিতকর অনুষ্ঠান বলিয়াই বিবেচিত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নয়।" কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে "আমাদের এই সুসভ্য প্রাচীন দেশ, যে দেশে আত্মার স্বরূপ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়া গিয়াছিল, ঈশ্বরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপিয়া শেষ করা হইয়াছিল, সে দেশের পণ্ডিতেরাও যে বিশ্বাস করিতেন পৃথিবীতে কর্ম্মফল যাহার যাহা হউক দুইটা প্রাণীকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইলেই পরলোকে এক সঙ্গে বাস করে এ কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।"

অনেকে বলেন, নারীই যখন সহমরণের পক্ষপাতী ছিলেন পুরুষ তখন কি করবে? "কিন্তু তাই যদি হয়, তবে স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার বিধবাকে একবাটি সিদ্ধি ও ধুতুরা

পান করাইয়া মাতাল করিয়া দেওয়া হইত কেন? শ্মশানের পথে সে কখনো বা হাসিত, কখনো কাঁদিত, কখনো বা পথের মধ্যে চলিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিত। এই তার হাসি, এই তার সহমৃতা হইতে যাওয়া, তার পর চিতায় বসাইয়া কাঁচা বাঁশের মাচা বুনিয়া চাপিয়া ধরা হইত, পাছে সতী, দাহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারে। এত ধুনা ও ঘি ছড়াইয়া অন্ধকার ধোঁয়া করা হইত যে, কেহ তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া যেন ভয় না পায়। এবং এত রাজ্যের ঢাক ঢোল কাঁশি ও শাঁখ সজোরে বাজান হইত যে কেহ যেন তাহার চীৎকার, কান্না বা অনুনয় বিনয় না শোনে!"

তবু যে নারী কোথাও কোথাও এর পক্ষপাতী ছিল শরৎচন্দ্র এ কথা অস্বীকার করেন নি। "পুরুষেরা যাহা ইচ্ছা করে, যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করে, নারী তাহাই বিশ্বাস করে, এবং পুরুষের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলিয়া ভুল করে এবং ভুল করিয়া সুখী হয়।" এর কারণ যে যাহার আশ্রিত সে তাহাকে সুখী করিতেই চায়। আমি যদি বাটীর মধ্যে সকলকেই একবাক্যে ঐ প্রশংসা করিতেই শুনি আমারও ঐ অবস্থায় সুখ্যাতি ও বাহবা লাভের লোভ যে প্রবল হইয়া উঠিবে তাহা অস্বাভাবিক নহে। ইহার উপর ধর্ম্মেরও গন্ধ আছে।" প্রাকৃত জনের কাছে সে বড় সহজ গন্ধ নয়!

যে দেশে সহমরণ নেই সে দেশেও বিধবার স্বাধীনতা খুব খর্ব্ব করা হয়েছে। পুনর্বিবাহের অধিকার যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানেও সে বিবাহকে মৃত স্বামীর আত্মীয়দের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে সে অধিকার নেই সেখানে "কিরূপ বিধি নিষেধ প্রয়োগ করিলে কিরূপ শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যে সদ্য বিধবাকে নিবদ্ধ রাখিতে পারিলে, কিরূপে তাহার নাক চুল কাটিয়া লইয়া বিশ্রী করিয়া দিতে পারিলে এবং কিরূপ খাটুনির মধ্যে ফেলিয়া তাহার অস্থিচর্ম্ম পিষিয়া লইতে পারিলে অমঙ্গলের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে...আজও এ মীমাংসার শেষ হয় নাই।...বস্তুতঃ সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের এই ভয়টাই চোখে পড়ে যে নারীকে আটকাইয়া রাখিতে না পারিলে সে বাহির হইবার জন্যে পা তুলিয়া থাকে। * অথচ এর মতো মিথ্যা আর নেই। তাই বিধবাকে জোর করে দেবী বানিয়ে তুলতেই হবে। "যত রকমের কঠোরতা কল্পনা করা যাইতে পারে, সমস্তই সদ্য বিধবার মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যহ একটু একটু

* যাঁরা বিশ্বাস করেন যে আমাদের দেশের কুলত্যাগিনীদের অধিকাংশ বিধবা তাঁরা শুনে বিস্মিত হবেন যে এদের অধিকাংশ সধবা এবং অল্পই বিধবা। সধবারা নীচকুলের, বিধবারা উচ্চকুলের। এরা গৃহত্যাগ করে পাপের মোহে নয় পেটের দায়ে। কারণ নীচকুলের সধবারা স্বামীর অত্যাচার সয়' অথচ বিবাহিতা বলে খেটে খেতে পারে না। নীচকুলের বিধবাদের এ বালাই নেই বলে তারা গৃহত্যাগ করে না, উচ্চকুলের বিধবারা যে দুঃখ সহ্য ক'রে, আত্মীয়ের গলগ্রহ হ'য়ে থাকেন কিন্তু স্বাধীন জীবিকার পথ পাননা এ স্বীকার করতেই হবে। শরৎচন্দ্রের কোনো বন্ধুর বহু আয়াসলব্ধ ষ্টেটিস্‌টিক্‌স্ এর উপর এই তথ্যটির প্রতিষ্ঠা।

করে দেবী করা হইতে থাকে। সে নিরাভরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, থান ফাড়া কাপড় পরে, কেন না সে দেবী। চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে থাকে আমাদের বিধবার মতো কাহার সমাজে এমন দেবী আছে? অথচ, দেবীটিকে বিবাহের ছান্‌লা তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না—পাছে দেবীর মুখ দেখিলে আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে।"

নারীর মূল্য কত অল্প তার সাক্ষী দেশবিদেশের অতিথিসেবার আদর্শ। আমাদের সনাতন সমাজের "বিল্বমঙ্গলে"র বণিক্ "সহস্রলোকের সমুখে দাঁড়াইয়া লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়া নিজের সহধর্ম্মিণীকে লম্পট অতিথির শয্যায় প্রেরণ করে। দর্শক অর্থব্যয় করিয়া দেখে এবং খুব তারিফ দিতে থাকে।" কিন্তু আমেরিকায় ছিনুকজাতি, এসিয়ার চুকচি জাতি প্রভৃতি যেসব অসভ্যজাতি অতিথির শয্যায় বাটীর শ্রেষ্ঠ কন্যা বা স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়া "অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মপালন" বলে মনে করে তাদের সঙ্গে "আমাদের ধার্ম্মিক বণিকটির প্রভেদ কোন্‌খানে?" আসলকথা স্ত্রী স্বামীর কাছে সম্পত্তিরই সামিল। তার ইহলোকের সুবিধার জন্য সে যেমন একে গরুর মতো খাটিয়ে নেয় পরলোকের সুবিধার জন্য ঘটিবাটির মতো একে দান কর্‌তেও পারে। "স্বামীর কাছে পতিব্রতা স্ত্রীর সম্মান এই।"

এমনি করে কতরকমে যে পুরুষ নারীকে মূল্যহীন মনে করে এসেছে তার সংখ্যা নেই। তবে নারীর একটি অবস্থার মূল্য কিছু কিছু স্বীকার করা হয়েছে—সেটি মাতৃত্ব। তাও আবার স্বার্থের খাতিরে। "নারীর সম্মান তাহার নিজের নহে তাহার সম্মান নির্ভর করে পুত্রপ্রসবের উপর। পুরুষের কাছে এই যদি তাহার নারীজীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, ইহা কোনোমতেই তাহার গৌরবের বিষয় হইতে পারে না।" কিন্তু সত্যই তাই। এ ছাড়া তাহার কাছে সংসার আর কিছুই আশা করে না, এবং সে যতকিছু সম্মান দিয়া আসিয়াছে, তাহা এই জন্যই। আমাদের সমাজে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি আছে।... সভ্য নারীর পক্ষে ইহা শ্লাঘার কথা নহে। প্রাচীন ইহুদী সমাজে অপুত্রক বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সন্তান কামনায় দেবরের উপপত্নী হইয়া থাকিতে হইত।" অসভ্য জাতিদের মধ্যে বহুপুত্রবতী অনূঢ়া জননীর আদর আছে। শাস্ত্রমতে স্ত্রীর সন্তান না হওয়া পাপ এবং হইলেই তার মুক্তির উপায় হলো। পুরুষ সমাজ চায় পুরুষেরই বৃদ্ধি; এবং নারীকে দিয়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তাই তার যাকিছু মূল্য। অসভ্য জাতিরা পুত্রকামনা করে যুদ্ধ কর্‌বার জন্যে, কন্যা জন্মালেই তাকে হত্যা করে। সুসভ্য জাতিরাও পুত্রকেই ভালবাসে, কন্যাদায় অল্পবিস্তর সব সভ্য জাতিতেই আছে। তাহলে দাঁড়ায় এই যে নরক থেকেই হোক্ আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই হোক, পিতৃকুলকে ত্রাণ করবার জন্যে, চাই পুত্র এবং পুত্র প্রসবের জন্যে, চাই ভার্য্যা। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" সভ্য-অসভ্য উভয়েরই প্রাণের কথা। পুরুষের এই স্বার্থের জন্যই তার মান, এইজন্যেই তার মর্য্যাদা...

তবে এই স্বার্থটা সহজে চোখে না পড়বার কারণ আছে। "পৃথক পৃথকভাবে একটি একটি করিয়া দেখিলে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য কিন্তু সমগ্রভাবে সমস্ত নারীজাতির সুখদুঃখ মঙ্গল অমঙ্গলের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর সমস্ত হীনতা, সমস্ত ফাঁকি এক মুহূর্ত্তেই সূর্য্যের আলোর মত ফুটিয়া উঠে।—কোনো একটা বিশেষ নিয়ম যখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহা যে একদিনেই হইয়া যায় তাহা নহে; ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাঁহারা সম্পন্ন করেন তাঁহারা পুরুষের অধিকার লইয়া করেন। তখন তাঁহারা যে পুরুষ, পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাঁহাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়, তাঁহারাও আত্মীয় নহেন, নারী মাত্র। পুরুষ তখন পিতা হইয়া কন্যার দুঃখের কথা ভাবে না, সে তখন পুরুষ হইয়া পুরুষের কল্যাণ চিন্তা করে—নারীর নিকট কতখানি কি ভাবে আদায় করিয়া লইবে সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। তারপর মনু আসেন, পরাশর আসেন মোজেজ আসেন, পল আসেন, শ্লোক বাঁধেন, শাস্ত্র তৈয়ার করেন—স্বার্থ তখন ধর্ম্ম হইয়া সুদৃঢ় হস্তে সমাজ শাসন করিবার অধিকার লাভ করে। দেশের পুরুষ সমাজ ব্যাসদেব শাস্ত্রকারেরা গণেশ ঠাকুর মাত্র। সকল দেশের শাস্ত্রই অনেকটা এইভাবেই প্রস্তুত। তারপর শাস্ত্র মানিয়া চলিবার দিন আসে। ধর্ম্মের আসন জুড়িয়া বসিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না, এবং সেই ধর্ম্মপালনের সুখে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, মায়ামমতা, ভালমন্দ বন্যার তৃণের মত ভাসিয়া যায়।"

এই সঙ্গে প্রণিধান যোগ্য আরো একটি কথা আছে—নারীর অবহেলার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে, শিশুর অবহেলা। পুরুষ কোথাও "জীবন্ত ছেলেমেয়েদের বড়শীতে গাঁথিয়া কুমীর হাঙ্গর ধরিবার টোপ" প্রস্তুত করেছে, কোথাও "শিশু কন্যা হত্যা" করেছে, আর কোথাও "পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত বালিকা কন্যার বিবাহ" দিয়ে অল্প বয়সেই তাকে বহু সন্তানের জননী করে, তিল তিল করে দেহমনে হত্যা করেছে। পুরুষও নারীর সম্পর্ক এত পরস্পর নির্ভর যে একটির মূল্য হ্রাস হলেই অন্যটিরও হবে আর একটির বাড়লেই অন্যটিরও বাড়বে, শিশু ও তার জননীরও ঠিক্ এম্নি সম্পর্ক। য়ুরোপও আফ্রিকার সামাজিক অবস্থার আলোচনা করলেই এসত্য জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে। কারণ অমন contrast আর একটিও নেই।

তবে সুসভ্য সমাজে নারীর (ও সেই সঙ্গে শিশুর) অনাদর অসভ্য সমাজের চেয়ে পরিমাণে কম হলেও উভয় সমাজেই নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব মূলতঃ সমান। অর্থাৎ সভ্য অসভ্যের "এই পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নহে। এই জন্যেই শরৎচন্দ্র সুসভ্য ও অসভ্য সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন করে ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে পশু থেকে অসভ্য নর ও অসভ্য নর থেকে সুসভ্য নর প্রত্যেকেই নারীর সম্বন্ধে একই প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে এসেছে। এই যে "একটা সম্পর্কের টান" একে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। "দুটো সিংহ প্রাণান্তকর যুদ্ধ করিতে থাকে, সিংহীটা চুপ করিয়া

লড়াই দেখে। যে জয়ী হয়, ধীরে ধীরে তাহার সহিত প্রস্থান করে। অতঃপর এই সিংহ মিথুন কিছুকাল একসঙ্গে বাস করে, তারপর সিংহী যখন আসন্নপ্রসবা তখন ইহারা পৃথক হয়, সন্তান পালন ও রক্ষার ভার একা জননীর উপরই পড়ে। সিংহ মহাশয় সন্তানের কোনো দায়িত্বই গ্রহই করেন না বরঞ্চ সুবিধা পাইলে সংহার করিবার চেষ্টায় ফিরিতে থাকেন।" এইরূপ প্রথা অন্য অনেক পশুর মধ্যে আছে। কিন্তু স্ত্রীর কি সত্যি এতই মূল্য যে তার জন্যে একটা প্রাণী প্রাণান্তকর যুদ্ধ করলে, অন্যটা প্রাণ পর্য্যন্ত দিলে? হায়! মূল্য যে নারীর নয়, "মূল্য যদি কিছু থাকে সে তাহার (পুরুষের) নিজের প্রবৃত্তির।" হাতে হাতে আমরা দেখতে পেলাম এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পর কেমন করে নারীতে আর কোনো প্রয়োজনই রইল না।

যাক। তবে পাওয়া গেল যে পুংপশুর কাছে স্ত্রী পশুর মূল্য শুধুবীর প্রবৃত্তির জন্যে যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাই। এখন আমরা যদি অসভ্য মানুষের রাজ্যে পদার্পণ করি তবে ঠিক এই জিনিসটি দেখতে পাবই, তা ছাড়া দেখতে পাব প্রবৃত্তি ছাড়া অন্য একটা দিক্ থেকেও নারী পুরুষের কাছে মূল্যবান—সে তার ভারবাহী পশুর দোসর; কারণ women ever made for labour, one of them can carry or haul as much as two men can do." পুরুষ কেবল যুদ্ধই করবে, খাদ্যের জোগাড় করতে হবে নারীকে। কাঁধে জোয়াল নিয়ে জমি চাষ করতে হবে, শিকারের পশু বয়ে আনতে হবে, তাঁকে রেধে' খাওয়াতে হবে, তার প্রবৃত্তির ইন্ধান যোগাতে হবে তার শেষ ফল যে সন্তান তাকে পিতার "বড়শীর টোপ" থেকে রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পশুর কাছে নারীর মূল্য যা ছিল অসভ্য মানুষের কাছে তার চেয়ে এক ডিগ্রী বেশী। অর্থাৎ সে কেবল প্রবৃত্তির ইন্ধন নয়, সে beast of burden ও বটে এবং সেই কারণে সম্পত্তিরও সামিল। সুসভ্য মানুষ তাকে এ দুটি মূল্য থেকে বঞ্চিত করেনি তবে এইটির একটু সুসভ্য নামকরণ করেছে। প্রবৃত্তি হয়েছে প্রেম। খাটুনি হয়েছে গৃহকর্ম্ম আর সম্পত্তি হয়েছে বিবাহের এক তরফা অধিকার। এখানে একটু বক্তব্য আছে; নামকরণটা শুধু নামেই নয়, নামের চেয়ে কিছু বেশী। ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে প্রবৃত্তি অনেক উচ্চে উঠে প্রেম নামে অভিহিত হয়েছে, সম্পত্তিভোগ পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে বিবাহে পরিণত হয়েছে, খাটুনি নরনারীর গার্হস্থ্য শ্রমবিভাগের অঙ্গ হয়ে পড়েছে। "কি করিয়া পাশববৃত্তি অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় প্রেমে পাতিব্রত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, কি করিয়া নরের প্রবৃত্তির মানদণ্ডে পরিমিত নারীর মূল্য একদিন ভাবুকের হৃদয়ে অপরিমেয় দেবতার মূল্য এক আসনে পাতিয়াছে শরৎচন্দ্র তা দেখাতে ভোলেন নি।

অসভ্যই হোক্, সুসভ্যই হোক্ মানুষ পশুর মতো নারীকে স্বাধীনতা দেয় নি; সে তাকে সম্পত্তিরই অন্তর্ভুক্ত করেছে। নারীর নিকট সে তেমনি বাধ্যতার দাবী করেছে যেমনটি সে তার গরু ভেড়ার নিকট করে; নারীকে সে বিক্রী করতে পারে, দান

কর্‌তে পারে; ত্যাগ করতে পারে; জীবনে মরণে ভোগদাসী ও সেবাদাসী করে রাখার চেষ্টা এক তরফা সতীত্বে ও সহমরণে পরিণত হয়েছে; আর বংশের সম্পত্তি বলেই নারী স্বামীর মৃত্যুতে পুনঃ বিবাহ করে অন্যবংশে যেতে সাধারণতঃ পারে না। অসভ্য ও প্রাচীন সমাজেরই কথা হচ্ছে, হয় সহমৃতা হয়, নয় "দেবী" হয়, নয় দেবর কিম্বা অন্য কোনো আত্মীয়কে বিবাহ কর্‌তে বাধ্য হয়। শরৎচন্দ্র যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন স্থানাভাবে তার উল্লেখ কর্‌তে পারা গেল না।

এমনি করে যুগে যুগে দেশে দেশে পুরুষ নারীকে নিজের সুখ-সুবিধা সম্ভোগের মানদণ্ডে মাপ করে যথেচ্ছ মূল্য দিয়েছে, আর এই মূল্যের অস্বাভাবিকতার জন্যে জগতের কোথাও কোনোকালে নর নারীর মধ্যে সমস্যার বিরাম হয়নি। তবে এখন যে "নারী সমস্যা" "peril" হয়ে উঠেছে, এ শুধু গণতান্ত্রিক ভাব প্রচারের ফলে। নারীর উপর পুরুষের অবিচারের কথাই আলোচিত হয়েছে দেখে অনেকে প্রশ্ন কর্‌বেন, নারী যদি এতই নির্য্যাতিতা, এতকাল সে survive কর্‌লে কি করে? এর উত্তর নরনারীর সম্বন্ধটা entreme and unmitigated oppression কোনো কালেই ছিল না, মানুষের মধ্যে দয়া-ক্ষমা-স্নেহ-প্রেমের সৃষ্টি যেদিন থেকে হয়েছে সেদিন থেকে নির্য্যাতনের প্রতিকারের চেষ্টাও চলেছে। সমাজ রক্ষার অন্ধ আবেগে যে মানুষ sexes-এর মধ্যে শত্রুতাটাকে বড় করে দেখত ও বাঁচিয়ে রাখত, নারীকে অবনত রেখে, নিজের উন্নতি খুঁজত, সে আজ সমাজের কল্যাণ চিন্তা কর্‌তে গিয়ে sexesএর মধ্যে মিলনের সূত্র খুঁজে পেয়েছে, নারীকে উন্নত কর্‌লে নিজের উন্নতি হয় একথা বুঝতে পেরেছে। তাই নারীর উপর অত্যাচার কমে আস্‌ছে, তার মূল্য স্বাভাবিক হয়ে আস্‌ছে। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "সুসভ্য মানুষের সুস্থ, সংযত শুভ বুদ্ধি যে অধিকার নারীজাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। কোনো একটা জাতির ধর্ম্মপুস্তকে কি আছে না আছে তাহাতে হয় না। নারীর মূল্য ও অধিকার বলিতে আমি এই নীতি ও অধিকারের কথাই বলিয়া আসিয়াছি। Supply and demandএর মূল্যও বলি নাই, কবে পুরুষ বাড়িয়া উঠিবে, কবে নারী বিরল হইবে সে আশাও করি নাই। নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ সহানুভূতি ও নারীধর্ম্মের উপরে। ভগবান তাহাকে দুর্ব্বল করিয়াই গড়িয়াছেন। বলের সেই অভাবটুকু পুরুষ এই সমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে। ধর্ম্মপুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোধ্য অর্থের সাহায্যে পারে না।"

৩

নারীকে পুরুষ কি মূল্য দিয়ে এসেছে এবং কি মূল্য দিতে পারে সেই আলোচনাই এতক্ষণ করা গেল। নারীর মূল্যের বিচার করতে গিয়ে আমরা পুরুষের দিকটা দেখলাম,

নারীর oljective মূল্য বা intrinsic worthকে আমরা বলেছি নারীত্ব। যতগুলি quality (গুণ ?) কেবল নারীতেই বিরাজিত এবং accidentally নয় essentially বিরাজিত তাদের সমষ্টিকে নারীত্ব বলা চলে। এমনি একটি সমষ্টি পুরুষত্ব, আর একটি মনুষ্যত্ব আর একটি পশুত্ব; প্রত্যেকেরই কিন্তু একটি একটি বিশেষ গুণ আছে—পশুতে sensiency, মানুষে rationality বা বিচার বুদ্ধি। পুরুষের বিশেষ গুণ কি ? আমরা বলি বল। নারীর বিশেষ গুণ কি ? আমরা বলি, রূপ। (রূপ শব্দটিকে আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি নে, বল শব্দটিকে তেমনি।) নারীর আসল মূল্য হচ্ছে রূপ, এবং এই রূপই হচ্ছে, যে রস "মানুষকে মানুষ করে তুলেছে সেই মধুর রসের প্রধান উপাদান। এই কথাটিই শরৎচন্দ্র বল্‌তে চেয়েছেন, অবশ্য অন্যভাবে, তাঁর বইখানির শেষ ক'টি পাতায়। আর এই কথাটিই, বইখানিতে যত ভাববার কথা আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এটি এমন একটি নতুন কথা (অন্ততঃ এ দেশে) যা যুগপৎ অপ্রিয় এবং সত্য। একে বলতে হলে সাহস চাই আর বুঝ্‌তে হলে শক্তি চাই। আমরা যতটুকু বুঝেছি তা বলতে চেষ্টা কর্‌ব, তবে শরৎচন্দ্রকে ঠিক মতো interpret করতে পারব কিনা বলা যায় না।

গায়ের জোরের যে অনেক সুবিধা আছে, তা অস্বীকার করা চলে না। এই গায়ের জোরের জন্যেই পুরুষ প্রবল, এর অভাবেই নারী অবলা। এই গায়ের জোরের জন্যেই পুরুষ নারীর নিকট হতে compulsory co-operation আদায় করে নিয়েছে। Hence the disregard of women's claims shown in, stealing and bringing them ; the inequality of status between the seses entailed by polygamy ; the use of women as labouring slaves ; the life and death power over wife and child ; and that constitution of the family which supjets all its members to he eldest (Spencer) এখন এই যে গায়ের জোর, যার ভাল নাম, বাহুবল, এটি বিশেষ করে পুরুষেরই সম্পত্তি নারী এটিকে শত চেষ্টা সত্বে পুরুসের মতো আয়ত্ত করতে পারবে না, যদিও কিছু কিছু আয়ত্ত করা সম্ভব ও উচিত। অপরদিকে পুরুষ বহু আয়াসেও নারীর মতো রূপ লাবণ্যের অধিকারী হতে পার্‌বে না, যদিও হওয়া একেবারেই অসম্ভব বা অবিধেয় নয়।

বাহুবলের মতো রূপেরও অনেক সুবিধা আছে। অতি বড় দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী ও রূপের কাছে মাথা নত করে। অমন যে অসভ্য জাতি যে "Knows not love, affection or jealousy "সেও" যত বর্ব্বরই হউক রূপের সম্মান না করিয়া পারে না।...যাহারা গরুর অভাবে স্ত্রীলোক দিগের কাঁধে লাঙ্গলের জোয়াল তুলিয়া দিয়া জমি চাষ করে, তাহাদের মধ্যে দেখা যায় যে, যে রমণীগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দরী তাহারা লাঙ্গল কম টানে। আবার সৌন্দর্য্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেই বেশী করিয়া লাঙ্গল টানিতে হয়।" রূপ জিনিষটা কেবল যে a gain in itself তা নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার ক্ষমতাও এর

আছে। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, একটা sex অপর sexকে আকর্ষণ করবার জন্যে রূপের সাহায্য নিচ্ছে। "চরিত্র হীনের" কিরণময়ীর মুখে শুনেছি, "রূপ হচ্ছে সন্তান ধারণের জন্যে যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই।" যতই শ্রুতিকটু হোক্ কথাটা সত্যি এবং নরনারী উভয়ের পক্ষেই সত্যি। রূপের আকর্ষণ করবার শক্তি আছে, আর আকর্ষণ শক্তিই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি, এ শক্তি নারী কিছু বেশী করেই পেয়েছেন—পুরুষকে যেমন এটি আয়ত্ত করতে হয়, নারীকে তেমন হয় না। "সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী ("চিত্রাঙ্গদা")। এর অনুরূপ বস্তু পুরুষের বল।

এখন রূপবলে নারীর এই যে বিশেষ গুণটি পাচ্ছি তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমৃদ্ধ যদি করতে পারা যায় তবেই নারীর আসল মূল্য তো অক্ষুন্ন থাকবেই, পরন্তু তার সম্পর্কগত মূল্য বৃদ্ধিই পাবে। আধুনিক জগতে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অসভ্যজাতিদের মধ্যে নারী যেমন কদাকার, সভ্যজাতিদের মধ্যে নারী তেমন নয়। অসভ্যজাতিদের মধ্যে নারীর রূপের অভাবের কারণ "নিদারুণ পরিশ্রম, দিনের অধিকাংশ সময় রুদ্ধ দুষ্ট বায়ুতে চলাফেরা, অতি অল্প বয়সেই সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন করা। পুরুষের ভুক্তাবশিষ্ট কদর্য্য আহার্য্য ভক্ষণ করা।" এ অবস্থায় 'কেমন করিয়া তাহার রূপ দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে ? আবার রূপ মানে শুধু রূপ নহে, রূপ মানে স্বাস্থ্য।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'আমরা যদি নিজেদের ঘরের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখি, উহাদের (অসভ্যদের) সহিত আমাদের কিছুই মিলেনা, উহাদের মত আমাদের রমণীরা অল্প দিনেই স্বাস্থ্য এবং যৌবন হারান না, তাঁহাদের গর্ভের সন্তানও রুগ্ন ও অল্পায়ু হয় না, অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া দুঃখীর সংসার আরো ভারাক্রান্ত করেন না। এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের সৎও স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের পথঘাট আমরা বন্ধ করিয়া দিই নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, যে মূল্য আমরা নারীকে দিয়া আসিয়াছি তাহাই ঠিক্ হইয়াছে। অন্যথা বলিতেই হইবে, আমাদের ভুল হইয়াছে এবং ধর্ম্মতঃ সে ভুল অপনোদন করিতে আমরা বাধ্য।…ভাল মন্দ দেখিতে পাওয়া শক্ত কাজ নয়, স্বীকার করিতে পারাই শক্ত কাজ।"

রূপকে ধর্ম্মব্যবসায়ীরা চিরকাল ঘৃণা করে এসেছেন এ ঘৃণা নারীর প্রতি ঘৃণার corollary কারণ রূপের মন্দ দিক্‌টাই এঁদের চোখে পড়েছে। বলকেও ঠিক্ এই কারণে এঁরা ঘৃণা করেছেন 'কিন্তু বলও রূপের একটি ভালদিক্‌ও আছে, বল যেমন আত্মরক্ষা ও পরোপকারের পক্ষে প্রয়োজনীয়, রূপও তেমনি আত্মরক্ষাও বংশোন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। রূপ জিনিষটা যদি এতই হেয় হত আমাদের দেবীদের রূপবতী বলে কল্পনা করা হত না। মা-দুর্গার রূপের তুলনা নেই, লক্ষ্মীসরস্বতীও অপূর্ব্ব রূপসী। কোনো কোনো আত্মসম্মান-প্রিয়া নারী রূপকে এই বলে উপেক্ষা করে থাকেন যে ও বস্তু পুরুষের লালসার শ্বাসে অপবিত্র-পুরুষকে মুগ্ধ করবার অস্ত্র-এবং এইসব কারণে নারীর হীনতা-সূচক। কিন্তু বল সম্বন্ধে কি এসব কথা প্রয়োজ্য হতে পারেনা ? এর জন্যে পুরুষ লজ্জিত হয় কি ? রূপ দুর্ব্বলতার চিহ্ন নয়, শক্তিরই

চিহ্ন। শক্তির একটা aspect রূপ, অন্যটা বল। শক্তি মূর্ত্তিতে রূপও বল উভয়েরই সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। আসল কথা রূপ বা বলের কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার ক্ষমতা ছাড়া অন্য মূল্যও আছে। এরা নিজগুণেই না নরের কাম্য হওয়া উচিত। এদের লাভ করে আনন্দ আছে, পূর্ণতা আছে; এদের culture করে গৌরব আছে, সৌষ্ঠব আছে, এদের সদ্ব্যবহার করে সুমহতী সার্থকতা আছে।

এই রূপ বা বলের উন্নতি করতে হলে "কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা ও প্রশস্ত স্থান অত্যাবশ্যক।" আর অত্যাবশ্যক একটা rational division of labour একটা যুক্তি যুক্ত শ্রমবিভাগ নরনারীর মধ্যে; "মানব সমাজের যত নিম্নস্তরে অবতরণ করা যায় ততই চোখে পড়িতে থাকে এই ভুলটাই তাহারা ক্রমাগত করিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকাংশস্থলেই পুরুষ শুধু লড়াই করে এবং শিকার করে আর কিছু করেনা। জীবণধারণের বাকি কাজগুলার সমস্তই একা নারীকে করিতে হয়।" যথা সামোয়ার অধিবাসীরা রাঁধাবাড়া করে, স্ত্রীলোকে হাটবাজারে যায়। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগের স্বাভাবিকত্ব দাঁড়িয়ে যায়। আদর্শ সভ্যতায় শ্রমবিভাগ এমন হওয়া চাই যাতে পুরুষের পুরুষত্ব ও নারীর নারীত্ব অক্ষুন্ন তো থাকবেই বরং বৃদ্ধি পাবে। তবে পুরুষ ও নারী উভয়েই তাদের নৈসর্গিক মূল্য পাবে এবং জগতে এতদিন যে অমঙ্গলের অভিনয় হয়ে এসেছে তার সত্তাই থাকবে না।

"নারীর মূল্য বইখানি ছোট, একটি প্রবন্ধেই সমাপ্ত। কিন্তু এই ছোট বইখানিতে ভাববার কথা কত বেশী আছে তার আভাস দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যার উল্লেখ করতে পারিনি, স্থানাভাবে পারবও না, এমন অনেক চিন্তার বিষয় আছে; সে সব পাঠক পাঠিকা আসল বইখানিতেই পাবেন; the proof of the pudding is in the eating. শরৎচন্দ্র যে চমৎকার pudding প্রস্তুত করেছেন তা স্বয়ং না খেলে অপরের মুখে তার যথার্থ আস্বাদন পাওয়া যাবে না কিন্তু।

আমি এই বইখানির অনুকূল সমালোচনা করেছি দেখে কেউ কেউ বলতে পারেন, বইখানির কি কোনো দোষ নেই? থাকতে পারে, কিন্তু আমার চোখে তেমন পড়েনি। মতবিরোধকে অনেকে দোষ বলে মনে করেন। তাঁরা অবশ্য এ বইটিতে দোষের কথা অনেক পাবেন। "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা"র ভার যাঁরা স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন এখানি যে তাঁদের কাছে red rag হবে এতেও সন্দেহ নেই। তবে যাঁরা কায়মনোবাক্যে নবীন, যাঁরা চিন্তাশীল ও সংস্কার মুক্ত—যাঁরা সমাজের সত্যিকার মঙ্গল চান তাঁরা এখানিকে ভালই বাসবেন।

আমার দুটি ছোট্ট অভিযোগ আছে গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে। প্রথম তিনি বার বার আমেরিকান্ নারীদের উচ্ছৃঙ্খল বলেছেন, এটি ভিত্তিহীন। আমেরিকার পুরুষেরা কিছু কম উচ্ছৃঙ্খল নয়। তবে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্টি কটু হয় না; এর কারণ সবদেশেই

পুরুষ সমাজ উচ্ছৃঙ্খল। আর আমেরিকান নারীদের স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা বলে মনে হয় অন্যসব দেশের নারীরা অল্পবিস্তর শৃঙ্খলিত বলেই। দ্বিতীয়, বইখানা বড্ড ছোট হয়েছে, শরৎচন্দ্র যদি দ্বাদশমূল্য লিখতে নাই পার্‌লেন, এটিকে একটু পরিবর্দ্ধিত কর্‌লেও তো পারতেন। মনের যে খাদ্য তিনি পরিবেশন করেছেন, তা যদি পরিমাণে কিছু বেশী হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মানসিক অজীর্ণতা হত না। এ আমি জোর করেই বল্‌তে পারি। তবে যা তিনি লিখেছেন, বইখানিকে অমর করে রাখবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। এই দীর্ঘ সমালোচনা কর্‌বার এই কৈফিয়ৎ আমি দিতে পারি যে এই এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত কোনো বইয়ের চেয়ে এই খানির importance কম নয়। আর কোনো মাসিকপত্রিকাই সংক্ষিপ্ত পুস্তক পরিচয়ের দ্বারা এর প্রতি ন্যায়পরতা দেখাতে পারেননি, পারেনও না।

একস্থানে পড়েছিলাম বইখানি নাকি একপেশে হয়ে পড়েছে। অনেকটা তাই বোধ হয় বটে, কিন্তু তাই সত্যি নয়। শরৎচন্দ্র নারীর তরফ থেকেই বিষয়টির আলোচনা করেছেন (অনিলাদেবীর নামেই তিনি লিখেছিলেন) এবং সেই কারণে নারীর দুঃখটাকে যত সুস্পষ্ট করে তুলেছেন, নারীর সুখটাকে তেমন করেননি। কিন্তু তিনি পুরুষকে তার পাওনা দিতে কোথাও কুণ্ঠিত হননি। যুক্তি তথ্যের সাহায্যেই তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে case খাড়া করেছেন। আর যেখানে নারীর দোষ দেখেছেন সেখানে এমন কঠোর ভাব অবলম্বন করেছেন যে কোনো নারীই তা পারতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুযোগ পেলে নারী যে পুরুষের চেয়ে একতিল কম নিষ্ঠুর হয় না, এ তিনি বার বার দেখিয়েছেন ও বলেছেন। এস্থলে তাঁকে একপেশে বলা চলে না। তবে কোন একটা cause নিয়ে যে লেখে সে স্বভাবতই extreme হয়ে পড়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কখন যে সে একটা প্রতিপক্ষ খাড়া করে বাণবর্ষণ সুরু ক'রে দেয় তা সে নিজেই জানে না। আরো একটা কথা। শরৎচন্দ্রের লেখা যিনিই পড়েছেন তিনিই জানেন যে তীব্রতা তার লেখার একটা বিশেষত্ব। এই তীব্রতা তার গল্প উপন্যাসে যেমন লক্ষিত হয়, "নারীর মূল্যে"ও তেমনি। এটিকে অনেকেই এক পেশেত্ব বলে ভুল করেন।

থাক্। আলোচনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এইবার শেষ করি। সময় থাক্‌লে দেখাতে পার্‌তাম "নারীর মূল্যে"র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য লেখার ভাবগত সম্পর্ক কতখানি এবং কেমন করে "চরিত্রহীন" "গৃহদাহ "শ্রীকান্ত" প্রভৃতিতে যেসকল ভাব ইতস্তত ছড়ানো আছে তাদেরই অধিকাংশই "নারীর মূল্য লেখকের আনাচে কানাচে উঁকি মারচে। কিন্তু তাহলে বারো-হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির মতোই হত, কারণ এতটুকু বইয়ের এতবড় সমালোচনা আবশ্যক হলেও অনুপাতের বাইরে এবং সেই কারণে বিসদৃশ।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

অন্ধের দৃষ্টি

১

রামদুলাল চক্রবর্ত্তীর একমাত্র কন্যা কল্যাণীর বিবাহোপলক্ষে সমারোহ খুবই হইয়াছিল। অতিথি অভ্যাগতদিগের কলকোলাহলে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ীখানা মুখরিত হইতেছিল। কুঞ্জবনের মাঝখানে পাতার আড়ালে থাকিয়া বৈদ্যুতিক বাতিগুলা মণিমুক্তার মত শোভা পাইতেছিল। সকাল হইতে নহবতের অবিরাম বাজনা লোকের কাণ ঝালাপালা করিয়া দিতেছিল। হঠাৎ সমস্ত আলো নিবিয়া গেল। শঙ্খ নীরব হইল। আসন্ন প্রলয় ঝড় যেন মুহূর্ত্তের জন্য পৃথিবীর দিকে রোষক্ষুব্ধ ও গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিল।—মুহূর্ত্তের জন্য শুধু! তার পর বরের পিতা ও আত্মীয়েরা রুদ্র ভৈরবের মতই সদর্প পদভারে পৃথিবী কাঁপাইয়া রামদুলালের উর্দ্ধ ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ সম্বন্ধে নানাবিধ কুৎসা উচ্চারণ করিতে করিতে সদল বলে প্রস্থান করিলেন।

কোনও পরসুখ অসহিষ্ণু আত্মীয় বন্ধুর কল্যাণে প্রকাশ হইয়া গেল কন্যার কোষ্ঠীতে লেখা আছে সে তাহার প্রিয়জনের দারিদ্র্য দুঃখ অমঙ্গল ও অবশেষে মৃত্যুর কারণ হইবে।

নারীর প্রিয়জন বলিতে তাহার স্বামীকে বুঝায়। কল্যাণী স্বামীর মৃত্যুর কারণ হইবে জানিয়া আর কেই বা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে? অথচ সেই রাত্রের মধ্যেই তাহাকে পাত্রস্থ করিতেই হইবে! রামদুলাল মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। জানিয়া শুনিয়া কেহই এ অমঙ্গল বিবাহ করিতে চাহিল না। সাধ করিয়া ত কেহ নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিতে চাহে না।

গভীর মর্ম্মবেদনায় কল্যাণীর চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। হায় অভাগী! কে তোমার নাম রাখিয়াছিল "কল্যাণী?" চির অকল্যাণের রক্ত শিখা জ্বালিয়া তুমি বসিয়া আছ! কালী কপালিনীর মত মঙ্গলময় শিবকে চরণে দলিয়া নরশোণিত পান করিয়া আকুল তৃষ্ণা মিটাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ। তোমাকে সহিতে পারিয়া বরণ করিয়া লইতে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় কালভৈরব ব্যতীত আর কে সমর্থ হইবে?

কল্যাণী তার অদৃষ্টের এই লাল অক্ষর কটা কেমন করিয়া মুছিবে? তাহার জন্য তার পিতার চির উন্নত শুভ্রশির আজ নির্ম্মম বিধাতার দৃষ্টির তীব্রতা সহিতে না পারিয়া নুইয়া পড়িবে। এই ঘৃণা ও কলঙ্ক হইতে তাঁহাকে মুক্তি দিবার কি কোনও উপায় নাই? কোষ্ঠীর রক্তলেখা তাহাকে বলিতেছে মৃত্যুই তাহার গতি! পিতাকে মুক্তি দিবার জন্য সে মৃত্যুকে বরণ করিবে! সেই অশুভরাত্রি প্রভাত হবার আগেই মৃত্যুদেবতার চির নির্ভয় কোলে আপনাকে বিছাইয়া দিবে। তাহলে ত আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না?

কল্যাণীর পিতাও বুঝি তাহারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন সেই ভাল মা! সেই ভাল। আমরা মৃত্যুদেবতার চরণে হত্যা দেব। তাঁর নিজের হাত থেকে পরম শান্তি বর চেয়ে নেব।"

তখন ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া এক সুদর্শন যুবক তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমার আপন বলতে একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি দেশে থাকেন। তাঁর মন অত্যন্ত মহৎ ও উদার। আমার বিশ্বাস সমস্ত নিজে গিয়ে তাঁর চরণে নিবেদন করলে অনুমতি পাবই। আমায় যদি আপনারা যোগ্য বিবেচনা করেন, আমি কল্যাণীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি।"

রামদুলাল আনন্দে উল্লসিত হইয়া সুরেশকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "দেবতার মত মহৎ তুমি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।"

কল্যাণী চাহিয়া দেখিল ওই কালো ডাগর চোখ দুটার আড়ালে আত্মনির্ভরতার অমিত শক্তি লুকান রহিয়াছে। মৃত্যুর মত ভীষণ অথচ কত সুন্দর!

আবার শাঁখ বাজিল। শুভলগ্ন তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই বুঝি সুরেশ ও কল্যাণীর এই মিলনে দেবতার আশীষ ধারা বর্ষে নাই!

২

প্রভাত হইলে সুরেশ তারযোগে পিতাকে জানাইল কুশণ্ডিকা সারিয়া সেইদিন বৈকালে নববধূর সহিত তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইবে।

এদিকে রামদুলালের আত্মীয় বন্ধুটীও বেনামায় দীননাথ ভট্টাচার্য্যকে জানাইয়া দিলেন তাঁহার পুত্র মোহের বশে সয়তানের কুহকে পড়িয়া এক অলক্ষণা ও অঘরের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে।

উভয় তারের সংবাদ পাইয়া দীননাথ স্তম্ভিত হইলেন। সহরের আবহাওয়ায় পড়িয়া তাঁহার পুত্র নিশ্চয় নিজের চরিত্র বজায় রাখিতে পারে নাই। আর যে ছেলে চরিত্রই হারাইল, তাহার আর রহিল কি?

পাঁচ বৎসর বয়সে সুরেশের মা মারা গিয়াছিলেন। সেই থেকে সে পিতার স্নেহ ও শাসনের মাঝে মানুষ হইয়াছে। কতবার সে গোঁএর বশে কত প্রকারে পিতার অসন্তোষের কাজ করিয়াছে; কিন্তু এ যাবৎ তাঁর প্রসারিত অভয় হস্ত পুনর্ব্বার তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে। তাঁর দুর্ব্বল বুকখানিতে স্নেহ ও ক্ষমা ভিন্ন আর কিছুর পরিচয় কেহ পায় নাই। আজ এক নিমিষে সমস্ত উৎস শুকাইয়া দিয়া সেই চিরস্নেহময় বুকখানিকে পাষাণের মত নির্ম্মম করিয়া তুলিল। সুরেশ তার অমার্জ্জনীয় অপরাধের কলঙ্ক কালিমা মাখিয়া পিতার চোখের সামনে দাঁড়াইবার অধিকার টুকুও হারাইল। দীননাথ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন তাঁহার অনুমতি না লইয়া সুরেশ অলক্ষণা মেয়েকে বিবাহ যখন করিয়াছে বধূর সমস্ত ভার সে একাই

গৃহে তাহার আর স্থান নাই। তিনি জীবনে আর এরূপ অবিমৃষ্যকারী পুত্রের মুখ দর্শন করিবেন না।

অভিমানে সুরেশ আত্মহারা হইল। সেও প্রতিজ্ঞা করিল যতদিন না নিজে কৃতী হইতে পারিবে ততদিন গৃহে ফিরিবে না।

কল্যাণী তাহার পিতার কাছেই রহিল। রামদুলাল মেয়েকে আরও কিছুদিন নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন জানিয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন।

সুরেশ কলেজের খাতা হইতে আপনার নাম কাটাইয়া দিল। রামদুলাল তাহাকে অন্ততঃ বি, এ পাশ দেওয়া পর্যন্ত সাহায্য লইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে রাজী হয় নাই। অবশেষে একদিন কাহাকেও না জানাইয়া পাঠ্য বইগুলি পুরাতন পুস্তকের দোকানে সিকিদামে বিক্রয় করিয়া যে কয়টা টাকা পাইয়াছিল তাহাই মাত্র সম্বল করিয়া গোপনে বোম্বাই যাবার গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

নৈশ আঁধারের মাঝখানে বাংলা মায়ের শ্যামল ছবিখানি ধীরে ধীরে ঢাকা পড়িল। অতিদূর থেকে চাষীদের কুটীরপ্রাঙ্গনে তুলসীমঞ্চের ক্ষীণ প্রদীপ দেখা যাইতেছিল; ক্রমে তাও নিবিয়া গেল। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ নীরব; এঞ্জিনের ঝঞ্ঝনা শুধু একাকী জাগিয়া দৃপ্ত অহঙ্কারে ঘুমন্ত পৃথ্বীর বক্ষ মথিয়া চলিতেছিল।

ওগো পিতা! তুমিও কি আজ সাধারণ মানুষের মতই শুধু বাহির হইতে বিচার করিয়া দণ্ড দিলে? অন্তরের সত্য স্বরূপটুকু তোমার চোখেও পড়িল না? তোমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই ইহা কি এতই অমার্জ্জনীয় অপরাধ?—আর তাহার শাস্তি এতই ভীষণ?

সুরেশ অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে আজ অনেকদিনের পর মায়ের কথা ভাবিয়া কাঁদিল ও আপন মনে বলিল আজ যদি তার মা থাকিতেন তিনি কখনো নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া এই নিদারুণ শাস্তি দিতে পারিতেন না! সুরেশ আজ বহুদিনের পর প্রথম মনে বুঝিল তাহার মা নাই!

৩

তিনদিনের পর বোম্বাই পৌঁছিয়া সুরেশ একটু ক্লান্ত হইয়াছিল। এবার সে কি করিবে? সংসারে পথ অনেক আছে বটে কিন্তু কোনটাই সুগম নয়। একবার মনে করিল পিতা যদিই বা তাহাকে রাগ করিয়া বলিয়াছেন আর তোর মুখ দেখিব না, তখনি গিয়া তাঁর চরণ-তলে হত্যা দিয়া পড়িলেও কি তিনি পা সরাইয়া লইতেন? সে তাহাই কেন করিল না? না—না—না—সে দেখাইবে সে তাহার পিতার অযোগ্য সন্তান নহে? সে দেখাইবে সে যে ভার লইয়াছে, অপরের সাহায্য না লইয়া একাই সে তাহা বহন করিতে সক্ষম। সে দেখাইবে সে দুর্ব্বল নয়।

সে দিনটা অনাহারেই পথে পথে কাটিল! আর একটী পয়সাও তাহার নাই। দ্বিতীয়

দিনে পুলিশের লোক তাহাকে "স্বদেশী" সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করিল। সে একচোট খুব হাসিয়া দারোগাকে বলিল "আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন! কেন না এখানে এসে অবধি আমি কি করব, কি খাব, এবং কোথায় থাকব কিছুই ঠিক করতে পারিনি। জেলে গিয়েও যদি আপাততঃ আমি কিছু খেতে পাই সেটা আমার শুভ অদৃষ্ট ভেবে সন্তুষ্ট হব ও আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেব।"

দারোগা রোস্তমজী সাহেব তার কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন ও তাহাকে মুক্তি দিলেন। যে কয়দিন না সে একটা কিছু করিয়া লইতে পারে ততদিনের জন্য গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতেও অঙ্গীকার করাইলেন।

রোস্তমজী একদিন বলিলেন "ভারতের বাহিরে যেতে রাজী আছ তুমি? আমার জানিত এক জাপানী ভদ্রলোক দেশে ফিরছেন। সেখানে তাঁর খুব বড় কাচের কারখানা আছে। তাঁকে তোমার কথা বলেছিলুম। তুমি যদি যাও ত অনেক কিছু শিখতেও পারবে করে খেতেও পারবে! যাবে ত?"

সুরেশ অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে সম্মতি দিল।

৪

সে মাসের পাঠান' টাকা কেহ দাবী করিল না বলিয়া ফেরত আসিল। কিছু দিনের মধ্যে দীননাথ ইহাও খবর পাইলেন যে সুরেশ কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। রামদুলাল একদিন নিজে তাঁহার কাছে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া দীননাথ আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন। বেনামী তারের কথা বিশ্বাস করিয়া পুত্রের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অমূলক জানিয়া আত্মগ্লানি করিতে লাগিলেন। তার পর উভয় বৈবাহিকে মিলিয়া মাস দুই তিন কতই না অনুসন্ধান করিলেন। পুলিসের মারফত সমস্ত ভারতবর্ষে সুরেশের ছবি বয়স ও অন্যান্য বিবরণ সমেত বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু কোন খবরই পাওয়া গেল না।

সুরেশ যেখানেই থাকুক পিতার এই নিদারুণ মর্ম্মগ্লানির কথা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না? একটীবার সকল অভিমান ভুলিয়া একখানি চিঠিতেও সে কেন লেখেনা যে সে ভাল আছে। দীননাথ রোজই ভাবেন সেত নির্ম্মম নয়! সে চিঠি লিখিবেই! রোজই ভাবেন আজ চিঠি আসিবে। ডাকের সময় আসে। হরকরা বাড়ীবাড়ী সকলের চিঠি দিয়া যায়। দীননাথ তার আসবার সময়টীতে ব্যগ্র তৃষিত নেত্রে প্রতীক্ষা করেন। তারপর সে চলে গেলে নিরাশ হইয়া ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসেন। গভীর অবসাদে এতই ক্লান্ত হইয়া পড়েন যে খানিক জোরে কাঁদিয়া বুকটাকে হালকা করিবার সময়ও আর থাকে না।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন আসে,—চলিয়া যায়। দীননাথের শরীর ক্রমশঃই ভাঙিয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু অন্ধকার হইল। আজ হয়ত তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী হইবে না। কিন্তু সে দীননাথ আর নাই। এ যেন রক্ত মাংসহীন বীভৎস কঙ্কাল মূর্ত্তি।

সারাটী দিন বিছানায় শুইয়া ভাবিতে থাকেন "আহা সুরেশ, এত পাষাণ তুই! এত অভিমানী। আমি আজ মরতে বসেছি তা ভেবেও তোর দয়া হল না। তুই ফিরে আয়। আমার সব অপরাধ ভুলে ফিরে আয়। এবার তোকে আমি বুকের নিবিড়তম আলিঙ্গনে বেঁধে রাখব আর ছাড়ব না।"

কিন্তু বাপের মন। তখনি সন্দেহ জাগে—আশঙ্কা হয়—'সুরেশ সত্যিই বেঁচে আছে ত? দীননাথ আর ভাবিতে পারেন না। কি জানি—হয়ত—হয়ত সে আর নেই—অভিমানে—আত্মহত্যা করেছে—তাই—তাই বুঝি কোন চিঠিই তার আর আসে না!

৫

সুরেশ যাবার আগে কল্যাণীর নামে একখানি চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল। তাহাতে লিখিয়াছিল "যদি বেঁচে থাকি, আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি তাহলে এক বছর পরে আবার আমি ফিরে আসব। নইলে এই শেষ দেখা। বিদায়।"

এইখানিই স্বামীর লিখিত প্রথম ও একমাত্র চিঠি। তাঁর দেওয়া ইহাই একমাত্র নিদর্শন—আর কিছু নাই। কিন্তু এর মাঝেই কল্যাণী সব পাইয়াছে। এ চিঠিতে নববধূর প্রতি স্বামীর উদ্বেলিত হৃদয়উচ্ছাসের ফোয়ারা নাই। প্রেম সোহাগ ও আদর মাখা অনুরাগভরা চুম্বনের স্পর্শ নাই! অথচ আছে সব! কল্যাণী তাহার দেবতার অন্তরের সমস্ত প্রতিচ্ছবিটুকু এই চিঠিখানির মধ্যে দীপ্তি পাইতে দেখিয়াছে। সে সন্তুষ্ট। একটী বছর পরে তিনি যখন জয়গর্ব্বিত শিরে ফিরে আসবেন কল্যাণী পবিত্রতম আসন পাতিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

রামদুলাল কিছুদিন কল্যাণীকে লইয়া একবার এ তীর্থ একবার সে তীর্থ করিয়া বেড়াইলেন। মনে সুখ নাই। তাঁহার বৈষয়িক কর্ম্মে অমনোযোগিতা লক্ষ্য করিয়া জ্ঞাতি শত্রুরা একে একে অনেকখানি সম্পত্তি বেহাত করিয়া লইল। ঘটনাচক্রে ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যাওয়াতেও তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হইল। কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় হইয়া গেল। কাশীতে একটী ঘর ভাড়া করিয়া পিতা ও কন্যাতে দিন কাটান। ক্রমে প্রায় একবৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল। কল্যাণী উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে এইবার সুরেশ নিশ্চয় আসিবে। কলিকাতার ডাকঘরে খবর দেওয়া ছিল তাহাদের নামে কোনও চিঠি আসিলে কাশীতে পাঠাইয়া দিবে একদিন সত্যই সুরেশের চিঠি আসিল। রামদুলাল কম্পিত হস্তে লেখাটা খুলিলেন। একটীবার ভিতরের লেখাগুলির প্রতি চাহিলেন। একমুহূর্ত্তে তাঁর সমস্ত মুখখানি রক্ত লেশহীন বিবর্ণ ভাব ধরিল। কল্যাণী কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ডাকিল 'বাবা।"

কোনও উত্তর নাই!

কল্যাণী তাঁর হাত থেকে চিঠিটা লইয়া দেখিবার জন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতেই তিনি মাটীতে পড়িয়া গেলেন। হৃদস্পন্দন তখন থামিয়া গিয়াছিল। জীবনের কোন লক্ষণই আর ছিল না।

এতদিনে কল্যাণীর বিধি লিপি সম্পূর্ণ হইল। সে তাহার প্রিয়জনের মনস্তাপ ও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে ; আর নারীর প্রিয়তম আত্মীয় বলিতে সকলে যেমন বুঝিয়াছিলেন তাঁর স্বামীর কথা, তা নয়, সে তার সারা জীবনের চির আরাধ্য পিতৃদেবকেই হত্যা করিয়াছে। হাঁা করিয়াছে। হাঁা, এ হত্যাই ত! তাহারি জন্ম তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া পিতা মরিলেন!

সুরেশের প্রেরিত খামের মধ্যে জাপান ব্যাঙ্কের একখানা দশ হাজার টাকার চেক! আরও দশ হাজার টাকার একখানি জীবন বীমার রসিদ ; ও রামদুলাল ও কল্যাণীর নামে দুইখানি চিঠি ছিল। কল্যাণীকে লিখিয়াছিল, সুরেশ একবৎসর পরে ফিরিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু ফিরিতে পারিল না। দৈব প্রতিকূল হইয়া তাহাকে ফিরিতে দিল না। সে আজ মরিতে বসিয়াছে। বাঁচিবার কোন আশাই নাই। চিঠি যতদিনে গিয়া পৌছিবে সেও ইহলোকের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া ভগবানের চরণে গিয়া জুড়াইবে। একবৎসর ধরিয়া সে পিতার নিদেশমত ঐহিক উন্নতি লাভ করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ; Chusan Glass Factory তে সাধুতার সহিত কাজ করিয়া সত্বাধিকারীর সুনজরে পড়িয়াছে। তাঁর দয়াতে সুরেশ ইতিমধ্যে কারবারের দু'আনা অংশীদার হইয়াছে। ভারতবর্ষে ফিরিয়া সে নিজে একটী কারখানা খুলিবে ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু তাহার সুযোগ ঘটিল না। ভূমিকম্পে যখন টৌকিও আর ইয়োকোহামা ধ্বংস পাইল, প্রজ্বলিত গ্যাসের আগুণে যখন লক্ষ লক্ষ লোক দগ্ধ হইল, প্লাবনের জলে যখন অসহায় নর নারী ভাসিয়া যাইতে লাগিল তখন সে নিজের জন্ম না ভাবিয়া আত্মরক্ষার কোনও উপায় না করিয়া যে কয়জনকে পারে উদ্ধার করিয়া সমুদ্রতীরে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া নিজে এরূপ ভীষণ ভাবে দগ্ধ হইয়াছে, যে, ডাক্তার স্পষ্টতঃ কিছু না বলিলেও তাহার স্থির বিশ্বাস সে আর বাঁচিবে না। নিজের সঙ্কল্প সাধন করিয়া পিতার কাছে ফিরিতে পারিল না। কল্যাণীকেও সুখী করিতে পারিল না। তাহার বড় দুঃখ রহিল পিতার কাছে মার্জ্জনা চাইবার অবসর পাইল না। সে আজ বুঝিয়াছে চক্ষু থাকিতেও সে কতবড় অন্ধের মত কাজ করিয়াছে। পিতার তিরস্কারে সে কেন অভিমান করিয়াছিল? সকল ধর্ম্ম দেবতা সুখ ঐশ্বর্য্যের বড় যিনি তাঁর কাছে মান অভিমান সাজেনা ত! পিতার অসন্তোষ বুকে লইয়া সে চলিল। কল্যানীর প্রতি অনুরোধ সে যেন একটীবার গিয়া তার পিতার কাছ থেকে অভাগার অন্তিম বেদনার কথা স্মরণ করিয়া ক্ষমা চাহিয়া লয়। আর পত্রের সঙ্গে প্রেরিত দশ হাজার টাকা কল্যাণী তাঁহাকে যেন প্রাপ্তিমাত্র পাঠাইয়া দেয়। জীবন বীমা সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার কল্যাণীর নিজস্ব। সুরেশ ইহার অধিক তাহাকে দিতে পারিল না! কেননা তাহার আর কিছুই নাই।

কল্যাণীর সব ফুরাইল। আর আশা করিবার, প্রতীক্ষা করিবার কিছু নাই। কল্যাণীর স্বামী পিতা একদিনে তাহাকে তার নিষ্ঠুর অদৃষ্টের সঙ্গে একা যুঝিতে রাখিয়া গেলেন। সে আর কি করিবে? কাহার জন্মই বা বাঁচিবে! কিন্তু···না...তাহার মরা হইবে না। এখন মরিলে সে বাঁচে, কিন্তু তাহাতে তার অধিকার নাই। স্বামীর নিয়তি জানিতে পারিয়া তাঁর

পিতা আরও মর্ম্মাহত হইবেন। এ সময় তাঁর কাছে তাঁকে দেখিবার কেহ নাই। স্বামীর শেষ আজ্ঞা সে পালন করিবে। দেবতার পূজা করিবার সুযোগ সে পাইল না। তাঁহার পিতা, তাঁহার দেবতা, তাঁহার স্মৃতিকে ভালবাসিয়া জীবন ধন্য করিবে। এই তাহার কাজ! এই তাহার সাধনা! এই তাহার অবলম্বন!

৬

অন্ধ দীননাথ জ্বরের ঝোঁকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন "আহা বাছাকে আমার আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে ধরে রেখেছে—! আসতে দিচ্ছে না—! জোর করে কয়েদ করে রেখেছে—! আমি জানি সে নিষ্ঠুর নয়! আমি জানি সে আমাকে ক্ষমা করেছে'! সব অভিমান ভুলে গেছে! তবু সে আসতে পারছে না! দেখছিস কল্যাণী—মুখখানি তার কতই না শুকিয়ে গেছে! তার ওই সজল চোখ দুটীর ব্যথিত চাহনির দিকে চেয়ে বল দেখি মা, সে অভিমান ভোলেনি ?"

কল্যাণী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। রুদ্ধস্বরে বলিল "বাবা স্থির হও, তুমিও উতলা হয়ে পড়লে আমি কার সাহসে বুক বাঁধি বল ?

দীননাথ তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া বলিলেন "ছিঃ, মা, কাঁদতে আছে কি। তাকে আমরা পাব! সে আস্‌তে পারছেনা—আয় আমরা দুজনে জোর করে ওই দস্যুদের হাত ছিনিয়ে তাকে নিয়ে আসি। কি বলিস মা; আমরা আনতে গেলে সে কি ফিরবে না? সে কি এখনো অভিমান করে পালিয়ে থাকবে? আমি তার দুটো পা ধরে ক্ষমা চাইব…না… না…এ আমি কি বলছি এমন কথা আমি বলব না! এতে তার অমঙ্গল হয়! সে না আসে—নাই আসবে! যেখানে সে ভাল থাকে থাকুক! শুধু একটীবার তাকে দেখে চলে আসব—তাও কি পাবনা? ওই যে—ওই যে, সে আসছে। সে কি না এসে থাকতে পারে! ওরে কল্যাণী দেখ্‌,—দেখ্‌, কি মূর্ত্তিই বাছার হয়ে গেছে। তোদের যে বিয়েতে আমি উপস্থিত থেকে আশীর্ব্বাদ করতে পারি নি। আজ আমি নূতন করে সব অনুষ্ঠান করব। প্রাণ ভরে তোদের আশীর্ব্বাদ করব। তোদের দুটীকে বুকের মাঝে জড়িয়ে আমি সুখে মরব। সুরেশ ফিরে আসছে দেখতে পেয়েছিস, কল্যাণী? আহা…কিন্তু একি! সে যে আগুনে জ্বলে পুড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। বাছাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। সে বাপের কাছে, লুকিয়ে পালিয়ে আসছিল তাই তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারছে!…হা ভগবান এও দেখতে হল!"

কল্যাণী চমকিয়া বলিল মিথ্যা কথা বাবা—মিথ্যা কথা। আগুনে পোড়ার কথা কে তোমায় বলেছে! আমি বলিনি—যদি বলে থাকি—সে মিথ্যা কথা। তিনি বেঁচে আছেন। আবার ফিরে আসবেন। তোমার কথা মিথ্যা হবে না বাবা—।"

বেঁচে আছে? বেঁচে আছে কল্যাণী? সত্যি বলছিস্ সে বেঁচে আছে?"

হায়রে! অভাগী সে আশ্বাসটুকু বা কেমন করিয়া দিবার ভরসা করিবে? সুরেশ যে নিজে তাকে লিখিয়াছে—

কল্যাণী দীননাথের পা দুখানি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তুমি তাঁকে ক্ষমা কর বাবা। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে উঠ্‌বেন। তোমার ক্ষমা না পেয়েই তিনি অভিমানের অনলে পুড়ে মরছেন। তুমি তাঁকে ক্ষমা করলে কেউ তাঁর কোন' অনিষ্ট করতে পারবে না। তুমি ছাড়া আর যে তাঁর কেউ নেই। তুমি না তাঁকে কাছে ডাকলে—"

দীননাথ কল্যাণীর চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "ক্ষমা ত' তাকে করেছি মা। সে কি তা বুঝ্‌ছে না। তবে সে এখনও কেন আসছে না?"

কল্যাণী দৃঢ়স্বরে বলিল "আসবেন।" কিন্তু ক্রন্দনভরে সে কথা স্পষ্ট মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না।

এমন সময় চিরপরিচিত স্বরে বাহির হইতে কে ডাকিল "বাবা।" ক্রমে নিকটে—আরও নিকটে আসিয়া সে বলিল "বাবা। আমি এসেছি।" দীননাথ ভাবিলেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। এ বড় মধুর স্বপ্ন। এ স্বপ্ন যেন জীবনে না ভাঙে। আগন্তুক আবার ডাকিল "বাবা" আমায় দেখবেনা বলেছ। আমিও অভিমানে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসেছিলুম। কিন্তু পারলুম না। তোমায় দেখবার অপেক্ষাতে আমার প্রাণ কিছুতেই বের হল না। তোমার মুখে ক্ষমা করেছ শুনতে না পেলে আমিত মরণের শান্তি পাব না। একটীবার—শুধ্ একটীবারের জন্য তোমার ও প্রাণঘাতী আদেশ ফিরিয়ে নাও! একটী বারের জন্য আমার দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতেচাও, তারপর তোমার চোখের সামনে থেকে চিরদিনের জন্য আমি চলে যাব।"

দীননাথ কাতরস্বরে বলিলেন ভগবান—এ মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে বারবার উত্তেজিত করে কি খেলা খেলছ তুমি?"

সুরেশ বলিল "বাবা একটীবারের জন্য আমার দিকে চেয়ে দেখ।"

দীননাথ চীৎকার করিয়া বলিলেন "ভগবান। তুমি আমার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছ—! তুমি আমার প্রাণের অধিক প্রিয়তম সুরেশকে নিয়েছ!—তবু কি সন্তুষ্ট হও নি? আজ আমায় পাগল করে তুল্‌লে?

কল্যাণী বলিল "স্বপ্ন নয় বাবা—সত্যি—সত্যিই তিনি এসেছেন। তাঁর সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে আজকের দিনটীতে ক্ষমা কর।"

দীননাথ বলিলেন "সত্যি এসেছে? ভগবান্, এত দয়া তোমার! সুরেশ বাবা! ফিরে এসেছিস্ আয় বাবা, আমার বুকে। তোকে দেখব না বলেছিলুম তার শাস্তিও আমি পেয়েছি। আমার এ অন্ধ আঁখি আর তোকে দেখতে পাবে না! জন্মজন্মান্তরে কতই না পাপ করেছিলুম, তাই আজ তোকে এত কাছে পেয়েও দেখতে পাচ্ছি না।"

সুরেশ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমায় দেখ্‌বে না বলেই চোখ দুটী অন্ধ করে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে বাবা?"

দীননাথ কল্যাণী ও সুরেশ উভয়কেই কাছে টানিয়া বলিলেন "কে বলে আমি অন্ধ? তোরাই আমার দৃষ্টি! তোরাই আমার প্রাণ! তোদের দূরে রেখে আমি মরতে বসেছিলুম; তোদেরও মারতে বসেছিলুম। তোদের দুজনকেই ফিরে পেয়েছি আজ। তাই আবার বল্‌ছি, আমি অন্ধ নই।"

সুরেশ রুদ্ধস্বরে বলিল "অন্ধ তুমি নও বাবা! অন্ধ আমি; তোমার তিরস্কারে অভিমান করে চলে গিয়েছিলুম সেই পাপেই তোমার এই কষ্ট আমায় দেখতে হচ্ছে। সেই সুদূর বিদেশে রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে কেবলি মনে হত' তোমার চরণতলে যদি নিজেকে লুটিয়ে দিতে পার্‌তুম তাহলে এক নিমেষে আমার সকল জ্বালা নিরাময় হত। ভয় হত আর তোমাকে দেখতে পাব না। আজ তোমারই কৃপায় আবার ফিরে আস্‌তে পেরেছি। এবার প্রাণ ও মন দিয়ে বুঝেছি, পিতার অভয় আশীর্ব্বাদ অভেদ্য বর্ম্মরূপে সন্তানকে রক্ষা করে।—পুত্র যেখানেই থাকুক,—যত দূরেই থাকুক,—ঝড় জল আগুণ রোগ, শোক কিছুই তাহাকে বিনাশ করতে পারে না। সব দেবতার বড় তুমি, ধর্ম্ম স্বর্গ তপ তপস্যা সকলকার উঁচুতে তোমার স্থান—সেই তোমার উপর অভিমান করেছিলুম! অভাগ্য আমি, জানিনা মৃত্যুর আগুনেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি না!"

৭।

সুরেশ কল্যাণীকে বলিল "কত যায়গায় যে তোমাকে খুঁজেছি তা কি বলব! তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পেয়েছি। এখানে তোমায় দেখতে পাব আশা করিনি। আমার দিকে চেয়ে দেখছত? আমি নিজেই চিনতে পারিনা। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এই বীভৎস মূর্ত্তির দিকে চেয়ে কেন ভয় পাবে বল? তোমার কি আমায় দেখে ঘৃণা বোধ হচ্ছে না? সত্যি করে বল! বাবা নাহয় দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তোমার চোখের সামনে নিত্যদিন যখন এই অগ্নিদগ্ধ মূর্ত্তি জাগবে—"

কল্যাণী বাধা দিয়া বলিল "তাই যদি তোমার ভয় হয় আমারও চোখ দুটা না হয় আমি নষ্ট করে ফেলব। তাহলে আমি তোমায় দেখে ঘৃণা করি একথা ভাববার আর কারণ পাবেনা।

...আচ্ছা তুমি কি এতই পাষাণ। আমাদের মনের অবস্থা বুঝেও তোমার দয়া হয় না? সে কথা শুনে আমাদের বুক ফেটে যায় তা তোমাকে বলতেই হবে?"

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল! সুরেশ অনুরাগভরে তার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল "ঘৃণা হয় না? আশ্চর্য্য তোমাদের মনের জোর। এত কঠিন তুমি, অথচ একটা কথার আঘাত সহিতে পার না এমনি দুর্ব্বল!"

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

অশোকা

১।

স্কুল প্রত্যাগতা অশোকা হাতের বইগুলি টেবিলে ফেলিয়া রান্নাঘরে গিয়া মাতাকে কহিল, "শুন্‌চোমা—"

আরব্ধ কাজ করিতে করিতে মলিনা বলিল, "কি রে ?"

"সখির বিয়ে হচ্ছে মা।"

সকৌতুকে মুখ তুলিয়া মলিনা কহিল, "সত্যি নাকিরে ?"

"হ্যাঁ মা, আজ সখির বাবা তার নাম কাটিয়ে নিলেন, আমি সখিকে জিজ্ঞাসা করলুম কেন ? সখি বললে তার বিয়ের ঠিক হয়েছে।"

মলিনা হাসিয়া কহিল "দূর ! তোকে ঠাট্টা করেচে।"

ব্যগ্রস্বরে অশোকা বলিল "সত্যি মা।"

"আচ্ছা, তুই মুখ ধুয়ে খাবার খাবি আয়, সত্যি মিথ্যে খবর পরে জানবো।"

অশোকা প্রস্থান করিলে মলিনা পুনরায় কার্য্যে মন দিল।

মলিনা ও নলিনী একই গ্রামের মেয়ে, বাল্যাবধি পরস্পরের সখি। মাতৃহীনা কন্যা মলিনাকে পিতা সামান্য অবস্থা হইলেও খরচ করিয়া শিক্ষিত পাত্রের হাতে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। নলিনী ধনী লোকের কন্যা, ধনী লোকের গৃহিনীও হইয়াছিল। কিন্তু অপরিণতবুদ্ধি অনাদিনাথ নিজের উচ্ছৃঙ্খলতায় বিষয়ের তিনভাগ উড়াইয়া দিয়া পরে যখন সংযত হইল তখন দেখিল আয় যাহা ব্যয় তাহাপেক্ষা অধিক। তাহার উপর পর পর কতকগুলি কন্যা। চারিদিকের ব্যাপার দেখিয়া শীঘ্রই তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু এই ভগ্নস্বাস্থ্যেও সে তাহার অবশিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন হেতু কন্যাগুলির বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিল।

২

মলিনা করুণাময়কে কহিল, "অশোকার কি বিয়ে দেবেনা ? অতবড় মেয়ে হ'ল—লোকে নিন্দে করবে যে, পাত্র খুঁজতে আরম্ভ কর।"

বৈকালিক জলখাবারের, থালাটা টানিয়া লইয়া—বিস্মিত ভাবে করুণাময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এরকম প্রশ্ন ?"

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে মলিনা কহিল, "না, না, তুমি বুঝছোনা। আজ নলিনীদের বাড়ী গেছলাম শুনলাম সখির বিয়ে হচ্ছে।"

"অমনি বুঝি তোমারো মেয়ের বিয়ে দিতে সখ গেল। ওরা—"

বাধাদিয়া মলিনা কহিল কথাটা শোনই না ছাই, নলিনীর কথা শুনে বুঝলাম এত বড় মেয়ে হিন্দুর ঘরে থাকেনা—এসব শাস্ত্র বিগর্হিত ক্রীশ্চানী মত।"

গম্ভীর ভাবে করুণাময় কহিলেন, "এইকথা শুনে যদি চঞ্চল হও মলিনা তবে বড় দুঃখের বিষয়। নিজের মনে যা ভাল বুঝেছ সেইমত কর্ত্তে গিয়ে যদি বাহির হতে বাধা বিপত্তি উপস্থিত হয় তা'তে ভয় করলে চলবেনা।"

মলিনা স্বামীকে বুঝিত তবুও কহিল, "কিন্তু সমাজ—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া করুণাময় কহিলেন,"সমাজ! সমাজ কি আমার মেয়ের বিয়ের অর্থ সাহায্য করবে? আমার টাকা নেই। কিন্তু এই সমাজের ভয়ে বিয়ে দিতে হলে আমার অতগুলি মেয়ে যা'কে হো'ক এক একটীকে ধরে ওদের উৎসর্গ করতে হবে। না মলিনা। তার চাইতে মেয়ে চিরকাল আমার ঘরে থাক্। বরং ওরা লেখা পড়া শিখে যদি সৎভাবে সচ্ছন্দে স্বাধীন জীবন চালাতে পারে সেটা ভাল নয়কি? একে দেশেরত এই অবস্থা, তার উপর সৎপাত্রে মেয়ে না পড়লে চিরজীবন দুঃখ ভোগ করবে।" মলিনাকে কুণ্ঠিতমুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া করুণাময় পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "সমাজ যখন শুধু ভ্রূকুটীই করবে কিন্তু ভাল কিছু করতে পারবেনা তখন আমি বাপ হয়ে এই সমাজের ভয়ে মেয়ে জলে ফেলে দিতে পারবোনা। তা'তে সমাজ—"

এমন সময় অশোকা ঘরে ঢুকিয়া বলিল "মা, মাসিমা এসেছেন।" ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া মলিনা জিজ্ঞাসা করিল মলিনা কখন এলোরে?" "এই মাত্র এসেছেন সখির বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে। তোমার ঘরে বসিয়েছি।" অশোকা ও মলিনা বাহির হইয়া গেল।

৩

সখির বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া বাটী ফিরিলে করুণাময় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন জামাই দেখলে?"

মলিনা হাসিয়া কহিল "তা বেশ! তবে একটু যেন কেমন কেমন। বল্‌নারে অশোকা কেমন দেখলি।"

বন্ধুবিরহে অশোকার মন তখনও ব্যথিত হইয়াছিল, চোখের অশ্রু তখনও শুখায় নাই। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কহিল বেশ তো মা, বশ বের হয়েছে।" করুণাময় সস্নেহ দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঘুম পাচ্ছে বুঝি, শোওগে মা।" মলিনা কহিল বিয়ের বর, বলতে নেই, কিন্তু কেমন যেন! প্রথম জামাই হোল, লেখাপড়াও শুনলাম জানেনা' তবে অবস্থা নাকি ভাল এইটা।"

বামুন আসিয়া জানাইল "বাবুর ভাত বাড়া হইয়াছে।"

মলিনা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "এত রাত্র অবধি খাওয়া হয় নাই।"

খবরের কাগজ খানা হইতে মুখ তুলিয়া করুণাময় কহিলেন

"বলতে ভুলে গিয়াছিলাম আজ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল সেই খাইয়ে দিয়েছে।" "আহা! বলতে হয়। ও বেচারী এতরাত অবধি বসে রইল। আচ্ছা ভুলো মানুষ, কোন দিকেই লক্ষ্য নেই।" এই বলিয়া মলিনা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

পত্নীর এই মধুর অনুযোগে ঈষৎ হাসিয়া করুণাময় পুনরায় সংবাদ পত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

৪

৬। ৭ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অশোকা এখন এম্ এ পড়িতেছে। একটা ছুটীর পরের দিনে অশোকা কলেজ যাওয়ার পর বাড়ীর চাকর তাহাকে অশুভ সংবাদ দিয়া ডাকিয়া আনিল। হৃৎকম্পের সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া অশোকা দেখিল পিতা মৃত্যুশয্যায়। ছিন্নলতিকার ন্যায় অশোকা পিতৃসমীপে লুটাইয়া পড়িল।

করুণাময় স্নেহভরে কন্যার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন, "তুমি এমন করে কাঁদলে ত চলবেনা মা। আমার প্রথম সন্তান তুমি, তোমাকে আমি পুত্রের ন্যায় পালন করেছি। এখন তোমার পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করবার সময় এসেছে। অশোকা, এদের ভার তোমার হাতে দিয়ে আমি শেষ নিশ্বাস নিশ্চিন্তে ফেলতে পারি।" অশোকা কি বলিতে চাহিল কিন্তু তাহার ক্রন্দনরুদ্ধ স্বর ফুটিলনা। করুণাময় গাঢ়স্বরে কহিলেন, "বল্‌ম', বল অশোকা আমার শিক্ষা বিফলে যাইনি?" প্রবল ক্রন্দনোচ্ছাস সংযত করিয়া সাশ্রুনয়নে অশোকা কহিল, "না বাবা! আপনার শিক্ষা বিফল হতে পারে না। আজ হতে আমার মা ভাই বোনকে প্রাণপণ পালন কোরবো। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন বাবা।"

—"আমি আশীর্ব্বাদ করছি অশোকা তুমি সৎভাবে স্বাধীন উপায়ে নিজেকে এবং আর দশজনকে পালন করবে।" আজ পৃথিবী থেকে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চল্‌লাম।" পরম নিশ্চিন্ততায় সেই মহাপারের যাত্রীর মুখে একটা প্রসন্নভাব ভরিয়া উঠিল। করুণাময় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। মলিনা হা'হাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অশোকা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল "বাবা! বাবা।"

৫

আরও কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। অশোকা এখন প্রফেসরি করিতেছে।

সন্ধ্যা হয় হয় অশোকা মাতার ঘরে ঢুকিয়া বিছানার পাশে বসিয়া বলিল, "আজ নলিনী মাসিমার বাড়ী গিয়াছিলাম।" স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে মলিনা একরূপ শয্যা লইয়াছে। কার্য্যান্তে অশোকা নানাপ্রসঙ্গ পাড়িয়া মাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

মলিনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওরা সব কেমন আছে?"

অশোকা ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বলিল "বড় গরম হচ্ছে মা' চল ছাতে যাই। বাণী, চুণী, অমল গেল কোথা? ওদের পড়াগুলোও দেখতে হবে।" "ওরা ছাতে খেলা করছে। গরম হচ্ছে তোর—চল ছাতেই যাই।" মলিনা উঠিলে অশোকা একটা মাদুর ও বালিশ আনিয়া

ছাতে পাতিয়া দিয়া বসিয়া বলিল,"মাস দুই হ'ল মেসো মশাই মারা গেছেন। আমরা নিজেদের দুঃখে ওদের কোন খবর রাখিনি, অন্যায় হয়ে গেছে মা।" মলিনা ব্যথিত হইয়া কহিল, "আহা! অনাদিবাবু মারা গেছেন!" অশোকা বলিল, "দুঃখের উপর দুঃখ মা সখির সেজবোন রাশি বিধবা হয়েছে। অপয়া বউ বলে শাশুড়ী তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। মাসিমা তাই বলছিলেন আমি কি করব, এত অপুষ্যি তার উপর মেয়েটার মোটে ১৩।১৪ বছর বয়েস। আমি ওর জীবনের কি উপায় করে দিয়ে যাব। আজ যদি আমি মরি—কাল ওদের কি উপায় হবে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মলিনা কহিল, "এই আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের ফল অশোকা; মেয়ে বড় করে রাখলে জাত যাবে কিন্তু আজ বিয়ে দিলে কাল যদি সে বিধবা হয় তা'হ'লে তা'র কি উপায় হবে সে ভাবনা কেউ ভাবেনা। বাঙ্গলা দেশে মেয়ের দুঃখ নেই, বলি দেবার লোকের ও অভাব নেই, যাক্—এখন ওদের সংসার কেমন চল্‌ছে।" অশোকা উত্তর দিল, "দেখে বুঝতে পারলাম মা খুব কষ্ট পাচ্ছে। মাসিমাকে বল্‌লাম রাশি, ননী, খুকীকে স্কুলে দিতে। মাসিমা বলাকওয়াতে রাজী হয়েছেন। বল্‌লাম রাশির জীবনের একটা অবলম্বন ও হবে। উনি দুঃখও বিস্তর করলেন। দেখমা! আমার মাইনে বেড়েছে ত? আমি মাসিমাকে কিছু দোব, কি বল মা?

পিতার আদেশ সে ভোলে নাই। মলিনা কহিল, "তাই দিস্। নলিনী বড় লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ হয়েছিল। কখন কোন কষ্ট পায়নি। এমন ভাবে দিস্ যেন তোর সাহায্য নিচ্ছে বলে তাকে কুণ্ঠিত হতে না হয়। সখি কোথায় আছে এখন—তাকে দেখলি?"

অশোকা ইতঃস্তত করিয়া কহিল "তার স্বামী তাকে বড় নির্য্যাতন করে তাড়িয়ে দিয়েছে, সখীর চেহারাও বড় খারাপ দেখলাম। কিন্তু আজই সে আবার ফিরে যাচ্ছে, মাসিমা কত বারণ করলেন, শুনলো না, আমি বল্‌তে কেঁদে ফেল্‌লে; কেন মা নিজেকে সে এই লাঞ্ছনার মধ্যে পিষে ফেলছে?" ব্যথার ভারে অশোকার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। মলিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি করে থাকবে সে? তা' হ'লে লোকে নিন্দা করবে, সমাজ ক্রুদ্ধ হবে।" ঈষৎ উষ্ণভাবে অশোকা কহিল, "কিন্তু তারা সখিকে যদি মেরে ফেলে?" ম্লান হাসি হাসিয়া মলিনা বিষণ্ণ ভাবে কহিল "তাহ'লে সকলে বলবে স্বামীর হাতে মরে সে অক্ষয় স্বর্গলাভ করেছে। ওরে অশোকা, এইযে সমাজের নিয়ম! সখি যদি উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে চলে আসে লোক অযথা কুৎসা রটিয়ে নিন্দার মুখে বিষ উদ্গীরণ করবে। উচ্ছৃঙ্খল, উৎপীড়ক স্বামীকে যদি সে শ্রদ্ধা করতে না পারে তাহ'লে এই অমানুষ সমাজে সে হেয়। আর যদি সে তা'র স্বামীর সকল লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে নিজেকে পলে পলে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দ্যায় তবেই এই সমাজের মধ্যে তার স্থান আছে। এখন তুই বল্ অশোকা তার কোন্ পথ ধরা উচিৎ—স্বামীর হাতে লাঞ্ছিত জীবনের শেষ করা, না সংসারের, সমাজের পাঁচজনের নিন্দা কুড়িয়ে বেঁচে থাকা। অশোকা চোখের জলে

অশ্রু কাটিতেছিল, মুছিয়া বলিল, কিন্তু মা আজ নারীজাতির প্রাণের মধ্যে যে স্বাধীনতার বাণী এসে পৌঁচেছে। এই পরাধীনা নারী তবুও কেন সাড়া দিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে না?

"কি নিয়ে আসবে অশোকা! এরা যে একেবারে অজ্ঞ, অন্ধ কুসংস্কার ও অজ্ঞানের তমসায় এরা যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এদের না আছে শিক্ষা না আছে শক্তি, না আছে মনের বল, না জানে পথ—কি নিয়ে এরা স্বাধীন পথের পথিক হবে?"

মাতৃহৃদয়ের গাঢ় বেদনায় কথাগুলি বলিয়া মলিনা একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরে পুনরায় বলিলেন "এই স্বাধীনতার সাড়া অনেকেরই ভিতরে দিয়েছে অশোকা; কিন্তু বাহিরে তা প্রকাশ করবার মত শক্তি এদের আজো নাই। এখন যদি কোন মহীয়সী শক্তিময়ী রমণী এই সর্ব্বাঙ্গক্ষত, দুষ্ট, ক্রূর সমাজের সকল বাধা পাশ ছিন্ন করে পদদলিতা পরাধীনা নারীর স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খাটাকে জাগিয়ে তুলে তাদের নেতারূপে পথ দেখিয়েছেন তবেই এরা জাগবে অশোকা।—

রাত হইয়াছে দেখিয়া মলিনা উঠিয়া ঘরে গেল। অশোকা বৃক্ষান্তরাল দিয়া যে চন্দ্ররশ্মি টুকু তাহাদের অলিন্দে আসিয়া পড়িয়াছিল সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতেছিল, যে পৃথিবী সূর্য্যকিরণ সম্পাতে উজ্জ্বল, চন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্না যাহাকে প্লাবিত করে, স্নিগ্ধ মলয় যথায় সদা সঞ্চারিত, অকলঙ্ক সুগন্ধ পুষ্প যাহাকে শোভিত করিয়াছে সেই সুন্দর পৃথিবীর মানুষ এত নিষ্ঠুর কেন? মায়ের কোলে আজন্ম বর্দ্ধিত, ভগ্নীর স্নেহছায়ায় লালিত, পত্নীর অযাচিত প্রেমে তৃপ্ত হইয়াও সে মানুষ এত ভীষণ, উচ্ছৃঙ্খল হয় কেন? শক্তিরূপা নারী, মাতৃরূপা নারী, দেবীরূপা সর্ব্বত্র পূজিতা নারী—হায়! এই অভাগা দেশে সে কেন চির পরাধীন; পদদলিতা, লাঞ্ছিতা! অশোকা নতজানু হইয়া যুক্ত হস্তে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "হে সুন্দর। তোমার রচিত এই সুন্দর ধরণীতে এত অসুন্দরের সমাবেশ কেন!"

৬

"আজ নারিজাতি ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন ভাবের উচ্ছাসে আজ প্রতি নারীহৃদয়ই উদ্দীপ্ত। এমন দিনেও কি সখি তুমি নিরালায় লোক চক্ষুর অন্তরালে পরাধীন জীবন যাপন করবে—না, না তা হবে না, তোমাকেও জেগে উঠতে হবে।" ম্লান হাসিয়া সুহাস কহিল আর এ জন্মে আমার জাগা হবে না অশোকাদি, সকলেই জাগবে আমিই শুধু জড়ের মত অচেতন হয়ে থাকব।"

ক্ষুব্ধভাবে অশোকা কহিল, "কেন সখি এই জাগরণের ঢেউ কি তোমায় একটুও স্পর্শ করে নি—একটুও চঞ্চল করেনি, তোমার কি জাগতে—স্বাধীন হতে সাধ হয় না?" নত মুখে সুহাস কহিল, "যেদিন একজনের হাতে সমর্পিত হয়েছি সে দিন হতে আমার নিজস্ব সাধ, আশা, আত্ম সুখ সব বিসর্জ্জন দিয়ে পরাধীন হয়েছি। কি সম্বল করে আজ স্বাধীন হব ভাই?"

"কেন সখি, তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। আমার শিক্ষার ভাগ আমি তোমায়

দোব। আমরা সকলে মিলে কাজ আরম্ভ করি। স্বাধীনতার পথে বাধা যথেষ্ট কিন্তু ভাবলে কাজ হবে না। আমাদের উন্নতি করতে হলে আগে কাজ করে পরে ভাবতে হবে। এস কালই তোমার শিক্ষা আরম্ভ করা যাক্।"

বিষণ্ণ মুখে সুহাস কহিল "মিথ্যে ভাই, আমার আর কিছুই হবে না।"

আহত ভাবে অশোকা কহিল, "বেশ বুঝলাম তোমার কিছুই হবে না। তুমি মৃন্ময় প্রতিমার মত একবারে অচেতন। কিন্তু মা হয়ে নারী হয়ে তুমি তোমার মেয়েগুলিকে আর পরাধীনতার অন্ধকূপে ফেলে রেখোনা। তাদের শিক্ষা দাও, তাদের প্রকৃত নারীত্ব বিকশিত হতে দাও—তাদের জান্তে দাও তারাও সজীব, স্বাধীন। তাদের জীবন যেন তোমার মত বিফলে না যায়।"

"মা হয়ে এমন কথায় আমি কেমন করে "না "বলি। আমার ত বাসনা মেয়েগুলি তোমার মত করে গড়ে তুলি. তারা যেন মানুষ হয়। কিন্তু উনি যে মত করেন না।"

"তোমার স্বামীর অমত সুহাস! আচ্ছা, আমি গিয়ে তোমার স্বামীর মত করাব।

একটা আতঙ্কে সুহাস বলিয়া উঠিল "নানা অশোকাদি তুমি আমার বাড়ী যেয়োনা ভাই"—বিস্মিত ভাবে অশোকা কহিল "কেন?" দুহাতে মুখ ঢাকিয়া সুহাস বলিল যে, আমি বল্‌তে পারবো না। আমাকে ক্ষমা কর ভাই। কিন্তু অশোকাদি হাতে ধরে বলছি, যেদিন আমার শেষ দিন হবে সেদিন তুমি আমার এই আজকের আচরণ ভুলে গিয়ে একবার ছোট বোনের কাছে যেও ভাই।"

চমকিয়া উঠিয়া অশোকা কহিল "ওকি কথা সখি!" কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়াই মনে হইল কথাটা মিথ্যা নয়। সুহাসের সে মৃণাল কান্তি আর নাই। স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এইভাবে থাকিলে অভাগিনী আর বেশীদিন বাঁচিবে না। অশোকার চিন্তাকুল দৃষ্টি ও বিমর্ষ মুখ দেখিয়া সুহাস বড় করুণ হাসি হাসিয়া বলিল "না ভাই, আজই কিছু সেদিন আসছে না—তবে সেদিন যখন আসবে সে দিন যেন আমার কথা ভুলো না।"

অশোকা উন্মনা হইয়া ভাবিতেছিল, হায় নারি! দুর্ব্বিসহ বেদনায় তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তুমি তাহা প্রকাশ করিবে না!

৭।

"এই বাড়ী দিদিমণি"

গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া অশোকা বলিল "এযে খোলার বাড়ী—এ কোথায় নিয়ে এলে।" অশোকা জানিত না যে সুহাসের স্বামী অধঃপতনের চরম সীমায় নামিয়া গিয়াছে।

কোচম্যান কহিল "হুজুর, আপনি যে ঠিকানা বলেছিলেন সে এই—অশোকা বাটীর নম্বর মিলাইয়া দেখিল সত্যই ত, সে একটু ইতঃস্তত করিতেছিল কি করিবে এমন সময় সহিস ঘুরিয়া

আসিয়া বলিল একজন বাবু বাড়ীতে বসে আছেন। অশোকা অগ্রসর হইয়া দেখিল ভদ্রবেশ ধারী একজন বসিয়া মদ্য পান করিতেছে। বেশ নিরীক্ষণ করিয়া চিনিতে পারিল সেই-ই সুহাসের স্বামী। ঘৃণায় তাহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। পশুটা আজো বসে মদ খাচ্ছে। স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়, সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নাই। মুখ ফিরাইয়া লইয়া অশোকা তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। পদশব্দে তাহার সুরারঞ্জিত নেত্র অর্দ্ধ উন্মীলিত করিয়া জড়িত স্বরে কহিল,—"এই যে এসেচেন, আপনিই বুঝি অশোকা দেবী আমার স্ত্রী আপনাকে ডাকতে আমায় অনেক অনুরোধ করেছিল। কিন্তু আমি ত তার হুকুমের পেয়াদা নই আমি সাফ বলে দিলাম আমার দ্বারা হবে না। তা' আপনি খবর পেলেন কোত্থেকে। কোন গতিকে খবরটা বুঝি পাঠিয়েছে। মশায় মরবে তবু—ফিচেলি বুদ্ধি ছাড়বে না। এর উপর বলে আবার মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও, তা হলে ত আর রক্ষে ছিল না। এক একটী আস্ত বিদ্যেধরী হয়ে—সহসা জিব কাটিয়া বলিল—"আরে আপনিই ত স্ত্রী স্বাধীনতাটা চালাচ্ছেন, আমি ভুলে গেছলাম—! আর কি বলিতে যাইতেছিল অশোকা কঠিন বিরক্তপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করিল, সখিকে কোন ডাক্তার দেখেছে ?"

হা ! হা ! শব্দে হাসিয়া লোকটী বলিল, "মদের পয়সা জোটে না বাবা, ডাক্তার দেখাব কোত্থেকে। তুমি বড়লোক, স্বাধীন জেনানা আছ। তোমার সখির জন্যে ডাক্তার আনাও দেখাও—আমি—অশোকার দুই চক্ষে ঘৃণা ফাটিয়া পড়িতেছিল, যেন নিজেকে আর সংযত রাখিতে পারে না। বাধা দিয়া বড় ঘৃণার সহিতই জিজ্ঞাসা করিল, "থাক্—এখন সে কোন্ ঘরে আছে ?' এত ঘৃণা মাতালটারও চক্ষু এড়াইল না। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

কোচম্যানকে ডাক্তারের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া অশোকা দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে যেন আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। মলিন শয্যাতলে ম্লান কুসুমের মত তাহার সখি পড়িয়া আছে। পাশে বসিয়া তাহার দুটী মেয়ে ক্রন্দন করিতেছে। বিছানার সন্নিকটে বসিয়া অশোকা কাতরকণ্ঠে ডাকিল "সখি !" কোন উত্তর পাইল না। সুহাসের কাণের কাছে মুখ লইয়া অশোকা পুনরায় ব্যাকুল হইয়া ডাকিল 'সখি ! সখি ! সহসা সচেতন হইয়া মুদিত চক্ষু খুলিয়া সুহাস কহিল,—"তুমি এসেছ ভাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি মাকে সংবাদ দিই নি কিন্তু তোমাকে ডেকেছি আমার এই অভাগা মেয়ে দুটোকে তোমার হাতে দিয়ে যাব বলে। তোমার আবাল্য বন্ধুর এই মৃত্যুশয্যার দান তুমি প্রত্যাখ্যান কোরোনা ভাই।"

"সেকি সখি ! আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, তুমি ভাল হয়ে উঠবে।"

"না, অশোকাদি ভাল আমি হ'তে চাই না, এ আমার মরণ নয় মুক্তি, কত অতৃপ্তি নিয়ে আমি সংসার থেকে যাচ্ছি তা বলতে পারি না, তবু যাচ্ছি যে এই আমার শান্তি।"

সুহাসের নিমীলিত নয়ন দিয়া ঝর ঝর বেগে অশ্রু বহিয়া পড়িল। মুছাইয়া দিয়া অশ্রু

ম্লান মুখে অশোকা কহিল, "কি বলে তোমাকে সান্ত্বনা দোব সখি ভেবে পাচ্ছি না ভাই। এই কি বিবাহিত জীবনের পরিণাম।"

"না—না—ও কথা বোলো না অশোকাদি এ আমার অদৃষ্টের ফল" কিন্তু—অশোকাদি বল আমার মেয়েদের ভার নিলে।

"ভাই! তোমার দয়া তোমার মহত্ত্ব তোমার বন্ধুত্ব স্মরণ করে বলছি, বল ভাই নিলে।" আমার অভাগা মেয়ে দুটোকে তুমি নিলে। অধিক উত্তেজনায় কথাগুলি বলিয়া রোগিণী বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িল। অতিকষ্টে অশ্রুর উচ্ছাস সংবরণ করিয়া অশোকা গাঢ়স্বরে কহিল, "হ্যাঁ, সখি এদের ভার আমি নিলাম। আমার ভাই বোনদের মতই আমি এদের মানুষ করবো তুমি নিশ্চয় জেনো।'

একটা পরম পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত দুর্ব্বল কণ্ঠে সুহাস কহিল "আঃ বাঁচালে দিদি।" তার পরেই অস্ফুটভাবে কহিল "বিদায়। বন্ধু বিদায়"—অশোকা ব্যাকুলভাবে ডাকিল "সখি!" সখি!" তখন সব স্থির।

অশোকা মৃতের শয্যাপাশে বসিয়া বলিতে লাগিল, "শুনতে পেলে না সখি, আমি এই দেহ স্পর্শে করে প্রতিজ্ঞা কর্ছি আজ হতে আমার জীবনের সমস্ত উপার্জ্জন কুমারী শিক্ষার জন্য অর্পণ করব, অভাগিনী বাল বিধবাদের দুঃখ মোচন জন্য, এই পদ দলিতা লাঞ্ছিতা পরাধীনা নারীজাতির উন্নতিকল্পে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে—সখি যদি তোমার মত একটী দুর্ভাগিনীরও আমি কষ্ট মোচন করতে পারি তাহারই চেষ্টায় আমার জীবন উৎসর্গ করলাম।"

ডাক্তার বাবু ঘরে ঢুকিয়া মৃতাকে দেখিয়াই বলিলেন—"হার্টফেল।"

অশ্রু নিরুদ্ধ কণ্ঠে অশোকা কহিল "হাঁ ডাক্তার বাবু—একটী অতৃপ্ত আত্মা পরলোকে শান্তির আশায় চলে গেছে।

শ্রীমানসী চৌধুরী।

প্রাচীন ভারতের মদ্রজাতি

মদ্ররা বৈদিক যুগের একটি ক্ষত্রিয় জাতি। বৈদিক সংহিতাগুলিতে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় না সত্য কিন্তু সামবেদের 'বংশ ব্রাহ্মণে' মদ্রগার সৌঙ্গায়নি নামে একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বেদজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হইতেই কাম্বোজেরা বেদাধ্যায়ন করে। সৌঙ্গায়নির নামের সহিত মদ্রগার নামটি সংযুক্ত হইতে দেখিয়া ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেন যে সৌঙ্গায়নি মদ্র-বংশোদ্ভব ছিলেন। মদ্রদের ভিতর বেদের চর্চা অতিমাত্রায় প্রসার লাভ করিয়াছিল। এমন কি সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে যে কয়জন লোক বেদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন সৌঙ্গায়নি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন। এই ঘটনা হইতেই ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্তও করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ যুগের পূর্ব্বে যে বৈদিক আর্যসমাজ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল মদ্ররা সেই বৈদিক আর্য্যসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণের যুগে মদ্রদের জ্ঞানের খ্যাতি যে বহুবিস্তৃত ছিল শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, উত্তর ভারতের, সম্ভবতঃ কুরু পাঞ্চাল প্রভৃতি অঞ্চলের ঋষিরা বেদাধ্যয়নের জন্য মদ্র প্রদেশে গমন করিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্দালক আরুণী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন "আমরা পাতঞ্জা কাপ্যলর গৃহে মদ্রদের ভিতর বাস করিতাম।" ভুজ্যালাহায়নিকেও বলিতে দেখা যায় যে, ছাত্ররূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি পাতঞ্জল কাপ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।" এই সব ঘটনা নিঃসংশয়েই প্রমাণ করে যে, বৈদিক যুগের লোকদের ভিতর মদ্রদের স্থান বেশ উচ্চেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (VIII. 134) উত্তর মদ্র নামে মদ্রদের এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তাহারা হিমালয়ের উত্তর অঞ্চলে উত্তর কুরুর কাছে বাস করিত। পণ্ডিতেরা কাশ্মীরের ভিতরেই উত্তর মদ্রের স্থান নির্দ্দেশ করেন।

রামায়ণে আছে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে মদ্রকও অন্যান্য জাতির ভিতর বানর প্রেরণ করিতেছে। বিষ্ণুপুরাণে আরাম্ পারসিক প্রভৃতি নামের সঙ্গে মদ্রদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণে গান্ধার, যবন প্রভৃতির সহিত মদ্রদের নামের উল্লেখ উক্ত পুরাণেই মদ্ররাজ্যের সকল প্রদেশের রাজা অশ্বপতির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধসাহিত্যের ১৬ টি মহাজনপদের তালিকার ভিতর মদ্রের নামের উল্লেখ নাই। কেহ কেহ মনে করেন বাহ্লিকই মদ্রনামে অভিহিত হইত। মদ্রদের পাঞ্জাবের মধ্যভাগে অবস্থিতি ছিল। চেনাব এবং রাবি

নদীর মধ্যে অবস্থিত শিয়ালকোটই সম্ভবতঃ ছিল এই মদ্রদেশ। (Cambridge History of India. Ancient India pp 549-550) প্রাচীন সাহিত্যে সম্প্রদায়ের মত অনুসারে ভারতবর্ষ নয়খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এই খণ্ডীকরণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জ্যোতিষী পরাশর এবং বরাহ-মিহিরের বিবরণে এবং তাঁহাদের এই বিভাগকেই কয়েক খানি পুরাণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই বিভাগ অনুসারে মদ্রই উত্তরের প্রধান প্রদেশ ছিল। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় মদ্রজাতির উল্লেখ আছে। এলাহাবাদের শিলাস্তম্ভ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, যাদব রাজ্যের পার্শ্বেই ছিল মদ্ররাজ্য। মদ্ররাজ্যের উল্লেখ মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের ভিতর আছে পাণিনির ব্যাকরণের ভিতরেও এই স্থানটির উল্লেখ পাওয়া যায়। (ii. 3. 73 ; iv 4. 7.) মদ্রদেশের রাজধানীর নাম ছিল সাগল বা সাকল। মহাভারতে সাকল নামটিই ব্যবহৃত হইয়াছে (ii. 1196, viii. 2033) জেনারেল কানিংহাম সাহেব সাকলকে রাবির পশ্চিম পূর্ব্বতীর বর্ত্তী সঙ্গল ওয়ালা টিবার সহিত এক বলিয়া মনে করেন।

তিনি বলেন, সাকল এখন পর্য্যন্তও মদ্রদেশ বলিয়া পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে মদ্রদেশের বিস্তৃতি ছিল বিয়াস হইতে ঝেলাম পর্য্যন্ত কিন্তু কেহ কেহ আবার ইহার বিস্তৃতির সীমা নির্দ্দিশ করিয়াছেন বিয়াস হইতে কেবল মাত্র চেনাব অবধি। রিজ ডেভিডস্ বলেন, কানিংহাম মনে করিতেন যে তিনি মদ্রদেশের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্তও সে স্থানটির খনন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং এই প্রদেশটির অবস্থান যে কোথায় ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে সম্ভবতঃ ইহার অবস্থিত ছিল ৩২° উত্তর এবং ৭৪° পূর্ব্বে ভিতর।

চৈণিক পরিব্রাজক হিউয়েন সং যে সাকলতে গিয়াছিলেন হাউ-লিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিখ্যাত পরিব্রাজকটির মতে সাকলের প্রাচীন নগরটির পরিধি ছিল প্রায় ২০ লি। নগরটির প্রাচীর প্রভৃতি ধ্বসিয়া পরিলেও তাহার মূল সৌধের ভিত্তি তখনও বেশ দৃঢ় ছিল। সেই প্রাচীন নগরের ভিতর ৬০০৭ লি পরিমিত স্থান লইয়া একটি সহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাকলতে একটি সঙ্ঘারাম ছিল। এই সঙ্ঘারাম প্রায় একশত ভিক্ষু হীন যান সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিত। এইখানেই বসুবন্ধু বোধিসত্ব সিং আই তাই (পরমার্থ সতী শাস্ত্র) এর সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। মাঠের ধারে প্রায় ২০০ফিট উচ্চ একটি স্তূপ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বুদ্ধ তাহাদের বাণী এইস্থান হইতেই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ইতস্ততঃ বিচরণের চিহ্ন তখনও সেখানে বিদ্যমান ছিল। সঙ্ঘারামের উত্তর পশ্চিম দিকে, ৫।৬ লি দূরে প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ আর একটি স্তূপ ছিল। এই স্তূপটি রাজা অশোক নির্ম্মান করাইয়াছিলেন। এখনেও চারিজন বুদ্ধ তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নূতন রাজধানীর প্রায় ১০ লি উত্তর পূর্ব্বে আরও একটি ২০০ ফিট উচ্চ পাষাণ-নির্ম্মিত স্তূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ স্তূপটিও রাজা অশোকের কীর্ত্তি।

প্রাচীন নগর সাগল-ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র ছিল। সাগলের প্রাকৃতিক অবস্থান ছিল ভারি—সুন্দর সুজলা পর্ব্বত-মেখলা বন-উপবন, হ্রদ,পুকুরে পরিবেষ্টিত। নদী-বন-পাহাড়-ঘেরা স্বর্গোদ্যানের মত ছিল ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। নিপুণ শিল্পীরা ইহার নগর পত্তনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। নগরটি অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। অত্যন্ত দৃঢ় ছিল ইহার দুর্গ-প্রকার এবং প্রবেশ দ্বার। মধ্যমূলে নির্ম্মিত রাজ প্রাসাদের চারিপাশে প্রাচীর এবং প্রাচীরকে বেষ্টন করিয়া ছিল সুগভীর পরিখা। ইহার রাস্তা ঘাট, উদ্যান-বাজার সমস্তই সুগঠিত ছিল। দোকানে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য শোভা পাইত। নানা রকমের শত শত ভিক্ষুকাগার এবং হাজার হাজার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এই সহরটি পরিপূর্ণ ছিল। রাস্তা ঘাটে হস্তী, অশ্ব, নানারকমের যান এবং পায়ে-হাটা পথিকদের চলার কথনও বিরাম ছিল না। পথিকদের ভিতর সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী নারী, ব্রাহ্মণ, অভিজাত-সম্প্রদায়, শিল্পী, কারিকর, ভৃত্য প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরই সন্ধান মিলিত। বিভিন্ন ধর্ম্মের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ট-ব্যক্তিরাও এই সহরে অবস্থান করিতেন। রাস্তা ঘাট ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের অভিনন্দন গানে মুখরিত থাকিত। তাহাতে কোনোরূপ সম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যাইত না। দোকানে বারাণসী মস্‌লিন, কোটাম্বর এবং অন্যান্য নানা রকমের বস্ত্র বিক্রয়ার্থে সজ্জিত থাকিত। বাজারে নানা প্রকারের গন্ধদ্রব্য এবং পুষ্পভার গন্ধবিস্তার করিত এবং তাহা সাজাইয়া রাখিবার ভিতরেও বিক্রেতাদের চমৎকার রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত। স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন, তাম্র এবং প্রস্তুত নির্ম্মিত বাসন এত পর্য্যন্ত পরিমাণে এই সহরে বিক্রয়ার্থে নীত হইত যে সহরটাকে একটা ধন রত্নের মণি-কোঠা বলিয়া মনে হইত। ইহা ছাড়া, শস্য, খাদ্য, পানীয়, মিষ্টান্নের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল এই সহরটি। ধন সম্পদে এই সহরটির একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উত্তর কুরু এবং গৌরবে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দেবতাদের রাজ্য—আলোক-মন্দা। নাগরিকেরা সকলেই ছিলেন উন্নতিশীল এবং ধনী।

সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য এবং পালি জাতক গ্রন্থে মদ্ররা ক্ষত্রিয় জাতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিবাহের আদান প্রদান চলিত গঙ্গার তীরবর্ত্তী রাজ্য সমূহের ক্ষত্রিয় জাতিদের সহিত। কৌরব-রাজ পাণ্ডু-মদ্র রাজ-দুহিতা মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বেও আছে যে, রাজা পরীক্ষিত মাদ্রবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভেই জনমেজয় প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল।

উত্তর ভারতের অনেক বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশই যে মদ্র-রাজ দুহিতাদের পাণি-পীড়নের জন্য উৎসুক ছিলেন জাতকে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। কুশজাতকে আছে, মদ্ররাজার স্বর্গের শরীর ন্যায় অপরূপ রূপবতী সাতটি দুহিতা ছিল। ইহাদের জ্যেষ্ঠার নাম ছিল প্রভাবতী। তাহার দেহ হইতে দ্যুতি বিকীর্ণ হইত। ইক্ষাকুরাজ মদ্র রাজের কাছে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার ধীর পুত্র যুবরাজ কুশের জন্য এই কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। মদ্ররাজ

এ বিবাহে শুভ ফল প্রসব করিবে মনে করিয়া আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। বহুসংখ্যক অনুচর সঙ্গে লইয়া ইক্ষ্বাকুরাজ রাজধানী কুশাবতী পরিত্যাগ করিয়া যথা সময়ে সাগলনগরে উপস্থিত হইলেন। বিপুল সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল এবং তাহার পর প্রভাবতী ইক্ষ্বাকু রাজচ্ছত্র কুশের সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। বিবাহের দ্বারা এইরূপে মদ্র এবং কুশাবতী এই দুইটি সাম্রাজ্য একত্রে মিলিত হইয়াছিল।

ইক্ষ্বাকু রাজপুত্র কুসের সহিত মদ্র-রাজ দুহিতার বিবাহের এই ব্যাপারটার উল্লেখ মহাবস্তু অবদানেও পাওয়া যায়। তবে উভয়ের ঘটনা সন্নিবেশের ভিতর পার্থক্য আছে। মহাবস্তুতে আছে, বারাণসীতে কুশ নামে ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব এক রাজা ছিলেন, তিনি একদিন তাঁহার মাতা অলিন্দা দেবীকে জানাইলেন, তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহার জন্য অলিন্দা সুন্দরী একটি কন্যা আবশ্যক। মন্ত্রীরা সুন্দরী কন্যার অনুসন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে সুরসেনদের রাজা কান্যকুব্জে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মদ্ররাজা মহেন্দ্র তখন রাজত্ব করিতেছিলেন। মন্ত্রীরা একদিন তাঁহার রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া মনে করিলেন ইহাপেক্ষা সুন্দরী আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। সুতরাং তাঁহারা রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রাজাও বারণসীর রাজা কুশের সহিত কন্যাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলে দ্বিধা করিলেন না। কিন্তু রাজা কুশের চেহারা ছিল অত্যন্ত বিশ্রী এবং তাঁহার দেহের অধিকাংশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ছিল বিকৃত। তাঁহার পত্নী সুরসেনা স্বামীকে এইরূপ বিকলাঙ্গ দেখিয়া শ্বশ্রূর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বারাণসী হইতে কান্যকুব্জে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নীকে প্রসাদে দেখিতে না পাইয়া রাজা কুশও ভ্রাতা কুশদ্রুমের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কান্যকুব্জ পত্নীর অনুসরণ করিলেন। শ্বশুরালয়ে পত্নীর নানা প্রকারের মনোরঞ্জনের কাজে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। কখনও তিনি পত্নীর জন্য মাল্য রচনা করিতেন, কখনও বা তিনি কারুকার্য্য খচিত মৃৎপাত্র তৈরী করিয়া পত্নীকে উপহার দিতেন, নানা প্রকারের রত্নালঙ্কার পত্নীর পদতলে পুঞ্জীকৃত হইত। কিন্তু সুরসেনা এই সব উপহারের কিছুই গ্রহণ করিতেন না। ইহার পর রাজা কুশ ভোজনাগারে পাচকের কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং একদিন এমন ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন যে রাজা তাহা ভোজন করিয়া অতিমাত্রায় প্রীতি হইলেন। ইতিমধ্যে নিকটস্থ প্রদেশ সমূহ হইতে সাতজন ক্ষত্রিয় রাজা বিবাহিতা রাজকন্যাকে লাভ করিতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাজা কুশ স্বীয় শক্তিতে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া শ্বশুরের রাজ্য রক্ষা করিলেন এবং পত্নী লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে মদ্ররাজ মহেন্দ্র তাঁহার অন্য সাতটি কন্যাকে পরাজিত সাতটি রাজার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কলিঙ্গ-বোধি জাতকে দেখা যায়, পূর্ব্ব প্রত্যন্ত সীমার কলিঙ্গ রাজবংশের একজন যুবরাজও

মদ্র-রাজ কুমারীর পাণি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। মদ্ররাজ্য সাগল সহরে মদ্র-রাজার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। জ্যোতিষরা গণনা করিয়া বলিলেন, এই কন্যা সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিবেন কিন্তু তাঁহার পুত্র হইবেন একচ্ছত্র সম্রাট। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ এই ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণ করিয়া রাজপুরী ঘেরাও করিলেন। মদ্ররাজ কোনও একটি রাজার সহিত কন্যাকে পরিণত করিয়া অন্যান্য রাজদের ক্রোধ বরণ করিতে সাহসী হইলেন না—তিনি পত্নীকন্যা লইয়া বনে পলায়ন করিলেন। এই বনেই কলিঙ্গের যুবরাজ বাস করিতেছিলেন। একদিন যখন তিনি নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন একগাছি পুষ্পমাল্য তাঁহার কেশে আটকাইয়া গেল। মালা দেখিয়া যুবরাজ মনে করিলেন এমালা নিশ্চয়ই কোন পুষ্প-পেলব তরুণী রচনা। এই তরুণীর অনুসন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। মুগ্ধ প্রেমিক গঙ্গার ধার ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে একদিন একটি সুমধুর সঙ্গীতের অনুসরণ করিয়া দেখিতে পাইলেন একটি সুন্দরী আম্র বৃক্ষের শাখায় বসিয়া গান গাহিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই যে ক্ষত্রিয় কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর সে কথাটা আর তাঁহাদের কাছে অজ্ঞাত রহিল না। উভয়ের গোপনীয় তথ্যগুলিও উভয়েই জানিয়া লইলেন। রাজকুমারী গৃহে ফিরিয়া পিতা মাতার কাছে কলিঙ্গ রাজকুমারের কথা বিবৃত করিলেন এবং তাঁহারা কলিঙ্গ রাজকুমারের হস্তে দুহিতাকে অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। এইরূপে কলিঙ্গ ও মগধের ভিতর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধান্ত জাতকে দেখিতে পাওয়া যায়, বারাণসী এবং মদ্র এই দুই রাজ-পরিবারের ভিতরেও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। মদ্ররাজের প্রধানা মহিষার কন্যা বারাণসীর রাজার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মদ্র-রাজ-দুহিতা চন্দ্রাদেবী কাশীরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে কোনও সন্তান না হওয়ায় রাজা তাঁহাকে পুত্রের জন্য দেবতার কাছে আরাধনা করিতে অনুরোধ করিলেন। রাণী নানা রকমের সৎকার্য্যে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পবিত্রতার জন্য প্রীতি হইয়া শক্র তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। রাজা এবং রাজ্যের আনন্দবর্দ্ধক এক পুত্র সন্তান তাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বিখ্যাত সিংহলী গ্রন্থ মহাবংশে মদ্র-রাজ দুহিতার সহিত পূর্ব্ব ভারতের জনৈক রাজপুত্রের পরিণয়ের কথার উল্লেখ আছে। সীহপুরের রাজা সীহবাহুর মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র সুমিত্ত রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিই মদ্র-রাজ-দুহিতার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মদ্ররা ক্ষত্রিয় জাতির একটি সঙ্ঘরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের অধিনায়কের উপাধি ছিল রাজা। মহাভারতে আছে মদ্ররা কন্যার বিবাহের সময় একটি শুল্ক গ্রহণ করিত। এই শুল্ক গ্রহণটা ছিল তাহাদের পারিবারিক রীতি। বর পক্ষেরা প্রথমে কন্যা পক্ষের কাছে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিত। কৌরবদের যুবরাজ পাণ্ডু স্বয়ম্বরে ভোজরাজ দুহিতার পাণি গ্রহণ করার পর ভীষ্ম পাণ্ডুর আর একটি পত্নীগ্রহণের

অভিলাষ প্রকাশ করেন। এই পত্নী সংগ্রহের জন্য তিনি মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের সমভিব্যহারে মদ্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। তখন মদ্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন বাহ্লিক বংশোদ্ভব শাল্য। ভীষ্ম পাণ্ডুর জন্য তাঁহার নিকট তাঁহার ভগ্নীকে প্রার্থনা করিলেন। শাল্য কহিলেন "হে মহানুভব, আপনার পরিবারের সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আমাদের একটি পারিবারিক প্রথা আছে যে, আমরা বিনা শুল্কে কাহাকেও কন্যার পানি দান করি না। এই প্রথাকে আমি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইব না।" ভীষ্ম শাল্যের কথায় মদ্ররাজকে শুল্ক স্বরূপে এবং কন্যার যৌতুকরূপে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন এবং শাল্যও ভগ্নীকে বহু রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিয়া ভীষ্মের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এই কন্যাকে হস্তিনাপুরে আনিয়া শুভ মুহূর্ত্তে পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডুর নকুল ও সহদেব নামে দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

মহাভারতে মদ্রের বীর রাজা শাল্যের প্রসঙ্গে আরো অনেক কথার উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মদ্ররাজ দূতের নিকট যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সাহাসীপুত্র এবং এক বৃহৎ চমূ লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে বহির্গত হন। তাঁহার সৈন্যেরা প্রায় অর্দ্ধযোজন পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া নানা রকমের অস্ত্র-শস্ত্র এবং বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া যখন কুরুক্ষেত্র অভিমুখে অভিযান করিতেছিল, তখনই দুর্য্যোধন তাঁহার সাহায্য কামনায় মধ্য পথে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

এই অভিনন্দন যাহাতে শল্যের যোগ্য হয় সে জন্য তিনি বহু সভা-সমিতি আমোদ-প্রমোদ এবং পানাহার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিনে। বহুসংখ্যক ভাল কূপ, হ্রদ এবং জলাশয় খনিত হইয়াছিল। শল্য দুর্যোধনের এই ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর প্রর্থনা করিতে অনুরোধ করিলে দুর্যোধন আসন্ন প্রায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য প্রর্থনা করেন। শাল্য তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির সমস্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিনা, কিন্তু আপনার কাছে আমারও একটি প্রর্থনা আছে, সে প্রর্থনা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। যখন কর্ণ এবং অর্জ্জুনে যুদ্ধ বাধিবে, কর্ণের সারথীরূপে আপনাকে অর্জ্জুনের রক্ষা ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" শাল্যরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সসৈন্যে দুর্যোধনের শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, শাল্যের সৈন্য বল ছিল—১০৯, ৩৫০ পদাতিক, ৬৫, ৩১০ অশ্বারোহী, ২১, ৮৭০, রথী এবং ২১, ৮৭০ জন হস্তী-যোদ্ধা। শাল্যের রথের সম্মুখে স্বর্ণলাঙ্গল শোভা পাইত।

যুদ্ধ গমনের পূর্ব্বে নৃপতিরা স্নান করিয়া শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিতেন। তাহার পর অগ্নির উপাসনা করিয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন। মদ্ররাজ শল্য দুর্যোধনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের

সৈন্যের বাম পার্শ্ব রক্ষা করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবদের দ্বারা পরাজিত হইয়া দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের অগ্রগতি বন্ধ করিবার জন্য শল্যের কাছে করুণ ভাবে প্রর্থনা করিতে দেখা যায়। এই প্রার্থনানুসারে মদ্ররাজ রথে আরোহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার সৈন্যদল আক্রমণ করেণ। তিনি শল্যকে দশজনের দ্বারা বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, নকুল এবং সহদেব তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন সাত বাণের দ্বারা। মদ্ররাজ শল্য প্রত্যুত্তরে প্রত্যেককে প্রথমে তিনি বানের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করেন ৬০ বানের দ্বারা। এইরূপে যুধিষ্টির এবং মাদ্রী যখন শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরিক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভীম আবার সেখানে উপস্থিত হইয়া ভীষণভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। অবশেষে মদ্র-সৈন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

যে সাবিত্রী ও সত্যবানের কহিনী সমস্ত ভারতবর্ষের লোকের কাছে সুপরিচিত তাহাও এই মদ্রদেশের সঙ্গেই সংযুক্ত। মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে, অশ্বপতি পুত্রের কামনায় নানাবিধ ব্রত পালন করিয়া ছিলেন। তিনি সন্তান কামনায় সাবিত্রীর উপাসনা করেন, সাবিত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর প্রর্থনা করিতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার নিকট সন্তানের যাজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার পাটরাণী মালবীর গর্ভে তাহার এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই কন্যার নাম রাখা হইল সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সত্যবানকে স্বামীরূপে মনোয়ন করিলেন। সত্যবান অল্পায়ু বলিয়া নারদ এই বিবাহে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাবিত্রী সঙ্কল্প-চ্যুতা হইলেন না। বিবাহের কিছুদিন পরে সত্যবান সাবিত্রীর কোলে দেহ ত্যাগ করিলেন। যম যখন সত্যবানের মৃতদেহ গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করিলেন, তখন সাবিত্রী যমের অনুসরণ করিয়া নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে স্বামীর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। সাবিত্রী একশত পুত্রের জননী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতার ঔরসেও একশত পুত্রজন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (মহাভারত বনপর্ব্ব, অধ্যায়, ২৩১—২৯৮)

ইতিহাসে দেখা যায় সাকল সহরে সেকন্দরের পৌরব বংশে এক রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তাহার নাম ছিল পৌরব এবং তাহার রাজ্য ঝেলাম এবং চেনাব নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। রাজাকে পরাজিত করিয়া সেকেন্দর তাহার আত্মীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্রাজ্যভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এ ইসব ঐতিহাসিক তথ্য হইতে সহজেই এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে,মদ্র-রাজারা নিজেদের পুরু-বংশোদ্ভব বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের রাজ্য ও রাজধানী সাকল দুইবার যবনের হস্তে পতিত হইয়াছিল—একবার সেকন্দরের সময় এবং আর একবার তঁহার উরাধিকারী মিনন্দারের সময়। পরবর্ত্তীকালে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে, সাকল পুনর্বার মিহিরকুলের রাজধানীতে পরিণত হয়।

চেষ্টা এবং যত্নতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম ভারতে তখন রাজত্ব করিতেছিলেন শক্তিশালী গ্রীক রাজা মেনন্দার বা মিলিন্দ। তিনিও বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিস্তারের যুগে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মিলিন্দ ছিলেন সাকল বা সাগলর রাজা। মিলিন্দ-পন্‌হোর ভাষায় বলিতে গেলে তিনি শিক্ষিত, বাগ্মী জ্ঞানবান এবং অত্যন্ত কৃতি রাজা ছিলেন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে তাঁহার নিজের রচিত ধর্ম্মভাষায় যে সমস্ত পূজা অর্চ্চনা বা যাগযজ্ঞের নির্দ্দেশ তাহাতে কোনও প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিবার অবকাশ না দিয়া সেগুলি তিনি যথাযথ নিয়মে ঠিক সময়ে প্রতি-পালন করিতেন। নানাপ্রকার শিল্প বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় রীতিনীতি, আইন কাহুন তাঁহার অধিগত ছিল। সাঙ্খ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, দর্শন, পাটিগণিত, সঙ্গীত, ভেষজ বিদ্যা, যুদ্ধ শাস্ত্র, কবিতা সমস্তই তিনি জানিতেন। এক কথায় ১৯ প্রকার শিল্পের কোনটিই তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার রাজত্বে উৎপীড়ন কাহাকেও কখনও সহ্য করিতে হয় নাই কারণ প্রজাদের শত্রুকে সর্ব্বদা দমন করিয়া রাখা হইত। নাগসেনের সহিত পুনর্জন্ম, আত্মা, অহং প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া তাঁহার তর্ক বিতর্কের অন্ত ছিল না। এই সব যুক্তি তর্ক পালি-বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দ পন্‌হোতে-লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

এমন কি এই রাজাটির পূর্ব্বেও সাকল বুদ্ধপ্রভাবের আওতায় আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রথম যুগের ভ্রাতা-ভগ্নীদের গাথায় পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের কেহ কেহ মদ্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। ভদ্রাকপিলানী সাগলের কেশীয় সম্প্রদায়ের কোনও ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অবদানের মতে এই সাগলই ছিল মদ্রদের রাজধানী। তিনি এবং তাঁহার স্বামী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে থেরী হইয়াছিলেন। (Psalms Of Sisters, p. 48). থেরীগাথা আছে এই রমণী মদ্রদেশের সাগল নামক স্থানে কোশীয় গোত্রের কোনও ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (Psalms of the Bre-thren, p. 354).

মদ্ররা সমুদ্রগুপ্তকে যে কর দিয়াছে শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শিলালিপিতে আছে, মদ্র এবং অন্যান্য সকলে কর প্রদান, আদেশ পালন এবং অভিবাদন করা প্রভৃতি ব্যাপারে সমুদ্রগুপ্তের আদেশও শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার ভারত আগমনের সময় উত্তর পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল তাহার বেশ বিস্তৃত বিবরণই পাওয়া যায়। তাঁহার বিবরণেই আছে যে, মদ্রদেশ হূনরাজা মিহিরকুলের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, কয়েক শতাব্দী আগে মো-হি-লো-কিউ-লো, (মিহির কুল) যিনি এই সাকল সহরের অধিপতি ছিলেন তিনি ভারতবর্ষকেও শাসন করিয়াছেন। তিনি ক্ষিপ্রবুদ্ধি এবং স্বভাবতঃ সাহসী পুরুষ ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী সমস্তগুলি প্রদেশই তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। একদা অবসর সময়ে তিনি বুদ্ধের

অনুশাসন গুলি যুক্তির মাপ কাঠিতে ফেলিয়া যাচাই করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষুদের ভিতর হইতে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভিক্ষুকে তাহার সহিত তর্কে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুকদের কাহারও রাজার সহিত তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সাহস ছিল না। এই সময়ে একজন বৃদ্ধ রাজ পরিবারে ভৃত্যরূপে অবস্থান করিতেছিল। সে অনেকদিন ভিক্ষু ছিল এবং যে সময়ে তাহার বাগ্মিতা এবং আলোচনা শক্তির ও যথেষ্ট খ্যাতি রটিয়াছিল। রাজার প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য ভিক্ষুরা তাহাকেই প্রেরণ করিলেন। এই ব্যাপারে রাজার পুরোহিতদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত পুরোহিতকে, এবং বুদ্ধের সমস্ত অনুশসনকে ধ্বংস করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

মগধে রাজা বালাদিত্য মিহিরকুলের এই পাশহিক অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কর প্রদানে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি নিজের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত করিয়া লইতে ও বিস্মৃত হইলেন না। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে মিহিরকুল তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন তিনি পলাইয়া সমুদ্রের ভিতর দ্বীপে আশ্রয় করিলেন। তাঁহার সৈন্যেরাও তাঁহার অনুসরণ করিল। মিহিরকুল কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সৈন্যদের ভার অর্পণ করিয়া বালাদিত্যকে আক্রমণ করিবার জন্য সমুদ্রে পাড়ি জমাইলেন কিন্তু যুদ্ধে তাঁহারই পরাজয় হইল, তিনি বালাদিত্যের সৈন্যদের হাতে বন্দী হইলেন। পরাজয়ের লজ্জা মিহির কুলকে এরূপভাবে অতিভূত করিয়া ফেলিল যে তিনি তাঁহার পোষাকের প্রান্ত দিয়া মুখ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে বালাদিত্যের মায়ের সন্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। এই মায়ের অনুরোধেই তিনি মুখ হইতে বস্ত্রখণ্ড অপসারিত করিয়াছিলেন। বালাদিত্য জননীর আদেশে মিহির কুলের সহিত একটি সুন্দরী রমণীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহার পর মিহিরকুল স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে তাহার ভ্রাতা সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তিনি সেখান হইতে কাশ্মীরে গমন করিলেন। কাশ্মীরের রাজাও তাহাকে বহু সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে এই রাজাকে হত্যা করিয়া তিনি কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার পর গান্ধারের বিরুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্র সুরু হয়। তিনি রাজ পরিবারের সমস্ত লোক এবং প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিয়া, স্তূপ এবং সঙ্ঘরাম গুলিকে ধ্বংসের ধূলিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তাহার পর এই বিধ্বস্ত প্রদেশ হইতে ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া তিনি সসৈন্যে স্বরাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চীন পরিব্রাজকের বর্ণণায় পাওয়া যায় যে তিনি এক হাজার ছয় শত স্তূপ ও মঠ ধ্বংস এবং নয় কোটি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীকে হত্যা করিয়াছিলেন।

মদ্ররাজ সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল। এই সময়ে বাংলার রাজা ধর্ম্মপাল মদ্র এবং অন্যান্য উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের সহায়তায় পঞ্চালের ইন্দ্ররাজকে সিংহাসন চ্যুত করিয়াছিলেন। ডাঃ শ্রীবিমলচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ ডি।

মুর্শীদ্দ্যা গান

মাঁঝির গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

আমি কত অপরাধ কইরাছি
দয়াল তোমার রাঙা পায়।
অফর বেলায় নৈলাম পাড়ী
দিক না ঠিক করতে রে পারি
তুফান দেখে লাগল চমৎকার
ও তুই বল দেখিরে ও শানাল চান
আমার হবে কি উপায় ;
আমি কত অপরাধ কৈর‍্যাছি
দয়াল তোমার রাঙা পায়।
যত ছিল বালাম নায়া
তারা গ্যাল বাটীরে বায়্যা—
আমি রইলাল নি গঙ্গার পাথারে
ও তুই বল দেখিরে ইত্যাদি
যত ছিল উজান নায়্যা
তারা গ্যাল গো-পেরে বায়্যা—
আমি রইলাম তোমার চরণ চায়্যা—
নিদানের ভরসারে শানাল চাণ হাল ধরিয়া কর পার,
আমি কত অপরাধ ইত্যাদি।
দাঁড়ী মাল্লা ছয়জন
তারা, কাইন্দ্যা হৈল অচেতন
হারে মাঁঝি যেন ছাড়েলা হাইলের শলা,
নিদানের ভরসারে ইত্যাদি

অফর বেলা = অবেলা, গোপে = যেখানে জল অনেকটা স্থলের ভিতর গিয়াছে. এইসব জায়গায় তুফানের ভয় কম থাকে। দাঁড়ী যারা দাঁড় বায়, মাল্লা = যারা

(৭)

নাও আমার চলে না ঠেকাল বালুর চরে।
নয়্যা নাও লয়ে আইলাম রে আমার গুরুধন
ও নাও বায়্যা ক'রলাম রে সারা ;
চণ্ডী পাট ছুটল নৌকার রে
ও নৌকার ছুটল সর্ব্ব জোড়ারে ৷
নয়্যা নাও লয়ে আইলা-মরে আমার গুরুধন
নায় উড়্যায়্যারে ডুবল বানাদ—
মনের দোষে হারা হৈলাম রে
গুরু আমি পঞ্চ রত্ন সোণারে।
কায়াত কাণ্ডারীরে আমার গুরুধন
শকুন তার যে ভাণ্ডারী—
বনের শৃগাল বলে
গুরু আমি ও ডিঙ্গার বেপারীরে।

চণ্ডীপাট—ছই ওয়ালা নৌকার দুইধারের মাথা কাটের সাথে দুইখানা তক্তা বসান থাকে। ইহার উদ্দেশ্য যেন ঢেউএর জল সহজে নৌকার ভিতরে আসিতে না পারে।

পঞ্চরত্ন বোধ হয় শান্ত দাস্যাদি পঞ্চরস কায়াত কাণ্ডারী............বেপারী ৪নং গানের টীকা দ্রষ্টব্য।

(৮)

আরে ও—রঙীলা নার মাঝি
তুমি এই ঘাটে লাগায়্যা নাও
নিঘুম কথা কয়ে যাও শুনি।
শ্রীগুরুর বানাইন্যা নৌকা আগে পত্তন দাড়া,
ছন্দে বন্দে গ'ড়ছে নৌকা বন্দে বন্দে জোড়া ॥
শ্রীগুরুর বানাইন্যা নৌকা শুকনা দিয়া চলে
চাইর দাঁড়েতে চলচে নৌকা গোলোইতি মাণিক জ্বলে।
মাঝি পাগল মাল্লা পাগল পাগল তার বেপারী
চার পাগলে বুক্তি কইরে ডুবায় সাধের তরী।

এখানে মানব দেহকে নৌকার সাথে তুলনা করা হইয়াছে। দুই হাত ও দুই পা এই চার দাঁড়ে নৌকা চলিতেছে। ইহার 'গোলোইতি' দুই চক্ষু-মাণীক জ্বলিতেছে। কবি এই রঙীলা নার মাঝিকে ডাকিয়া নিঘুম কথা শুনিবার চাহিতেছে। আর বলিতেছে তাহার দেহ নৌকার

মাঝি ও মাল্লা সকলেই পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তারা কখন যে যুক্তি করিয়া সাধের তরিকে ডুবাইয়া দিবে তার ঠিক নাই। এই গান তিনটী ফরিদপুর জেলার রসুলপুর গ্রামের জনৈক মিস্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি।

(৯)

আমার হ্যালে লৌকারে বাই বাই—
ডোালে লৌকারে বাই
ডোালে লৌকা ও আল্লার বাতাসে বাইরে।
আমার আল্লা বিনেরে বাই বাই
আসল বিনেরে বাই
ইরে বাইরে আর ত লক্ষরে নাই।
আমি আটক রইলাম রে বাই বাই
বন্ধক রইলামরে বাই
হারে আমার আর ত লক্ষরে নাই।

গায়ক—কোর মান ফকীর, বয়স ৫০
উজান চর, ফরিদপুর।

এই গানের সুরখানি নৌকাচলার তাল বেশ মিলিয়া যায় হ্যালে হেলিয়া পড়ে। ডোালে দোলে। গায়ক যাহার নিকট হইতে এই গান সংগ্রহ করা হইয়াছে।

মুনার গান

মনকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া ভগবানের পথে দাঁড় করান এই সব গানের উদ্দেশ্য। ইহা ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনার উদ্বোধনের মত। মনের সমস্ত 'জঞ্জাল' সমস্ত দুর্দ্দশার কথা এই গানে আমরা পাই। প্রত্যেক বৈঠকে প্রথমে বন্দনা গান গাওয়ার পর এই মুনার গান গাওয়া হয়। যখন গানে ভাব জাগিয়া উঠে তখন 'উদাসীন গান হয় গাহিতে হয়।

(১০)

ও মনা বলেরে
কিব্যা খাইলাম কিব্যানা লইলাম
আমি কি লয়্যা তোর ভবে আইলাম রে
ও মনা কান্দেরে
কি ধন লয়্যা যাবা ভব বাড়ীরে মনা বলেরে।

ও মনা বলেরে

আমি না ভজিলাম মাতারে পিতা

না ভজিলাম রাম সীতারে

ও মনা কান্দেরে

আমি না ভজিলাম শ্রীগুরুর চরণ রে মনা বলেরে।

ও মনা বলে রে

জবা পুষ্প লয়্যানা হাতে

আমি খাড়া আছি রাজপথেরে

ও মনা বলে রে

দিব জবা শানালের চরণেরে মনা কান্দেরে।

ও মনা বলি রে

যেনা ঘাটে ওলার মেলা

সেই না ঘাটে ছান্দ গোলারে

ব্যাসাত কইরো চৈতন্যের বাজারেরে মনা বলি রে।

ও মনা কান্দে রে

আমার পশু জনম ছিল না ভাল

মানব জনম বৃথা গ্যাল রে

ও মনা কান্দে রে

পশু হইলে যাইতাম বৃন্দাবনরে মনা কান্দেরে।

গায়ক বুধাই ফকীর বয়স—৪০

গোবিন্দপুর, ফরিদপুর।

ওলার মেলা=যেখানে খুব লোকজন আছে। ব্যাসাত=সম্পত্তি। কিব্যা না লইলাম কিই বা না লইলাম এখানে যে ঘাটে বহুলোক সেইখানে মনকে 'গোলা ছানিবার' উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তার সম্পত্তি যেন টাকা পয়সার দেশে না হয়। চৈতন্যের বাজারে তাকে 'ব্যাসাত' করিতে হইবে। তাই সত্যিকার বৈষ্ণবেরই মত মনা কান্দিতেছে মানুষ জনম তার বৃথা গেল, তার পশু জনমই ভাল ছিল। কারণ পশু হইলে সে বৃন্দাবন যাইতে পারিত।

(১১)

তোর উজান বাঁকে তিরপিনীর চৌকীদার হে

তোরে ডাকেরে—ও ভাই মনা রে।

ও ভাই মনা রে

তুমি বিনা বাঁশে বানাইও নড়ি, বিনা পাটে পাহাইও দড়ি

তুমি বিনা কাষ্ঠে বাইও সাধের তরি ও ভাই মনারে।

ও ভাইমনা রে।

বিনা ধানে ভাজিও খই, বিনা দুধে পাতিও দই রে
বিনা দুগ্ধে খাইও ভাল ননী ও ভাই মনা রে।

ও ভাই মনা রে।

যেখানে চুচুড়্যার ধার, সেইখানে বালুয়ার চররে
তুমি বাইও নৌকা গহীন গন্ত দিয়া ও ভাই মনারে।

গায়ক—জনৈক ফকীর

তৃপিনী—বক্ষস্থলে যেখানে নিশ্বাসের সাথে সমস্ত রক্ত আসিয়া আবার ফিরিয়া যায়। সাধকের বিশ্বাস এই ঘাটে সোনার মানুষ ভগবান 'বিহার করেন।' একটী প্রাচীন গানে আছে—

"সেই যে মানুষ ঘোরে ফেরে ও তৃপিনীতে উজান ধরে।"

বাঁকে—নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। তাহার এক একটী বাঁকা অংশকে নদীর বাঁক কহে। উজান বাঁকের তৃপিনীর চৌকীদার আজ মনকে ডাকিয়াছে। তার কাছে যাইতে হইলে সত্যিকার ধর্ম্মজীবন লইয়াই মনকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই বিনা বাঁশে তাকে নড়ী বানাইতে হইবে, বিনা কাষ্ঠে তাকে তরি গড়াইয়া বাইতে হইবে অর্থাৎ বাহিরের সমস্ত সহায় সম্বল তাকে ত্যাগ করিয়া অন্তরের শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিতে হইবে। তাকে বিনা দুধে ক্ষীর ননী খাইতে হইবে অর্থাৎ spiritual খাদ্য তাকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি চুচুড়্যার ধার—যেখানে অল্প জলের নীচে বালুর চর আছে সেখানকার স্রোত, মানুষের বাহির দেখিলেই তার ভিতরকার খবর অনেকটা জানা যায়। তাই যার অন্তর গভীর তার সাথেই মনকে কারবার করিতে হইবে। চাচুড়ের ধার—যেখান সেখান দিয়া যেন মন মাঝি তার তরিখানি বাহিয়া না যায়। 'গহীন-গন্ত' অর্থাৎ গভীর জল যেখানে মন যেন তার তরি সেখান দিয়াই বাহিয়া যায়।

জসীম উদ্‌দীন।

ক্রমশঃ

কবি গিরীন্দ্রমোহিনী।

মৃত্যু প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ ঘটায় কিন্তু বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে কি? বরঞ্চ করাল কাল যখন আমাদের ভালবাসার সামগ্রীকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে দর্শন স্পর্শনের অতীত করিয়া তোলে, তখন চর্ম্ম চক্ষের অনায়ত্ত সেই প্রিয়রূপ আমাদের মর্ম্ম দৃষ্টিতে অধিকতর সমুজ্জল হইয়া ওঠে। বাহিরে হারাইয়া অন্তরে তখন আমরা পূর্ণ মিলন অনুভব করি।

কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত আমার মিলন পাতানো ছিল। মানুষে মানুষে মনের মিলন এখন কদাচিৎ ঘটে। যে সুন্দর মনোমোহন রূপে তিনি আমাকে ধরা দিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণও সকলে তাঁহাকে সে রূপে দেখিয়াছেন কিনা জানি না। কারণ সমাজের বাহিরে মুক্ত সখ্যতার নির্ম্মল আলোকে আমি দেখিয়াছি, কবি হৃদয়ের খোলসহীন যে সৌন্দর্য্যটুকু,—সমাজের বেড়া সংস্কারের বেড়া, স্বার্থ সংঘর্ষনের বেড়ার ভিতর দিয়া নিকটের লোকের নয়নে তাহা সহসা না পড়িবারই কথা। আটে ঘাটে বাঁধা সেকালের সংস্কারে লালিত-পালিত হইয়াও স্বাধীন বিচার শক্তির অভাব তাঁহাতে দেখি নাই; তাহার চিন্তার পরিসর ছিল, প্রকৃতই মুক্ত, উদার। বলিতে কি সংকীর্ণতার ভাববন্ধের মধ্যে কোনো দিনই আমাদের মতবিচ্ছেদ ঘটে নাই। তাই বুঝি আমাদের সখ্যতা সম্বন্ধ এমন মধুর এমন স্থায়ী হইয়াছিল। মিলন-দিনে আমরা কি আনন্দই না উপভোগ করিতাম। দেখা হইলেই নীরব উল্লাসিত দৃষ্টিতে উভয়ের প্রাণ যেন কোলাকুলি করিয়া উঠিত। তাহার পর তাঁহার পালায় তিনি আমার হাত ধরিয়া সাগ্রহ-সমাদরে পালঙ্ক একখানির উপর বসাইতেন, আর আমার পালাতে আমিও সেইরূপ সাদর যত্নে তাঁহাকে বাহু পাশে আবদ্ধ করিয়া আমার ঘরের শ্রেষ্ঠ শোফাসনের উপর তাঁহার শুভ প্রতিষ্ঠা করিতাম। অতঃপর মুখোমুখি হইয়া বসিবামাত্র দুজনের অদর্শন কালের মনের চাপা উৎস খুলিয়া যাইত। কত না রঙ্গরস রহস্যে, কত না গোপন মনের কথায়, প্রকাশ্য সুখ দুঃখ কাহিনীতে, সমাজ এবং কাব্য সমালোচনায় দিবসের আলো ক্রমশ যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘনীভূত হইয়া পড়িত তখনো কিন্তু আমাদের কথা ফুরাইত না; বিদায় লইতে মন চাহিত না।

আজ আমার প্রিয়সখী গিরীন্দ্রমোহিনী এ লোকে নাই, আমাদের সে সুখ মিলনের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে এখন শুধু তাঁহার প্রীতি-মধুর স্মৃতি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপের ন্যায় দর্শন আশা-রহিত আমার চিত্তে অচঞ্চল রূপলালিত্যে বিরাজিত রহিল।

কবিতারি সুরছন্দে আমাদের সখ্যতা অঙ্কুরিত এবং বিকশিত হইয়াছিল।

সে আজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা; তখন আমরা থাকিতাম শ্যামবাজার অঞ্চলে কাশিয়া-বাগান বাগান-বাটীতে। সবে মাত্র সেই বৎসর ১২৯১ সালে আমি ভারতীর সম্পাদন ভার

গ্রহণ করিয়াছি, শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ একদিন এখানে আসিয়া একটি কবিতা আমাকে দিয়া বলিলেন, "কবিতাটি অক্রুব দত্তের বাড়ীর একটি অন্তঃপুরিকার রচনা। লেখাটি ভালই হয়েছে, ভারতীতে দিও।

তাঁহার বন্ধু ৺গোবিন্দ দত্ত ভারতীকে প্রকাশ জন্য কবিতাটি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। গিরিন্দ্রমোহিনীর সেই কবিতাটিই ভারতীতে সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ইঁহার কবিতাহার এবং ভারত কুসুম গ্রন্থাকারে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রথম পুস্তক কবিতাহার বাহির হয় ১২৭৯ সালে তাঁহার বয়স যখন ১৪ বৎসর।

বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে তখন কবিতা হারের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভারতকুসুমের সমালোচনা ১২৯৩ সালের ভারতীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভারতকুসুম। বইখানি একজন হিন্দুমহিলা প্রণীত।

হৃদয়ের উচ্ছাসে পূর্ণ ছোট ছোট কয়েকটি কবিতায় এই বইখানি শেষ হইয়াছে। ইহাতে যে দোষ নাই এমন নহে কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন সুন্দর জিনিষ আছে তাহা পড়িলে দোষের দিকে আরত ত লক্ষ্য থাকেনা। কেবল তাহা নয় যখন দেখা যায় কবিতাগুলি লেখিবার কত অল্পবয়সের লেখা তখন অনেকটা আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং ভবিষ্যতে কবির প্রতিভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ থাকে না। নিম্নে একটি কবিতা উঠাইয়া দিতেছি।

নিশীথে বংশীধ্বনি।

কেন প্রাণ কাঁদে বাঁশি! ও তোর মধুর তানে?
উদাস হইল প্রাণ তোর স্বর পশি কাণে!
নাহিত মুরলী ধারী, নাহি রাধা ব্রজেশ্বরী,
তবে কেন চিতহারা মন নাহি গৃহপানে।
মাতিল মোহিল প্রাণ কাঁদিল কেন কে জানে?
ইচ্ছা হয় পাখী হয়ে গৃহ ত্যজি যাই, ।
কৌমুদী হসিতাকাশে উড়িয়া বেড়াই!
বাঁশির সুরেতে মিশি বিচরি নীল আকাশে।

বয়স সম্বন্ধে দেখিতেছি অন্যান্য মহিলালেখকদিগকে তিনি হার মানাইয়াছেন অন্ততঃ আমি নিজের দিক হইতে বলিতে পারি, দীপনির্ব্বাণ যখন প্রকাশিত হয় তখন আমার বয়স ছিল আঠারো।

সরসী জলে শশী

কি দেখাও সরসী!
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগণের শশী!
আনন্দ লহরী মেখে গরবে উঠিছ কেঁপে,
হাসিতেছ টিপি টিপি সোহাগের হাসি!
ভাবিছ অমন চাঁদ আর আছে কার?
সুধামুখে হাসি রাশি ঝরে অনিবার!
হয়ো না সরসি তুমি মত্ত অহঙ্কারে,
ঐ দেখ মাতৃ অঙ্কে শিশু শোভা ধরে!
তব চাঁদ মুখে শশি কলঙ্কের দাগ!
মোদের চাঁদের মুখে নব অনুরাগ!
তব চাঁদ দিবা রাতি ভাতি না বিকাশে;
আমাদের অঙ্কে চাঁদ দিবানিশি হাসে।
শুধু সুধা, সরসিগো তব চাঁদ ধরে
আমাদের চাঁদ হাসে মধু ঝরে মধুভাষে
আধো আধো স্বরে।

কবিতাহার রচয়িত্রী।

ইহার পর ক্রমশ ভারতীর পাতে তাঁহার নানা ভাবের নানারূপ লেখা বাহির হইতে লাগিল এবং যথা সময়ে সে গুলি পুস্তক বদ্ধ হইয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়া ছিল।

আমি ১২২০ সাল যখন ভারতীর সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করি সেই সময় মিলন কথা নামক প্রবন্ধের একস্থলে তিনি বলিয়াছেন,—ভারতী প্রকাশ জন্য আমার গ্রাম্য ছবি নামক প্রবন্ধটি পাঠাইয়া ভাবিয়া ছিলাম,—ভারতী সম্পাদিকা কখনই সেটি মনোনীত করিবেন না? কিন্তু খুব আদরের সহিতই তাহা গৃহীত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রাজ-নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন—ভারতীর প্রকাশিত গ্রাম্যছবি পড়িয়াই আমি তপোবন লিখিয়াছি।

এই সকল কথা অমি সম্পাদিকার পত্রেই জানিতে পারে। কত রকমে তিনি যে আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন তাহা বলিবার নয়।

ভারতী সম্পদিকরে কোমল করে বলয়ের মিষ্ট মধুর আহ্বানধ্বনিই চিরমুখরিত হইত, কখনো সে হস্ত সমালোচনায় কঠোর আঘাতে নবীন সেই লেখকের নষ্ট করে নাই।" ইত্যাদি।

স্বাভাবিক বিনয়ভাব হইতেই যে কবি নিজের গুণপনা খর্ব্ব করিয়া দেখিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী কি গ্রাম্য কবিতা হইতে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

পাড়া গাঁ

রোদ উঠেছে ফুল ফুটেছে,
ঘাসে শিশির মেলা,
চুপড়ি হাতে,   যায় ক্ষেতেতে
প্রাতে কৃষক বালা।
শীতের প্রভাত,   নয় প্রতিভাত,
কুয়ার ধোঁয়ায় ঢাকা—
সুদুর দূরে,   নাই কিছুরে
কেবলি ধূম মাখা।
তুলছে খুঁটী,   কলাই শুঁটী
ক্ষেতের মাঝে বসে,
বালক রবির,   সোনার কিরণ
গায় পড়েছে এসে।
ছোট ছোট   হলুদে ফুলে
শর্ষের ক্ষেত আলা,
পূরব ধারে   মেঘের শিরে,
রাঙা সোণার থালা!
পথের ধারে   বিলের তীরে
বক শাদা শাদা,
খেজুর গাছের   গলার কাছে
কলসীগুলি বাঁধা।
কুঁড়ের পিছে   তালের গাছে
বাবুই বাসার সার—
কি চাতুরী   কারিগিরি
মানুষ মানে হারে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

গার্হস্থ্য চিত্র।

ফুট্‌ফুটে জোছনায়, ধব্‌ধবে আঙ্গিনায়
একখানি মাছুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,

শাদা শাদা মুখ তুলি, যুঁই শেফালিকাগুলি,
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে।
প্রাচীরেতে সুশোভিতা, রাধিকা ঝুম্‌কালতা,
দুলিতেছে চন্দ্র করে নেয়ে।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়, বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল!
প্রশান্ত মুখের পরে, কালোকেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু-ঢুল্!
মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
গায় ঘুম পাড়ানিয়া, গান।
মোহিয়া সুস্বর ভাযে, আকুল বিভুল বাসে
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী তান।
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সেই রূপরাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে,
ছেলে ডাকে 'আয়চাঁদ', মা বলিছে 'আয় চাঁদ
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা, নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে।
শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

গ্রাম্য ছবি বা জন্মভূমি

মাটীতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর
সমুখেতে মাটীর উঠান,
খড়ো চালা-খানি ছাঁটা, লতিয়া কদ্দুলালতা,
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
পিঞ্জিরায় বদ্ধ বাঁধা, বউ কথা, কহে কথা,
বিড়ালটী শুইয়া দাবাতে,
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা!
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে,
কানে দুল্, দুল দুল (গাছ ভরা পাকাকুল।)
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটী বোনে,

ছোট হাতে জোর করে   শাখাটী নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে, হাত লয় টেনে !
পুকুরে নির্ম্মল জল,   ঘেরা কল্‌সির দল,
হাঁস দুটী করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশ বন ।
শূন্য জন-কোলাহল,   কিচি মিচি পাখীদল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন্‌,
রোদটুকু সোনার বরণ ।
লুটায় চুলের গোছা   বালা দুটী হাতে গোঁজা
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে ।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,   গ্রাম্য মাঠে গরু চরে,
তরুতলে রাখাল শয়ান ;
সরু মেঠের রাস্তা দিয়ে,   পথিক চলেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান্‌,
আজি এই দ্বিপ্রহরে,   বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে,
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান্‌,
সুধাময়ী জন্মভূমি,   তেমনি আছ কি তুমি,
শান্তিমাখা স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাণ ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ।

আজিকার প্রবন্ধে কবির কাব্য সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবুও প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখার প্রধান আকর্ষণ ইহার অকৃত্রিম সরলতা। সরল ভাষায়, সরল ছাঁদে, নিজস্ব ভাবে গড়া সরল চিত্রকলার উপর তিনি তাঁহার প্রতিভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আজকাল কার দিনে নব লেখকদিগের অধিকাংশ কবিতাই, ছন্দোবন্ধে, ভাবায়ভাবে রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বল অথবা প্রশাস্ত অনুকরণ। গিরীন্দ্র মোহিনীর কবিতায় ভাষার ঘনঘটা নাই, ছন্দোবন্ধেও আধুনিক কারি কুরির অভাব তবুও সে রূপে মন মজিয়া যায়, কারণ তাহা খাঁটি জিনিষ, স্বাভাবিক ভাবপটুতাতে তাহা মনোরম।

দুই একটী কবিতা ভারতীতে ছাপা হইবার পর—কবির সঙ্কোচ বাঁধ অনেকটা টুটিয়া আসিল। ক্রমশঃ আমাদের পত্র লেখালেখি আরম্ভ হইল,—এবং যেমন হইয়া থাকে চিঠিতে চিঠিতে আমাদের ভাবটা বেশ জমাট বাঁধিয়া গেল। দুঃখের বিষয় সে সব চিঠিপত্র

আমরা ধরিয়া রাখ নাই রাখিলে, সে কালের সখী প্রণয় কাহিনী একাল খুব সম্ভব উপন্যাসের ন্যায়ই সমাদৃত হইত। সে যাক্ গতের অনুশোচনা বৃথা।

কিন্তু লেখালেখিতেই আর ত মন বাঁধে না দেখাশুনার জন্য আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখন উপায়! গিরীন্দ্রমোহন তখনো একরূপ অসূর্য্যম্পশ্য শাস্ত্র অন্তঃপুরিকা বিশেষ অল্প দিন তিনি বিধবা হইয়াছেন, স্বামীকে তিনি তাঁহার প্রাণের যে ইচ্ছা সহজেই জানাইতে পারিতেন; বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট তাহা প্রকাশে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে হইল, এই প্রস্তাবে খুব সম্ভব উঁহাদিগকে ক্ষুণ্ণ ব্যথিত করিয়া তুলিবে।

কাজেই মনের ইচ্ছা আমাদের মনেই তখন চাপিয়া রাখিতে হইল। অবশ্য আমি অপেধাকৃত স্বাধীন। তিনি আমার বাড়ী নাই আসুন আমি যদি দত্তবাড়ীর অন্তঃপুরে যাইতাম তাহা হইলে কি কেহ আমার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইতেন? তাহাত আর নহে। কিন্তু এখানে সমাজ সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। তিনি এখানে আসিবেন না আর আমি সেখানে যাইব ইহা স্বামী অপমান জনক জ্ঞান করিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রাণেও সখীর এই সম্ভাবিত অপমান সাড়া দিয়া উঠিল! অতএব এ কথা এইখানেই চুকিয়া গেল; খাঁচার পাখীর সহিত বনের পাখীর আর তখন চাক্ষুষ মিলন হইল না।

কিন্তু পিপাসা যে নিদারুণ, জল নহিলে ত প্রাণও আর বাঁচেনা। কি করা যায়? গিরীন্দ্র মোহিনীর বাপের বাড়ী আমাদের মিলনের পথ খুলিয়া দিল। কিন্তু এহেন মহাখবর কি লুকান থাকে, অবশেষে দত্তবাড়ীতেও একথা পৌছিল। কিন্তু সুখের বিষয় এই আমাদের এই নিমন্ত্রিত অসন্তোষের পরিবর্ত্তে তাঁহারা সন্তোষই প্রকাশ করিলেন। সখীর ভয় ভাবনা সমস্ত মিথ্যা হইয়া গেল? ইহার পরে এমন একদিন আসিল যে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই দত্ত অন্তঃপুরে আমি সখ্যতামিলনে হইতাম এবং মিলনও বৌবাজার হইতে আমাদের বাড়ী আসিতেন। তখন মেয়েতে মেয়েতে দেখাশুনা হইবার পক্ষেও কত বাধাবিঘ্ন ছিল একালের পাঠিকা তাহা দেখিয়া অবাক হইতেছেন কি? কিন্তু বাধাবিঘ্ন ছিল বলিয়াই বুঝি আমাদের দুইটি হৃদয় এখন অনুরাগ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল?

গিরীন্দ্র মোহিনী শুধু কবি ছিলেন এমন নহে, তিনি চিত্রকরও ছিলেন।

তাঁহার হস্তাঙ্কিত নানা ভাবের চিত্র এখনো তাঁহাদের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র শিক্ষার অভাবে যদিও নির্দ্দোষ হইতে পারে নাই, তবে তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা খুবই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ছিহ।

গিরীন্দ্র মোহিনী মাটির পুতুলও বড় সুন্দর গড়িতে পারিতেন। মহিলা শিল্পমেলায় তিনি ও তাঁহার মাতা ভগ্নী নানারূপ পুতুল গড়িয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের গঠিত কুঁড়েঘর দেখিয়া কৃষ্ণনগরের পটুয়া নির্ম্মিত বলিয়াছে লোকে ভুল করিত। সখি সমিতির শিল্পমেলা সম্বন্ধে গিরীন্দ্র মোহিনী তাঁহার মিলন কথায় যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিছু এখানে উদ্ধৃত

আমাদের মহিলা সমাজে সখি সমিতির নূতন সৃষ্ট অসূর্য্যম্পশ্যা অবরুদ্ধাদিগের জন্ত এক বিশুদ্ধনরোজা'র দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল; এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ তাঁহারা আর কখনো ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না! "রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে লেগেছে রমণী রূপের হাট।"

আমার মনে আছে, রেঙ্গুনে প্রথম উদ্‌ঘাটিত শিল্প-সেনায় যেদিন মহিলাগণ কর্ত্তৃক মায়ার খেলার অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখ গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন, সেকি এক নূতন আনন্দ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন! মনে আছে, আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটী মেয়ে বলিয়াছিলেন, "এঁরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এরূপ সুচারু অভিনয়-ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ও বাহাদুরির বিষয়।" হায়, হায়, যেদেশে মহিলাদের মধ্যে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য স্ত্রী শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল, যে দেশে সতী বেহুলা ইন্দ্র সভায় নৃত্যগীত করিয়া মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এখন কোন নারীকে কলা কুশলা দেখিলে, সেই দেশের মহিলাদেরই এইরূপই মনে হয়!

১৩২৩ সালে ভারতীর সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া সে ভার যখন নবীন সম্পাদকদ্বয়ের হস্তে ন্যস্ত করি...তখন সখী গিরীন্দ্রমোহিনী মিলন কথা নামক প্রবন্ধে—আমাদের মিলন ইতিহাসের অনেক কথাই সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। আজ পুনরায় তাঁহার কথা হইতে তাঁহার মনোভাব কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

মিলনের কথা

"ভারতীর উপলক্ষে কিরূপে আমাদের দুইটি হৃদয় এক হইয়া যায়, কিরূপে একটি চিররক্ষণশীল একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের অভেদ্য দুর্গ প্রাকারে আমাদের মিলন মঙ্গল পতাকা উড্ডনী, হয়তাহা ভারতীর নবীন সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায্য প্রাপ্যবোধে উপহার দিতেছি।

* * * *

প্রথম যেদিন স্বামী আসিয়া বলিলেন, "আজ একটী নূতন খবর দিব। তোমাদেরই স্বজাতীয়া একজন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা হইলেন। তুমি ত পারিলে না।" (ইহা বলিবার অর্থ, তিনি আমাকে সংবাদ-প্রভাকর অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রে ধারাবাহিকরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন।) সেইদিন আনন্দ-কৌতূহলের মধ্য দিয়া নবীনা সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রবল হয়। তারপর ঘটনা সূত্রে যেদিন তাঁহার সহিত ঈপ্সীত মিলন ঘটিল, হায়! সেদিন তিনি যিনি আনন্দের সহিত স্ত্রী সম্পাদিকার সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি আর ইহ জগতে ছিলেন না। আমাদের বাটী চিররক্ষণশীল হইলেও স্বামী স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মিস্ তরুদত্ত ও অরুদত্তের উল্লেখ করিয়া আমাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার

উৎসাহেই তখন 'কবিতা-হার' ভারত-কুসুম' রচিত হইয়াছিল। আমার পিতৃদেবও স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপ নির্ব্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এমন সুন্দর লিখিতে পারিয়াছেন ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। তিনি মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিতাম। মনে পড়ে, আমার সংস্কৃত অধ্যাপকের জ্যোতিষের পুঁথি কাড়িয়া রাখিতাম। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছিলেন "ভারতে আবার (খনা প্রভৃতি) ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।" কিন্তু মেয়েদের জ্যোতিষ-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, জ্যোতিষী নির্ব্বংশ হয়; এবং আশ্চর্য্যের কথা, তিনি বহুপুত্রক হইয়াও পরে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন।

তারপর বহুদিন পরে, সিমুলিয়ায় আমান পিতৃভবনে সেই "পৃথিবী" ও "দীপনির্ব্বাণ" রচয়িত্রীর সহিত যেদিন আমার প্রথম চাক্ষুষ মিলন হয়, সেদিন আমার স্নেহময় পিতৃদেবও পরলোকে। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি নিষ্ঠুর।

আমাদের মহিলা সমাজের নূতন সৃষ্টি "সখি-সমিতির প্রস্তাব ভারতীতে বাহির হয় ১২৯৩ শালের বৈশাখে। আমি উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রথম পত্র লিখি। লিপি দূতীর সে কি আনাগোনা! তখনকার লিখিত একখানির পত্রের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আপনি লিখিয়াছেন আমাদের শিক্ষা পুরুষদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহাদের ইচ্ছা-ব্যতিরেকে আমাদের কিছুই করিবার যো নাই।' ইহা সত্য। তবে যে তাঁহারা আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার আবশ্যক বুঝিবেন তাহা কে জানে। আপাততঃ পুরুষেরা আমাদের যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা আমরা পাইয়াছি, অর্থাৎ ধোবার বাড়ীর ফর্দ্দ মিলানো, আর কায়ক্লেশে একখানা পত্র লিখিতে পারা। আমার মনে হইতেছে, একজন লেখক তাঁহার প্রবন্ধে শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, কোন্‌টী, মিল্ স্পেন্‌সর লইয়া জ্বালাতন, আবার ঘরেও তাই। ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, অধিক আর কি বলিব।

তারপর যখন পত্র ব্যবহারের মধ্য হইতে 'আপনি' 'আপনার' প্রভৃতি উঠিয়া গেল যখন

রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং

তখন গলির ভিতর পাল্কীর শব্দ হইলেই মনে হইত—

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!

পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া কতদিন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে উভয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রেমের অভিধানে 'আদব-কায়দা বলিয়া কোনো কথা ছিল না। আমাদের

সেই ঘনঘোর, সেই মেঘ—আঁধিয়াধ , সেই মৃদু বর্ষণ, সেই কনক নিকষ বিদ্যুৎ দীপ্তি আমাদের এই অভিসারকে কি মধুর করিয়া তুলিত! বাস্তবিক টিপি টিপি মেঘান্ধকারে স্নিগ্ধ দিবস দেখিলেই উভয়ের হৃদয় যে উভয়কে চাহিত, তাহা একদিনকার ঘটনায় প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মেঘ-মেদুর দিবসে উভয়েই উভয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল শেষে পথে পথে সাক্ষাৎ।

দুঁহুলাগি লাগি দুঁহুজনে বাহিরায় পন্থ।
জনু চাঁদ লাগি ফিরে রাহু লাগি চন্দ॥

আমরা সেকালের; সুতরাং 'পাতান' রোগের হাত এড়াইতে পারি নাই। এই মিলন-সূত্রে আমরা "মিলন পাতাইয়া ছিলাম।

তারপর আর একদিনকার কথা! তিনি তখন তাঁহার পিতৃদেবের শুশ্রূষার্থ পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি 'টডের' রাজস্থান পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসির বইখানি মুড়িয়া ফেলিলেন। সেদিনের কথা ভুলিবার নয়। সেকি দামিনী চমক, কি ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন, কি মুষল ধারে বৃষ্টি। আমরা দুইজনে দারুণ গল্পে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম। কখন যে আমার স্খলিত-কবরী লোহার কাঁটা দুটি তাঁহার শয্যায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা টের পাই নাই! কাঁটা দুটি সমেত এই মধুময়ী পত্রিকাখানি পাই

"অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে!
কইরে মিলন কোথা, সেকি হেথা আছে আর?
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল-পরশ তার!
তাপটুকু রেখে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে;
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রু-জল রেখে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারা;
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা!
ফুলটী সে নিয়ে গেছে, ফেলে গেছে কাঁটা দুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি!"

মনে পড়ে উত্তরে লিখিয়াছিলাম—

দূর হতে কাছে আনা স্বভাব আমার।
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগৎ রয়েছে দূরে হইতে আমার—
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটি।

প্রেমের জগতে আমি মধ্য-আকর্ষণ ,
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ-মিলন।

১৩৩০ সালে মৎ-প্রণীত 'শিক্ষা' প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থ আমি মিলনকেই উপহার দিই। তাহাতে আমাদের সুমধুর সম্বন্ধের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আজ আবার যুগান্ত পরে নূতন করিয়া ভারতীর পত্রে উপহার দিলাম।

সখি,

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস ;—
কি অভিসম্পাতে কার জানি নাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে নটে বাস করে,
নিশিদিন চেয়ে তবু মিলনের পানে—
নির্দ্দয় মিলন সেত শত ব্যবধানে।

দেখ যদি ফেলে সূত্র তল নাহি পাবে কুত্র
এ হৃদয় আকুল সলিলে ;
বিরহের পাশাপাশি, মগ্ন হেথা প্রেমরাশি
তন্দ্রামগ্ন গভীর অতলে ,
অর্ণব মন্থন করে পার যদি নিও তারে
পূত সেই এক বিন্দু সুধা ;
বিরহ গরল আছে তাই ভয় হয় পাছে
যদি তোর নাহি মিটে ক্ষুধা !

ওয়ালটেয়ারে সুদীর্ঘ প্রবাস যাপনের সময় আমি যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম।

শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে ঘটেছে যা, তোমায় আমায় ;—
মনে পড়ে সেদিনের কথা দুই যুগ পূর্ণ হলো প্রায় !
লিপি দূতী করি আনাগোনা দুটি হৃদি করিল বন্ধন,
দেখিবার আগেই দোঁহার ঘটাইল অপূর্ব্ব মিলন।
কুসুমের পরাণ যেমন সমীরণে হইয়া বাহিত,
ঘটায়ে ফুলের পরিণয় দূর হতে করে সম্মিলিত।
বসে এই সুদূর প্রবাসে স্মরি সেই ভাষার প্রভাব,
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।"

এমন রাশি রাশি ছিল। মধুর যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আজকাল সাগরে অন্তর্হিত

আমাদের ভারতীর মাসিক সমালোচনা পত্র মধ্যেই প্রায় হইত। সে সব লিপির বহরই বা কত? আমি স্বামীকে যেসব চিঠি লিখিতাম তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া তাঁহার এক বন্ধু কতকগুলি পত্র জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী নামে ছাপাইয়া দেন্। তারপর মৎপ্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হয়। ইংরাজী মাসিকপত্রে কবিতাহারের সমালোচনা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার এই "জনৈকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার এই সাহিত্যিক রহস্য অবগুণ্ঠন দুষ্টা ভারতী সম্পাদিকাই উন্মুক্ত করিয়া দেন্।"

বলা বাহুল্য আমাদের সখ্যতা কেবল আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ রহে নাই। পরস্পরের ছেলেমেয়েকে আমরা নিজের মতই মনে করিতাম, অধিকন্তু উভয় পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও ইহা বেশ একটি প্রিয় বন্ধন রচনা করিয়াছিল।

এ সম্বন্ধে মিলন কথায় গিরিন্দ্র মোহিনী লিখিতেছেন—

সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আমার দেবর শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সহিত ঠাকুর পরিবারের অনেকেরই আলাপ ছিল এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিতও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে মনে পড়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর "সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" ও রবীন্দ্রনাথের "অকাল কুষ্মাণ্ড" প্রভৃতি রচনা পাঠ হইয়াছিল। কিন্তু তখন জোড়াসাঁকোর মেয়ে পরিবারের সহিত আমাদের মেয়ে পরিবারের পরিচয় ছিল না। গোবিন্দলাল অবরোধের মধ্যে শাস্ত্র সম্মত স্ত্রী-শিক্ষার পাণ্ডা ছিলেন এবং সাবিত্রী লাইব্রেরীকে উপলক্ষ্য করিয়া নারী রচনা পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। কঠোর রক্ষণশীল দলের সেনানায়ক উপাধি ও তদুপযোগী শিরোনাম আমি তাঁহাকে অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম এবং কোনও দিন ভাবি নাই অবরোধের বাহিরে তিনি গুণের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে আমার সহিত ভারতী সম্পাদিকার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ক্রমে তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়া উঠেন ও আমার এই মিলন যজ্ঞের অন্যতম উত্তর সাধক ছিলেন।"

কেবল তিনি নহেন—তাঁহাদের সুবৃহৎ পরিবারের সাহিত্যানুরাগী সকলেই আমাকে কিরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন—'রেইস্ অ্যাণ্ড রায়েৎ' নামক তাঁহাদের পত্রিকাতে যথা অবসরে মাঝে মাঝে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। আর গিরীন্দ্রমোহিণী জোড়াসাকোর বাড়ীর অনেকেরই ছিলেন মিলন। পূজ্যপাদ মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী আমার মধ্যম বধু ঠাকুরাণী—যিনি বৎসর কালে বালকের সম্পাদিকা ছিলেন--তাঁহার সহিত মিলনের কিরূপ ভাব হইয়াছিল, সে কথাও মিলন কথায় কবি প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সেসব কথা আর এখানে তুলিলাম না; ১৩২৩ সালের ভারতিতে পাঠক সে কথা দেখিতে পইবেন।

আমাদের সখ্য নাট্যের শেষ পরিচ্ছেদটি পূর্ণ মাত্রায় মিলন মধুর। এত সত্বর আমার ভাগ্যে

স্বরূপ উক্তরূপ অমৃতকণার আস্বাদ দিলেন! এই মরজগৎলীলায় এইটুকুই বিধাতার অমর কৃপা! বহুদিন হইতে আমাদের ইচ্ছা ছিল উভয়ে মিলিয়া আমরা তাঁহার ভ্রাতৃসদন ও মাতুলালয় মজিলপুরে যাইব। তাঁহার ভ্রাতাগণ মজিলপুর-দত্ত বংশের দৌহিত্র অধিকার সূত্রে মাতামহের বিষয় সম্পত্তির আংশিক মালিক। দৈব নির্ব্বন্ধে যৌবন সময়ে সে সাধ আমাদের পূর্ণ হয় নাই। এইবার নববর্ষের প্রাক্কালে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাইজ বিতরণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষগণ যখন আমাকে ধরিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের অনুরোধ-নিমন্ত্রণ আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। দুজনেই যদিও এখন আমরা ভগ্নস্বাস্থ্য তথাপি দেহের দুর্ব্বলতা মনের জোরেই উপেক্ষা করিয়া উদ্দীপিত আনন্দে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মোটরযানে আমরা মজিলপুর যাত্রা করিলাম। ১৭রই ১৮রই দুইদিন সেখানে কাটাইয়া তৃতীয় দিনের প্রাতঃকালে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিলাম। মজিলপুর অবস্থানের এই স্বল্প সময়টুকু সখীর আত্মীয়গণের আন্তরিক আত্মীয়তাপূর্ণ সমাদর যত্নে পরম সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম প্রীতি সৌজন্য আমার জীবন পাতে চির মুদ্রিত থাকিবে।

এই স্বল্প সময় সখী গিরীন্দ্রমোহিনীকে আমি যেরূপ প্রাণ ভরিয়া পাইয়াছিলাম পূর্ব্বে সেরূপ সুযোগ আর কখনো ঘটে নাই। আহারে, বিহারে, শয়নে, ভ্রমণে আমরা সাথী ছিলাম। অল্পক্ষণের নিমিত্তও তিনি আমার চোখের আড়াল হইলে তৃষিত-চিত্তে আমি তাঁহার পথ চাহিয়া থাকিতাম। কাছে আসিলে তখন কি পরিতৃপ্তি!

মজিলপুর প্রাসাদ আমার বড় সুন্দর লাগিল। সেকালের জমীদারদিগের বাসভবন কিরূপ নিরাপদ দুর্গরূপে নির্ম্মিত হইত এই প্রসাদ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। পরিখা বেষ্টনের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশের প্রথম পথ একটী সুদৃশ্য বৃহৎ সিংহ দ্বার। দ্বারমধ্য দিয়া কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিলে যে প্রাসাদ নজরে পড়ে তাহা বহির্ভবন, এ ভবনও একটি মাত্র প্রবেশ দ্বারে সুরক্ষিত এই প্রসাদের উঠানে দালান প্রভৃতির আবার আর এক কমপাউণ্ড ও অন্য প্রাসাদ। এইরূপ কমপাউণ্ডের পর কমপাউণ্ড, প্রসাদের পর প্রাসাদ এক একখানি বৃহৎ প্রবেশ দ্বার সুরক্ষিত হইয়া যেন কৌটার মধ্যে কৌটারূপে অবস্থিত।

প্রাসাদের পারিপার্শ্বিক কত না ঠাকুর দালান, কমপাউণ্ডের আশে পাশে কত না রঙ্গমঞ্চ, দোলমঞ্চ দেব দেবীর মন্দির।

কোন বাড়ীরই ঘরগুলি সেকালে ধরণে ঘুবচি খুবচি নহে। বেশ বড় বড় হাওয়া রৌদ্র খেলিবার উপযুক্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদ এখন ভিন্ন ভিন্ন শরিকের ভাগে পড়িয়াছে। ইচ্ছা করিলেই এক শরীক অন্য সরিকের বাড়ী যাতায়াত করিতে পারেন—অথচ সকলেই দূরে দূরে আছেন।

আমি ছিলাম সখীর সহিত বহির্প্রাসাদে। শুনিলাম—বঙ্কিমবাবু যখন এই অঞ্চলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি এইখানে আসিয়া থাকিতেন। এবং এই প্রাসাদের আদর্শেই নাকি তিনি বিষবৃক্ষের প্রাসাদ রচনা করিয়াছিলেন

মজিলপুর বহু বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাসস্থান। রামায়ণ অনুবাদক পণ্ডিত প্রবর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং খ্যাতনামা শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্মস্থানও এইখানেই।

প্রাসাদেরই একটি দালানে মজিলপুরের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। গিরীন্দ্র মোহিনীও এইখানে পড়িতেন।

প্রাইজ বিতরণ দিনে ঠাকুর দালানের সম্মুখবর্ত্তী বড় উঠান লোক সমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই শত সহস্র লোকের মধ্যে সেকালের অন্তঃপুরিকা গিরীন্দ্রমোহিনী প্রকাশ। ভাবেই আমার পার্শ্বে উচ্চ মঞ্চের উপর আসিয়া বসিলেন। সেকাল আর একাল!

বিদ্যালয়ের একটী বালিকা বেশ সুন্দর গান করিল। ইহা হইতে কি বুঝা যায়। সঙ্গীত শিক্ষা যে বালিকাদিগের পক্ষে এখন দোষের কথা বর গুণের কথা ইহা পুরুষগণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মজিলপুর যাত্রা করি আমরা সন্ধ্যাবেলায় ফিরিলাম প্রত্যুষে। তাই এ সময় পথের শোভা বেশ উপভোগ করিয়াছিলাম।

পথিপার্শ্বে কোথাও অনেকদূর ধরিয়া বৃক্ষশ্রেণীর ছায়াপথ; কোথাও উন্মুক্ত আকাশতলে আকা-বাঁকা মেটো রাস্তা, ধারে ধারে জলাভূমি, অদূরে মাঝে মাঝে একখানি কুঁড়েঘর, কোথাও বা কিছুদূরে গাছপালার ছাউনিতলে আট দশটি বসতিতে এক একটি কৃষাণ গ্রাম। রাস্তার সমপাতেই বারুই প্রভৃতি দুএকখানি বর্দ্ধিষ্ণু সহর। রাস্তা হইতেই জমীদারদিগের জমকালো বাসভবন আংশিক ভাবে নজরে পড়ে।

উন্মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়া যখন মোটর চলিতেছিল তখন উষার সুবর্ণ দৃশ্যে আকাশ সুরঞ্জিত। গিরীন্দ্রমোহিনী প্রকৃতির সেই মধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন—আমার অন্তিম শয্যা যেন এইরূপ মুক্ত উদার আকাশ সম্মিলন তলেই রচিত হয়। অনন্তের শোভা দেখিতে দেখিতেই যেন আমার নয়ন মুদিয়া আসে, ইহা আমার চিরজীবনের একটি সাধ।

কবির এই অন্তিম-বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল কিনা জানি না—কারণ তাঁহার শেষদিনে তাঁহাতে আমাতে দেখা হয় নাই, এই নিদারুণ আক্ষেপ এ জীবনে ঘুচিবে না।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমি খুব অসুস্থ হইয়াছিলাম, একটু সুস্থ হইয়াই যখন ভাবিতেছি একবার তাঁর কাছে যাইব—সহসা খবর পাইলাম···তিনি আর নাই।

এরূপ শোক দুর্ঘটনার সময় বাড়ীর লোকের মাথা ঠিক থাকে না, সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ আমার নিকট পৌঁছে নাই।

হায়! শুনিয়া কি মর্ম্মান্তিক বেদনাই অনুভব করিয়াছিলাম। শেষ মুহূর্ত্তে একটিবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, এ যে গভীর দুঃখ।

সত্যই তিনি কি আর নাই! সব সময়ে তাহা ত মনে করিতে পারি না? এই স্মৃতি কথা লিখিত কতবারই যেন তাহাকে চোখের সম্মুখে দেখিতেছি আনন্দ হাসিতে তাঁহার মূর্ত্তিখানি যেন তেমনি প্রীতি প্রফুল্ল, তেমনি সখ্য মধুর। শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

খেয়াল খাতা

"রবীন্দ্র বারমাস্যা

আশ্বিন

১। আশ্বিনে নব আনন্দ উৎসব নব।
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদ লক্ষ্মী বিরাজে।
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে,
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বর মাঝে
শ্বেতভুজে শ্বেতবীণা বাজে॥

২। আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকাচুরী খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা!

৩। শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। * * * বহে খর বেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্রখণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখ নিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে।

৪। আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে,
স্নান অবসান শুভ্রবসনা চলিয়াছ ধীরে ধীরে॥

৫। যেথায় ফুটে কাশ তটের চারিপাশ,
শীতের দিনে বিদেশী হাসেয় বসবাস!
কচ্ছপেরা ধীরে রৌদ্র পোহায় তীরে,
দু'একখানি জেলের ডিঙি সন্ধ্যোবেলায় ভিড়ে॥

৬। আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মত নিল তুলি
আশ্বিনের ঐ আঁচলখানি গেল ভরে'।

৭। আজ শরতের নীলাকাশে, আজ সবুজের খেলায়,
আজ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে, আজ চামেলীর মেলায়,
কত কালের গাঁথা বাণী আমার প্রাণের সে গানখানি
তোমার গলায় দোলে যেন করিনু দর্শন ॥

৮। কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায় ॥

৯। আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দ্দিনে,
হেমন্ত ধানের ক্ষেতে বাতাস উঠেছে মেতে
কেমনে চলিবে পথ চিনে ?

১০। ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে ?

১১। উপর পানে আকাশ শুধু
সমুখ পানে মাঠ,
শরৎকালে রোদ পড়েছে
মধুর পথ ঘাট।
দুটি একটী পথিক চলে,
গল্প করে হাসে,
লজ্জাবতী বধুটী গেল
ছায়াটি নিয়ে পাশে।

১২। আশ্বিনেতে পূজোর ছুটী হবে
মেলা বসবে গাজন তলার হাটে,
বাবার নৌকো কতদূরের থেকে
লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।

১৩। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা,
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।

১৪। আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই,
আনন্দে দুহাত তুলি নাচে ॥

১৫। আজ যদি বাজে বাঁশী গান কি যাবে না ভাসি

আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে ?

১৬। তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর প'নে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে ।

কালের প্রবাহ

বুকের মিল

(ইয়ং ইণ্ডিয়া)

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দের উত্তরে আপনি 'বুকের মিল'—বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেচেন। আমি চিন্তা ও ধ্যান করে দেখলুম এই বুকের মিলের রহস্য গোপন রয়েচে বিশ্বের অন্তরের মধ্যে। তার অতল গভীরতায় ডুবে গিয়ে অপার্থিব স্পর্শ মণির সন্ধান করে এনে মানব-সমাজের বিকৃত ও বিবর্ণ অংশগুলিতে তা ছুঁইয়ে দিলেই সেই সমাজে আবার সুখ ও বৈচিত্র্য ফিরে আসবে। ইহা সত্য ও ঋত উভয়েরই অন্তরের সত্তায় আছে। এই বুকের মিলই গ্রহে গ্রহে মিলন ঘটিয়ে তাদের ঊর্দ্ধে ধারণ ক'রে রেখেচে। এই বুকের মিলই পঞ্চভূতের সমন্বয় ঘটাচ্চে। রাসায়নিকরা আবিষ্কার করলেন যে অম্লজান ও উদজানের যোগের ফল, জল। কিন্তু যতক্ষণ না সেই যোগের ওপর তাড়িতের প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল ততক্ষণ জল পাওয়া যায় নি। ঐ বৈদ্যুতিক প্রভাবই প্রকৃতিতে বুকের মিল। এই বুকের মিলই বস্তুর পরিবর্ত্তন ঘটায়—বরফকে গলিয়ে জল করে, জলকে জমিয়ে বরফ করে; বিবর্ত্তন ও আবর্ত্তন, অসীমের সসীমে অবতরণ এবং সসীমের অসীমে প্রত্যাবর্ত্তন সবই এই বুকের মিলে ক্রিয়া।

শিবের সহিত পার্ব্বতীর এই বুকের মিলের জন্য তপস্যা হিন্দু কল্পনার একটি চমৎকার ব্যাপার। পার্ব্বতী হচ্চেন মানবরূপে মূর্ত্তিমতী ঐশ্বরিক শক্তি অর্থাৎ বিশ্বের কার্য্য শক্তি। আমার মনে হয় জাতির কোন সাধক পূর্ব্বপুরুষ একেবারে ভগবানের কাছ থেকে এই কল্পনার মূর্ত্তিলাভ করেছিলেন। তপস্যা-রতা পার্ব্বতীরূপে, বস্তুর আবরণ ধ্বংস করে ভগবানের শক্তি যে এই সুন্দরতম ভাবে এসেছিল, সে কিসের জন্য ? "প্রাণস্য প্রাণং" তারই সঙ্গে নিবিড় বুকের মিলের জন্য, আর কিছুরই জন্য নয়—মানুষের সামনে এমন আদর্শ ধর্‌বার জন্য, যা সে গ্রহণ ও উপলব্ধি করবে। আপনি এটা উপলব্ধি করেচেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে আল ভাই

ও অপরাপর লোকের সঙ্গে বুকের মিলের দ্বারা এর প্রয়োগ করেছেন, তার ফলে আমরা বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত স্বতন্ত্র উপাদান থেকে একটি অখণ্ড জাতি গড়ে তোলবার পথ চিনে নিয়েচি ও সে পথে যাত্রা শুরু করেচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সমগ্র দেশ যেন আপনার কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে বুকের মিলের পথে যাত্রা করবার শক্তিলাভের জন্য তপস্যা করে ও তাতে ধৃত-ব্রত হয়।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

আমার প্রশস্তি আছে বলে এই চিঠি আমি ছাপালুম তা নয়—ছাপালুম এইজন্যে যে আমি ভায়াদের ও অপরাপর লোকের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে আমার মত ও বিশ্বাস-গত পার্থক্য আছে, আমার সম্পর্কের মধ্যে লেখিকা যথার্থই আমার বুকের মিলের সন্ধান করেচেন আর আর এই বুকের মিলের কথা তিনি খুব জোর করেই বলেচেন, বড় ভাইটি আমাকে সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন যে অধিকাংশ বিষয়ে আমাদের এত অনৈক্য থাকলেও সে কি, যা আমাদের অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করে রেখেচে? এ কি একই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভীতির ফল নয়? তিনি যা বলেছিলেন তা কত স্বাভাবিক ও সত্য! কোরাণ, বাইবেল, তালমুদ, আবেস্তা, গীতা এই সব ভিন্ন ভিন্ন বাহনের মধ্যে দিয়ে দেখি বলে আমরা আত্ম কলহের দ্বারা ঈশ্বরের অমর্য্যাদা করবো কেন? হিমাচলের শিরে ও উপত্যকার উপরে একই সূর্য্যের কিরণ প্রহত হয়। তুষার-স্থলীর লোক কি উপত্যকার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে সূর্য্যের কিরণ তারা বিভিন্নভাবে অনুভব করে বলে? আমাদের মুক্তির আর বুকের মিলের সহায় বলে না ধার্য্য করে, পুঁথি আর আচারকে আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল করে তুলবো কেন?

গান্ধি।

বাণী-বিতান

গান্ধী।

গান্ধী গান্ধী মহীয়ান্!
হে মহাপ্রেমিক মহাপ্রাণ!
গুর্জ্জর-বীর দুর্জ্জয়
অস্ত্রবিহীন নির্ভয়!
গাণ্ডীবহীন অর্জ্জুন—
নাহিক শায়ক, নাহি তূণ;—
চিত্তশক্তি তরবার;
ধৈর্য্য বর্ম্ম দেহে তার;

সহন শায়কে ব্যথা নাশ ;
অরি নত হেরি ক্ষমা-হাস !
রিক্ত-বিলাস শঙ্কর—
আঁখিপাতে মার যাহা জড়,
মরে ভয় ও আলস্য,
দাস্য চরণে বশ্য,
দুঃখ নহেক আগুসার,
কাঁপে ক্ষুদ্রতা, পাপভার ;
হেরি অঙ্গুলি-তর্জ্জন
নিন্দা ও ঘৃণা দুষ্মন্
কেঁপে কেঁপে মরে লাগে ত্রাস,
মরে লোভ, কাটে মোহপাশ।
পদপরশনে দৃপ্ত
নির্জ্জীব জাগে ক্ষিপ্ত ;
নির্ভীক বাক্ বলীয়ান্
মিথ্যারে করে খানখান।
সিংহ যেন রে পশুমাঝ
এ বীরকেশরী নররাজ !
হিমালয় যেন দুর্ব্বার—
নীরদ বজ্র বাত্যার
নর্ত্তন সহি অচপল,
দাঁড়ায় গান্ধী সে অটল।
ভীষণ অটল,—ক্ষমাময়,
মূর্ত্ত শান্তি, মহা জয়।
ন্যায়ের যেথায় অপমান,
সত্য সেথায় নত ম্লান,
গান্ধী রুদ্র ছন্দ
যুঝে সে সত্যসন্ধ।
কাঁদে ঐ কাঁদে দুর্ব্বল—
এই যে গান্ধী মহাবল !
ক্ষমাময় কম লাস্য
বিষাদে ফুটায় হাস্য !

অত্যাচরিত বলে—ওই
লভেছি শরণ, ভীতি নেই।
দুখীর ঘুচাও দুঃখ,
মুছে দাও ক্লেশ রুক্ষ;
নাহিক সহায় সখা যার
তারে তোল বুকে আপনার;
সমাজ ত্যক্ত হীন যেই
তব বাহু পাশে হাসে সেই।
হেথা কাঁদে হোথা কাঁদে নর—
তুমি সব ঠাঁই—কে বা পর?
মানুষ মানুষ সব ঠাঁই,
সকল মানুষ ভাই ভাই,—
এই নীতি এই মহাজ্ঞান
তব নিশ্বাসে কর দান।
নয়ন-বিভায় ঝরে প্রেম,
ললাটে ভাতিছে মহাক্ষম,
বাহু সঞ্চারে শুভাশীষ
ঝরিয়া জুড়ায় দিশিদিশ।
দৈন্যে দুঃখে হতমান
অপমানে ক্লেশে নতপ্রাণ
বেদন-কাতর হৃতনীড়
ভারতে জাগিলে মহাবীর!
বিরাট্‌ বিষাদ গলে যায়,
গোপন বেদন ভাষা পায়,
পাষাণ সমান ভীতি-চাপ
ধীরে সরে করি পরিতাপ।
ব্যথা-মূঢ় যত ভাষাহীন
পিষ্ট নিঃস্ব নত দীন
জাগে লভি নব মন্ত্র,—
চলিল অচল যন্ত্র।
"কেনরে নিরাশ?—আছে অংশ,
ভাঙে দুখ জাগো উল্লাস

দুঃখেরে সহি জিন্ দুখ,
বর্‌রে আঘাত পাতি বুক ;
বুকে সহি অরি-অস্ত্র
হেসে দাঁড়া, নাহি শস্ত্র ;
আঘাত আঘাত নে রে বাজ,
হবি জয়ী, অরি পাবে লাজ।”—
অস্ত্রনাশন মহাগান
জাগিল ভারতে নব তান !
জননী ভারত নতমুখ
মুখ তুলে চায়,—এত দুখ
হবে হবে কিরে অবসান ?
কে রে এ শুভালু সন্তান !
গান্ধী গান্ধী ক্লেশহর,
রুদ্র অটল তেজোধর,
নম্র মধুর দয়াবান্,
সৌম্য উদার দুখত্রাণ,
প্রেমিক পাগল সে তাপস,
তপোবলে করে নিরলস !
নমামি গান্ধী মহীয়ান,
নমামি প্রেমিক মহাপ্রাণ !

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

জাগ্রত বেদনা।

সহজের লোভ হতে যেন আমি, নাথ,
নিজেরে বাঁচাতে পারি ! চিত্তে দিনরাত
অশান্তির বহ্নিজ্বালা উদ্দীপ্ত অনলে
সুখ স্বপ্ন দগ্ধি যদি নিদারুণ জ্বলে
সেও সবে ; শুধু এই শক্তি দাও মোরে
দুর্গমের সুবিপুল আহ্বান অন্তরে
মর্ম্মে মর্ম্মে পশি যেন সম্মুখের পথে
নিত্য মোরে টানি লয় ! জন্মিয়া জগতে

বৃথা হাস্যে পরিহাসে আঙিনার কোণে
গম্ভীর আরামে ভুলি যেন অন্য মনে
দিন নাহি চলি যায় মায়ার লালসে
অভ্যাসের ঘূর্ণাপাকে মোহের রভসে।
দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভালোমন্দে সজাগ পরাণে
যেতে যেন পারি একা সত্যের সন্ধানে।

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কোকিল

পথ হারা কে অচিন পাখী
　　বসন্তের-ই গীতী
শ্যামল মোদের কুঞ্জবনে
　　কে আজ অতিথি।
তোমার আসার পরশ পেয়ে
জাগল ধরা হরষ গেয়ে
শূন্য কানন রাখলো ভরে
　　বেল করবী যাঁতি
স্বাগতম্ হে বল্‌ছে তারা
　　আসন বনে পাতি।
পথটি তোমার শ্যামল সদা
　　নাইক শীতের ছাপ
কণ্ঠে তোমার জাগচে শুধুই
　　গানেরই আলাপ।
কতকালের ফাগুন রাতে
গাঁথচ মোদের সুরের সাথে
আনন্দেরই ছন্দ দোলায়
　　দুল্‌চ দিবস রাতি
ঘর ছাড়া কে অচিন প্রেমিক
　　বসন্তেরই সাথী।

শ্রীশেফালিকা দেব।

শারদীয়া

আজি শরৎ এসেছে সখী ফিরে!
ভুবন ভোলানো বাঁশীখানি তার
দিকে দিকে শোন্ বাজিছে আবার
জাগে অনুরাগে আগমনী যার
শত অন্তর ঘিরে!

সখী শরৎ এসেছে আজি ফিরে!
মাঠে মাঠে তার ওঠে জয়গান
বন মর্ম্মরে লোটে মন প্রাণ
ছোটে আনন্দ-ছন্দ তুফান
জীবন সিন্ধু নীরে!

আজি শরৎ এসেছে সখী ফিরে!
ছিল এতদিন কোথা সে গোপনে
কোন্ ইন্দ্রের নন্দন বনে
সুরভি-স্নিগ্ধ মন্দার সনে
মন্দাকিনীর তীরে!

সখী শরৎ এসেছে ফিরে!
বরষার প্রেমে এসেছে সে ওরে,
বজ্র অনল বুকে চেপে ধ'রে
বিদ্যুৎ শিখা নির্ব্বাণ ক'রে
মেঘ পর্ব্বত চিরে!

আজি শরৎ এসেছে সখী ফিরে!
এসেছে সে হেসে সকলের দ্বারে
ভরি উত্তরি নানা উপহারে,
ফুল করঙ্ক কারে পুজিবারে
বহিয়া এনেছে শিরে!

সখী শরৎ এসেছে আজি ফিরে!
এসেছে সে পরি শেফালির মালা
রূপে আলো করি, চেয়ে দেখ্ বালা,
দু'নয়নে তার প্রেম-মধু-ঢালা
বধূ হৃদি-মন্দিরে!

আজি শরৎ এসেছে সখী ফিরে!

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

আগমনী

কার আগমনী, বঁধু, কার আগমনী
তোমার পরশ-বশে   উল্লাসে, প্রণয়ে, রসে
করিছে শোণিত কই চঞ্চল, ধমনী
নিরানন্দ কক্ষে ওই,   হে মোর উৎসবময়ী
বরণের মালা কই ছলিছে তোমার
অকলঙ্ক গৃহাঙ্গন   কোথা তাহে আলিম্পন
ওই রাঙা পা দুখানি স্নেহে রাখিবার !
ফিরে এস, ফিরে এস আলোহীন পুরে,
জাগাইয়া কলহাসি   বহ প্রাণে সুধারাশি
বাজুক্ হৃদয় বাঁশী মিলনের সুরে
নবীন শেফালি-হারে   অলিন্দে, তোরণে, দ্বারে
নয়নের জ্যোতি তব পড়ুক্ লুটিয়া
স্নিগ্ধ হোক্ এ ধরণী   সত্য হোক্ আগমনী
প্রেমের উন্মুখ কলি উঠুক্ ফুটিয়া

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

বন্ধুর আগমন

বন্ধু আমার দুয়ারে আসিয়া দিয়েছে ডাক—
দিয়েছে সাড়া,
ডাকের সহিত হৃদয় কোথায় উড়িয়া গেছে
মুগ্ধ আত্মহারা।
সাড়া দেওয়া তাই হয়নি আমার হায়,
বন্ধু আমার ফিরে গেছে অভিমানে,
সকল হৃদয় তারে যে গো ফিরে চায়,
কোন্‌খানে হায়—পাব তারে কোন্ খানে !
বাতাস কহিছে নাই—নাই—নাই—নাই গো,—
কোনোখানে সে যে নাই,—
কোথা তারে খুঁজে পাই ?

বন্ধু আমার এনেছিল বয়ে স্বপন-শেষে
স্নিগ্ধ হাসি,
আভাটি তাহার গড়েছিল নব ইন্দ্র ধনুর
অপরূপ লীলা রাশি।
তাই নিয়ে ছিল বিভোর ব্যাকুল মন,
বরণের লাগি' তাগিদ জাগেনি প্রাণে,
বন্ধু আমার ফিরে গেছে অকারণ,
কোন্‌খানে হায়—পাব তারে কোন্‌খানে!
হৃদয় কহিছে চাই-চাই-তারে চাইগো,
আমি যে তাহারে চাই,
কোথা তারে খুঁজে পাই!

বন্ধু আমার এসেছিল মোর আলিঙ্গনের
ঝড়ের মত,
চাহিতে পারিনি মুখ পানে তার নয়ন তুলি,
—চাহিনি লজ্জানত।
হৃদয়ের সাড়া বাহিরে ফোটেনি তাই—
ভালোবাসা সেও অন্তর নাহি জানে!
বন্ধুরে চাহি বন্ধু হারায়ু হায়,
কোন্‌খানে তারে খুঁজে পাব কোন্‌খানে?

* * *

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আগমনী বিদায়।

* * *

মাথার কিরে বল্‌না তোরা, শুনছি যাহা সত্যি তা কি?
ভোরের মুখে খবর পেলাম মা ফের ফিরে আস্‌ছে নাকি!
একটু আগেই অরুণ আলোয় সিউলি ফুলের গন্ধ দিয়ে
চলে গেল-চল্‌না তোরা আস্‌বি: মাকে সঙ্গে নিয়ে।

* * *

সময় ছিল এমন কথায় উড়ে যেতাম উধাও হয়ে,
মনোরথে কৈলাশ হতে আন্‌তে তাঁকে বঙ্গালয়ে ;
দেবদারুর ছায়াপথে ছড়িয়ে বনফুলের রেণু,
ওষধিতে জ্বালিয়ে বাতি, কীচক বনে বাজিয়ে বেণু,
কাশের চামর ছুলিয়ে পথে শরৎ আসার সাথে সাথে
মাকে ফিরে আন্‌তে ঘরে জাগত পুলক প্রাণের পাতে !

*　　*　　*

আজ সে কথা ভাবতে মনে সুখের চেয়ে ব্যথাই বেশী
কার ঘরে আজ ডাক্‌ব কারে, বুঝবি নাকি মুক্তকেশী ?
হিমগিরি নিঃস্ব সে আজ, মা মেনকা শূন্যঘরে
কি দিয়ে আজ তিন দিনইবা মেয়েরে তার আদর করে !

*　　*　　*

যে পিতা তার ভুবন রাজা যে মাতা তার ভুবন রাণী —
তারা যে আজ শক্তিহারা ভিক্ষুকেরও অধম জানি।
বড় ঘরের কন্যা ছিল, আজ কি সে ঘর তেমনি আছে
পূর্ব্বদশা ভেবে তারা মরণ হ'লে হয়ত বাঁচে !

*　　*　　*

তুই বা কেন আস্‌বি মাতা, দেখবি কি আর বাপের ঘরে,
দেখবি ক্রমে সবাই যে তোর শ্বশুর বাড়ীর ধারা ধরে ,
দেখবি সেথায় শূন্য শ্মশান ভিক্ষা ছাড়া বৃত্তি নাহি,
ঘরে ঘরে দিগম্বরের শিশুরা সব দেখবি চাহি ;
দুর্দ্দশা আর দুর্গতিতে দুর্গে সাজি দুঃখীদলে,
ভূতের মতন পাগল হয়ে বেড়ায় তোরি ভবন তলে।
আসিস্‌ নেমা, আসিস্‌ নেমা, আসিস যদি এবার তারা,
দেখবি পথে আলপনা নাই, নয়ন ধারার বোধন ধারা !

*　　*　　*

হাহাকারের হাওয়ায় ঘেরা রাজ্য এযে প্রেতের বাসা,
নাইক সে হায় নাইক প্রীতি, নাইক আশা নাই সে ভাষা ,
আস্‌তে যদি পারিস্‌ আবার আগের মতন হরষ হাসি,
তবেই আসিস নইলে তোরে চাইনে মোরা, সর্ব্বনাশি !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি।

অনুক্রম

২৬

সকাল বেলায় ধীরেশ নিতাইয়ের সঙ্গে আসিয়া শুনিল যে মণি চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ফণিরও দেখা নাই। তারাপদ বাবু বিশ্বাস করিলেন যে মণি কুলত্যাগ করিয়াছে কিন্তু অনুপম বা ধীরেশ কোনমতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। নিতাইয়ের বিলাপ শুনিয়া তারাপদ বাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া মণির সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা সকলেই প্রথমে একটা ভুল করিয়া বসিলেন এবং সে ভুলের কারণ তারাপদ বাবু স্বয়ং। তারাপদ বাবু ঠিক করিয়াছিলেন যে ফণীর সহিত্য কুলত্যাগ করিয়া মণি কাশীতেই আছে, কোথাও লুকাইয়া আছে, কারণ কলিকাতা ব্যতীত কুলটা বঙ্গনারীর একমাত্র আশ্রয় বারাণসী। সুতরাং সকলে মিলিয়া পুলিশের সাহায্যে কাশীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মণির জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। এই। বিলম্বের জন্য তাহারা মণির প্রকৃত সন্ধান পাইবার সুযোগ হারাইলেন!

বারানসী নগরী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া মণির সন্ধান মিলিল না, বীরবল সন্ধান করিয়া জানাইল যে মণি একখানা মোটা বিলাতী ধুতি পরিয়া ও বিছানার চাদর সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। সে রকম মোটা ধুতি পরিয়া হাজার হাজার বাঙ্গালী স্ত্রী লোক দিবারাত্রি কাশী ঘুরিয়া বেড়ায় সুতরাং মণির খবর কেহ দিতে পারিল না। কাশী শহর ছাড়িয়া যখন সকলে বাহিরে খোঁজ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন ষ্টেসনের লোকে মণির কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ধীরেশ ও অনুপম হতাশ না হইয়া যখন, কাশীর বাহিরে সন্ধান করিবার প্রস্তাব করিল, তখন তারাপদ বাবু তাহাদিগকে বৃন্দাবন যাইতে হুকুম করিলেন। কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে মণি ফণির সহিত কুলত্যাগ করিয়াছে এবং কুলটা বঙ্গনারীর বৃন্দাবন আর একটী আশ্রয় স্থল। নিতাই মাতাজী তপস্বিনী ওরফে ক্ষীরোদা সুন্দরীর সহিত বহুবার হরিদ্বারে গিয়াছিল, সে কাশী ছাড়িয়া হরিদ্বারে চলিল। তারাপদ বাবুর হুকুম মত ধীরেশ ও অনুপম বৃন্দাবনে গেল। তারাপদ বাবু নিজে ফণির পরিত্যক্ত লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে মনঃ সংযোগ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল, হরিদ্বার, কখন, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থস্থান অনুসন্ধান করিয়া নিতাই যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহাকে দেখিয়া তারাপদ বাবু অত্যন্ত

ও ওয়াজেদ আলী নরনারী কুঞ্জর ও দোল লীলার উপাখ্যান ও ইংরাজ রেসিডেণ্টের অত্যাচার তাহাকে একেবারে গ্রাস করিয়াছিল ; তাহার মনের ভাব বুঝিয়া নিতাই কাশী ছাড়িয়া ধীরেশের সন্ধানে বৃন্দাবনে গেল। কাশীতে যে রকম ভাবে মণির অনুসন্ধান করা হইয়াছিল অনুপম ও ধীরেশ ঠিক সেই রকম ভাবে বৃন্দাবনে মণিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, মণি মথুরা জেলার ত্রিসীমানায় পদার্পণ করে নাই, সুতরাং বৃন্দাবনের কোন বনে মণির সন্ধান পাওয়া গেল না।

অনেক কষ্ট পাইয়াও সে যখন খুঁজিয়া মণিকে বাহির করিতে পারিল না তখন তাহার প্রতি অনুপমের গভীর অনুরাগ একটা গভীর অশ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া গেল। তাহার নব যৌবনের রূপ, প্রথম যৌবনের অপরিসীম প্রেম সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে তাহার বিশাই আত্ম-ত্যাগ উপেক্ষা করিয়া এতদিন পরে মণি একটা কুরূপ নির্গুণ অজ্ঞাত কুলশীল যুবার সঙ্গে কি দেখিয়া কি ভাবিয়া কি বুঝিয়া কুলত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল অনুপম তাহা বুঝিতে পারিল না, ক্রমে ক্রমে মণির প্রতি ভালবাসার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধার সহিত সমস্ত নারী জাতির উপরে অবিশ্বাস ও ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। ধীরেশ তখনও মণির সন্ধান পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু অনুপম ক্রমে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িতেছিল। নিতাই-সুন্দর যখন কাশী ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিল তখন অনুপম হঠাৎ একদিন তাহাকে বলিয়া বসিল "কেন আর বিদেশে ঘুরে ঘুরে কষ্ট পাচ্ছেন ? নিতাই বাবু বাড়ী ফিরে যান। তার যদি ফিরে আসবার ইচ্ছে থাকত তাহলে এতদিন তার খোঁজ পাওয়া যেত।" নিতাই শুষ্কমুখে বলিল, এটা আমার কষ্ট নয় অনুপম বাবু আমি তার যে অত্যাচারটা করেছি তারই প্রায়শ্চিত্ত কচ্ছি। এটা কষ্ট নয় আমার কাছে আনন্দ, আমার অত্যাচারে আশ্রয় হীন হয়ে মণি যে কষ্ট পেয়েছে তার দশগুণ আমার পাওয়া উচিৎ। স্বর্গ নরক এইখানেই, মরণের পথ স্বর্গের সুখ বা নরকের যন্ত্রণা ভোগ করা কথায় কথামাত্র, আমাদের দেশের মানুষকে কর্ম্মফল বোঝবার জন্যে এই সকল উপাখ্যানগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। আমি কোন কষ্ট অনুভব করছিনে বরঞ্চ সে সতী লক্ষ্মী আমার ভয়ে আশ্রয় ছেড়ে চলে এসে কত কষ্টই না জানি পাচ্ছে।" হঠাৎ অনুপম হাসিয়া উঠিল। ধীরেশও নিতাই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। অনুপম বলিয়া উঠিল, সতী লক্ষ্মীই বটে! আমিও প্রথমে তাই মনে করেছিলুম। দেখুন মেয়ে মানুষের চরিত্র পুরুষে বোঝেনা—কোন কালেই বোঝেনা। আপনি তার স্বামী, তার ওপর অত্যাচার করেছিলেন বলে মনের গ্লানিতে কষ্ট স্বীকার কচ্ছেন। কিন্তু আমি কি করেছি জানেন ? আমি তাকে দুশ্চরিত্রা জেনেও প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছিলুম। বুড়ো বাপের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে জীবনের সুখ শান্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের মাথায় পদাঘাত করে আমার মনের সিংহাসনে সেই বেশ্যাকে কল্পনার বলে দেবী সাজিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলুম, সেই ভুলের ফলটা এখন ভোগ কচ্ছি। বাড়ী ফিরে চলুন। বাঙ্গালী স্ত্রী স্বর্গের দেবী নয়, নরকের প্রেত, মণি দেবী নয় পিশাচী।"

সহসা উত্তেজিত হইয়া ধীরেশ বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌ছিস্ নেড়া। মণির স্বামীর সম্মুখে এ সব কথা কি বল্‌ছিস্?" অনুপম আরও উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক বল্‌ছি, আজ আমার মনেও আত্মগ্লানি আরম্ভ হয়েছে, তুমি মণিকে বোনের মত ভালবাসতে, কিন্তু আমি মনে করেছিলুম যে মণিকে না পেলে আমার জীবন অন্ধকার হয়ে যাবে।"

ধীরেশ ও অনুপম বুঝিয়াছিল যে বৃন্দাবনে মণি নাই, সুতরাং তাহারা নিতাইকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিল, পথে এলাহাবাদ ষ্টেশনে ধীরেশ মণির সন্ধান পাইল। একটি বৃদ্ধ বাঙ্গালী পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর বলিল, যে প্রায় দেড়মাস আগে একটী বাঙ্গালীর মেয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল বটে কিন্তু তার স্বামী তাহারই সাহায্যে এলাহাবাদ ষ্টেশন থেকে ধরে নিয়ে গেছে। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরটির নাম মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সকলে এলাহাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৮-শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩১ { সপ্তম সংখ্যা

নিবেদন

আমাদের গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠক-পাঠিকা সকলের নিকট আমরা সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। নানা অনিবার্য্য কারণে ও দৈব দুর্ব্বিপাকে "ভারতী" তিনমাস পিছাইয়া পড়িয়াছে। আমরা ১৫ই ফাল্গুনের মধ্যে এই ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিব এইরূপ আশা করি ও তাহার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করিতেছি। সুখে দুঃখে, বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'ভারতী' আজ আটচল্লিশ বৎসর যাঁহাদের সেবা ও চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে তাঁহারা প্রতিকূল অবস্থায় 'ভারতী'র এই অস্থায়ী ত্রুটি সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিবেন আমরা এমন ভরসা রাখি।

আমাদের দোষ গুরু, সে কথা আমরা একবারও ভুলিয়া যাই নাই কিন্তু প্রেমের চক্ষে স্নেহের পাত্রীর অনেক স্খলন পতন লঘু হইয়াই দেখা দেয়, তাই আমাদের বিশ্বাস আছে যে 'ভারতী' যাঁহাদের স্নেহে এত বড় হইয়াছে তাঁহারা তাহাকে বিলম্বের অপরাধে পরিত্যাগ বা সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

বরপণ ও "স্ত্রী অধীনতা"

গত শ্রাবণ মাসের "ভারতীতে" বরপণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দেখা গেল। কিছুকাল হইল (পৌষ ও ফাল্গুন—১৩২৮) "ভারতী"তে আমিও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। এবং তাহাতেই আমার মত জানাইয়াছি। তবে আবার যখন ইহার কথা হইতেছে, তখন উপস্থিত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এটী যে প্রবন্ধের উত্তর তাহার বিষয় ঠিক মনে না থাকায় পূর্ব্বলেখক কি বলিয়াছিলেন ধরা গেল না।

বর্ত্তমান লেখকের প্রধান বক্তব্যের সহিত আমাদেরও মিল আছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক ২।৪টি কথা সম্বন্ধেই বলিতে হয়। আমাদের সমাজে অসংখ্য বর্ণ ও শ্রেণীভেদের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা যে বরপণের একটি প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধেও সে বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছিল। তাহার পর ইংরাজী পাশের অযথা মূল্য দেওয়াও যে আর একটী কারণ, তাহাও তাহাতে বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইংরাজী পাশ কেন, মেয়ের বিবাহ যে রকম গুরুতর ব্যাপার, তাহার জন্যই পাত্রের সকল রকম গুণের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ইংরাজী পাশের দাবী তাহারই লক্ষণ মাত্র। ইংরাজী পাশে বরেরা শিক্ষিত, উন্নতিশীল ও উপার্জ্জনশীল হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়াই লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ইহার যতই ব্যতিক্রম হইতে দেখা যাইবে উহার প্রতি আকর্ষণও ততই কমিয়া যাইতে বাধ্য। এখনই তাহার সূত্রপাতও দেখা যাইতেছে। ছেলের বিবাহ ইহাপেক্ষা অনেক তুচ্ছ জিনিষ বলিয়াই কন্যার গুণের দিকে তেমন দেখা হয় না। নতুবা পাত্রী পাত্রের অপেক্ষা বিদ্যায় কম বলিয়া বরপণ খুব দেওয়া হয় না। বিশেষতঃ বিদ্যা কন্যার গুণের মধ্যে বলিয়াই এখনও তেমন স্বীকৃত নয়,— কন্যার নিকট প্রধান দাবী তাহার রূপমাত্র। তাহার কিছু মূল্য দেওয়াও হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যালাভ মানুষের চেষ্টাসাধ্য, কিন্তু রূপ নিতান্তই অদৃষ্টের দান। কাজেই ইহাতেও যে সুবিধাটুকু মেয়েদের হইতে পারে তাহাও তাঁহাদের হাতে নয়। বরং ইহাতেও তাঁহাদের দুর্দ্দশা আরও ঘনাইয়াছে। কারণ সমষ্টিহিসাবে বরকন্যা একজাতীয়, সুতরাং একই পিতামাতার সন্তান বলিয়া রূপ উভয়ের মধ্যেই সমান সংখ্যকের থাকাই সম্ভব। কিন্তু বরপক্ষে ছেলে নিজে যদি "কালী কাল, মিসি কাল" ও হন—অপ্সরা না হইলে তাঁহারও মন উঠিবে না। গরজ বরপক্ষের নয় (কেন নয় পরে দেখা যাইতেছে) বলিয়া তাঁহাদের পক্ষের দাবীটি যতই অসঙ্গত হউক, তাঁহারা উচাইয়া রাখিতে পারেন, এবং তাহার ব্যতিক্রমে টাকার অঙ্কে মায় সুদ তাহার ক্ষতিপূরণ লইতেও তাঁহাদের বাধা নাই। কিন্তু মেয়ের পক্ষে অন্য গুণ বা ইংরাজী পাশের লোভও যতই থাকুক, গরজ তাহাদের (কেন,—পরে বলা যাইতেছে) বলিয়া টাকার থলির বহরেই তাঁহাদের সকল দাবী খাট করিয়া আনিতে হয়। সুতরাং বরের বেলা ইংরাজী পাশে টাকার অঙ্ক বেশী

না। কিন্তু মেয়ের দিকে, অল্পসংখ্যক সুন্দরী ভিন্ন, যত গুণই থাক, আর সকলের বিবাহ জোটাই ভার হইয়া উঠে।

বহু বিবাহে মেয়ের দর বাড়ে না। ঐ সকল দ্বারা স্ত্রী এবং বিবাহকেই পুরুষের পক্ষে অনেক সস্তা ও হাল্কা করিয়া মেয়ের মূল্য মর্য্যাদা কমাইয়া রাখিতেছে। যেখানে এবং যখন বহু বিবাহ অত্যধিক প্রচলিত থাকে, সেখানেও মেয়ের "demand" বাড়িতে দেখা যায় না। কিন্তু "Credit" কমিয়াই থাকে। সর্ব্বত্রই কৌলীন্যাদির ন্যায় কৃত্রিম মর্য্যাদার সৃষ্টি করিয়া এবং মেয়ের বিবাহ নিয়ম কঠিন করিয়াই বহুবিবাহের পথ পরিষ্কার রাখা হয়।

সকল পুরুষেরই নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে মেয়েদের মত কঠিনভাবে নির্দ্দিষ্টশ্রেণীর মধ্য হইতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক স্ত্রী সংগ্রহ যদি বাধ্যতা মূলক হইত, তবেই বহু বিবাহে কন্যাপণের আমদানীর সম্ভাবনা বা ঐ হিসাবে একরকম "demand" ও বাড়িতে পারিত। কিন্তু তাহা নয়,—অথচ তাহার পথ খোলা। অপর দিকে কন্যার বিবাহের অবশ্য বাধ্যতা, এবং যতই ২।৪ বৎসর এ দিক ও দিক হউক, প্রায় একটী নির্দ্দিষ্টবয়সের মধ্যেই তাহার অবশ্য বাধ্যতা আছে। কিন্তু পুরুষের এই দুটীতেও অবাধ স্বাধীনতা থাকায় বিবাহ বিষয়ে নর-নারীর অবস্থা অত্যন্ত অসমান বলিয়াই মেয়ের পক্ষের গরজ এত ভারী করিয়াছে। জাতির কুলের বন্ধনও মেয়ের বেলায় যত ছেলের বেলা ততটা নয়। সুতরাং সেজন্যও মেয়েদেরই নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ। তাহার পর শুধু স্ত্রী এবং বিবাহও নয়, তাহার বাহিরেও তাঁহাদের গতিবিধি নির্ব্বাধ বলিয়া বিবাহ পুরুষের কাছে এতটা তুচ্ছ হইতে পারিয়াছে। নতুবা তাঁহাদের যে যদৃচ্ছাবয়সে বিবাহ স্বচ্ছন্দ রহিয়াছে, চরিত্ররক্ষা করিয়া থাকিতে হইলে তাহা অত "যদৃচ্ছ" হইত না। বরং বিবাহ নিয়ম সবদিকে সমান হইলে গরজ তাঁহাদের পক্ষেই ভারী হওয়া সম্ভব। এবং তাহাতেই মেয়েদের সত্য "demand" এবং "Credit' ও বাড়িতে পারে। "স্ত্রীঅধীনতা" দ্বারাই ইহার বিপরীত সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি যে নিম্নশ্রেণীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন সেখানেও মেয়েদের অধীনতা এবং অল্প বয়সে বিবাহ থাকিলেও পুরুষের বিবাহও সাধারণতঃ অল্প বয়সেই হইয়া থাকে বলিয়া "মেয়ের বিবাহের বয়স পুরুষের অনুপাতে" না বাড়ার কুফল ততটা প্রকাশ পায় না। তার পর সে স্থলেও নরনারীর নৈতিক বৈষম্য সত্ত্বেও দুর্নীতির পথ ব্যয়সাধ্য বলিয়াই কষ্ট সাধ্য, এবং স্ত্রী সাংসারিক কাজ এবং অনেক সময় উপার্জ্জন দ্বারাও সাহায্য করিয়া থাকে বলিয়া তাহার মূল্য আছে। উহাদের মধ্যেই নারীর সংখ্যার অল্পতাও বেশী বলিয়া বোধ হয়। এই সকল কারণেই তাহাদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা না থাকিলেও কনেপণ আছে।

উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ঐ কারণ গুলি স্পষ্টতঃই তেমন কাজ করে না। কাজেই নারীর অধীনতার অন্যফল গুলি কাজ করিয়া বরপণেরই সৃষ্টি করে। আর মেয়েরাই শিক্ষিতা ও উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ না করিলে যদি ইহার প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া তিনি স্বীকার

ও উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিবে না বলিয়া "বদ্ধপরিকর" হইয়া আপনাদের supply কমাইয়া রাখিতেছেনই, তখন তাঁহাদের স্থলে supply, demand এর নিয়ম কি রকম কাজ করিবে?

মূল্যেরও অবশ্য প্রকার ভেদ আছে। মূল্য যেখানে মর্য্যাদা ও সম্মানবৃদ্ধি, সেই খানেই তাহার গৌরব। নতুবা মূল্য যেখানে ক্রীত বস্তুর বিনিময় মাত্র, সেখানে তাহা অতি হীন। সে মূল্য ত দাসেরও আছে। বরং স্বাধীনতাই অমূল্য। সেই জন্য নিম্নশ্রেণীর কনেপণের সহিত বরপণেরও তুলনা হয় না। কারণ তাহাতে বরেরা ক্রীত হন না। দান করিয়াও তাহাদের পদলুণ্ঠিত হইয়াই, থাকিতে হয়। এবং বাধ্যতামূলক হইলেও তাহা দান, মূল্য নয়। কিন্তু মেয়ের বেলা পণ দিতে হইলে, তাঁহাকে একেবারে ক্রীতবস্তু বলিয়া মনে করা হয়। এই দেখিয়াও উচ্চ সমাজে বরপণ দেওয়া চলিত হইয়া থাকিবে। কৌলীন্য অবশ্য তাহাকে দৃঢ়তর করিয়াছে। কিন্তু ভিতরের অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া এ রকম উপরের সাধুচেষ্টায় কোন ফল হয় না। অন্তরের ক্ষত তাহার মধ্য হইতেও কোন না কোন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই মেয়েদের অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া ঐভাবে তাঁহাদের সম্মান-রক্ষা করিতে গিয়া ইহাও অপর দিকে তাঁহাদের ঘোর অসম্মান ও মূল্য হীনতায় দাঁড়াইয়াছে।

এদিকে বরপণের সহিত কন্যার নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিবাহের অবশ্য বাধ্যতার জন্য কেবল পাশ করা ছেলের দরই যে বাড়িতেছে তাহা নয়। নির্গুণ, রুগ্ন, বৃদ্ধ, বিপত্নীক, বহুবিবাহকারীরাও বিবাহবাজারে উপযাচিত হইতেছে। কারণ সেগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া গরিবরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদের দিকে ঝুঁকিতে বাধ্য হইতেছে।* নির্দ্দিষ্ট বয়সে মেয়ের বিবাহের বাধ্যতার সহিত বরপণের মণিকাঞ্চনযোগ না হইলে অবশ্য তাহারাও উহাদের পুঁছিত না সুতরাং বহুবিবাহাদিও বরপণের দ্বারা পুষ্ট ও প্রশ্রয়প্রাপ্তই হইতেছে। বিবাহে শ্রেণীভেদে সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইলে অবশ্য ইহার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু তাহার সহিত মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, রাষ্ট্র-সামাজিক, নৈতিক সাম্যও চাই। নতুবা এ সকলের জড় রহিয়াই যাইবে; কারণ "স্ত্রীঅধীনতা"র মধ্যে কন্যাপণ আছে বলিয়া বরপণটিও যে "স্ত্রীঅধীনতার" পরিচয় নয় দেখা গেল। একই অধীনতা ভিন্নক্ষেত্রে ও ভিন্ন কারণে বিভিন্ন-রূপে কাজ করে মাত্র। সুতরাং মেয়েদের অধীনতা যে ইহার মোটেই কারণ নয় বলা চলে না। সকল বিষয়ে ভার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাত্র, পাত্রী পাইবার জন্য যদি কেহ ঘুষ দেয়, তাহা স্বতন্ত্র পক্ষের কথা। সে উৎকৃষ্টতা যে কি হইবে তাহাও উভয় পক্ষের রুচি, প্রয়োজন ও আগ্রহের মাত্রার উপরই নির্ভর করিবে। যেমন আমেরিকায় ধনী ধনীকন্যাদের আভিজাত্যও প্রথাভিজাত্যমূলক পদবী আবশ্যক, ইউরোপের অভিজাত পুত্রদের ধন আবশ্যক কাজেই তাঁহারা উহার বিনিময় করিয়া থাকেন। তাহার

* এ বিষয়ও আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

সহিত আমাদের বরপণের কোনই তুলনা হয় না আর তাহা হইলে, উহা কেবল বরপণও হয় না, কনেপণ বরপণ দুই-ই সে হইবে তিনিও বলিয়াছেন।

কৌলীন্যপ্রথায় কুলীনের মেয়েদের পক্ষেই বা বরপণ কোথায় কমিয়া থাকে? কৌলীন্যে কুলীনের ছেলেদের শ্রোত্রিয়াদিতেও অবাধগতি। কিন্তু কুলীনের মেয়ের কুলীনের ছেলেই ভরসা বলিয়া তাহাদের বিবাহই জুটিত না। এবং কুলীনের ছেলেকে কুলীনের মেয়েদেরই কি পণ দিতে হয়? বহুবিবাহই বা এই সব কারণে উহাতে কি রকম প্রশ্রয় পাইয়াছে? আর এখন কুলীনের মেয়েদের কৌলীন্যের গণ্ডী একটু শিথিল করিয়া তাঁহারা কাপে, শ্রোত্রিয়ে নামিতে চাহিলে উহারাও তাঁহাদের কাছ হইতে এককড়ি কম লন না। ইহার দৃষ্টান্ত নিত্যই চোখে আসিতেছে। তবে কায়স্থসমাজে জ্যেষ্ঠপুত্রের কুলীনকন্যা বিবাহের একটী রীতি আছে শোনা যায়। হয়ত সেই স্থলেই কুলীনকন্যার পণ কম থাকিতে পারে। জানিনা তাঁহারা কয়জনে সে নিয়মটী মানিয়া চলিতেছেন। অবশ্য মানিবার আবশ্যকতাও যে নাই বলাই বাহুল্য।

তারপর বরকন্যার শিক্ষার তারতম্য যে বরপণের কারণ, ইহা তিনি এত বলিয়া উহার প্রতিকার নির্দ্দেশের সময় কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার উল্লেখমাত্র করেন নাই। মেয়েরা শিক্ষিত, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিলেও যে ইহা নিবারিত হইতে পারে, তাহাও স্বীকার করিয়া উহা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া সারিয়াছেন। কিন্তু তিনি "বাঞ্ছনীয় নহে" বলিলেও রক্ষণশীলেরা পর্য্যন্তও আজকাল ইহার বাঞ্ছনীয়তা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ও মানুষের অধিকার লাভ করিতে এই পথই মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন আছে! তবে মেয়েদের উপার্জ্জনক্ষমতা ও তাহার পথই যাহাতে খোলা থাকে, কিন্তু উহা তাঁহাদের সকলের চিরদিন বাধ্যতামূলক হইয়া না দাঁড়ায়, তাহার জন্য পিতামাতার কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পুরুষের স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালন বাধ্যতা, স্বামীর অর্থে স্ত্রীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সকলরকম উত্তরাধিকারে মেয়েদের সম্বন্ধে ন্যায্যব্যবস্থার দ্বারা তাহার অবাঞ্ছনীয় দিক রোধ করা যাইতে পারে। এমন কি ইহার সহিত অসহায় মাতৃত্বের স্থলে রাষ্ট্র-সাহায্যের ব্যবস্থাও দরকার।

"পুত্র পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী" হয় বলিয়া "মেয়ের কিছুটা অংশ" পাওয়া যদি "খুবই ন্যায়সঙ্গত" হয়, তবে তাহা বরপণের দ্বারা করিবার দরকার কি?—যাহার যেমন অবস্থা সেই অনুসারে পুত্রকন্যাকে সমানভাবে দিবার ব্যবস্থা করিলেই ত গোল মিটিয়া যায়। বরপণের অর্থও কি মেয়ে পাইয়া থাকেন?—না, মেয়েকে দেওয়া হয়? মেয়ে, মেয়ে বলিয়াই নীচ জন্য বরের মর্য্যাদাস্বরূপই উহা দেওয়া হয় না কি? মেয়েকেও যখন যাহা দিতে হয়, তাহা আপনার ইচ্ছা ও অবস্থানুসারেই ত হওয়া উচিত, অপরের হুকুম ও মর্জ্জিমত বাধ্য হইয়া তাহা দিতে হইবে কেন? ইহাতে কেহ ফাঁকি দিতে পারেন বলিয়া উত্তরাধিকারে

তারপর বরপণ যে "one-sided নয়" বলা হইয়াছে, পিতার পক্ষে তাহা না হইতে পারে। কারণ একই পিতার পুত্রকন্যা দুইই থাকিতে পারে। সুতরাং এক ক্ষেত্রে তাঁহাকে যেমন দিতে হয়, অপরত্র তেমনি তিনি পাইতেও পারেন। (ইহা না হইলে বোধ হয় চলিতেও পারিত না!) সেইজন্য কোন লেখিকা যে ইহাতে "নরনিগ্রহ"ই দেখিয়াছিলেন, তাহাও নয়। "নিগ্রহ" নারীরই, এবং পণটী মেয়ের পক্ষে "one-sided" ও। মেয়ের সম্পর্কীত বলিয়াই তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরাও তাহার ফলভোগ করেন।

প্রকৃতকারণগুলি দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া ও চাপা রাখিয়া বরপণের বিরুদ্ধে কেবল নৈতিক বক্তৃতা ঝাড়িলে ইহার "উচ্ছেদ সম্ভবপর" অবশ্যই নয়। ইহা আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধেও যথেষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য জাতি ও শ্রেণীভেদ আলগা করা, ইংরাজীপাশের অযথা দর কমান যেমন আবশ্যক, মেয়েদের শিক্ষাস্বাধীনতাও যে তাহাপেক্ষা কিছু কম নয় ইহা আগেই দেখা গেল। আর প্রায় সকল সামাজিকপ্রথার সহিতই "স্ত্রীপরাধীনতা" জড়াইয়া আছে বলিয়াই যে কোন প্রথার আলোচনা করিলেই উহা বাহির হইয়া পড়ে।

"স্ত্রীস্বাধীনতার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী" হইয়া তিনি "স্ত্রীস্বাধীনতার ধুয়া উঠিয়াছে" কথাটাই বা বলিতে পারিলেন কিরূপে বোঝা গেল না। যাহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার সম্বন্ধে এরকম ভাষা আমাদের সাধারণতঃ বাহির হয় না।

আর একটী মজার কথা এই, মেয়েদের শিক্ষা স্বাধীনতা দিতে তেমন প্রধান শাস্ত্র ও ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করিতে না হইলেও তাহাতে সকলে নীরব হইয়া যান। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই আমাদের শাস্ত্র, ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব হইলেও তাহার সম্বন্ধে গুরুতর পরিবর্ত্তন আগেই যথেষ্ট ত হইয়াছেই, এখন তাহার মুলোচ্ছেদ করিতেও অনেকেই ইতস্ততঃ করিতেছেন না! কারণ এ প্রথাটী "স্ত্রীঅধীনতা"র উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বটে। ইহা পুরুষেরই একশ্রেণীর উপর অপরের আধিপত্যের চিহ্ন। তবে মেয়েরাও জাতির অন্তর্ভূক্ত বলিয়া তাহার ফলভোগ অবশ্যই করিয়া থাকেন। আর জাতিভেদের নিয়মেও পুরুষের বিবাহে তাহার অনেক শৈথিল্য কিন্তু মেয়েদের বেলাতেই যে উহার আঁটাআঁটি বেশী, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। সুতরাং যে প্রথাগুলি সাধারণ, তাহারও বন্ধন দুঃখ হইতে মেয়েরা নিষ্কৃতি পান না। উহার উপর আবার সবক্ষেত্রেই তাঁহাদের বেলা অধিকন্তু ও থাকে।

এক হিসাবে কিন্তু লেখকের "স্ত্রীস্বাধীনতার ধুয়া"র কথা সম্পূর্ণই মানিতে হয়। কারণ সত্য এখন স্ত্রীস্বাধীনতার ধুয়া যথেষ্টই উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ ধুয়াই। আর যাঁহারা এই ধুয়া তোলেন, কাজে ও মতে তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাঁহাদের স্ত্রীজাতির পরমবন্ধু ও দরদী না বলিলে চটিয়াও থাকেন! আগে সে গুলিকে লোকে যথেষ্ট মন্দ বলিত এবং সৎলোকে ঘৃণা করিতেন, এখন তাহারও গুণগান এবং

সেগুলিকে পরম ন্যায্য ও স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার বিষম চেষ্টাও সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পুরুষের বহুবিবাহাদি সকলরকম শৈথিল্যের সমর্থন দ্বারা নরনারীর নৈতিক বৈষম্যটীকেই আঁকড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে প্রধান। পাশ্চাত্যদেশেও ইহার খুবই স্রোত চলিতেছে। এবং মেয়েদের মুক্তির নামমাত্রই সেখান হইতে আমাদের দেশেও উহার আমদানী হইতেছে। নরনারীর সম্বন্ধের মূলগলদ এইখানে বলিয়াই বোধ হয় ইহার জন্য একটা প্রাণপণ হইয়া থাকে। পুরুষচরিত্রের সাধারণ অবনতিগ্রস্ততা ও বস্তুতন্ত্রতার বৃদ্ধি আর একটী কারণ। পাশ্চাত্যদেশে এইভাব এতই বাড়িয়াছে যে নারীরাও অল্পলোকেই ইহার বিরুদ্ধে বলিতে সাহস পান। কিন্তু আমাদের দেশেরও অন্যসব বিষয়ে "স্ত্রীঅধীনতা"র সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, পূর্ণরক্ষণশীল মেয়েদের নিকটেও একবার জিজ্ঞাসা করিলেই মেয়েদের প্রধান আপত্তি ও অভিযোগ যে কি জানিতে দেরী হইবার কথা নয়। ন্যায় ও সত্যবলবিহীন একদেশদর্শী, ভাবোচ্ছাসফেনিল, আদর্শবাদ ও যেমন অসার, অন্যায়মূল, উচ্চলক্ষ্যাদর্শাশূন্য বস্তুতন্ত্রতাও তেমনি হীন।

পাশ্চাত্যদেশের এই ভ্রষ্টতা ও অবনতিগ্রস্ততা কেবল লেখায়, বক্তৃতায় নয়, আমাদের দেশের নবীনদলের জীবনেও যে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারও অনেক কথাই সর্ব্বদা কানে আসিতেছে। কাজেই "স্ত্রীস্বাধীনতা" যাহাতে "ধুয়া"তেই পর্য্যবসিত না হয়, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা দরকার! কিন্তু একটু পথ খুলিতে না খুলিতেই এই সাধারণ-শৈথিল্য ও অবনতির প্রবলবন্যার মধ্যে প .া মেয়েদের স্বরাজ্যপ্রচেষ্টা অনেক কঠিনতর করিয়াছে সন্দেহ নাই।

আর একটী কথাও প্রসঙ্গক্রমে মনে আসিল। মেয়েদের মুক্তি এবং দেশবাসীর অধিকার লাভকেই অবনতির চিহ্ন বলিতেও শোনা যায় না, এমন নয়। ইহাকে পেটিকোটগভর্ণমেণ্ট, তরলতা ইত্যাদি নানা আখ্যাই দেওয়া হয়। বাহিরের পূজার অন্তরালে মেয়েদের প্রতি প্রকৃত মনোভাবই অবশ্য ইহাতে প্রকাশ পায়। কিন্তু একটী কথা এই মনে করিলেই হয় যে মেয়েরা যখন শারীরিক বলে দুর্ব্বলতর, তখন মেয়েদের স্বাধীনতা ও অধিকার পশুবলের উপর ন্যায়, সত্যের জয়লাভই ঘোষণা করে।

বঙ্গনারী

ঊষা

—:০:—

জগতের তুমি জাগরণী
হেম আভরণী
আঁখিভরা শ্যামা প্রকৃতিটি
মুখে মৃদু শ্রী-টি ;
নিখিলের চেতনার ফুল
আলোকে আকুল,
উঠে ফুটি নিবিড় হরষে
তোমারি পরশে।

তিমিরের স্তব্ধ কলেবরে,
করুণ অন্তরে
সোহাগের সোণার কাঠিটি,
অপলক দিঠি
ছোঁয়াইয়া দাও তুমি স্নেহে,
বসুধার গেহে
কিরণের নবারুণ-রাগে
অমনি সে জাগে।

ধরণীর জড়তা ছেদিয়া,
ধমনী ভেদিয়া
দাও তারে সেকি রক্তধারা
বেগে আত্মহারা
উচ্ছ্বসিত প্রবাহে যাহার
নাচে বক্ষ তার
আলস্যের টুটিয়া বন্ধনে
কর্ম্মের স্পন্দনে

তব শুভ আগমনে, জানি
　　মরমের বাণী
ধরিত্রীর, হয় মুখরিত'—
　　মধুকণ্ঠে গীত'
পুলকিত বিহগের স্বরে,
　　আলোর অক্ষরে
লেখে জানি হৃদয়ের ভাষা
　　তব ভালবাসা,
পুষ্পে পত্রে তৃণে মৃত্তিকায়,
　　পেলব শোভায়
জাগে তব মূরতি মধুর—
　　জ্যোতির চিকুর
এলাইয়া রূপের আকাশে,
　　দশদিকে হাসে
বরণের বর' কান্তি তব
　　স্নিগ্ধ, অভিনব।

দেবী তুমি, ঋষি-কণ্ঠে স্তুতা
　　বেদমন্ত্রে পূতা,
দিবসের প্রভা-নির্ঝরিনী
　　জননীরূপিনী ;
সৃজনের আঁধার-বিলয়ী
　　হে অমিয়ময়ী
লহ সুখে আনন্দ-মগন—
　　কবি-সম্ভাষণ।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

ভাদ্রের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে লইয়া একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে; একদল বলিতেছেন—গিরিশচন্দ্র বড় —অন্য দল বলিতেছেন—প্রতিভার বরপুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য জগতের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু কি কারণে একজন বড়, আর একজন ছোট, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা কেহই করিতেছেন না। Calcutta Review পত্রে—Modern Bengali Literature প্রবন্ধে অধ্যাপক সেন মহাশয় এমন সব হাল্কা মতামত বাহির করিয়াছেন যাহা পড়িলে হাসি পায়। তাহার বিভিন্ন মতামত এ আলোচনার অঙ্গীভূত নহে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তিনি যে সব মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই হাস্যকর; দ্বিজেন্দ্রলাল বড় ছিলেন,—কারণ তিনি কিছুদিন ইউরোপে ছিলেন—and he was a brilliant graduate দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার চমৎকার ব্যাখ্যা।" এ বিষয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার কিছুমাত্র অনৈক্য নাই। দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার ইহা চমৎকার ব্যাখ্যাই বটে। কিন্তু আমার প্রবন্ধের কোথায় দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা দেখাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। 'অবতার' পত্রে আমার প্রতি ঐ প্রকার অভিপ্রায় আরোপ করা হইয়াছিল; মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'অবতার' পড়িয়াছিলেন কারণ ঐ পত্রিকার মত ঐ পত্রিকার ভাষায়ই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন কিনা এবং পড়িয়া থাকিলে তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ অর্থ না বুঝিয়া অভিমত প্রকাশ করার অভ্যাস যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আছে তাহার প্রমাণ এই 'ভারতীর' পৃষ্ঠায়ই পাইয়াছি। গত বৎসরের মাঘ সংখ্যা ভারতীতে তিনি 'শিবাজীর নৌবহর' নামক প্রবন্ধে একখানি মারাঠি পত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। চিঠিখানি রাজবারের গ্রন্থে এবং সর দেসাইর রিয়াসতে মুদ্রিত হইয়াছিল। চিঠি খানি শিবাজী লিখিয়াছিলেন জিবাজী বিনায়ককে ভৎর্সনা করিয়া, প্রাচীন মারাঠীর অর্থগ্রহণে অসমর্থ মুখোপাধ্যায়ের মতে এই চিঠি জিবাজীই শিবাজীকে লিখিয়াছেন। তিনি যে সার সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাও আগাগোড়া ভুল। সুতরাং তিনি যদি আমার প্রবন্ধের ভাষার অর্থগ্রহণে অপারগ হইয়া থাকেন তাহাতে আমি বিচলিত হইব না। কিন্তু তিনি জানিয়া শুনিয়া আমার 'হাল্কা' ও 'হাস্যকর' মতগুলির পুনরাবৃত্তি তাঁহার সারবান প্রবন্ধে কেমন করিয়া করিলেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি—"It may be said without any fear of contradiction that they certainly open a new epoch in the history

পথে মৌলিকতার যে অলকনন্দা স্বর্গ হইতে মর্তে আনিয়া ফেলিলেন বাংলা নাট্যজগতে তাহা নব যুগের জয় ঘোষণা করিল।" আমার প্রবন্ধে আছে—"Dwijendralal has been greatly influenced by western writers. In his dramas the influence of Ibsen can be clearly seen and in his Shajahan many will perceive a shadow of Shakespeare's King Lear." মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে—"দ্বিজেন্দ্র প্রতিভা পাশ্চাত্য কবি ও নাট্যকারগণের,—বিশেষ সেক্সপীয়রের নিকট ঋণী।' অন্যত্র—"লিয়রের সহিত সাজাহানের তুলনা হয় না, সেক্সপীয়রের ভাবরাশি সাজাহানে উপযোগ করিয়া নাট্যকার ইতিহাসের সাজাহানের সহিত নাটকের সাজাহানের বিরোধ বাধাইয়াছেন। মদীয় প্রবন্ধে –We do not find in Dwijendralal's dramas the immense variety both in character and plot for which Girish Chandra is noted."

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—তাঁহার অঙ্কট চরিত্র মৌলিক কিন্তু বৈচিত্র্যহীন।' আমি লিখিয়াছি—Read any of the dramas that are staged at Calcutta to-day. The influence of Dwijendralal will be clearly perceived in Mogal Pathan and Bange Bargi. I do not mention them because they are of any merit but because they are popular. They are but poor imitations of Dwijendralal possesing all his mannerisms but none of his finer qualities." 'অবতারের' সমালোচক ইহা স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে ভূপেন্দ্র বাবু প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব এড়াইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু এখানেও মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'হাল্কা' ও 'হাস্যজনক' মত সমর্থন করিয়া লিখিতেছেন—"বর্তমানে রচিত যে কোন নাটকের পাতা উল্টাইলে তাঁহাকে অনুকরণ করিবার ব্যর্থ ও নিষ্ফল চেষ্টা দেখি" আমার প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর দুইটি কথা আছে—'It is doubtful whether Dwijendralal is greater than Girishchandra as a dramatist : probably he is not এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান সম্বন্ধে—"his songs are inimitable", মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"গান ও তাহার ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলালের আর এক মৌলিক সৃষ্টি—" এবং গিরিশ ও দ্বিজেন্দ্র উভয়েই সমান, "প্রতিভার যমজ-পুত্র।"

যাঁহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন খবরই রাখেন না এমন সব অবাঙ্গালীর জন্যই আমার প্রবন্ধ লেখা। যাঁহাদের ফরমাসে সে প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন যে ইহার আকার হাফ ক্রাউন ত্রিশ পৃষ্ঠার বেশী হইলে চলিবেনা। হিন্দী অনুবাদ পাইকা হরফের হাপ ক্রাউন ত্রিশ পৃষ্ঠায় এবং মূল ইংরাজী প্রবন্ধ রয়েল বিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সুতরাং আমি প্রত্যেক গ্রন্থ বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারি নাই। বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের কতগুলি tendency দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যরথিগণ যে অনেকে ইংরাজী শিক্ষিত

ব্যক্তি তাহাই বলিয়াছি। মাইকেল সম্বন্ধে বলিয়াছি—"He was one of the foremost scholars of his day." "Hemchandra and Nabinchandra were graduates of the Calcutta University, Rameshchandra Dutt, well known as one of the most brilliant Indian civilians"; বলা বাহুল্য ইহা তাঁহাদের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছোট ছোট হরফে ছাপা ১৪ পৃষ্ঠা ছাপা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন. আমার এক পৃষ্ঠার বেশী যায়গা ছিলনা তাহাতে যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়াছি তাহা উপরে সকলই ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি পাছে অবিচার করিয়া বসি এইজন্য ভারতীর পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "Girish was not alone in the field. Dwijendralal Ray, hitherto known as a powerful satirist and literary critic, wrote Rana Pratap; Durgadas, Nurjehan, Shahjahan and Chandra Gupta followed in quick succession. They will always have a permanent place in Bengali literature and it may be said without any fear of contradiction that they certainly open a new epoch in the history of Bengali drama. A brilliant graduate of the Calcutta University, Dwijendralal spent a number of years in Europe. On his return he was appointed a Deputy Magistrate but he spent his time mainly in studying the literature of the east and the west. A musician of considerable ability he possessed all the qualities that go to the making of a great dramatist, he generally selected one of the soul stirring episodes of Indian history that was likely to appeal not only to the patriotism of Indians but to the human heart all over the world. In Chandragupta we have an empire builder, resolved to unite all India. He is, however, not the chief figure in the drama. The chief figure is, Chanakya, the champion of Brahman supremacy. A superman in every sense of the word, with an indomitable resolution and almost unfathomable intelligence, Chanakya was absolutely heartless and pitiless. Yet he was not devoid of the softer feelings that make a man lovable. He loved his motherless daughter with all the force that a strong nature like his was

capable of. He knew that he was a genius, and he stood against God and man, when man's injustise deprived him of his all, his daughter not excepted, and God apparently indifferent. Yet he was not an atheist for he says—God, you did not enlist me on your side, I will stand against you. In him we find the struggles of a superman to keep down his natural love, pity, kindness and faith in God and this makes the drama of abiding interest. In Durgadas again we not only see the grand picture of Marwar and Mewar's war of independence against all the odds at the command of the Mughal Empire. The grim resolution of the Rajputs to leave their home and hearth to be ravaged and plundered by the Mughal soldiery but not to bend their knees before Aurangzib. This naturally appealed to the theatre going public of post swadeshi Bengal. But the patriotism of the Rajputs is not the only thing depicted there. We have the selfless loyalty and the innate chivalry of Durgadas which even the ingratitude of the youngman for whom he had suffered so much could not affect. The dramas of Dwijendralal have been translated into Hindi and are well known to Hindi reading public. Dwijendralal has been greatly influenced by western writers. In his dramas the influence of Ibsen can be clearly seen and in his Shahjahan many will perceive a shadow of Shakespeare's King Lear. It is doubtful whether Dwijendralal is greater than Girishchandra as a dramatist ; probably he is not. We do not find in Dwijendralal's dramas the immense variety both in character and plot for which Girishchandra is noted but his songs are inimitable. They lose their beauty in translation and it is on this account that these grand songs যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ or যখন সঘন গগন গরজে or সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি are not so well known outside Bengal. But though Girishchandra may be greater than Dwijendralal, the age of Girishchandra is over and in the history of Bengali drama the present period will be known as the age of Dwijendralal. Read

any of the dramas that are staged at Calcutta to-day. The influence of Dwijendralal will be clearly perceived in Moghal Pathan and Bange Bargi. I do not mention them because they are of any merit but because they are popular. They are but poor imitations of Dwijendralal possessing all his mannerisms but none of his finer qualities. মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে আমার "হাল্কা ও হাস্যজনক" মতামতগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়া সে গুলিকে স্বীয় প্রবন্ধে কাপাইয়া ফুপাইয়া বেশ ভারি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। এবং তিনি যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গম্ভীর ভাবে রায় দিয়াছেন যে—কেবা ছোট কেবা বড়, সকলে সমান, তাহাতে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই তাঁহাকে স্বর্গ হইতে সাধুবাদ করিতেছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁহার গুরুভার মতামত গুলি আমি দুর্ব্বল শির নত করিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছিনা। তিনি বলিতেছেন গিরিশ গতানুগতিক ও মৌলিকতা বর্জ্জিত এবং তাঁহার হাস্যরস নোংরা ও বিসদৃশ! জনার বিদূষক, পাণ্ডবগৌরবের কঞ্চুকী, সিরাজদ্দৌলার করিম চাচা এবং তপোবলের পেটুক বামুনের অনাবিল রসিকতার সঙ্গে পরিচয় আছে বলিয়াই মানিতে পারি না যে গিরিশের হাস্যরস নোংরা বা বিসদৃশ। মাতাল দুলালচাঁদ এবং ঠক কাঙ্গালীচরণ এবং তাহার সহকারিনী যে অভদ্র আলাপ করিবে ইহাইত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। আমিও কিন্তু বিল্বমঙ্গলের ভিখারীর রসিকতাতেও নোংরা কিছু খুঁজিয়া পাই না। বোধ হয় আমার রুচি হাল্কা এবং প্রকৃতি নিতান্ত তরল বলিয়া। বিদূষক চরিত্র নাকি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ মৌলিক ও নিজস্ব। হইতে পারে কিন্তু সাজাহানের দিলদারের উক্তির সহিত King Lear এর foolএর কোন কোন উক্তির তুলনা করিতে যাইয়া আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকের অন্যরূপ ধারণা হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের মোগল রাজ-পরিবারের অন্তঃপুরিকারা যেরূপ অবাধে নিঃসঙ্কোচে দরবারে ছুটিয়া আসিয়া মোগল বাদশাহকে ভৎর্সনা করিয়া যান তাহাতে অনৈতিহাসিকতার দোষ আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু বিমল বাবুর মতে সাজাহানের চরিত্রই অনৈতিহাসিক, কেন না পিতৃদ্রোহী সাজাহান বলেন—'এমন কি পাপ করেছিলাম খোদা, যে আমার পুত্রের হাতে আজ বন্দী।' বিমলকান্তি বাবুর মত নির্ম্মল চরিত্র ব্যক্তিরা হয় ত তাহাদের পাপের কথা দোষের কথা কখনই বিস্মৃত হন না কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বভাবই এই যে দুঃখের দিনে নিজের অন্যায় ভুলিয়া তাহারা ভগবানের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। মাইকেলের রাবণও এইরূপ 'কি পাপে এরূপ বিধি লিখেছিলে ভালে—'বলিয়া বিধাতাকে অনুযোগ করিয়াছিল। অস্বাভাবিক রাবণের মনেই ছিলনা যে সীতা তখনও অশোক কাননে বন্দিনী। সাজাহানের চিঠি পত্র এখনও নষ্ট হয় নাই তাহাতে এইরূপ অভিমানই দুই একস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিহাস

বলে শেষে খোয়া যাইবার ভয়ে তিনি সত্য সত্যই মণিমুক্তা পরিয়া থাকিতেন; একবার তাহার মূল্যবান জহরত গুলি চূর্ণ করিয়া ফেলিবার ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের অমর্য্যাদা করেন নাই। করিয়াছেন উনবিংশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ এন্‌টিগোনাসকে কনিষ্ঠ সেলিউকসের পুত্রে পরিণত করিয়া, এরূপ অনৈতিহাসিকতা গিরিশ-চন্দ্রের নাটকে বিরল। বিমলবাবু দিব্যদৃষ্টিতে চন্দ্রগুপ্তে সেকালের একখানি নিখুঁত চিত্র দেখিয়াছেন—আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাহা দেখি নাই। যাক্‌, বোধহয় আবার কতক-গুলি 'হাল্কা' ও 'হাস্যকর' মতামত জাহির করিয়া অনধিকার চর্চ্চার পাতক বাড়াইতেছি সুতরাং আর পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি না করিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেছি। তাঁহা-দিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি এ বিষয় লইয়া আর তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব না বিশেষতঃ যখন a Daniel has come to Judgement.

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

বাঁশী

-:•:-

ছেলের হাতের খেলনা আমি বাঁশী
গোটা মেলার স্ফূর্ত্তি আমার বুকে,
পুলক আমি রূপ ধরিয়া আসি
অফুট কুঁড়ির চুমা আমার মুখে।

সাঁওতাল ও ভীল তারা আমায় চেনে
সরল বুকের আমি সরল সাথী,
মউয়া ফুলের দিই পরিমল এনে
উৎসব ময় করি উদাস রাতি।

তরুণ হৃদে গুঞ্জন আমি করি,
সুধার ভোজে আমার নিমন্ত্রণ ;
গভীর রাতে গুমরে আমি মরি
পীযূষ হানি বিষ করি মন্থন।

নির্ঝর ছুটাই শুষ্ক মরুর প্রাণে,
কুসুম ফোটাই বক্ষ মরুর ঘিরি,
অনুরাগী আমার কদর জানে
রূপের রসের খবর দিয়েই ফিরি।

আমি বাঁশী অসির চেয়ে দামী
আমি ভ্রমর মধুর ব্যবসায়ী
প্রণয় আমি চণ্ডীদাস যে আমি
যৌবন আমি কোষ্ঠী আমার নাহি।

বংশী আমি রাই কানু হাত ধরা।
কিশোর বুকের প্রণয় পেয়ে সুখী
কলসী ছেঁদা কালিন্দী তায় ভরা
বুকের ফাঁকে বসন্ত দেয় উঁকি।

শ্রীকু ম:দ:ঞ্জন মল্লিক।

বার্ণাড-শ

বার্ণাড-শ বলেছেন আধুনিক নাটকের উদ্দেশ্য হচ্ছে—illumin itirn of life, বা জীবনের দেয়ালি! ইবসেনের মতো পৃথিবীর পুরাতন জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ; এবং প্রচার করা বা উপদেশ দেওয়া তাঁর ধর্ম্ম নয়, কেননা যে নাটক প্রচার করতে সুরু করে তাকে কখনো আর্ট বলা যায় না! ইবসেন আর গ্যালস্‌ওয়ার্দ্দি নাটক লেখেন social implications নিয়ে, আর শ লেখেন social injunctions নিয়ে, অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্মভাবে শুধু সামাজিক জীবের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করে যান না, তিনি উদ্দেশ্য নিয়ে লেখেন চরিত্রের স্থূলতার দিকে দৃষ্টি রেখে।

বিলিতি থিয়েটারে আজ কাল গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দিই সব চেয়ে চতুর নিপুণ কলাবিৎ, শ technipueকে একেবারে বাদ দিয়েছেন। গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দি শ-র মতো ভাবতে পারেন না বটে, কিন্তু জিনিষ তৈরী করেন শ-র চাইতে বেশী চমৎকার। তাঁর সংযম কথায়, dialogueএ আর শ-র সংযম চরিত্রে, characterএ। এই চরিত্র গঠনের সংযমই শ-র মধ্যে mysticismএর ভাব এনেচে। শ-র মাল মসলা আছে ঢের, কিন্তু তা দিয়ে জিনিষ তৈরী করতে তিনি এত অনিচ্ছুক, যে তাঁর এই কৃপণতা ভারী অবাক্ করে। সেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করলে বোঝা যায়, শেক্সপীয়র যেখানে ছড়িয়ে পড়েচেন দিকে দিকে, শ সেইখানে চুপ করে' বসে আছেন নিজের আঁকা বাঁকা সেই একখানি পথের কিনারায়! তার একটা কারণ আছে। শেক্সপীয়রের প্রতিপাদ্য হচ্চে লোক, আর শ-র হচ্চে doctrine। তাই শেক্সপীয়র লোকের বিচিত্রতা দ্যাখাতে গিয়ে অনেক ভাবে ছবি এঁকেচেন, শ তাঁর doctrineএর সার্থকতা দ্যাখাতে বেশী চরিত্রের আমদানী করেন-নি। তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে বারোটি আলাদা ভিন্ন প্রকৃতির লোক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তিনি প্রায় আটত্রিশ খানা নাটক লিখেচেন কিন্তু সবগুলি যেন অবিচ্ছিন্ন গানের একটি সুর, একটা বড় গল্পেরই এক-একটা পরিচ্ছেদ! ...শ প্রথম উপন্যাস লিখতে সুরু করেন, পাঁচখানা তিনি লিখেছিলেন, চারখানা তাঁর মধ্যে ছাপা হয়েচে; তাতে তাঁর বলার বিশেষ সুবিধা হোল না দেখে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাঁর ঝোঁক হোল। কিন্তু তিনি তাঁর নভেলগুলোকে নষ্ট হতে দিলেন না। তাদের তিনি নাটকে রূপান্তরিত করলেন। তাঁর এই আটত্রিশখানি নাটকে এমন খুব অল্প জিনিষই আছে যা কোনো না কোনো নভেলে অপরিণত অবস্থায় না পাওয়া যাবে।...Major Barbara, ও You never can tell বই দুখানি একটু ভালো করে দেখলেই টের পাওয়া যায়, এ দুখানি প্রায় একই ছাঁচে গড়া হয়েছে। প্রথমটির Lady Britomart Undershaft দ্বিতীয় নাটকটির Mrs Clandon এই দুটি স্ত্রীলোকের situationও একই রকমের। তাঁরা দুজনেই বিনা কারণে

ছেলে আছে, উভয় ক্ষেত্রেই সন্তানদের, বাপের কথা ভালো মনে নেই। Stephen Undershaft ও Philip Clandonএ শুধু একটু পার্থক্য আছে; মনে হয় Undershaft পরিবারকে Clandon পরিবারে রূপান্তরিত কর্‌তে গিয়ে এখানেই বার্ণাড-শর একটু ভুল হয়ে গেচে।...

গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দির মতো শ র বর্ণনা ও আবহাওয়ার হুবহু সত্যতা নেই, কেমন একটা অবহেলা, ঠিক অনেকটা শেক্সপীয়রের মতো। ...রুশিয়ার নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক শেকভের নাটক দেখে শ অনেকটা চালিত হয়েছিলেন, যদিও শেকভের সঙ্গে শ-র কোনো মিল্ নেই। শ বকে যেতে পারেন অনর্গল যেখানে সেখানে, আর শেকভ একদম নির্ব্বাক উদাসীন। শেকভের চরিত্রগুলি যত পারে কম কথা কয় অনেকটা গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দির মতো, কিন্তু শ-র চরিত্রগুলি যা দরকার নয়, তার চেয়েও বেশীক্ষণ বক্‌তে থাকে। কথোপকথনের মধ্যে শেকভের থাকে নির্ব্বিকার পক্ষপাতিত্বহীনতা, আর শ-র থাকে বাচালতা, তর্কলোলুপতা argumentativencss। শেকভ লেখেন সত্যকারের নাটক, আর শ লেখেন অনেকটা তর্ক ও বাক্‌যুদ্ধ।...শ-র Heartbreak House নাটকটাকে বলা হয়েচে a Fantasia in the Russian manner of English themes."...

বার্ণাড-শর মধ্যে একটা নেতৃত্বের ভাব আছে; তিনি শুধু পথ দ্যাখান না, উঁচু গলায় বলেন—এই পথে আমার সঙ্গে চল!...তিনি বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা যার মীমাংসা না করেচেন, তাকে তিনি কোনো যুক্তিতেই গ্রহণ করবেন না। হৃদয়ের অনুভূতিতে তাই তাঁর এত মর্চে ধরে আছে। বিশৃঙ্খলা ও অসংলগ্নতার মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য আছে এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর বই পড়ে মনে হয় না যে প্রকৃতির প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো টান আছে। সামাজিক বা নৈতিক সম্পর্ক ছাড়া এই গাছ পাতা ফুল ফল প্রভৃতির যে চমৎকার একটি রমণীয়তা ও মাধুর্য্য আছে এ কথা শ-র মোটে জানা নেই। তিনি Dr Johnsonএর মতোই মনে করেন এই মাঠ সেই মাঠেরই মতো, এই জলের রং ঐ জলেরই রং!...St. Pauls Cathedral ভেঙে গেলে শ-র এক কণাও দুঃখ হবে না যদি তাতে সাধারণ পুরবাসীদের জীবন ধারণের সুবিধা হয়।...ফ্রান্সের পক্ষে তাঁর মতে Rheims cathedralএর চাইতে একটা ভালো drainage system বেশী উপকারী।...তাঁর কাছে শেক্সপীয়রের নাটকের চাইতে একটা ভালো ফাউণ্টেন্‌পেন্ বেশী মূল্যবান!...এম্‌নি সব অদ্ভুত মত ও logic নিয়ে আর একজন লেখক জন্মগ্রহণ করেচিলেন ডাবলিনে, তাঁর নাম Francis Sheely Skeffington। শ-র মতো তিনিও এম্‌নি অদ্ভুত তর্ক করতে চাইতেন, কিন্তু শ-র মতো তাঁর কৌতুক ও ব্যঙ্গ ছিল না। এই ব্যঙ্গ কৌতুক দ্বারাই শ সাধারণ চাষা মুটে মজুর কুলীর সম্পর্কে আস্‌তে পেরেছিলেন। Syuge ও Skeffington কারুরই এই কৌতুক ছিল না, তাই তাঁদের বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ হয়ে থাক্‌তে হত। শ-র মধ্যে শুধু এই কৌতুকই নয়, তাঁর মধ্যে আছে প্রখর বুদ্ধিমত্তা, উদার হৃদয়, অটল সাহস ও দৃঢ় সাধুতা; তার মধ্যে আছে যত

সব কুসংস্কার ও ভেদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ, এবং তাই দিয়ে তিনি সবাইর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন।

বার্ণাড -শ ভারী লাজুক এবং অল্পতেই ভারী অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর নিজের এই স্বভাবগত দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর এই লজ্জা বিনয় ও দুর্ব্বলতা তাঁর কাপুরুষতা ও অযোগ্যতার প্রমাণ বলেই মনে হচ্ছিল, এবং এভাবে থাক্‌লে কেউ তাঁকে স্বীকারই কর্‌বেনা। প্রথম বয়স থেকেই তাঁর যশের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা হোল। ব্রাউনিঙের মতো বৃদ্ধ বয়সে, কিম্বা কাট্‌সের মতো মৃত্যুর পরে, যশের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন-না। তিনি নিজেকে জাহির কর্‌বার জন্য প্রথম থেকে বক্তৃতা সুরু কর্‌লেন, এবং কী করে' শ্রোতাদের মন হরণ কর্‌তে পারেন তারো শিক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। অদ্ভুত পোষাক পর্‌তেন, দাঁড়ী-গোঁফ কামাতেন না, এবং Evening dress সিল্কের টুপী ও boiled shirt এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌লেন।···প্রথমে বল্‌তেন—তিনি শেক্সপীয়রের চাইতে ভালো লেখেন, এই আশায় বল্‌তেন যে লোকে তাঁকে পাগল বলে' উড়িয়ে দিলেও এই লোকটার লেখার খোঁজ হয়ত তারা একটু কর্‌বে। · পরে বল্‌তেন—তিনি একজন নাস্তিক, এবং তিনি বটতলার অশ্লীল বই লেখেন।...শেষে বল্‌লেন—তিনি একজন Socialist। কিন্তু তাঁর এই Socialism সত্যি সত্যিই তাঁর জীবনের পরম ধর্ম্ম,এটা শুধু বক্তৃতায় লোক ভোলাবার কৌশল নয়।···লোক হাসাবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। শ্রোতারা সাধারণতঃ শ-র সঙ্গে এক পেট হাসে বটে, কিন্তু শ-র চিন্তা ভাব ও বাণী তাদের মনে অমর একটা চিহ্ন রেখে যায়।···

বার্ণাড-শ ও এইচ, জি ওয়েল্‌সের একটা একসঙ্গে তোলা ফটোগ্রাফ আছে। তাঁরা দু'জনে তাতে পাশাপাশি বসে' আছেন। ছবিতে দু'জনের বিশেষ ভঙ্গীগুলি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌লে দুজনেরই বিশেষত্ব বেশ টের পাওয়া যায়।···শ-র চোখে ঋষির মতন গম্ভীর উদাস দৃষ্টি, ওয়েল্‌স্-এর চোখে অবিশ্বাসের ছোট্ট একটি হাসি! শ-র মুখে বিশ্বাস, ওয়েল্‌স্-এর মুখে জিজ্ঞাসা! শ যেন বসেচেন বেশ নিশ্চিন্ত আরামে, আর ওয়েল্‌স্‌এর বসার মধ্যে কি একটা অস্বস্তি রয়েচে!···ওয়েল্‌স্-এর সঙ্গে শ-র মতের অনেক প্রভেদ আছে। মন্দর থেকে ভালো হওয়াটা শ অবশ্যম্ভাবী মনে করেন-না, ওয়েল্‌স্ অবশ্যম্ভাবী বলেই বিশ্বাস করেন এবং প্রমাণ দ্যাখাতে ইতিহাসের নজীর পাড়েন!···

লেখার মধ্যে লেখকের ভাবে ভাষায় জ্ঞানে চরিত্রগঠনে ক্রমশঃ উন্নতি দ্যাখা যায়, লিখনভঙ্গীর বিচিত্রতাও থাকে। শ-র মধ্যে তেমন কিছু পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আছে বলে' মনে হয় না। মনে হয়, সবখানে তিনি একই ভাবে বিরাজ কর্‌চেন। তাঁর Love among the artists, The Irrational knot, Cashel Byron's professicn প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর ভাষা ঠিক একরকম ভাবেই আছে, ঠিক একঘেয়ে বাঁশীর সুরের মতো! তবে এ-গুলির ভাষা একটু উচ্ছৃঙ্খল, আবার যখন একটু সংযত হবার চেষ্টা কর্‌লেন, তখন আবার সমস্ত লেখার ভাষা একঘেয়ে হয়ে গেল. যেমন Man and Superman, Joha Bull's other Island

Heartbreak House. Back to Methuselah. এইখানে George Moore এর সঙ্গে তাঁর ভারী তফাৎ Mooreএর A midsnummer wife এর সঙ্গে The Lake অথবা The Boo Karithএর কোনো সংশ্রব নেই। Moore এর আগের ও শেষের লেখার মধ্যে খুব একটা ভেদ আছে, প্রথমে তাঁর ভাষার স্রোত ছিল সরোবরের জলের মতো, এখন হয়েচে নদীর বাঁধনহারা জলোচ্ছাসের ন্যায়!...

শ তরুণ সাহিত্যিকদের ভারী ভালো বাসেন এবং তাদের সঙ্গ পেলে তিনি ভারী খুসী হন। অসংখ্য ভাবে তিনি তাদের সাহায্য করে' থাকেন, কিন্তু কোনোদিন তার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন-না। প্রায় সত্তরে তিনি পা দিতে চল্‌লেন, কিন্তু মুখে তাঁর বার্দ্ধক্যের লেশ মাত্র নেই। এ-ক্ষেত্রে আমাদের রবীন্দ্রনাথের চেহারার কথা বারে-বারে মনে পড়ে' যায়। আগে শ-র চুল লাল ছিল এখন তা প্রায় শাদা হয়ে এসেচে। তাঁর মনে এখনো যৌবনের সেই হিল্লোল, সেই তেজ, সেই মাদকতা! তাঁর চলার ভঙ্গী আনন্দময়, লঘু, ঠিক হরিণশাবকের মতো! তাঁর দীর্ঘ, কৃশ, সুন্দর, বিলাসী পরিচ্ছন্ন চেহারার পানে তাকালে, তাঁর স্নিগ্ধ সুকোমল দৃষ্টি, সুগঠিত দুখানি হাত ও ছন্দোময় গতিখানি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌লে মনে হয় তিনি ত্রিশ বছরও পেরোন-নি; তিনি কিছুতেই বুড়ো হতে চান না; প্রকৃতি তাঁকে বাইরে জীর্ণ কর্‌লেও তাঁর তরস্ত মন আর আর বুড়োদের মতো ফোঁপ্‌রা হয়ে যায় নি। তাঁর মধ্যে এই অসাধারণ যৌবন ও প্রাণ রয়েচে বলে'ই, যা-কিছু গতির অভাবে বদ্ধ সংকীর্ণ হয়ে পড়েচে তার বিরুদ্ধে তিনি এমন চড়া গলায় বিদ্রোহ প্রচার কর্‌তে পারেন, এবং আজো তাঁর মাঝে এই তারুণ্য ও প্রফুল্লতার অভাব হয়নি বলে'ই তাঁর তরুণ সহচরের আর অন্ত নেই।...

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

বিল্বমঙ্গল

বিল্বমঙ্গল নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একখানি উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া প্রসিদ্ধ! নাটক হিসাবে ইহার সফলতা কতদূর সে আলোচনা আমরা এস্থলে করিবনা, যে সমস্ত দার্শনিক উপাদানের দ্বারা নায়ক বিল্বমঙ্গলের চরিত্রের বিকাশ সাধন করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বেশ্যাগত প্রাণ বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণগত প্রাণ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর হইলেন—ইহাই আখ্যায়িকার মোট কথা। ইহার সৃষ্টি করিতে কবিকে যে আয়োজন করিতে হইয়াছে এবং ইহার পরিপুষ্টি ও পূর্ণ বিকাশের জন্য যে সমস্ত দার্শনিক ভাব সমূহের ঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই আমরা দেখিব।

সাধারণ মানুষের স্তর হইতে দেখিলে আমরা প্রথমেই বিল্বমঙ্গলকে দেখিতে পাই— একজন বেশ্যাসক্ত পুরুষ, বেশ্যাকে ভালবাসিয়াছেন। বেশ্যাকে ভালবাসা অর্থে এখানে কামলালসা পরিতৃপ্তির জন্য প্রবল আসক্তি বা তজ্জনিত সাময়িক একটু আত্মীয়তা নয়— অবশ্য আসক্তি ইহাকে বলিতেই হইবে এবং বিল্বমঙ্গলও তাহাতে মুগ্ধ, ইহা নিশ্চয়—তবে ইহাতে আন্তরিকতা আছে, হৃদয় আছে কিন্তু ভাণ নাই তাহা আমরা এখনি দেখিতে পাইব। চিন্তামণির বাড়ী হইতে পথে বাহির হইয়াই বিল্বমঙ্গল বলিতেছেন

"আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো।"

তাঁহার রাগ হইয়াছে—তা'ত হইবারই কথা, ভালবাসার লোকের সামান্য ত্রুটীতেই যে রাগ হয়—অবশ্য পাশব ক্রোধ নয়, অভিমান। ভয়ানক রাগ হইয়াছে, বলিতেছেন— "আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখ দর্শন কচ্চি না! যেমন চলে এসেছি, তেমনি ব্যস—আজ থেকে খতম।" আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন—"যদি কখন দেখা হয়",— এখানে মুখ দর্শন করিব না বলিলেও তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ বলবতী, "জুটো কথা শুনিয়ে দেবো," কথা কহিবার লোভও যথেষ্ট, "কড়া নয়, মিষ্টি। না বলে আসাটা ভাল হয় নি;" সামান্য ত্রুটিতেই প্রবল রাগ, কিন্তু ভালবাসার পাত্রকে শাস্তি দিতে অন্তরে ব্যথা বাজে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। চিন্তামণিকে ছাড়িয়া আসা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয়। কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া যাইতেও পারেন না অভিমানটুকুও আছে। আবার ইহাও দেখাইতে হইবে যে চিন্তামণিকে তিনি মোটেই ভালবাসেন না, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে, চিন্তামণিকে তিনি খুব ভালবাসেন, চিন্তামণিকে তিনি প্রাণ দিয়াছেন, চিন্তামণি তাঁহার চিন্তারই মণি। ক্রমশঃ আমরা ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইব।

পথিমধ্যে এক ভিক্ষুকের সহিত সাক্ষাৎ; তাহাকে ধরিয়া চিন্তামণির বাড়ী পাঠাইতে হইবে। কেন? দেখিতে হইবে সে কি করিতেছে এবং বলিয়া আসিবে, বিল্বমঙ্গল আর আসিবে না। ভাবিতেছেন "এই ব্যাটাকে দে সন্ধান নিই, বেটীর মন একটু ধুকপুক কর্ত্তেই হবে"। আমার মন যখন এত ধড়ফড় করিতেছে তখন তাহার মন একটু ধুকপুক নিশ্চয়ই করিতেছে যেহেতু আমি তাহাকে ভালবাসি। ইহাই বিল্বমঙ্গলের যুক্তি, ইহাই ভালবাসার রীতি।

ভিক্ষুককে পাঠাইয়া বিল্বমঙ্গল অপেক্ষা করিতেছেন। এদিকে চিন্তামণি স্নানে বাহির হইয়াছে। চিন্তামণিকে দেখিয়া বিল্বমঙ্গল ঝোপের মধ্যে লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন, চিন্তামণি দেখিয়া ফেলিয়াছে আর লুকান চলে না, তখন সম্মুখে আসিয়া বলিলেন।

"দ্যাখ, আমি এপারে কাঠ কিন্‌তে এসেছিলাম; দেখা হলত একটা কথা বলে যাই"। পাছে চিন্তামণি বুঝতে পারে যে বিল্বমঙ্গল এখনও যায় নাই

বলিলেন, আমি কাঠ কিন্‌তে এসেছিলাম। চিন্তামণিকে বিশেষ রকমে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে বিল্বমঙ্গল তাহাকে ভালবাসে না, কিন্তু প্রতিপদেই বিল্বমঙ্গল ধরা পড়িয়াছেন।

চিন্তামণিকে ছাড়িয়া যাইতে বিল্বমঙ্গলের মন সরে না চিন্তামণির অদর্শন সহ্য হয় না। খানিক দূর যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কোন কারণ নাই। একটা কথা বলিতে হইবে, অথচ বলিবার কিছুই নাই—'ভালবাসি' এই কথাটী ছাড়া, কিন্তু ও কথা চিন্তামণিকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেওয়া হইবে না। তাই বলিলেন—"আমি আজ রাত্তিরে আস্‌তে পারব না—আমার কাপড় ক'খানা গুছিয়ে রেখ। চলিলেন—দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিলেন, মন আর সরে না "আর ঐ টিয়ে পাখীটাকে দুটী ছোলা দিও।" আবার চলিলেন আবার ফিরিলেন "আর একদিকে একটু জল।" আবার চলিলেন আবার ফিরিলেন "আর যদি শিশ দেয় ত দিতে ব'ল।" আবার চলিলেন আবার ফিরিলেন "আর ঐ মেড়াটাকে দুটী দানা দিও।" আবার চলিলেন আবার ফিরিলেন "আর সিং ঘসে ত বারণ ক'র না।"

বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ের ভাব স্পষ্টই বুঝা গেল। এ সমস্ত কথা অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর। বিল্বমঙ্গলের মুখে উপেক্ষার ভাব, অন্তরে অগাধ ভালবাসা; ভালবাসার উচ্ছাস এত অধিক যে মুখের ভাব তাহাকে সংযত রাখিতে পারে না, উছলিয়া পড়িতেছে। তাই তাঁহার মুখ দিয়া এই অসংলগ্ন বাক্যাবলীর প্রকাশ। যেন চিন্তামণির প্রতি তাঁহার কোন টান নাই, যত টান ঐ কাপড়, টিয়াপাখী আর ঐ মেড়াটার উপর। প্রেমের রীতির ইহা সুন্দর অভিব্যঞ্জনা।

বিল্বমঙ্গলের পিতৃশ্রাদ্ধ মিটিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল দেখিয়া বিল্বমঙ্গল বিরক্ত হইয়াছেন। অনেকক্ষণ চিন্তামণিকে দেখেন নাই, প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। ভোলা চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন মথুর ঠাকুরকে এইখানে পাঁচ চাঙারী খাবার দিয়ে যেতে বল্‌। ব্রাহ্মণেরা এখনও অভুক্ত তাঁহাদের পাতা হইয়াছে, মথুর পরিবেশন করিবে; সে যাক্‌, বলিলেন, আগে আমার পাঁচ চাঙারী খাবার এইখানে রেখে যাক্‌"। নিজেও সারাদিন উপবাসী আহার করিতে গেলে পাছে দেরী হয়, তাই আহারেরও সময় নাই। সারাদিন চিন্তামণিকে দেখেন নাই, আর কি থাকা যায়—ভাবিতেছেন "আমি আর এখন খাব না দেরী পড়ে যাবে, খাইবার সময়টুকুও তিনি দিতে পারেন না। তাহার উপর আর একটি সুন্দর লোভনীয় চিন্তা তাঁহার মনে জাগিল "চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাব"। সুতরাং আর খাওয়া হইতেই পারে না। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করিয়াছে, ঝড় উঠিল! ভোলা আসিয়া সংবাদ দিল "বামুনদের পাতা উড়ে গেল।" বিল্বমঙ্গল বলিলেন "তা যাক তুই পাঁচ চাঙারী খাবার এনে এইখানে রাখ না।" ক্রমশ দেরী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য ভোলাকে বলিলেন, তুই খেয়াঘাটে দিয়ে আসিস, আমি নৌকা দেখতে চল্লুম।" এমন সময় দাওয়ান খবর দিল মশাই ব্রাহ্মণ ভোজন পণ্ড হয়।

বিল্বমঙ্গল। হ'ক্! পরন্তু আমার একশ টাকা চাই, যেখান থেকে পাও ঠিক রাখতে চাও বুঝেছ ?

দাওয়ান। আর টাকা চাইলে বাড়ী বাঁধা ভিন্ন উপায় নাই।

বিল্বমঙ্গল। তা যেমন করে হোক।

ধনী বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছেন, এবার বাড়ী পর্য্যন্ত বাঁধা দিতে হইবে, সেও চিন্তামণির জন্য—তাতে তিনি পশ্চাৎপদ নন।

এমন উন্মনা, সিন্দুকের চাবি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন,—ভোলার নজরে পড়িয়াছে। চিন্তামণিগতপ্রাণ বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির চিন্তাতেই বিভোর—চাবির কথা তাঁহার মনেই আসে নাই। বিল্বমঙ্গল ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন,—চিন্তামণির বাড়ী ওপারে—তিনি খেয়াঘাটের দিকে ছুটিলেন—প্রবল ঝড় উঠিয়াছে—তা' নদী পার হইতেই হইবে—শ্রাদ্ধের দিন নদী পার নিষিদ্ধ,—সে সব চিন্তার অবসর কোথায়? বিল্বমঙ্গল ছুটিলেন। এই দুর্য্যোগে খেয়া মিলিল না। মুষলধারে বৃষ্টি—ভীষণ ঝড়। কি ভয়ঙ্কর তুফান কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, যেন পিশাচ যুদ্ধ কচ্চে। বিল্বমঙ্গলের অন্তরও সেইরূপ উদ্দাম প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ। প্রাণ ছট্‌ফট করিতেছে—চিন্তামণির অদর্শন আর সহ্য হয় না।

"উঃ! কি করি? কি করি? কেমন করে
পার হই? এ দুরন্ত তরঙ্গ!"

ছুটিলেন - শ্মশান হইতে একখানা মোটা কাট আনিতে, ভাসাইয়া নদী পার হইতে হইবে। কিছুদূর চাহিয়া চিতাপার্শ্বে উপবিষ্ট এক পাগলিনীকে দেখিয়া সাধারণ হিন্দু স্বভাব সুলভ সংস্কার বশতঃ ভাবিলেন—"একি পেত্নী নাকি? ওরা মনে কল্লে পার করে দিতে পারে।" পাগলিনীকে বলিলেন—"ওগো, তোমায় আমি ষোড়শোপচারে পূজো দোব, তুমি আমায় পার করে দাও। মা, কৃপা করে কথা কও, চিন্তামণির জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।"

স্বীয় চিন্তামণির ধ্যানমগ্না পাগলিনী 'চিন্তামণির' কথা শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—

কই সই, কই চিন্তামণি?
বল, কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী।
দেখ দেখ এসেছি শ্মশানে;—
সে ত নাই লো এখানে!
পর্ব্বতগুহায় নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কতদিন!
কভু ভস্ম মাখি গায়—

এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায় !
শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি—
সে কোথায় দেখা ত হ'ল না।
হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তাতে বাদ কেবা সাধে ?
কই—কই চিন্তামণি

উদ্দাম হৃদয়াবেগ লইয়া বিল্বমঙ্গল ছুটাছুটি করিতেছেন। ভাদ্রের ভরা নদীর ন্যায় বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ের অগাধ প্রেম দুর্দ্দমনীয় বেগ ধারণ করিয়াছে। ইহাই উপযুক্ত অবসর—আসক্তিপূর্ণ প্রেমে আবার ভাঁটা আসিতে পারে, তাই প্রেমের পূর্ণ জোয়ার থাকিতে থাকিতেই বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য গ্রন্থকার সতর্কভাবে হাল ধরিলেন। পাগলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাগলিনীও তাহার হৃদয়ের দেবতার জন্য উন্মাদ—তাহারই সন্ধানে সে শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—পর্ব্বতগুহায় নিবিড় কাননে খুঁজিয়াছে—তাহারই অভাবে সে পাগলিনী। মহাশক্তিস্বরূপিনী মহামায়া প্রকৃতি পাগলিনী সাজে বিল্বমঙ্গলের প্রেমিক হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিতেছেন—প্রেমাধারের মহান আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া দিতেছেন আপনাকে দেখাইয়া। এ দুর্দ্দমনীয় ভালবাসার, এ অনন্ত প্রেমের, পাত্র সামান্য এক হৃদয়হীনা রমণী,—অত ক্ষুদ্র হইতে পারে না—সে পাত্রে এত প্রেম ধরিবে না—এ অনন্ত-অকূল অসীম প্রেমের পাত্র সেই অনন্ত প্রেমময়। ইহাই ইঙ্গিত করিলেন।—কই চিন্তামণি কোথায় বলিতে পার ! সেত এখানে নাই, চিন্তামণিকে ত আমি অনেক খুঁজিয়া দেখিয়াছি—শ্মশানে, পর্ব্বত গুহায়, কাননে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে খুঁজিয়াছি, পাই নাই। শূন্যে আকাশে বাতাসে কোথাও ত তাহার দেখা হ'ল না। হৃদয়ের চাঁদ সে, তাহাকে দেখিব, কে তাহাতে বাদ সাধে ? মহাশক্তি প্রকৃতি।—মহাশক্তি মহামায়া প্রকৃতি এই বিশ্বকে চালিত করিতেছেন—জীবসমূহ মহামায়ার মায়াতেই মুগ্ধ—তাঁহার অধীনে, তাঁহারই ইঙ্গিতে সমুদায় জগত চালিত হইতেছে। তাঁহার বিনা অনুমতিতে একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা কাহারও নাই—কারণ তাঁর শক্তি বিনা এ বিশ্ব চরাচর শব। তাঁহার মায়াতে মুগ্ধ জীব প্রেমময় পরমপুরুষকে ভুলিয়া সংসার খেলায় মত্ত। সবাই তাঁহার এলাকায়—তিনি কৃপা করিয়া পথ ছাড়িয়া না দিলে কাহারও চিন্তামণিকে পাইবার উপায় নাই। অবশ্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলে তিনিই পথ করিয়া দেন—আবার বাদও সাধেন তিনি। বিল্বমঙ্গলের এই ঐহিক আসক্তিপূর্ণ প্রেমের পথে বাদ সাধিয়াছেন প্রকৃতি, দুর্য্যোগময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া।

পাগলিনী আবার বলিলেন—"কই—কই চিন্তামণি ?" বিল্বমঙ্গলের ভ্রম দূর হইল—এত পেত্নী নয়, বোধ হয় পাগল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁগা, চিন্তামণি তোমার কে ?—চিন্তামণি ত মেয়ে মানুষের নাম।"

পাগলিনী তখন বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে জগচ্চিন্তামণির স্বরূপের আভাস দিতে গিয়া বলিল—

"চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয়করা, ভক্ত মনোহরা,
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী;
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।
কভু রজত-ভূধর—
দিগম্বর, জটাজুট শিরে,
নৃত্য করে বব বম্ বলি গালে।
কভু রাস রসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা!
প্রেমে ঢলে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা—
"কোথা বনমালী" বলে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি;
বিপরীত রতি,
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা।
কভু একাকার,
নাহি আর কালের গমন;
নাহি হিল্লোল কল্লোল,
স্থির—স্থির সমুদয়;
নাহি—নাহি "ফুরাইল "বাক ;—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

বিল্বমঙ্গল পাগলিনীর কথার প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে না পারিয়া বলিলেন—"আমার চিন্তামণি! আমি এতদিনেও তার রূপের সীমা পেলুম না। আহা, সে রূপ দেখতে দেখতে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে! কি কর্‌বো? কেমন ক'রে যাব? চিন্তামণি! বুঝি এই নদী-কূলেই প্রাণ যাবে।" পাগলিনীর কথায় বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল—এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারিতেছেন না—চিন্তামণির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু প্রাণ গেলে আর চিন্তামণিকে ত দেখা হইবে না সুতরাং প্রাণত্যাগ করা হইবে না, নতুবা "মেঘগর্জ্জন! তোমায় ভয় করি না, তরঙ্গ! তোমার ও কল কল নাদে ভয় করি না।

দেহ! তোরও মমতা রাখি না, কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখতে পাব না, ওই ভয়। নৈলে তুমি নদী নও, গোখুর জল, আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত।" অতি ব্যাকুল বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতা আরও বাড়াইয়া দিয়া পাগলিনী গান ধরিল। গানের শেষ চরণ—"ঘোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি"—শুনিয়া বিল্বমঙ্গল উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই ভীষণ দুর্য্যোগে ভয়াবহ তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ঝম্প প্রদান করিলেন। কি প্রবল আসক্তি—কি উদ্দাম ভালবাসা—কি উন্মাদ আকর্ষণ।

বিল্বমঙ্গল নদীতে লাফাইয়া পড়িলেন—কিন্তু পার হইবেন কিরূপে জানা নাই, তবু তিনি লাফাইলেন, কারণ তাঁহাকে পার হইতেই হইবে। চিন্তামণির চিন্তায় তদ্গতচিত্ত বিল্বমঙ্গল নদী ভুলিলেন, দুর্য্যোগ ভুলিলেন, উত্তাল তরঙ্গমালা ভুলিলেন, দেশকাল ভুলিলেন,—জগত সংসার ভুলিলেন—আপনাকে ভুলিলেন,—রহিল কেবল চিন্তামণি—চিন্তামণি—চিন্তামণি।

এ অবর্ণনীয় তদ্গত ভাব,—এ বিশ্বাকর্ষিণী একাগ্রতা—এ অনন্ত উদ্দাম প্রেমের নিকট জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মস্তক অবনত না করিবে—বশ্যতা স্বীকার না করিবে। এ আকর্ষণে বিশ্ব কেন্দ্রচ্যুত হয়—মহাকালের কালচক্র থামিয়া যায়—ভগবানের আসন টলিয়া যায়। তাই আজ স্বয়ং মহাশক্তি তাঁহাকে এ তরঙ্গে আশ্রয় দিলেন—একটা পচা মড়া। বিল্বমঙ্গল অসঙ্কোচে তাহারই সাহায্য লইয়া নদী পার হইলেন,—ভয় নাই, ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই।

উন্মত্ত গতিতে ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন চিন্তামণির দ্বার রুদ্ধ—প্রবেশের কোন উপায় নাই। ডাকিতেও সাহস হয় না, পাছে চিন্তামণির ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, বা সে বিরক্ত হয়,—অথবা সে অবসর কোথায়? উচ্চ প্রাচীর,—উল্লঙ্ঘনও অসম্ভব। সহসা দেখিতে পাইলেন সম্মুখের প্রাচীরে লম্বমান এক প্রকাণ্ড বিষধর সর্প, তৎক্ষণাৎ তাহাই ধরিয়া তিনি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। আত্মবিস্মৃত জগত বিস্মৃত বিল্বমঙ্গল দেখিতে পাইলেন না তিনি কি ধরিলেন,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত—চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ!—অন্তরে দেদীপ্যমান চিন্তামণির উজ্জ্বল মুখচ্ছবি। চিন্তামণি—চিন্তামণি—চিন্তামণি!

বিল্বমঙ্গল লাফাইয়া পড়িলেন। পতনের গুরুশব্দে বাড়ীর লোক আসিয়া দেখিল—বিল্বমঙ্গল মাটীতে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছেন।

চিন্তামণি দেখিয়া বিরক্ত হইল,—বিল্বমঙ্গলকে ভৎর্সনা করিল, গালি দিল। বিল্বমঙ্গল অবসন্নকণ্ঠে বলিলেন—"চিন্তামণি, তোমায় দেখতে এসেছি চিন্তামণি! চিন্তামণিকে দেখিয়া বিল্বমঙ্গলের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল—সাধ্যবস্তুকে লাভ করিয়া সাধকের জ্ঞান নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিল।

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে দেখিতেছেন—একদৃষ্টে চিন্তামণির মুখের পানে চাহিয়া আছেন—চিন্তামণির রূপসুধা পান করিতেছেন। পাগলিনীর প্রেরণায় বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির প্রতি

আকর্ষণ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল—তিনি প্রকৃত প্রেমিকের চক্ষে ধ্যেয়বস্তু চিন্তামণির রূপরাশি দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, সে রূপ দেখতে দেখতে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে।" সেই প্রেরণায় বিল্বমঙ্গলের সমস্ত হৃদয় এখনও পরিপূর্ণ—তাই তিনি একদৃষ্টে চিন্তামণির রূপসুধা পান করিতেছেন।

বিল্বমঙ্গলের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন সম্বন্ধে চিন্তামণি অযথা সন্দেহ প্রকাশ করায় বিল্বমঙ্গল বলিলেন, চিন্তামণি দড়ী ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তিনি তাহা ধরিয়া উঠিয়াছেন। চিন্তামণি রাগিয়া "তবে রে মড়া! খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব, তোর দড়ী দেখাবি চল্ত" বলিয়া বিল্বমঙ্গলকে প্রাচীরের দিকে লইয়া আসিল। বিল্বমঙ্গল দূর হইতে বলিলেন—"এই দ্যাখ, দড়ী দ্যাখ।" চিন্তামণি প্রাচীরের নিকটে গিয়া চমকিয়া উঠিল—"ওগো, মাগো, এ যে অজগর গোখরো সাপ!"

চমকিত, আশ্চর্য্যান্বিত বিল্বমঙ্গল তখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না যে তিনি বিষধর সর্পকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিলেন—বিস্ময়ে বলিলেন —"অ্যা! গোখরো সাপ?" তারপর চিন্তামণির মুখের দিকে চাহিলেন—এই রূপের আকর্ষণে তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া গোখরো সাপ ধরিয়া আসিয়াছেন!—আবার চিন্তামণিকে দেখিলেন—বড় সুন্দর মুখখানি।

ধন্য তাঁহার প্রেমের সাধনা! প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভের জন্য তিনি আত্মবিস্মৃত বাহ্যজ্ঞানশূন্য তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে, তিনি আত্ম প্রসাদ অনুভব করিলেন। চিন্তামণির রূপ তাঁহার চক্ষে শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তিনি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না—অনিমেষ নয়নে, প্রেমবুভুক্ষু হৃদয়ে চিন্তামণির মুখখানি দেখিতে লাগিলেন—শুধু দেখিতে লাগিলেন।

বিস্মিত স্তম্ভিত চিন্তামণি বলিল—"একি! তুমি কালসাপ ধরেছিলে? তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে?"

বিল্ব। তোমায় দেখছি।

চিন্তা। কি দেখছ?

সৌন্দর্য্যের উপাসক সুন্দর হৃদয় বিল্বমঙ্গল প্রেমাস্পদের সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়াই বলিলেন—"তুমি বড় সুন্দর!"

চিন্তামণি সাপের কথাই ভাবিতেছে। সে বলিল—তুমি সাপটা অনায়াসে ধরলে?

বিস্মিত চিন্তামণির অযথা সন্দেহে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল—আবেগ কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"চিন্তামণি! বোধ হয়, তুমি কখনও প্রাণ দাওনি। তাহলে বুঝতে প্রাণ অতি তুচ্ছ; তাহ'লে জান্‌তে, সাপেতে দড়ীতে বিশেষ প্রভেদ নাই।"

বিস্মিত চিন্তামণি স্তম্ভিত হইল। সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত রীতিনীতির বাহিরে গেলেই লোকে তাহাকে পাগল বলে। বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গভীরতা তখনও অনুভব করিতে না পারিয়া চিন্তামণি বলিল—"তুমি কি উন্মাদ?

বিল্বমঙ্গল—"যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি

চিন্তামণি প্রেমিকা নয়। কিন্তু বিল্বমঙ্গল তাঁহার অতলস্পর্শী হৃদয়ের অগাধ প্রেম চিন্তামণিকে ডালি দিয়াছেন। চিন্তামণি কিন্তু প্রেমের ধার ধারে না। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বিল্বমঙ্গল তাই বলিলেন—"যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও ;"—প্রেম ও কথার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখিল না—সে বলিল, তা জানি না "কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।"

চিন্তামণি অপ্রেমিকার মতই বলিল—"কি ফ্যাল ফ্যাল করে দেখচ ?" বিল্বমঙ্গল হৃদয়ে আঘাত পাইয়া বলিলেন—"দেখচি তোমার কথা সত্যি কি মিছে ?" তিনি চিন্তামণির জন্য—তাহার ঐ সুন্দর মুখখানির জন্য এক কথায় প্রেমের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন বাস্তবিক তাহা পাগলেরই মত। বিল্বমঙ্গল বলিলেন, তাঁহার উন্মত্ততার নিদর্শন সেই প্রাচীর গাত্রস্থ সর্পকে দেখাইয়া বলিলেন—"আমি উন্মাদ কি না প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ। সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ ;—কিন্তু কিসের জন্য উন্মাদ ? রূপের জন্য, সৌন্দর্য্যের জন্য, তোমার জন্য—অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রতিহত প্রেমাবেগে বলিলেন, "সত্য চিন্তামণি আমি উন্মাদ কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর ."

চিন্তামণি প্রেমিকা নয়, সে বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গভীরতা অনুভব করিতে পারে নাই ; তাই বলিল—"আচ্ছা তুমি বকচ কেন ?"

বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল—মর্ম্মস্থল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ,—চিন্তামণি—বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ের পরিচয় গ্রহণে অসমর্থা। চিন্তামণি কাম্য-স্বভাব-সুলভ সন্দেহের আঘাতে বিল্বমঙ্গলকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। আঘাতের পর আঘাতে প্রেমিক হৃদয় প্রহত হইয়া ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইল। ভাবিল, একি ! আমি যে এত ভালবাসিয়াছি,—এ কাহাকে ? এত অতি সুন্দর ! সুন্দরকেইত আমি পূজা করিয়াছি এত দিন। কিন্তু এ পূজা ত সুন্দর গ্রহণ করিতে পারে নাই ! কেন ? তবে কি এ সুন্দরের হৃদয় নাই ? নিশ্চয়ই নাই। থাকিলে সে আমার পূজা গ্রহণ করিতে পারিত। আমার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিত—আমার বিরাট ব্যাকুলতা অনুভব করিতে পারিত। আমি এতদিন এই হৃদয়হীনা পাষাণীর পূজা করিয়াছি। এ অগাধ ভালবাসা এ আত্মদান সমস্তই নিষ্ফল ! উঃ কি আক্ষেপ ! শেষে পাষাণে প্রেম দিলাম—পাষাণকে পূজা করিলাম ! কেন পাষাণকে পূজা করিলাম কেন ? সে যে সুন্দর। সে পাষাণী কিন্তু সে সুন্দর—অতি সুন্দর !

তাই ব্যর্থ প্রেমের দারুণ আক্ষেপে ক্ষুব্ধ হৃদয় বিল্বমঙ্গল বলিলেন—"জানি না। অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নৈলে এতদিন কার পূজা করেছি ? নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী। কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর !

চিন্তামণি আবার বলিল—চল, তুমি কি কাঠ ধরে এলে, আমি দেখব ."

বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে বুঝিয়াছেন,—তাহার শেষ সন্দেহে আরও ভাল করিয়া বুঝিলেন। এই সন্দেহের আঘাত—এই অবিশ্বাসের আঘাত বিল্বমঙ্গলের হৃদয় সহ্য করিল না—করিতে পারিল না। দারুণ দুঃখে, ক্ষোভে, বিফলতায় তাঁহার হৃদয় বলিল—ভুল—ভুল, মহাভুল

করিয়া কাহাকে ভাল বাসিয়াছ ? অবিশ্বাসিনীকে,—যে তোমায় বিশ্বাস করে না ; পাষাণীকে, যে তোমার হৃদয়ের ব্যথা বোঝে না, বেশ্যাকে—যে তোমায় উপেক্ষা করে, ব্যঙ্গ করে, সন্দেহ করে, গা'ল দেয়।

যে সুন্দরের প্রতি প্রবল আসক্তি তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই আসক্তি আজ সুন্দর নিজেই শিথিল করিয়া দিল—নিজেরই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ; কিন্তু স্বাভাবিক ধারায়—আঘাতের পর আঘাত দিয়া। এ সুন্দর প্রেমাস্পদ যে জ্ঞানহীন—প্রেমহীন অসম্পূর্ণ, তাই তাহার কার্য্যের ধারার মধ্যে অন্যরূপ আশা করাই যায় না। চিন্তামণি যদি বিল্বমঙ্গলের প্রতি অমানুষিক সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া, অবিশ্বাস না করিয়া, তাঁহাকে গালি না দিয়া, ব্যঙ্গ কটাক্ষ না করিয়া বিল্বমঙ্গলের প্রেমবুভুক্ষু হৃদয়কে সোহাগে আদরে হৃদয়ে ধরিতে পারিত, তবে আমরা আজ বিল্বমঙ্গলের চরিত্র অন্যরূপ দেখিতাম।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যাহার জন্য বিল্বমঙ্গলের এই অমানুষিক কার্য্যকলাপ, সে বিল্বমঙ্গলের সহিত এরূপ অন্যায় ব্যবহার করে কেন ? ইহা ত তাহার প্রতি বিল্বমঙ্গলের প্রবল ভালবাসারই পরিচয়,—আর চিন্তামণি যে বিল্বমঙ্গলকে দেখিতে পারিত না তাহাও নহে। তাহা নহে সত্য। কিন্তু চিন্তামণি বারাঙ্গনা,—সে হৃদয়হীন হৃদয়ের ভালবাসার আকর্ষণ নাই, আছে কেবল অর্থের আসক্তি। হৃদয়ের বিনিময় সেখানে প্রায় অসম্ভব ! যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সাধারণ বেশ্যার হৃদয় গঠিত হয় সেখানে নারীসুলভ কোমল বৃত্তি সমূহের দ্বার প্রায়ই বন্ধ থাকে ; সুতরাং হৃদয়ের অনেকটাই বাদ দিয়া তাহারা সমস্ত কাজ করে। যাক্, সে সমস্ত বিষয়ে চিন্তামণির চরিত্র বিশ্লেষণ যদি প্রয়োজন হয়, সেই সময় করা যাইবে। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, চিন্তামণি সাধারণ মানুষ—এবং অতি নিম্নস্তরের। তাহার হৃদয়ের বিকাশ অতি অল্পই হইয়াছে। তাহার উপর ব্যাভিচারে তাহার উৎপত্তি, অবিশ্বাসে তাহার পুষ্টি এবং হৃদয়হীনতায় তাহার ব্যাপ্তি। সে ভালবাসার আবহাওয়া সহিতে পারিবে কেন ? সত্যের নগ্ন সৌন্দর্য্য তাহার চক্ষে বিভীষিকার সৃষ্টি করিল—অবিমিশ্র সত্যের স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিল,—বিল্বমঙ্গলের কার্য্যাবলি যে সত্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা পূর্ণ সত্য—অবিমিশ্র সত্য, চিন্তামণি তাহা সহ্য করিতে পারিল না,—বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিল্বমঙ্গলকে সে বলিল—"তুমি উন্মাদ।" ইহা চিন্তামণিরই হৃদয়ের উপযোগী, ইহাই তাহার স্বাভাবিকতা।

বিল্বমঙ্গলের আসক্তি টুটিল। পরম প্রেমাস্পদ মনে করিয়া যাহাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন, দেখিলেন সেখানে প্রেম নাই—তাই আঘাতের পর আঘাত পাইয়া বিল্বমঙ্গলের আসক্তি টুটিল। সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের উদয় হইল।

প্রতিদানের আশায় আমিত্বের নেতৃত্বে যে কার্য্যের উৎপত্তি তাহা নিশ্চয়ই দুঃখ আনিবে এবং সেই মুহূর্ত্তেই আনিবে যখনই তাহার আমিত্ব খর্ব্ব হইবে। বিল্বমঙ্গল 'আমি' রূপকে ভালবাসিয়াছিল—এবং সেই রূপের অধিকারিণীকে 'আমার' মনে করিয়া আসক্তিতে ...

ছিল—আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল কিন্তু বিল্বমঙ্গল যখন বুঝিল সে রূপ তাহার নয়, সেরূপ তাহাকে উপেক্ষা করে—অবিশ্বাস করে, মর্ম্মপীড়া দেয়, তখনই তাহার দুঃখ আসিল এবং সেই দুঃখের উপস্থিত প্রতিকারকল্পে তাহার হৃদয় রূপের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। দুঃখ কোন জীবই চায় না—দুঃখ আসিলেই দুঃখের উৎপাদক যাহা জীব তাহাকে ত্যাগ করিতে চায়—দুঃখের নিবৃত্তির জন্য। এই যে ত্যাগ করিতে চাওয়া ইহার নাম বৈরাগ্য। রূপ বিল্বমঙ্গলকে দুঃখ দিল তাহার আমিত্বকে উপেক্ষা করিয়া—খর্ব্ব করিয়া। সুতরাং বিল্বমঙ্গলের হৃদয় রূপের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল, বলিল, 'এ রূপ চাই না—ইহা আমিত্বকে অবজ্ঞা করে, আমাকে দুঃখ দেয়, ইহা মিথ্যা। ইহাত আমার নয়—'আমার' হইলে 'আমাকে' দুঃখ দিত না বা আমার দুঃখের কারণ হইত না। এ পৃথিবীতে তথাকথিত 'আমার' প্রিয়তম বস্তুও যখন 'আমার' নয় অর্থাৎ আমি যাহাকে প্রিয়তম মনে করিতাম তাহাই যখন আমার ঐরূপ মনে করাকে অস্বীকার করিল, উপেক্ষা করিল, তখন অন্য কোন বস্তুকেই ত আমার বলা যায় না। চিন্তামণিকে 'আমি' এত ভালবাসিলাম—চিন্তামণির জন্য 'আমি' প্রাণ তুচ্ছ করিলাম কিন্তু মিথ্যা। চিন্তামণিত 'আমার' নয়। আর চিন্তামণি যখন আমার নয় আর কেইবা আমার? বিল্বমঙ্গলের 'আমিত্ব' এখানে প্রহত, উপেক্ষিত, খর্ব্বীকৃত। দুঃখে নিরাশায় বিল্বমঙ্গল বলিল—"কৈ, কেউ ত আমার আপনার দেখিনি;—যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম সেত আমার নয়। আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখলে হয়।" কিন্তু এখনও দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে কে 'আমার' আছে?—মন সন্দেহ দোলায় দুলিতেছে, আছে কি না। কেন না 'আমি' যে আছি এ বিষয়ে বিল্বমঙ্গলের কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু আমার সম্পর্কীয় এ জগতে কিছু আছে কি না—সেইটাই প্রামাণ্য বিষয়, সেই বিষয়েই বিল্বমঙ্গলের সন্দেহ।

তারপর নদীকূলে সেই গলিত শব, যাহা অবলম্বন করিয়া বিল্বমঙ্গল নদী পার হইয়াছিল—দেখিয়া, বিল্বমঙ্গলের বৈরাগ্য আরও একটু বৃদ্ধি পাইল—ভাবুক বিল্বমঙ্গল ভাবিতে লাগিলেন—

"এই পরিণাম! এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুকুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়!
এই নারী—এরও এই পরিণাম!

দেহী মাত্রেরই এই পরিণাম—দেহ বিনষ্ট হইবেই। যেরূপ যত্নেই পালিত হউক না কেন, যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষিত হউক না কেন, দেহের পরিণাম বিনাশ,—তা পুরুষের দেহই হউক আর স্ত্রীদেহই হউক। সুতরাং এ দেহ ক্ষণস্থায়ী—এ সংসার নশ্বর। এইবার বিচার

আসিল। তবে এ সংসারে ভালবাসিলাম কাহাকে? আমিত চিন্তামণিকে এত ভালবাসি—কিন্তু চিন্তামণি কি? চিন্তামণি, নারী, চিন্তামণি দেহী। আমি তাহাকে ভালবাসি কেন? তাহার রূপের জন্য। রূপই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—রূপই আসক্তি আনিয়াছে—রূপই আমায় ভালবাসিতে শিখাইয়াছে। কিন্তু এ রূপত চিন্তামণির দেহের। দেহের সহিত চিন্তামণির রূপও বিনষ্ট হইবে—সম্মুখস্থ এই গলিত শবের ন্যায়। আমি তবে ভালবাসিলাম কাহাকে? এই ক্ষণস্থায়ী রূপকে যাহা নশ্বর—যাহা ছায়া—যাহা মিথ্যা। এ জগতে তবে চিরস্থায়ী কিছুই নয়,—ঐ যে ঊষা, আপন লাবণ্যে পূর্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইতেছে, উহাও ত এখনই বিনষ্ট হইবে—উহাও ছায়া, উহাও মিথ্যা। মিথ্যা—মিথ্যা—এ জগত সংসার সমুদায় মিথ্যা।

কিন্তু বাস্তবিক মিথ্যায় মানুষ বাঁচিতে পারে না মিথ্যায় জগত চলিতে পারে না—সৃষ্টিস্থিতি লয় হইতে পারে না। কারণ 'মিথ্যা' বলিয়া জগতে স্বতন্ত্র কিছুই নাই। মিথ্যা একটী অভাবাত্মক শব্দ, সুতরাং মিথ্যার নিজস্ব কোন রূপ নাই—সত্তা নাই। সত্যের অভাবই মিথ্যা। যেমন, আমি গিয়াছিলাম' এই বাক্যটীর দ্বারা যাহা বুঝায়, তাহা সত্য অর্থাৎ আমার এই হস্তপদাদি বিশিষ্ট দেহটীকে কোন বিশেষ স্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম এবং আমার এই গমনাত্মক ক্রিয়া সম্পাদনের পর কেহ ঐ বিশেষ স্থানে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে বলিলাম—"আমি গিয়াছিলাম" এবং ইহা সত্য। আবার আমি নিজে ঐরূপ কোন গমনাত্মক ক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া যদি বলি 'আমি গিয়াছিলাম' তখন উহা মিথ্যা বলিব। অতএব 'মিথ্যা' এই সংজ্ঞার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে আমাকে একটী অভাবাত্মক ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা এই 'না যাওয়া'। বাস্তবিক এই না-যাওয়ার' মধ্যে কোন ক্রিয়ারই সম্পাদন হয় নাই, সেই হেতু 'না-যাওয়ার' মধ্যে কোন ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, মিথ্যার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

তাই মানুষের সম্মুখে পশ্চাতে যখন অনেক মিথ্যা জমা হয়, তখন মানুষ হাঁপাইয়া উঠে, সত্যের জন্য ব্যাকুল হয়, বলে সত্য কোথায়? কারণ অভাবাত্মক এই বাক্য 'মিথ্যা' মানুষের নিজের সৃষ্টি। কিন্তু অভাব ত মানুষের স্বভাব নয়,—তার প্রমাণ, মানুষ দিবারাত্রই নিজের সৃষ্ট অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহা নষ্ট করিবার জন্য। সুতরাং সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া কোন জিনিস থাকিতে পারে না বলিয়াই মিথ্যার উপর মানুষের সন্দেহ হয়।

এই মিথ্যার উপর সন্দেহ বিল্বমঙ্গলেরও আসিল, বলিলেন—

"দেখা দাও যদি থাক কেহ।"

মিথ্যাকে বিল্বমঙ্গল বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। আপনার জন কেহ নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না, যদিও তিনি স্পষ্ট কোন প্রমাণ পান নাই যে তাঁহার কোন আপনার জন আছে। ইহা মানুষের instinct এই সত্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের অন্তরের প্রেরণা। তাই বিল্বমঙ্গল বলিলেন,—

"কোথা আছ কে আমার, বল
সাধ হয় দেখিতে তোমাকে,
আত্মজন দেখি নাই জন্মাবধি!"

নশ্বর সংসারের উপর তখন তাঁহার অশ্রদ্ধা আসিল—বৈরাগ্য আসিল, তখন তিনি আপনার জনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন যদিই বা কেহ আপনার জন থাকে, তাহাকে পাইব, কিরূপে—কে বলিয়া দিবে।

এই সত্য মিথ্যার ধাঁধায় বিল্বমঙ্গল যখন ঘুরিতেছেন—কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না তখন একবার 'পাগলিনী'কে প্রয়োজন হইল। পাগলিনী আসিয়া গাহিলেন,—

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে, আমায় বল্‌তে হয় না জোর ক'রে॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে,
কত রাখে আদরে॥
আমি জান্‌তে এলাম তাই, কে বলেরে আপন রতন নাই,
সত্যি মিছে দেখনা কাছে।
কচ্চে কথা সোহাগ ভরে॥"

পাগলিনীর গান বিল্বমঙ্গলকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল, বিল্বমঙ্গলের সন্দেহ হ্রাস হইল—আপনার জনের জন্য বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল। পূর্ব্ব সন্দেহের বলে ব্যাকুলভাবে বলিলেন—"আমার কি কেউ নাই?" পরক্ষণেই পাগলিনীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বিল্বমঙ্গল অনুকুল যুক্তি পাইয়া বলিলেন—"অবশ্যই আছে" আছে—আমার কাছে কাছে আছে। নৈলে ঘোরতর তরঙ্গের মধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে? করাল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় বলে দিলে, সংসারে আমার কেউ নেই? কে আমায় এখন বলচে, 'আমি তোর আছি।" যে অদৃশ্য হস্ত নদীবক্ষ হইতে আমার উদ্ধার সাধন করিল, করালসর্পের গ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা করিল সেই ত আমার আপনার জন। সে ত নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কে সে? কোথায় সে? কেমন সে? এইবার তাহাকে জানিবার জন্য বিল্বমঙ্গল অধীর হইয়া পড়িলেন। তাহার সম্বন্ধে যত প্রশ্ন আসিয়া জুটিল।

রূপের উপাসক, সৌন্দর্য্যের সাধক বিল্বমঙ্গলের মনে প্রথমেই রূপের—সৌন্দর্য্যের কথাই আসিল—"কে তুমি? তোমার কি রূপ? যিনি সুন্দরের উপাসক, তাঁহার আপনার জন, তাঁহার উপাস্য কখনও অসুন্দর হইতে পারে না। সুতরাং অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর।"

প্রথমে নশ্বর জগতে অনশ্বর আপনার জন কেহ আছে কিনা সন্দেহ হইল,—স্থির হইল আছে। তাহার পর যখন সে আছে, তখন নিশ্চয়ই সে অসামান্য সুন্দর, কেন না আমি সুন্দরকে ভালবাসি, সৌন্দর্য্যই আমার উপাস্য—তাই সেও নিশ্চয়ই সুন্দর হইবে। কিন্তু

সে কোথায় ? তাহাকে না দেখিলে ত সে কিরূপ সুন্দর তাহা বুঝিতে পারি না—তাই তাহার দেখা চাই-ই। দেখাত চাই-ই—সে আমার আপনার জন, আমার সহিত কথা কহিবে—আমার কাছে বসিবে,—নয়ন ভরিয়া তাহার রূপ দেখিব, প্রাণ ভরিয়া তাহার কথা শুনিব, তবে ত আমার প্রাণ জুড়াইবে। হৃদয় ভরিয়া তাহাকে ভাল বাসিব—অনন্ত প্রেমের বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিব, তবে ত আমার আশা মিটিবে। কিন্তু সে কোথায়—কোথায় ? কই তাহাকে ত দেখিতেছি না ! আছে আছে, নিশ্চয়ই সে আমার কাছে আছে। আমি অন্ধ তাই দেখিতে পাই না। আমার এ নশ্বর চক্ষু নশ্বর রূপ দেখিবারই উপযুক্ত। সে রূপ দেখিবার চক্ষু ত আমার নাই ; কে দিবে ? কোথায় যাইব ?

বিল্বমঙ্গল চলিলেন, কোথায় চলিলেন, জানেন না। জানিবার প্রয়োজন ও নাই। তাঁহার আরাধ্যের উপাস্যের সন্ধানে চলিয়াছেন। ব্যাকুলতা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল—অধীর ভাবেই তিনি বলিলেন—কোথায় গেলে তাঁহার আপনার জনকে পাইবেন—তাঁহার প্রিয়তমকে পাইবেন—তাঁহার সুন্দরতমকে পাইবেন !

ব্যাকুলভাবে আরাধ্য দেবতার সন্ধান করিতে করিতে চলিয়াছেন, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ? পথিমধ্যে সোমগিরির সহিত সাক্ষাৎ। বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতা চরম সীমায় উঠিয়াছে। প্রিয়তমের জন্য, সুন্দরতমের জন্য প্রাণ এরূপ অস্থির হইয়াছে যে দেখা না পাইলে দেহ বুঝি আর থাকে না। হৃদয় অন্ধকারময়, নিরাশায় হতাশায় চিত্ত বিক্ষুব্ধ। ডাকিতেছেন, কোথায় প্রেমময়, কৃপা করিয়া একবার দেখা দাও !

বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না—তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। এই ব্যাকুলতার বলে তিনি আজ ভগবৎ কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ করিলেন। তিনি প্রেমিক, ভালবাসিবার জন্য—প্রেম দিবার জন্য, তাহার হৃদয় আকুলি বিকুলি করিতেছে। কোথায় সে প্রেমিক পুরুষ—অনন্ত প্রেমময় যাহাকে প্রেম দিয়া তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া থাকিবেন। গুরুকে বলিলেন, আমি প্রেমময়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষী—প্রেমময়ের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে—কিরূপে সাক্ষাৎ পাইব ? গুরু বলিলেন,—অনন্ত প্রেমের যুগল প্রতিমা রাধাকৃষ্ণ, আপনি কৃষ্ণকে চিন্তা করুন, তিনি আপনাকে কৃপা করিবেন, কৃষ্ণকে ডাকুন,—তিনিই আপনাকে বলিয়া দিবেন কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে।

গুরুর কৃপায় কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিল্বমঙ্গল অবিরাম কাতরভাবে ডাকিতে লাগিলেন—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ—কোথায় কৃষ্ণ—প্রেমময় দেখা দাও।

কিন্তু রূপের কাঙাল বিল্বমঙ্গল রূপ দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারেন না, মন টলিয়া যায়। মন এখনও স্থির হয় নাই। আজীবন বেশ্যাসক্ত মন এখনও পূর্ব্ব সংস্কার ভুলিতে পারে নাই ; সংস্কার মানুষের সহজে যায় না—বিল্বমঙ্গলের ও যায় নাই।

বিল্বমঙ্গলের ব্যাকুলতা যদিও চরম সীমায় উঠিয়াছে ...

এখনও স্থির প্রতিষ্ঠ হয় নাই। বিচারের দ্বারা বিবেকের উদয় হয়—বিবেক বৈরাগ্য আনয়ন করে,—কিন্তু বিবেক স্থির প্রতিষ্ঠ না হইলে বৈরাগ্যও ক্ষণস্থায়ী হয়। বিবেক স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইলে এই বিবেকের অগ্নিতে সংস্কার পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। জন্ম জন্মান্তরের অর্জ্জিত সংস্কার রাশি মানুষের মনে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে—এবং মন হইতে চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া যায়—এবং চিত্তকে ওতপ্রোতঃভাবে জড়িত, অভিভূত করিয়া রাখে। বিবেকের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়,—চিত্তবৃত্তি সমূহ সংস্কার অনুযায়ী গঠিত হয়। ঐ চিত্তবৃত্তি সমূহ মনের উপর সংস্কারানুযায়ী ক্রিয়া করিতে থাকে,—ঐ ক্রিয়াই আবার মনে চিন্তার সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কে চিন্তার প্রবল স্রোত বহাইয়া দেয়—ঐ মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাস্রোত আবার আপনার কার্য্য সাধক অনুকূল স্পন্দন প্রবাহ শরীরের মধ্যে প্রেরণ করে; তখন শরীরের মধ্যে সংস্কারজাত ভাবসমূহের প্রকাশক ক্রিয়ার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়—এবং উহারা প্রবল হইলেই শরীরের দ্বারা আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সমূহ করাইয়া লয়।

তাই সংস্কার রূপ মলিনতা দূর না হইলে হৃদয় মুকুরে আরাধ্যের রূপ প্রতিভাত হয় না। এবং এই সংস্কার নাশের একমাত্র উপায় বিবেকের আশ্রয় লওয়া।

এখানে আর স্বতন্ত্র উদাহরণের প্রয়োজন নাই, বিল্বমঙ্গলের চরিত্রে আমরা এখন দেখিব সংস্কার কিরূপে আপনার কার্য্য করে।

নির্জ্জনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট বিল্বমঙ্গল জপে নিরত—গুরুদত্ত কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরেই দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। তিনি নির্জ্জন মনে করিয়া তথায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু কথোপকথন শুনিয়া বুঝিলেন সেস্থান নির্জ্জন নয়। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন!

কেন? চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন না কেন? তিনি এদিকে ইষ্টচিন্তায় নিমগ্ন; কিন্তু অপরের কথোপকথন তাহার জপে বিঘ্ন করিল—কেবল একমাত্র কারণে যে তাহা স্ত্রীলোকের কথোপকথন। তিনি শুনিলেন স্ত্রীকণ্ঠ। তাহার চিত্তের বেশ্যাসক্ত বৃত্তি, পরস্ত্রী প্রীতিরূপ যে সংস্কার অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাকে বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত করিল, ঐ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর—যেহেতু স্ত্রীলোকের সংক্রান্ত যাহা কিছু তাহারই প্রতি ঐ সংস্কারের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে ঐ সংস্কারের উৎপত্তি বলিয়া। চিত্তবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াই উহার ক্রিয়া মনে সঞ্চারিত হইল—মন চিন্তা করিল—"মেয়ে মানুষের আওয়াজ যে—অ্যা! এখানেও মেয়ে মানুষ? বেশ মিঠে আওয়াজ কিন্তু;---চেহারাটা কি রকম একবার দেখলে হয়, দেখতে দোষই বা কি? জপ ত কচ্ছিই, একবার দেখি।" ঐ চিন্তা মস্তিষ্ক হইতে এক প্রবল স্পন্দন প্রবাহ প্রেরণ করিল শরীরের মধ্যে, স্নায়ুর ভিতর দিয়া। সেই স্পন্দন প্রবাহ আসিয়া পড়িল চক্ষের উপর যেহেতু দেখাই ঐ চিন্তার মুখ্য ক্রিয়া। বিল্বমঙ্গল চাহিয়া দেখিলেন। উহা বিল্বমঙ্গল ইচ্ছা করিয়া করেন নাই; সংস্কার বশেই করিয়াছেন এবং সংস্কারের উপর তাহার কোন ক্ষমতা তখনও জন্মায় নাই।

কিন্তু বিবেক বলিল "চক্ষু, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আরে মূঢ় চক্ষের দাস মন, চল্। কি দেখবি।

স্ত্রীলোকদ্বয় প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার বিল্বমঙ্গলকে টানিয়া তুলিল; সংস্কারের হাতে তিনি ক্রীড়নক। সংস্কার তাহাকে বণিক পত্নীর পশ্চাতে টানিতে লাগিল, বিল্বমঙ্গল চলিলেন।

ভগবৎ কৃপায় বিল্বমঙ্গলের বিবেক ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল, বিবেক ছাড়িল না, বিচার করিতে লাগিল, মনকে বুঝাইতে লাগিল।

আরেরে নয়ন,
মন্মথের তুইরে প্রধান সেনাপতি;
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রুডেকে আন ঘরে।
সুখ আশে সতত বিফল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান
ঈশ্বরের স্থান যথা।
সে করে দংশন,
তবু আনে প্রলোভন,
জ্বালায় ব্যাকুল
পোড়া প্রাণ
পুনঃ তারে দেয় কোল;
শত লাঞ্ছনার ধিক্কার না হয়,
তবু ছলে আঁখি বলে, "জুড়াবার এই ধন।"
ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি! তোমায় কি দিব দোষ!
চল মন, যথা আঁখি নিয়ে যায়।

কিন্তু সংস্কার বিল্বমঙ্গলের মধ্যে যে ক্রিয়ার প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার নিকট বিবেক আপাততঃ হীনবল। বিবেকের বিচার সত্ত্বেও বিল্বমঙ্গল বণিকপত্নীর পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে একেবারে তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত।

বণিক আসিয়া পরিচয় লইয়া বিল্বমঙ্গলকে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। বিল্বমঙ্গল সংসার আশ্রম করেন না শুনিয়া বণিক ভাবিলেন—তিনি মহাপুরুষ। তাই অতিথিনারায়ণকে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য পীড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন। বিবেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত বিল্বমঙ্গল তখন স্বীয় পাপ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—

"ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি সংকার—
কর অঙ্গীকার
একা মম সনে
দিবে আনি পত্নীরে তোমার ;
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী
আজি নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী।

সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া বিল্বমঙ্গল বণিকপত্নীর রূপে মুগ্ধ হইলেন, তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন,—বণিক পত্নী গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার দ্বারে উপবিষ্ট হইলেন,—ইচ্ছা, আবার বাহির হইলে তাঁহাকে দেখিবেন। ইতিমধ্যে বণিক আসিয়া তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। বিল্বমঙ্গল হাতে স্বর্গ পাইলেন। এই ত পাপ বাসনা পূর্ণ করিবার উত্তম সুযোগ। কিন্তু কিরূপে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যায়! ধর্ম্মপ্রাণ বণিককে বিল্বমঙ্গল শুনাইলেন যে, তিনি লম্পট, বেশ্যাদ্বারা তাড়িত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু অতিথির এই অসৎ পরিচয় পাইয়াও ধর্ম্মভীরু বণিকের কোন মানসিক বৈলক্ষণ্য ঘটিল না দেখিয়া বিল্বমঙ্গল আরও সাহসী হইলেন।—বণিকের নিকট তাঁহার পত্নীর প্রতি আসক্তি জ্ঞাপন করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং করিলে কিরূপ ব্যবহার তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিবেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত বিল্বমঙ্গল তখন আরও পাপ গোপন করিবার জন্য মিথ্যা আবার দ্বিতীয় পাপে লিপ্ত হইতে সাহসী হইলেন না। বিবেক নগ্নসত্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিল,—বিল্বমঙ্গলের দ্বিধা দূর হইল—তিনি পাপ ব্যক্ত করিলেন।

তাঁহার এই অসমসাহসিক উগ্র অপ্রিয় বচন শুনিয়া বণিক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাস্তবিকই, এই দুঃসাহস, এই অসংযত স্পর্দ্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ দুঃসাহস, এ স্পর্দ্ধা কোন সাধারণ মানুষে সম্ভবপর নয় তাই বণিক ভাবিলেন,—বোধ হয় কোন মহাপুরুষ তাঁহার অতিথি সৎকার পরীক্ষা করিতেছেন,—নতুবা মানুষে কি এ অতি মানুষিক স্পর্দ্ধা সম্ভব হয়!—প্রকাশ্যে বলিলেন,

"নারায়ণ নিশ্চয় আপমি—
কর ছল মূঢ়জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি
পুরাইব বাসনা তোমার,
আজ রাত্রে পতি তুমি পত্নীর আমার।"

বণিক বিল্বমঙ্গলকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন।

বিল্বমঙ্গলের বিবেক মনের দুয়ারে আঘাত করিয়া দেখাইল,—চক্ষু তাহাকে কিরূপ উন্মত্ত করিয়াছে। অবশ্য মনের উপর সংস্কারের প্রভাবেই বাসনার উদ্রেক কিন্তু বাহ্যতঃ চক্ষুই

সে বাসনায় ইন্ধন যোগাইল। যে চক্ষু পরম সুন্দরের রূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে সে আজ পার্থিব রূপের দর্শনে হৃদয়ের পশুকে জাগাইয়া তুলিল।

বণিক বিল্বমঙ্গলকে ঘরে বসাইয়া আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিয়া বলিলেন—"এই আমার গৃহিণী, আপনার দাসী।"

বণিক চলিয়া গেলেন। নিস্তব্ধ রজনীতে নিভৃত গৃহকক্ষে কামাসক্ত বিল্বমঙ্গলের সম্মুখে ধর্ম্মপ্রাণ বণিকের সাধ্বী সুন্দরী পত্নী পতির আদেশে অতিথি সেবায় নিযুক্ত। বিল্বমঙ্গল চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই বণিক তাহার সুন্দরী পত্নীকে তাঁহার লালসাগ্নির সম্মুখে ইন্ধন স্বরূপ রাখিয়া গেলেন—অসঙ্কোচে, অতিথি সৎকারের জন্য। ভাবিলেন, কি ধার্ম্মিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এই বণিক। আর আজ কামাসক্ত আমি কামের তাড়নায় পরস্ত্রীর পশ্চাৎ ধাবন করিয়া, তাহার সতীত্বের মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া—চূর্ণ করিয়া,—পায়ের তলায় নামাইয়া দিয়া,—আপনার অশ্লীল বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য হৃদয়ের উন্মত্ত শ্লথবল্‌গা পশুকে মুক্ত করিয়া দিতে উদ্যত! ওঃ—কি পিশাচ আমি! এই পৈশাচিকতা লইয়াই কি আমি আজ পরম প্রেমময়কে লাভ করিব? ধিক! ধিক!

বিবেক পুনঃ পুনঃ মনকে কষাঘাত করিতে লাগিল। সম্মুখে মহাপ্রাণ বণিকের সমুন্নত শির, মহিমাময় আদর্শ, পশ্চাতে বিবেকের কষা। বিল্বমঙ্গল আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—দেখিলেন চক্ষুই তাহার সমস্ত পাপ কার্য্যের মূল। চক্ষু তাঁহাকে বারাঙ্গনার রূপে মুগ্ধ করিয়াছে,—বেশ্যার দাস করিয়াছে, চক্ষু কাষ্ঠখণ্ড বলিয়া তাঁহাকে শব ধরাইয়াছে—রজ্জু বলিয়া কালসর্প ধরাইয়াছে, এবং পুরস্কার দিয়াছে বারাঙ্গনার তিরস্কার। আবার প্রাণে যখন প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইল, গৃহবাস ছাড়িয়া "কোথা কৃষ্ণ,কোথা কৃষ্ণ"বলিয়া উন্মত্ত হইলেন, তখন পুষ্করিণীর তীরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রমণীর রূপ দেখিয়া চক্ষু আবার তাঁহকে প্রবল বাসনায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল,—এবং সেই উন্মাদিনী বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য আজ তিনি ধর্ম্মপরায়ণ মহাপ্রাণ বণিকের সতী সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্বের অবমাননা করিতে উদ্যত। চক্ষুই তাঁহার সমস্ত অনিষ্টের মূল,—অথচ সেই চক্ষুর জন্যই কত সতর্কতা,—কত গর্ব্ব!

মন তুমি আঁখির গরব কর?
নিত্য ভয় পাছে যায় এ রতন;
দ্যাখ তোর আঁখির আচার!
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেই মত গলিত হইবে;
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ;—

এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার।
ভাব মন, বৃথা জন্ম তার
এ রতন বঞ্চিত যে জন ?
বুঝ মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে ?
কিছু নাহি হেরে
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যধন।
এর ছলে কতদিন রবে ভুলে ?

বিল্বমঙ্গলের বিবেক বলিল,—এ আঁখির প্রয়োজন কি ? ইহা কেবল অসৎ বাসনার উত্তেজক, পাপ কার্য্যের প্ররোচক। অদ্যাবধি ইহা কেবল তোমাকে পাপের পথেই লইয়া গিয়াছে—বাসনার পঙ্কিল কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। এ চক্ষু যতদিন থাকিবে ততদিন এইরূপই চলিবে। এই চক্ষুর মমতা করিও না, ইহা প্রেমময়কে দেখাইতে পারিবে না,—যে রূপের অতি ক্ষুদ্রকণা মাত্র লইয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, সেই পরম রূপের আধার সুন্দরতমকে দেখাইতে পারিবে না। এবং ইহা তোমাকে পাপের পথেই টানিয়া লইবে—সুতরাং স্বহস্তে ইহার এখনই উচ্ছেদ সাধন করা কর্ত্তব্য। সতীর প্রতি কামদৃষ্টিতে চাহিতে পারে যে আঁখি, দূর করিয়া দাও, বিনষ্ট করিয়া ফেল তাহাকে।

বিল্বমঙ্গলের বিবেক ক্রমাগত বিচারের দ্বারা স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল,—অন্তরাত্মার মঙ্গলময় প্রেরণায় বিবেক তাঁহার হৃদয় ভরিয়া দিল—চিত্ত উদ্ভাসিত করিল। তিনি বুঝিলেন, এই চক্ষু যাওয়াই মঙ্গল। চক্ষুর বিনাশ সাধনে স্থির সঙ্কল্প হইয়া বণিক পত্নীর অলঙ্কার হইতে দুইটী কাঁটা চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"মা তোমার স্বামীকে বলগে, আমি তোমার পাগল ছেলে। যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা হেলন কত্তে নাই।

বণিক পত্নী চলিয়া গেলো।স্থির প্রতিষ্ঠ বিবেক দৃঢ়স্বরে বলিল—

"মন এখন কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপলো
'আমার' বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্তে সব দেখিবে অসার।
যাও যাও—নশ্বর নয়ন !

কঠোর হস্তে বিল্বমঙ্গল আপনার চক্ষু বিদ্ধ করিলেন।

ব্যস্, নিশ্চিন্ত। পাপের মূল উৎপাটিত হইল।

বিবেক অবিচলিত কণ্ঠে বলিল—এইবার

চক্ষু তাঁহাকে পরমপ্রেমাস্পদের প্রেম লাভে বঞ্চিত করিয়াছিল—তাঁহাকে ক্রমাগত অসতের দিকে টানিতেছিল। এখন চক্ষুকে বিনষ্ট করিয়া তিনি সংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিলেন। চক্ষু থাকিলে যে ভগবৎ প্রেম লাভ করিতে পারা যায় না এমন নহে, কিন্তু সংস্কার থাকিতে পারা যায় না; বিল্বমঙ্গলের চক্ষু পার্থিব রূপের দর্শনে সংস্কারকে জাগাইয়া, সেই দিকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল, তাই এখানে সংস্কারের উদ্দীপক কারণটিকে বিনষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারটীও বিনষ্ট হইল।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ সংস্কার অন্য কারণে উদ্দীপিত হইতে পারে কিনা? আর ঐ সংস্কার যখন মানুষের নিজের মধ্যে রহিয়াছে তখন চক্ষু না থাকা সত্ত্বেও পার্থিব রূপের আসঙ্গলিপ্সা ত জাগিতে পারে।

জাগিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহারও একটা কারণ থাকা চাই। আমাদের মনের অবস্থা যখন এলোমেলো থাকে এবং যখন আমরা কোন বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ না করিয়া থাকি তখন অপরের প্রেরিত চিন্তার শক্তিশালী তরঙ্গগুলি আমাদের মনের মধ্যে অতর্কিতে প্রবেশ করিয়া সমধর্ম্মাবলম্বী বৃত্তিগুলিকে আঘাত করিয়া মস্তিষ্কে সেই বিশেষ প্রকারের স্পন্দনের সৃষ্টি করিতে পারে এবং সেই স্পন্দন চিন্তার আকারে প্রতিভাত হইয়া মনের উপর কার্য্য করে। আর আমরা যদি কোন বিষয়ে গম্ভীর ভাবে মনকে নিযুক্ত রাখি তবে অন্য কোন চিন্তাতরঙ্গ আমাদের মনের উপর সহজে কার্য্যকরী হয় না। সুতরাং বিল্বমঙ্গল যদি মনকে বিষয়ান্তরে একাগ্রভাবে নিযুক্ত রাখেন তাহা হইলে বাহিরের কোন চিন্তাতরঙ্গের দ্বারা তিনি আর অভিভূত হইবেন না। অতএব এখন ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতেই বিল্বমঙ্গলের চিত্তবিক্ষিপ্তির আর কোন কারণ রহিল না। বাহিরের কারণ চক্ষু বিনষ্ট হওয়াতে তাহা দ্বারা আর কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা রহিল না এবং ভিতরের দিক হইতে পার্থিব বিষয়ের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য ও প্রেমময়ের প্রতি অসীম অনুরাগ তাঁহার মনকে সেই দিকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট রাখিল-- বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হইবার অবসর তাঁহার রহিল না।

এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রেমময়কে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব ব্যাকুলতা আবার বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। কাতর চিত্তে ডাকিতে লাগিলেন—'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, কোথায় তুমি—দেখা দাও। কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া চারিদিক উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! ব্যাকুলতার মাত্রা ক্রমশঃ এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে তাহার প্রবল বেগ শরীর বুঝি বা আর ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন—হয় সুন্দরতম আরাধ্যের সাক্ষাৎ-লাভ করিব, না হয়—শরীর যাক্।

সত্যই বিল্বমঙ্গলের শরীর ব্যাকুলতার সেই বেগ সহ্য করিতে পারিল না—'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সেই ভীতিসঙ্কুল নির্জ্জন কাননে আজ বিল্বমঙ্গল একাকী—অসহায় অবস্থায়। ...

দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবৎসল, করুণা নিদান, অনন্ত প্রেমময় ভগবান ভক্তের এ অবস্থা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—তাঁহাকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্তের সাহায্যে আসিতে হইল। তাঁহাকে আসিতে হইবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এই আকর্ষণ—এই চিন্তা সকল যুগে তাঁহাকে সাধকের বাঞ্ছনীয় রূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং তুলিবে। ভক্তবৎসল তাই আজ রাখাল বালকের মূর্ত্তিতে বিল্বমঙ্গলের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত বিল্বমঙ্গল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; আবার কৃষ্ণ নাম শুনিয়া চেতনা পাইলেন, মনে হইল কৃষ্ণ আসিয়াছেন। চেতনা পাইয়া কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। কৃষ্ণ তাঁহার মন প্রাণ সব ভরিয়া দিয়াছে অবিরত অবিচ্ছেদে কৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে অন্য চিন্তার লেশ মাত্র স্থানও আজ আর নাই।

সেই অসামান্য শক্তি সম্পন্ন চিন্তা তরঙ্গ বিল্বমঙ্গলের মস্তিষ্কে যে প্রবল স্পন্দন তুলিয়াছিল, মস্তিষ্ক তাহার বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া পরাভব স্বীকার করিল—বিল্বমঙ্গল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার কৃষ্ণ চিন্তার সে স্রোত চলিতেছে। যদিও চিন্তার প্রবল বেগ ধারণে অক্ষমতা হেতু মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া পড়াতে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য ক্ষণিক রহিত হইয়াছিল, তথাপি তখনও কৃষ্ণ চিন্তার একটী অবিচ্ছেদ ধারা তাঁহার চিত্তে প্রবলতম ভাবে বর্ত্তমান ছিল। সেই সময়ে রাখালের 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' শব্দ বাহির হইতে যে স্পন্দনের ধারা সৃষ্টি করিল, তাহা বিল্বমঙ্গলের অন্তরের চিন্তার সহিত মিলিত হইয়া সেই চিন্তাকে আপনার পূর্ব্বপথে টানিয়া তাহার কিয়দংশ বহির্মুখী করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের স্রোত যে প্রবলভাব ধারণ করিয়াছিল তাহার হ্রাস হইল এবং মস্তিষ্কেরও অবসন্ন ভাব দূর হওয়ায় ইন্দ্রিয় সকল আবার কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিল,—এক কথায় বিল্বমঙ্গল চেতনা পাইলেন। চেতনা পাইলেও তাঁহার চিন্তার ধারা কিন্তু অবিচ্ছেদেই চলিয়াছে,—তবে কতকটা বহির্মুখী হইয়াছে মাত্র—বাহিরে তখনই তাহার প্রকাশ হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কই কৃষ্ণ ?"

কৃষ্ণকে ত তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই—তবে কৃষ্ণ আসিলে তিনি কিরূপে বুঝিবেন; আর দেখিবার চক্ষুও ত তাঁহার নাই।

তাহা না থাকিলেও তিনি কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণের একটী ধারণা করিয়া লইয়াছেন—অন্তরে তাঁহার মূর্ত্তি ও তাহার বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে একটী বিশেষ ধারণা করিয়া লইয়াছেন, তাহারই আভাস তাঁহার পরবর্ত্তী কথায় পাওয়া যায়। তাঁহার কৃষ্ণ কালাচাঁদ, বংশীধারী, গলে বনমালা, শিরে শিখি-পাখা বামে হেলিয়া আছে এবং বঙ্কিমঠামে তিনি দাঁড়ান। ইহা কৃষ্ণের বাল্যরূপ, গোকুলের গোপালরূপ,—এইরূপে তিনি ব্রজলীলা করিয়াছেন। তাঁহার বাঁশরী শুনিলেই বিল্বমঙ্গল বুঝিবেন, কৃষ্ণ আসিয়াছেন।

পরম প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ রাখালরূপে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, কিন্তু আত্ম প্রকাশ করেন নাই। বিল্বমঙ্গলও তাঁহার অনাসক্ত রূপে শ্রীভগবানকে দেখিতে না পাইয়া

আকুলি-বিকুলি করিতেছেন,—কাতর হইয়া কত কাঁদিতেছেন—কই কৃষ্ণ, কোথা তুমি? দেখা দাও। এক একবার নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন—হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। পরক্ষণে আবার দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ডাকিতেছেন—এস, এস হে অনাথ নাথ! দিবারাত্র ঐ এক চিন্তা—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

অতি তীব্র বৈরাগ্য—পরিপূর্ণ অনুরাগ, তবুও আরাধ্যের দর্শন হইতেছে না কেন? না, এখনও অনুরাগ ইষ্ট দর্শনের উপযোগী হয় নাই; সহজ না হইলে সহজকে সহজে পাওয়া যায় না। সংস্কার সকল পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, চিত্তের বৃত্তি সকল একেবারে নির্ম্মল হইয়া যাইবে, মায়া মোহ ইত্যাদি কোনরূপ আবর্জ্জনা আদৌ থাকিবেনা এইরূপ একানুগ মায়াতীত অবস্থা না আসিলে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। সে অবস্থা এখনও বিল্বমঙ্গলের আসে নাই।

রাখাল বালকের সেবার জন্য তাহার প্রতি ভিতরে ভিতরে একটু টান জন্মিয়াছিল। সেবার জন্য যে একটা প্রীতি, সেবকের প্রতি একটা আকর্ষণ, একটা মোহ বিল্বমঙ্গলের মনের এক কোণে কখন তাহার অজ্ঞাতে আসিয়াছিল। তাহার উপর বালক বলিয়া আবার একটা স্নেহের ভাবও আসিয়াছিল। তাহার হৃদয়, মন, প্রাণ, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি নিঃশেষে অর্পণ করিতে পারেন নাই। রাখালের জন্যও তাহার মধ্যে একটু স্থান হইয়াছিল, তাই তখনও বিল্বমঙ্গল ইষ্ট দর্শনের উপযুক্ত হন নাই।

রাখালের প্রতি যে তাঁহার টান হইয়াছে, ইহা বিল্বমঙ্গল পরে জানিতে পারিয়া, রাখালকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন এবং সেজন্য অনেক তিরস্কার করেন; রাখাল কিন্তু নাছোড় বান্দা। অবশেষে বিল্বমঙ্গল প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প প্রকাশ করায় রাখাল বলিল "আচ্ছা তুই বৃন্দাবনে চল্, কৃষ্ণকে দেখতে পাবি।"

বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন শুনিয়া বিল্বমঙ্গল আরও উৎসুক হইয়া উঠিলেন, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ছুটিয়া চলিলেন, তাঁহার স্থান কাল পাত্র জ্ঞান রহিত হইয়া গেল, ব্যাকুলতার তরঙ্গ মনপ্রাণ ছাপিয়া উথলিয়া উথলিয়া উঠিল—

"এই কি সেই মধু বৃন্দাবন?
কই তবে ভ্রমর গুঞ্জন?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি
তান তরঙ্গিনী উন্মাদিনী কই ধায়?
কই পীতাম্বর মুরলী-অধর
বামে রাধা বিনোদিনী?
কই, কই, কি হ'ল আমার?
বৃন্দাবনে কই সে মাধব?

বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, কিন্তু কই, রাখাল যে বলিয়াছিল, বৃন্দাবনে গেলে কৃষ্ণের

দেখা পাওয়া যাইবে, কৃষ্ণের দেখা ত মিলিল না। বরং বিল্বমঙ্গল যত রাখালের সঙ্গ করিতেছেন ততই রাখালের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল, একদিকে কৃষ্ণ আর একদিকে রাখাল। অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া শেষে একদিন বলিলেন, রাখালের জন্যই তাহার এই সর্ব্বনাশ, মনও ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিতেছে, সন্ধ্যার মধ্যে মন স্থির না হইলে আত্মহত্যা করিবেন।

এখন আবার কৃষ্ণের চেয়ে রাখালই মনে আসে বেশী; সময় সময় কৃষ্ণ বলিতে রাখাল বলিয়া ফেলেন। এইরূপে রাখালই তাহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল। সাত দিন অনাহারে কাটিবার পর রাখাল যখন দুগ্ধ পাত্র লইয়া বিল্বমঙ্গলের সম্মুখে আসিল তখন রাখালেরই ইঙ্গিতে বিল্বমঙ্গল বুঝিলেন, রাখালরূপী অনাথনাথ আজ তাহার সম্মুখে তখন বিল্বমঙ্গলের একই গুণ-সম্পন্ন দুই চিন্তা (কৃষ্ণের চিন্তা ও রাখালের চিন্তা) মিলিয়া এক হইয়া গেল, এবং তখনই বিল্বমঙ্গল পূর্ণতর ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিতে পারিলেন।

কৃষ্ণই যে রাখালরূপে বিল্বমঙ্গলের পরিচর্য্যা করিতেছেন এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, বিল্বমঙ্গল তাহা বুঝিতে পারেন নাই সুতরাং তাহার মনে দুইটী আপাত বিভিন্ন ভাবধারা বর্ত্তমান ছিল, একটী শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা, তাহার আরাধ্যের চিন্তা, অপরটী রাখালের চিন্তা।

কৃষ্ণকে তিনি দিবারাত্র ডাকিতেছেন, কত কাঁদিতেছেন, কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে-ছেন, কৃষ্ণের জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নাই। আর রাখাল বালক বনমধ্যে একাকী অসহায় অন্ধ বিল্বমঙ্গলকে অযাচিতভাবে সাহায্য করিতেছে, সেবা করিতেছে, যাহা না পাইলে তাহার জীবন ধারণ করা সম্ভব হইত না; তদুপরি বাল-সুলভ প্রীতি বাৎসল্যের দ্বারা রাখাল বালক বিল্বমঙ্গলের সম্মুখে একটী আকর্ষণের ফাঁদ পাতিয়াছিল—অধিকন্তু রাখাল তাহাকে ইষ্টলাভের পথে সহায়তা করিতেছে।

কৃষ্ণকে তিনি প্রাণপণে ডাকিতেছেন, পাছে রাখালের প্রতি তাঁহার কোনরূপ আকর্ষণ জন্মে, তাই রাখালকে দূর করিয়া দিয়া কৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইতেছেন কিন্তু রাখাল কখন কোন অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে একটু করিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা বিল্বমঙ্গল জানিতে পারেন নাই। এইবার বিল্বমঙ্গল নিজেকে আর স্ববশে রাখিতে পারিলেন না,—তিনি রাখালের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন, কারণ এখানে আর কোনরূপ মনের বল হৃদয়ের বল কিছুই খাটে না—যদিও কোন চেষ্টা থাকে তাহা প্রতিপদে ব্যর্থ হইয়া যায়। বিল্বমঙ্গল রাখালের জন্য কৃষ্ণচিন্তা করিতে পারিতেছেন না; অত্যন্ত কাতর ও অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন—"আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধিপত্য রাখাল কিরূপে কল্লে? কে ও রাখাল আমার কাল হ'য়ে এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা কচ্চ? আমার এ কি সর্ব্বনাশ, কে ও রাখাল আমার কাল হয়ে এল? আমি সাতদিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হচ্চে, সে এলো। আমি কি করব? তার সঙ্গে কথা না কইলে আমি বাঁচি নি; মন আমার যে তার জন্যেই লালায়িত। "রাখালের নিকট

হইতে সাতদিন হইল পালাইয়া আসিয়াছেন কিন্তু রাখালের চিন্তা অহরহ তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়াছে, উভয় চিন্তার মধ্যে পড়িয়া বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব তাঁহার পরবর্ত্তী কথায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।—"শুনেছি একুশ দিন অনাহারে থাকলে প্রাণ বিয়োগ হয়; আর একপক্ষ অনাহারে ধ্যান করি প্রাণ যায় যাবে। না সে রাখাল ছোঁড়া আমায় মরতে দেবে না; সে বারণ কল্লে আমি মরতে পারব না। আমি এই ধ্যানে বসলুম। আর উঠব না; সে এলে মরব। (ধ্যান মগ্ন হওন) রাখাল রাখাল! দেখ, একি হল? কৃষ্ণ বলে ডাকতে রাখাল বেরিয়ে পড়ে! না, দেখি আর একবার দেখব। একবার চক্ষু তুমি মজিয়েছিলে; এবার কর্ণ আমায় মজালে! বধির হতেও সাধ হয় না। তার কথা শুনতে পাব না! চক্ষু! আজ তোমার জন্য ক্ষোভ হচ্চে; রাখাল বালকটি কেমন, একবার দেখতে পেলুম না। দেখ মূঢ় মন রাখালের কথাই ভাবছে। (ধ্যানমগ্ন হওন—) রাখাল রাখাল!"

রাখাল আর থাকিতে পারিল না অমনি ছুটিয়া উপস্থিত। ভক্তবৎসল ভক্তাধীন, প্রেমময় ভগবান ভক্তকে আর কষ্ট দিতে পারেন না, কারণ সে কষ্ট যে তাঁহারই প্রাণে বাজে। তাই বিল্বমঙ্গল যখন জিজ্ঞাসা করিলেন রাখাল, তুমি আমায় খোঁজ কেন? ভগবান ধরা দিলেন, বলিলেন, "তুই যে ভাই অনাথ; আমি যে ভাই অনাথকে বড় ভালবাসি।"

বিল্বমঙ্গল বুঝিলেন, আরাধ্য তাঁহার সম্মুখে। বিপুল আনন্দে অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় পুলকে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন রাখাল! রাখাল! আয়রে প্রাণের রাখাল আয়।"

অন্ধ বিল্বমঙ্গল রাখালের রূপত দেখিতে পাইতেছেন না। আর তাহা ছাড়া তাঁহার আরাধ্যের রূপত রাখালরূপ নয়। সৌন্দর্য্যের উপাসক, সুন্দরতমের প্রেমলিপ্সু আরাধ্যের যে সুন্দরতম রূপের ধারণা করিয়াছেন সে রূপ কোথায়? তাহা না দেখিলে ত তাঁহার ইষ্ট দর্শনই হইল না কিন্তু হায়! তিনি কিরূপে দেখিবেন সেই পরিপূর্ণ সুন্দররূপ যাহার জন্য তিনি চক্ষু দুটীই স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়াছেন। ভাবগ্রাহী ভগবান ভক্তবৎসলরূপে চিরদিনই ভক্তের কাছে বাঁধা। তিনি এইবার বিল্বমঙ্গলের চির-অভীপ্সিত রূপ ধারণ করিয়া বলিলেন "দেখ দেখি কেমন সেজেছি! "কিন্তু তিনি দেখিবেন কিরূপে? তখনই বিল্বমঙ্গলের নষ্টচক্ষু ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, "যা, তোর চোখ হ'য়েছে।"

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বিল্বমঙ্গল কি দেখিলেন? প্রেমে গদ গদ, আনন্দে বিভোর, আত্মহারা বিল্বমঙ্গল আরাধ্যের, পরম সুন্দরের অপরূপ রূপ স্বচক্ষে দেখিতেছেন ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিলেন "আহা আহা, মরি মরি! নয়ন দ্যাখ, তোর কত দেখবার সাধ।

নবীন জলধর   শ্যাম সুন্দর,

মদন মোহন ঠাম।

নয়ন খঞ্জন, হৃদয়-রঞ্জন,
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম ॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর-গুঞ্জন,
মুরলী মোহন তান ।
কুসুম ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ-গোপিনী প্রাণ ॥
শ্রীপদ-পঙ্কজ, দেহি পদ-রজ,
শরণ মাগিছে দীন ।
প্রাণ মাধব, সাধ, রব তব
প্রেম-মাধুরী-লীন ॥

* * * *

যেখানে রাখাল বিল্বমঙ্গলের হৃদয় অধিকার করিল তাহার পরবর্ত্তী গ্রন্থাংশে বিবৃত বিল্বমঙ্গলের চরিত্রের মধ্যে আর যুক্তি তর্কের বিচার চলে না, যুক্তিতর্কের সমাপ্তি ঐখানেই। আর যুক্তি বিচার চলে সাধন স্তরের সীমানা পর্য্যন্ত, সিদ্ধিস্তরে উহারা যাইতে পারে না। তখন আর বিচার বুদ্ধি থাকে না, থাকে কেবল একটী অপূর্ব্ব অনুভূতি, যাহা বাক্যে বলা যায় না, তর্কে বুঝান যায় না। ইহাকে সমালোচনা করিতে গেলে ভুল হইয়া যায় এবং বুঝাইতে গেলে ও ঠিক বুঝান যায় না। গ্রন্থকার এখানে যাহা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার লীলানুভূতির চক্ষে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত। যুক্তি তর্ক, বিষয় প্রাপ্তির সোপান মাত্র। যুক্তি তর্কের দ্বারা বিচার চলে ততক্ষণ যতক্ষণ না বিচার্য্য বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে তাহার পর যে স্থুল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহা তদতিরিক্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করিতে পারে না। কাজেই বিচার কার্য্য আর চলে না।

তখন থাকে কেবল স্থুলবুদ্ধির অতীত এক সূক্ষ্মানুভূতি, যাহা কেবল অনুভূতিই থাকিয়া যায় স্থূল ইন্দ্রিয়াদি তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; যেহেতু ঐ অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনসমূহ ইন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করিতে পারে না। সুন্দরের উপাসক বিল্বমঙ্গল ভাগ্যবান প্রেমিক পুরুষ, তাঁহার ভগবদ্ভক্তি রাগানুগত—

তাহাতে বৈধী ক্রিয়ার লেশমাত্র নাই, তাহা শাস্ত্রবুদ্ধির অপেক্ষা করে না, একেবারে আপন ভাবানুসারে আত্মসমর্পণ করে।

শ্রীগোবিন্দপদ বিশ্বাস

বাণী-বিতান

গতানুগতি।

[প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পুর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী সাধকের রচনা।]

হিংসা।

তিন পুরু যন্ত্রণায় আবৃত জগৎ।
শোচনীয় জীব করে হেথায় বসৎ॥
তিন তাপে দগ্ধ আর সহস্র বালাই।
ইহা দেখে জ্ঞানী কার হিংসা করে ভাই।
যদি বল অপরের অতুল সম্পদ।
আমার জীবন শুধু বিপদের পদ॥
তবুও পরের সুখে সুখী হই ভাই।
মিছে কেন আরো এক যন্ত্রণা বাড়াই॥
অপরের সুখ দেখে যত সুখ পাই।
ততটাই সুখ এর কোন ভুল নাই॥

মাংসময়ী প্রীতি।

বাসনার ইন্দ্রজালে ঢাকিয়ে নয়ন।
বহুদিন সেবা করি প্রেয়সী চরণ॥
মনে দেখি স্বর্গ ছবি নয়নে তাহার।
বচন সঙ্গীত স্রোতে দিয়েছি সাঁতার॥
মলময় ঘৃণ্য দেহ অস্থি চর্ম্মে ঢাকা।
কাটের পুতলি মাত্র বাস্তবিকে ফাঁকা॥
কাম কর্ম্ম অবিদ্যার ধন্ধ জাদুগিরি।
মহামোহে হেন হেয় বস্তু লাগি ফিরি॥
ভক্তিভাবে পূজি যদি বিভুর চরণ।
সকল এড়ায়ে পাই তাহার শরণ॥
বিষয় বিলাসে যথা মানসের টান।
তেমতি ঈশ্বর প্রেমে টানে যেন প্রাণ॥

সত্য সত্য সত্য করি বলি শুন ভাই।
জ্ঞান ভক্তি ভিন্ন ভবে অন্য গতি নাই ॥
যতদিন জ্ঞানের নয়ন নাহি খুলে।
যতদিন শুষ্ক হৃদি প্রেমে না উথলে ॥
কর্ম্মনিষ্ঠ হয়ে কর কামহীন ক্রিয়া।
ফলাফল তার সব ঈশ্বরেরে দিয়া ॥
শ্রদ্ধাবান হয়ে কর শাস্ত্র অধ্যয়ন।
সুসময়ে ভক্তি জ্ঞান হবে উপার্জ্জন ॥
শ্রদ্ধাবান সুখে তরে যন্ত্রণা সংসার।
শ্রদ্ধাহীন দেখে শুধু অকূল পাথার ॥

স্বর্গ নরক।

স্বর্গ নরক লয়ে পণ্ডিতের বাদ।
কত বাধা, কত ধাঁধা, সন্দেহ অগাধ ॥
কিন্তু এ সরল সত্য মনে ভেবে দেখ।
সুখ দুঃখ ছাড়া নাই যেথানেই থাক ॥
মনের প্রসাদ স্বর্গ অপ্রীতি নরক।
পাপ পুণ্য এ দুয়ের ইহাই পরখ ॥
একই বস্তু দেখ স্থির করিয়ে বিচার
একের সুখের তরে দুঃখ তরে আর।
দেখে তারে কাহারো বা ঈর্ষা জ্বলে উঠে
এই মত নানা মন নানা ভিতে ছুটে ॥
এখন যে বস্তু লয়ে সুখে মন ভোর।
অন্য কালে তাহাতেই জ্বালাতন ঘোর ॥
একবার যাতে হয় ক্রোধের প্রমাদ।
অন্যবার তাহাতেই মনের প্রসাদ ॥
তাই বলি এ সংসারে বস্তু দেখি যত।
বস্তুত্ব তাদের নাই বিচার সম্মত ॥
দুঃখ বলি এ জগতে কোন কিছু নাই।
সুখ বলিয়াও কিছু দেখিতে না পাই ॥
সুখ দুঃখ দেখি যাহা, যাহা শুনি নাম।
মনের বিকার শুধু করিয়েছে ধাম ॥

জ্ঞানই হয় পরব্রহ্ম অন্ত বহির্জ্যোতি ।
জ্ঞানই সুগতি আর জ্ঞানই দুর্গতি ॥
জগৎ সংসার এই দেখ জ্ঞানময় ।
জ্ঞান ভিন্ন কিছু আর কোথাও না হয় ॥
বিদ্যা যে পরম ধন, অবিদ্যা বালাই ।
জ্ঞান ভিন্ন কিছু নাই জানিও সদাই ॥
জ্ঞানময় পরব্রহ্ম জগৎ যাঁ হতে ।
তিনিই জগৎ যাহা দেখিছ সাক্ষাতে ॥
বিশ্বের আধার তিনি জগৎ গোঁসাই ।
লয়কালে তাহাতেই বিশ্ব করে ঠাঁই ।
তিনিই পরম গতি, চিরন্তন ধাম ।
ছাড়ায়ে কারণ কার্য্য তথা রূপ নাম ॥
একেলা অদ্বৈত তিনি নাহি ভেদ তাঁর ।
চরাচর তাঁহা হতে, চরাচর সার ॥
তিনিই অব্যক্ত রূপী প্রকৃতি যে মূল ।
তিনিই এ ব্যক্ত বিশ্ব নাহি ইথে ভুল ॥
অন্তরের অন্তরাত্মা, ভেবে দেখ ভাই ।
পবিত্র প্রেমের আর কোথা হেন ঠাঁই ॥

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

মাকড়সার জাল ।

মাকড়সা সুচতুর, কত সূক্ষ্ম তার কারিগরি !
তন্তুবায় তন্তু দিয়া গড়িয়াছে সুচিক্কণ জাল ;
'টানা' ও 'পোড়েনে' পড়ি পোকাগুলি হয়ে নাজেহাল,
না খেয়ে শুকায়ে মরে, শর্ম্মারাম খান শেষে ধরি' !
প্রতীচ্য ভারতবর্ষে লৌহজাল রাখিয়াছে গড়ি ।
তক্তার 'পোড়েন' নীচে, লৌহদণ্ড 'টানা' সুবিশাল ।
আবরিল শস্যক্ষেত্র, কত শত নদ নদী খাল !
লৌহবর্ত্মে ছুটি চলে লৌহদৈত্য দিবা বিভাবরী !
কুক্ষিগত করি নিত্য লক্ষ কোটি মানব মানবী,
দানব দৌড়িছে বেগে ; অর্দ্ধসিদ্ধ আরোহণকারী !

যবে তারা অবতরে, হস্তিভুক্ত কপিত্থের ছবি !
নাহি স্বস্তি না কমিলে সভ্যতার উগ্র বাড়াবাড়ি ।
ভারতের ভোগাগ্নিতে পাশ্চাত্যেরা ঢালিতেছে হবিঃ
ভাণ্ডারে লেগেছে অগ্নি, সর্ব্বাকুল দেখিছে সংসারী ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

রূপের নিশান ।

ফুটফুটে তার চেহারাটি
মিশমিশে চুল কালো,
দাঁড়ায় যখন পাশে এসে
সবাই বাসে ভালো ।
কপালটি তার নিটোল গড়ন
যেন চাঁদের ফালি,
হু'টি পাশে হু'টি ভুরু
রূপের চতুরালি,
কত চোখের দৃষ্টি-কপোত
পড়েছে তার জালে,
সে ফাঁদ কেটে বাহির হতে
পায় না কোন কালে ।
চোখ হুটির অই বাঁধাঘাটে
নাইতে আসে পরী,
চোখের পাতার বেড়ার জালে
রাখলে কে যে ধরি ।
পদ্মপাতায় শুয়ে শুয়ে
সাঁতরে বেড়ায় দিনে,
বাঁধলে কত বুকের তরী
ধরলে হৃদয় মীনে,
তারই নিচে দ্বিদল পদ্ম
চাঁপার কলি পরে,
মলয়জ নিশ্বাসেতে
নিখিল ভুবন ভরে ।

রূপের সাগর রাঙ্গা পদ্মে
ফুটল ওষ্ঠাধরে,
সুধার নদী নিরবধি
বইল তাহার পরে।
উথলে পড়ে সুধার ধারা
চিবুকখানি পরে,
কত হাতের স্নেহের পরশ
সেই খানেতে মরে।
মুখখানি কার কণ্ঠভরা
গম্ভীর প্রেমের গান,
বাজছে চোখে নাচছে বুকে
ভরছে সকল প্রাণ।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বেণীসংহারের কবির প্রতি।

সাহিত্যের রথিবৃন্দ মাঝে
তুমি দ্রোণ, হে বীর ব্রাহ্মণ,
চাণক্য, কি কবিজন্ম লভি
গৌড়ে হলে 'ভট্ট নারায়ণ';
ভদ্রকালী তোমার ধেয়ানে
জাগিয়াছে রুদ্রকালীরূপে,
পূজিয়াছ রাজরক্তে তারে
বৌদ্ধরাজে বলি দিয়া যূপে।
'শৌর্য্য শুধু নহে ক্ষাত্র ধন'—
সুতপুত্র মুখে প্রচারিলে,
'জন্মায়ত্ত নহেক পৌরুষ,
স্বায়ত্ত, তা' সাধনায় মিলে।'
চিত্রিলে শোণিত মসী দিয়ে
শায়কাগ্রে জাতীয় জীবন,
বৌদ্ধ হিন্দু কুরুক্ষেত্র রণে

কান্যকুব্জ হতে বিপ্রগুরু
নবমন্ত্র করি আনয়ন
'আদি' রাজ যজ্ঞ শালা তলে
সম্বরঙ্গে ঘটালে মিলন।
পৃষ্ঠে তব তূণভার দোলে
কণ্ঠে তব সামের ঝঙ্কার,
দর্ভাঙ্গুরী অঙ্গুলি মালায়,
হস্তে তব কোদণ্ড টঙ্কার।
অপাংক্তেয় দেশে ধন্য করি
দিলে আর্য্য সভ্যতা গৌরব,
উদ্বোধিলে ক্ষাত্রধর্ম্ম পুন
দিলে পুণ্য দ্বিজত্ব বৈভব।
কুরুরাজ উরুভঙ্গ-মাঝে
বিধর্ম্মের হেরিলে পতন,
ক্রমে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম
ভূপতিত বেদদ্রোহিগণ।
শিখাইলে এ ভারতে পুন
রমণীর বেণীবন্ধ পণ।
তোমার হুঙ্কার শুনি' কাঁপে
যুগে যুগে যত দুঃশাসন।
বজ্রবাণী তব রঙ্গভূমে
দিল বঙ্গে শৌর্য্যের প্রেরণা,
দিলে বঙ্গবাহিনীর প্রাণে
কর্ণ, কৃপ, পার্থের দীপনা।
সুপ্ত তব রঙ্গভূমি আজ
লুপ্ত নহে তব শূর-কথা
অন্ধরাজ শ্রবণে আজি তা
অশ্রুময় সঞ্জয় বারতা।

শ্রীকালিদাস রায়।

শিশু।

সৃষ্টির কোন প্রাতঃকালে কখন এলি মনভোলা
ওরে শিশু দিলি যে তুই চিত্তমাঝে হিন্দোলা!
সকাল বেলার পাগলা হাওয়ায় আলোর তুলি বুলায় দাগ,
শুভ্র হাসির রেশটুকু তোর মনের তলে রাঙায় ফাগ!
তরুণ রবির অরুণ জালে পড়ল ধরা পাখীর তান—
তার পাশে তোর আঁখির আলো করলে সজাগ কবির গান!
শুষ্ক সে কোন্ ফল্গু ছিল হৃদয় মরু প্রান্তরে,
জাগালি তায় কল্লোল তান স্নেহের সুধা মন্তরে!
প্রকৃতির ঐ শ্যামল বুকে তোরাই তুলিস সুরের রেশ;
আঁধার ঘরে জ্বালিস্ আলো তোরাই যে রে নির্নিমেষ!
আকাশ থেকে ঠিকরে পড়া ক্ষুদ্র জ্যোতির এক কণা—
জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ জ্বলছে রে তোর নয়ন কোলে অঞ্জনা!
তোদের হাসি সর্ব্বনাশী জ্বালায় চিত্তে সর্ব্বভুক্
বিরাট স্নেহের গহন বনে উজ্জ্বল তার শিখাটুক্!
খৈ পায়না কাব্যসুধা কণ্ঠে তোদের মূর্চ্ছনা!
মায়ের আঁচল শয্যা'পরে বিছাস্ মধুর জ্যোচ্ছনা!
মাণিকঝরা ফিণিকফোটা অভিমানের চোখের জল
টপ টপ টপ পড়ে যেন শুক্তি হতে মুক্তাফল!
মায়ের বুকে মিষ্টি দিলি কোল জুড়ে তার সৃষ্টিধর
ইষ্টিদেবের আসনটী তাঁর কেড়ে নিলি অতঃপর।
দুঃখরাতের মাণিক তোরা শান্তি জাগাস্ সব বুকে
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে বেড়াস্ সকল সময় শোক দুখে!
ওরে নবীন মানব শিশু সাতরংএরি তুলির টান
কেমন করে মনের পাতে ফুটিয়ে তুলিস অফুলান!
জগৎসভার প্রথম কবি, রংমহালের গোলাপ ফুল
শ্বেত পরীদের স্বর্ণছটা গুলবাগেরি ও বুলবুল!
মনোলোভা ওরে শোভা ওরে স্নেহের দুলালি!
সোহাগ ডোরের বন্ধনে তুই মনরে আমার ভুলালি!

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বৌদ্ধ যুগে আয়ুর্ব্বেদ

প্রাচীন আর্য্যগণ চিকিৎসা শাস্ত্রকে অন্যতম বেদরূপে শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া উহাকে আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করেন এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। অন্যান্য বেদের ন্যায় এই শাস্ত্রের কলেবরও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঋষিগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমাবেশে এইরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে ইহা এখন পর্য্যন্ত জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। বর্ত্তমান এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এই মহান শাস্ত্রে উন্নতি মানসে বৌদ্ধাচার্য্যগণ কি পরিমাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন।

অধ্যাপক রীজডেভিড্ বৌদ্ধ যুগ নামক ভারত ইতিহাসের একটী বিশিষ্ট পরিচ্ছেদের অবতারণা করেন। তাঁহার মতানুসারে বৌদ্ধযুগ প্রায় অষ্ট শতাব্দীব্যাপী অর্থাৎ মহারাজ বিম্বিসার হইতে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমরা এই প্রবন্ধে বৌদ্ধযুগ শব্দে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই বিশিষ্ট পরিচ্ছেদই বুঝিব। সেই যুগের বৌদ্ধাচার্য্য চিকিৎসকের চিকিৎসা ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একে-একে লিখিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহারাজ মগধাধিপতি বিম্বিসারের রাজত্ব কালীন অথবা ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সময়ে ভিষক্‌কুল তিলক মহামতি জীবক রাজ-চিকিৎসক ও শল্যকর্ত্তা ছিলেন।

প্রাচীন কালে তক্ষশীলা মহানগরীর জ্ঞানসৌরভে জগৎ মুগ্ধ ছিল। তক্ষশীলা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। তখন মিশর, বাবিলন, সিরিয়া, ফিনিসিয়া আরব, চীন্ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের পণ্ডিতগণ শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের চর্চ্চা হইত। তৎকালীন গ্রীকেরা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য তক্ষশীলা আগমন করিতেন, তাহা ছাড়া তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রভৃতি শিক্ষা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থাছিল। তথায়—

ভিষক্-কুলতিলক মহামতি জীবক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য গমন করেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম, অসামান্য অধ্যবসায় এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠে ব্যাপৃত থাকিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের শিক্ষনীয় বিষয় সাত বৎসরেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ ও উদ্ভিদবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।

বিদায়কালীন গুরুর নিকট পরীক্ষা প্রদান ব্যাপার হইতে বুঝা যায়, তিনি কিরূপ গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পাঠাগারে সপ্তম বৎসরের শেষভাগে একদিন তদীয় আচার্য্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "গুরুদেব! আর কতদিন আমায় অধ্যয়ন করিতে হইবে।"

আচার্য্য বলিলেন "বৎস তোমাকে চারিদিবসের সময় দিতেছি, তুমি এই নগরের চতুর্দ্দিকে দুই যোজনের মধ্যে যত তরুলতা, ফলমূল, ইত্যাদি দেখিতে পাও সমস্ত পরীক্ষা করিয়া আমায় বল, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোনটী ভৈষজ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেনা।

ভিষক্-কুলতিলক মহামতি জীবক চারি দিবস পরে আসিয়া এমন উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, যে শিক্ষাচার্য্য তাঁহার জ্ঞানে সবিশেষ প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন "বৎস! তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তোমাকে আর শিক্ষা দিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে বিরল।" ভিষক্-কুলতিলক মহামতি জীবক বলিয়াছিলেন, "ঔষধে না লাগে এমন কোন উদ্ভিদই নাই।" এই বালক—জীবকই উত্তর কালে মহারাজ বিম্বিসারের রাজবৈদ্য ও ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের, ভিক্ষু সঙ্ঘের চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত।

এই মহা পুরুষের চিকিৎসাতত্ত্ব কতকগুলি বিস্ময়কর বিবরণ ব্যতীত তৎলিখিত কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে এইরূপ ভারতবর্ষের কত শত কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণের প্রণীত কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না, এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতারাশি প্রায় বিলুপ্ত, অথবা ব্যক্তি বিশেষে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যদিও আমরা তাঁহাদের আবির্ভাব এবং অন্তর্দ্ধানের সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না—তথাপি আমরা বৌদ্ধ এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখিতে পাই, মহামতি বাগভট, নাগার্জ্জুন, চক্রপাণি, সিদ্ধনাগার্জ্জুন বৃন্দ মাধবকর ও ভাবমিশ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ ভারতবর্ষে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

গুরুর নিকট বিদায় নিয়া মহামতি জীবক স্বদেশে যাত্রা করেন। পথে সাকেত নগরে শুনিতে পাইলেন যে এক শ্রেষ্ঠীপত্নী শিরঃপীড়ায় সপ্ত বৎসরাবধি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা কেবল অর্থ নিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন মাত্র, রোগের উপশম করিতে পারেন নাই। ভিষককুলতিলক মহামতি জীবক অবশেষে গভীর জ্ঞানবল ও গবেষণায় আবিষ্কৃত সামান্য নস্য সেবন করাইয়া ঐ রোগকে আরোগ্য করেন।

মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসারকে ভগন্দর রোগে সামান্য প্রলেপ প্রদানে আরোগ্য করিবার পর হইতেই তিনি রাজবৈদ্য রূপে গৃহীত হন। *
রাজগৃহে কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রের করটী ভেদ করিয়া দুইটী পোকা বাহির করতঃ তাঁহাকে শিরঃপীড়া হইতে মুক্ত করেন। এই হইতেই ভারতবর্ষে—ভিষক্কুলতিলক মহামতি জীবক প্রথম শল্য চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

আরও একটী উদাহরণ হইতে বুঝা যায় ভিষক্কুলতিলক মহামতি জীবক শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে কতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন! একদিন বারাণসিতে এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের অন্ত্রের একাংশ, লম্ফ দিবার সময়, গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া যায়। ইহার নিমিত্ত তিনি কোনরূপ কঠিন দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারিতেন না। ভিষক্কুল তিলক্ মহাপতি জীবক ঐ কুমারের বস্তিদেশ

---

* বিনয় মহাবগ্গ অষ্টম খণ্ড।

বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রটিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিরাময় হইয়া উঠেন।

উজ্জয়িনী রাজচণ্ড প্রদ্যোত পাণ্ডু রোগগ্রস্থ হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসারকে অনুরোধ করেন যেন, ভিষক্‌কুলতিলক মহামতি জীবককে তাঁহার চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। মহামতি জীবকের, তাহাকে আরোগ্য করিতে গিয়া, জীবনান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যে হেতু রাজার এক অদ্ভুত দোষ ছিল তিনি তৈল কিম্বা ঘৃত প্রভৃতি কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু যখন আরোগ্য হইয়া উঠেন, তখন, ভিষক্‌কুল তিলক মহামতি জীবকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে দুইটী পরিচ্ছদও বহুল রত্ন পুরস্কার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব কোষ্টকাঠিন্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। ভিষক্‌কুল তিলক মহামতি জীবক তিনটী পদ্মের মধ্যে তাঁহার আবিস্কৃত মৃদু-বীর্য্য ঔষধ রাখিয়া ভগবান বুদ্ধকে উহার আঘ্রাণ লইতে বলেন, তাহাতেই বুদ্ধদেব কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। * অতঃপর দেবদত্ত ভগবান বুদ্ধদেবকে হত্যা করিবার নিমিত্ত এক পাষাণ নিক্ষেপ করেন, এবং ঐ পাষাণের একখণ্ড লাগিয়া তাঁহার পায়ে ক্ষত হয়। তখন ভিষককুল তিলক মহামতি জীবকের চিকিৎসায় তিনি ঐ ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করেন।

মহামতি জীবকের উপাধি কৌমার ভৃত্য (পালি নাম কুমার ভচ্চ)। বর্ত্তমানে শিশু চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ মাগধি বা বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আশ্চর্য্য ফল লাভ করিতেছেন। তাহা বোধ হয় ঐ বৌদ্ধ যুগের পুরুষপরম্পরা চিকিৎসাবিদ্যার আভাষ ও প্রচলন। শিশু চিকিৎসার নানাবিধ ঔষধ তাঁদের নিকট পাওয়া যায়। এই সকল ঔষধ শিশু রোগের পক্ষে অমোঘ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বৌদ্ধ চিকিৎসক মহামতি বাগভট তৃতীয় শতাব্দী অর্থাৎ অন্ধ্ররাজ চষ্টনের রাজত্বকালে "অষ্টাঙ্গ হৃদয়" নামক এক বৃহৎ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তিনি সমস্ত আয়ুর্ব্বেদকে অষ্ট প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন। শল্য শালক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতচিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারবিদ্যা, অগদতন্ত্র, রসায়ণতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র; তথায় মৃদু মধ্যম ও তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া ধাতু শোধন, মারণ, জারণ প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও লবণ, যবক্ষার খনিজ ধাতু প্রভৃতির বিশদরূপে পরীক্ষা করিবার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ পি সি রায় মহাশয়ও তাঁহার হিন্দুকেমিষ্ট্রীতে (২য় ভাগে) প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে বাগভট বৌদ্ধ উপাসক ছিলেন। †

---

* শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত জাতকের অনুবাদ ৩৯ পৃষ্ঠার কুরঙ্গ মৃগজাতক

† তাঁহার পুস্তকের ১ম ভাগ ৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অষ্টঅঙ্গ যথা শল্য—লৌহ, ধূলি, কেশ, নখ প্রভৃতি শরীরের ভিন্ন অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেও তাহা বহির্গত করিবার প্রণালী এই তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

শালক্য—চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা, প্রভৃতির রোগ সমূহের বর্ণনা আছে।

কায় চিকিৎসা—জ্বর, অতিসার রক্তপিত্ত, শোথ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত আছে।

ভূত বিদ্যা—দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব যক্ষরাক্ষস পিশাচ নাগ প্রভৃতির জন্য শান্তির কর্ম্ম উপদিষ্ট আছে।

কৌমার বিদ্যা—শিশু পালন, ধাত্রিদুগ্ধের শোধন, বালরোগ প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত আছে।

অগদ তন্ত্র—সর্প কীট বৃশ্চিক্ প্রভৃতির দংশন জনিত বিশেষ চিকিৎসা বিবরণ বর্ণিত আছে।

রসায়ন তন্ত্র—যাহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, মেধা ও শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার বিষয় বর্ণিত আছে।

বাজীকরণ তন্ত্র—ইহাতে শুক্রের শোধন, শুক্র বর্দ্ধন প্রভৃতির উপায় বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বোক্ত আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট অঙ্গের বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত আছে বলিয়াই বাগভট প্রণীত গ্রন্থের নাম "অষ্টাঙ্গ হৃদয়"। বৌদ্ধ চিকিৎসক মহামতি বাগভটের সময়েই অস্ত্র চিকিৎসার সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে ঐ বিদ্যার অবনতির সূচনা হয়। মনু একজন হিন্দু সমাজসংস্কারক ছিলেন। তাঁহার সংহিতাতে তিনি আচার ব্যবহারের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মগত মত বা সংহিতাই, অস্ত্র চিকিৎসা শাস্ত্র, হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষ হইতে আজ বিলুপ্ত হইবার কারণ। তিনি বলেন মৃতদেহ স্পর্শ করিলে দোষ বা পাপ হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানে শরীরবিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসা চর্চ্চা ভারতবর্ষে এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন আরবে সমধিক এই শাস্ত্রের আলোচনার সূচনা হয়। ইউরোপ পার হইয়া সাগরের জল যেমন সাগরে বর্ষিত হয়, তেমন পুনঃ ভারতবর্ষে কিছু কিছু বর্ষিত হইতেছে। *

বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাংএর নাম ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার ভারত ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায় সে সময়ে বোধিসত্ত্ব নামক নাগার্জ্জুন এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। † তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নাগার্জ্জুন তন্ত্র, নাগার্জ্জুনীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র, যোগরত্নাবলী কৌতূহল চিন্তামণি, পক্ষপুট নাগার্জ্জুনীয়, নাগার্জ্জুন রস রত্নাকর, আরোগ্য মঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল, প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ তাঁহারই কৃত। এই নাগার্জ্জুন ব্যতীত আমরা অন্য একজন নাগার্জ্জুনের নাম প্রাপ্ত হই। কেহ কেহ অনুমান করেন, খৃষ্ট পূর্ব্ব

---

* জগজ্জ্যোতিঃ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ৪৯ পৃষ্ঠা

† পঞ্চানন নিয়োগীর কৃত আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন [illegible] পৃষ্ঠা

প্রথম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বিদর্ভরাজ ভোজ ভদ্র তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। * ভোজভদ্র খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক সূত্র প্রণেতা। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব নামে সুপরিচিত।

নব্য রসায়নের জন্মদাতা যেমন বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক "ল্যাভোয়াসিয়ে" সেইরূপ ভারতীয় প্রাচীন রসায়নের জন্মদাতা বোধিসত্ত্ব "নাগার্জ্জুন" তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে বহুবিধ তির্য্যক পাতক প্রক্রিয়া এবং ধাতুর জারণ মারণ প্রভৃতির আবিষ্কারকর্ত্তা বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। চক্রপাণি, লৌহ মারণ বর্ণনা কালে উহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া স্বীকার করেন। রসরত্নাকর, বোম্বে সংস্করণের ৪র্থ পৃষ্ঠায়, নাগার্জ্জুনকে একজন রস বিষয়ক উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মহাযান প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন যে একজন রাসায়নিক ও চিকিৎসা পারদর্শী সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ বৌদ্ধ পালি তিব্বতী ও চীন ভাষায় লিখিত নানা গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে নাগার্জ্জুনের চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ পারদর্শিতা সম্বন্ধে বিস্তর কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায় তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক; কেহ বলেন নাগার্জ্জুন হর্ষের সময়, কেহ বলেন কনিষ্কের সময় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জন্মকাল ঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন। যাহা হউক তিনি যে সাধারণ রাসায়নিক নহেন তাহার কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। সুশ্রুতের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদে ছয়টি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, শীষক ও লৌহ। শারঙ্গধর এবং বিশেষতঃ তাঁহার টীকাকার নয়টী ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন। তাম্র, রৌপ্য, পিত্তল, শীষক, স্বর্ণ, লৌহ কাংশ ও বৃত্ত লৌহ, তাঁহারা সূর্য্য প্রভৃতি ন গ্রহ হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে এইরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভারতে নাগার্জ্জুন ও পতঞ্জলি ধাতু প্রক্রিয়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু নাগার্জ্জুন ও পতঞ্জলি প্রণীত গ্রন্থাবলী প্রায় বিলুপ্ত। কেবল অন্য গ্রন্থাদিতে তাঁহাদের উক্তি কর্তক উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। ভারতের প্রধান রাসায়নিক নাগার্জ্জুন স্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে রসমঞ্জরী গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন। † কাশ্মীর সুবার অন্তর্গত পকিলী নামক স্থানে নদীর স্রোতে প্রথমে লম্বা লম্বা ছাগ চর্ম্ম বিছান হইত এবং স্রোতে যাহাতে উহা ভাসাইয়া লইয়া না যায় সেই জন্য পাথর চাপা দেওয়া যাইত। দুই তিন দিবস পরে চর্ম্মগুলি সযত্নে তুলিয়া রৌদ্রে শুকানো হইত। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য প্রদেশের খনি ছিল। আবার নদীস্থ বালুকা এবং মৃত্তিকাতেও পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ প্রাচীন রাসায়নিকদের প্রথায় নাগার্জ্জুনের বিশেষ চেষ্টায় লৌহ তাম্র প্রভৃতি হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা হইত। আইনি আকবরীতে বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন কৃত এক রকম পরশ পাথরের উল্লেখ আছে।

* রসেন্দ্র চিন্তামণি কালিশচন্দ্র সেনের সংকরণ ১১পৃষ্ঠা

† গ্লেড উইল সাহেবের আইনি আকবরী ২য় খণ্ড ৮৭ পৃঃ।

তাহা ছাড়া গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া রৌপ্যের সহিত তিনবার ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্য স্বর্ণেতে পরিণত হয়। * এইরূপ তাঁহার সরত্নাকর গ্রন্থে কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। তাহা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, শীসক, যশদ, পারদ, কজ্জলী, লৌহ, প্রভৃতি প্রস্তুত প্রক্রিয়া ও জারণ, মারণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী ভারতবর্ষে উড্ডীয়মান হইতেছিল তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল! উহাতে সুদূর চীন, তাতার, তিব্বত, শ্যাম, আনাম প্রভৃতি দেশ হইতে ছাত্রগণ আগমন করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। নালন্দা নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তি আছে যে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের দক্ষিণবর্ত্তী পুষ্করিণীতে নাগরাজ বসতি করিতেন। তাঁহার নাম অনুসারে ঐ স্থান নালন্দা নামে অভিহিত ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দুইশত গ্রাম বৌদ্ধ সম্রাট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। তথায় বৌদ্ধ নরপতিগণের দ্বারা একটী বৌদ্ধ বিহার প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার উচ্চে প্রায় ৩০০ শত ফিট ছিল। উক্ত বৌদ্ধ বিহারের প্রজ্ঞাভদ্র নামক একজন বিহারাধ্যক্ষ ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ সহস্রাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। পনর শত দশজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন।

প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক দশজন পঞ্চাশৎবিধ সূত্রে গ্রন্থে ও শাস্ত্র গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক সহস্র জন বিংশবিধ শাস্ত্র গ্রন্থে ও সূত্র গ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ ছিল। পূর্ব্বাধ্যক্ষ ধর্ম্মপালের লোকান্তর গমনের পর প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হন শীলভদ্র। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর হইতে তিনি দণ্ডদেব নামে পরিচিত হন। তিনি পঞ্চাশ বৎসর কাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন ভারত ভ্রমণে আসেন তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রধান শিক্ষক শীলভদ্রের বৌদ্ধ দর্শনে অশেষ পাণ্ডিত্য দর্শনে তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া, অভিধর্ম্ম, হেতু বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা, ইত্যাদি শাস্ত্রের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন।

† মাধ্যমিক দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভাবন কর্ত্তা বোধিসত্ত্ব, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গুনমতি, জিনমতি, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, জ্ঞানচন্দ্র, শীঘ্রবুদ্ধ, প্রভৃতি অধ্যাপক ছিলেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধ মতের প্রতিষ্ঠাতার নাম বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন, ইনি একজন মহাজ্ঞানি ও তার্কিক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন বিদর্ভের অন্তর্গত মহা কোশল নামকস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন কৃষ্ণানদীর তীরে শ্রীপর্ব্বতের এক গুহায় অনেকদিন যাবৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ বিহারে

* ভাব প্রকাশ ১৪৬ পৃঃ।

† অশোক বা প্রিয়দর্শী ২৬৬ ৬৭

ছাত্রের অভাব ছিল না, প্রকৃত জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও সদগুণ সম্পন্ন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুনমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র ও শীলভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ ও ভাষাদি রচনা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ বিস্তৃতি করিয়াছিলেন। খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চীন পরিব্রাজক ইসিন ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ৬৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। আর্য্যদেব বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুনের শিষ্য অনেকস্থলে কানদেব, নীলনেত্র, এবং পিঙ্গলনেত্র নামে পরিচিত। ইনি ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আর্য্যদেব বহুদিন নালন্দা বিশ্বিদ্যালয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। চীন ভাষায় কুমার জীব ইহার জীবনী লিখিয়াছিলেন।

* তক্ষশীলার শিক্ষা মন্দির নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাও প্রাচীন। এক সময় মহর্ষি আত্রেয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও আলোচিত হইত, বৌদ্ধ পালিগ্রন্থে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক মহর্ষি পাণিনি ও মহাভাষ্যকর পতঞ্জলি তক্ষশীলা বৌদ্ধ বিহারে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই দুইটী প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত ভারতবর্ষে বহুস্থানে বৌদ্ধ বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধযুগে শিল্প, ধর্ম্ম, চিকিৎসা শাস্ত্র, এক অভেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল। মৌর্য্য সম্রাট অশোক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তার বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

বালাদিত্যের রাজত্বকালে ৪৫০ খৃষ্টাব্দে নালন্দা বৌদ্ধবিহার সর্ব্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার যশঃ সৌরভ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নালন্দা বৌদ্ধবিহারে রত্নসাগর, রত্নোদধি এবং রত্নরঞ্জন নামক তিনটি তাঁহার বিশাল গ্রন্থালয় ছিল। ইহাদের মধ্যে রত্নোদধি নবমতল বিশিষ্ট সুবৃহৎ অট্টালিকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থালয়ে হীনযান মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় পুস্তক সংগৃহীত ছিল।

ফরাসী দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি, চীন দেশীয় ত্রিপিটক গ্রন্থের আলোচনা কালীন চরক নামক জনৈক চিকিৎসকের সন্ধান প্রাপ্ত হন, তিনি রাজা কনিষ্কের দীক্ষা গুরু ছিলেন। রাজা কনিষ্কের রাজত্ব কাল দ্বিতীয় শতাব্দীতে. কেহ কেহ অনুমান করেন। সুতরাং "চরক" দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। আরবীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজেস্ তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে ভারতবর্ষের সিদ্ধিচয় নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে কয়েকটী বিষয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই সিদ্ধিচয় চরক ভিন্ন

* শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুর অশোক বা প্রিয়দর্শী ২৭৯-২৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অন্য কেহ নহেন। আরবীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাজেস্ ৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

* মৌর্য্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রেরও অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, ভৈষজাগার নির্ম্মাণ এবং ভৈষজ গুল্ম লতাদি সংগ্রহ বিষয়ে সম্রাটের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পশু চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় প্রভৃতি ব্যবস্থা ও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের দয়ার্দ্র হৃদয়ও নিরাশ্রয় আতুরের আর্ত্তনাদে দ্রবীভূত হইয়াছিল। তাই তিনি রাজ্যে দাতব্য চিকিৎসালয় আতুরাশ্রম ভেষজসার প্রভৃতির যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মগধ সাম্রাজ্যে সুচিকিৎসকের অভাব ছিল না। সম্রাট অশোক কেবল নিজ সাম্রাজ্যেই চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। যে সকল রাজ্য তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত, যে সকল রাজ্য মিত্র বা করদ রাজ্য রূপে পরিগণিত হইত তথাকার প্রজাদিগের হিতার্থে চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া—প্রজাগণের সুব্যবস্থা ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। মৌর্য্য সম্রাট অশোক তাঁহার সুবৃহৎ রাজ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় এবং আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যয় ভার রাজকোষ হইতে নির্ব্বাহ করিতেন। তক্ষশীলা শিক্ষা মন্দির, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষাও প্রাচীন, * বৌদ্ধ পালিগ্রন্থে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধযুগে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র এক অভেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের যত্ন ও তৎপরতায় তক্ষশীলা বারাণসী, শ্রীধান্যকটক এবং নালন্দা প্রভৃতি স্থানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। † তাঁহার পরে চক্রপাণি বৃন্দ মাধবকর ও ভাব মিশ্রের নাম উল্লেখ যোগ্য। চক্রপাণির প্রধান গ্রন্থের নাম চক্রদত্ত, বৃন্দের প্রধান গ্রন্থের নাম সিদ্ধিযোগ। তাঁহারা উভয়েই নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত বিবিধ চিকিৎসা ও চিকিৎসার অনুকরণ করেন। চক্রপাণির চিকিৎসা সংগ্রহ গ্রন্থে নাগার্জ্জুনাঞ্জন ও নাগার্জ্জুন যোগ প্রভৃতি ঔষধের উল্লেখ দেখা যায়। চক্রপাণির পিতা নারায়ণ, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, পাল-বংশের রাজা নয়পালের চিকিৎসা ও পাকশালার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। চক্রপাণির নিবাস—রাঢ়ের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে। তিনি ১০৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। যদিও তাঁহারা তান্ত্রিক যুগের অর্থাৎ খৃষ্টপরে নবম ও একাদশ শতাব্দীর লেখক ছিলেন, কিন্তু বৃন্দের সময়ে ধাতু ঘটিত ঔষধ সকল আভ্যন্তরিক প্রয়োগে তাদৃশ প্রবল হয় নাই। উভয়েই নাগার্জ্জুনের আবিস্কৃত কজ্জলী ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। "বৈদ্যক শব্দ সিন্ধু" ১০ পৃষ্ঠায়

* ১ম সংখ্যা ১১ বর্ষ জগজ্জ্যোতিঃ ১৭—১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু প্রণীত অশোক বা প্রিয়দর্শী ২৬১—২৬২—২৬৩ পৃষ্ঠা।

দেখিতে পাই চক্রপাণি ভারতের পেরাসেল্‌সাস্ নামে অধিকারী। তাঁহার সময় হইতেই ধাতু ঘটিত ঔষধ খুব বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে।

ডাক্তার শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া সটিপট্‌টান সূত্রের অনুবাদিত ভূমিকায় লিখিয়াছেন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্তই ধ্যান প্রসূত। স্মৃতি অনুশীলন করিতে গিয়া বৌদ্ধ সাধক-গণ মানব-শরীর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল লোম্, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু অস্থি, অস্থি মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লেদ, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুয, শোণিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সিকনী, লসিকা, মূত্র, ও মস্তিষ্ক আছে।

মৃত-দেহের পরিণাম ভাবিতে গিয়া তাঁহারা অনেকগুলি অস্থির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা হস্তাস্থি, পদাস্থি, উদরাস্থি, কটিরস্থি, পৃষ্ঠকণ্ট ও শির কটাহ। শরীর তত্ত্ব শিখিবার নিমিত্ত শব ব্যবচ্ছেদ করিবার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও অনিত্য ভাবিবার উপায় করিতে গিয়া মৃত দেহকে পোড়াইত না। এবং তৎপরিবর্ত্তে সিবথিকা বা "অমুক শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া দিন দিন উহার অবস্থা অবলোকন করিতেন। ক্রমে উহার রক্ত মাংস সমন্বিত ও স্নায়ু সম্বদ্ধ অস্থি শৃঙ্খলে পরিণত হয়। ক্রমে রক্তমাংস বিদুরিত হয়, অস্থিগুলি ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া শঙ্খ বর্ণের ন্যায় শ্বেত হইয়া যায়।

সটিপট্টান সূত্র ব্যতীত আরও অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে চিকিৎসা বিষয়ে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। নিম্নে আমরা বিনয়-পিটক হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব।

এক সময় ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীবিহারে ত্রয়োদশ বর্ষ বাস করিতেছিলেন। ভিক্ষুদের অবস্থা দেখিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহার শ্রাবক মণ্ডলী কয়েক জনের মধ্যে বমন রোগ হইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। আহার্য্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবা মাত্রেই বমি হইয়া যাইত। তদ্দর্শনে তিনি, প্রিয় শিষ্য মহাথের। আনন্দকে বলিলেন, "দেখ আনন্দ আমি তাঁহাদের রোগ নিবারণার্থ ভৈষজ সংগ্রহ করিতেছি। তুমি প্রকৃত জানিয়া আসিবে তাঁহাদের কি রোগ হইয়াছে; তৎশ্রবণে মহাথেরা আনন্দ রোগী ভিক্ষুদিগকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন তাঁহাদের নিকট শারদীয় ঋতু সহ্য হইতেছে না। যে হেতু বর্ষা বাসের সময় তাঁহারা কঠিন মানসিক পরিশ্রম করাতেই তাঁহাদের পিত্ত কোপিত হইয়াছে। এবং শরৎ কালীন শীতলতা ঐ কোপিত পিত্তকে গাঢ় করিয়া শরীরের বসা নামক যে ধাতু আছে তাহাকে বিধ্বংস করিয়াছে, তাই এই রকম বমি হইতেছে। সুতরাং ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিবার নিমিত্ত রোগী ভিক্ষু সংঘকে আদেশ প্রদান করেন। তাহাতেই তাঁহারা শীঘ্র আরোগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১। পঞ্চ ভৈষজ্য—ঘৃত, নবনীত মধু ফনিত—অশ্ব বসা, মৎস্য বসা, শশক বসা, শূকর বসা, গর্দ্দভবসা। এই সমস্ত একত্র করিয়া সিদ্ধ করতঃ ঔষধ প্রস্তুত করিতেন।

২। মূল ঔষধ—হরিদ্রা, শিংগীর, ক্ষার, বচ, (অতি বিষ) পাঠিনাম, কটকরোহিণী

(বন্ধমর্ত্তিকং ও উচিক, পালিনাম) এই সকল মূল ঔষধ একত্রে সিদ্ধ করতঃ পাচন প্রস্তুত করিতেন।

৩। ত্রিকূট কষায়, পটল কষায়, পগগ কষায়, মস্তনমান কষায়, সংযোগে ইহা অন্যতম পাচন ব্যবস্থা করিতেন।

৪। নিমপত্র, কুটবপত্র, পটলপত্র, তুলসীপত্র, কার্পাসপত্র, এই সকল ও পাচনরূপে ব্যবস্থা করিতেন।

৫। বিঙ্গড়, পিপুল, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, জায়ফল, প্রভৃতিতে আসব প্রস্তুত করিতেন।

৬। জতু সংযুক্ত বটি। হিং, হিঙ্গুত টিপাটিত, হিং বৃক্ষের শুষ্ক পত্র ও ছাল শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতেন।

৭। সমুদ্রের লবণ, কাল লবণ, উদ্ভিদ লবণ ইত্যাদি সংযোগে অন্য প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতেন।

* ব্রহ্মজাল সূত্রে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধেও কতিপয় বিষয় উল্লিখিত আছে। বমন বিরেচন, উর্দ্ধ বিরেচন কর্ণ তৈল নেত্র তৈল, নস্য প্রস্তুত করণ ইত্যাদি! তন্মধ্যে শালৈক্য, অস্ত্র চিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, ও বিষ চিকিৎসা প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। উক্ত সূত্রে ভগবান সম্যক সমবুদ্ধের উক্তি সমূহ হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভাগ বিভাগ সম্বন্ধে সঠিক খবর কিছুই পাওয়া যায় না। তথাপি আমরা বেশ মনে করিতে পারি যে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ সেই সময়ে আয়ুর্ব্বেদ অষ্টভাগে বিভক্ত ছিল না। উত্তরঅধ্যায়সূত্র নামক একটী প্রাচীন জৈন গ্রন্থে মাত্র ৪টী ভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক জগতে কত রকম আশ্চর্য্য ঔষধ আবিস্কৃত হইয়াছে। তাহার মূলেই রহিয়াছে চিকিৎসা শাস্ত্র। বৌদ্ধ চিকিৎসকগণ এই শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সুশ্রুত ও অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রের, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বৌদ্ধ চিকিৎসক দ্বারা। তাহার প্রমাণ বিশেষ ভাবে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৌদ্ধ চিকিৎসকগণের সংস্কৃত চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি মহা মহা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ বিশেষ সম্মান লাভ করিতেছে। মোটের উপর দেখিতে পাই (ভিষককুলতিলক) মহামতি জীবক উদ্ভিদ বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধন করেন এবং তিনি যে শল্য চিকিৎসায়ও বিশেষ নিপুণ ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাঁহার পরবর্ত্তী বাগভট নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ প্রস্তুত করেন।

দৃঢ়বল ও মাধবকর রোগনিশ্চয়নিদানের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের পরে মহামতি বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন ধাতু গঠন জারণ মারণ প্রস্তুত করণ ইত্যাদি রাসায়নিক তত্ত্ব বাহির করেন।

পরিশিষ্ট।

মহা ব্যুৎপত্তি বিবিধ বুদ্ধিতম।

অধ্যাপক বিনয়ক সম্পাদিত।

পৃঃ ৫১।

নিম্নলিখিত বৌদ্ধ চিকিৎসকগণের নামের বিশেষ উল্লেখ আছে।

চিকিৎসকগণের তালিকা।

সুশ্রুত। হারিত। হরিশচন্দ্র। ভৃগু। ধন্বন্তরি। জাতুকর্ণ। ভেত। কাশ্যপ। কশ্যপ। অগস্তি। সনাতন। শনৎকুমার। স্বরেনাদি। আত্রেয়। প্রজাপতি। পরাশর। কপিল মহর্ষি। কনাদ। মহর্ষি অক্ষপাদ। ব্যাস। ভরদ্বাজ। বশিষ্ঠ। নারদ। অগ্নিবেশ। অরনেমি।

বৌদ্ধ আচার্য্যগণের তালিকা—

নাগার্জ্জুন। নাগাহবর। আর্য্যদেব। আর্য্যসঙ্গ। বসুবন্ধু। আর্য্যশূর। অশ্ব-ঘোষ। দিগ্নাগ। ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মকীর্ত্তি। স্থিরমতি। সঙ্ঘভদ্র। গুনপ্রভ। বসু-মিত্র।গুনমতি। শাক্যবুদ্ধি। দেবেন্দ্রবুদ্ধি জ্ঞানগর্ভ। শাও রক্ষিত। চন্দ্রগোমি। বুদ্ধপালিত। ভব্য। বররুচি। পাণিনি। পাতঞ্জলি। চন্দ্রকীর্ত্তি। বিনিতদেব। নন্দ। ধর্ম্মোত্তর। শাক্যমিত্র। জ্ঞানদত্ত। প্রভাকর সিদ্ধি। শীলভদ্র। দংষ্ট্রসেন। ধর্ম্মত্রীত। বিশেষ মিত্র। রবিগুপ্ত। বাগভট।

শ্রীশ্রীধর বড়ুয়া।

হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরকার কথা

পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রের ভিতরকার কথা ধারাবাহিক যুক্তি যোগে অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম—এখনকার কালের বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া দুয়ের মধ্যে যোগাযোগ কিরূপ আছে তাহার অনুসন্ধানে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বাহিরের প্রাকৃতিক সত্যের সহিত অন্তরের আধ্যাত্মিক সত্যের যে, একপ্রকার নিগূঢ় যোগ আছে--বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহা স্বীকার না করেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা তাহা স্বীকার করিয়াও—সেই নিগূঢ় যোগসূত্রটি যে, কিরূপ যোগসূত্র, তাহার কোনপ্রকার বিজ্ঞানসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া এক্ষণে তাঁহারা হাইল্ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন। এটা তাঁহারা বেশ বুঝেন যে, মনুষ্যের ভুক্ত অন্ন হইতে নানা প্রকার

সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থ রসরক্তবাহী নানাপ্রকার নাড়ীপথের মধ্য দিয়া বাহিয়া উঠিয়া মস্তিষ্কের অন্তরাকাশে বিলীন হয়। এটাও তাঁহারা বোঝেন বেশ যে, যত কিছু সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থ পৃথিবী হইতে উদ্গীরিত হয়—অনতিকাল পরে তাহা উপরিস্থিত আকাশে বিলীন হয়। কিন্তু তা ছাড়া—আমাদের শরীরের অন্তর্বাহিরের আকাশ ছাড়াইয়া উঠিয়া তাহা আরো কত যে সূক্ষ্ম পদার্থে চরমগতি প্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে তাঁহারা একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। তাঁহারা আকাশ এবং কালের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া একপদও তাহার ও পিঠে যাইতে সাহসী হ'ন না। এইজন্য, তাঁহাদের কথা ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিতে হইলে—আকাশ এবং কালের সহিত বাহ্য জগতের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার বিধিমতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের এটা একটা ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, বাহিরের বস্তুমাত্রই আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, অথচ সেই আকাশ-ব্যাপন কার্য্যটি যে ভৌতিক বস্তু কর্ত্তৃক কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে—সে বিষয়ে তাঁহারা পারৎপক্ষে উচ্চবাচ্য করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকটে আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, আমরা যেমন হস্ত দ্বারা গ্রাহ্য বস্তু সকল স্পর্শ করি—ভৌতিক বস্তু সকল কি সেইরূপ শূন্য আকাশকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে? শূন্যকে কি কেহ কখনও স্পর্শ করিতে পারে? কেহই তাহা পারে না বলা বাহুল্য। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোনো-দুই বস্তু যখন পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া রহে, তখন তাহারা কি একেবারেই পরস্পরের সহিত লিপ্ত হইয়া যায়, অথবা, উভয়ে খুব ঘনিষ্টভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করিলেও দুয়ের মধ্যে আকাশের ব্যবধান থাকে? দুয়ের মধ্যে যে, আকাশের ব্যবধান বিদ্যমান থাকে, একথা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন—তাঁহারা বলিতে বাধ্য হন যে, একটা লৌহপিণ্ডও আদ্যোপান্ত ফোঁপরা পদার্থ। এই বিষয়টি এক্ষণে একবার বিধিমত প্রকারে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

একটি মৃৎপিণ্ড আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে বলিলে বুঝায় এই যে, মৃৎপিণ্ডটি স্বীয় বিস্তৃতির পরিমাণানুযায়ী আকাশখণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, আর সেই সঙ্গে বুঝায় যে, মৃৎপিণ্ডটির অর্দ্ধাংশ আকাশ খণ্ডটির অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, মৃৎপিণ্ডটির চতুর্থাংশ আকাশ খণ্ডের চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, মৃৎপিণ্ডটির অষ্টমাংশ আকাশ খণ্ডটির অষ্টমাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, মৃৎপিণ্ডটির শতাংশ আকাশখণ্ডটির শতাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, মৃৎপিণ্ডটির কোটিতম অংশ আকাশখণ্ডের কোটিতম অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। এইরূপ ক্রমবিভাজনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা পাইতেছি এই যে মৃৎপিণ্ডটির পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্রতম অংশ আকাশখণ্ডটির পরাকাষ্ঠা সূক্ষ্মতম অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। এখন কথা হচ্চে এই যে, মৃৎপিণ্ডটিরই বা কি, আর, আকাশখণ্ডটিরই বা কি—দুয়ের কোনোটির পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্রতম অংশ বলিলে অগত্যা এইরূপ বুঝায় যে, সে অংশটি জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় শূন্যেরই আর এক নাম। তবেই হইতেছে যে ভৌতিক পিণ্ডও যেমন আর তাহার অধিকার্য্য আকাশখণ্ডও তেমনি, দুইই শূন্য নিচয়ের সমষ্টি। গণিতশাস্ত্রে যাঁহাদের

কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের ইহা বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না যে, ব্যষ্টি শূন্যও যেমন (০)—সমষ্টি শূন্যও তেমনি (০+০+০+০), দুয়ের মধ্যে এক চুলও প্রভেদ নাই। কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল। অসীম আকাশ একটিমাত্র শূন্য বিন্দুতে পর্য্যবসিত হইল, আর সেই সঙ্গে আকাশব্যাপী সমস্ত ভৌতিক জগত শূন্যে পরিসমাপ্ত হইল। এ যাহা আমি বলিলাম—পাঠকবর্গেরা মনে করিবেন সন্দেহ নাই যে, এটা একটা আমার দার্শনিক কূটতর্ক বই আর কিছুই না। তাঁহারা হয়তো বলিবেন—"ভৌতিক বস্তুর বিভাজ্যতার একটা সীমা আছে—সে সীমা অতিক্রম করিয়া শুদ্ধ কেবল কল্পনার জোরে সেই সকল স্থূল পদার্থকে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মে পর্য্যবসিত করিয়া, অবৈধরূপে তুমি যে তাহাদিগকে প্রলয় সাগরে বিসর্জ্জন করিতেছ, ইহা কাহারো নিকটে গোপন থাকিতে পারে না; ভৌতিক পরমাণুগণকে তাহাদের আধার বস্তু হইতে বিয়োজিত করিয়া তাহাদের কোনটিকে পৃথক্‌রূপে চক্ষের সম্মুখে আনিতে পারো কি? তাহা যখন পারো না তখন কেমন করিয়া জানিলে যে ভৌতিক বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় শূন্যেরই নামান্তর? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সকল ভৌতিক বস্তুই যখন স্ব স্ব আয়তনের পরিমাণানুযায়ী আকাশখণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, তখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভৌতিক পরমাণু তদনুযায়ী আকাশখণ্ড না ব্যাপিবে যে, কেন, তাহার কোনো কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই আমি বলিতেছি, (কল্পনার জোরেও বলিতেছি না—গায়ের জোরেও বলিতেছি না) যে, ভৌতিক বস্তুর মাত্রাতীত ক্ষুদ্র অংশ মাত্রাতীত ক্ষুদ্র আকাশখণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, কাজেই, দুইই জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় শূন্যেরই শামিল। মনে কর দাবানলের আক্রমণ বশতঃ একটা বনের বৃক্ষরাজি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর, সেই জ্বলন্ত অগ্নির কোপে পড়িয়া তাহার রাশিরাশি পরমাণু ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধ আকাশে ধূমাকারে পলায়ন করিতে লাগিল; ক্রমে সেই ধূমরাশি একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল; এবং তাহার পরে সেই অদৃশ্য পরমাণু সকল ঊর্দ্ধতম আকাশে উঠিয়া মেঘ দেহের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য পরমাণু সকল জলাকারে পুঞ্জীভূত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। সে-যে জল, স্বীয় বিস্তারের পরিমাণানুযায়ী আকাশ ব্যাপে, তাহা কেহ অস্বীকার করেনও না, করিতে পারেনও না। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তৎপূর্ব্বে সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম বাষ্পীয় পরমাণুগণ যদি বিন্দু-বিন্দু পরিমাণ আকাশ না ব্যাপিত, তবে তাহাদের সমষ্টিরূপিনী স্থূল জলধারা কি স্বীয় বিস্তৃতির পরিমাণানুযায়ী আকাশ ব্যাপিতে পারিত? এইরূপ, যুক্তি এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ দুয়ের সাহায্যে এটা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কোন একটি স্থূল বস্তুকে চরম সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত করিলে তাহা আকাশে মিশিয়া আকাশ হইয়া যায়। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাঁহাদের অসামান্য অধ্যবসায় এবং নৈপুণ্যের গুণে একটা সোণার পাত'কে এতাধিক পাৎলা করিয়া গড়িয়া প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, তাহাকে

একটা সাবানের মণ্ডলাকৃতি বুদ্‌বুদের পরিধি অপেক্ষা সহস্রগুণ বা ততোধিক বেশী পাৎলা বলিলে অত্যুক্তি হয় না; অতএব, একটা সোনার পাতকে মাত্রাতীত পাৎলা করিয়া গড়িয়া তুলিতে গেলে তাহা যে, আকাশে মিশিয়া আকাশ হইয়া যাইবে, ইহা ভাবিতে পারা কিছুই কঠিন নহে।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন—সুদূর ভবিষ্যৎ কালে সমস্ত জগৎ ঐরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অবস্থায় পর্য্যবসিত হইবে; আমাদের শাস্ত্রেও বলে—সুদূর ভবিষ্যৎ কালে সমস্ত জগৎ মহাপ্রলয়ে পর্য্যবসিত হইবে। প্রভেদ কেবল এই যে প্রলয়কালের সেই পরাকাষ্ঠা সূক্ষ্ম অব্যক্ত জগৎ ঘনীভূত হইয়া হইয়া পুনর্ব্বার কিরূপে যে তাহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্ব-সংসার উদ্ভূত হইবে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পান না; তাঁহারা বলেন যে, সেরূপ সূক্ষ্মতম অবস্থায় জগতের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতদূর শীতল হইতে পারে হইয়া—তাহার কোন স্থানেই উত্তাপের তারতম্য না-থাকা প্রযুক্ত তাহা একেবারেই নিশ্চেষ্ট এবং নিস্পন্দ হইয়া যাইবে; সুতরাং তাহা ঘনীভূত হইয়া আবার যে, কোনো প্রকার স্থূল পদার্থে পরিণত হইবে তাহার সুদূর সম্ভাবনাও লোপ পাইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে দেশীয় শাস্ত্রে বলে যে, প্রতিলোম ক্রমে বিশ্বসংসার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম এবং সূক্ষ্মতম হইতে অব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হইলেও অনুলোম ক্রমে পুনর্ব্বার সৃষ্টির আরম্ভ হইবে। কোন্ কথাটা যুক্তিসঙ্গত তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখা যাক্।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা একথা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, জগতের নানাপ্রকার স্থূল সূক্ষ্ম অবস্থার আষ্ঠে পৃষ্ঠে নানাপ্রকার শক্তির সূত্রজাল যেরূপ সঞ্চারিত রহিয়াছে তাহার একটি সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতম তন্তুও কোনকালে ছিন্ন হইতে পারে না। সূক্ষ্মতম পরমাণুগণের মধ্যেও আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুইই ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। শক্তির সহিত যোগ ছাড়িয়া স্থূলপিণ্ডও থাকিতে পারে না—সূক্ষ্মপরমাণুনিচয়ও থাকিতে পারে না। যদি ভৌতিক বস্তুসমূহ শুদ্ধ কেবল পরমাণুসমষ্টি হইত তা বই তাহাদের সঙ্গে শক্তির কোন সংস্রব না থাকিত, তাহা হইলে সূক্ষ্ম পরমাণুগণের স্থূলেপরিণত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকিত না—স্থূলপিণ্ড সকলের সূক্ষ্মেপরিণত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকিত না; কাজেই, স্থূলবস্তু অত্যন্ত সূক্ষ্মে পরিণত হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্তির কার্য্যকারিতা যেমন তেমনি অটুট থাকে। প্রকৃত বিজ্ঞানের কথা এই যে, কোনো একটা স্থূলপিণ্ড যখন, অগ্নিযোগে সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন সেই আগ্নেয় পিণ্ডের দাহিকা শক্তি উৎসারিত বাষ্পের গতি শক্তিতে পরিণত হয়, তা বই লোপ পায় না। transformation of forces বলিয়া বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে একটি মন্ত্র বচন আছে, তাহা যদি সত্য হয় তবে তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তিকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জগতের প্রলয় অবস্থায়—তাহার পরমাণুগণও যেমন

শাস্ত্রে তাই বলে যে, প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়। দেশীয় দার্শনিক ভাষায় শক্তিলীন অবস্থার নামই প্রলয়াবস্থা। অতঃপর দেখিতে হইবে এই যে, জড়পিণ্ড সকলের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র যেমন আকাশ,—শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র তেমনি কাল। কালেতেই শক্তি জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং কালেতেই তাহা অব্যক্ত মূল প্রকৃতির অন্তর্ভূত হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, একটা দোলক পিণ্ড (pendulum) বামপার্শ্ব হইতে ডাহিন পার্শ্বে এবং ডাহিন পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে পুনঃ ২ আবর্ত্তন করিতে থাকিলে—মধ্যপথ হইতে ডাইন্ দিক্ বাগে বা বাঁ দিক্ বাগে প্রধাবিত হইবার সময় তাহার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে ২ শেষে তাহার একতম গতিপথের চরম প্রান্তে যখন সে উপনীত হয়, তখন তাহার গতি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়া গতিশূন্য স্থিতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়; সেই মাত্রাতীত ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তব্যাপী গতিশূন্য তমসাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও শক্তির কার্য্যকারিতা যেমন তেমনি বর্ত্তমান থাকে,—বর্ত্তমান থাকিয়া দোলকপিণ্ডটাকে প্রথমে মাত্রাতীত মন্দবেগ হইতে ঈষৎ দ্রুতবেগে এবং শেষে দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সৃষ্টির পুনরাবর্ত্তন বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, দোলক পিণ্ডটা তাহার গতিপথের চরম প্রান্তস্থানে পৌঁছিবামাত্র যখন সে একেবারেই বেগশূন্য হইয়া গিয়া সেখান হইতে ক্রম বর্দ্ধমান বেগে পুনরাবর্ত্তন করিতে উদ্যত হয়, তখন পুনরাবর্ত্তনের প্রথম উদ্যমে কত বেগে সে যাত্রারম্ভ করে, তাহা তাহারা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? অবশ্য যাত্রারম্ভ করে সে—শূন্য বেগ অপেক্ষা যৎপরোনাস্তি অল্পদ্রুতবেগে, এক কথায়—শূন্য বেগের নিকটতম বেগে। তাঁহাদের মধ্যেকার কোনো একজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত যদি বলেন যে, তাহা যাত্রারম্ভ করে $\left(\frac{১}{১০}\right)^{২}$ক (কিনা কচ্ছপ) বেগে, অর্থাৎ কচ্ছপ গতিবেগের শতাংশের একাংশ-বেগে তবে আমি বলিব যে, তাহা হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৩}$ক-বেগ শূন্য বেগের নিকটতর। যদি বলেন—তাই সই, তাহা $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৩}$ক-বেগে যাত্রারম্ভ করে, তাহা হইলে বলিব যে, তাহাও হইতে পারে না এইজন্য যেহেতু $\left(\frac{১}{১০}\right)$ অপেক্ষা ও $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৪}$ক-বেগ শূন্যের নিকটতর। তেমনি, $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৪}$ অপেক্ষা $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৫}$ শূন্যের নিকটতর, $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৫}$ অপেক্ষা $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৬}$ শূন্যের নিকটতর, $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৬}$ অপেক্ষা $\left(\frac{১}{১০}\right)^{৭}$ শূন্যের নিকটতর, ইত্যাদি। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে শূন্য-বেগের নিকটতম বেগ বন্ধ্যা পুত্রের ন্যায় ন-ভূতো-ন-ভবিষ্যতি-গোচের অসম্ভব পদার্থ। তবেই হইতেছে যে, দোলক পিণ্ডটা তাহার গতিপথের চরম প্রান্তস্থান হইতে কেমন করিয়া ক্রম বর্দ্ধমান বেগে পুনরাবর্ত্তন করিবে তাহা কোনো বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরই সাধ্য নাই যে তাহার একটা যুক্তি মূলক সম্ভবপরতা তিনি আমাকে দেখাইতে পারেন তাহা যখন পারেন না তখন সে বিষয়ে অপর কেহ সংশয় প্রকাশ করিলে, তাহার সেই সংশয় বাণীটাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেন কোন্ লজ্জায়? ফল কথা এই যে, সৃষ্টির পুনরাবর্ত্তনের সম্ভবপরতা বুঝিতে পারা যে তাঁহাদের কর্ম্ম নহে, তাহা আমার

অনেক কালের জানা কথা। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে, আমাদের পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারদিগের কথা স্বতন্ত্র। নিমেষের পরে নিমেষের প্রত্যাবর্ত্তন, নিশ্বাসের পরে প্রশ্বাসের প্রত্যাবর্ত্তন, সুপ্তির পরে জাগরণের প্রত্যাবর্ত্তন, সমস্তই দোলক পিণ্ডের পুনরাবর্ত্তনের মতন সুসম্ভব তাহাতেই সন্দেহমাত্র নাই এইজন্য—যেহেতু অঘটন ঘটনাপটীয়সী ঐশীশক্তি যাহা তাহার মূল কারণ, তাহাকে কেহই রোধ করিতে পারে না। এই দোলকের দৃষ্টান্তের আলোকে আমাদের মনোমধ্যে এই কথাটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল দোলকপিণ্ড স্থিতি হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া প্রলয়ে উপনীত হইবামাত্র যখন শূন্যের সামিল হইয়া যায়, তখন সেই শূন্যের ভিতরেও ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা বন্ধ থাকে না; ঐশী শক্তি তাহাকে পুনর্ব্বার অল্পে ২ দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে সৃষ্টির দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করে।

বিজ্ঞানের প্রদীপ ধরিয়া আকাশ তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাইয়াছি এই যে, আকাশ এবং আকাশব্যাপী জড়পিণ্ড সকল বাহিরে যত বড় বৃহৎ ব্যাপারই হউক না কেন—ভিতরে তাহার আপাদমস্তক শূন্যেরই সামিল। অতঃপর কাল প্রকৃত পক্ষে কিরূপ পদার্থ তাহা বিধিমতে অনুসন্ধান করিয়া দেখা শ্রেয় বোধ করিতেছি; আগামী বারে সেই কার্য্যটিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবেক।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনের দাগ

(আন্তন শেকভ হইতে)

কলেজের অ্যাসেসর মিগুয়েভ সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়ে ফিরবার পথে তারের একটা খুঁটী ধরে ভাবতে লাগল আর একটা গভীর নিশ্বাস তার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। ঠিক এক সপ্তাহ হ'ল এমনি একদিন বেড়িয়ে ফিরবার পথে এই জায়গায় বাড়ীর আগেকার চাকরাণী অ্যাগনিয়া তাকে ধমক দিয়ে ব'লেছিল—"দাঁড়াও, তোমায় দেখাচ্ছি মজা, মেয়ে ভোলাবার ফল টের পাওয়াচ্ছি—ছেলেটাকে তোমার দোর গোড়ায় রেখে যাব—তোমার নামে নালিশ করব—সমস্ত তোমার স্ত্রীকে বলে দিব আর......"

তার দাবী তার নামে ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার রুবল জমা দিতে হবে। মিগুয়েভের চোখের সামনে সব কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল। দারুণ অনুশোচনায় নিজেকে সে তিরস্কার করতে লাগল তার একদিনের মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য যা তার জীবনে অনেক কষ্ট অনেক ভার বাড়িয়ে দিবে।

বাড়ী পৌঁছে সে সিঁড়ির উপর ব'সে জিরুতে লাগল। তখন ...

আর চাঁদের খানিকটা মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। রাস্তায় বা বাড়ীর পাশে কেউই ছিল না, বাইরের পথিক যারা, তারা এতক্ষণে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, গ্রামের ছেলে ছোকরারা বনে বনে মাঠে মাঠে ফুর্ত্তি ক'রে বেড়াচ্ছে। দেশলাই খুঁজতে দুই পকেটে হাত দিতেই নরম কিছু একটায় তার কনুই ঠেকল—ফিরে চাইতেই পাশে, সাপ দেখার মত চমকে ভয়ে সে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল। ধাপের উপর একটা বাণ্ডিল; হাত দিয়ে সে বুঝতে পারল যে লম্বা মত কি একটা লেপের টুকরোর মধ্যে জড়ানো আছে; স্পর্শে জিনিষটা নরম ঠেকল। ভয়ে সে আঁতকে উঠল—"নিশ্চয় তবে সেই ছেলে রেখে গেছে।" রেগে চাপা আওয়াজে সে ব'লে উঠল "এখানে...এ...আমারই পাপের ফল...হা ভগবান।" ভয়ে রাগে লজ্জায় সে অভিভূত হয়ে পড়ল। এখন উপায়? সত্য যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তার স্ত্রীই বা কি বলবে, অফিসের আর সহকর্ম্মীরাই বা কি মনে করবে—কর্ত্তা হয় ত তার পিঠ চাপড়ে বলবেন "বাঃ ভাই খুব বাহাদুর—দাড়ীতে যদিও রং ধরেছে কিন্তু দিলটা তোমার তেমনই রঙ্গীন আছে দেখছি·· ···বদমাইস পাজী কোথাকার।"

ছেলে বুড়ো সকলেই তার গোপন কথাটা জেনে ফেলবে। কোন ভদ্রলোক তাকে বাড়ী ঢুকতে দিবে না—আর এ কথা খবরের কাগজে ছাপা হবে—দেশশুদ্ধ তাকে চিনে ফেলবে। বাড়ীর মাঝেকার জানলা খোলা ছিল। ভিতরে গিন্নী অ্যানা টেবিলের উপর খাবার সাজাচ্ছিল। বাগানের পাশে চাকরটা বাজনা বাজিয়ে একটা করুণ সুরের লহর তুলছিল। কেবল ছেলেটা একবার চেঁচিয়ে কাঁদলেই বাস্ সব কীর্ত্তি তার বেরিয়ে পড়বে। কিছু একটা করবার জন্য মিগুয়েভ ক্ষেপে উঠল।

"শীগ্‌গির, খুব শীগগির ছেলেটাকে আর কারো বাড়ীর কাছে রেখে আসি।" আস্তে আস্তে বাণ্ডিলটা এক হাতে তুলে নিয়ে, পাছে কেউ কোন রকম সন্দেহ করে এই ভয়ে ভাল মানুষটীর মত জোর জোর পা ফেলে সে পথে নেমে পড়ল।

সে ভাবতে লাগল—"ছ্যাঃ কি বিশ্রী হাঙ্গামাতেই পড়লাম। কলেজের অ্যাসেসর কিনা একটা ছেলে কোলে রাস্তায় এমনিভাবে হেঁটে যাচ্ছে। বাপরে! যদি কেউ দেখে ফেলে আসল ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করে নেয়—তবেই আমি গিয়েছি......এই এখানে এই সিঁড়ির কাছে রেখে দিই......নাঃ দরজাটা খোলা আছে—হয় ত কেউ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রয়েছে। তবে?......না ঠিক হয়েছে···ব্যবসায়ী মিয়েল-কিসের কাছেই একে নিয়ে যাই......ব্যবসাদার লোকেদের পয়সা আছে আর অন্তরটাও তাদের কোমল হয়···সম্ভবতঃ তারা আমাকে ধন্যবাদ দিবে আর ছেলেটাকে নিজের ছেলের মতই মানুষ করবে। মিগুয়েভ ঠিক করলে যে ছেলেটাকে সে মিয়েলকীন্সের কাছেই নিয়ে যাবে যদিও তার বাড়ীটা অনেক দূরে—রাস্তার শেষে নদীর ধারে।

"এখন এ আবার না চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে।—তা এ এক মন্দ ব্যাপার নয়। দিব্যি

এর আত্মা আছে, বোধশক্তি আছে। বরাতে থাকলে মিয়েলকিন্স একে পোষ্যপুত্র নেবে, আর কালে এ দশজনের একজন হবে—মস্ত প্রফেসর, খুব বড় সেনাপতি নয় ত একজন খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক......সবই সম্ভব। আমি একে এখন আবর্জ্জনা মনে করছি কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ বছর পরে আমার হয় ত সাহস হবে না এর সঙ্গে বসতে......"

ছোট নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে বেড়ার ধারে ধারে সারি সারি লাইম গাছের ছায়া দিয়ে যেতে যেতে মিশুয়েভের মনে হ'ল—"কাজটি কিন্তু বড় নিষ্ঠুর হচ্ছে···এও আর একটা অপরাধ...... বাস্তবিকই বড় অন্যায় হচ্ছে এটা আমার, কেন একে নিয়ে আমি অপরের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি? এর জন্ম হয়েছে বলেই কি এ দোষী? শিশুত আমাদের কোন ক্ষতি করে নি। হায় হায় আমরা নিজেরা সুখের সাগরে ডুব দিই আর শাস্তি দিবার বেলায় দিই এই নির্দ্দোষ শিশুদের। ভাবতে কষ্ট হয় যে আমার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে এই বেচারা···...... ···মিয়েলকিন্সও ত একে কোন হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিতে পারে সেখানে সে নিজের কাউকে পাবে না বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে তার দিনগুলো কেটে যাবে। কেউ তাকে আদর করবে না তাকে ভালবাসার কেউ থাকবে না তার পর বড় হলে হয় ত কোন জুতোর দোকানে কাজ শিখবে·····তার পর মদ খেতে শিখবে, ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে ছোটলোক হয়ে যাবে, অথচ তার বাপ আমি ভদ্রলোকের ছেলে···যাই হোক না কেন সে ত আমারই সন্তান।...'

আঁধার থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদের আলোয় ছেলেটার মুখের ঢাকা খুলে দিয়ে তার মুখের দিকে চোখ রেখে মিশুয়েভ বলতে লাগল—"ঘুমুচ্চে···হায়রে অভাগা...বাঃ নাকটা যে তুই অবিকল বাপের মত পেয়েছিস···ঘুমুচ্ছে, না জেনে যে সে তার বাপের কোলেই রয়েচে আর তার বাপ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে·······...সংসারের এই নিয়ম রে, আচ্ছা আমাকে মাপ করতে পারবি? করিস্ আমাকে মাপ করিস্—কি করব বল তোর ভাগ্যই যে এই রকম.........

দুই চোখ দিয়ে তার ধারা বয়ে গেল—ভাল করে ছেলেটীকে কাপড় মুড়ি দিয়ে চলতে লাগল মনের মধ্যে নানা রকম সামাজিক তর্ক বিতর্ক তুলে।

কাজটা আমার ভাল হত যদি ছেলেটাকে আমি অ্যানার কাছে নিয়ে যেতে পারতাম আর তার সামনে জানু পেতে বলতাম—"পাপী আমি, আমায় ক্ষমা কর, যা শাস্তি হয় আমায় দাও—কিন্তু এই নিরীহ ছেলেটার যেন কোন অনিষ্ট না হয়.....···আর তোমারও ত ছেলে নেই —তুমি কেন একে আপনার ছেলে করে নেও না।' অ্যানার মন ত ছোট নয়, সে হয় ত' রাজী হত আর ছেলেটাও আমার কাছে থাকতে পেত...

মিয়েলকিন্সের বাড়ী পৌঁছেও সে দ্বিধা করতে লাগল। সংসারের একখানা ছবি তার মনের সামনে ভেসে উঠল—নিজেও সে টেবিলে বসে কাজ করছে আর তার ঝুলে পড়া জামা ধরে—একটা ছেলে খেলা করছে.........আবার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল সহকর্ম্মীদের মুখভঙ্গী আর কর্ত্তার·····। বিবেকের দংশন ছাড়া তার মনের মধ্যে একটা

দুঃখের, একটা স্নেহের দাগ বসে ছিল। খুব সতর্কতার সঙ্গে ছেলেটাকে সে বারান্দার উপর শুইয়ে দিতেই টস্ টস্ ক'রে দুফোঁটা জল তার চোখের কোণ থেকে ঝ'রে পড়ল—"ক্ষমা করিস্ বাপ আমি যে পাপী।"

এক পা সে পিছিয়ে এল, তার পর আবার এগিয়ে গিয়ে "চুলোয় যাক সব—যা হয় হোক আমি একে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, লোকে যা পারে বলুক বলে মিগুয়েভ ছেলেটীকে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

"যা পারে বলুক তারা আমি অ্যানার কাছেই যাব; অ্যানা বুদ্ধিমতী সব কথা সে বুঝতে পারবে...—আমরা একে মানুষ করব.. এ বোধ হয় খোকা, এর নাম রাখব ভ্লাডমীর......আর মেয়ে যদি হয় ত এর নাম হবে অ্যানা; বুড়ো বয়সে এ হবে আমাদের সান্ত্বনা, আমাদের অবলম্বন।"

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। ভয়ে আর লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে আশা নিরাশায় দোল খেতে খেতে সে নিজের বাড়ীতে ফিরে এল। ছেলেটীকে মেঝেতে রেখে জানু পেতে সে কান্নার সুরে বল্লে "শাস্তি দেবার আগে আমার সব কথা শোন অ্যানা...পাপী আমি এ আমারই সন্তান...অ্যাগনিয়াকে বোধ হয় মনে আছে তোমার...সয়তান আমার ঘাড়ে চেপেছিল......

উত্তর না শুনেই ভয়ে লজ্জায় সে ছুটে বাইরে এল অ্যানাকে সামলে নেবার সময় দিবার জন্য। অ্যানা ডাকলেই সে আবার ভিতরে যাবে।

বাড়ীর চাকর জায়মোলে, হাতে তার যন্ত্রটা নিয়ে তার পাশ দিয়ে চ'লে গেল আবার এক মিনিট পরে ফিরে এসে আবার পাশ কাটিয়ে চলে গেল বলতে বলতে "ব্যাপার মন্দ নয় ধোপানী অ্যাক্সিনিয়া এই মাত্র তার ছেলেটীকে এখানে রেখে বাড়ীর ভিতর গিয়েছিল কিন্তু ছেলেটাকে এখান থেকে আবার কে নিয়ে গেল!—

"কি কি কি বল্লি" মিগুয়েভ পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল।

* * * *

অ্যানা ঠিক তেমনি ভাবে বসেছিল, মুখখানা তার রাগে ক্ষোভে লাল হয়ে গিয়েছিল, চোখের জলের ধারা গালের উপর শুকিয়ে গিয়েছিল, এক দৃষ্টে সে ছেলেটার দিকে চেয়েছিল...

পাণ্ডাশমুখে জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে মিগুয়েভ বল্লে "আমি ঠাট্টা করছিলাম অ্যানা···বাস্তবিক এ আমার ছেলে নয়...এ ধোপানীর ছেলে···আমি ঠাট্টা করছিলাম··· কেবল নিছক তামাসা···যাও লক্ষী চাকরটাকে ছেলে দিয়ে এস।

শ্রীইন্দুভূষণ বসু।

মা

কাশীর চৌষট্টি ঘাটের উঁচু সিড়ি ভেঙ্গে একজন কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধা একটা জলভরা মেটে কলসী কাঁখে ক'রে, হাতের লাঠীতে ভর দিতে দিতে অতি কষ্টে উঠছিল, আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কর্‌ছিল।

হরিদাস সবে সেদিন বাঙ্গলা দেশ থেকে কাশীতে এসেছে। স্নান করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠ্‌ছিল ;—অনভ্যস্ততা বশতঃ মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে 'উঃ' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাজা, পা টিপ্‌ছিল। বুড়ীর প্রতি তাকিয়ে সে আশ্চর্য্য হ'লো! এই থুল্‌থুলে বুড়ী এই জলের কলসী নিয়ে রোজ কি ক'রে এই সিঁড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি করে! সে বুড়ীর প্রতি করুণা মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বুড়ীও এক নজরে তার আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে নিজের পথে চলে গেল।

তার পরদিন দুপুর বেলায় আবার তাদের সিঁড়ি উঠ্‌তে উঠ্‌তে দু'জনে দেখা! আজ বুড়ী বড়ই হাঁপাচ্ছিল। হরিদাস বল্‌লে—মা, আপনার কলসীটী আমায় দিন্, আমি সিঁড়ি পার ক'রে দেই, উপরে যেয়ে নেবেন। বামুনের ছেলে?' 'না মা, কায়েত।' একটু ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বুড়ী বল্‌লে—'না, আমি কায়েতের ছোঁয়া জল খাই না।

তার পর প্রায় প্রত্যহই তাদের দেখা হ'তো—সেই সিঁড়ির পরে!

হরিদাসের মনে হ'তো, তার মা বেঁচে থাক্‌লে এতদিনে এই রকম থুল্‌থুলে বুড়ী হ'তো। তার হৃদয় কাঁপিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে পড়তো চারিদিকের বায়ুরাশিকে চঞ্চল ক'রে। সংসারে তার আপনার বল্‌তে আর কেহ নাই; তাই জন্মের মত দেশত্যাগ ক'রে কাশীবাস কর্‌তে এসেছে!

হরিদাস বুড়ীর পানে চেয়ে থাক্‌তো গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে! তার প্রাণ আকুল হ'য়ে ব'লে উঠ্‌তো—'মা, তোর ঐ জলভরা মাটীর কলসীখানা আমায় দে, আমি সিঁড়ি পার করে দি'!

বুড়ী ব'য়ে ব'য়ে ক্লান্ত হ'য়ে ভাবতো—এই মাটীর কলসীর ভার তো আর বইতে পারি না! আমার এই পুরাণো মাটীর কলসীটা খালি ক'রে কবে মণিকর্ণিকায় রাথ্‌বো, আর কবে আমার এই সিঁড়ি ভেঙ্গে আনা গোনা শেষ হয়ে যাবে!

বুড়ীরও আপনার বল্‌তে ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। অনেক শোক দুঃখে তার অন্তর বাজপড়া গাছের মত শুষ্ক হ'য়ে গিয়েছিল।

বুড়ী ভাবতো—ঐ কায়েতের ছেলেটী

ছেলেটী বড় ভাল মানুষ! এতদিন ধ'রে এই পথে এই কলসী নিয়ে যাওয়া আসা করি, কেউতো অমন ক'রে আমার দুঃখে কাতর হয় না! আমার মণি বেঁচে থাক্‌লে এতদিনে এত বড় জোয়ান ছেলে হ'তো! বুড়ী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে কাপড় দিয়ে নয়ন কোণ মুছতো!

একদিন সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে উঠতে বুড়ী বড়ই বেশী কাতরভাবে হাঁপাচ্ছিল। হরিদাস বললে—'মা, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে আজ! কি কর্‌বো,—আমরা কায়েত! সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো। বুড়ীর প্রাণটা কেমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো,—তারও অন্তর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বে'র হয়ে এলো।

বুড়ী খানিকক্ষণ হরিদাসের পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার বহুকালের শুষ্ক মাতৃস্নেহের ধারায় আবার বান ডেকে উঠলো! বুড়ী বললে—নে বাবা, কলসীটা সিঁড়ি পার ক'রে দে!' হরিদাস একটু ইতস্ততঃ কচ্ছিল, বুড়ী বললে—নে, দোষ নাই, তুই আমার ছেলে! সে কলসীটা সিঁড়ির উপরে উঠিয়ে দিলে। বুড়া সেটা নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চ'লে গেল! হরিদাসের সমস্ত বুকখানার ভিতর কে যেন 'মা মা' ব'লে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠলো!

তারপর দু'তিন দিন আর বুড়ীর দেখা নাই। হরিদাস ভাবলে—মার কি হ'লো? কোন অজানা আশঙ্কায় তার বুকখানা কেঁপে উঠলো। আমার যা কপাল, তাতে আর ভরসা কি? আপনার বলতে যে যেখানে ছিল, সবাই তো চ'লে গেল!—ভাবতে ভাবতে তার চোখ দুটো সজল হ'য়ে উঠলো।

অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে সে বুড়ীর বাসা বে'র করলে। বুড়ীর খুব জ্বর হয়েছে,—দেখবার কেহ নাই, বিছানায় পড়ে সে ছট্‌ফট্ কচ্ছে। হরিদাস ডাক্‌লে—'মা!' বুড়ী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—'এসেছিস্ বাবা! কতবার ভেবেছি, তুই যদি আস্‌তিস্!'

হরিদাস সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বুড়ীর সেবা শুশ্রূষা কর্‌তে লাগলো। বুড়ী জ্বরের ঘোরে কখনো কখনো তাকে নিজের ছেলে ব'লে মনে কর্‌তো; হরিদাসও বুড়ীকে কখনো কখনো আপনার মা ব'লে ভুল কর্‌তো;—কারণ তার কোথায়ও কোন বন্ধন ছিল না,—এইখানেই তার সারা অন্তরটী বাঁধা পড়েছিল।

হরিদাস বুড়ীর মাথা টিপছিল,—বুড়ীর একটু তন্দ্রা বোধ হচ্ছিল। বুড়ী বল্‌লে—'বড় পুণ্যে তোর মত ছেলে পেটে ধরেছিলাম! হরিও সব কথা ভুলে মনে কচ্ছিল, বুড়ী তার নিজেরই, মা! হরিদাস বললে 'মা, তোমার জন্যে একটু সাবু তৈরী করি।' উঠে গিয়ে সে সাবু তৈরী ক'র্‌লে। একটু কাগজী লেবুর রস এতে হ'লে ভাল হ'তো ভেবে রাস্তায় বে'র হ'লো। বাস্তব জগতে এসে তার মনে পড়লো, সে একি কর্‌লে! সে যে কায়স্থ! নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী কেন তার তৈরী সাবু খাবেন! ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে ভাবতে লাগলো।

'সাবু হয়েছে দে!' হরিদাস বললে 'মা, ও কথা আমি একেবারে ভুলে গেছলাম,...

কেমন ক'রে এ পাপ ক'রে, তোমাকে ও আমাকে দু'জনাকেই ডুবাতে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবছি।

বুড়ী একটু ভেবে বললে দে, তুই দে! আতুরে নিয়ম নাস্তি! মনে মনে বললে 'তুই যে আমার ছেলে! আত্মায় আত্মায় যেখানে মানুষের পরিচয়, সেখানে আবার জাতের বিচার কি?

বুড়ী সেরে উঠলো। তার পর দিনের পরদিন তাদের অন্তরাত্মা আরো কাছাকাছি হ'তে লাগলো। হরিদাসের কি খেতে ভাল লাগে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুড়ী তা জিজ্ঞাসা করতো, আর সেই সব জিনিষ তৈরী করে নিজে সামনে বসে খাওয়াতো। হরিদাস ও বুড়ীর হাত ধরে ধরে যেখানে ভাল কীর্ত্তন হ'তো, কথকতা হ'তো, সেখানে নিয়ে যেতো; যেখানে যেদিন ভাল মেঠাইটী তৈরী হতো, সেখান থেকে সেটী কিনে এনে বুড়ীকে খাওয়াতো।

এই কায়েতের ছেলেটীকে নিয়ে বুড়ীর সেই পূর্ব্বের কঠোর আচারের শৈথিল্য সম্বন্ধে কেহ কেহ আলোচনা কর্‌তো। বুড়ীর তা ভাল লাগতো না। এক দিন বুড়ী বললে 'বাবা, চল আমরা বৃন্দাবনে যাই!

হরিদাস বুড়ীকে নিয়ে বৃন্দাবনে এলো। এখানকার সকলেই মনে কর্‌তো, হরিদাস বুড়ীর নিজের ছেলে!

কয়েক বৎসর কেটে গেল। বুড়ী বড় বেশী বুড়ী হ'য়ে পড়লো; তবু কিন্তু বুড়ী নিজেই রাঁধতো; আর হরিদাস সেখানে ব'সে তরকারী কুট্‌তে কুটতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতো। একজন প্রতিবেশী একদিন বললে ছেলে রাঁধে না কেন? বুড়ো মাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোইতো ছেলের কর্ত্তব্য! বুড়ী বললে ছেলে মানুষ, পার্‌বে কেন? হরিদাসের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি!

তার পরদিন বুড়ী হরিদাসের হাতে রান্নাঘরের সব ভার দিয়ে, হরিনামের মালা নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বস্‌লে! এম্‌নি ক'রে দিনের পর দিন তারা ক্রমে ক্রমে একেবারে ভুলে গেল যে, তারা আপন মা ছেলে নয়।

মানুষ গণনার বৎসর এলো। একজন লোক এসে তাদের নাম লিখে নিল। বুড়ী নাম বল্‌লে রক্ষামণি দেবী। হরিদাস বহুদিনের অভ্যাস বশতঃ নাম বললে হরিদাস দত্ত। পরিচিত বাঙ্গালী লোকটী তাদের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো। সে চাহনির অর্থ তারা কিছুই বুঝলো না। লোকটী বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে 'হরিদাস তোমার নিজের ছেলে নয়?' তখন তাদের হুঁস হ'লো! বাহ্যিক সকল খোসা ফেলে দিয়ে তারা যে সত্য সম্বন্ধে নিকটতম হয়েছে, তার উপর বুঝি সংসারের মিথ্যা আবরণ পড়ে, পাছে সংসার প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার ক'রে বসে, সেই ভয়ে তারা ভীত হলো।

বুড়ী বল্‌লে 'আমার নিজের ছেলে।' লোকটী ধীরে বল্‌লে ও, বুঝেছি, ব্রাহ্মণের

মেয়ে কায়স্থের—হরিদাস ক্রুদ্ধ হ'য়ে কি বল্‌তে যাচ্ছিল, বুড়ী বাধা দিল। লোকটী যেতে যেতে ভাবলে বৃন্দাবনে এমন ঢের আছে!

হরিদাস বল্‌লে 'মা, মিথ্যা কথাটার প্রতিবাদ করতে দিলে না?' মা বললে কত জনের সম্বন্ধে কত মিথ্যা ধারণা নিয়ে সংসারে কত লোক আছে, তাতে তাদের কি আসে যায়! তুই যে আমার ছেলে এইটী জগতে প্রকৃত সত্য। এইটে আমি অন্তরে বাইরে দেখতে চাই! লোকের চোখের সামনে এ সত্য আমারই অন্তরের মত ক'রে ভেসে উঠুক, তাই আমি চাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

স্বরাজ ও নারী

স্বরাজ লাভই আমাদের কাম্য এবং আমাদের স্বরাজ যে গণতন্ত্রমূলক হওয়া উচিত তাহাও একপ্রকার অবিসংবাদিত। গণতন্ত্র জনমণ্ডলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ন্যায় বহু প্রদেশবিশিষ্ট বিস্তৃত দেশে স্বরাজ-শাসন তন্ত্র যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক সংখ্যার হার অনুসারে সেই সেই প্রদেশের লোক সমষ্টির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে -তাহাও ঠিক! কিন্তু জনগণের প্রভাব দ্বারা গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইবে, এই উপলক্ষ্য করিয়া প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রদায় বৈঠকী শাসন চলিবে—ইহা কখনই প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। জাতি, ধর্ম্ম, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিচারে যাহাকে জনগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, যাহার উপর তাহাদের বিশ্বাস আছে, এবং যাহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে তাহারা সন্দিহান নহে, শাসন কার্য্যে তাহারা সেইরূপ প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে,—ইহাই আকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়া উচিত।

যে জনসমষ্টির উপর আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এখন সেই জনসমষ্টিকে লক্ষ্য করা যাক্। তাহাকে মোটামোটি দুই সমানভাগে ভাগ করা যায়—স্ত্রী ও পুরুষ। আমাদের গণতন্ত্র জনমণ্ডলীর উপর নির্ভর করিলেও তাহা যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উপরই সমানভাবে নির্ভর করিতেছে, সে সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি পাওয়া কঠিন। স্বরাজ যদি পুরুষের ন্যায় নারীর ও স্বরাজ হয় তবে পুরুষ ও নারী স্বরাজ শাসন তন্ত্রে কেন সমান দাবী করিতে ও অধিকার পাইতে পারিবে না, স্বাধীনতার দিক হইতে তাহার কোন জবাব আসিতে পারে না। অবশ্য স্বরাজতন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগেই যে নারী পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া নারীর বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিবে এখানে সে কথা উঠিতে পারে না। নারী ও পুরুষের কার্য্যক্ষেত্রে যতটুকু বিভিন্নতা থাকা প্রয়োজন, নারীর নারীত্ব ও পুরুষের পুরুষত্বের উপর যতটুকু প্রকৃতির হাত আছে, তাহা হইতেই উভয়ে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্র ঠিক চিনিয়া লইতে পারিবে। তাহা ছাড়া নারীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে নারী ত আর দেশের

বাহির হইতে হঠাৎ আমদানী হইতে থাকিবে না যে শুভ উপদেশ ও নির্দ্দেশ নারীর মঙ্গলে নিয়োজিত হইতে পারিবে না। কিন্তু তাহার স্বাধীনতা পঙ্গু করিয়া তাহাকে সমাজের হিতের নামে বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিবার সপক্ষে যে যুক্তি তাহা মানবের উন্নত পরিণতির ও মনুষ্যত্ব বিকাশের কিরূপ পরিপন্থী, সে কথাটি অনেক সময়েই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখি না। সমাজের মঙ্গলের জন্যই যদি ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে হয়, তবুও স্বাধীনতা সম্পর্কে সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধটা যথাযথরূপে নিরূপিত হয় নাই। স্বাধীনতার অনেক বড় বড় কথাই বলিতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমাদের কথায় ও কার্য্যে মোটেই সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না।

অনেক বিষয়েই আমরা আমাদের জন্মাধিকার বা birthrightএর ঘোষণা করি। স্বদেশ-শাসনের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভেই যে মানবের জন্মাধিকারের নির্ব্বাণ লাভ ঘটে তাহা নহে, পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিবার যে অধিকার তাহাই বোধ হয় মানবের সব চেয়ে বড় অধিকার! মানবের জন্মাধিকার কথাটি কি কেবল পুরুষের অধিকারই নির্দ্দেশ করে? সহজ ভাবে মানুষ মাত্রেরই যে এই অধিকার আছে তাহা স্বীকৃত হইলে (মনে হয় তাহা স্বীকার না করিয়া আর উপায় নাই) এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকও যে মানুষ এই বিচারটা খুলাখুলি ভাবে গ্রহণ করিয়া লইলে "নারী-সমস্যা" অনেকটা সহজেই সমাধিত হইয়া যাইতে পারিত, এবং নর ও নারী সমস্যার বিরোধকারী ভূত দুইটাকে একই গাছে বাসা দিয়া ওঝার আশ্রয়ে বাড়ীটাকে শুদ্ধ ও সুখপ্রদ করা যাইত। কিন্তু নারীকে মানবজাতিভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যত সহজই মনে হউক, প্রত্যেকে জানেন, তাহাকে মানবের অধিকার দান করিবার দাবী কতই অদ্ভুত! বিষয়টা আরও কিম্ভুত বলিয়া মনে হয় যখন আমরা দেখি যে সম্প্রদায় বিশেষ দেশে গণতন্ত্র তথা স্বরাজতন্ত্রের মূলে অন্ধভাবে কুঠারাঘাত করিয়া ও জন সংখ্যার দাবীতে তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করিতে লোলুপ, অথচ যদি বলা যায়, তোমাদের সম্প্রদায় যে জন সংখ্যার উপর দাবী করিতেছে তাহার অর্দ্ধেকই নারী, সেই অবরুদ্ধ, অশিক্ষিত, অবনত নারীজাতির জন্য তোমরা কি করিতেছ বা করিবে? এখানে কিন্তু পুরুষ সম্প্রদায় সামান্য সংখ্যক নারী সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী অভিভাবকত্বের দাবী ছাড়িতে রাজি নহেন।

সুতরাং আমাদের গোড়াতেই গলদ! মানবের অধিকার আমরা কার্য্যতঃ মানিতে পারিতেছি না। কেননা ইহা মানিলে আমাদের পুরুষদের বহুকালের একটা অধিকার— যাহা আমাদের অস্থিমজ্জার সহিত একরূপ জড়িত, যাহা আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রয়োজনীয় এবং যাহার উপরই মুখ্যতঃ আপামর আমাদের পুরুষত্বের অহঙ্কার, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি নিয়ত প্রতিপন্ন হইয়া আমাদের মেজাজটা "পুরুষোচিতভাবে" সঞ্জীবিত রাখিতেছে— আমাদের সেই দাবী, যাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও ব্যক্তিগতভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষার

সামগ্রী তাহা ছাড়িতে হয়। গোড়াতে আমাদের এই গলদ, তাই বাহিরে আমাদের কথার নাগপাশ সহজ সত্যের মুখ বন্ধনে সচেষ্ট।

স্বরাজলাভে প্রত্যেক ব্যক্তির—স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা স্পষ্টভাবে স্বীকার না করিয়া স্বরাজ গড়িতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র হইবে সন্দেহ নাই। আর স্বরাজের দিক হইতেও এরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। মোটা মোটি ভাবে বলা যায়, ব্যক্তির হৃদয় স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী না হইলে জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উচ্চ তোরণ চোরা বালির উপর ভিত্তি রাখিয়া দীর্ঘকাল মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। আর যেস্থানে নারীদের পুরুষের অধীন রাখিয়া স্বাধীনতা লাভ ঘটিবে, তাহা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ নামের যোগ্য হইবে না। এমন কি সে স্বাধীনতাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিকও বলা চলিবে না। স্বরাজের অর্থ যদি Political Independence বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা মাত্র হয়, তবে নারীদিগকে শিক্ষা স্বাধীনতার বর্ত্তমান ধাপে রাখিয়া, অথবা ধীর উন্নতির আশা দিয়া, পুরুষের পক্ষে রাজ্য জয়ের আশা অসম্ভব না হইতে পারে (যদিও বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য), কিন্তু স্বরাজ আমাদের চক্ষে স্বাধীনতার যে মূর্ত্তি ধরিয়াছে, তাহা হইতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করাটা, এ পর্য্যন্ত কেবল চালিত হইবার জন্যই যাহারা পৃথিবীতে তাহাদের স্থগিত জীবন বহন করিয়া আসিতেছিল, তাহারাও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছে না। সুতরাং এই আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সকলের জন্যই যাহাতে স্বরাজ পথের প্রত্যেক উন্নতির ধাপ রচিত হয়, তাহা নেতৃস্থানীয়গণের মনে রাখা দরকার।

ধর্ম্মের (Religion) স্থান যতই উচ্চ হউক, সাম্য মৈত্রী স্থাপনে প্রাক্‌যুগে ধর্ম্ম কর্ম্মক্ষেত্রের যত বড় অংশেই প্রসারিত হইয়া থাক, ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক স্বরাজলাভে ধর্ম্মের গণ্ডী কখন সেই গণ্ডীভুক্ত লোকের স্বাধীনতা বিষয়ে প্রতিনিধির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। স্বাধীনতা মন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত তাহারাই কেবল স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষীর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য। যদি কেহ কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষে সে দাবী করেন, তবে তাহাকে অন্ততঃ দেখাইতে হইবে যে অন্য যে কোন স্বাধীনতা প্রয়াসীর চেয়ে সেই সম্প্রদায়ে স্বাধীনতার নিশান উড়াইতে তিনি অধিক সচেষ্ট, ন্যূনকল্পে সমান ক্ষমতাবান্। মোট কথা মুক্তির জন্য প্রাণে উদ্দীপনা অনুভব না করিয়া কেবল ধর্ম্মের চাপরাশ দেখাইয়া নিজ সম্প্রদায় ভুক্ত নরনারীর মুখপাত্রত্বের দাবী কখনই টিকিতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি ভারতের রাজনীতি বক্রগতি ধরিয়া এই দিকেই চলিয়াছে। তাহাতে দেশে ধর্ম্মান্ধতা বাড়িবারই আশঙ্কা অন্ততঃ কপট হইলেই ধর্ম্মান্ধতা যে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিবে তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ এই ধর্ম্মান্ধতা সঞ্জীবিত রাখিতে পারিলে মোড়লদের হাতে কতকগুলি রাজনৈতিক সুবিধা সহজলভ্য হইয়া থাকিবে; সুতরাং স্বার্থলোলুপদের ইহাই প্রধান কাজ হইবে। বিশেষতঃ যে সম্প্রদায়

যত অবনত, সেই সম্প্রদায়েই এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রাধান্য ধর্ম্মান্ধতায় ইন্ধন যোগাইতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইবার কথা। স্বার্থসিদ্ধির জন্য মুখে তাহাদের স্বাধীনতার নাম থাকিলেও তাহাদের অন্তরে জনগণের অভ্যুত্থান নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক হইবে না।

এই অবস্থাটা আমাদের আকাঙ্খিত গণতন্ত্রের কিরূপ অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত ও পরিপন্থী অথবা এ ভাবে স্বরাজ্যলাভ দ্বারা পুরুষের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা কতদূর বিড়ম্বিত হইবে, সেই বিবেচনা এখানে করিতেছি না। ইহার দ্বারা কোন কোন সম্প্রদায়ের নারীর পক্ষে রাষ্ট্র সম্পর্কে দূরে থাক সামান্য সামাজিক নিষ্পেষণ হইতেও অব্যাহতি লাভ কঠিনতর যদি না হয়, সহজ লভ্য যে কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে সন্দেহ আসিতে পারে না। এ অবস্থায় অনেক কিছুই হয়ত সাম্প্রদায়িক ব্যাপার বলিয়া অন্য সমাজ সংস্থষ্ট লোকের পক্ষে অস্পৃশ্য বলিয়া চলিতে থাকিবে। মুক্তির চেষ্টাতেই যে দশা, স্বাধীনতার উষালোক দর্শনে "হারাই, হারাই" ভাবটা কতকাল যে সম্প্রদায় সকলের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একীকরণের স্পর্দ্ধা নিয়া অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে, তাহার পরিমাণ কে করিতে পারে? তবে এ কথা ভাবা মোটেই অসমীচীন হইবে না, যে সম্প্রদায় নেতা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দূতের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে। নারীর দুর্দ্দশায় সনাতন চালক এবারেও চালক থাকিয়া গেলে দূরাগত স্বাধীনতার সঙ্কেত কার্য্যকরী হইবে কি?

দেশের উন্নতিশীল উদার সম্প্রদায়ের নারীগণ হয়ত স্বরাজ্য প্রয়াসীদের এই মিটমাটে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে হয়ত ইতি মধ্যেই জাগরণের সাড়া পড়িয়া থাকিবে, স্বরাজ সম্পর্কে তাহাদের সম্প্রদায়ের নারীর কার্য্য দেখিয়া হয় তো তাঁহাদের মনের দৃষ্টি বিস্তার লাভ করিয়া থাকিবে, বিশেষতঃ সেই উন্নত সম্প্রদায়ের পুরুষেরাও হয়ত নারীর উন্নতির পথ আগলাইয়া দাঁড়াইতে আর বেশী উৎসাহ দেখাইবেন না। কিন্তু অবনত সম্প্রদায়ের, যেখানে নারীর উপর পুরুষের অধিকার, পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্যের গতির ন্যায় সুদূর অতীত হইতে চিন্তা ও কাজের ভিতর দিয়া সহজ সত্যের স্থানলাভ করিয়াছে,—তাহাদের অবস্থাটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্ম্মগণ্ডীর সংস্কার ও আবরণের প্রাধান্য দ্বারা কত যুগে একইভাবে থাকিবে, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

এখনও লোকের অভাব নাই যাহারা নারীর উন্নতির কথা উঠিলেই আমাদের আচরিত রীতি অনুসারে পুরুষ ও নারীর প্রভেদ, এবং তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পার্থক্য ও সীমা দেখাইতে অগ্রসর হন। নৈসর্গিক বিধানেই নারী তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে, পুরুষের aggressive কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা হঠকারিতা অযথা নারীকে নিয়া টানাটানি করিলে যে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিবেন এবং সমাজ একেবারে বিফল হইয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ বংশের দুর্দ্দশা বাড়িবে, হয়ত বা ধরাপৃষ্ঠ হইতে মানবের বিলুপ্তির সম্ভাবনা উৎকট হইয়া দেখা দিবে। যুক্তিতর্ক আসিয়া যখন এত সব বিভীষিকা সৃষ্টি করিবে, তখন হয়ত

নিরুপায় পক্ষে একমাত্র উপায় বলিয়া গৃহীত হইবে; আর এরূপ আত্মত্যাগেই যে নারীর দেবীত্ব ও মহত্ত্ব তাহাই ললিত ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজেও যে নারী এখনও নির্য্যাতিত' বলি কি, এ দেশের অপেক্ষাও অরক্ষিত, অধিক কলঙ্কিত, সেই রায়টা দেখাইয়া দিলে—তাহা দ্বারা নির্যাতন করাটা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা প্রমাণিত না হইলেও— আমরা যে অন্য দেশের পুরুষদের অপেক্ষা বেশী অন্যায় কিছু করিতেছিনা, তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। নারীর মানবত্ব যে মাতৃত্বেই পরিণত, সুতরাং নারীর অধিকার বলিতে মাতৃত্বের অধিকার (?) ই তাহার সর্ব্বস্ব। কিন্তু অধিকারের সঙ্গে যে স্বাতন্ত্র্যের গন্ধ জড়িত আছে—ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। নারীর মাতৃত্বের গৌরব কি তাহার অধিকার ঘোষণা করে?

নারীর জাগরণের আকাঙ্ক্ষাকে এই চক্ষে দেখেন এরূপ লোকের প্রভুত্ব এখনও দেশের উপর চলিতেছে তাহা অস্বীকার করা চলিবে না সুতরাং নারীর উন্নতির মৃদু চেষ্টার অন্তরায় হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই শঙ্কিত হইতে হয়। স্বরাজ ভারতে সঞ্জীবন আনিবে। সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও অভ্যুদয়ের জন্য সকলেই স্বরাজের দিকে চাহিয়া আছেন। নির্য্যাতিত ও পতিত জাতি সকলও স্বরাজ মন্ত্রেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। যুগযুগব্যাপী আচার, সংস্কার ও নারীর স্বাভাবিক কোমলতার সহিত নানা কারণ মিলিয়া নারীকে বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়াছে, এবং সর্ব্বদাই তাহার বাহিরে আসিতে বাধা দিতেছে। তাহা ভিন্ন উপরি উল্লিখিত যুক্তিজাল নারীর উন্নতি চর্চ্চাকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিতেছে। এ অবস্থায় স্বরাজের নেতারা যদি ধর্ম্মগণ্ডীর হাতে অত্যধিক ক্ষমতা দান করিয়া ধর্ম্মের (Religion) প্রাধান্যকে রাষ্ট্রের নিয়ন্তা করেন, এবং আশু রাষ্ট্রীয় সুবিধাই কেবল লক্ষ্য করিয়া চলেন, তবে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর স্বরাজ কখনও—সুদূর ভবিষ্যতেও—গড়িয়া তুলা কিরূপ দুঃসাধ্য হইবে, তাহা এখনই চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। বস্তুতঃ নারীর উন্নতির বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। বোধ হয় নারী অস্পৃশ্য (untouchable) অথবা নির্য্যাতিত Depressed or Repressed জাতির তালিকায় পড়ে নাই বলিয়াই এ দিকে চেষ্টার অভাব। এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া যে খুব কঠিন তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু লোক সংখ্যার অনুপাতে (Population) যখন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভাগ বাটোয়ারা করিতে প্রবৃত্ত, এবং দল বৃদ্ধির জন্য নারীর সংখ্যাটাকে গণনা করিতে ভুল করেন না, তখন কি এই ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে নারীর উন্নতির কি সুবিধার একটা সর্ত্ত করিয়া নেওয়া কর্ত্তব্য নয়? অধিকার আহরণের সময় যদি নারীর সংখ্যাটাকে পুরুষের সংখ্যার মতই সমান উপযোগী মনে হয়, তবে সেই অধিকারের ভাগ হইতে নারীকে কিছু দিতে পরাঙ্মুখ হইবার সপক্ষে যুক্তি আছে কি?

শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য।

কালাধলা

ক্ষীর সমুদ্রের দুই পারে দুই মহাদেশ। একদেশের গহন বনের ভেতর রাজত্ব করে একজাত রঙ তাদের কালো, বনের গভীর ছায়ার মত। আরেক দেশের শাদা বরফে ঘর বেঁধে থাকে আরেক শাদা জাত—বরফের মত শাদা।

কালোরা বলে আমরা খুব ভালো, আমাদের সব ভালো, আর যারা কালো নয় তাদের সব মন্দ। কালো জাত, হিসেব করে আর হিংসে করে।

শাদারা স্ফূর্ত্তি করে, আর গান গায় আর নাচে, আর আপন পর বাছে না।

কালোরা ভারী সভ্য। তারা সোজা করে কথা কয় না, মধু না মিশিয়ে বিষ দেয় না। সর্ব্বনাশও করে কিন্তু সান্ত্বনা দিতেও ভোলে না। তারা পরের চিনিকে নুন বলে আর নিজের রাঙতাকে বলে সোনা। তারা ভারী দয়ালু, মানুষকে মারতে হলে কিসে তার যন্ত্রণা না হয় তা আগে দেখে, এমন কি তারা পরলোকে কল্যাণের সুবিধা করে দেয়। এদের ভাষা বড় মার্জ্জিত—খুনের নাম বীরত্ব, ধাপ্পাবাজির নাম রাজনীতি—কৌশল আর আকালষেড়েমির নাম স্বদেশপ্রীতি। সুতরাং ভগবান এদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। এদের সব জায়গায় জয়জয়কার।

শাদারা কিন্তু এত সভ্য হ'তে পারে নি। তারা হাসি না পেলে হাসতে পারে না এবং মিথ্যেকে মিথ্যেই বলে ফেলে। খুনকে তারা বলে খুন—আর জুয়াচুরী দেখলে দু ঘা না দিয়ে থাকতে পারে না। সুতরাং এই অসভ্য জাতটা ভগবানের একেবারে অপ্রীতি-ভাজন। তারা বিশতলা বাড়ীও তৈরী করতে পারে না সমুদ্রের তলায়ও ডু মারতে পারে না।

কাজে কাজেই দেবতার আদেশ হ'ল—ওই শাদা জাতটাকে তোমাদের নফর করে' রেখে' দাও নইলে ওদের আর উদ্ধার নেই। দলে দলে শাদা জাতটাকে ধরে' এনে কালোদের গোয়ালে আর আস্তাবলে পোরা হ'তে লাগল। কেউ কেউ আপত্তি করে, তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আর ডান হাতে শাস্ত্রের খোঁচা প্রয়োগ;—এই উভয় প্রবল যুক্তির চোটে তাদের আর বুঝতে বিলম্ব হ'ত না।

এমনি করে' দিন যায়, কালো জাতের দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়ে। তাদের ট্যাঁকশালে টাকা ধরে না, মরাইএ ফসল ধ'রে না। এই দেখে আর যত জাত ছিল লাল, নীল হলদে সকলে হিংসে করে। কালোরা খুসি হয়ে রোজ দিনে দুপুরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে' বলে—"হে ভগবান মনে বল দাও, যেন অপরে হিংসা করে বলে' মনে অহঙ্কার না আসে, আর অহঙ্কারে যেন রোজ প্রার্থনা করতে না ভুলে' যাই।" পাছে আরামে রাখলে ধলাদের খিদমংগিরি করতে বেশী কষ্ট হয়, তাই তারা সময়ে অসময়ে কোড়ার বন্দোবস্ত

এমনি করে বেশ চ'লে যেত কিন্তু হিংসুটে অন্য জাতগুলোর জ্বালায় আবার এক ফ্যাসাদ বাধল।

হিংসুটেরা বলে "এ ভয়ানক অন্যায়! মানুষ মানুষকে এ রকম করে' দাস করে রাখবে কোন অধিকারে? তাই শুনে' দেশের দু একটা মাথাপাগলা ছেলেও সুর ধরলে "না এ ভয়ানক অন্যায়!"

কালোরা চটে' গিয়ে বল্লে "ভালোরে ভালো! অন্যায় ত কি হয়েছে, তোমাদের অন্যায় করতে কে বারণ করেছে। আর অন্যায়ই বা হ'ল কেমন করে। ওরা যদি দাস না হবার জন্যেই জন্মাবে তবে ওদের চামড়া শাদা কেন?"

লাল নীলেরা সাধু হয়ে বল্লে "শাদাও যা কালোও তাই আমরা অমন অন্যায় করবই কেন!"

গেঁায়ার ছেলেগুলোর-ও রকম সকম বড় ভালো ঠেক্‌ল না। কালোরা নরম হয়ে বল্লে "শাদদেরই মুখ চেয়ে আমরা ওদের এই অসহায় অবস্থায় কেমন করে'—পথে ছেড়ে দিই বলত?"

কিন্তু মীমাংসা হ'ল না। গোল বেড়েই চল্‌ল।

সুতরাং একদিন খুব সমারোহ করে', শাদা জাতটাকে রাস্তায় কপর্দ্দক হীন করে' বার ক'রে দিয়ে বলা হল বুঝেছ আমরা নিজের ক্ষতি করে' শুধু মনুষ্যত্বের খাতিরে তোমাদের স্বাধীনতা দিলুম, বুঝলে।"

সমস্ত পৃথিবীময় ধন্য ধন্য রব উঠল।—কি মহত্ত্ব কি স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা!

আরো দিন যায়। শাদা জাতটা নেহাৎ আহাম্মুক। সে কালোদের সঙ্গে দেখা হ'লে মাটি ছুঁয়ে' কুর্ণীশ করে না, কালোদের মজলিসে গিয়ে তাদের পাশে বসতে যায়, রাস্তায় জোরে পা ফেলে হাঁটে, কালোদের সঙ্গে সমান সুবিচার চায় সব কাজে পাল্লা দিতে যায়। মনে করে যে ধিঙ্গি হয়েছি, বলে "আমরা শাদা কালো দুই ভাই!"

এতে আর রাগ কি করে' সামলান যায়! বেশ করে' পিটে ঘা কয়েক কোড়া লাগিয়ে কিম্বা চোখ দুটো তপ্ত শলা দিয়ে গেলে দিয়ে কিম্বা আগুনের ওপর জ্যান্ত ঝল্‌সে মেরে তখন কালোদেব বলতেই হয়—"মনে থাকে না কেন আমরা তোমাদের দাসত্ব দূর করে' দিয়েছি, মনে থাকে না তোমরা আজ এই স্বাধীনতা ভোগ করছ শুধু আমাদেরই দয়ায়?"

আহাম্মুকেরা তবু বুঝতে পারে না বলে "বাঃ মারবে কেন?—দু একজন শাদা মরিয়া হয়ে বল্লে "চল আমরা নিজের দেশে যাই কালোর সঙ্গে মিশে কালো হওয়ার বিফল চেষ্টার চেয়ে ভালো করে' শাদা হবার চেষ্টাই বেশী সহজ ও সুবিধা।"

কালোরা নাক সিটকে বলে—"একেই না বলে নেমক-হারাম!"

রবীন্দ্রনাথের বাণী

যে কবির রচনার মধ্যে আমার হৃদয় তাহার সমস্ত ভাবের সাড়া পাইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার রচনা ছন্দঝঙ্কারে আমার শৈশবকালের তরুণ চিত্তকে অপূর্ব্বতালে দোল দিয়াছে. তখনকার অরুণালোকে যাঁহাকে কোন স্বপ্নলোকচারী বলিয়া বোধ হইত; আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িয়া চলিয়াছে, যিনি আমার চোখের সম্মুখে বিশ্ব-মানবের সংস্কার বিমুক্ত উদার রাজপক্ষটী খুলিয়া ধরিয়াছেন, সেই কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করিতে যাওয়া আমার অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথের রচনা আমাদের দেশে যতই আলোচিত হয় ততই মঙ্গল, কারণ তাঁহার রচনা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা, আবিলতা এবং পঙ্কিলতা হইতে পাঠকের মনকে তুলিয়া কোন্ এক ঊর্দ্ধালোকে লইয়া যায়।

আমার প্রবন্ধের বিষয়—রবীন্দ্রনাথের বাণী। সুতরাং আমি এখানে কবির কাব্যরাজি আলোচনা করিয়া তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য একটী একটী করিয়া খুলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব না। কিন্তু তাঁহার কবিজীবনের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্য দিয়া যে একটী পরম সত্য অতি আশ্চর্য্য ও সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাই এখানে আলোচনা করিব।

কবির রচনা যে অতি বিচিত্র, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার নিত্য নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা চিরদিনই নূতনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। তাই তাঁহার রচনা শুধু রসিকজনের চিত্তবিনোদন নয়, কিন্তু সকল অবস্থার নরনারীর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া বিচিত্র রাগিণী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার রচনায় যেমন বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সুর অজস্রভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাই, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে খুঁজিয়া দেখিলেও আর কোনো কবির রচনার মধ্যে এত বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এই সমস্ত বিচিত্রতার মধ্যে ও একটী সুর সমস্তকে ছাপাইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। এই যে আমাদের বিপুল সংসারের ক্ষেত্র, ইহা তাহার সমস্ত দুঃখদৈন্য লইয়াও পরম সুন্দর। বিশ্ব বিধাতা এই সংসারের মাঝখানেই আপনাকে নিত্য নূতন ভাবে মেলিয়া দিতেছেন। পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধবের স্নেহ প্রীতিতে ইহা সুন্দর হইয়াছে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইয়াছে। মানব-জীবনের মহত্ত্বে সুন্দর হইয়াছে। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছেন—

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে,
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে,

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ,
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া !

মুগ্ধ কবি তাই গাহিতেছেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,

সংসার পরিত্যাগ করিয়া নয়, কিন্তু সংসারের মধ্যে থাকিয়া, সকলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ভগবানকে লাভ করিতে হয়। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' কবি এই শিক্ষাই আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। সংসার বিমুখ একটী সন্ন্যাসী বিশ্বের সমস্তকেই মায়া জ্ঞান করিয়া অতি সাবধানে সংসার হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিলেন। পরে একটী বালিকার স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে সংসারের ভিতরে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। তিনি অল্পে অল্পে বুঝিতে পারিলেন যে এতদিন তিনি কি শুষ্কতার মধ্যেই ছিলেন ! তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ, দয়া, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। বালিকার স্নেহে সেগুলি যেন কোন মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি বিশ্বকে আর মায়া বলিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন না, কিন্তু বিশ্বের সমস্তকেই প্রীতি করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়াই বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিলেন। 'নৈবেদ্যের' একটী গানেও তিনি বলিতেছেন —

তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে রবে টানিতে।
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম
আমার হৃদয় খানিতে।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গে পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয় খানিতে।

মানুষের জীবন যে কত বড়, কত মহৎ কত সুন্দর এই শিক্ষা আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে যত পাইয়াছি, এমন আর কাহারো নিকট হইতে নহে। তিনি জীবনের —
মধ্য দিয়াই জীবন-পাত্রের যত মধু সমস্তই নিঃশেষে পান করিয়াছেন।
অমৃত-রস বহন করিয়া আনিয়াছে, বেদনা বিধাতার দূতীরূপে দেখা দিয়া
সঙ্গীতকে মাধুর্য্যধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে, ভক্তি তাঁহাকে ভূমার সঙ্গে

মানবজীবনের সমস্ত অবস্থাই তাঁহার চোখে নূতনতর সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাঁহার বীণার তারে নূতনতর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহার আধুনিক রচনা 'গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা' প্রভৃতি প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই এই পরিতৃপ্তির কথা নানা ভাবে, নানা ছন্দে, নানা সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি জীবন-দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান

আর একটী গানে তিনি বলিতেছেন—

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে
আমার প্রাণ নইলে সে কি কোথাও ধরবে,

এইরূপ কত শত কবিতায় এবং গানে তাঁহার পরিতৃপ্তির কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

এ জীবন ত সামান্য নয়। ইহার 'নিমন্ত্রণ লোকে।' 'লোকে' ইহার সঙ্গে মিলনের জন্যই পরমাত্মা বা ভূমা বাহির হইয়াছেন। কবি গাহিতেছেন—

আমার মিলন লাগি তুমি আসচ কবে থেকে
তোমার চন্দ্রসূর্য্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে
কত কালের সকাল সাঁঝে তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে গেছে আমায় ডেকে।
ও গো পথিক, আজকে আমার সকল পরাণ ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় হয়েছে আজ ফুরালো মোর যা ছিল কাজ
বাতাস আসে হে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে॥

ঝড়ের রাত্রিতে পরমাত্মা অভিসার যাত্রা করিয়াছেন। মানুষের আত্মা ব্যাকুল হইয়া তাঁহারি পথ চাহিয়া আছে—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা, হে বন্ধু আমার
বাতাস কাঁদে হুতাশ সম
নাইরে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম চাই যে বারে বার
সুদূর কোন নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে

মানুষের আত্মা তাঁহার পায়ের শব্দ যেন শুনিতে পাইয়াছে। ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিতেছে—

তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
সে যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
সকল যুগে বেজেছে তার আগমনী ;
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে তারি চরণ বাজে বুকে
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি
সে যে আসে, আসে, আসে।

জীবনকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন

আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে

জীবনকে এমনই সুন্দর ও বিরাট করিয়া তিনি দেখিয়াছেন। জীবন তাঁহার কাছে অনন্ত অর্থপূর্ণ। এক কথায়, তাঁহার সমগ্র রচনাকে নিখিল জীবনের উৎসব-সঙ্গীত বলা যাইতে পারে।

জীবনকে তিনি এমন গভীরভাবে ভালোবাসেন বলিয়াই যেখানেই এই জীবনকে খর্ব্ব করা হইতেছে দেখিতেছেন সেখানেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তাই আধ্যাত্মিক গোঁড়ামি যেখানে মানবের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে জড়ভরত মাত্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়, যেখানে সামাজিক কুসংস্কার মানুষের আত্মার বিকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেখানে তিনি অমিতবিক্রমে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন। তিনি মানব জীবনকে ভালোবাসেন—তাই তাহার বিকাশের স্বাধীনতা চান। তিনি বিশ্ব বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি

পৌরুষেরে করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

আমাদের দেশে জাতিবিচার প্রভৃতি যখন চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে, যখন মানুষ মানুষের আত্মাকে নয় কিন্তু কৌলিন্যকে বড় করিয়া দেখিয়াছে তখন কি কবি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন। তিনি নানা গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে ইহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। 'গীতাঞ্জলি'র একটী কবিতায় তিনি বলিতেছেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
পশ্চাতে দাঁড়ায়ে রেখে তবু পদে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

আমাদের দেশে মেয়েরা বাহিরের উদার বিশ্বজগতের আলো, বাতাস, শিক্ষা, দীক্ষা হইতে বঞ্চিত। তাদের আত্মা বাহিরের সংস্পর্শে আসিতে না পারিয়া খর্ব্ব হইয়া আছে। তাহারা বাঁধা বুলি, বাঁধা নিয়ম, বাঁধা অভ্যাসের সহস্র নাগপাশ বন্ধনের মধ্যে নিরানন্দ গৃহকোণে তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে আর বাহিরে বিধাতার নিজের সৃষ্টি আনন্দলোক ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। বিশ্বজগৎ তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র হাতে করিয়া বার বার ডাকিয়া ডাকিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহাদের সে দিকে তাকাইয়া দেখিবারও সময় কিংবা সুযোগ নাই। এই যে জগৎ জুড়িয়া মহামানবের মেলা বসিয়াছে, সুখ দুঃখের অভিঘাতে তাহাতে যে বিচিত্র নাট্যলীলা জমিয়া উঠিতেছে তাহাতে তাহাদের যোগ দিবার অধিকার আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমাজ রাখেন নাই। আমাদের সমাজের হাতে যত রকম বন্ধনই আছে সমস্ত বন্ধনেই এই মাতৃজাতিকে পিষিয়া রাখিবার আয়োজন করা হইয়াছে। ফল এই হইয়াছে তাঁহারা এখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তিও হারাইয়াছেন এবং বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া না জানিয়া মুক্তি বলিয়াই জানিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয় ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছে। 'পলাতকা'র একটী কবিতা এখানে আমার বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। একটী মেয়ে মৃত্যু শয্যায় তাহার বাইশ বছর ব্যাপী জীবনের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন বাইরের জগৎটা যে কিরূপ তাহাও দেখিবার সুযোগ আমার কোনো দিন ঘটিয়া উঠে নাই। আমার জীবনটা ছিল যেন একটা কলের মত। আমি জানিতাম, "শুধু খাওয়ার পরে রাঁধা, আর রাঁধার পরে খাওয়া" ইহা ছাড়া পৃথিবীতে আমার যে কিছু করিবার আছে তাহা মনে হয় নাই। আজ রুগ্ন শয্যায় কলের চাকার মত

প্রতিদিনকার তুচ্ছ জীবন যাত্রা হইতে অবকাশ লইয়াছি। উন্মুক্ত বাতায়নপথে আলোর ঝরণা বাহিয়া আকাশপারের বাণী আমাকে অভিনন্দন করিল—আমি নারী, আমি মহীয়সি আমি ভূমা—অল্পে আমার সুখ নাই।

মানুষের আত্মার বেদনায় এবং অবমাননায় রবীন্দ্রনাথের বীণা এমনই করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে।

যৌবনই জীবনের সংবাদ বহন করিয়া আনে। কারণ তাহাতে চলার বেগ আছে। সে সমস্তই পরখ করিয়া লইতে চায়—শাস্ত্র বাক্যই হউক বা অন্য কোনো বাক্যই হোক বিনা বিচারে মাথা নাড়িয়া লইতে চায় না। যৌবনের মধ্যেই মানব জীবনের অনন্ত জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তার শক্তির প্রাচুর্য্য তাকে পথ খুঁজিয়া লইবার প্রেরণায় জাগাইয়াছে। তারা বলে, "পথ আমারে পথ দেখাবে" "আমাদের চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে উঠ্‌বে" জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

এই জন্যই এই অশান্ত ও অশ্রান্ত যৌবনের প্রতিই কবির অপরিসীম শ্রদ্ধা। এইখানেই মানুষের জীবন বিকাশ লাভ করিয়াছে। কবি তাঁর আধুনিক কাব্য 'ফাল্গুনী ও অন্যান্য বহু গানে ও কবিতায় যৌবনের জয়গান করিয়াছেন। যৌবনকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

খড়্গসম তোমার দীপ্তশিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা
জীর্ণতারি বক্ষ দু'ফাক করে
অমর পুষ্প তব
আলোক পানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব

কবির চিরদিনই যুবক থাকিবার ইচ্ছা। শুধু দেহে নয়, মনেও। কবিকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—

ওরে কবি, সন্ধ্যা হয়ে এল
কেশে তোমার ধরেছে যে পাক
বসে বসে উর্দ্ধপানে চেয়ে
শুন্‌তেছ কি পরকালের ডাক?

এখন কবি কি উত্তর করিতেছেন শোনা যাক্—

কবি কহে, সন্ধ্যা হল বটে
শুন্‌চি বসে লয়ে শ্রান্ত দেহ
এ পারে ঐ পল্লী হতে যদি

তিনি বলিতেছেন—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো !

সকলের এক বয়সী হইবার ইচ্ছা, সকলের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বব্যাপী যে জীবনের লীলা চলিতেছে তাহার সঙ্গে অনুভূতি দ্বারা এক হইয়া যাওয়াই রবীন্দ্রনাথের চরম সাধনা। তাঁহার কিশোর বয়সের প্রভাত সঙ্গীতেও আমরা দেখিতে পাই—

জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না
মরিয়া যাব একা হলে একটী জল কণা।

এই ভাবটী তাঁহার সমগ্র রচনাতে ওতঃপ্রোতভাবে মিশাইয়া আছে।

তিনি জীবনকে আনন্দের দিক হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া যে দুঃখকে বাদ দিয়াছেন তাহা নহে, কারণ দুঃখ ত আনন্দেরই অংশ বিশেষ। তিনি উপনিষদের ঋষীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতেছেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্তি, অভিসংবিশন্তি। আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, আনন্দ দ্বারাই জীবিত রহিয়াছে এবং আনন্দেই প্রবেশ করিতেছে, দুঃখ যদি কেবল মাত্র দুঃখই হইত তবে ইহার মত অবাস্তর কিছুই থাকিত না। দুঃখের সঙ্গেই সুখ আছে বলিয়া এ জগৎ টিকিয়া আছে। তাই তিনি উপনিষদকারের সঙ্গে বলিতেছেন—

কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ অর্থাৎ আকাশ ভরিয়া যদি আনন্দ না থাকিত তবে কেই বা প্রাণের চেষ্টা করিত অর্থাৎ দুঃখ ধন্দা সহ্য করিত। জননী যে সন্তানের জন্য কত দুঃখ সহ্য করেন, তাহা কি তাঁহার দুঃখ। বরং তাঁহার দুঃখ যতই বৃহৎ হয় আনন্দই তত বৃহৎ হয়। কারণ তিনি এই দুঃখের দ্বারাই আপনাকে লাভ করিতে পারেন। মহাত্মা কারলাইল তাই প্রতিভাকে উল্টাদিক হইতে দেখিয়া বলিয়াছেন—গভীরতম দুঃখকে বহন করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

রাত্রি যদি তার গভীর অন্ধকারের মধ্যে অরুণোদয়ের সংবাদ বহন করিয়া না আনিত তবে সৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া যাইত। মানুষ কাজ করে, দুঃখ পায়, শোকের যাতনা সহ্য করে কিন্তু তবুও ইহারই মধ্যে সে অমৃতের আস্বাদ ক্ষণে ক্ষণে লাভ করে। এই দুঃখই তাহার মনকে ভূমার দিকে লইয়া যায়। তাই দুঃখ আনন্দ হইতে পৃথক অন্য কোন কিছু নহে। শুধু দুঃখের দিক দিয়া দেখিলে জীবনকে আধখানা করিয়া দেখা হয় কারণ তখন আনন্দকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু আনন্দের দিক দিয়া দেখিলে দুঃখকে বা অন্য কিছুকে বাদ দেওয়া হয় না। কারণ আনন্দের মধ্যে সমস্তই আছে সুতরাং জীবনকে যদি আমরা সম্পূর্ণ...

দেখা। "আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের"। আমরা যদি কোন গাছের পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে চাই; তবে ফল পত্র শোভিত বিশাল বন জাতিকেই দেখিব, যাহা উর্দ্ধালোকে আকাশে মাথা তুলিয়াছে, চ্যালা কাঠকে নহে, তাই উপনিষদের ঋষির সঙ্গে কবির গভীরতম প্রার্থনাটী এই—আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে আবি হে পরিপূর্ণ স্বরূপ, তুমি আমাদের নিকট পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হও।

আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনা মোটামুটি ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তিনি জীবনকে অত্যন্ত গভীর ভাবে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি জীবনের মধ্যে বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির সমস্ত আনন্দই প্রতি ফলিত দেখিয়াছেন। জীবনের সমস্ত অবস্থাই বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাহার নিকট বিচিত্র সুরে বাঁশী বাজাইয়াছে। মৃত্যুর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি অমৃতকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সত্যকে লাভ করিয়াছেন এবং সুখের মধ্যে আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাই তিনি বলেন যে এজীবনে বিধাতার দান দুঃখের রূপ ধরিয়াই আসুক আর সুখের রূপ ধরিয়াই আসুক তাহাকে নত মস্তকে অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ এ সমস্তের মধ্য দিয়াই বিশ্ব বিধাতা আপনাকে নিয়ত দান করিতেছেন।

এ জীবন বিধাতার দান বলিয়া ইহাকে সর্ব্বপ্রকার আবিলতা হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া রাখিব। ইহাকে অবনত হইতে দিবনা ও অপমানিত হইতে দিব না। কবি বলিতেছেন—

আমারে সৃজন করি, যে মহা সম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরাণ
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস শর্ব্বরী
তার উর্দ্ধশিখা যেন সর্ব্ব উচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি!
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমার প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমার মহিমা
মহেশ্বর! সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে
সর্ব্বশক্তি লয়ে মোর। যাক্ আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।

বিকশিত পুষ্প যেমন আপনার সহজ সার্থকতার আনন্দে তার সমস্ত গন্ধ ও মাধুরী

লইয়া বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে মেলিয়া দিয়াছে, আমরাও তেমনি আমাদের রসে টস মল অখণ্ডিত পরিপূর্ণ জীবন খানা লইয়া বিশ্ব বিধাতার সম্মুখে ধরিয়া কবির সহিত বলিব—

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল
মোর আনন্দ সে যে মনিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন পর্ব্বত
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়।

শ্রীসুধেন্দুনাথ বসু।

অনুক্রম

(২৭)

শেষ রাত্রিতে মণির গাড়ী যখন এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌছিল তখন ফণী আসিয়া মেয়ে-গাড়ীর দরওজা খুলিয়া মণিকে বলিল, "নেমে এস।" ভয়ে ও বিস্ময়ে মণির মুখ শুখাইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে?" ফণি একটু হাসিয়া চড়া গলায় বলিল, "আবার আপনি আরম্ভ করলে? হিন্দু স্বামী তোমার মত স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করতে পারে না, এখনও লোকে জানাজানি হয়-নি, বেশী র‍্যালা করোনা, তা'হলে পুলিশ ডাকতে হবে। ভাল কথায় নেবে এস বলছি।" ভয়ে ও আতঙ্কে নিরাশ্রয়া নারী দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি কেন এরকম করছেন! আমি আপনার ভয়েই মামার আশ্রয় ছেড়ে এসেছি, আমি আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আপনি আমাকে যে রকম মেয়ে-মানুষ মনে কচ্ছেন আমি তা নই।" গলাটা ভার করিয়া ফণি বলিল, "দেখ, যে কষ্ট, যে অপমান আর যে লোকলজ্জা তোমাকে বিয়ে করে পেয়েছি সে ... কষ্ট পেলে অপর পুরুষ অমন স্ত্রীর মুখে লাথি মেরে চলে যেত কিন্তু আমি সে রকম

নই। হিন্দুর সাত পাকের বিয়ে উল্টো দিকে চৌদ্দ পাক দিলেও খোলেনা। দেশ তোমার ত আত্মীয়স্বজন আছে, ভালয় ভালয় নেমে এস। আর কাশীতে থেকে কাজ নেই, চল তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই।" মণির মাথা তখন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এলাহাবাদ ষ্টেশনের আলোগুলা তাহার চোখের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাবনা; কোন মতেই যাবনা।" বলিতে বলিতে তাহার অঙ্গ এলাইয়া পড়িল। মণি তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ে-গাড়ীতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। গাড়ীতে দুই তিনটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাহাদের অভিভাবকেরা প্লাটফর্মে ফণিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, "কি হয়েছে মশাই? মেয়েটি কে মশাই?" ফণি অম্লান বদনে তাহাদিগকে বলিল, "কি আর বলব মশাই, আমারই স্ত্রী, দেশ থেকে কাশীতে পালিয়ে এসেছিল, তারপর আমি আস্‌ছি শুনে আর কোথায় পালাচ্ছিল। তিন দিন অনাহার অনিদ্রার পরে এই এলাহাবাদ ষ্টেশনে এসে ধরেছি। আপনারা একটু সাহায্য করুন না মশাই? ওকে নামিয়ে ওয়েটিংরুমে শোয়াই।"

ফণির অনুরোধ মত আরও তিনজন ভদ্রলোক মণিকে তুলিয়া সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিংরুমে লইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে মণির যখন চেতনা ফিরিল তখন সে দেখিল যে তাহার পাশে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আর ফণি দাঁড়াইয়া আছে। মণি উঠিয়া ভদ্রলোকটীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আমি বড় অনাথা আপনি আমার ধর্ম্মবাপ, আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। ও আমার কেউ নয়। আমার স্বামীর নাম নিতাইসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি ওর ভয়ে মামার আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলুম," মণির কথা শুনিয়া ফণি একটু হাসিয়া ভদ্রলোকটিকে বলিল, "দেখলেন মশাই, কি বলছিলুম? নিতাই আমাদের পাড়ার সেই বয়াটে ছেলেটা, তার জন্যেই আমার সংসারটা ছারখার হয়ে গেল।" ফণির কথা শুনিয়া রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্যা হইয়া মণি বলিয়া উঠিল "তুই কোন্ মুখে এ-সব কথা বলছিস নচ্ছার? জানিস্ আমি ভদ্রলোকের স্ত্রী? জানিস্ এর জন্য তোর একদিন জেল হবে?" মণিকে একটা ধমক দিয়া ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, "দেখ বাছা তুমি এখন পুলিসের হাতে, আমি রেলের পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর। তোমার মত কত মেয়ে যে আমাদের ধরতে হয় তা আর তোমাকে কি বলবো? তোমার পরম সৌভাগ্য যে এমন স্বামীর হাতে পড়েছিলে, এখন ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যাও। বেশী চেঁচামেচি করোনা, তাহলে হাতকড়ি দিয়ে তোমাকে হাজতে দিতে হবে। কাল সকালে হাকিমের সম্মুখে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তোমার স্বামী অতি ভদ্রলোক, তাঁর ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য তোমাকে ভাল কথা বল্‌ছি। তোমার স্বামী যখন তোমাকে চাইছেন তখন ফিরে যাও।"

হাজৎ ও হাতকড়ির কথা শুনিয়া মণি কাঁদিয়া ফেলিল, চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া

কেউ নয়, ও কাশীর একটা বয়াটে ছেলে। আপনি আমাকে ওর হাতে ছেড়ে দেবেন না।" ভারতবর্ষের ইংরেজরাজার পুলিস সচরাচর নিমকহারাম হয়না, ফণির একখানা একশত টাকার নোট তখনও নিমকস্বরূপ ইনস্‌পেক্টরের পকেটে বিরাজ করিতেছিল, তিনি মণিকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চোপ মাগী! বেরিয়ে এসেছিস্, স্বামী দয়া করে নিতে এসেছে, এখনও ছেনালী; তোকে হাত কড়া লাগাতে হবে দেখছি। আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, আমি এলাহাবাদের রেলের পুলিসের ইন্‌সপেক্টর, তোর মত হাজার হাজার ছেনাল খানকী আমার হাত দিয়ে পার হয়ে গেছে, আমার ত্রিশ বছর চাকরী হল, বেটি আমাকে ধর্ম্মের কাহিনী শোনাতে এসেছিস্। ফণিবাবু, আপনি একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এসে মাগীকে নিয়ে যান, যদি সোজা কথায় না যায় তাহলে হাতকড়ি লাগিয়ে হাজতে দিতে হবে।" ফণি হাসিয়া বলিল, "আপনি একটু পাহারায় থাকুন, আমি একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আসি।" তাহার কথা শুনিয়া মণি ওয়েটিং রুমের সোফার উপরে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, ইন্‌সপেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মিত্র বলিলেন, "বাইরে দু'জন কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে আছে, আপনার কোন ভয় নেই।"

দুই ঘণ্টা পরে ফণি একখানা মোটর লইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন রৌদ্র উঠিয়াছে, ষ্টেশনের পথে লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ফণি আসিয়া মণির হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে মোটরে উঠাইল, মণি ভাবিয়াছিল যে সে গাড়ীতে উঠিবার সময়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবে কিন্তু মোটরের ড্রাইভারের পার্শ্বে একজন পুলিশ কনেষ্টবল দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। মোটর ছাড়িয়া দিল, গঙ্গা পার হইয়া কনেষ্টবলকে দশ টাকা বখসিস্ দিয়া ফণি তাহাকে মোটর হইতে নামাইয়া দিল। মোটর চলিতে লাগিল, অনেক দূর চলিয়া মাঠের মাঝখানে একটা বড় বাগানের ফটকে মোটর থামাইয়া ফণি মণিকে টানিয়া বাহির করিল। মোটর চলিয়া গেল! মণিকে টানিতে টানিতে বাগানের ভিতর লইয়া গিয়া ফণি তাহাকে একটা ছোট একতালা বাড়ীর অন্ধকার কুঠরীতে ঢুকাইয়া দিয়া বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া দিল। বাগানে দুই একজন মালী ছিল, তাহারা মণির চীৎকার শুনিয়াও আসিল না, মণি হতাশ হইয়া তাহার জেলখানার মাঝে বসিয়া পড়িল। বিকাল বেলায় ফণি নিজে আসিয়া তাহাকে একঘটী জল ও কতকগুলা খাবার দিয়া গেল, সমস্তদিন উপবাস থাকিয়া মণি পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, সে এক নিশ্বাসে একঘটী জল খাইয়া ফেলিল, জলে দুর্গন্ধ বোধ হইল; কিন্তু সে পিপাসার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া সমস্ত জলটাই পান করিয়া ফেলিল।

(২৮)

অনেক রাত্রিতে ফণি যখন একটা আলো লইয়া আসিল তখন মণি অচেতন হয় নাই। কিন্তু তাহার দেহের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একটা প্রবল উত্তেজনা তাহার সমস্ত

আসিতেছিল। ফণি আসিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে, অষুধ ধরেছে।"

মণি দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, "ধরেছে।" মণির মুখের কথা শুনিয়া ফণি আবার ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিল, সুরাপানে তাহার চোখ দুইটি লাল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন যেন তাহা বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার উভয় পংক্তির দন্ত বিকশিত হইল, সে নিজের রং ফর্সা করিবার জন্ত যে রং মাখিয়াছিল তাহা জায়গায় জায়গায় ফাটিয়া গেল, তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া মণির মনের ক্ষণিক উত্তেজনা হইয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল,তাহা দেখিয়া ফণি হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল, মণি শিহরিল। ফণি বলিয়া উঠিল, "দেখ, এ অষুধে বশ হয় না, এরকম মেয়ে মানুষ দেখি-নি, তবে তুমি যত শিগ্ গির রাজী হয়েছ এত শিগগিরি কেউ হয় না। গোড়া থেকেই আমার উপর একটু নিমরাজী ছিলে—না? দেখ আমি প্রেমের বিশ্বকোষ বিশেষ—ও ছোঁড়াটা কি জানে—ও কি শিখেছে? দেখ ভাই মণি, যখন রাজী হয়েছ তখন আর দুঃখ দিও না। অষুধ জোর বটে, অনেক শালা ডাক্তারকে বোতল বোতল বিলিতি মদ খাইয়ে তবে আদায় করেছি, কিন্তু অষুধের একটা অনুপান আছে ত? একপাত্র খেলেই একেবারে ষোড়ষোপচার।" মণি একটু হাসিয়া বলিল, খাব"। ফণি তাহার কথা শুনিয়া এক লাফ দিয়া বলিয়া উঠিল, "হরি রাম্মা, যীশু খ্রীষ্ট, চৈতন্যচন্দ্র, কেশব সেন, ওলাদেবী, শীতলাদেবী, ধর্ম্মঠাকুর, সকলকে জোড়া জোড়া পাঁঠা দিব বাবা। মণি তুই উঠে আয়! হাত মুখ ধুয়ে চেহারাটা বদলে ফেল।" মণিও তাহাই চাহিতেছিল। ফণি তাহাকে একটা বড় ঘরের পার্শ্বে গোসলখানা দেখাইয়া দিল। মণি গোসলখানার দুয়ারটা ভেজাইয়া দিল বটে কিন্তু বন্ধ করিতে পারিল না,কারণ ফণি তাহার উপায় পূর্ব্ব হইতেই ঘুচাইয়া রাখিয়াছিল। মণির অবস্থা বুঝিয়া ফণি বলিয়া উঠিল, এখানে কাঁচা কাজ পাবেনা বাপধন! এ পাকা জহুরী।"

মণি গোসলখানায় ঢুকিয়া মাথায় ঘটিতে করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার শরীর সুস্থ হইল, তখন সে কাপড় ছাড়িয়া আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া বাঁধিয়া হল ঘরে ঢুকিল। সে ভাবিয়াছিল যে ফণি হয়ত আনন্দে মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু হলে ঢুকিয়াই তাহার সে ভুল ঘুচিয়া গেল। ফণি খড়খড়ির ফাঁক হইতে তাহাকে দেখিয়াছিল, স্নান শেষ হইলেই সরিয়া আসিয়াছিল। মণি তখন তাহাকে বলিল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে ভাই। তাহা শুনিয়া ফণি ঘরের কোণ হইতে একরাশি খাবার লইয়া আসিল। মণিকে খাইতে দেখিয়া ফণি দুইটা বোতল ও দুইটা গ্লাস বাহির করিল। খাইতে খাইতে দুইটা বোতল দেখিয়া মণি জিজ্ঞাসা করিল,"ও আবার কি?" ফণি কহিল "দিশি বিলাতি যে রকম তোমার অভিরুচি। আমি একটু মিশিয়েই খাই, শিগগির রং ধরে চাবুকের কাজ করে। একটু মিশেল টেনে দেখনা।" চার আউন্স পরিমাণ দেশী ও বিলাতি মদ একটা গ্লাসে মিশাইয়া সে যখন মণির হাতে দিল তখন মণি সিদ্ধ মাতালের মত তাহা একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে

তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। স্নানের পরে সে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া পলায়নের উপায় খুঁজিতেছিল, কিন্তু এখন তাহার ঘাড়ে খুণ চাপিল। সে স্থির করিল যে ফণি যদি তাহাকে না ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সে ফণিকে খুণ করিবে।

মণিকে মদ খাইতে দেখিয়া ফণির আর কোন সন্দেহ রহিল না! সে আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বরাৎ গুণে মিলেছ বাবা, তুমি দেখছি ঘড়েল মেয়ে মানুষ। খানকিদের মদ দেখেছি, শুনেছি বাঙ্গালা দেশে কোন কোন প্রাতঃস্মরণীয় গুষ্টিতে মেয়েরা মাল টানেন কিন্তু তুমি যে চার আউন্স দেশী বিলাতি neat মেরে দিলে, বাহাদুরী আছে। এত কষ্ট দিলি কেন ভাই, কাশী থেকে এতক্ষণ দু'শ মজা উড়ান যেত। "অনেক কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া মণি বলিল, "একবারেই কি হয়; তার উপর মামাবাবু যে কড়া।" ফণি মুখবিকৃত করিয়া বলিল,"দুর তোর মামাবাবু, মাডুয়াডিহিতে আমার বাগানবাড়ী আছে, সেখানে তোকে রেখে দিতুম। এটাও আমার বাগানবাড়ী, পীরিতের খাতিরে এই রকম কত জায়গায় কতগুলি বাগানবাড়ী করে রেখেছি জানিস্? বুড়োবেটা ভাবছে যে আমি শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা, গাজীউদ্দীন হায়দার হলে দিল্লীর আকবর সা কতকখানি চোখের জল ফেলেছিল তাই Measure glassএ করে মাপতে তার বাড়ীতে গিয়েছিলুম। আমার প্রাণের বাদশা যে মণিরুদ্দিন তাতো সে জানেনা। মাইরি ভাই, পীরিতের জন্য দেশ ছেড়ে কাশীতে পড়ে আছি' ঢের ঢের মেয়ে মানুষ দেখেছি কিন্তু তোর মত মেয়ে মানুষ দেখিনি। আর একপাত্র খানা ভাই। মণি বলিল,"অনেকদিন অভ্যাস নেই কিনা তাই গলাটা একটু জ্বালা করছে।"

সহসা ব্যাঘ্র লম্ফ দিয়া শিকারির উপরে পড়িল, ফণি যে এইরূপ ভাবে আক্রমণ করিবে মণি তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ফণির পৃষ্ঠে দংশন করিল। মদ্য পান করিয়া মণির দেহের বল ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহার সবল দংশনে প্রেমের বিশ্বকোষ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল, ফণি প্রথমে অনুরোধ পরে মিনতি অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সে কোন মতেই মণিকে ছাড়াইতে পারিল না। হলঘরের চারিদিকের দুয়ারে সে নিজের হাতে তালাবন্ধ করিয়া আসিয়াছিল সুতরাং বাহিরের লোক ভিতরে আনিবার উপায় ছিল না। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে মণির সঙ্গে ঘরের চারিদিক ছুটিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। একবার সে একটা জানালার কাছে গিয়া পৌছিল, জানালাটা খোলা ছিল। ফণি প্রাণের দায়ে জানালার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল, মণি তাহা বুঝিয়া ঠেল দিল। ফণি জানালার কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিল, তখন মণি তাহার দেহের সমস্ত বল দিয়া ফণিকে নীচে ফেলিয়া দিল।

তাহার পরে কি হইল তাহা মণি বলিতে পারে না। তাহার জ্ঞান হইল মহকুমার হাজতে। যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে মনে করিল যে ফণি মরিয়াছে এবং তাহার ফাঁসি হইবে। সে মরিলে সকল আপদ দূর হইল এই ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। ক্রমশঃ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিন্ধু-শকুন*

বিধাতার সৃষ্টি মানুষ, আর মানুষের সৃষ্টি কল, তাদের পাশাপাশি দেখ। কে হার মেনেচে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ভিতরে সব রকম দরকারের কল আছে অথচ দরকারটাকে দেখাই যাচ্ছে না। কলটার চেহারায় দরকার ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌চিনে। এর চেয়ে বে-আব্রু আর কিছুই নেই।

* * * *

সুন্দরের বুকের ভিতর দিয়ে কালো নিঃশ্বাস ফুঁসতে ফুঁসতে কলের কালো দৈত্য চলেচে। সেকালের জল-তোলা কলটি মানুষের প্রাণের জিনিষ তাই পাহাড়ের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে রঙে রঙে মিশ খেয়েচে। আর হাল আমলের ঐ জাহাজটা বিশ্বের রাসলীলার প্রতিবাদ করতে করতে বেসুরটাকে সুরলীলার দিকে উৎক্ষিপ্ত করতে করতে চলেছে।

* * * *

ছোট্ট ফুল, ছোট্ট পাখী কি সম্পূর্ণ অথচ কি সরল। আর ঐ বৃহৎ যন্ত্রটা তার অসম্পূর্ণতার জটিলতা নিয়ে যেন চীৎকার করচে তার শান্তি নেই। ফুল হ'ল লক্ষ্মীর বাহন, আর যন্ত্রটা হ'ল যক্ষরাজ কুবেরের; পাখী লক্ষ্মীর দরবারে গান গায়, আর ঐ যন্ত্রটা কুবেরের ভাণ্ডারে শিঙে ফুঁকতে থাকে।

* * * *

ঐ পাখীটার এই রিক্ত শাখার কয়েকটি ফুলের কত বড় গাম্ভীর্য্য ওরা যেন সিংহাসনে বসে' আছে। আর নির্লজ্জ যন্ত্রটা যেন ওদের কাছে ভাঁড়ামি করছে; ওরা ফিরেও তাকাচ্ছে না।

* * * *

লোকালয় আর প্রকৃতি গলাগলি ভাব করে আছে—কল আর প্রকৃতি কেবলি লড়াই করচে। কলটা আগে নম্র হোক, গাছের মত, পাখীর মত, তবেই প্রকৃতি তাকে নিজের ঘরের মধ্যে বরণ করে নেবে। নইলে কিছুতেই সন্ধি হবে না।

আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের হিন্দি বক্তৃতা*

আপকী সেবামে খড়া হোকর বিদেশীয় ভাষা কহুঁ য়হ হম্ চাহতে নহী। পর জিস্ প্রান্তমেঁ মেরা ঘর হৈ বহাঁ সভামে-কহনে-লায়েক হিন্দী কা ব্যবহার হৈ নহী।

মহাত্মা গাঁধি মহারাজকীভী আজ্ঞা হৈ হিন্দিমে কহনেকে লিয়ে। যদি হম্ সমর্থ হোতা তব ইস্‌সে বড়া আনন্দ ঔর কুছ হোতা নহী। অসমর্থ হোনে পর ভি আপকি সেবামে মৈ দো চার বাত হিন্দীমে বোলুংগা।

সারী রাহমে আপ্-সভোঁকা সমাদরকা স্বাদ পাতে পাতে হম আয়ে হৈঁ। হরেক ষ্টেশনমে বালবৃদ্ধবনিতা

---

* সমুদ্রের জাহাজ হইতে এই কয়খানি পত্রের টুক্‌রা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন।

* ১৯২০ সালের ২রা এপ্রিল ষষ্ঠ গুজরাতি সাহিত্য পরিষদের সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া পূজনীয় আচার্য্যদেব যখন গুজরাটে যান, তখন তাঁহার সহিত আমেদাবাদ ভাবনগর, বরোদা, সুরাট প্রভৃতি

হমকো সৎকার কিয়ে হৈঁ। মেরা ঘটতো পূর্ণ হোনেকো চলা হৈ পর পূর্ণ ঘটসে আবাজ তো নিকলনে চাহতী নহী। তোভী নিঃশব্দমে য়ানে খামোশ রহকর আপকী প্রীতিকা অর্ঘ্য গ্রহণ করূঁ ঐসী অসভ্যতাভী সহ সকুঁ কিস্ তরহ সে?

জো সভ সুবক্তা লোকসভাকে চবূতরা পর চঢ়কর আপনী ভাষাকে প্রবাহসে সর্ব্বসাধারণকে চিত্ত অনায়াসসে বহা লে জা সকতে হৈঁ ইতনা দিহ উন সভোঁ। পর মেরী ঈর্ষা য়ানে হসদ্ ন থী; আজ চাহতে হৈঁ কি যদি উনহকী ঐসী সহজ বাক্‌শক্তি হমারীভী হোতী, ঈশ্বর মুঝে দিয়ে হোতে তব্-বস্-য়হী সে ফৌরন মৈ নগদ আপকা করজা চুকা দেনে কী চেষ্টা কর়তে।

লে কিন্ মৈ সিফ কবি হুঁ। বাক্য তো মেরা কণ্ঠমে হৈ নহী হৈ দিল মে। মেরী বাণী ঐসা জলসামে বাহর হোনে তো চাহতী নহী, বহ রহতী হৈ ছন্দকা অন্দরমহলমে। উসী বাণীকী সাধনামে সারী জিন্দগী-ভর মৈনে নির্জ্জনবাসকো স্বীকার কর লিয়া হৈ, মৈ তো পৌরসভাকে যোগ্য নহী হো সকা হু। প্রকৃতি জিস্ নিভৃত জগহ মে অপনী ফুলোকো বিকসিত করতী হৈঁ, বহী মৈ গানেকে লিয়ে প্রভুকা আদেশ পায়া হুঁ। বহাঁসে অগর মুঝে জমায়ৎ মে কোই খীচ লে-আবে তব মৈ গূ-গা বন জাতা হুঁ, দিল ভর-জানে সেভী মুখ তো খুলনে চাহতা নহী। য়হী তো মেরী মুস্কিল হৈ। যবতক হম লোকালয় য়ানে ইন্‌সানোকে বতন সে দূরমে রহতা হু তবতক্ মেরা সুর বঁহা পৌঁছ সক্তা হৈ। সভোকে সামনে অগর মুঝে খীচা জায় তো মৈ বিলকুল গূ-গা বন জাতা হু।

মৈ গীত গানেওয়ালা চিড়িয়া ঐসা হু। পত্তোকে পরদে মে মেরা গীত হৈ—উবহী মেরা গীত ঘরো মে সব আদমীয়োকে পাস পৌহতা হৈ, পর আজ আপ সভোমে সমাদর করকে মুঝে সভাকে মঞ্চমে চড়া দিয়া হৈ।

ভ্রমণের সৌভাগ্য লাভ আমার ঘটিয়াছিল। যে অভ্যর্থনা প্রীতি ও সমাদর জন-সাধারণের কাছে তখন তিনি পাইয়াছিলেন তাহা অপূর্ব্ব—কাঠিওয়াড়ের ছোট বড় সমস্ত ষ্টেশনে দশ পনর মাইল দূর হইতে দারুণ গ্রীষ্মে দ্বিপ্রহরের সময়ও সম্রান্ত ঘরের পুরুষ মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া চাষী গৃহস্থরা পর্য্যন্ত একবার তাঁহার দর্শন লাভ করার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, দিনে রাত্রে এ জনতার বিরাম ছিল না। ফল, ফুল, মাল্য চন্দনের স্তূপে গাড়ীর কামরা ভরিয়া উঠিত। অসূর্য্যম্পশ্যা বধূরা শিশু সন্তানদের তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিতেন। সহরে পৌঁছিবার পর তাঁহার গাড়ী জোরে চলিবার উপায় থাকিত না, যাঁহার গৃহের সম্মুখ দিয়া মোটর যাইত তাঁহার বাড়ীর ছেলে মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে মাল্য চন্দন দিত, বধূরা আসিয়া বরণ করিতেন, কেহ বা নিজের হাতে কাটা রঙ্গীন সূতার মালা তাঁহাকে পরাইয়া দিতেন। কোনও মন্দিরের সম্মুখ দিয়া গেলে পুরোহিতেরা আসিয়া ধান্য দূর্ব্বা দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

বাংলা সাহিত্যকে অনুবাদের ভিতর দিয়া গুজরাতীতে প্রকাশের যে কাজ স্বর্গীয় নারায়ণ হেমচন্দ্র সুরু করেন আজিও তাহা পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বাংলার প্রতি গুজরাটের একটি অন্তরের টান আছে। পূজ্যপাদ ৺মহর্ষিদেব একবার আমেদাবাদে পদার্পণ করিয়া সেখানকার প্রার্থনা সমাজ মন্দিরে উপদেশ দেন, স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহুদিন আমেদাবাদে ছিলেন এবং বহুবার এই মন্দিরে গুজরাতি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, গুরুদেব তাঁহার প্রথম বয়সে সাবরমতীর তীরে সাহিবাসের বাংলায় কাটাইয়াছেন, সেখানকার পায়রা ও বোল্‌তা গুলি তাঁহার জীবন স্মৃতিতে অমর হইয়া রহিল, এ সকল কথা আনন্দ ও গর্ব্বের সহিত সেখানকার কত লোক যে বলিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না।

১৯২০ সালের ৬ই এপ্রিল কাঠিওয়াড়ের ভাবনগরে এই বক্তৃতাটি গুরুদেব দেন। ইহাই বোধ করি তাঁহার প্রথম হিন্দী বক্তৃতা। ইহার পরও তিন চার বার তিনি গুজরাটে হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়াছেন। ভাল করিয়া হিন্দী না জানা সত্ত্বেও বক্তব্য বিষয়টি ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা হিন্দীতে যে সেখানে সাধারণের অন্তরে সহজে এবং ঠিক মত প্রবেশ করিত, ইহা আমরা বারম্বার লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

আপ কবীকে পাস উমেদ করতে হৈঁ বক্ত তা, যানে বাঁসুরীকো চাহতে হৈ লগানে লাঠিকে কামমে। ইস লিয়ে যদি বহ কাম অচ্ছী তরহসে ন বনৈ তব বিধাতাকী নিন্দা কী জিয়ে। বহ মুঝে শক্তি বাট্‌নেকে সময়মে কৃপণতা কিয়া হৈ ; অগর বিধাতা মুঝে দিয়া কুছ হো তো দিয়া হৈ কবিত্ব—বোল্‌নেকী শক্তি নহী।

বিধাতাকী যহ কৃপণতা সে মুঝমে ভী দীনতা আ পহচী হৈ। সভামে খড়া হো করকে আপ লোগোঁকো অপার আনন্দ দেউঁয়া উপদেশ দেউঁয়া কামলায়ক বাতে কহূ ঐসা দাক্ষিণ্য দেখানে কা সৌভাগ্য মুঝে হুয়া নহী, দাক্ষিণ্য কেবল আপ লোগোঁকে তরফসে প্রকাশ হুয়া, মুঝে হার মান্‌নে পড়া।

বিনয়কে সাথ হার মাননে কো তৈয়ার হৈঁ, পর সিফ বচনকে হার, হৃদয়মে হম হার মানতে হৈঁ নহী। আপ লোগোঁকে সাথ যে প্রীতিকা সম্বন্ধ হুয়া হৈ, উস্ সম্বন্ধ মে মেরা দিল্ সে কুছভী কমী রহ গঈ যহ হম্ মান্‌তে নহী।

আপ লোগোঁসে জো প্রীতি জো সমাদর লাভ কর্ রহা হূ, উস্‌কো হম্ ঈশ্বরকে তরফসে অপ্রার্থিত দান সমঝ কর্ লে রহী হূ। ঈশ্বরকী দয়া আদমিয়োঁকি যোগ্যতা কা হিসাব করতী নহী। উনকী দয়াকে যোগ্য হোনেকী সাধনা করনা হী মেরা কৃত্য হৈ। অন্তরজামী জানতা হৈ কি বহ্ সাধনা মেরা দিল্ মে হৈ বহী মেরী কবিকী সাধনা।

পর কবীকী সাধনা হৈ ক্যা চীজ? বহ ঔর কুছ নহী বস্ আনন্দকে তীর্থমে রসলোকমে বিশ্বদেবতাকে মন্দিরকে অঙ্গনমে সর্ব্বমানবকা মিলন গান সে বিশ্ব দেবতাকী অর্চ্চা করনা। পৃথিবীকে সব মনুষ্যোকো হম কঁহা পাউ, শক্তিকী ক্ষেত্র জাহা লড়াঈ দিনরাত চল্ রহী হৈ, উস্ জগহমে, যা বাজারমে, জাহাঁ খরীদ্ ঔর বেচকা শোর ঔর কোলাহলসে কান বহরা হোগয়াহৈ—মনুষ্যাকা মিলন হোনা হৈ কিস্ জগহমে—শক্তিকী রাহমে, যা লাভকী রাহমে? সব রাহোঁকী চৌমুহানী পর কবীকী বাঁসুরী টেরসে যহ সুনাতী কি লিয়ে হৈ, কি জিস্ প্রেমকী রাহমে মুঝকো ঈশ্বর বুলা রহে হৈঁ, বহা জানেকা সম্বল হৈঁ, দুঃখকো স্বীকার করনা, আপ্‌নেকো ভরপুর দান করনা,— ঔর উস্ রাহকা পরমলাভ হৈ বহ্ জোহৈঁ মেরী পরমাগতি, মেরী পরমাসম্পৎ মেরা পরম লোক, ঔর মেরা পরম আনন্দ। ভগবানকে বহ চরণপদ্মমে সারা ভারতকা চিত্ত একহো জাবৈ যহী এক ভাব সারা দুনিয়াকে ঐক্যকী রাহ দিখ্‌লাবেগা।

যহ পৃথ্বী সুন্দর হৈ, যহ নীল আকাশ উদার হৈ, যহ সূর্য্যালোক পবিত্র হৈ। মনুষ্য জো জন্ম লিয়া হৈ, সো মার কাটকে মরনেকে লিয়ে নহী। যহ সুন্দর জগৎমে চিরসুন্দরকে স্পর্শলাভ করনেকে লিয়ে, যহ পবিত্র আলোকমে চিরপাবনকে আশীর্ব্বাদকো লাভ করনেকে লিয়ে। বহ ভারত অপনী তপোবনছায়ামে এক সময় যহ ঘোষণা সারা বিশ্বকো দিয়া হৈঁ—বহ ঘোষণা জব সে উন্‌কে কণ্ঠমে মলিন হো গয়া, তভী সে উস্‌কা দারিদ্র্য ঔর অপমান। ফির ভারতকো বহী তপস্যা লেনা হৈ। সারা দুনিয়াকে লিয়ে তপশ্চর্য্যা করনা হৈ। ক্যোঁকি দুর্দ্দিন আজ আ-পড়া হৈ। বিশ্ব বসুন্ধরা তাপিত হৈ ; শ্যামলা বসুধা শোণিতসে পঙ্কিল ঔর পাপসে মলিন হৈ। আজ ভারতকে চিরদিনকী সাধনাকা শূন্য আসন ফির গ্রহণ করনা হৈ। ব্রহ্মলোককী বার্ত্তা সর্ব্বত্র পৌছান হৈ।—

এষ সেতু বিধরণ অসম্ভেদায় লোকানাম্—নৈনম্ সেতুমহোরাত্রে তরতঃ ন শোকো ন জরা ন মৃত্যুঃ এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা অন্ধাসন্ অনন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি, উপতাপীসন্ অনুপতাপী ভবতি, সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

যহ সেতু সর্ব্ব লোকোঁকো ধারণ করনেকে লিয়ে হৈ, সম্ভেদকো দূর করনেকে লিয়ে হৈ ; অহোরাত্রি যহ সেতুকো লঙ্ঘন কর সক্তা নহী শোক জরা মৃত্যুই সকো লঙ্ঘন কর সক্তা নহী ইসকো পার হো করকে অন্ধ অনন্ধ হো জাতে হৈঁ, পাপী নিষ্পাপ হো জাতে হৈ, শোকার্ত্ত বিগতশোক হো জাতে হৈঁ, যহ ব্রহ্মলোক উদয়মাত্র ঔর অবসানকো প্রাপ্ত হোতা নহী।

শান্তিনিকেতন —— শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৮-শ বর্ষ } ১৩৩১ { অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ

মিলন

১

জীবন মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি'
সেখানে মিলে ছিনু সময় হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজি একা ভেসে'
কোথা সে কত দূর দেশে,
তরণী দুলিতেছে ঝড়ে,
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি'
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি॥

২

সেখানে বসেছিনু আপনা-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া ওঠে ঘাসে ঘাসে।

কিসের খুসি ওঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময়।
প্রাণের নিঃশ্বাস কি মহাবেগে
ছুটেছে দশদিকগামী।
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি॥

৩

বিজনে বসেছিনু আকাশে চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে।
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখিপাতে।
সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্ব হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী,
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি॥

৪

বুঝিনু কি আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে ;—
কেন যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে ;

অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি ;
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে ;
রজনী কি খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়-কামী
বুঝিনু, যবে দোঁহে পরাণ পণে
খেলিনু তুমি আর আমি ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীন ফিন্‌ল্যাণ্ড

পূজার ছুটী। দার্জ্জিলিং হইতে কার্সিয়ং যাইতেছি। সন্ধ্যাবেলায় লোকাল ট্রেণে চড়িয়া বসিয়া আছি। ষ্টেশনে লোকের যথেষ্ট ভিড়। সকলেরই প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ। কথাবার্ত্তা চলা ফেরার ভাব ভঙ্গীতে, চোখের চাহনিতে আনন্দের উত্তেজনা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। এখানে যেন দুঃখ বলিয়া কোনও জিনিষ নাই। আমার শরীর ও মন বড়ই শ্রান্ত ছিল। তাই চারিদিকের এই উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্য্য চাঞ্চল্যের মাঝখানেও স্বস্তি পাইতেছিলাম না। আমি জানালার একপ্রান্তে বসিয়া একান্ত মনে অনন্যদৃষ্টি হইয়া সহস্রশৃঙ্গ হিমাদ্রির স্মৃতিজীর্ণ এই ক্লান্তিবিহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা লক্ষ্য করিতেছিলাম। পর্ব্বতের পর পর্ব্বতশ্রেণী ঢেউয়ের পর ঢেউএর মত গিয়া দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে। কি বিরাট দৃশ্য! অদূরে—

"দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তার শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সাম গীত শব্দ হারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী ধারা।"

কতক্ষণ এইভাবে অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম বলিতে পারিনা। হঠাৎ আমার পার্শ্বে দাড়া পাইয়া ফিরিয়া দেখিলাম একটী ইউরোপীয় ভদ্র মহিলা আমার সামনের বেঞ্চিতে আমার ঠিক বিপরীত দিকে বসিবার আয়োজন করিতেছেন। ঘুরিয়া বসিলাম। বাহিরে দেখিলাম একটী ১৩।১৪ বৎসরের বালিকা মহিলাটীর সাথে আলাপ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক।

মুখখানি ম্লান এবং অনবরতঃ রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছে। আলাপের একবর্ণও বোঝা গেলনা। শুধু বুঝিলাম বালিকাটী মহিলাটীর কাছ হইতে একটা চুম্বন চায়; কিছুক্ষণ পরেই বালিকার মুখখানা ধরিয়া মহিলাটী তাহার গণ্ডদেশ এবং ওষ্ঠ দেশ চুম্বন করিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ের উপর হইতে কতকগুলি ইহারই সমবয়সী বালিকা রুমাল উড়াইতে ছিল। মহিলাটী স্মিত আননে রুমাল উড়াইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিলেন। বালিকাটী তখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, দেখিলাম বালিকাটীর টুপিতে ঘুরাইয়া লেখা আছে "ফিন্‌ল্যাণ্ড।"

পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরের দিকে গাড়ী উঠিতে লাগিল। আমিও আলাপ আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'আপনি কোথায় নামিবেন? মহিলাটী বলিলেন যে তিনি "ঘুমে" যাইতেছেন। ঘুম দার্জ্জিলিং এর পরবর্ত্তী ষ্টেশন। দার্জ্জিলিং হইতে প্রায় আরও দেড় হাজার ফিট উঁচু। তিনি বলিতে লাগিলেন যে তিনি "ঘুমে" প্রায় ৭ বৎসর ধরিয়া আছেন। জায়গাটী তাঁহার বেশ পছন্দ হইয়াছে। 'ঘুম' যেন ঠিক ঘুমন্ত পুরী। চিরকুয়াসাচ্ছন্ন স্থানটী যেন পাহাড়ের বুকে ঠিক শান্ত শিশুটীর মত ঘুমাইয়া আছে। ভারতবর্ষ কেমন লাগে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে এমন বিচিত্র দেশ তাঁহার চোখে আর কখনও পড়ে নাই। প্রকৃতির ভিতরে রুদ্র ও সুন্দরের এমন সহজ ও পরিপূর্ণ মিলন আর কোথাও তিনি দেখেন নাই। আলাপ জমিয়া উঠিল। বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "ফিন্‌ল্যাণ্ড"। বালিকাটীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তাঁহারই মেয়ে, দার্জ্জিলিং স্কুলে পড়ে। ছুটীর পর ওখানে বোর্ডিং এ পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন। উপরে যে সব মেয়েরা রুমাল উড়াইতেছিল সবাই ঐ বোর্ডিংএর ছাত্রী। তিনি প্রায়ই ঐখানে আসেন বলিয়া সবাই তাঁহাকে চেনে। উহার ভিতরে কেউ কেউ বা তাঁহার মেয়ের সহাধ্যায়িনী; বলা বাহুল্য আমাদের কথাবার্ত্তা সকলই ইংরাজীতে হইতেছিল। মেয়েটীর সাথে ষ্টেশনে ফিনিস্‌ ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল বলিয়া তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর কথা ইত্যাদি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম সব বিষয়ে বেশ খোঁজ খবর রাখেন। মহাত্মার সম্বন্ধে বলিলেন যে তাঁহার উপরে ইঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তারপর আরও বলিলেন যে মহাত্মা, মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের জীবনের একটা প্রতিকল্পিত মূর্ত্তি। উভয়ের অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধী হয়ত সকল বিষয়ে সফলকাম না হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার চিন্তার ধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে উদ্বুদ্ধ করিবে। আমি বলিলাম যে আপনাদের দেশ ত বিগত মহাযুদ্ধের ফলে স্বাধীন হইয়াছে। আপনারা এতদিন ত পরাধীন ছিলেন, আমাদের কথা আপনারা খুব সহজেই বুঝিতে পারিবেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন যে হাঁ, এতদিন রুসিয়ার

অত্যাচার আমরা যথেষ্ট সহ্য করিয়াছি। মাঝে মাঝে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত; বিধাতার অভিশাপ কাটিয়া গিয়াছে। এখন আমরা স্বাধীন; পৃথিবীতে উন্নতিকামী জাতির কথা শুনিতে ও ভাবিতে এখন বড়ই আনন্দ পাই আপনাদের আন্দোলনের ধারা আমি আগ্রহ সহকারেই লক্ষ্য করিতেছি। আমার মনে হয় আপনাদের এ আন্দোলন সুফল প্রসব করিবে। তারপর রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার কথা ও অন্যান্য আরো অনেক কথাপ্রসঙ্গ ক্রমে উঠিল। তাঁহাদের রাজনীতি, বড় বড় লোকদের কথা এবং সাধারণ ভাবে আরও অনেক কথার আলোচনা হইল। আমি কোথায় থাকি এবং কি করি জিজ্ঞাসা করায় সংক্ষেপে আমার বিষয় তাঁহাকে বলিলাম। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন যে তাহা হইলে আপনার কাছ হইতেই ত আমার দেশের সব খবর পাওয়া উচিত ছিল আমিত অনেকদিন দেশে যাইনি। কথা বলিতে বলিতে 'ঘুমে' আসিয়া পড়িলাম। মৃদু হাসিয়া কর মর্দ্দন করিয়া তিনি বিদায় লইলেন গাড়ী ছাড়িয়া দিল ফিন্‌ল্যাণ্ডের কথা ভাবিতে লাগিলাম। হয়ত কিছুদিন আগে ইহারা এতটা মাথা উঁচু করিয়া লোকের সাথে কথা বলিতে পারিতেন না। আর আজ সহজে ও সচ্ছন্দ চিত্তে নিজের ও দেশের কথা আলোচনা করিয়া আপনাদের মতামত নিঃশেষে ব্যক্ত করিয়া যাইতেছেন।

আসল কথা চাপাই থাকিয়া গেল। ভূমিকাটুকু বেশী হইলেও দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। এখন স্বাধীন ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিস্ময়কর কাহিনীটুকু সংক্ষেপে বলিয়া পাঠকবর্গের কাছ হইতে বিদায় লইব।

ফিনল্যাণ্ড ইউরোপের বাল্টিক সাগরের উপকূলস্থ একটা ক্ষুদ্র প্রদেশ। রুসিয়ার সম্রাট ফিনল্যাণ্ডের গ্রাণ্ড ডিউক ও সব ফিনল্যাণ্ড শাসন করিতেন। ইহার লোক সংখ্যা ৩৩, ৬৭, ৩৪২। আমাদের বঙ্গদেশের ময়মনসিংহ জেলার লোক সংখ্যা হইতে কিছু কম এবং রংপুর জেলার লোকসংখ্যা হইতে কিছু বেশী। সাধারণতঃ ৬টী ভাষা প্রচলিত। ফিনিস ভাষাই অধিকাংশের ভাষা। সুইডিস্, রাসিয়ান, জার্ম্মান এবং ল্যাপনিক ভাষা বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক লোকের ভিতর প্রচলিত। ফিনল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা ফিনল্যাণ্ড ও রুসিয়ার ভিতরে উভয়ের প্রতি উভয়ের দাবী দাওয়ার ব্যাপার, নিত্য বহু বিবাদ বিসম্বাদের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ফিনল্যাণ্ড যথাসম্ভব আপনাকে ইতি মধ্যে ধীরে ধীরে নিজের দায়িত্ব নিজেই সম্পূর্ণভাবে বহন করিয়া লইবার জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া লইতেছিল। রুষ গবর্ণমেণ্টের সাময়িক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ফিনল্যাণ্ডের দেয় অংশ ফিনল্যাণ্ড টাকার পরিবর্ত্তে সৈন্য পাঠাইয়া পরিশোধ করিবার প্রস্তাব করিল। রুসিয়া তাহাতে নারাজ হইয়া ফিনল্যাণ্ডের উপর ওই বাবদ একটা কর ধার্য্য করিয়া দিল। ইহা লইয়াই প্রথম গোলোযোগের সৃষ্টি হয়। ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভিতর অসন্তোষের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে রুসিয়ার গবর্ণমেণ্টের আদেশে ফিনল্যাণ্ডের শাসন পদ্ধতি একেবারে তুলিয়া লওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন জেনারলকে ফিনল্যাণ্ডের

ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। শৌমান নামক জনৈক ফিন তাঁহাকে হত্যা করে। হত্যা করিবার পূর্ব্বে সে রুসিয়ার সম্রাটের নিকট একখানি চিঠিতে ফিনল্যাণ্ডের উদ্ভিন্ন জাতীয় জীবনের দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা এবং আইনের শক্তি ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে নিজের মতামত লিখিয়া জানায়। সে জানিত যে তাহার পরিত্রাণ নাই। তাই দেশের জন্য নিজেকে আত্মোৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রিয় জন্মভূমির উপর সম্রাটের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গুটিকতক সহজ কথা চিঠিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে রুষ-জাপান যুদ্ধের পর রুসিয়ার আভ্যন্তরিক গোলোযোগের ফলে ফিনল্যাণ্ডের অনেকটা সুবিধা হইয়া গেল। জনতন্ত্রবাদী একদল লোকের সহায়তায় ফিনল্যাণ্ডে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রুস-সম্রাট তৎক্ষণাৎ এই লোকগুলিকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের আবেদন-নিবন্ধ সমুদয় সর্ত্ত গুলি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। নাম মাত্র রুসিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া ইহার পর হইতেই ফিনল্যাণ্ড ভিতরে ভিতরে স্বাধীন ফিনল্যাণ্ড ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। রুসিয়ার প্রধান মন্ত্রী ষ্টোলিপিন আভাষে ইঙ্গিতে সকল বুঝিয়া লইলেন। বিষমার্কের মত তিনি রুষিয়ার সবাইকে "রুষ" করিয়া লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ছোট ছোট বিভিন্ন জাতি গুলির বৈশিষ্ট্য মুছিয়া তিনি একটা বৃহৎ জাতি সংস্থাপন করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন। তাহাতে তাঁহার সকল উদ্দেশ্য সফল হইবে। এইরূপে এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ১৯১০ খৃঃ অব্দে সমগ্র রুস সাম্রাজ্যের জন্য একটা আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি প্রায় সমুদয় আভ্যন্তরিক ব্যাপারে রুসিয়ার আইন-সভাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপীল আদালত করিয়া তুলিলেন। ফিনল্যাণ্ডের আইন সভা বা মন্ত্রীসভা শুধু নামে খাড়া হইয়া থাকিল। পদে পদে ফিনল্যাণ্ডবাসিদের স্বাধীনতা আবার খর্ব্ব হইতে থাগিল। ফিনল্যাণ্ড আবার সাড়া দিয়া উঠিল। এবার সে মরিয়া হইয়া লাগিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ড, সে রুসিয়ার বিরুদ্ধে আর কি করিবে। ফিন শাসনকর্ত্তাগণ রুসিয়ার তৈরী আইন দ্বারা শাসন চালাইতে অস্বীকার করিলেন। বড় বড় ফিন বিচারকগণ ঐ আইন দ্বারা বিচার করিতে সম্মত হইলেন না। শাসনচক্র প্রায় অচল হইয়া উঠিল। রুসিয়ার আদালতে বিচারের প্রহসন হইয়া তাঁহাদের প্রতি কঠিন দণ্ডবিধান হইতে লাগিল। তাঁহারা হাসিমুখে দণ্ড বরণ করিয়া একে একে কারাগারে যাইতে লাগিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে সমগ্র ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ফিনল্যাণ্ড রুসিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর দিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে রুস সম্রাট সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করিলেন। রুসিয়ার সর্ব্বত্র গোলোযোগ চলিতে লাগিল। এদিকে ফিন্ল্যাণ্ডের রুসীয় গবর্ণর জেনেরল সিনের অত্যাচার মাত্রা দিন দিন এতই বাড়িয়া উঠিল যে অবশেষে ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে সমস্ত ফিন্ল্যাণ্ড রুসিয়ার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিল। সম্রাটের উপর যে ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল তাহা সমস্ত রুষ সাম্রাজ্যের উপর ছড়াইয়া পড়িল, সমগ্র

ইউরোপ ফিনল্যাণ্ডের এই আত্মসম্মান জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। ফিনল্যাণ্ডের মনের জোর সহস্রগুণ বাড়িয়া গেল।

ফিনল্যাণ্ডের ভিতর একদল লোক কতকটা স্বভাবতঃই কতকটা বা স্বার্থের জন্য রুশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। অন্যদিকে স্বাধীনতাকামী ফিনদল রুষ সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ফিনল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। এই আত্মকলহ অবশেষে আত্মসংঘর্ষে পরিণত হইল। বলশেভিক রুসিয়া সৈন্য এবং রসদ পাঠাইয়া এই গৃহবিবাদ মারাত্মক করিয়া তুলিল। জার্ম্মানি এই গৃহ বিবাদে বলশেভিক রুসিয়ার বিরুদ্ধে ফিন চরমপন্থি-দের সঙ্গে যোগদান করিল। ১৯১৮ খৃষ্ট অব্দে জার্ম্মান সেনানায়ক ভনডারগলজের সহায়তায় ফিনল্যাণ্ডের বুকের উপর বসিয়া রুশীয়া সৈন্য এবং ফিন ভলান্‌টিয়ার সৈন্যদ্বয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। জেনেরল ম্যানারহিম ফিন সৈন্য পরিচালিত করিতেছিলেন যুদ্ধে রুষ সৈন্য নিঃসংশয়রূপে পরাজিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষনা করিল।

এইবার ফিনল্যাণ্ডের শাসন প্রণালী কিভাবে চলিবে এই বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ হওয়ায় জার্ম্মাণী হইতে একজন 'রাজা' আমদানী করিয়া তাঁহার উপর শাসন-ভার প্রদান করিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। বিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার হাসিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য মিত্র শক্তিপুঞ্জের সহিত ফিনল্যাণ্ডের সম্পর্ক কি ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা হইতে হইতে ফিনল্যাণ্ডের নেতৃবর্গ স্থির করিলেন যে আর কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া এখন নিজেরাই নিজেদের দেখিবার ভার লইবেন। জেনেরল ম্যানারহিম, যিনি এ যাবৎ অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা থাকিয়া শাসন কার্য্য চালাইতেছিলেন, তিনি স্থির করিলেন যে ফিনল্যাণ্ডে সাধারণ-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। অবশেষে তাহাই ঠিক হইল। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ষ্টল-বার্গ ৬ বৎসরের জন্য ফিনল্যাণ্ড সাধারণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সোভিয়েট রুসিয়া অবশেষে ফিনলণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিল। ফিনল্যাণ্ড আজ ইউরোপের একটী স্বাধীন শক্তি। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আজ সে আপনাকে চিনিয়া লইয়াছে। বাস্তবিক জাতীয় আত্মবোধ জাগ্রত না হইলে শুধু সাময়িক উত্তেজনায় কোনো জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না। এই আত্মবোধই আত্মশক্তির মূল। স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছাই হউক সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেলেও এই জাতি জীবিতই থাকিবে। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে কত কত প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির এই জাগ্রত আত্মবোধ-লোপ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা, করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। কোথাও নিজেই নিজেকে হারাইয়া বসিয়া আছে। আবার কোথাও বা আঘাতে আঘাতে এই

ক্ষুদ্র জাতি গুলির বৈশিষ্ট্য আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইংলণ্ড এবং রুসিয়াতে বিদেশী জাতি আসিয়া ইংরাজ ও রুষ বনিয়া গিয়াছে। স্পেন আবার রোমান, গথ এবং মুরের অধীনে থাকিয়া জাতীয়তার প্রেরণা পাইয়াছে। এইভাবে ইটালী অষ্ট্রিয়ার অধীনে, বলকান তুর্কের অধীনে এবং জার্ম্মাণী নেপলিয়নের অধীনে আসিয়া আপনাদের আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে। ফলে প্রত্যেকেই আজ স্বাধীন। ফিনল্যাণ্ড ছয়শতবৎসরের পরাধীনতায়ও আপনাকে হারায় নাই।

ফিনল্যাণ্ড এখনই ক্রমশঃই শিল্পে বাণিজ্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মনের স্বাধীনতা এখন শতমুখ হইয়া তাহাকে কর্ম্মে প্রেরণা দিতেছে। কি ধর্ম্মনীতিতে, কি সমাজনীতিতে, কি রাষ্ট্রনীতিতে, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে সকলের অধিকারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজের অধিকারের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করার আকাঙ্ক্ষা মানব হৃদয়ের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। ইহার অনুশীলন দ্বারাই সে যথার্থ পরিপুষ্টি লাভ করে। যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে এই বাণীই ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। ইতিহাসের এই চিরপরিচিত সত্যে আত্মা হারাইয়া কত ধর্ম্ম, কত সমাজ, কত রাষ্ট্র যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে ইয়ত্তা নাই। এই ধর্ম্মের পরিবেষ্টন কি, ইহার গ্লানি কোথায় আরম্ভ, কোথায় মাত্রা পূর্ণ, ইহা লইয়া মূর্খ মানব কত মিথ্যা সূক্ষ্ম তর্ক সৃষ্টি করিয়া আপনার স্বার্থ-ম্লান দৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ খুঁজিয়া বাহির করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছে কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মানুষের মন যখন আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্ব্বত্র ব্যবধান রচনা করিতে থাকে তখনই তাহা কলুষিত হইয়া পড়ে। তখন তাহার আর এ বিষয় ভাবিবার অধিকার থাকে না।—চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া মনকে অবসন্ন করিতে লাগিল। হঠাৎ বাহির হইতে শুনিলাম "কার্সিয়ং, কার্সিয়ং"। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা। তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া এক ভুটিয়ালি কুলির মাথায় বাক্স বিছানা চাপাইয়া বলিলাম "হঠো পার্ব্বতী কুঠী, ডাউ হিলস্।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

সুন্দরতম

দেখি নাই উর্ব্বশীরে
তিলোত্তমা বুঝিনা কেমন
জানে শুধু মানস, নয়ন
তুমি ধন্য ধরণীরে
করিয়াছ রূপের প্রভায়,
ত্রিভুবন এত শোভা পায়
চরণের জ্যোতি তব চুমি,
প্রিয়তমে, কি সুন্দর তুমি।

কি সুন্দর সারা দেহ
কি সুন্দর তুটি আঁখি কালো
কি সুন্দর আমারে যে ভালো
বাস' তুমি, সব স্নেহ
সব প্রেম দিয়া ও বুকের
কি সুন্দর হাসি ও মুখের
কি সুন্দর প্রতি অঙ্গহার
কি সুন্দর, তুমি যে আমার।

ওগো, তুমি যে আমার
এর বাড়া গর্ব্ব কোথা কার
এর চেয়ে কোন্ অহংকার
মানবেরে বার বার
করে বড় দেবতার চেয়ে ?
তোমারে এ হৃদিমাঝে পেয়ে
যে অমৃত লভেছি ভুবনে
উঠেনি তা' সাগরমন্থনে।

প্রিয়ে, সাগর মন্থনে
সুধাবিষ দুই উঠেছিল

নীল কারো কণ্ঠে ফুটেছিল
মথি' তোমা, হে শোভনে
উঠিয়াছে পীযূষ কেবল
টল টল, রূপে ঢল ঢল
আদি মধ্য অন্ত সব ভরি
বহিয়াছে অমিয়-লহরী।

সখি, অমিয়-লহরী
তুমি মোর প্রেম-পয়োধির
লীলাময়ী, অবাধ, অধীর
গতি তব লো সুন্দরী
আনন্দের কিরণ সম্পাতে
ছায়া রৌদ্রে নিশীথে, প্রভাতে
স্নিগ্ধতার শীকরমাধুরী
ছড়াইয়া, খেলে লুকোচুরী।

হে প্রেয়সী, লুকোচুরী
পড়ে গেল সকলি যে ধরা
সাজে সই আর ছল করা?
রেখেছ যে বুকপূরি
মোর প্রীতি মোর অনুরাগ
আঁখি দুটি রহে যে সজাগ
দেখিবারে এই মুখখানি
মনোরমে, জানি তাহা জানি।

জানি আর ধন্য মানি
আপনারে ওগো নিরুপমা!—
সে গৌরবে তপন চন্দ্রমা
আলোকের নব বাণী
কহে মোরে, করি অনুভব
করি তুচ্ছ সকল বৈভব
যাচি শুধু ওই মুখ'মধু
ওগো তুমি আমারি যে বঁধু

আমারি যে, বঁধু, তুমি—
আছ, রবে, ছিলে চিরদিন
বক্ষে মোর বিলীন, নিলীন
মোর হিয়া-বৃন্তে তুমি'
আছ তুমি প্রেম-পদ্ম মম
কী সুন্দর, হে সুন্দর'তম!
কী সুন্দর তুমি মোর,
শুনিয়াছি বৈকুণ্ঠের রমা
সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি অনুপমা
হে আমার মনোচোর
কহে সবে বাণী বীণাপাণি
ত্রিভুবনে লাবণ্যের রাণী
আমি জানি, ভুল, সবভুল—
শুধু তুমি ত্রিলোকে অতুল।
ওগো, ত্রিলোক-অতুল
আমিও যে পরশে তোমার
ফুটিয়াছি মধুর আধার
সুষমার অপরূপ ফুল,
মিশাইয়া অন্তরে অন্তর
আমিও যে হ'য়েছি সুন্দর
আজি প্রিয়ে সুন্দরে সুন্দরে
একাকার হোল বিশ্বপরে।
হোক্ সখি একাকার
সুখে দুঃখে তোমায় আমায়
অধরের চুমায় চুমায়
সুন্দরে সুন্দরে আর
কোন দিন দ্যুলোকে ভূলোকে
প্রাণে মনে শোকে ও অশোকে
ভেদ যেন কিছু নাহি রয়
হোক্ জয়, উভয়ের জয়।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

এস্কিমো জাতির বিবরণ

উত্তর আমেরিকারও উত্তর ভাগে গ্রীন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রদেশের তুষার হিম বাত্যার রাজ্যে এস্কিমো জাতির বাস। প্রচলিত হিসাবে ইহারা আবহমান কাল হইতেই এই সকল হিম প্রদেশেই বাস করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিলাতের ভৌগলিক মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি (Ex-president of the Royal Geographical Society of London) Sir Clements Markham প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এস্কিমোদিগকে—ওঙ্কিলন (onkilon) নামে সাইবেরিয়ার এক প্রাচীন জাতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে মধ্যযুগে তাতার আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া এই জাতির শেষাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ উত্তর সাগরের অন্তর্গত New Siberian island নামক দ্বীপাবলীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সেখান হইতে বর্ত্তমানে অনাবিষ্কৃত পথে তাহারা Grinnell Land এবং গ্রীনল্যাণ্ডে (Greenland) আসিয়া পড়ে। উত্তর মেরু আবিষ্কারক Commander Pearyও এই মতেরই পোষকতা করেন, এবং তাঁহার এরূপ বিশ্বাসের কয়েকটি হেতুও নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন যে মঙ্গোলীয় জাতির বিশিষ্ট ছাপ ইহাদের মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়:—যথা গাত্রাবরণে পীত বর্ণের আভাস, চেপ্‌টা নাক, উন্নত হনু এবং চক্ষুর বক্রভাব। ১৮৯৪ সালে পেয়ারী গৃহিণী (Mrs Peary) যে এস্কিমো বালিকাকে দেশে লইয়া আসেন তাহাকে দেখিয়া চীনদেশীয় লোকেরা তাহাদের স্বজাতীয়া বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। প্রাচ্যজাতি সুলভ কতকগুলি বিশিষ্টতাও ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবেই পাওয়া যায়, যথা কার্য্য-কুশলতা, অনুকরণপটুতা ইত্যাদি। ইহারা প্রস্তর নির্ম্মিত যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহার সহিত সাইবেরিয়াতে প্রাপ্ত একপ্রকার গৃহাবশেষের খুবই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়।

তাহারা যে বিপদে আপদে মৃতাত্মার আবাহন করে তাহাও হয়ত জাপান চীন প্রভৃতি দেশের পূর্ব্বপুরুষ পূজার প্রথারই ধ্বংসাবশেষ মাত্র। সাধারণতঃ ইহারা চীনা এবং জাপানীদের ন্যায় খর্ব্বাকৃতি তবে মাঝে মাঝে দীর্ঘাকৃতি লোকও ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠাবয়ব, কাহারও কাহারও মাংসপেশীর পরিপুষ্টি অতি আশ্চর্য্যজনক কিন্তু অনেক স্থলেই ইহাদের শরীরে অতিরিক্ত চর্ব্বির আবরণে মাংসপেশীর বৈশিষ্ট্য লুক্কায়িত। কাহারও কাহারও মতে আমেরিকার আদিম অধিবাসী Red Indiansদের সহিতই ইহাদের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, সেই হিসাবে তাঁহারা ইহাদিগকে Red Indians দের জাতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

আদিম অবস্থায় উহারা যে স্থান হইতেই আসুক বর্ত্তমানে বহু শতাব্দী ধরিয়া

জাগতিক সভ্যতার দুরধিগম্য প্রদেশে প্রকৃতির রাজ্যে অভিনব আবেষ্টনের মধ্যে উহারা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই ইহারা এখনও শিশুর ন্যায় সরল প্রকৃতি, শিশুর ন্যায় কোন নূতন জিনিষ দেখিলে সে বিষয়ে ইহাদের কৌতূহলের সীমা থাকে না। একবার (Mrs Peary) মিসেস পেয়ারী যখন গ্রীনলণ্ডে যান তখন এক বৃদ্ধা এস্কিমো রমণী শুধু তাঁহাকে দেখিবার জন্যই একশত মাইল পথ পর্য্যটন করিয়া আসে। শিশুর ন্যায়ই ইহারা অতি সহজেই উল্লাসিত হয় এবং অতি সামান্য দুঃখের কারণেই অবসন্ন হইয়া পড়ে; আবার দুঃখ ভুলিতেও ইহাদের বেশীক্ষণ লাগে না— এমন কি মৃত্যুশোকও ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাটাইয়া উঠে। মোটের উপর ইহারা বেশ প্রফুল্লচিত্ত। হয়ত এই প্রফুল্লচিত্ততা প্রকৃতিরই বিধান, দেশের ওরূপ প্রাকৃতিক কঠোরতার মধ্যে এই জাতির টিকিয়া থাকাই সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ। ইহারা প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়া এখন পর্য্যন্তও প্রকৃতির উপরেই চির নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতির এখানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মূর্ত্তি নয়; এখানে চাষ আবাদ দূরে থাকুক দুই একটা ফুল পাতা দুই এক গাছি তৃণ দেখা যায় এমন স্থানও খুবই বিরল; শুধু তাই নয় জলও অনেক স্থানেই বরফ বা তুষার গলাইয়া সংগ্রহ করিতে হয়। জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্যের জন্য নির্ভর করিতে হয় একমাত্র শীকার-লব্ধ মৎস্য মাংসের উপর; আবার শীকার লব্ধ পশুচর্ম্ম হইতেই ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ এমন কি নৌকা এবং বাস করিবার জন্য তাঁবু পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য ইহারা প্রস্তর অথবা প্রস্তরাকারে খণ্ড খণ্ড বরফ দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু ইহারা স্থায়ী বাসিন্দা মোটেই নয়, অন্যান্য যাযাবর জাতির ন্যায় বোধ হয় খাদ্য সংগ্রহের সুখ সৌকর্য্যের অন্বেষণে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আদিম অবস্থায় প্রায় সকল জাতিই যাযাবর অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইত; এখন তাতার, তিব্বত, বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

এস্কিমোগণ অ-সভ্য হইলেও বর্ব্বর নয়। পেয়ারী সাহেব ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন ইহারা অ-সভ্য জাতি কিন্তু বর্ব্বর প্রকৃতি নয়; ইহাদের রাজসরকার নাই কিন্তু তাই বলিয়া অরাজক উচ্ছৃঙ্খল নয়। আমাদের আদর্শ অনুসারে ইহারা পুরাপুরি অশিক্ষিত। কিন্তু তবু ইহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায়। শিশু প্রকৃতি এই জাতি, শিশুর মতই ক্ষুদ্র ব্যাপারে খুসী হইয়া উঠিলেও সহ্য করিবার শক্তিতে ইহারা সভ্যজাতির পরিণত বুদ্ধি স্ত্রী পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, মানুষের আজীবন বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিয়া চলে। ইহাদের ধর্ম্ম নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো প্রকার ধারণা নাই, কিন্তু মুখের শেষ গ্রাস ক্ষুধিতের জন্য তুলিয়া দিতে ইহারা কুণ্ঠিত নহে। অসহায় ও বৃদ্ধের সেবা যত্ন ইহারা কর্ত্তব্য বোধেই করে। ইহারা

.কি জুয়া খেলাও ইহারা করে না। মোটের উপর ধরিতে গেলে জগতে এই জাতির একটা বিশিষ্টতা আছে।

বাস্তবিক পক্ষে ইহা খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে একটা জাতি পৃথিবীর ইতিহাস ও সভ্যতার আলোক না পাইয়াও এরূপ সাত্বিক ভাবে জীবন যাপন করিতেছে—অথচ ইহারা যাযাবর অবস্থার লোক, স্থায়ীভাবে একত্র অবস্থান করিয়া যে কোন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে এমনও নয়। সুতরাং ইহারা স্বভাবতঃই সৎ, শান্ত এবং সাত্বিক প্রকৃতির লোক ; বর্ব্বর-জাতি সুলভ হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা ইহাদের মধ্যে নাই। অনেক পর্য্যটকেরা আসিয়া প্রচার করিয়াছেন যে এস্কিমোরা শ্বেত জাতীয়দিগকে দেবতা বিশেষ বলিয়াই গণ্য করে, কিন্তু পেয়ারী সাহেবের মতে এরূপ উক্তি ভিত্তিহীন। এবং তাঁহার বিবরণে দেখা যায় যে কোন প্রকার অনুগ্রহ বা সাহায্য করিলে যেমন ইহারা কৃতজ্ঞ থাকে তেমনি কোন প্রকার প্রত্যাশা দিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে সে কথাও ইহারা ভোলে না। আবার অনেক বিবরণে ইহাদের প্রতি বর্ব্বরতা এবং নৃশংসতার আরোপ দেখা যায় কিন্তু Peary সাহেব ইহার বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন "এস্কিমোরা পশু প্রকৃতি নয় ; তাহারা ককেসিয়ানদের মতই মানুষ নামের যোগ্য।"

এস্কিমোরা শারীরিক শক্তিতে এবং কষ্ট সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর বর্ত্তমান আদিম জাতি সমূহের মধ্যে অদ্বিতীয়। ইহাদের সাহিত্য দূরে থাকুক লিখিত ভাষাও নাই কাজেই বর্ণমালাও নাই, ইহাদের কথিত ভাষা Agglutinative ধরণের অর্থাৎ মূল শব্দ সংগ্রহ খুব বেশী নয় কিন্তু এক একটা মূল শব্দের পূর্ব্বে বা পশ্চাতে প্রত্যয়াদি যোগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করা যায়, তবু ইহাদের ভাষা আয়ত্ত করা খুব কঠিন নয় ; এই সাধারণ ভাষা ছাড়া এক প্রকার সাঙ্কেতিক ভাষা ইহাদের আছে যাহা শুধু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেই আবদ্ধ –এই ভাষা উহারা বিদেশীয়দিগকে জানিতে দেয় না। ইহাদের যেমন সাহিত্য নাই তেমনই কলা হিসাবে কোন প্রকার শিল্প চর্চ্চাও নাই। ইহাদের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন নাই দ্রব্য বিনিময় দ্বারাই বিদেশীয়দের সহিত আদান প্রদান চলিয়া থাকে। ইহাদের নিজেদের মধ্যে আদান প্রদানের বড় একটা প্রয়োজনও হয় না কারণ ইহাদের মধ্যে সম্পত্তিতে সুবিধার জ্ঞানই প্রায় নাই। কোন প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও ইহাদের মধ্যে সামাজিকভাব এবং পরস্পরের প্রতি সহজ প্রীতির ভাব এতটা উৎকর্ষ প্রাপ্ত যে শীলমৎস্যের চেয়ে কোন বড় শিকার কেহ পাইলেই তাহা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় ; এরূপ ব্যবহার প্রয়োজনীয়তাও খুবই প্রত্যক্ষ কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সকল সময়ে শিকার সংগ্রহ করা বড় সহজ নয়। এমন দৃশ্য ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না যে, একটা লোক ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর অথচ তাহার প্রতিবেশীরা আকণ্ঠ পূরণ করিয়া ভোজন সমাধা করিতেছে। যদি কাহারও শিকারের অস্ত্রশস্ত্র না থাকে তবে কাহারও দুই প্রস্থ থাকিলে সেই ব্যক্তি এক প্রস্থ তাঁহাকে দিয়া দেয়। ইহাদের শিকারের অস্ত্রশস্ত্র

খুবই আদিম অবস্থার পরিচায়ক, তীর, ধনুক, বর্ষা. ইত্যাদি ; ধনুকের গুণ পশু চর্ম্মাদি দ্বারা নির্ম্মিত। পিয়ারী তাঁহার অভিযানে গিয়া অনেককে বন্দুক ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আসিয়াছেন ; ইহাতে এই জাতির প্রভুত উপকার সাধিত হইয়াছে কারণ মৎস্য মাংস শিকারের উপরেই ইহাঁদের জীবন ধারণোপযোগী খাদ্য এবং পোষাক সংগ্রহও নির্ভর করে ; কাজেই- শিকার সুলভ না হইলেই ইহাদের খাদ্যাভাব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের মধ্যে আতিথেয়তাও বেশ পরিস্ফুট দেখা যায়। অন্যান্য যাযাবর জাতির ন্যায় ইহারাও তাঁবু লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু ইহারা আবার স্থানে স্থানে বরফ অথবা প্রস্তরাদির দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াও লয় : এই গৃহ সমূহ ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও এগুলি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হয়। এক পরিবার বা একদল চলিয়া গেলে অন্য পরিবার বা অন্যদল আসিয়া আবশ্যক মত এই সকল গৃহে আশ্রয় লয়। বর্ত্তমান যুগের Socialism এর আদর্শ যেন ইহাদের স্বভাবজাত।

ইহারা এখনও প্রাকৃতিক অবস্থায় আছে বলিয়াই ইহাদের জীবনযাত্রাও এরূপ প্রণালীতে চলিতেছে ; সকলদিক বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে এই ধারাই ইহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। অনেকের মনে ইহাদিগকে সভ্য সমাজের জীবন প্রণালীতে দীক্ষিত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। এরূপ প্রচেষ্টায় ফল যে কি হইবে তাহারও একটা ধারণা করা খুব কষ্ট কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। ফলে ইহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়া স্বার্থপরতা পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি সভ্যজাতি সুলভ চরিত্র-দৌর্ব্বল্য ত আসিবেই, কেহ কেহ আশঙ্কা করেন যে ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া সভ্যদেশে লইয়া আসিলে ইহারা অনভ্যস্ত আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া শরীর রক্ষা করিতে না পারিয়া হয় ত সমস্ত জাতিটাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ; কারণ দেখা গিয়াছে যে ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ বিষয়ে ইহারা খুব দুর্ব্বল এবং রোগ প্রবণ। ইহাদিগকে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাবে Peary সাহেব বলেন যে ইহাদের খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করা অসম্ভব ; কিন্তু বিশ্বাস, আশা ও করুণা এই তিনটি ঈশ্বর প্রসাদ তাহাদের অন্তরে বর্ত্তমান আছে, নহিলে তাহারা কখনও ছয়মাস ব্যাপী রাত্রি কাটাইয়া এবং তাহাদের দেশের অন্যান্য বহুদুঃখ সহিয়া টিকিয়া থাকিত না। পিয়ারী সাহেবের মত যাহাই হউক এ বিষয়ে খৃষ্টিয় মিশনারীর চেষ্টার ক্রটী নাই, তাহাদের অক্লান্ত চেষ্টা অবশেষে সার্থকতাও লাভ করিতেছে।

ইহারা আদিম অবস্থায় পড়িয়া রহিলেও বুদ্ধিবৃত্তিতেও যে অপরিণত এমন মনে করিবার হেতু নাই ; কারণ পোষাক পরিচ্ছদ এবং তাঁবু নৌকা প্রভৃতি সাজ সরঞ্জাম এবং গৃহ নির্ম্মাণে ইহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। পিয়ারী সাহেব যখন ইহাদিগকে অভিযানের কর্য্যে লাগাইয়া ছিলেন তখন অপূর্ব্ব পরিচিত নানা প্রকার অস্ত্রসস্ত্র সাজ সরঞ্জামের ব্যবহার প্রণালী ইহারা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া

লইয়াছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহেবের অভিপ্রায় আয়ত্ত করিয়া লইয়া নানাভাবে তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল। বস্তুতঃ ইহাদের সাহায্য না পাইলে এখন পর্য্যন্তও উত্তর মেরু আবিষ্কৃত হইতে পারিত কিনা সন্দেহের বিষয় —

এস্কিমোদের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক; এইজন্য মেয়েদের বিবাহ অল্পবয়সেই হইয়া যায়। অনেক স্থলে বার বৎসরের সময়। অনেক ক্ষেত্রে সন্তানেরা অল্পবয়স্ক থাকিতেই পিতামাতা তাহাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখে, কিন্তু পরে তাহারা বড় হইলে পুর্ব্বোক্ত বিবাহ সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়াও নিজেরা ইচ্ছামত যে সে স্থলে বিবাহ করিতে পারে। যদি একাধিক ব্যক্তি একই রমণীর পাণী-প্রার্থী হইয়া দাঁড়ায় তখন বাহুবলের বিচারেই এই সমস্যার মীমাংসা হয়। বিবাহ ইহাদের মধ্যে আজীবন সম্বন্ধ নয়। বিবাহের পরে যে কোনও সময় যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহারা একে অন্যের উপযোগী নয় তখন তাহারা এই দাম্পত্য সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামত অন্যস্থলে গিয়া বিবাহ-বদ্ধ হয়, এইরূপে যতবার ইচ্ছা দাম্পত্য সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, Peary সাহেবের এস্কিমো বিবরণে আছে যে তিনি অনেকবার গিয়া তাঁহার পুর্ব্ব পরিচিত লোকদের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়াছেন। স্বামী পত্নীত্যাগ করিতে হইলে শুধু এইমাত্র বলে যে তাহার গৃহে ঐ পত্নীর জন্য আর স্থান নাই। পত্নী তখন পিতা মাতার নিকট ফিরিয়া যায় অথবা কোন ভ্রাতা বা ভগ্নীর নিকট যায়, অথবা নিজ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে খবর পাঠায় যে সে স্বাধীন হইয়াছে এবং এখন হইতে আবার নূতন করিয়া জীবন যাপন করিতে অভিলাষী, এই সব স্থানে স্বামী ইচ্ছামত সন্তানের মধ্যে একটি একাধিক অথবা সকল কয়টিকেই রাখিতে পারে; স্বামী না রাখিলেই পত্নী ইহাদিগকে লইয়া যায়। এস্কিমোদের সন্তানাদি বেশী হয় না সাধারণতঃ দুটি তিনটি মাত্র। সুইডেনের স্বনাম ধন্য ইবসেন (Ibsen) তাঁহার পুতুলের ঘরে (Dolls House) এবং তাহার অনুবর্ত্তী কোন কোন লেখক তাঁহাদের রচনায় এমন কি বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকেরা যে স্বেচ্ছাতন্ত্র বিবাহের চিত্র আঁকিতেছেন এতকাল পর্য্যন্ত তাহা সাহিত্যের পৃষ্ঠায়ই দেখিয়া আসিতেছিলাম। এখন দেখিতেছি তাহা সত্য সত্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে, অজ্ঞানান্ধকার এবং প্রাকৃত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন তথা কথিত বর্ব্বর জাতির মধ্যে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহারা আবার ইবসেনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বিবাহের স্বেচ্ছাতন্ত্রতা তথা স্বেচ্ছাচারিতা এতটা অগ্রসর যে কোনও ব্যক্তি একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পাণিপ্রার্থী হইয়াও দাড়াইতে পারে, এবং সে প্রার্থনা যথারীতি গ্রাহ্য লইবার পক্ষেও কোন সামাজিক বাধা নাই। সেই ব্যক্তি উক্ত রমণীর নিকট গিয়া দাঁড়াইলে স্বামী হয় বাহুবলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবে, অথবা পত্নীকে আগন্তুকের জন্য ছাড়িয়া দিবে, বলিয়া রাখা ভাল এসব ক্ষেত্রে বাহুবলের পরীক্ষার অর্থ দ্বন্দ্বযুদ্ধ নয়, শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতা মাত্র। কারণ পুর্ব্বেই

বলা হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে হিংসা প্রবৃত্তি নাই। প্রথা হিসাবে এরূপ বর্ব্বরতার মধ্যেও এইরূপ হিংসা প্রবৃত্তির অভাব খুবই সংযম এবং সাত্ত্বিকভাবের পরিচয় বলিতে হইবে।

ইহাদের মধ্যে পত্নী স্বামীর সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু যতবারই বিবাহ হউক পত্নী কোনও ক্ষেত্রে পতির নাম, গোত্র বা উপাধি গ্রহণ করে না, সন্তানেরাও পিতামাতাকে নাম ধরিয়াই ডাকে, কোন কোনও ক্ষেত্রে খুব ছোট শিশুদের সংক্ষিপ্ত আহ্বান বাক্যে "মা" শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। এস্কিমো রমণীরা গৃহকর্ম্মে সু-নিপুণা বলিয়াই বোধ হয় Peary সাহেব যে অভিযানে উত্তর মেরু আবিষ্কার করেন সেই অভিযানে তাঁহার সঙ্গী এস্কিমো রমণীগণ জাহাজে অবস্থানকালে এবং পরেও অভিযান যাত্রার জন্য বহু পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল, যে সব স্থানে এই অভিযান যাত্রার নির্দ্দিষ্ট পথ আছে সেই সকল পথের ধারে ধারে কতকদূর অন্তর অন্তর কতকগুলি গৃহ অদ্যাপি আছে, যখন যেদিন এই পথে চলে তখন তাহারাই এই সকল গৃহে আশ্রয় লয়, এই সকল স্থায়ী গৃহ গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। এক একটি ঘর সাধারণতঃ ৬ ফুট উচ্চ, ১০-১২ ফুট দীর্ঘ এবং আট দশ ফুট প্রশস্ত, মাটিতে গর্ত্ত কাটিয়া ঘরের ভিত্তি ভূমি প্রস্তুত হয়, তাহার চারিদিকে প্রস্তরের দেওয়াল, খণ্ড খণ্ড প্রস্তর এবং মাটির গাঁথুনিতে তৈয়ারী দেওয়ালের উপরে লম্বা চ্যাপ্টা প্রস্তর খণ্ড বসাইয়া lever প্রথায় ছাদ নির্ম্মিত হয়। ছাদের প্রস্তর সজ্জার উপরে মাটির স্তর ফেলিয়া সমস্তটা ঢাকিয়া দিতে হয়, আর সমস্ত ঘরের চারিদিকে তুষার চাপাইয়া দিয়া ঘরটাকে মজবুত করিয়া রাখা হয়। ঘরের দরজা প্রস্তুত হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া দশ পনর অথবা ২৫ ফুট পর্য্যন্ত একটা সুরঙ্গ করিয়া প্রবেশ পথ তৈয়ারী হয়, ঘরের সম্মুখ ভাগে একটা ছোট জানালা থাকে, এই জানালার জন্য পর্দ্দা তৈয়ারী হয় সীল মৎস্যের অন্ত্রস্থ পাতলা পরদা (Intestinal membrane) কয়েকখানা একত্র করিয়া সেলাই করিয়া, ঘরের আলো এই পর্দ্দা ভেদ করিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত গৃহাভিমুখী পথিকদিগকে ঘরের সান্নিধ্য জানাইয়া দেয়। এরূপ এক একটি ঘর এক মাসের মধ্যেই তৈয়ারী হইতে পারে। এই ঘর গুলি এত মজবুত হয় যে ছাদটা মাঝে মাঝে মেরামত করিয়া লইলে একটা ঘর হয়ত সাত বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

ঘরে প্রবেশ করিলে একেবারে শেষভাগে বিছানা, বিছানার জন্য প্রায় ১।।০ ফুট উচ্চ একটা বেদী প্রস্তুত হয়; সাধারণতঃ মূল মৃত্তিকা ভূমিই এই বেদীর কাজ করে, ঘরের অবশিষ্টাংশের মাটি কাটিয়া মেজে তৈয়ারি হয়। কোন কোন স্থানে প্রস্তর দ্বারা এই বেদী তৈয়ারী হয়। বিছানার ধারে একটী বড় প্রস্তরের উপরে সারা দিনরাত্রি এক বাতি জ্বলে; বাতি অর্দ্ধ প্রস্তরের আধারে সীলমৎস্যের চর্ব্বি জ্বালান হয়; এই বাতি হইতেই রন্ধন এবং ঘরের উত্তাপ রক্ষাও চলে। তথায় বাতি জালিবার অগ্নির জন্য পাথরের চকমকিই (Flint

and steel) এতকাল ব্যবহৃত হইত, এখন কোন কোন স্থানে Peary সাহেবের মারফতে তাহারা দেয়াশলাই এর ব্যবহারও ঠিক পাইয়াছে। উহারা বাতির দিকে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করে, যেন আবশ্যক মত ঘরের গৃহিণী বাতির তদারক করিতে পারে, এক ঘরে দুই পরিবার থাকিলে হয়ত আর একটী বাতিও জ্বলে, এই সকল ঘরের তাপমান বিছানায় এবং ছাদের দিকে ৮০।৯০ পর্য্যন্ত ওঠে, মেঝেতে হয়ত তুষার সীমা (Ereezing point) পর্য্যন্ত নামে, ঘরের ছাদের মাঝখানে বায়ু চলাচলের জন্য ক্ষুদ্র একটী ছিদ্র পথও থাকে।

গ্রীষ্মকাল আসিলে প্রস্তরের এবং মাটীর ঘরও স্যাঁতসেতে হইয়া পড়ে, তখন ঘরের ছাদ খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরটা শুকাইয়া লওয়া হয়। এই সময়টা (জুন মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত) ইহারা সপরিবারে তাঁবুতে বাস করে। তাঁবুগুলি সীলমৎস্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত, চর্ম্মের লোমশ দিকটা ভিতরে থাকে। এক একটা তাঁবুর জন্য ১০_২ খানা সীলমৎস্যের চামড়া সেলাই করিয়া লওয়া হয়, তাঁবুর মেঝের পরিমাপ হয় ৮।১০ ফুট লম্বা, ৬-৮ ফুট প্রশস্ত, তাঁবুর ভিতরেও সেইরূপ বিছানার বন্দোবস্ত হয়। সেইরূপই বাতি জ্বলে।

অস্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য ইহারা একপ্রকার বরফের ঘরও তৈয়ারী করে, যেমন অস্থায়ী বন্দোবস্ত তেমনই এইরূপ ঘর তৈয়ার করাও বিশেষ সময় সাপেক্ষ নয়, চারিজন চতুর লোকে চেষ্টা করিলে এক ঘণ্টার মধ্যে একটি ঘর তৈয়ার করিতে পারে, বরফ কাটিবার জন্য একরূপ ছুরি আছে, প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা একদিকে ধার অপরদিকে করাতের ন্যায় দাঁতওয়ালা প্রথমতঃ সকলেই এইরূপ এক একখানা ছুরি লইয়া প্রস্তরাকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া বরফ কাটিতে থাকে—এক একটি খণ্ড লম্বায় ২-৩ ফুট, উচ্চতায় ২ ফুট এবং পুরু হয় কয়েক ইঞ্চি হইতে অবস্থানুসারে আরও বেশী। বরফখণ্ড কাটা হইয়া গেলে একজন স্থান নির্ণয় করিয়া মাঝখানে দাঁড়ায় আর সকলে তারপর চারিদিকে বরফখণ্ডসমূহ আনিয়া হাজির করে; সেই ব্যক্তি মাঝখানে দাঁড়াইয়া বরফ খণ্ডগুলি লইয়া চারিদিকে দেওয়াল গাঁথিয়া তুলিতে থাকে। বহা বাহুল্য প্রথম স্তরের প্রস্তরগুলি বেশ বড় থাকে পরে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর ব্যবহার করা হয়। প্রস্তরখণ্ড কাটিবার সময় সবগুলিই ভিতরের দিকে একটু বাঁকা করিয়া কাটা হয় পরে প্রস্তরের উপরে পরের স্তর প্রস্তর বসাইবার সময় প্রত্যেকটি স্তরই ভিতরের দিকে একটু কাৎ করিয়া বসান হয়, ফলে সমস্ত ঘরটা কোনাকার (Conical) হইয়া উঠিতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে ছাদের উপরে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। ঘরের ভিতর হইতে সেই লোকটিই এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া কাৎ করিয়া একটি বরফখণ্ড উঠাইয়া ধরিয়া হস্তকুশলতায় ঐ প্রস্তরটি বসাইয়া ছাদের কার্য্য শেষ করে। ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য দেয়ালের গায়ে নীচের দিকে একটা ছিদ্রপথ কাটিয়া দেওয়া হয়। ঘরের মেঝের পরিমাপ হয় সাধারণতঃ ৫—৮ বর্গফুট হইতে ৮—১০ বর্গফুট পর্য্যন্ত।

আহার্য্যের জন্য শিকার করিয়া মৎস্য এবং সীল সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল নিহত পশুর চামড়া হইতে পোষাক পরিচ্ছদ এবং বিছানা তৈয়ারী হয়। পোষাক তৈয়ার

করিতে পশুচর্ম্মের বিভিন্ন খণ্ড সেলাই করিবার জন্য সুতার পরিবর্ত্তে নিহত পশুর তন্তুই ব্যবহৃত হয়। আর সুচের কাজ হয় কোনো পশুর হাড় দ্বারা। এস্কিমো রমণীরা এই কর্ম্মে খুব নিপুণ। ইহাদের পোষাক অনেকটা দেখিতে হয় তিব্বতীয় বা ভুটানীদের মত। ইহারা স্বভাবতঃ বড়ই অপরিষ্কার। স্নান ইহারা কস্মিনকালেও করেনা—এই ক্ষেত্রে তিব্বতীয় বা ভুটানীদের সহিত ইহাদের খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়; শীতকালে বরফ বা তুষার না গলাইলে জলও ইহারা পায় না। যদি গাত্রাবরণে অতিরিক্ত ময়লা জমিয়া অস্বস্তিকর বোধ হয় তখন ইহারা একটু তেল মাখিয়া শরীরের ময়লা উঠাইয়া ফেলে।

ইহারা সাধারণতঃ বেশ সুস্থকায় কিন্তু বাত এবং ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ ইহাদের মধ্যে প্রবল; বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিশেষতঃ রমণীরা এক প্রকার হিষ্টিরিয়া ব্যারামেও ভোগে।

ইহাদের জীবনযাত্রা প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক অবিশ্রাম সংগ্রাম; আহারোপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করা এক সংগ্রাম; শীতবাত হইতে শরীর রক্ষা করাও এক কঠোর ব্যাপার। আবার যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেও এমনই সংগ্রামের মূর্ত্তি লইয়াই আবির্ভূত হয়, কাহারও মৃত্যু হয় নৌকাডুবিতে, কাহারও মৃত্যু পদস্খলনে, কাহারও মৃত্যু তুষার পর্ব্বত ধ্বসিয়া পড়াতে; বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত (৬০ বৎসরের উপরে) বাঁচিয়া থাকা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।

প্রকৃতির নিকট হইতে ইহারা এমন শুভপ্রদ কিছু লাভ করে নাই যাহার জন্য কোন ফলদাতা বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতার ভাব আসিবে, বোধ হয় এই জন্যই কোন মঙ্গলময় বিধাতার কল্পনা ইহাদের মধ্যে স্থান পায় নাই বরং এখানকার প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে সারাজীবন তাহাদিগকে সংগ্রাম করিয়া কাটাইতে হয় বলিয়াই তাহারা মনে করে যে তাহাদের চারিদিকে শত্রুতা সাধন করিবার জন্য অসংখ্য অশরীরি আত্মা নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই সব দুর্ব্বৃত্ত আত্মাদের নায়ক হইলেন টরনারসুক (Tornarsuk)।

দুর্বৃত্ত আত্মাধিপতি এই টরনারসুককে ইহারা সারাজীবনই সমীহ করিয়া চলে। শিকার পাইলে প্রথমেই টারনারসুক্‌কে কিছু উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। বরফের ঘর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় তাহারা ঘরের সম্মুখভাগটা পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আসে যেন কোন দুর্বৃত্ত আত্মা এই ঘরে আশ্রয় লইতে না পারে। কোন পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবার সময় তাহারা, পোষাকটিকে এমন ভাবে ছিঁড়িয়া ফেলে যে কোন দুর্বৃত্ত আত্মা যেন সেই পোষাক ব্যবহার করিতে না পারে; মনে হয় যেন কোন দুর্বৃত্ত আত্মা একটু আরামে থাকিতে পারিলে আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। হঠাৎ কোন কারণ বিনা কুকুর ডাকিয়া উঠিলে ইহারা মনে করে যে টরনারসুক অদৃশ্য অবস্থায় নিকটে কোথায়ও আছে। তখন ইহারা বাহিরে আসিয়া চাবুক ঘুরাইয়া বন্দুক ছুড়িয়া দুরাত্মাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। বায়ুর গতিতে ইহারা অনেক সময় মনে করে যে টরনারসুকই

কথা মনে করাইয়া দেয়। যাত্রাপথে হঠাৎ আসিয়া হয়ত একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করে—টরনারসুক কি বলিয়া গেল শুনিতে পাইলে কি ?

পিতৃপুরুষদের শুভ আত্মাদের সহিতও যে ইহারা সম্পর্ক শূন্য এমন নয়। শীতবাত্যা বা বরফের দুর্য্যোগে সকল প্রকার অবস্থা বিপর্য্যয়েই তাহারা পিতৃপুরুষদের অশরীরি আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করে।

আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের মধ্যে কোন দলপতি নাই। দলের মধ্যে এক ব্যক্তি থাকে যে চিকিৎসবের কাজ করে, তাহার একটু প্রভাব প্রতিপত্তিও দেখা যায়। চিকিৎসকের কোন প্রকার ঔষধ পত্র নাই ; কোন কোন স্থানে খাদ্য সম্বন্ধে নিষেধের ব্যবস্থা আছে যেমন এক বা একাধিক পক্ষকালের জন্য রোগী সিল মৎস্য বা হরিণের মাংস খাওয়া হইতে বিরত থাকিবে, ঔষধের পরিবর্ত্তে কখন কখন চিকিৎসক নিজে সমাধিস্থ হইয়া রোগ আরোগ্য করে, তাহার অন্যবিধ প্রক্রিয়া হইতেছে স্বরসংযোগে এবং বাদ্যযন্ত্রসংযোগে মন্ত্রোচ্চারণ এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী। ইহাদের একমাত্র বাদ্যযন্ত্র বালরাসদন্ত (walrus ivory) বা হাড়ের ফ্রেমের উপরে সিন্ধু-ঘোটকের (walrus) গলনলীর পরদায় প্রস্তুত একপ্রকার Taambourine ; আর একখণ্ড জলহস্তীদন্ত বা হাড় দ্বারা Tambourine এর কিনারায় আঘাত করিয়া তাল রক্ষা করা হয়। এস্কিমোদের সঙ্গীত চর্চ্চা বা বাদ্যযন্ত্র চর্চ্চা ঐ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ।

চিকিৎসকেরাই আবার ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের সংবাদ প্রচার করে, তাই ইহাদের কেহ বড় সুনজরে দেখে না। এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে একজন দৈবজ্ঞ অতিমাত্রায় ভবিষ্যৎ মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়া লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল ; ফলে সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে লইয়া শিকার করিতে বাহির হইল—এই যাত্রাই দৈবজ্ঞের পক্ষে অগস্ত্যযাত্রা হইল। এরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্য খুবই বিরল। কোন কোন স্ত্রীলোককেও এই দৈবজ্ঞ এবং চিকিৎসকের ক্ষমতা লাভ করিতে দেখা যায়।

মৃত্যুর পর ইহাদের সৎকার ব্যবস্থাটা বেশ সহজ। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ যথাসম্ভব পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া দুই একটা অতিরিক্ত পোষাক সঙ্গে দিয়া বিছানার সমস্ত চর্ম্মাবরণ এবং তাহার উপরে একটা রশিদ্বারা জড়াইয়া বাঁধা যায়। উহারা মৃতদেহ স্পর্শ করাটা পছন্দ করে না কাজেই ঐ রশি ধরিয়া sledge টানিবার মত করিয়া টানিয়া লইয়া যায়, ঘর বা তাঁবু হইতে বাহির করিবার সময় এবং গন্তব্য স্থানে যাওয়া পর্য্যন্ত শবদেহের মস্তক সম্মুখের দিকে রাখা হয়। নিকটতম যে কোন স্থলে যথেষ্ট প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায় সেই স্থানে গিয়া শবদেহ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়া আসে যেন শিয়াল কুকুর বা শকুনিতে বিধ্বস্ত না করে। ইহারা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ; আত্মার অস্তিত্ব অর্থ ইহাদের নিকট ব্যক্তির অস্তিত্ব আর পরলোক অর্থ এই পার্থিব জগতেরই একটা দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র, যেখানে মৃত ব্যক্তি আবার পার্থিবভাবে জীবনযাপন করিবে।

কাজেই মৃতব্যক্তির সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পার্থিব সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তিও তাহার সঙ্গেই দিয়া দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তি শিকারী হইলে তাহার sledge, নৌকা তাহার অস্ত্র শস্ত্র এমন কি তাহার কুকুরগুলি পর্য্যন্ত দম বন্ধ করিয়া হত্যা করিয়া তাহার সহিত সমাহিত হয়। এ বিষয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পৌরাণিক প্রথার সতিত ইহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়; শুধু তাহাদের মত ইহারা মৃতের পত্নীকে সহমরণে পাঠায় না। মৃতব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে তাহার বাতি, চর্ব্বি, দেয়াশালাই, সেলাই করিবার যন্ত্রপাতি এবং বরফ গলাইয়া জল সংগ্রহ করিবার জন্য একটি পাত্র পর্য্যন্ত মৃতদেহের সহিত সমাহিত হয়। মৃত রমণীর শিশু সন্তান থাকিলে তাহাকেও গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া ঐ সঙ্গে সমাহিত করা হইত। বর্ত্তমানে Peary সাহেব গিয়া স্থল বিশেষে এই প্রথার অনেকটা উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন।

তাঁবুর ভিতরে কাহারও মৃত্যু হইলে সেই তাঁবু আর কেহ ব্যবহার করে না; তাঁবু ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়। কালক্রমে উহা পচিয়া ছিঁড়িয়া বা উড়িয়া চলিয়া যায়। কোন ঘরের ভিতরে মৃত্যু হইলে সকলে সেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বহুদিন পর্য্যন্ত সেই ঘর আর কেহ ব্যবহার করে না। মৃত্যুর পরে মৃতব্যক্তির স্বজনেরা খাদ্য এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করে আর বিশেষ কথা এই যে মৃতব্যক্তির আর কেহ উল্লেখ করে না। যদি দলে আর কাহারও সেই নাম থাকে তবে তাহার নাম বদলাইয়া অন্য নাম রাখা হয়; পরে সে দলে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে সেই নাম দেওয়া হয়, তখন সে নামের যত কিছু দোষ কাটান যায়। ইহাতে মনে হয় যে অনেক ভাবী শিশু সন্তানের নাম পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এস্কিমোরা আমোদ আহ্লাদে যেমন শিশুর মত তরলমতি মরণ বা মৃত্যু শোকেও ইহারা তেমনই প্রথমে খুবই অভিভূত হইয়া পড়ে। আবার কয়েকদিনের মধ্যেই শোক দুঃখ কাটিয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহারা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তাহা ছাড়াও ইহারা অশরীরি আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাসবান—বিশেষতঃ দুর্বৃত্ত আত্মা। ইহারা দেশের যে গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিয়া লইবে ইহা খুব স্বাভাবিক। ইহারা যথাসম্ভব জ্যোতিষী। উত্তরদেশের আকাশের সকল নক্ষত্রের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়গুলি ইহাদের নিকট সুপরিচিত। চন্দ্র এবং সূর্য্যের আকাশ পর্য্যটনের তাহাদের ধারণা যে এক মুগ্ধ নায়ক তাহার নায়িকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে—আমেরিকার আদিম নিবাসীদের কোন কোন জাতির মধ্যেও ঠিক এইরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। সর্ব্বশেষে এস্কিমো কুকুরের একটু পরিচয় না দিলে এস্কিমো জাতির বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কারণ কুকুরই ইহাদের একমাত্র গৃহ পালিত পশু, আবার শিকার যাত্রায় এই কুকুরই একমাত্র সঙ্গী এবং সহায়কারী। এখানকার সমস্ত কুকুরই এক

হলদে, ধূসরবর্ণ বা বাতাবী রং আবার কোনটা হয়ত চিত্রবিচিত্র। কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে এই কুকুর উত্তরদেশীয় নেকড়া বাঘের (Arctic wolf) বংশধর; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহারা অন্যান্য দেশীয় কুকুরের ন্যায়ই প্রভুভক্ত। ইহাদের শারীরিক বিশেষতঃ মুখের আকৃতি মস্তকের দিক হইতে মুখের দিকে ক্রমশঃ সরু, এক চক্ষু হইতে আর এক চক্ষু পর্য্যন্ত ব্যবধান খুব বিস্তৃত, কাণ দুটি খাড়া এবং ক্রমশঃ সরু আকৃতি, গাত্রচর্ম্ম খুব পুরু তাহার উপরে বেশ অনেকটা লোমশ পশমের আবরণ, লেজও শিয়ালের ন্যায় লোমশ, পায়ের মাংসপেশী খুব পুষ্ট এবং শক্তিশালীও। ইহাদের আকৃতি এবং গঠনও বেশ শক্তির পরিচায়ক। ওজনে এক একটা কুকুর সাধারণতঃ ১ মণ বা ১ মণ ১০ সের পর্য্যন্ত হয়; Peary সাহেবের বিবরণে আছে তিনি একটা কুকুর পাইয়া ছিলেন তাহার ওজন ছিল দেড় মনের উপর (১মণ ২৫ সের পর্য্যন্ত) বলা বাহুল্য ইহারা মাংসাশী; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মাংস ছাড়া খাদ্যে ইহাদের শরীর রক্ষা হয় না, ইহারা তুষার ভক্ষণ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। ইহা-দের শক্তির পরিচয়ে ইহাও বলা যাইতে পারে যে আর কোন দেশের কুকুর এত শৈত্যের মধ্যে অল্পাহারে বা অনাহারে এত করিতে পারে না, পারিবার কথাও এ নয় কারণ ইহারা এই হিমানি প্রদেশের তুষার শৈত্যের উন্মুক্ত ক্ষেত্রেই জন্ম গ্রহণ করে। কখনও বা এক মাস বয়স পর্য্যন্ত গৃহে আশ্রয় পায় না। তাহা ছাড়া ইহারা চিরকালই উন্মুক্ত আকাশ তলেই জীবন যাপন করে—গৃহ পালিত পশু হইলেও ইহারা সাধারণতঃ গৃহে আশ্রয় পায় না।

উত্তর মেরু অভিযান সমূহে বহুবার এই সব কুকুরের অত্যাবশ্যকতা এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

ঝড়ের বাঁশী

(১)

ঝড়ের বাঁশী প্রাণ উদাসী
করল যেরে আজ।
ডাক এসে তার পৌঁছেছে গো
সুপ্ত হিয়ার মাঝ।

এলিয়ে দিয়ে ধূম্র কটা,
আকাশ জুড়ে মেঘের জটা
কি নাচেতে উঠল মেতে
ওই যে প্রলয়-রাজ।
(তার) পাগল-বাঁশী আকুল করে
ভুলাল মোর কাজ।

(২)

ওই যে তাহার আঁখির দিঠি
ওঠে ঝিলিক মেরে।
বাঁশীর গানে আকাশ খানি
ফেল্‌চে চিরে ফেড়ে।
তার নৃত্য-লীলার ছন্দে দোদুল
বিশ্ব নিখিল শঙ্কা আকুল
বৃষ্টি ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর
উঠল বেজে যেরে।
আঁখির দিঠি ওই কেবলি
উঠছে ঝিলিক মেরে।

(৩)

সুপ্তি মগন ঘরের কোণে
ছিলাম নিরালায়
(তার) বাঁশীর গানের ঢেউটি এসে
লাগ্‌ল সারা গায়।
নয়ন মে'লে তাকিয়ে দেখি
বিশ্ব জুড়ে হচ্ছে একি
শান্তচিতে ঘরের ভিতে
থাকাই হল দায়।
(সে যে) ভিত্তি ধরে উঠ্‌ছে নড়ে
(তার) ভরসা কোথায় হায়!

(৪)

আজ ঘরছেড়ে বার হতেই হবে
সবাই যেদিক যায়

কি আশে আর রইহু ব'সে
প্রাণের মমতায় ?
আর যে নারি রইতে ঘরে,
উদাসী প্রাণ কেমন করে,
বাঁশীর স্বরে গুমরে ম'রে,
যদিই যেতে চায়,
যাক্‌না চলে নাই কোন ক্ষোভ
সবার যদিই যায়।

(৫)

সবাই যদি মরণ বুকে
ঝাঁপ দে পড়ে আজ।
আমার তবে বৃথাই কিসের
শঙ্কা হৃদয় মাঝ ?
লক্ষ জনের ভাগ্য ধাতা,
যা ঘটাবে ঘটুক না তা,
এক নিয়তি সূত্রে গাঁথা,
সবার জীবন আজ।
আমায় মিছাই শঙ্কা বালাই
ভাব্‌তে যে পাই লাজ।

(৬)

ঝড়ের বাঁশী ডাক দিয়েছে,
আর কি আছে ভয়!
লক্ষ প্রাণের শক্তি-সাহস
নয়ক মিছে নয়!
নিখিল বিশ্ব ভুবন ব্যেপে,
আসুক নাক, বিপদ চেপে,
উঠবে না তায় বুকটী কেঁপে
হবেই হবে জয়।
মৃত্যু সাগর লঙ্ঘি মোদের
মিল্‌বে বরা ভয়।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার।

মেয়েদের শিক্ষা

স্ত্রী জাতের শিক্ষা পাওয়া উচিত কি অনুচিত একথাটা কবে প্রথম উঠেছিল জানি না, কিন্তু কেউ পেয়েছেন,—কেউ একটুখানি পেয়েছেন, বেশীর ভাগ একেবারেই পান নি—সত্ত্বেও—এখন পর্য্যন্ত মীমাংসা হ'লোনা যে লেখা পড়া শেখা মেয়েদের উচিত কিনা এবং উচিত হয় যদি ত কতটুকু। এবং সেই কতটুকু—কি রকমের—কেন না, স্ত্রী-শিক্ষা বলতে মানেটা এত বিস্তৃত প্রসারিত আবার গভীরও হয়ে ওঠে যে নিরক্ষরা গৃহকর্ম্মজ্ঞান কিম্বা 'মিতাক্ষরা' ঐ পটুত্ব অথবা লিখাপড়া জানা বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, মতভেদে কোন্‌টা যথার্থ স্ত্রী-শিক্ষা বুঝতে পারা শক্ত। অথচ এই নারী সমস্যা বা তাঁদের শিক্ষা সমস্যা ভাল করে পর্য্যালোচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে তাতে মুখ্য আর গৌণভাবে পুরুষের শিক্ষা সমস্যারও কারণ দু'একটি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলপ্রদতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই অন্ন সমস্যার কথা ওঠে দেখা যায়, জ্ঞানের মুখ্য লক্ষ্য অর্থ বোঝায়, মেয়েদের সমস্যা গুলিতেও সেটা প্রবেশ করেছে কন্যাদায় সমস্যা, গলগ্রহ সমস্যা, দুর্ব্বহ জীবনযাত্রার গ্লানি সমস্যা ইত্যাদি আকারে—মূলে ওই অন্নসমস্যাই রয়েছে। পুরুষের যেমন জ্ঞানের জন্য মুখ্য,—অর্থের জন্য গৌণ করে বিদ্যার্জ্জন অনেকেরই ভালো ঘটে ওটে না রুচিতেও অনেকের লাগে না, অন্নের জন্য—বনাম অর্থের জন্য মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়—মেয়েদের প্রায় সকলেরই বিবাহের জন্য—অবিবাহিত হ'লে অর্থার্জ্জনের জন্য (অবশ্য খুব কমই) বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা পরিস্ফুট। কোনো পক্ষেরই বিশেষ বিষয়ের কিম্বা সম্যক জ্ঞানের উৎকর্ষ লক্ষ্য নয়। এবং তাঁদের শিক্ষা দাতা বাপ মার এটা লক্ষ্যও থাকে না সাধারণতঃ যে,সন্তানদের মধ্যে ঐ ধরণের প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। কাজেই সাংসারিক অন্ন বস্ত্র ছাড়া আরও একটা যে প্রয়োজন, যেটা অনেকের কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে না-ও হতে পারে—সেই মানসিক উৎকর্ষ আর তার ফল সমূহে নিজেকে সমাজকে সন্তানদের লাভবান করা—এটা অনাবশ্যকই রয়ে যায়। শিক্ষার এই দিকটা গৌণকাঙ্ক্ষিত, খুব কম লোকেই নিজেকে বা ছেলেমেয়েকে এতে শিক্ষিত দেখতে চান। এবং সেই জন্যেই এই সম্বন্ধে এত 'নানামত' শুনতে ও দেখতে পাওয়া যায়। অন্ন বস্ত্রের সঙ্গে ঘরবাড়ী গাড়ী ঘোড়া তুলনীয় হতে পারে,—কেননা সবগুলির জন্যে দরকার অর্থ কিন্তু তার লেখাপড়ার জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গে তুলনা এবং ঐ সমস্ত জিনিষের অভাব বা অসদ্ভাব ঘটলে সেই শিক্ষাকে ব্যর্থ শিক্ষা বলা যেন কি রকম অদ্ভুত মনে হয়। অবশ্য দুইয়েরই অভাব থাকলে সবই বলা যায়। মেয়েদের দিকেও লেখা পড়া তাঁদের দরকার তাঁদের মানসিক উন্নতির জন্য—বিকাশের জন্য, ঠিক মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থার্জ্জন বা বিবাহের বাজারে দরের জন্য না হওয়া উচিত। শুধু অর্থার্জ্জনটা গৌণভাবে রাখা দরকার।

কিন্তু এই আলোচনায় এখনো ঔচিত্য অনৌচিত্য চলেছে যখন, তখন মনে হয়—এ জিনিষটা ছেড়ে—এখনকার সমাজের ধারায় গতির সঙ্গে ও পক্ষে মেয়েদের কি কি দরকার ও শিক্ষনীয়—সেইটের বেশী আলোচনা হওয়া উচিত।

আমাদের দেশের, বোধ হয় সবদেশেরই, মেয়েদের সর্ব্বপ্রধান সংস্কার হচ্ছে বিবাহ। এ দেশে এখনো ওজিনিষটা কিন্তু সেই প্রচলনের মতনই রয়ে গেছে জন্ম মৃত্যু বিয়ে—এই তিন বিধাতা নিয়ে—।—যত রকম বিপত্তি ঘটে বিধাতার হাতে সব কাজ ফেলে দিলে, কারণ তিনি হাতে কিছুই করেন না করেন কলমে। কিন্তু তাঁর কলমের লেখার জন্ম মৃত্যু ঘটে, বিবাহটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে—কেন না ওটা তাঁর কলমের লেখার নির্দ্দেশ অনুসারে চললে সমাজ—এবং সংস্কার এমন করে গড়ে উঠতে পেত না। অথচ এ বিষয়ে তিনিই নিমিত্তের ভাগী আর তাঁর বাহুবলহীন সৃষ্টিরা ফলভোগী হয়েছে। যাই হোক যত কিছু সামাজিক কথা, আলোচনা শিক্ষা যা কিছু নিয়ে সবই এই বিবাহ সংস্কারটির সঙ্গে—নানা মুনির নানা মতে ধাক্কা খায়। স্ত্রীজাতের যখন বিবাহই অন্ন বস্ত্র বিদ্যা বুদ্ধি তখন তাদের শিক্ষার গোড়ার, মাঝের এবং শেষের কথা যে এই বিবাহকেই কেন্দ্র করবে কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু বিবাহ হোক বা না হোক মানুষের শিক্ষা সার্থক হয়েছে কি ব্যর্থ হয়েছে সেটা দেখা যায় তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে—সংসারে চলবার ধরণে ধার্ম্মিকতা, সামাজিকতা শিষ্ঠতা ইত্যাদি থাকলে ও না থাকলে—যদি শিক্ষাকে বিস্তৃত অর্থে ধরা যায়। কিন্তু যেমন মানুষের স্বভাববৈচিত্র্যে শিক্ষার সার্থকতা জিনিষটা সকলের কাছে সমানভাবে আশা করা যায় না,—বিধাতার সৃষ্টিকে যদি মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করা যায়—সব বৈচিত্র্য সহ্য করতে হয় অনুকূল ও প্রতিকূল। সে হিসাবে বিবাহ বনাম সংসারযাত্রার মাঝখানে শিক্ষার পরীক্ষা হওয়া সমীচীন হলেও তাকে মানুষের প্রকৃতি বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতার মাপকাঠিতেও বিচার করা উচিত। কেন না স্বভাব নিজের কাজ করবে এবং করে, শিক্ষা তাকে নির্দ্দেশ করতে পারে কিম্বা বিকশিত করতে পারে মাত্র কদাচ হয়ত সুনিয়ন্ত্রিত করে। মেয়েদেরও শিক্ষার ফলাফল নিয়ে যখনি আলোচনা করা হয়, দু'পক্ষের মতামতেই চরম উৎকর্ষ কি চরম অপকর্ষ কল্পনা করে নেওয়া হয় এবং তার দৃষ্টান্ত নজীরও দেওয়া হয়, সাধারণের তাতে অপকারের চেয়ে উপকারের সম্ভাবনা বেশী কিম্বা কম এটা বিবেচনা করে মতামত ব্যক্ত করা হয় না। সে প্রসঙ্গে বিবাহ সংস্কারটীর যত গুলি সুবিধা অসুবিধাই কল্পনা করে নেওয়া হয়। কন্যাদায় সমস্যার প্রতিকার আকাঙ্ক্ষা, সুগৃহিণী, সুমাতা পাওয়ার দেখার ইচ্ছা স্ত্রী শিক্ষা সবকটিই কেন্দ্রীভূত করে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এখনকার এই সভ্যতা সংস্কারের যুগে শিক্ষার আদর্শ একরকম ত নেই বরং, কিছু বেশী জটিল হয়ে পড়ছে। কারুর পক্ষে যা অমোঘ উপকারী অন্যের পক্ষে তা অনাসৃষ্টি অদ্ভুত এখন যত দেখা যায় বোধ হয় সেকালে এত ছিল না। কাজেই কোন কথা বা প্রস্তাব এ সম্বন্ধে একজন তুললে পাঁচজন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন, বোঝবার আগেই হয় ত চরম কোন কিছু কল্পনা করে নেওয়া হয়। সুতরাং এই ধাঁধা বা গণ্ডগোলের যুগে সহজে

কোন সোজা সরল পক্ষ দেখতে পাওয়া যাবে তা মনে হয় না। তবু শিক্ষা সংস্কার কিম্বা শিক্ষিত করবার চেষ্টা ব্যক্তি মানুষের দ্বারা হবে এটা আশা করা যায়, সামাজিক যা কিছু বিশেষ নাড়া না দিলে ও।

যে জিনিষটার সম্বন্ধে একটা ভাল কারণ আছে অথচ খুব সুলভ নয়, তার উপকারিতা সম্বন্ধে তেমনিই একটা ধারণা হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়; শিক্ষা হচ্ছে সেই জিনিষ। যা সকলের কাছে প্রয়োজনীয় কি না বা খাটে কি না, না জানা সত্ত্বেও তা সকলের পক্ষেই সব উপকারী ও দরকারী বলে মনে হয়। এই ধারণাতে মনে হয় শিক্ষা পাবার এবং সেটাকে সুলভ উপায়ে পাবার অধিকার সকলের থাকা উচিত। সকলেরই নিজের অবস্থার বিষয়ে সব কথা জানা দরকার অন্ততঃ মোটামুটি রকমেরও; তারজন্য খানিকটা লেখাপড়া জানা প্রয়োজন কেন না শিক্ষাই মানুষকে ভাব্‌তে শেখায়।

মেয়েদের এ বিষয়ে তিনটে ভাববার এবং করবার ও লাভের দিক আছে। ঔৎকর্ষ্য মানসিক যা তাঁদের অবকাশকে কাজে লাগিয়ে আনন্দদায়ক করবে এবং এ দিকে অবকাশ হিসেবে তাঁদের চর্চ্চার সময় পুরুষদের চেয়ে বেশী, যদি কাজে লাগাতে পারেন সর্ব্বতোভাবে উপকার হ'বে নিজের সমাজের সন্তানের দ্বিতীয় সাংসারিক,—ঘর গৃহস্থালী, মার কাজ, সেবা, পরিচর্য্যার কাজ যা শিক্ষায় এবং নিয়মের অভাবে জানেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না এমন কি জননীরা সন্তানের খাওয়ার নিয়মও জানেন না। শিক্ষিত হলে এবং চেষ্টা করলে তার দ্বারা ঐ সব শিখে সুনিয়ন্ত্রী হতে পারেন, অকাল বার্দ্ধক্যে, ক্লান্ত শরীরে, রুগ্ন শিশু নিয়ে আর দুঃস্থ রুগ্ন স্বামীর কাজের ভার বাড়ান না, পরন্তু তাঁদেরও স্বাস্থ্য অর্থ নিজের স্বাচ্ছন্দ্য দেখাতে শেখেন। তৃতীয়, গলগ্রহ গ্লানি সমস্যার প্রতিকার অর্থার্জ্জন, ভার বা কন্যাদায় যেখানে সেখানে দায় না কর. মা বাপের মনের জোরে এবং হাতে—তার জন্য শিক্ষা পাওয়া দরকার। বৈধব্যে যদি জীবন কেটে যায়—যে দেশে কাটে আকুমার ব্রহ্মচারিণীদের সেদেশে এদেরও যে কাটতে পাবে এই আদর্শে ও অর্থার্জ্জন দ্বারা তাদের স্বাবলম্বিনী করে উপায় দেখিয়ে দেওয়া যাতে অনেক সময়ে ভার না হয়ে বরং ভার নিতেও শেখে। সকল অবস্থার দুঃস্থতা দারিদ্র্য পীড়িতাদের ও আর্থিক অভাব হ্রাস দূর হতে পারবে এই লাভ।

কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে এতে সব চেয়ে বেশী মেয়েদের বয়স, সুযোগ ও ব্যয় সম্বন্ধে। বেশীর ভাগ হিন্দুর ঘরে বিবাহ বাল্যকালে হয় অনেক স্থলে শৈশবেও তাদের লেখাপড়া শেখার অবকাশ নেই। তাদের অভিভাবকদের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সে স্থলে মেয়ের বিবাহটাই মুখ্য লক্ষ্য থাকে, যা কিছু কর্ত্তব্য পরবর্ত্তী পূর্ব্ববর্ত্তী সব অদৃষ্টের হাতে। সুযোগ এদেশে নেই কেন না শিক্ষা নয় বেশী নেই এবং ব্যয় খুব বেশী সেই জন্যে আরও মেয়েরা অনেকেই পড়ায় লেখায় আশায় জলাঞ্জলি দেন। দরিদ্র মা বাপ সংস্কার ছাড়িয়েত উঠতে পারেন না, আবার তিনি লেখাপড়ায় খরচ বেশী হলে মেয়েদের বেলা বৃথা মনে করেন, মেয়ের

বছরেরও অবিবাহিতা মেয়ে দেখা যায় শুধু অর্থাভাবে যাঁরা কোন রকম মানুষের অধিকার পান নি, শুধু গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়া।

শেষ অবধি, আমার যা চাই বা বলি তার জন্য দেশের সমস্ত মা বাপেরা সচেষ্ট হতে না পারলে তাঁদের ছেলেরা মানুষ হ'বেন অর্দ্ধেক—মেয়েরা মোটেই না। সকল মা বাপের মনে যদি নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অনুযায়ী ও শেখাবার ইচ্ছে থাকে তা হলেও মেয়েদের লেখাপড়ার দিকটাই শুধু অল্প খোলা থাকে। নইলে সব সমস্যাই অর্থের ওপর নির্ভর করবে সেটাতে কোন পক্ষের সুবিধা নেই। ছেলেটীর সঙ্গে প্রত্যেক মেয়েটীকে মানুষ করণে যে সাংসারিক সামাজিক এবং সেই মেয়ে বেচারীর মানসিকও যথেষ্টলাভ এটা ভাববার বোঝাবার বিষয় প্রত্যেক সামাজিকের মা বাপের। এবং মানুষ করতে পারেন শুধু মা বাপই—না হওয়ার সকল দোষই তাঁদের হওয়া উচিত। কেন না মা বাপের, সন্তানের হিতকামনা সমস্ত সংস্কার অসুবিধাকে ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

দুটী ছেলের রোমান্স

(গল্প)

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ের ঘড়িটার অঙ্গুলি সঙ্কেতে আস্থা স্থাপন করে হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীতে, সুধীরের কাছে অনেকক্ষণ কাটিয়ে, অনিল যখন শিয়ালদহে পৌঁছল, তখন তার গাড়ী ছাড়তে বাকী মোটে দুই মিনিট! অনিল ও সুধীর উভয়েই ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র এবং তারা দুজনে প্রাণের বন্ধু,—সুধীর তার বাড়ীতে ও অনিল ছাত্রদের বাসায় থেকে একই কলেজে পড়ে। কবে কেমন করে তাদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হয়েছিল সে ইতিহাস এখানে বলবার কোনো দরকার নেই, বৃত একথা সত্যি, সুধীরকে ছেড়ে ফুটপাথে নেমেই অনিলের সমস্ত শরীর কেমন ভারী হয়ে উঠ্‌ল,—সময় তাকে যত তাড়াতাড়ি এড়িয়ে গেল, স্থানটুকুকে সে তেমন কোরে পেরিয়ে যেতে পারলে না!

চল্‌তে চল্‌তে অনিল ভাবলে, এবার পূজার ছুটীতে নাই বাড়ী গেলাম! বিশেষ করে বিদায়ের পালার সময় এবার সুধীরের মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল, তাতে যে নতুন রহস্যের সঞ্চার করেছে তাই নিয়ে এই একটা মাস দিব্বি কাটিয়ে দেওয়া যায়! কিন্তু বাড়ী না গিয়ে তার একেবারেই উপায় নেই কিনা, তাই এই একটা মাস নিরিবিলি বন্ধুসঙ্গের কত না আনন্দের প্রলোভন তার চিত্তের সবখানি জুড়ে যেমন একান্ত হয়ে উঠল ততই তার মনে পড়ে যেতে লাগল, আহা, সে যে একেবারেই নিরুপায়, দেশে তাকে যেতেই হবে যে,—যদি কখনো সে বড় হয়ে, পাশ কোরে, অনেক টাকা রোজগার কোরে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের অধিকারী

হয় তখনই তার এই সব সাধ মিটবে,—তখনই সে সুধীরকে নিয়ে তার বাকী জীবনটা হাসি খুসি করে, বায়স্কোপ দেখে স্বপ্নের মত কাটিয়ে দিতে পারবে! তার সদ্যজাগ্রত সমস্যার, মনে মনে এই সব সমাধানের আলোচনা করতে করতে, অন্তরে সে যতটা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল, বাহিরে সে ষ্টেশনের দিকে ঠিক ততটা এগিয়ে যেতে পারছিল না।

কিন্তু দু' মিনিট বাকী, ষ্টেশনের ঘড়িতে এই তথ্যটি অবগত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিল তড়িৎস্পৃষ্টের মত যেন একেবারে বদলে গেল, মানসিক উদ্যম ও শারীরিক জোরের সাহায্যে পূজার ছুটীগ্রস্ত ছাত্র ও কেরাণীকুলের ভিড় ঠেলে কয়েক মুহূর্ত্তেই প্লাটফরমে গিয়ে হাজির হল,—টিকিট তার আগেই করা ছিল। ট্রেণকে হাতের মধ্যে পেয়ে চকিতের মত একবার তার মনে হল, এই ট্রেণ ফেল করি! সেই মুহূর্ত্তে একটি কামরার গবাক্ষ থেকে একটি ছেলে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলে, এ কি অনিল বাবু যে? বাড়ী যাচ্ছেন নাকি?

"তাই ত যেতে হচ্ছে!"

"আমাকে চিনতে পেরেছেন ত? আমি যতীন।"

"হ্যাঁ পেরেচি, আপনার সঙ্গে ফুটবলের মাঠে আলাপ হয়েছিল।"

"না না, আমি 'বিদ্যাসাগরের' যতীন।"

ওঃ, তুমি আমাদের যতীন, তা বলতে হয়। আজ আমার শরীরটা ভালো নয় কিনা—বলে অনিল অম্লান বদনে মনের ভালো-না-থাকাটা নির্ব্বিবাদী শরীরের উপর চাপিয়ে দিয়ে ত্রুটী শুধরে নিল।

যতীন সহানুভূতি করে বললে, যে প্যাসেঞ্জারের ভীড় আজ! কোথাও খালিগাড়ী নেই, আসুন না এই গাড়ীতে—

দেখি আরেকটু সামনে গিয়ে, বলে অনিল সরে পড়ল,—হয় তো এই ভরাট কোলাহলের মধ্যে তার প্রাণে কোথাও নীরবতার সুর ধরছিল, তাই এই সব ভদ্রতাজনিত মৌখিক আলাপের অত্যাচার এড়িয়ে, যাত্রীর এই ঠাসাঠাসি ভিড়ের একান্তে, তার মনের নির্জ্জনটীতে বসে, সদ্য আহৃত বেদনার মধু আর একবার চেখে দেখতে চাইছিল। সে কয়েকটী কামরা দ্রুতপদে পেরিয়ে গিয়ে, যে কক্ষটীর খোলা দরজার সম্মুখে একটি সুশ্রী কিশোর দাঁড়িয়েছিল, হয় তো নিজের অগোচরেই সেই গাড়ীতেই ঢুকে পড়ল। অন্যমনস্ক ভাবে সেই ছেলেটীকেই একটু ঠেলা দিয়ে অন্য ধারের দরোজার সংলগ্ন বেঞ্চটীর একধারে বসে চারিদিকে চটপট একটু তাকিয়ে নিলে।

একটু বাদেই গাড়ী ছেড়ে দিল, ষ্টেশনের সীমা অতিক্রম করে যেতেই, হাওয়ার জন্য সে জানালার উপর মাথা রেখে বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল,—এমন সময়ে সেই ছেলেটী ফিরে এসে তার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে—সরে বসুন মশায়!

তার নাকি অনেক কিছুই আরেকবার নতুন করে ভেবে দেখবার দরকার ছিল, তাই সে না তাকিয়েই উত্তর দিল—আরোত জায়গা আছে! পাশে বসলেই হয়।

"বাঃ এ জায়গাটা যে আমি রেখে গেচি, বেশত!"

কিনে রেখে গেছ নাকি, এই বলে ফিরে তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেটীর দিকে চাইতেই তার দৃষ্টি আপনিই কোমল হয়ে এল, এবং পর মুহূর্ত্তেই তার চরম কণ্ঠস্বর নরম নিখাদে নামিয়ে বল্লে, তা বেশ বেশ এই খানেই বস না কেন? বলে নিজেই দরোজা থেকে দূরে সরে বসল।

ছেলেটি দরজার কাছাকাছি তার লোভনীয় জায়গাটীতে বসতেই অনিল প্রশ্ন করল, কোথায় যাবে তুমি?

ছেলেটী ঈষৎ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বল্লে, কৃষ্ণনগর। আপনি?

"আমি নামবো বহরমপুরে। পৌঁছতে রাত তিনটে হবে বোধ হয়।"

'কৃষ্ণনগর যেতেইত একটা বাজবে।'

'তা বাজবে। গাড়ী ছেড়েচে ৮-৪৫এ, দশটা, এগারোটা, বারোটা, একটা— মোটে চার ঘণ্টা তো! আমার তার পরেও দু-দু ঘণ্টা কাটাতে হবে।'

ছেলেটি চুপ করে রইল, অনিল জিজ্ঞাসা করল, তোমার নামটী কি ভাই?

"আমার নাম সুবোধ, তবে সবাই আমায় দোলা বলে ডাকে।" বলে ছেলেটি একটু হাসলে।

"তুমি ছেলেবেলায় খুব দুলতে বুঝি? কোন ক্লাসে পড়?

ছেলেটী একটু ম্লান হয়ে বল্লে, ক্লাস সেভেন!

'বাঃ, বেশ পড়ত। অনিল এ কথা বল্‌তেই সুবোধের মুখ খুসী হয়ে উঠল, তা তোমার এখন বয়স কত হবে?

"বারো তেরো হতে পারে।"

"তবে ত তুমি ষোল বছরেই 'ম্যাট্রিক' দিতে পারবে—তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।"

অনিলের এই সহানুভূতি সুবোধের ভালো লাগল কিনা জানা গেল না, তবে তার পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। অনিল সতের আঠারো, তার এখন সেই বয়স, যে বয়সে যাকে চোখে ভালো লাগে তাকেই সব প্রাণ ঢেলে ভালোবাসবার দুর্দ্দম ইচ্ছা করে। এরই মধ্যে একটুখানি হাওয়ায় অনিলের মনের সব মেঘ যেন এক পলকে উড়ে গেল, এমনকি সে দিনের আকাশের পঞ্চমীর ক্ষীণশশীর মতো একটুখানি কি আশা ধীরে ধীরে জাগতে লাগ্‌লো।

অনিল আবার জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কার সঙ্গে,—তোমার সঙ্গে কে যাচ্ছেন?

'কেউ না। আমি একলাই যাচ্ছি। কলকাতায় মামার বাড়ী থেকে পড়ি কি না।'

'দেশে তোমার কে আছেন, বাবা মা—'

'আমার বাবা মা নেই, কেবল এক দাদামশাই আছেন।'

'মা নেই?'—বিচলিত হয়ে অনিল তার হাত ধরে সহসা কাছে টেনে আনল, ছেলেটি আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে বসল।

আরো কিছুক্ষণ নীরবে কাটলো। কি একটা অজানা ষ্টেশনে গাড়ী একটুক্ষণ থেমেই হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে গেল। অনিলের দিকে একটু তাকিয়েই এবার সুবোধই প্রশ্ন করলে, আপনি এই মোটা মোটা খদ্দর পরেন কেন?

'নিজের দেশের জিনিস তো সবারই পরা উচিত। উচিত নয়?'

সুবোধ তার উত্তর না দিয়ে বল্লে দেখুন আমারো জামা কাপড় সব দেশী।

তার কাপড় হয় তো দেশী মিলের হতেও পারে, কিন্তু অমন 'ফ্যান্সী' শার্ট যে নিছক বিলিতি তা বুঝেও ছেলেটির এই হঠাৎ দেশপ্রীতির পরিচয় দেবার চেষ্টায় মনে মনে সে হাসল। তার জামাটি হাতে ধরে বল্লে, সত্যি আজকাল আমাদের দেশেও এমন সুন্দর সুন্দর কাপড় হচ্ছে!

কিন্তু তার জিনিষ চেনবার দক্ষতায় ছেলেটী একটুও প্রফুল্ল হল না, দেখে অনিল তাড়াতাড়ি বল্লে, তাছাড়া, তোমরা এখন ছেলে মানুষ কিনা এখন ঝকঝকে পোষাক পরবে বই কি, বড় হয়ে তোমাদেরও তখন খদ্দর ছাড়া আর কিছু পরতে ইচ্ছে হবে না।

সুবোধ একটু নিশ্বাস ফেলে বল্লে, এবার বাড়ী গিয়েই আমি খদ্দরের পোষাক কিনব ঠিক করে রেখেছি।

অনিল এবার উৎসাহিত হয়ে তাকে কাছে টেনে ধীরে ধীরে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বল্লে, নিশ্চয় নিশ্চয়। বড় হয়ে তোমরাই কত দেশের কাজ করবে, হয় ত দেশের জন্য সারাজীবন খাটবে, প্রাণ দেবে। চাই কি ভবিষ্যতে তুমিই দেশ চালাবে, দেশের নেতা হবে, কে বল্‌তে পারে, তুমিই হয় তো বিবেকানন্দ, সি, আর, দাশ হতে পারো।

এতগুলা কথা সে বুঝল কিনা তার মুখ দেখে বোঝা গেল না, তবে অনিলের আদরের হাত থেকে তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে নিতে তৎপর হল না। তার বয়সের ছেলেদের মনে সর্ব্বগ্রাসী স্নেহের তৃষ্ণা এমন সহজেই জেগে উঠে যে তারা পরিচয়হীন লুব্ধ পথিকের কাছে কিছুমাত্র না ভেবেই আপনাকে সমর্পণ করে। তাতে করে অনেক সময়েই নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনে তাতেও কোনো ভুল নেই, কিন্তু সদ্য-জাগ্রত হৃদয়ের প্রথম আনন্দ ও বেদনার অপূর্ব্ব মোহকে ঠেকিয়ে রাখবার শক্তি তখনো তার মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয় নি যে।

একটু পরে সুবোধ উঠে দরোজার কাছে গিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে দাঁড়াল, সেই সময়েই কি একটা ষ্টেশনে গাড়ী যেমন এল তেমনি না থেমেই বেরিয়ে গেল—সেই পলায়মান হতভাগ্য ষ্টেশনটার দিকে চেয়ে অনিলের একটা ছোট দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল।

কিছুক্ষণ চুপ করে একা বসে থেকে অনিলও দরোজার কাছে গেল, কিন্তু মাথা গলিয়েই দেখতে পেলে সুবোধের হাতের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট—তাকে দেখেও সেটা লুকোবার তার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। এতক্ষণ তার মনটা ছেলেদের খেল্‌না বেলুনের মতো গ্যাসের সঞ্চারে ক্রমশই ফুলে উঠছিল কিন্তু এই জ্বলন্ত সিগারেটের অতর্কিত খোঁচাটা তার কোথায়

যেন অলক্ষ্য একটা ফুটো করে দিল—যাতে করে তার মনের স্ফাতি রীতিমত দমে গেল।

সে শুধু বল্লে, তুমি সিগারেট খাও? ছেলেটী তার দিকে অবাক হয়ে চাইতেই ঈষৎ তীব্রস্বরেই বলে উঠল, সিগারেট খেতে নেই, ছিঃ!

'এতো সবাই খায়।'

'সবাই খাক্, কিন্তু যারা দেশের—যারা দেশের সেবা করবে, বা দেশের চালক হবে তাদের সিগারেট খাওয়া উচিত নয়, অনিল এমনই কিছু একটা বল্‌তে যাচ্ছিল,—কিন্তু দেশের এই ভাবী সি, আর দাশের ক্ষুদ্র সংস্করণটীর দিকে চেয়ে বাক্যটা সে আর নিষ্পত্তি করতে পারল না।

সুবোধ মলিন মুখে বল্লে, বাড়ী গিয়ে আর খাবোনা, ঠিক খাবোনা।

'বাড়ী গিয়ে নয়, এখন থেকেই, আর খেতে পাবে না'—এই বলে অনিল তার হাতে একটু জোরে ঘা দিতেই সিগারেটটী পড়ে গেল। সেই আহত হাতখানিই নিজের হাতের মধ্যে ধরে অনিল বল্লে, ডাক্তারেরা বলেন সিগারেট্ খেলে শরীরের অনেক অপকার হয়,—

'কিন্তু ডাক্তারদের যে আমি খেতে দেখেচি।'

'তাছাড়া, যে ছেলে সিগারেট্ খায় তাকে কারু ভালবাস্‌বার ইচ্ছে হয় না।'

'আচ্ছা আমি আর খাবো না।'

'এই ত ভালো ছেলের মত কথা! ছেলেবেলায় অনেকেই সিগারেট্ খাওয়া,—আরো এম্‌নি অনেক খারাপ অভ্যাস না জেনে শেখে, কিন্তু খারাপ বলে জান্‌লেই তা জন্মের মত ছেড়ে দিতে হয়। কি বল?'

সুবোধ মাথা নাড়িল। অনিল তার গাল টিপে দিয়ে বল্লে—শুধু বল্লে, দুষ্ট! তার কণ্ঠস্বরে কি ছিল জানিনে, কিন্তু এই দুটি কথা দোলার মনে গিয়ে দোলা দিল, এই পীড়নটুকুও তার বেশ মিষ্টি লাগ্‌লো।

সুবোধের মাথার উপর নিজের মাথাটী কয়েক মুহূর্ত্ত রেখেই অনিল তারপরে স্বস্থানে এসে বস্‌ল—তার হৃদয় তখন একটি-ছেলেকে ভালো করার আনন্দে ভরপুর। সুবোধও সঙ্গে সঙ্গে এসে এবার কাছ ঘেঁসে বস্‌ল। অনিলের গায়ে কি একটা ফুট্‌তেই সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার পকেটে এটা কি দোলা? বল্‌তে বল্‌তেই পকেটে হাত দিয়েই একটা জার্ম্মান-রূপার কেস্ বাহির হল, 'এতে আছে কি?'—খুলে দেখে, কেস্‌টী সিগারেটে ভরা। অনিল বল্লে, এগুলো ফেলে দাও।

'বাঃ, তা কেন!'

'তুমি ত এক্ষুনি বল্লে যে আর সিগারেট্ খাবে না, তবে এগুলো রেখে আর কি হবে?'

'আমার এগুলোর সব দাম পাঁচ টাকা, আপনি টাকা দিন আগে, আমি ফেলে দিচ্ছি।'

'বেশ তুমি যদি সত্যি সত্যি প্রতিজ্ঞা কর আর জীবনে কখনো এ খাবে না, আমি পাঁচ টাকা দেব, এক্ষুনি দেব।'

'নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করব।'

'আচ্ছা তবে নাও, মণিব্যাগ থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে অনিল সুবোধের বুক পকেটের ভিতর গুঁজে দিল, বললো, কিন্তু আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে আর খাবে না।'

অনিলের হাতের মধ্যে হাত রেখে সুবোধ প্রতিজ্ঞা করলে, অবশেষে বল্লে, আপনার তো আর টাকা নেই দেখলুম, কেবল কয়েক আনা পয়সা।'

'ওতেই আমার হয়ে যাবে।'

তখন গাড়ী ব্যারাকপুর ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে, সুবোধ কেস খালি করে সব সিগারেট লাইনের ধারে ফেলে দিল,—কতকগুলি লোক এই অপচয় লক্ষ্য করে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল,—আহা হা! করলে কি, করলে কি? ফেলে দিলে কেন? আমাদের দিলেই হত

অনিল বল্লে, বেশ ত নাওনা গিয়ে, এখনোত গাড়ী ছাড়ে নি।

দুজন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে সিগারেট কুড়োচ্ছে এমন সময় বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিতেই একজন হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে অন্য কামরায় হাতল ধরে উঠে পড়ল, অন্যজন। সিগারেট হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, তার দুটী চোখ যেন ট্রেণের অনুসরণ করে সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে আসতে চাইল।

অনিল সত্যি সত্যি পাঁচ টাকা দিয়ে ফেলবে সুবোধ ভাবেনি, তাহলে সে ও রকম অসম্ভব গোছের আবদার করত না, কিন্তু যখন সে নিজেকে প্রায়-নিঃস্ব করে নোটখানা দিয়েই ফেলল—তখন সুবোধ হাঁ, না, কিছুই বলতে বা এই আশ্চর্য্যদান প্রত্যাখ্যান করতে পারল না বটে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তার অন্তরে, তারই অগোচরে কি এক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল, যাতে সে ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন হয়ে রইল।

সুবোধের মনের ভিতর কোন আবেগ জাগল তা সেই জানে, ক্ষণকাল পরে, সে আরো একান্ত কাছে গিয়ে অনিলের বুকের উপরে আপনাকে ছড়িয়ে দিল এবং পর মুহূর্ত্তেই দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল। এমন নিবিড় স্পর্শে অনিলও সহসা বিহ্বল হয়ে গেল, এবং নিজেকে সে আর সম্বরণ করতে না পেরে, তার সুন্দর নিটোল মুখখানি দুহাতে তুলে নিজের গালের ওপর এনে চেপে ধরল। ছেলেটী কিছুই বল্লে না, কোনই প্রতিবাদের চেষ্টা করলে না, মুখের উপর মুখ রেখে স্থির হয়ে রইল; এমন কি ঈষৎ লজ্জিত হয়ে কিছুক্ষণ পরে অনিল যখন তাকে মুক্তি দিল, তখনো সরে গিয়ে আত্মরক্ষার একটুও উদ্যম করল না তার বাহু ফাঁসও অনিলের গলা থেকে খুলে নিল না। স্পর্শের মোহ একবার পাগল করে তুললে আর রক্ষা নেই, এবার অনিলও সুবোধকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তার কচি লাবণ্যময় মুখে—একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা—অনেকগুলো চুমু দিল। এই উদ্দাম আত্মপ্রকাশের পরে আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হয়ে তাদের মুখে কিছুক্ষণের জন্য এমন এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য ফুটে উঠল, পৃথিবীতে যা কদাচ কারো চোখে পড়ে,—র‍্যাফেলের ম্যাডোনার মুখভাবের মধ্যে যার হয়

তো কিছু আভাস আছে !

যখন আদরের বিনিময়ে তারা ব্যগ্র ছিল, তখন প্রথমে তাদের মনেই পড়ে নি যে এই ভালবাসা গাড়ী শুদ্ধ লোকের চোখে পড়তে পারে বা পড়ছে, পরে যখন তাদের মনেও পড়ল, তখন তারা এদিকে নজর দেওয়া বাহুল্য মনে করলে—কেননা এই অনিবার্য্য স্নেহপ্লাবনকে গণ্ডী বেঁধে চালানো তাদের অসাধ্যই ছিল। যে কোন প্রকাশ যখন সহজ হয়ে উঠেচে তখন তা-সত্য ও সুন্দর নিশ্চয়, যদিও সকলের চোখে তার এই নগ্নরূপ সমান লাগে না। কেননা, অনিলের চুমোয় সুবোধের সারামুখ অপূর্ব্ব হাসিতে ভরে উঠল দেখে, সেই কামরারই দূরের কোণের একটি যুবকের চিত্ত যখন একান্ত খুসিতে ভরে উঠেছিল, ঠিক তখনই অনিলের পাশের বুড়োর পিত্ত এই দুর্নৈতিক ব্যাপারে একেবারেই জ্বলে উঠল। যে চুমো, নিজে না দিয়েও তার পুরো আনন্দ যুবকটী অন্তরে অনুভব করলে, সেই অমৃতই গরল হয়ে উঠে, যেন চড় মেরে বুড়োর গাল অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে! সে রুক্ষস্বরে বল্লে তোমাদের কি হচ্ছে বাপু?

এই বুড়োটি যে তার পাশে বর্ত্তমান থেকে মাঝে মাঝে খন্ খন্ করে কাশছেন—তাঁর অস্তিত্বের এই খবর মাঝে মাঝেই অনিলের কাছে পৌঁছেচে, কিন্তু তিনি যে কেবল কাশি ছাড়া আরো কিছু করবেন তা সে ভাবে নি। তাহলে অতটা তন্ময় না হয়ে সে হয় ত কিছু সাবধান হোতো,— সে শুধু বল্লে, কই কিছুইত করছিনে আমরা।

'ওটি তোমার কে হয়?'

'আমার ভাই।'

নিতান্ত অবাক হয়ে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলে, কিরকম ভাই? আপনার?

'আপনার বই কি!'

'বটে? তা হোলেই বা ভাই, ওকে নিয়ে অত নাড়াচাড়া করছ কেন? অমন করে চটকাচ্ছ, ওর লাগচে না?'

'কিজানি' বলে অনিল সুবোধকে জিজ্ঞাসা করলে, কিরে তোর লাগচে?

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানাল, না। পর মুহূর্ত্তেই সে অনিলের গালে নিজের গাল চেপে ধরে বল্লে, দাদা তোমার গালটা কি গরম!

ছেলেটীর এই আদরের প্রতিদান তৎক্ষণাৎ দেওয়া অনিলের উচিত ছিল, কিন্তু তার আকস্মিক অচিন্তিত ব্যবহারে সে বুকের মধ্যে শিউরে উঠে, কেমন স্তব্ধ ও আনমনা হ'য়ে রইল। বৃদ্ধ বুঝল না বটে, কিন্তু দূরে থেকেও যুবকটি বুঝল যে ছেলেদের এই প্রথম যৌবন, যে মিষ্টি তারা অতি শিশুকাল থেকেই পায় ও খায়, তার প্রথম স্বাদ এই বয়সেই ধরা পড়ে কিনা!

এমন সময়ে ভীষণ কোলাহলের মধ্যে গাড়ী কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে ঢুকতেই সমস্ত যাত্রী চকিত ও উন্মুখ হয়ে উঠল।

সেদিন কাঁচড়াপাড়ার কলের কুলীদের ছুটী হয়েছিল, তারাই শত সহস্রে দলবদ্ধ হয়ে সারা ষ্টেশন জুড়ে ট্রেনের প্রতীক্ষায় মহাবীর কি জয় ঘোষণা করে মহাবীর্য্যের পরিচয় দিচ্ছিল। একেত কেরাণী ও ছাত্রের ভীড়ে সমস্ত গাড়ীর কোথাও কেবল তিল ধারণের স্থানছাড়া মানুষ ধরবার জায়গা অবশিষ্ট ছিল না, তবু ওই অতগুলি দীর্ঘ প্রস্থ বপু প্রত্যেক গাড়ীতেই পনের কুড়িজন করে, একান্ত অবলীলা ক্রমেই ঢুকে পড়ল। এটা তাদের ডাল রুটির জোরে,,বা বাঙালী স্বভাবতঃ সঙ্কোচশীল বলে সম্ভব হয়— তার সঠিক মীমাংসা রেল কোম্পানীর কাছেই পাওয়া যেতে পারে।

দরোজার কাছে বসেছিল বলে অনিলদের দুর্ভাগ্যই বেশী হল, কেন না দশবারোজন 'প্রলিটারিয়েট নারায়ণ' কোথাও সরতে না পেরে সেইখানেই জমাট হয়ে রইল। একজন তো তার লম্বা টিনের বাক্সটি ইতস্তত সঞ্চালন করছিল, সুবোধকে বাঁচাতে গিয়ে তার একটা খোঁচ অনিলের মাথার এক কোণে লেগে গেল,— আরেকজন তার নানাবিধ পদার্থের মোটা গাঠরিটা কোথায় রাখবে ঠিক না পেয়ে অবশেষে অনিলের কাঁধেই রাখলো, তৃতীয় জনৈক স্থূল ব্যক্তি তাল সামলাতে না পেরে অগত্যা অনিলের কোলেরউপরেই ব'সে পড়লেন এবং তাঁর অনেকক্ষণ স্থান ত্যাগ করবার অভিসন্ধি বোঝা গেল না। বুড়ো লোকটি তো মার মুখো হয়ে মুখেই মারতে লাগলেন—কুলীরা তাতে আপনাদের একটুও আহত বিবেচনা করলেনা দেখে তাঁর রাগ ও চীৎকার উত্তরোত্তর বাড়তেই লগলো; গাড়ীর সকলেই কম বেশী অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্লো,—কেবল দুটী ছেলে, একজন স্নেহের আশ্রয় পেয়ে, ও আরেকজন তার সবখানি শক্তি দিয়ে সেই সামান্য অশ্রেয়টুকু রচনা কোরে, সমস্ত আঘাত, কলহ ও বিপৎপাতের আড়ালে, অন্তরে অন্তরে যে কোন্ অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে উঠ্ল তার খবর আর কেহই পেলনা। কয়েকটা ষ্টেশন এইভাবে কাটলো,—এই অবস্থাটা দুঃখ কি সুখজনক প্রশ্ন করলে অনিল বা সুবোধ কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারত কিনা জানিনে, তবে রাণাঘাট ষ্টেশনে কামরাটা অনেকখানি খালি হয়ে গেলে, কাটিহার যাত্রিবৃন্দ মুক্তি পেয়ে মুক্তি দিতেই তারা দুজনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

এতক্ষণ পরে ঝগড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে বুড়ো তার এক পুঁটুলি থেকে রুটি ও তরকারি বের করলে, বোধ হয় আহারের মৎলবে, কিন্তু তরকারিতে অসংখ্য পিঁপড়া সমাবেশ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে আবার সমালোচনা সুরু করে দিল, - 'যত বলি, ওগো তরকারিতে মিষ্টি দিওনা. তাকি শুন্বে, তরকারি হবে চড়্চড়ে ঝাল—খেয়ে মানুষ পালাবে, না তরকারিতে ধরচে পিঁপড়ে। এ কোন্ দিশী রান্না জানিনে বাপু।' তারপরে পিঁপড়াদের লক্ষ্য করে বল্তে লাগ্লো, তোমাও ধন্যি সব। পুঁটলির মধ্যে ঢুকে বসে রয়েছিস? কি তোরারে? উ?'

বুড়োর খাবারের আয়োজন দেখে অনিল জিজ্ঞাসা করলে তোর খিদে পেয়েছে দোলা?

"পেয়েছে একটু।"

আমাদের দুটী ভায়ের এতেই হয়ে যাবে, কেমন ? বলে অনিল 'টিফিন ক্যারিয়ারটা' বের করল।

কুলিরা সরে যেতেই শ্রান্ত হয়ে সুবোধ অনিলের কোলেই অর্দ্ধেক শুয়ে পড়েছিল, উঠবার কোন উদ্যম প্রকাশ না করে বল্লে, আমি বেশ শুয়ে আছি, খাইয়ে দাও আমাকে।

'তাই দিচ্ছি।' অনিল সুবোধের গালে একটি টোকা মারল।

তারপর যা খাবার ছিল দুজনে খাওয়া সেরে অনিল বোতল থেকে কিছু জল সুবোধের গালে ঢেলে দিয়ে, জলহাত মুখে বুলিয়ে কোঁচার খুঁটে মুখ মুছে দিল। এত ক্ষণ পরে ছোট ছেলেটীর দুটী চোখ আরামে ও শ্রান্তিতে বুজে এল, সে এক রকম অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে রইলো। অনিল তার মাথাটী কোলে নিয়ে চুলের ভিতরে আঙুল চালাবার অবসরে মাঝে মাঝে নরম রাঙা গাল দুটি সুখের আবেশে আস্তে চাপতে লাগলো, —ছেলেটি ঘুমিয়েই হোক্ আর জেগেই হোক্ তার সবটুকু অনুভব করবে অনিল মনে মনে বুঝেছিল।

এইভাবে একটার পর একটা বাকি ষ্টেশন গুলি কেটে গেল; কৃষ্ণনগরের আগের ষ্টেশন পেরিয়ে যেতেই সুবোধ নিজেই উঠে পড়ল ও প্রস্তুত হ'য়ে নিল—অনিল তাহাকে বুকের মধ্যখানে একান্ত আবেগে টেনে আনতেই সে তার মুখের মধ্যে মুখ লুকাল।

'আমাকে তোমার মনে থাকবেত দোলা ?'

'থাকবে।'

কি মনে করে অনিল তার পকেট বই বের করলে, বললে, তোমার মত যদি আমার একটি ভাই থাকতো দোলা।

'সত্যি দাদা, আমি যদি তোমার ভাই হতে পারতাম তাহলে আমি যে—

সে কি হত বা কি করত সেই ভাবের অভিব্যক্তি তার ভাষায় কুলাল না।

'দোলা' তুই যে কি মিষ্টি—

ক্ষণেক চুপ করে থেকে অনিল বল্লে, তোর হাতের লেখা আমার পকেট বুকে দিয়ে যা, তোর স্মরণ চিহ্ন থাকবে।

সুবোধ কপিইং পেন্‌সিল দিয়ে অনিলের খাতায় লিখল—"ইউ আর এ ভেরি গুড্ বয়।

লেখাটা পড়ে একটু হেসে বল্লে, ইংরিজিতে নয়, বাঙলায় লেখ।

এবার সুবোধ লিখল—

'আমি আপনাকে ভালবাসি'।

বাংলা লেখাটা পড়ে কিন্তু অনিলের হাসি পেল না, সে গম্ভীর হয়ে গেল, দুজনে কিছুক্ষণ চোখোচোখি চেয়ে আছে, এমন সময়ে কৃষ্ণনগরে এসে গাড়ী দাঁড়ালো!

পানিপাঁড়ের হাঁক শোনা গেল—কিষ্ট নগর, কিষ্ট নগর!

সুবোধ 'যাই দাদা' বলে নেমে গেল, অনিল একটু করুণ হেসে বিদায় দিয়ে জানালা

গলিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, ছেলেটী হাত নাড়তে নাড়তে দূরে সরে যাচ্ছে—ট্রেন ছেড়ে দিয়েচে। তার চট করে মনে হল, এখানে নেমে গেলে যেন ভাল হত।

বৃদ্ধ লোকটি তার পাশে এতক্ষণ বিস্ময়ে চুপ করে ছিল, এখন জিজ্ঞাসা করল, তোমার ভাইটি এখানেই নামল যে ?

অন্য মনস্কের মত অনিল উত্তর দিল সে বাড়ী গেল।

'বাড়ী গেল ? তার বাড়ী আবার কোথায় ?'

এবার চকিত হয়ে অনিল উত্তর দিলে, কেন ? কৃষ্ণনগরেরই কোথাও হবে।'

'কোথাও হবে ! কোথায় তুমি জানোনা ?'

'না, তা'তো জিজ্ঞাসা করিনি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে।' যেন হঠাৎ সর্ব্বস্ব হারিয়েচে, অনিলের মুখখানা এমনিই হল।

'সে কি ? সেকি তোমার ভাই নয় তবে ?'

তার উত্তর না দিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে অনিল উঠে জানালার ধারে গেল। একজন ভদ্রলোক ডেকে বল্লেন, আপনার কি কাগজ পড়ে গেল মশাই।

কাগজখানা তুলে অনিল দেখল—সেখানা সেই পাঁচটাকার নোট ! যার এমন আত্মহারা ভালোবাসা, জানিয়ে দিলে সে হয়ত ফিরে নেবেনা এই আশঙ্কা করে সুবোধ অনিলের অগোচরে তার প্রথম ভিক্ষা শেষ দানে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

যতক্ষণ না বহরমপুর এল, অনিল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মাথা গলিয়ে, বাহিরের অন্ধকারের দিকে তার দুই চোখ মেলে রইল,—তখন চাঁদ অস্ত গেছে।

শ্রী শিবরাম চক্রবর্ত্তী।

পল্লীর বর্ত্তমান ও নারী নির্য্যাতন

আমার মনে হয় বাঙ্গালার পল্লীর বর্তমান অবস্থা এইসব দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠানের অনুকূল। নারী নির্য্যাতন পল্লীতেই হয় বেশী। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামেই এই সকল কার্য্যে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পল্লীবাসীর নেই। ব্যাধি তাদের দেহের নিত্যকার সঙ্গী, দলাদলি তাদের সমাজের আভরণ, অধিকাংশ স্থলেই সমাজপতির জীবনের মন্ত্র 'আপন গণ্ডা বুঝে নেওয়া,' শিক্ষার অভাবে উপযুক্ত চালকের অভাবে তারা একান্ত অসহায়। এ অবস্থায় প্রবল অত্যাচারীর কাছে মাথা নোয়ান ছাড়া তাদের অন্য গতি নাই। দুর্ব্বলের বল যে সঙ্ঘশক্তি তা একেবারে পল্লী থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার হলে তারা নিজের ঘরের দ্বার বন্ধ করে, অনেক সময় অত্যাচারের পুনরনুষ্ঠানের আশঙ্কায় অত্যাচারিতও প্রতিবিধানে যত্নপর হয় না। বাঙ্গলায় এমন পল্লীও আছে যেখানে দুর্ব্বল গৃহস্থ নিজ সহোদরা কিংবা অন্তঃপুরললনাকে প্রবল পাষণ্ডের গৃহে রাত্রি যাপনের জন্য রেখে আসতে বাধ্য হয়। অবাধ্য হ'লে উৎপীড়ন প্রকাশে কুল-নারীর সতীধর্ম্ম নাশ হয়, এই ...

ফলে লোকগঞ্জনা, সামাজিক নির্য্যাতন। কাজেই লোক চক্ষুর অন্তরালে মনুষ্যত্বের এই অপমান, কামুক পশুর পায়ে নিষ্ফল আর্ত্তনাদের সঙ্গে নারীধর্ম্মের এই উৎসর্গলীলা প্রত্যহ চলতে থাকে। কথাটি অবিশ্বাস্য কিন্তু আদৌ মিথ্যা নয়।

বাঙ্গলার পল্লীর এই অবস্থার জন্য অনেকটা আমরা দায়ী। যে সকল কারণের সমবায়ে পল্লীর এই অবস্থা, তার মধ্যে প্রধানতম কারণ আমাদের নাগরিকতার মোহ। মুখ্যতঃ উপার্জ্জনের আশায় গৌণতঃ ব্যাধির ভয়ে বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় পল্লী ত্যাগ করেছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীর তো কথাই নেই, একটু ইংরেজী যে ছেলেটী শিখেছে সেই আসে সহরে এবং কিছুদিনের পর স্ত্রীপুত্র নিয়ে সহরেই স্থায়ী হয়। গ্রামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। এইরূপে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পল্লীর তথা পল্লীর সাধারণের হৃদয়ের যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়েছে। পল্লীর দুঃখে পল্লীবাসীর নির্য্যাতনে বেদনা বোধ কর্ব্বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাঁরা হারিয়েছেন। তাঁহারা সহরে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়েন, জনহিতকর কর্ম্মে সময়-ক্ষেপ ও বহুল পরিমাণ বাক্যশক্তি ব্যয় করেন এবং ছুটির সময়ে পশ্চিমের গাড়ীর খোঁজ করেন। আপনার পল্লীভবনের দিকে চান না। যাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপদে বিপদে পল্লীর সাধারণকে রক্ষা কর্ত্তেন আজ তাঁদের বংশধরদের ঔদাসীন্য দরিদ্র পল্লীবাসীকে অসহায় করে ফেলেছে।

নৌকা পথে যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সন্ধ্যাবন্দনার জন্য একটি গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধা হ'ল। প্রকাণ্ড গ্রাম নদীটির একটি বাঁক জুড়ে। সমস্ত গ্রামটি এমন নিস্তব্ধ ও অন্ধকার যে চাইতে ভয় হয়। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে গাছের ফাঁকে দু' একটি অট্টালিকাও দেখ্ছিলাম, সেগুলিও অন্ধকার। সমস্ত গ্রামটি যেন জনহীন, নির্জ্জীব। সেরাত্রে নৌকা বেঁধে প্রাতে গ্রামের অবস্থা বুঝবার জন্য গেলাম। প্রথমে যেখানে গেলাম সেটা সূত্রধর পল্লী। জন কয়েক বৃদ্ধ সূত্রধর একটা নৌকা গড়ছিল সেখানে গিয়ে বস্‌লাম। তারা অনেক দুঃখের কথা বল্‌ল। সেকালের সুখের কথা ব'লে একালের অবস্থার কথা বল্ল, পাশের গ্রামের বদ্‌মায়েসদের অত্যাচারে সন্ধ্যার সময় 'বৌঝি' ঘাটে যেতে পারে না। কিছু বললে বাড়ীতে এসে চড়াও হবার ভয় দেখায়, সেদিন এক জেলেনীকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে তিন দিন পরে ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিকারের চেষ্টা কর্‌বার উপদেশ দিলে তারা আমাকে যে জবাব দিল তার সারাংশ আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম,—

"কে তাদের ঘাটাতে যাবে বাবু? আমরা ছোট জাত, পয়সা কড়ি নেই, দিনভোর খেটে খুটে দশগণ্ডা পয়সা পাই, খেতে পরতে কুলোয় না। ভদ্দর বাবুরা দেশে আসেন না, ভরসা দেবার মানুষ নেই, একটা হাঙ্গাম হ'লে পিছনে দাঁড়াবার লোক নেই। যে দু'একজন বাবু আছেন তাঁরা পথে ঘাটে অপমান হবার ভয়ে বাক্যি করেন না। গাঁয়ে সাত ঘর গোয়ালা ছিল তারা একবার 'বাঁক' দিয়ে দু'চারজনকে ঠেঙ্গিয়ে ছিল। হপ্তা কয় বাদে সব

এখান থেকে ছ'কোশ বাবু। একদিন সাক্ষী দিতে গেলে দু'দিন লোকসান। 'বেবসাত' মানুষ 'খেতি' সইতে পারলে না, পাঁচমাস পর মাম্‌লা মিটলে ভিন্‌ গাঁয় চলে গেল।"

তারপর গ্রামের স্বর্গীয় জমিদার বাবুর কাহিনী বলল, যাঁর জীবিত কালে 'সোমত্ত' স্ত্রীলোক একা হাট বাজার কর্ত্তে যেত, জমিদারের ভয়ে কেউ তার দিকে চাইতে সাহস পেত না। এই দুর্জ্জয় প্রতাপ স্বর্গীয় জমিদার বাবুটির বংশধরদের কথা জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম যে তাঁর কৃতবিদ্য দুই পুত্র কলিকাতায় থাকেন, একজন উকীল অপর জন কলেজের প্রোফেসর। পিতার মৃত্যুর পর হইতে এই দশ বৎসরের মধ্যে আর দেশে আসেন নি। কিন্তু এই পল্লীবিরাগ শুধু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, বাঙ্গলার পল্লীর মালিক যাঁরা, সেই ভূস্বামীগণের মধ্যেও এ ব্যাধিটা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অনেকেই বৎসরের অর্দ্ধেকেরও বেশী সময় সহরে কাটান; যে সময় তাঁদের প্রজারা বিচিত্র নির্য্যাতনে আর্ত্তনাদ কর্ত্তে থাকে সে সময় তাঁরা হয় বিচিত্র আমোদ প্রমোদে থাকেন, নৈলে লাট দরবারে হাজিরা দিতে ব্যস্ত থাকেন। জমিদারদের অবস্থা নানা কারণে শোচনীয় হ'লেও তাঁদের যে প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা আছে তা সরকারেরও আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এতখানি প্রভুত্ব ও ক্ষমতা শুধু সুপ্রয়োগের অভাবে নিতান্ত অকেজো হ'য়ে আছে। তাঁদের নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যে সব নির্য্যাতন ঘটে শুধু সেই গুলির প্রতিকারে যদি তাঁরা বদ্ধপরিকর হন তা হ'লে অনেক কাজ হয়। বৎসরে নগর বাসের জন্যে নির্দ্ধারিত সময় থেকে যদি তাঁরা অন্ততঃ দুটি মাস কাল তাঁদের পল্লীর প্রজাদের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য ব্যয় করেন তবে পল্লীর কিছু মঙ্গল হ'তে পারে।

বাঙ্গালার অশীতি সহস্রাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রামের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ গ্রামে এই অবস্থার জন্যে নগরবিলাসী শিক্ষিত পল্লীর সন্তান প্রধানতঃ দায়ী। অবশ্য সকলের পক্ষে সহর ত্যাগ ক'রে সারা বৎসর গ্রামে বাস করা সম্ভব নয় কিন্তু বৎসরের মধ্যে দু'বারও যদি এই তীক্ষ্ণধী শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণ আপন আপন গ্রামে যান এবং পল্লীর নির্জ্জীব সমাজকে নূতন প্রেরণায় জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেন তবে একটা কাজের মত কাজ হয়। পিছনে দাঁড়াবার লোক আছে জানতে পারলে—অশিক্ষিত জন সাধারণ বুকে বল পায়, সর্ব্বপ্রকার গর্হিত কার্য্যকে বাধা দিতে এগোতে সাহস পায়। এমন গ্রাম দেখেছি যেখানে পিছনে দাঁড়াবার লোক পেলে তিনশো সমর্থ পুরুষ এক ডাকে একত্র হতে পারে। শুধু আমাদের ঔদাস্য ও আলস্যপ্রিয়তা এই এতগুলি মানবের কর্ম্মশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে রেখেছে।

পল্লীগঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। নারীনির্য্যাতন সম্পর্কে বাঙ্গলার পল্লীর বর্ত্তমান অবস্থা কতখানি দায়ী এবং সেই শোচনীয় অবস্থার জন্য শিক্ষিত ভদ্র পল্লী সন্তানদের দায়িত্ব কতখানি তারই যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল মাত্র, স্বতন্ত্র নিবন্ধে নারীনির্য্যাতনের অপর কারণ গুলির অনুসন্ধান ও আলোচনা কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্ব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ভারতীয় স্থাপত্য

আজ কাল ইংরাজি শিক্ষার গুণেই হউক বা ইংরাজি রুচির জন্যেই হউক, আমরা ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যা একেবারে ভুলিয়া যাইতেছি। সহরের যে কোন অংশেই যাই না কেন দুই চারিটা ভিন্ন সমস্ত অট্টালিকাই বিলাতি ছাঁচে ঢালা। অট্টালিকাগুলি সৌন্দর্য্যের ধার দিয়াও যায় না, শুধুই ইষ্টকের সমষ্টি। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ভারতীয় অনুকরণ করিতে গেলে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এইরূপ যুক্তি কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ যে অর্থ সাধারণতঃ ইংরাজি গড়নে ব্যয় করা হয় সেই অর্থেই ভারতীয় প্রণালীতে অত্যন্ত সুন্দর রূপে বাড়ী সাজানো যায়। এখন যাহাতে ভারতীয় স্থাপত্যে সাধারণের অনুরাগ জন্মে, সেই উদ্দেশ্যে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি।

ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রায় সকলেই এক বাক্যে বলিবেন যে মুসলমানেরাই ইহার জন্মদাতা। কারণ তাজমহল, মতিমসজিদ, ইৎমৎ-উদদৌলা (জাহাঙ্গীরের শ্বশুরের স্মৃতি সৌধ) সকলগুলিই মুসলমান যুগে নির্ম্মিত। এমন কি, ফারগুসান বলিয়াছেন যে, সাহজাহান ও জাহাঙ্গীরের সময় যে সকল সৌধ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দু স্থাপত্যের লেশ মাত্র নাই, বিদেশী পরিব্রাজকগণেরও এইরূপ ধারণা। আবার কেহ কেহ বলেন ভারতীয় স্থাপত্য মোগল স্থাপত্য সর্ব্বৈব বিদেশী। মোগল কারিকরের সংখ্যা এদেশে অত্যন্ত অল্প ছিল। মোগলেরা হিন্দু কারিকরের দ্বারাই নির্ম্মাণ করাইতেন। ইঁহাদের বুদ্ধিদাতা সকলেই হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের সৌধরাজি কেবল হিন্দুদিগের কার্য্যদক্ষতায় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই বাক্যগুলি যে কেবল পুঁথিগত বর্ণনা হইতে সংগৃহীত তাহা নহে। আমাদের দেশের অনেক লোকে সাহেবরা যদি কোন বিষয় কিছু বলেন সেইটিই বেদবাক্য স্বরূপ মানিয়া লন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সে হাওয়ার অনেক বদল হইয়াছে, এখন অনেকেই নিজের মাথা ও চোখের কিছু না কিছু ব্যবহার করেন। যাঁর চোখ আছে তিনি যদি এই সমস্ত মধ্যযুগের ভারতীয় ইসলাম স্থাপত্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে ইসলাম স্থাপত্যটী হিন্দু স্থাপত্যের খোলসে মোড়া।

হিন্দু মুসলমানের ভিতর পার্থক্য এই যে, মুসলমানেরা মনে করেন ভগবান এক। হিন্দুদের ধারণা ভগবান চেতন, অচেতন, সজীব, নির্জীব পদার্থে বর্ত্তমান।

সরলচেতা আরবি নাবিকেরা দিবারাত্র অসীম সমুদ্রবক্ষে ভাসমান থাকিয়া কেবল প্রশস্ত আকাশ ও বিস্তীর্ণ পৃথিবী নিরীক্ষণ করে। শিবিরবাসীগণ দেখে তাহাদের পটমণ্ডপের উপরিভাগে স্তব্ধ নীলাকাশ অনন্ত মরুভূমির চতুর্দ্দিকে মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল সৌন্দর্য্য তাহাদের অন্তরে একেশ্বরবাদের বীজ-অঙ্কুরিত করে। এবং এই সকল সৌন্দর্য্য হইতেই ইহাদের

শিল্প বিস্তার প্রারম্ভ। বিশ্ববিধাতা যেরূপ তারকা নক্ষত্রগুলিকে বাহুরেখা দ্বারা গগনে অঙ্কিত করিয়াছেন, আরবী শিল্পের রেখাচিত্রগুলিও সেইরূপ অঙ্কিত। আরবী শিল্প হিন্দু শিল্পের ন্যায় আকারযুক্ত নহে। এইরূপ শিল্পে হিন্দুরাই চরম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন প্রায় সকল ইস্লাম (Saracenic)স্থাপত্যের সঙ্কেতসূত্রগুলি ভারতবর্ষের হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণ। এমন কি কোন বিশেষ খিলান (Painted arch) যাহা Saracenic স্থাপত্যের মূল চিহ্ন, তাহাও হিন্দু স্থাপত্য হইতে গৃহীত। এইরূপ খিলান দ্বারা মুসলমানেরা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এই খিলান কেবল শোভাবর্দ্ধন জন্য নহে, ইহার দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মের মূল সূত্র "ভগবান এক ও মহম্মদ তাঁহার পয়গম্বর" ব্যক্ত হয়। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই কালক্রমে যেরূপ এক কেন্দ্রে মিশিয়া যায়, খিলানের দুই বাহুও সেইরূপ এক কেন্দ্রে মিশিয়াছে। হিন্দুদের ধারণা ইহার বিপরীত। কাজেই তাঁহারা মনে করেন যে এইরূপ খিলান তঁহাদেরই, যদিচ এইরূপ খিলান পুরাকালের অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে দেখা যায় এবং এই খিলানে হিন্দুধর্ম্মের কিছুই সংশ্লিষ্ট নাই তাহাও বলা যায় না। কারণ হিন্দুরা পদ্মের দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। পদ্মের পাপ্ড়ির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

যখন আরব দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন তাঁহাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল প্রতিমা পূজক দিগকে ধ্বংস করা। এবং এ উদ্দেশ্য পূর্ণ না করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। যত হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল তাহাদের সমস্ত প্রতিমা গুলিই বিনষ্ট হইয়াছিল ও মন্দির গুলি মসজিদে পরিণত হইয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্মের পণ্ডিতেরা তখন এইসকল মসজিদের চিহ্নগুলি নিজধর্ম্মের মতানুযায়ী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধদেবের প্রধান মূর্ত্তিনিকেতনটি (নিশ বা কুলুঙ্গি) মুসলমান তীর্থস্থান মক্কার দিক্‌চিহ্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, ক্রমে ইহা ইসলাম ধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদের প্রার্থনা স্থানে অঙ্কিত হইল। এই চিহ্নটি সকল আরববাসীগণের চিত্তাকর্ষণ করিল। কারণ নাবিকগণ তাহাদের জাহাজের উপরভাগের, মরুভূমিবাসীগণ তাঁহাদের পটমণ্ডপের প্রবেশ পথে এই চিহ্নটী প্রত্যহই দেখিতে পাইতেন। আরব দেশীয় ঐতিহাসিকেরা বিধর্ম্মীদিগের এই সকল মন্দিরগুলির "বৌধখানা" নাম দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের মুসলমান আক্রমণকারিদের ধারণা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ছিলনা। তাঁহারা হিন্দু সৌধ শিল্পী ও কারিকরদিগের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। আরবদেশীয় ঐতি-হাসিক এল্‌বেরুনি যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তিনি হিন্দু শিল্পীদিগের এই সকল কার্য্যে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে আমাদের দেশের লোকেরা এই সকল কার্য্য দেখিয়া কেবল আশ্চর্য্যই হইতে পারে কিন্তু এইরূপ সৌধ প্রস্তুত করা তাহাদের কল্পনাতীত। আবুল ফজলও বলিয়াছেন যে হিন্দুস্থানের চিত্র শিল্পের সহিত অন্য কোন শিল্পের তুলনাই হইতে পারে না। আল্‌বেরুনির সমসাময়িক গজনির সুলতান মামুদ প্রতিমা পূজকদিগের

অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তথাপি তিনি হিন্দু সৌধশিল্পীদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মথুরা লুণ্ঠনের পর তিনি বলিয়াছিলেন যে এইরূপ সুন্দর সহর দুই শত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমেও নির্ম্মিত হইতে পারে না। লুণ্ঠনান্তে তিনি ৫৩০০ হিন্দু বন্দীসহ গজনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহারা প্রায় সকলেই সুধাজীবী ও শিল্পী। এই সকল বন্দিগণ দ্বারাই তিনি তাঁহার মহাবিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ,শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত,নয়ন মুগ্ধকর মস্‌জিদটী তৈয়ারী করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্তেই জানা যাইতেছে যে হিন্দু শিল্পীদের স্থান মুসলমানযুগেও কত উচ্চ ছিল।

ভারতীয় স্থাপত্যের বিষয় কিছু বলিতে গেলে তাজমহলের উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফারগুসান বলিয়াছেন যে জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের অট্টালিকাগুলিতে হিন্দু স্থাপত্যের কিছুই প্রতীয়মান হয় না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কিন্তু আমরা ইৎমৎ উদ্দৌলা এবং তাজমহলেও পদে পদে হিন্দু স্থাপত্যের চিহ্ন দেখিতে পাইব। ইৎমৎ উদ্দৌলার উপরিভাগ সমস্তই হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণ। তাজমহলের বহির্দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বলিবেন যে ইহা মুসলমান শিল্পের উদাহরণ। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে গেলে আমাদের মতের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

খেদিভ রাজ সরকারের সৌধশিল্পী ফ্যানজ পাশা বলিয়াছেন যে, আরব দেশীয় শিল্প সূক্ষ্ম অলঙ্কার কার্য্যে (ornamentation) চরম স্থান অধিকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে সৌসামঞ্জস্য এবং সাকার অলঙ্কার বলিয়া কিছুই নাই। প্রায় সমস্ত ইস্‌লাম অট্টালিকাতেও এই দোষগুলি বর্ত্তমান, তাজমহলে ইহার একটী দোষও দৃষ্ট হয় না।

তাজমহলের ছাদ পাঁচটী গম্বুজ দ্বারা নির্ম্মিত, মধ্যভাগে একটী ও চারি কোণে চারিটী। এইরূপ ব্যবস্থাবদ্ধ সজ্জা কেবল হিন্দু স্থাপত্যেই দেখা যায়। হিন্দু সৌধশিল্পীরা ইহাকে পঞ্চরত্ন বলিতেন। পঞ্চরত্ন বলিতে শিবের পঞ্চ লিঙ্গ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম বুঝাইত। কাজেই তাজের গম্বুজগুলি যে হিন্দু অনুকরণে নির্ম্মিত ইহা নিঃসন্দেহ; তাজমহলের মধ্যভাগের গম্বুজটিই ইহার প্রধান শোভা। গম্বুজটীর উপরে একটী কলস; কলসের নীচে একটী উল্টানো পদ্ম, এবং এই পদ্মের ভিতর হইতে গম্বুজটী যেন বৌদ্ধ স্তূপের ন্যায় নামিয়া আসিয়াছে। এইরূপ গম্বুজ ইটালীয় নহে, saracenicও নহে, ইহা খাঁটি হিন্দু। আজন্তায় এইরূপ অনেক গম্বুজ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাজমহলের খচিত-কার্য্যগুলিও অত্যন্ত সুন্দর। ফেরিস্তা হইতে জানা যায় যে, খচিত কার্য্যের জন্য যে সকল কারিকর নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাও সকলে হিন্দু ছিলেন। এই কার্য্যের প্রধান শিল্পী ছিলেন চিরঞ্জীলাল, ইনি সরকার পক্ষ হইতে আট শত টাকা বেতন পাইতেন। ইহার অধীনে ছোটীলাল, মনুলাল ও মনুহর সিং কার্য্য করিতেন, ইহাদের প্রত্যেকের বেতন তিন শত টাকারও অধিক ছিল।

তাজমহলের সুন্দর নয়নরঞ্জন উদ্যানটীও হিন্দুর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা তাজমহলের ন্যায় সৌধেরই উপযুক্ত।

ইহা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গড়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারিকর নিযুক্ত করা হইয়াছিল। শ্বেত প্রস্তরের গাঁথনি পর্য্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন মহম্মদ হানিফ, ইহার বেতন ছিল সহস্র মুদ্রা গম্বুজগুলি মহম্মদ সৈয়দ দ্বারা ও তাহার কারুকার্য্য ইসমাইল খাঁ রুমিঁর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহারা প্রত্যেকে সরকার হইতে ৫৯০ মুদ্রা পাইতেন।

আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, ভারতীয় স্থাপত্য সম্পূর্ণ ভারতীয়—ইহাতে বিদেশী স্থাপত্যের বিন্দুমাত্রও নাই। হিন্দু ও মুসলমানদিগের কার্য্যদক্ষতা ও মুসলমান বাদসাদের উৎসাহে ইহা আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা সেই হিন্দু মুসলমান ভারতবর্ষে বাস করিয়া আমাদের নিজ শিল্প ভুলিয়া গিয়াছি। এখন য়ুরোপীয়দিগের বাক্য আমরা বেদবাক্য বলিয়া মনে করি। তাঁহারা যদি বলেন যে ভারতীয় শিল্প সুজান দেশের অনুকরণে, তথাস্তু—অথবা ভারতীয় শিল্প বোহিমীয় তথাস্তু।—সাদা কথায় তাঁদের কথাই আমরা জিওমেট্রির অভ্রান্ত সত্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া থাকি।

আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে চর্চ্চা করি, আমাদের নিজ নিজ গৃহ আমরা যথাসাধ্য ভারতীয় স্থাপত্য অনুসারে নির্ম্মাণ করিব, ইহাই যদি আমাদের বাসনা থাকে তাহা হইলে এমন সময় আসিবে যখন আমরা আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইব এবং দেখাইতে পারিব যে যদিও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় এবং ভবিষ্যৎ অন্ধতিমিরে নিহিত, তথাপি এমন একদিন ছিল যেদিন ভারতস্থাপত্য জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আমাদের দেশের সবজান্তা পণ্ডিতগণের নিকট আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারা ভারতীয় স্থাপত্যেও পারসিক ও ইটালীয় প্রভাব সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা না করিয়া একবার ভারতীয় স্থাপত্যের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখুন।

শ্রীজয়দেব চৌধুরী।

হীরা বিজয় সুরী

আইনী আকবরী গ্রন্থে আবুল ফজল ৪০ জন পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। অনুমান করা যাইতে পারে আকবরের সময়ে ইহারাই ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ব্লকমান সাহেব অনেকেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু আজ আমরা যে মহাপুরুষের সম্বন্ধে আলোচনা করিব, তাঁহার কোন পরিচয় ব্লকমানের আইনী আকবরী গ্রন্থে না থাকায়, ঐতিহাসিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে বহুদিন পর্য্যন্ত কোন তথ্য অবগত ছিলেন না। স্মিথ সাহেব প্রথমে তাঁহার জীবনী প্রচার করিয়া, ঐতিহাসিক অভাবটি অনেক পরিমাণে দূর করিয়াছেন। এই মহাপুরুষ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অকাট্য যুক্তি আকবরের হৃদয়ে এরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে কথিত আছে ভারত সম্রাট তাঁহার দ্বারা জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিছুকাল ধরিয়া ঐতিহাসিকগণের ভ্রান্ত ধারণা ছিল আকবর বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া স্মিথ সাহেব বলেন যে এই ভ্রান্তির জন্য চামার্স (Chalmers) ইলিয়ট, ডাউসন্ ও ভন্ নোয়ার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ দায়ী। আকবরনামা গ্রন্থে (vol III. Chxli. P 365 Beveridge's Edn) দেখিতে পাওয়া যায় যে সুফী, সুনী, সিয়া, ব্রাহ্মণ, যতি, খৃরি, চারবাক, নাআরিন, ইহুদি, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইবাদাদখানায় একত্র হইয়া, ধর্ম্মালোচনার দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিতেন। ঐতিহাসক মাত্রেই অবগত আছেন যে, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের আদেশে ইসলাম ধর্ম্মের তথ্য নিদ্ধারণের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণকে একত্র করিয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়। তিন বৎসর কাল ধরিয়া ইবাদাদখানায় কেবল মাত্র ইসলাম ধর্ম্মেরই আলোচনা হয়, পরে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আকবরের মন হইতে সাম্প্রদায়িক ভাব অপনীত হইলে, জৈনও অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণ ইবাদাদখানায় প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মলোচনায় যোগ দিয়া একমাত্র সত্যধর্ম্ম নির্দ্ধারণে সাহায্য করিবার জন্য আহুত হন। তথায় বহু লোকের বসিবার স্থান ছিল। প্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যানে এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, এত অল্প সময়ের মধ্যে সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইবার কারণ ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং এই অট্টালিকা সমভূমি করিয়াছিলেন। এই অট্টালিকায় যতি ও সুরীগণ একত্র হইতেন, আকবর নামায়

ইহার উল্লেখ পাইয়া চামার্শ ভ্রান্তি বশতঃ ইহাদিগকে জৈন ও বৌদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ইলিয়ট ও ডাউসন তাঁহার এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করায়, ভন নোয়ার অনুমান করেন যে সে সময়ে ফতেপুর সিকরিতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের অভাব হয় নাই, এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ যে কোন দিন ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিয়াছিলেন অথবা আকবর যে কোন দিন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, তাহার স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, বরং তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে। আবুল ফজল আইনী আকবরীতে স্পষ্টই বলিয়াছেন আমি হিন্দুস্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুস্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, পেগু, টেনাসরিম্ ও তিব্বতে আশ্রয় লইয়াছে। (Ain vol III Janet p 212) সুতরাং কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গলাভ আকবরের ভাগ্যে ঘটে নাই। ধর্ম্মালোচনায় কোন বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত যে কোন দিন উপস্থিত হন নাই একথা বলাই বাহুল্য।

এখন জৈন ধর্ম্ম নিস্তেজ হইলেও এককালে ইহার প্রভুত্ব বড় কম ছিল না। কথিত আছে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভদ্র-বাহু নামক একজন নৃপতি ভারতের উত্তর হইতে আসিয়া মহিশূরের সন্নিকটে জৈন রাজ্য স্থাপন করেন। ভদ্রবাহুর সহিত মৌর্য্য নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের এতই গভীর সখ্য ছিল যে তাঁহার অন্তিমসময়ে পরম যত্নে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন এবং যেখানে বলভদ্রের মৃত্যু হয়, জীবনের শেষভাগে তিনি সেখানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই জৈনদিগের মধ্যে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর নামক দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। যতি ও সুরী আখ্যাধারী পণ্ডিতগণ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত। আকবরের সময়েও গুজরাট শ্বেতাম্বর জৈনদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল।

হীরাবিজয় শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত একজন অদ্বিতীয় জৈন পণ্ডিত ছিলেন। আইনী আকবরী গ্রন্থে তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। হীরা বিজয় ব্যতীত আকবর বিজয়সেন সুরী ও ভানুচন্দ্র উপাধ্যায়ের নিকট হইতে জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু উপদেশ পাইয়াছিলেন কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে হীরা বিজয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আকবরের অনুরোধে গুজরাট হইতে আগ্রায় আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে আকবরকে জৈন ধর্ম্মের গভীর দার্শনিক তথ্যে মুগ্ধ করেন এবং জৈন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। নিম্নে এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল। ১৫৮৩ সম্বৎ বা ১৫২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। গুজরাটের অন্তর্গত পালানপুর বা প্রহ্লাদানপাতন ইহার জন্মভূমি। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ইঁনি বিজয় দীন সুরীর নিকটে দীক্ষিত হন। গুরু কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইয়া ইনি তর্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি বাসক উপাধি লাভ করেন। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার অন্তর্গত শিরোহী প্রদেশে ইনি সুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই

তিনি একটি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি মর জগৎ ত্যাগ করেন।

অগাধ পণ্ডিত্যের জন্য হীরা বিজয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবেন। কারণ আকবর ইহার খ্যাতির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত রাজধানীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য গুজরাটের শাসনকর্ত্তা সাহাবুদ্দিন আহেদখানের নিকট দূত পাঠাইয়া দেন। শাসনকর্ত্তার অনুরোধে হীরাবিজয় আপন সম্প্রদায়ের পরিচালন ভার বিজয়সেন সুরীর উপর ন্যস্ত করিয়া আগ্রা যাত্রা করেন। তাঁহার যাত্রার জন্য সুন্দর যান ও বাহনের আয়োজন সাহাবুদ্দিন করিয়াছিলেন। অহিংসা, সত্যবাদিতা, অপ্রসন্ন চিত্তের দান প্রত্যাখ্যান, পবিত্রতা, সম্পদ-ভোগ-ত্যাগ এই পঞ্চ ব্রত জৈন মাত্রকেই গ্রহণ করিতে হয়। তদনুসারে তিনি শাসনকর্ত্তার সর্ব্ববিধ দান প্রত্যাখ্যান করিয়া পদব্রজেই আগ্রা যাত্রা করেন। এই দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি রাজদরবারে উপনীত হইয়া আকবরকে বিস্ময়মুগ্ধ করিয়া দেন আকবর সে সময়ে বিষয়ান্তরে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তিনি ইহার পরিচর্য্যার ভার আবুল ফজলের উপর ন্যস্ত করেন। ইহাতে আবুল ফজল বিশ্রম্ভালাপে হীরাবিজয়ের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবার সুযোগ প্রথমেই পাইয়াছিলেন। অবসর পাইয়াই আকবর পরম সমাদরের সহিত তাঁহাকে আপনার সান্নিধ্যে আনয়ন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া মোহিত হন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আবকর তাঁহাকে কোন উপহার দিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু হীরাবিজয় কোন দান গ্রহণেই সম্মত হইলেন না, অবশেষে আকবর তাঁহাকে কতিপয় পুস্তক উপহার দিতে কৃতসংকল্প হন এবং তাঁহাকে এই উপহার গ্রহণে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। আকবরের একান্ত অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে পুস্তকগুলি গ্রহণ করিয়া, আগ্রার কোন পুস্তকালয়ে দান করেন। স্মিথ সাহেব অনুমান করেন এই সময়ে সম্ভবতঃ আগ্রা সহরে জৈনদিগের কোন পুস্তকালয় ছিল এবং হীরাবিজয় সাম্প্রদায়িক পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য পুস্তকগুলি তথায় পাঠাইয়া দিয়া থাকিবেন।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আকবর জৈন গুরুর উপদেশ মত জৈন ধর্ম্মানুমোদিত কতিপয় আদেশ প্রচার করেন। এই সময় হইতেই প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ হয়, এমন কি ফতেপুর সিক্রিতে একটী বৃহৎ সরোবর ছিল তাহার নাম ছিল দীবর। রাজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ ইহাতে মৎস্য শীকার করিতেন; এই সময় হইতে দীবরে মৎস্য শীকার নিষিদ্ধ হয়। পর বৎসর "জগৎগুরু" উপাধি লাভ করিয়া হীরাবিজর শান্তিকেন্দ্র উপাধ্যায় নামক জনৈক জৈন শ্রমণকে দরবারে রাখিয়া আগ্রা ত্যাগ করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকাল তিনি এলাহাবাদে অতিবাহিত করিয়া শিরোহী যাত্রা করেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তথায় সুরথান নামক একজন সামন্ত রাজা রাজত্ব করিতেন, কোন কোন পস্তকে সুরথান ভ্রম ক্রমে সুলতান হইয়া গিয়াছে।

ইহাতে কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে মুসলমান নৃপতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত, কারণ সুরথান লিপিপ্রমাদ বশতঃ অথবা অনুবাদকের অজ্ঞানতা বশতঃ সুলতান হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা হউক জগৎগুরুর উপদেশ শুনিয়া শিরোহী নৃপতি মুগ্ধ হন। শিরোহীতে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া হীরাবিজয় আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার পর সুদীর্ঘ আটবৎসর ভারতের একটি নগণ্য নগরে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি ধর্ম্ম চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তাঁহার যশঃ এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, যে ভারতের বহু নৃপতি তাঁহার দর্শন মাত্র লাভকরিতে পাইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। যশ ও খ্যাতির মধ্য হইতে আপনাকে সবলে টানিয়া আনিয়া, তিনি স্বেচ্ছায় আপনাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে নিভৃত ধর্ম্মালোচনায় নিয়োগ করেন। এই জন্যই তাঁহার শেষ জীবনের কোন বিশেষ কথা জানিতে পারা যায় না। এই খানেই তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে জৈন ধর্ম্মানুমোদিত অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

কাথিয়ারের অন্তর্গত পালিটান নগরের সন্নিকটস্থ শত্রুন্‌জয় নামক পর্ব্বতে আদিনাথের মন্দির আছে। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। হীরাবিজয় এই দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের প্রবেশ পথে একটি দীর্ঘ উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে রচিত। রচনাকর্ত্তা স্বয়ং হীরাবিজয়। বুলার সাহেব এই লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে হীরাবিজয় একজন জৈন শ্রমণ তাঁহার উপদেশে সম্রাট আকবর ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ছয় মাসের জন্য প্রাণী হত্যা নিবারণ করেন! অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে জিজিয়াকর রোধ, আগ্রার জৈন পুস্তকাগার স্থাপন, শত্রুন্‌জয় পর্ব্বত জৈনদিগকে প্রদান কার্য্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু ব্যক্তিকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। বহুবার জৈন মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং মালবের বহু ব্যক্তিকে শত্রুন্‌জয় দর্শনার্থ গমনে প্রবুদ্ধ করেন। পরিশেষে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

আকবর হীরাবিজয় ও অন্যান্য জৈন শ্রমণদের সহবাসে ২০ বৎসর অতিবাহিত করেন। জৈন ধর্ম্ম তাঁহার জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কারণ তিনি জীবহত্যার বিরুদ্ধে কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। বহু পরিবার দণ্ডিত হইয়া উৎসন্ন গিয়াছিল।

জগৎগুরু কাব্যম ও হীরা সৌভাগ্যম্ নামক দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই দুইখানি পুস্তকই হীরাবিজয়ের জীবনী স্বরূপ। এই দুইখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ আলোচনা করিয়া স্মিথ সাহেব এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আকবর হীরাবিজয় কর্ত্তৃক জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এবং জৈন শ্রমণগণের সহবাসের ফলে তাঁহার জীবনে জৈন ধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত পরিমাণে দেখা গিয়াছিল। তিনি কোন দিন বৌদ্ধ শ্রমণের সহবাস লাভ করেন নাই; সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের কোন তথ্যই তিনি বিশেষ ভাবে অবগত হইবার সুযোগ পান

নাই। জৈন ধর্ম্মের অহিংসা আকবর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগের মধ্যে আংশিক ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। জৈন ধর্ম্ম ও জোরাস্তার ধর্ম্ম আকবরের মনে যেরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আর কোন ধর্ম্মই সেরূপ গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

নারী প্রতিভা

স্ত্রীলোকের স্বভাব চরিত্র বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি সম্বন্ধে সেকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত অনেক অভিমতই শুন্‌তে পাওয়া গেছে এবং যায় সপক্ষে বিপক্ষে, কিন্তু স্ত্রীলোকের যে প্রতিভা থাকেনা এটা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত মত। বিদেশী অনেক পণ্ডিত তাঁদের বইতে কারণ যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে স্ত্রীলোকের প্রতিভা থাকে না এবং থাক্‌তে পারে না, দেশীরা বইতে বিশেষ করে যুক্তি কারণ না দেখালেও এমন অশ্রদ্ধেয় ভাবে মত প্রকাশ করেছেন, তাতে ঐ মতের সমর্থন হয়েছে। যে সব পুরুষ নারীকে শ্রদ্ধা করেন 'মানুষ' বলে আর যে সব নারী নিজের এবং অন্যের অন্তরের 'নারীটী'কে চিনেছেন বা চেনেন তাঁরা সকলেই এই মতটী শুনে গভীর দুঃখ অনুভব করেন। এদের মধ্যেরই কেউ কেউ ঐ সব মত খণ্ডন করতে চান প্রাচীনকালের প্রতিভাশালিনী এবং আধুনিক যুগের বিখ্যাত নারীদের এনে কিন্তু সেই নারী 'প্রতিভা' সংখ্যায় এত কম যে তাতে নারী বা পুরুষ কারুরই অন্তর সন্তোষ লাভ করে না নারী বেচারীরাত জানেনই তাঁদের স্থান পৃথিবীতে 'সংখ্যার' পাশে 'শূন্যের' মতন যদি বা কারুর 'প্রতিভা' থাকে ত চাঁদের আলো,—সূর্য্যকিরণ নয়। ধার করা প্রতিভাকে পুরুষ সস্নেহে 'প্রতিভা' বল্‌লেও নারীর চিত্ত তাতে পরিতৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হয় না। এই প্রতিভা যে কেন থাকেনা তার সব চেয়ে বড় কারণ নাকি নারী 'জীবজননী'; 'জীবজননী' হ'লেই যে প্রতিভা কেন থাক্‌তে পারে না বা জন্মায় না জীবজননী বা মহত্বের সঙ্গে প্রতিভার কি রকম সম্পর্ক সেটা ভাববার জিনিষ এবং সেটা নিয়ে প্রত্যেক নারীরই আলোচনা করা উচিত।

প্রতিভার পুর্ণবিকাশের জন্য স্ফূর্তির জন্য, যে স্বাধীন ক্ষেত্র দরকার এটা বোধ হয় একটা মত, বিপরীত মতও আছে যে প্রতিভা স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বপ্রকাশ। প্রতিভা থাকলে আপনি ফুটে উঠবে। কিন্তু তবু নারীর সম্পর্কে সেটী বলবার আগে একবার নরনারীর সামাজিক অবস্থাগত বৈষম্য তলিয়ে দেখা দরকার।

সকলদেশে সব সমাজেই পুরুষের সঙ্গে নারীর সামাজিক স্থান সমান নয়, যাঁদের দেশ স্ত্রী স্বাধীনতার লীলাভূমি তাঁদেরও নয়। কেন যে নয় সেটী সমাজ সমস্যা, তার ভিতরে সমাজভুক্ত নরনারী উভয়েরই স্বার্থ সুবিধা। সে জিনিসটাতে কার কতটা সুবিধা ভাববার প্রয়োজন দেখিনা, কাকে কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, কতটা নিষ্পেষিত হয়ে থাকতে হয়েছিল এবং হয়, প্রতিভার ক্ষেত্রতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে সেইটে দেখা আজো দরকার।

বুদ্ধি সকল মানুষেরই থাকে—কারুর কম কারুর বেশী, যাদের বুদ্ধিবৃত্তি অনন্যসাধারণ, সূক্ষ্মদৃষ্টিশালী, বহুমুখী, সৃজনক্ষম, তাঁরাই প্রতিভাশালী বলে খ্যাত এবং বিবেচিত হন। তাঁদের অন্তরে নিজত্ব এবং অন্যত্ব সমানভাবে পরিস্ফুট, প্রতি মানুষের বিশেষত্ব তাঁর অন্তরে আপনার মত ফুটে উঠে রচনার মধ্যে প্রকাশ হয়। এই গুণ বা বিভূতিটী ভগবানের দান অথচ ভগবান পুরুষ মানুষের মত তা পুরুষকে দিয়েছেন নারীকে দেননি। নারী যদি মানুষ না হয়ে কোনো মানবেতর জীব হতেন, তা তাহলে এটা মানা সহজ হ'ত এবং অন্তরে কোনো বেদনাও ফুটে উঠত না। মনে করা যেত, অভিব্যক্তিবাদ কোনো দিন তাঁদের মানুষের ক্ষেত্রে পোঁছে দেবে। কিন্তু আপাততঃ নারীকে যখন মানুষ বলে মনে করা যাচ্ছে তাঁর যে মানবোচিত গুণ ও সম্পূর্ণতা থাকবে না—এ কল্পনাও পীড়াদায়ক।

প্রতিভার ভিত্তিভূমি সততা; জিনিষটা কি রকম করে মানুষের অন্তরে স্ফূর্ত্তি পায়, বিকশিত হয়ে ওঠে,—বিকাশ লাভ করবার জন্য কি রকম স্বাধীনতা দরকার হয়, সেইটে দেখলে নরনারীর চরিত্রের এই প্রধান এবং বিষম বৈষম্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। যাঁর চরিত্রে 'সততা' নেই অন্য অনেক গুণ আছে তাঁর বুদ্ধি হয় তো সৃজন কখনো করতেও পারে, সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হতেও পারে—কিন্তু তা প্রতিভা নয়। তা প্রতিভার মতন চিরস্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না, চির নূতনরূপ ধারণ করতে পারে না।

সমাজ যখন গড়ে উঠেছিল সুবিধাবাদের মধ্য দিয়েই হোক বা কর্ম্মবিভাগের মাঝ দিয়েই হোক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রত্যেক সামাজিকেরই কমাতে হয়েছিল সমষ্টির সুবিধার কাছে। সামাজিক, পুরুষ ও নারী, উভয়েই তাঁদের ব্যষ্টির স্বার্থ, সমষ্টির সুবিধার কাছে বলি দিয়েছিলেন। পুরুষকে যা দিতে হয়েছিল তার মধ্যে তাঁর অশোভন উচ্ছৃঙ্খল শক্তি সামর্থ্যের অংশই বেশী ছিল, যে শক্তি সামর্থ্য দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করত: তাকেই সমাজ শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। মানবত্বের অধিকার তাঁর খর্ব্ব করা হয় নি। কিন্তু

নারীকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল, হচ্ছে, কেন, সেইটাই নারীর প্রতিভাহীনতার মূল কারণ নির্ণয় করবে।

নারী "জীবজননী" বা "পত্নী" সম্পর্কের মাঝ দিয়ে যা পেয়েছিলেন যেটা তাঁর সুবিধা করেছিল সন্তান লালনের ভার জননীর উপর রেখে, জীবিকা সংগ্রহের ভার তার (শিশুর) পিতার উপর দিয়ে বটে—কিন্তু অসুবিধা যা' করেছিল তা থেকে কোন দেশের নারী সমাজ আজো মুক্তি পা'ন নি; সেটা হচ্ছে চিন্তার, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে। নর নারী কিজন্য প্রথমটা পরস্পরের সাহচর্য্যে ছিলেন তার মূল কারণটা যতদূর সম্ভব শুধু নারীরই মাতৃত্বজনিত স্বার্থচেষ্টা বা রক্ষা চেষ্টা নয়, তাতে উভয়তঃ মায়া মমতার আকর্ষণ স্নেহাসক্তি স্বভাব-জাত উভয়ের পরস্পরের সান্নিধ্যইচ্ছা ইত্যাদি সবই ছিল; এই সমস্ত জটিল জিনিষ মিলিয়ে এই সাহচর্য্য প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে সমাজভুক্ত নরনারীরা যা' ভাবতেন যা' বলতেন পরস্পরের কাছে গোপন করবার চেষ্টা করতেন না কৃত্রিমতা না থাকার জন্য। তাঁদের গোত্র বা যূথের মধ্যে উভয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, বাহিরের আক্রমণ বা অত্যাচারের সময়ও সমভাবে সাধ্যমত উভয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেন এইটাই সাধারণ প্রথা ছিল। যে প্রাচীন কালের প্রতিভাশালিনী মহিলাদের, সুক্ত মন্ত্র রচয়িতাদের নাম আমরা শুনতে পাই বা দেখতে পাই ব'লে, স্মরণ করে কৃতজ্ঞ, আনন্দিত এবং গর্ব্বিত হই তাঁরা এই যুগের; সমাজ (পুরুষ) তাঁদের অন্তরকে ভয় দেখিয়ে সততা শূন্য করতে পারে নি। সমাজ-বহিষ্কারের যে ভীষণ শাস্তি তা তাঁদের স্পর্শ করতে তখন পারত না. নারী পুরুষের কোনও অধীন জীব ছিলেন না।

ক্রমে তাঁদের বুদ্ধি প্রতিভা শুধু যূথ বা গোত্রের মধ্যে আবদ্ধ রইল না অন্য সব গোত্র বা যূথের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল ও সেই সময় থেকেই সমাজ বিস্তৃত হ'য়ে দেশ বেড়ে উঠতে লাগল। তখন যে সব নিয়ম গড়ে উঠতে লাগল আগের নিয়মের পরিবর্ত্তে, তার 'গল্পেতিহাস', পুরাণ মহাভারতের প্রাচীন বইয়ের পাতায় পাতায় দেখতে পাওয়া যায়। নারী শৃঙ্খল পরলেন 'শৃঙ্খলার' জন্য। জ্ঞান চর্চ্চায় স্বাধীনতা, স্বাধীন চিত্তকে সসম্ভ্রমে নেয়ার ঔদার্য্য, তখন থেকেই উঠে যেতে লাগ্‌ল। নারীর গৃহ কর্ম্ম সন্তান লালন প্রভৃতির নাম দিয়ে তাঁদের জন্য অন্তঃপুর সৃষ্ট করার জন্য প্রচুর অবকাশ থাকা সত্বেও, পরস্পরের আলোচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। কেন, কি জন্য, সেটাও ভাববার বিষয়, সন্দেহ হয় সমাজ (পুরুষ) পবিত্রতার নাম দিয়ে প্রথমটা, পরে নিজের সুবিধার জন্য তাঁকে মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছিলেন। ক্রমে সমাজের প্রথাই তাই দাঁড়িয়ে গেল, নারীর কর্ম্মক্ষেত্র অন্তঃপুর, পুরুষের বাহির। সেই সময়ে যে সব অনুশাসন, বিধি নিষেধ হয়েছিল তাতে নারীকে পূজা এবং অসম্মান তুল্য ভাবে করা হয়েছিল, এই থেকে বেশ বোঝা যায় তখন নারী আর মানবী ছিলেন না, মাতা, পত্নী, দুহিতা ভগিনী ছিলেন, এই সম্পর্কের বাহিরে তাঁরা কোন দিন মানুষের অধিকার ত

পায়ইনি, বিলাস লীলার ক্রীড়নক মাত্র ছিল। কাজেই মনে হয় নারী মাতৃত্বের জন্য নয় পবিত্রতা রক্ষা নামক ভীতির জন্য সমাজ কর্তৃক স্বাধীনতাচ্যুত হয়েছিলেন। কেননা অতি প্রাচীন কাল থেকে সমাজ দেখলে বোঝা যায় স্বাধীনতা হরণের কোনোই আবশ্যক ছিলনা। কেননা প্রাচীন কালের সেই প্রতিভাশালিনীরা পুরুষের সাহচর্য্যে ছিলেন, অধীনে ছিলেন না অথচ কোনো নিন্দা গ্লানি কিম্বা কোনো রকম অসম্মান তাঁদের স্পর্শও করতে পারেনি, এমন কি নারীর অসম্মানসূচক কোনো প্রথার সৃষ্টিও হয়নি। তাঁরা নিজের অন্তরের মানবীয় তেজস্বিতায় মহিমায় সততায় উদ্ভাসিত ছিলেন, কোনো সমাজ নামক কৃত্রিম স্বার্থের বন্ধন তাঁদের অন্তরের নারায়ণকে নিষ্পেষণ করতে পারে নি। তাঁদের চিন্তা শক্তিকে কেউ ভয় দ্বারা রুদ্ধ না করাতে কোন ভাব কোন কল্পনা তাঁরা গোপন করতে শেখেন নি। কিন্তু সমষ্টি (যূথ) বা সুবিধা বুঝে সকলের মঙ্গলের জন্য কল্যাণের জন্য যা করেছিলেন মানুষ (ব্যষ্টি) সেটার অপব্যবহার করলেন, স্ব স্ব সম্পর্কীয়াদের কায়মনের বাণীর স্বাধীনতা হরণ করে। সেই সময় থেকে "নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়" "মুণিনাঞ্চ মতিভ্রম" হ'তে আরম্ভ হ'ল। সমাজ ক্রমে নারীর আশ্রয় হ'য়ে দাঁড়াল, নরনারী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাত্রী রূপে সমাজের আশ্রয় স্বরূপ হয়ে রইলেন না। পুরুষ জানলেন আমি সমাজ "পতি", সেই জন্য যত রকম বিধি নিষেধ সমস্তই পুরুষের স্বপক্ষে গড়ে উঠতে লাগল—সামাজিক পবিত্রতার নাম দিয়ে, মানবীর অন্তরের নারায়ণকে অবিশ্বাস করে, অপমান করে। স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের যা' অবনতি হ'তে পারে অন্য আর কিছুতেই তেমন হওয়া সম্ভব নয়।

নারী "সততা" হারালেন পবিত্রতার জন্য সমাজের নিয়মে, অথচ সে পবিত্রতাও সমাজে অক্ষুণ্ণ রইল না। যে সব পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল হ'তেন সমাজ তাঁদের আশ্রয় দিত, যে সব নারী এ শ্রেণীতে গিয়ে পড়ত তাদের অপরাধ দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত, তারা সমাজবর্জ্জিত হ'য়ে, সমাজের গ্লানিস্বরূপ হ'য়ে সমাজের একদিকে পয়ঃপ্রণালী স্বরূপ হ'য়ে থাকত। তবু—"স্ত্রী রত্ন দুষ্কুলাদপি" ছিল। শকুন্তলা সত্যবতী প্রভৃতি প্রমাণ। ক্রমে সে প্রথাও উঠে যেতে লাগল।

সমাজ নারীর কাছে চাইলে 'বশ্যতা', নইলে 'বহিষ্কৃত' হতেন। এই বহিষ্কারের ভয় তাঁদের সততাচ্যুত করলে, আশ্রয় চ্যুতির আশঙ্কায়। যে যুগে 'বাক্' প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী প্রতিভাশালিনী নারীদের দেখা পাওয়া গেছে এ সে যুগ নয়। যে যুগে 'শকুন্তলা' 'সত্যবতী' বধূরূপে বৃতা হয়েছিলেন, প্রত্যাখ্যাতা 'দেবযানী' যযাতিরকাছে সমাদৃতা হয়েছিলেন সে যুগও নয়। 'অম্বার' মতন নারীলাঞ্ছনার যুগ আরম্ভ হয়েছিল। এ যুগের সমাজ নারীর কাছে চাইলেন দৈহিক পবিত্রতা, দৈহিক মানসিক দু'য়েরই পবিত্রতা নয়। যাঁরা দুটোরই উপযুক্ত ছিলেন আজও তাঁরা পুজনীয়া সাবিত্রী, সতী, সীতা, দময়ন্তী ইত্যাদি। অথচ তবুও একটা দিক অপবিত্র হয়ে রইল—সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়ে। নারীর মনের কথা বলবার ভরসা ছিল না যা ভেবেছেন তা যদি অন্যায় না-ও হয়—তবু সমাজ নামক তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁর

মনের উপর যথেচ্ছাচার করতে পারেন। ফলে, সামাজিক নারীপ্রকৃতি অনন্তকালের মত 'মূক' হয়ে রইলো আর সমাজ বহির্ভূত নারী-প্রকৃতির 'বাচালতা' চিরকালের জন্য চতুর্দ্দিকে ফুটে উঠলো স্বর্গের অপ্সরা থেকে নিয়ে মর্ত্তে পতিতাদের মুখে অবধি। কোনদিন এই মূক ও বাচাল নারী প্রকৃতির মনস্তত্ত্ব কেউ জানতে চান-নি। কোনো সামঞ্জস্য করতে চাননি, হতে পারাও সম্ভব ছিল না।

এই সময় থেকে পুরুষ প্রকৃতি অন্যনারীলোলুপ হয়ে 'প্রিয়া নিসূদন' আরম্ভ করলে আর ব্যথিতা নারী প্রকৃতি 'প্রিয়প্রসাদনব্রত' করতে লাগলেন অবিশ্বস্ত, হীন, অপদার্থ স্বামীর প্রীতি কামনায়। অগ্নিমিত্রের প্রীতির জন্য ধারিণী ব্যস্ত, পুরূরবার প্রীত্যর্থে ঔশীনরী উন্মুখ, উদয়নের জন্য বাসবদত্তা আকুল ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বামীরা ? না বলাই ভালো নারী তখন আর—মানবী নয়,—সে নিজেকে হীন করতে লজ্জিতাও ছিলনা তখন। এর মূল শুধু সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতা।

এই নিয়ম শুধু এক দেশে নয়, সভ্য সব দেশেই ভিন্ন ভিন্ন আকারে ছিল ও আছে সমাজের সমর্থনে। মুসলমান খ্রীষ্টান সমাজে নারীর লাঞ্ছনা কম ছিলনা—অনেক অধিকার থাকলেও মানুষের অধিকার ছিল না। এবং সে সব দেশের তুলনায় প্রাচীনকালে আমাদের নারীর লাঞ্ছনা কিছু কমই ছিল। এই যে মানসিক অধীনতা, যে কারণেই হোক, সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যই হোক আর মহত্ত্বের পবিত্রতার জন্যই হোক সর্ব্বত্র তা সফল হোক বা না হোক (সর্ব্বতোভাবে সফল হয়-নি কেন না অন্য শ্রেণী রয়েছে) নারীজাতিকে সততা হীন দেখেনি। মানবীরঅন্তরের নারায়ণকে মানুষের বিচারে খর্ব্ব বিকৃত হতে হয়েছে। নারী প্রকৃতিতে সততা থাকতে পারেনা যতদিন না চিত্তের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা তাঁরা পাবেন। স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। কেন না যে শিথিলবন্ধন সমাজে বনবাসিনীদের মধ্যে নারীপ্রতিভা যেথা গিয়াছিল তাকে স্বাধীন সমাজ আখ্যা অনায়াসে দেওয়া যায় তাঁদের তেজস্বিতাকে কোনো পুরুষ নিষ্পেষণ করেন-নি করতে সাহস করেন নি। সেই জন্য তাঁরা নিজ মনোভাব গোপনের জন্য কোনো হীন মিথ্যার আশ্রয় কোনোদিন গ্রহণ করেন নি। অথচ তেজস্বিনী নারীচিত্ত আজও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং দুর্ব্বল বা অসৎ অন্তরের বিদ্রোহের চরম কুফল সমাজ পরিত্যাগ, সৎ উৎপীড়িত বিদ্রোহী অন্তরের চরম কুফল আত্মহত্যা। একটা দেহের একটা মনের। চির "অপ্রতিভ" নারী সমাজে দুটোই সমান পরিস্ফুট। কোনো অন্তরের কথা বল্‌বার অধিকার তার নেই। তার আদর্শ অনেক—ধরিত্রীর মত সর্ব্বংসহা, ভগবানের মতন ক্ষমাশীল হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি; অথচ বলা হ'বে মানুষের সব রকম 'পতনের মূল তারাই। তারও প্রতিবাদ করিবার স্বাধীনতা তাদের নেই।

এই থেকে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনচিত্ত সততার লীলাভূমি। যেখানে সততা নেই প্রতিভা

সহজাত সংস্কার আছে তা দুর্ব্বলচিত্তের সততাকে নষ্ট করে মিথ্যা বলিয়ে, সবলচিত্তের সততাকে নষ্ট করে আত্মহত্যা করিয়ে। যে কোনও অধীন জাতির মধ্যে সততার সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না সে জাতি ধার্ম্মিক হলেও তাকে নীরবে অনেক অন্যায় সহ্য করতে হয়। অনেক সময়ে পীড়ন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সেই জন্য দেখা যায় অধীন জাতির চেয়ে স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রতিভার সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হয়, বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির আবির্ভাবে জাতি পবিত্র উন্নত হয়।

প্রতিভা সততা চায়—নারী-অধীনতা তাকে সততা-হীন করেছে। যদি নারীর মুক্তি কোনো দিন হওয়া সম্ভব হয় পুরুষের স্বার্থ শৃঙ্খল থেকে, মিথ্যা দেবীত্বের বন্ধন থেকে, সামাজিক অবিচার অপমান থেকে, অন্তরের দেবতার লাঞ্ছনা থেকে, আবার সেই নারী-প্রতিভার যুগ ফিরে আসবে, প্রাচীনকালের প্রতিভাশালিনীদের মত তখনই সত্যকার দেবীর কল্যাণীর, লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে। তাঁর প্রতিভা নিষ্পেষিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে পুরুষের অধিকার-প্রমত্ততার কাছে, পুরুষের স্বার্থপরতার কাছে; তিনি প্রতিভাহীনা ন'ন। নারীর উচিত আপনাকে মানবী মনে করা সকলের আগে—যিনি মানবী তিনিই দেবী হতে পারেন, কল্যাণী হতে পারেন। যিনি নিজেকে রক্ষা করতে, নিজের আত্মাকে অপমান থেকে বাঁচাতে না পারেন তাঁর মাতৃত্বে পত্নীত্বে দুহিতৃত্বে কোনই সার্থকতা নেই। প্রতিভা মানবী চায়, ব্যক্তিত্ব চায়, সম্পর্কের শ্রেষ্ঠতার অধিকারে দান করা সম্মান চায় না, সে সম্মান মানুষের নয়—নারায়ণের নয়,—সে সম্মান দয়ার দান।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

বিক্রমপুরের প্রাচীন-সাহিত্য।

—*—

(দ্বিজ জগন্নাথের মনসা-মঙ্গল)

অনেকদিন হইতেই বিক্রমপুরের সাহিত্য-সেবার একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নের বলবতী ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। জ্ঞানবরেণ্য এই বিক্রমপুর বঙ্গভূমির কর্ম্মকোলাহলময় রাজধানীর সুদূরবর্ত্তী হইলেও কোনও বিষয়েই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে। সাহিত্য-সেবা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাহিত্যের উন্নতি ও গঠনকল্পে বঙ্গদেশের অন্যান্য সকল অংশ যখন প্রাণপণে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছিল, তখন বঙ্গের এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ বিক্রমপুর একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিল না। সাহিত্য-ক্ষেত্র তাহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে ও পাইতেছে, তাহা কখনই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

যাক—আমরা সময়মত তাহা পাঠকগণকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এ প্রবন্ধে তৎ-সম্বন্ধে কিছু বলিব না।

আমরা বহুদিন বিক্রমপুর অনুসন্ধান করিয়া বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিজ জগন্নাথের মনসা মঙ্গল' প্রধান। এতদ্ভিন্ন ত্রিলোচন দাসের শিবপার্ব্বতী সংবাদ, বৈদ্য জগন্নাথের সমুদ্র-মথন পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ নিতাই দত্তের সীতার বারমাসী, ভৈরবচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল ইত্যাদি এবং বহু প্রাচীন চিঠিপত্র, হিসাবের ফর্দ্দ, প্রাচীন দলিল প্রভৃতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। মুদ্রাখণ্ডের অভাবে, গৃহস্থের অনাদরে, অগ্নিদেবের কৃপায় এইরূপ কত প্রাচীন সম্পদ যে চিরদিনের জন্য বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাও বিস্ময়কর। যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে পারিলে, যে কোনও সভ্য জাতির সঙ্গে বাঙ্গালী গীতি-কাব্য অর্থাৎ পুরাতন সম্পদ লইয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে। জগতের প্রাচীন গৌরব-ভাণ্ডারে যাহা একান্ত দুর্লভ—তাহাও আমাদের বঙ্গদেশ হইতে দুই দশখানি বাহির হইয়াছে। এই সকল অমূল্য গ্রন্থ, খনির গর্ভের মণির মত লুক্কায়িত ছিল। একমাত্র বিক্রমপুর হইতে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার বিবরণ ধীরে ধীরে বঙ্গীয় পাঠকদের গোচরীভূত করিবার ইচ্ছা আছে। অদ্য দ্বিজ জগন্নাথের মনসামঙ্গলের পরিচয় দিতেছি।

পুঁথিখানি বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত। সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। সকল স্থানেই এইরূপ। প্রাচীন-সাহিত্য সংগ্রহ করাই এক বিরাট ব্যাপার। আর এক কথা, অধিকাংশ প্রাচীন পুঁথিই গ্রামের নিম্ন শ্রেণীয়দের গৃহে অবস্থিত। তাহারা এগুলিকে 'যকের ধনে'র মত রক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এইগুলি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই, তাহাদের কিছু 'অমঙ্গল' হইবে। এস্থানেও সেইরূপও হইয়াছিল। অনেক কষ্টে—অর্থ স্বীকার করিয়া পুঁথিখানা বাহির করা হইয়াছিল। তাহাদের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না, কাজেই অর্থলোভেই হউক আর যে কোনো কারণেই হোক, অবশেষে পুঁথিখানা আমার হাতে দিতে বাধ্য হইয়াছিল। (১)

পুঁথিখানি প্রাচীন তুলট কাগজে লেখা। আকার ১৬×৬ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা প্রায়

(১) অপরিচিত লোক বলিয়া, আমাকে আরও বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে মনে হইয়াছিল, "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী মূলচর। আমি তখন তাঁহার নাম করিয়া বলিলাম যে, আমি তাঁহাকে ভালরূপ জানি, ইত্যাদি। তখন তাহারা একটু আশ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমি একটা বড় রকমের মিথ্যা কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম। কেননা আমি যোগেন বাবুকে মোটেই চিনি না।—তবে, তাঁহার বই আমি পাঠ করিয়াছি সত্য। মূলচর হইতে আসিবার সময় একবার যোগেনবাবুর বাড়ী হইয়া আসিবার খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই। শ্রীসঃ।

দুই হাজার হইবে। হস্তলিপি বহু পুরাণো—অনেক অক্ষরই সংস্কৃতের অনুরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় মূল পুঁথিখানি পাওয়া যায় নাই। এখানি প্রতিলিপি। প্রতিলিপির বয়সও কম নয়। পুঁথির শেষে লেখা আছে।

"ইতি দ্বিজ জগন্নাথ বিরচিত মনসা-মঙ্গল কাব্যং॥ জথাদিষ্টং তথা লিখিতং॥ লিখকং নাস্তি দোষঃ॥ ইতি শ্রীকালিদাস সেন॥ দেওভোগ গ্রাম বিক্রমপুর পরগণে। বিতারিখ ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১১৭৭ সাল।"

ইহা হইতে দেখা যায় প্রতিলিপির বয়সই প্রায় ১৫৪ বৎসর। ইহারও কতকাল পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল, কে বলিবে ?

পুঁথিখানার আরম্ভ এইরূপ,—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে মম ভক্তিরস্তু।
ধুয়া। ভকত সহিতে গাহ গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥"

এই স্থানটুকু পাঠ করিলে লেখককে একজন বৈষ্ণব বলিয়াই বোধ হয়। মনসা-মঙ্গল লিখিতে গিয়া গৌরাঙ্গ গুণগান করিয়া পুঁথি আরম্ভ কার দেখি নাই। ইহাতে লেখকের অতিরিক্ত বৈষ্ণব প্রীতি ভিন্ন আর কি বুঝা যায় ?

অতঃপর লিখিতেছেন,—

"প্রথমে বন্দিব হরি দস অবতার
খেলা ধূলা * * প্রভু সংসার॥
মৎসকুর্ম্মবরাহ বামনরূপ ধরি।
ছলিয়া বলিকে নিলা পাতালের পুরি॥
সত্যে নরসিংহরূপে হিরণ্য সংহার।
কৃপা করি প্রহ্লাদেরে দিলা রাজ্যভার॥
ত্রিতাতে হৈল প্রভু রাম অবতার।
দসরথের ঘরে জর্ম্ম হইল তাহার॥
সত্ত্য পালিবারে রাম লক্ষ্মণ গেলা বন।
তাহাতে হরিল সীতা লঙ্কার রাবণ॥
সমুদ্র বান্দিয়া রাম সাগর হৈলা পার!
রাবণ বধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার॥
দ্বাপরে হৈলা প্রভু কৃষ্ণ অবতার।
দৈবকির উদরে জন্ম হইল তাহার॥

দুষ্ট কংস ভয়ে নিয়া * * রাখিল।
বিন্দাবনে নানা ক্রেয়া (২) গোবিন্দ করিল ॥
অক্রুর পাঠাইয়া কংস কৃষ্ণকে আনিয়া।
* * কৈলা রাজা সভাতে বসিয়া ॥
মাতা পিতা চিন্তিত দেখিয়া সর্ব্বজন।
দুষ্ট কংস বধ কৈলা দেব নারায়ণ ॥
কলিতে চৈতন্যরূপে হৈলা প্রকাশ।
হরির নাম দিয়া জীবের পূরাইল আশ ॥
এই মতে চারিযুগে করিল বন্দন।
দেবতার বন্দন এ শুন দিয়া মন ॥"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কবি দেবতাদের 'বন্দন' আরম্ভ করিয়াছেন :—

"প্রথমে বন্দিব ব্রহ্মা বিষ্ণু সনাতন।
* * * করিলা স্বজন ॥
ব্রহ্মা করেন সৃষ্টি বিষ্ণু করেন পালন।
অন্তকালে মহাদেব সংহার কারণ ॥
জয় জয় মহাদেব হর প্রজাপতি।
সর্ব্ব ব্রতে সর্ব্ব ভূতে তোমার বসতি ॥"

এই স্থানে কবি একেবারে 'জগাখিচুড়ি' করিয়াছেন। মহাদেব হর প্রজাপতি এক-জনকে তৈয়ার করিয়াছেন। শেষের পংক্তিতে "তোমার" উল্লেখ না করিলে অবশ্য অন্য অর্থ করা যাইত। ইহা প্রতিলিপিকারের ভুল, কি কবির নিজেরই ভুল কে বলিবে?

অতঃপর লিখিয়াছেন—

"চণ্ডির চরণ বন্দো শুনিয়া ভকতি।
যাহার ক্রেপায় খণ্ডে দুঃখ দুর্গতি ॥
অশুর বধিয়া কৈলা দেবের নিস্তার।
হেন চণ্ডির চরণে করহ নমস্কার ॥
লক্ষির চরণ বন্দো করিয়া প্রণতি।
কিঞ্চিত ক্রেপায় খণ্ডে দুঃখ দুর্গতি ॥
সরেস্বতি দেবি বন্দো বচন দেবতা।
যাহার প্রসাদে হৈল কবি ঋকৃগিতা ॥
বসিষ্ট আদি মুনি বন্দো অষ্টসিদ্ধা যার।
সংসার ভরিয়া যশগুণ গান যার ॥

সাবধানে শুনহ পুরাণ জোগ কথা।
কাস্তব বন্দিয়া * গৌর মাতা পিতা॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি বন্দো যত তারাগণ।
তিথি বার নক্ষত্র বন্দো বিপ্রের চরণ॥
মাতার চরণ বন্দো মহাজর্ম্মস্থান।
যাহার প্রসাদে হৈল ইদেহ নির্ম্মাণ॥
জন্ম দিলা মাতা পিতা যার যেহি কর্ম্ম।
পুনরপি গুরু হৈতে পুনর্জ্জর্ম্ম॥
ভক্তিভাবে বন্দো ইষ্ট গুরুর চরণ।
যাহা হইতে * * গোবিন্দ ভজন॥
বিস অধিকারি বন্দো পদ্মার চরণ।
যুদিষ্টির আদি বন্দো ভাই পঞ্চজন॥
মহা কবিগণ যত করি পরিহার।
পদ্মা পুরাণের কথা করিব প্রচার॥

এই পর্য্যন্ত বন্দনা করিয়া কবি বলিতেছেন ;—

"যদি ক্রেপা কর মোর সরেশ্বতি মাতা।
তবে সে কহিব পদ্ম পুরানের কথা॥
আমার জতেক দোস * * হইয়।
জেখানে যে নাহি জানি তাহা কহি দিয়॥
সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা যার জর্ম্মে * * পানি।
* * ব্রহ্মা সৃজিলা পরানি॥
জল হইতে উতপতি জত ইস্তি আর
প্রথমে গাহিবগীত জর্ম্ম গঙ্গার॥"

অতঃপর কবি মনসা মঙ্গল আরম্ভ করিয়াছেন। মনসা মঙ্গলের বৃত্তান্ত পাঠকগণের বিশেষতঃ হিন্দু পঠেকগণের অবিদিত বা অভিনব বস্তু নহে। সুতরাং সেই সম্বন্ধে বৃথা বাক্যব্যয় অথবা সমস্ত পুঁথিখানা প্রকাশ করিয়া পত্রিকার স্থানাভাব করিতে চাহি না। তবে কবির কবিত্ব শক্তি প্রদর্শনার্থে কাব্যের নানাস্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠক গণকে উপহার দিব। প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই এবং তাহা উদ্দেশ্যও নহে। এই যে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনার উৎসাহ দেশময় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, কবিত্ব-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন এবং প্রাচীন সাহিত্যের মূল প্রকৃতির নির্ণয় বিলুপ্ত জাতীয় ইতিহাসের ভস্মাচ্ছাদিত কঙ্কালের আবিষ্কার, ইত্যাদিই মুখ্য উদ্দেশ্য,— সমালোচনা করিয়া তাহার দোষগুণ প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই আমরা তাহাতে

বিরত হইলাম।

কবি দ্বিজ জগন্নাথ সুশিক্ষিত ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার রচনা সর্ব্বত্রই সরল ও আড়ম্বরশূন্য। তবে, সে কালের রচনা পদ্ধতি ভিন্নরূপ সুতরাং অনেকের নিকট তাহার সকল স্থান হৃদ্য না হইতে পারে, কিন্তু তা' বলিয়া উহার ভাষার সরলতা ও আড়ম্বরশূন্যতার অস্বীকার করা যায় না।

মহাদেব পদ্মাকে আনিয়া প্রথমতঃ "পুষ্পের সাজির মাঝে" গঙ্গার গৃহে রাখিয়া দেন আর গঙ্গাদেবীকে সাবধান করিয়া বলেন,—

"সাবধান এহি কন্যা রাখিবা আপোনে॥
ইসকল কথা যেন চণ্ডি নাহি জানে।"

এই বলিয়া শঙ্কর সেখান হইতে চলিয়া যান এদিকে—

"নারদ বিরোধি তবে বিরোধ লাগাইলা॥
একদিন রহিতে নারে বিনা বিরোধে।
কৈলাসে চলিলা নারদ দুর্গার সাক্ষাতে॥"

আসিয়া আর কথা নাই, অমনি—

"কি করহ আগ মামী কি কর বসি আ।
তোমারে ছারিলা মামা কিসের লাগি আ॥
কালি এক * * কন্যা সাজির ভিতরে।
আনিয়া রাখিছেন শিব গঙ্গার যে ঘরে॥
বৃদ্ধকালে মামার কি কুবুদ্ধি হইল।
কথাকার এক কন্যা হরিয়া আনিল॥"

বলিয়া ঝগ্‌ড়াটি বেশ করিয়া বাধাইয়া দিয়া নারদ মুনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন আর এদিকে—

"ক্রোধ করি চণ্ডি তবে গঙ্গার ঘরে গেলা॥
গঙ্গা ২ বলি দুর্গা ডাকিতে লাগিল।
সুনিআ দুর্গার কথা গঙ্গা বাহির হৈল॥
দুর্গা বলে গঙ্গা তুমি সত্য কহিয় মোরে।
এককন্যা শিব বলে থুইছে তোমার ঘরে॥
গঙ্গা বলে কোথা সিব কোথা রহিছি আমি।
মিথ্যা বিরোধ লাগি আসিয়াছ তুমি॥

---

(১) কবি বৈদ্য জগন্নাথেরও কয়েকখানি পুথি আপনাদের হস্তগত হইয়াছে।—

দুর্গা বোলে মিথ্যা কহ দেবতা হৈআ।
আনিয়া রাখিছে কন্যা সাজিতে ভরিয়া ॥
দুইজনে বোলাবোলি বিরোধ লাগিল।
প্রথমে গঙ্গার তরে দুর্গা গালি দিল
দাড়ি পাইকে সাড়ি গাত্র তোমার উপরে॥
মার এ দাড়ের বাড়ী বুকের ভিতরে॥
গঙ্গা বোলে দুষ্ট চণ্ডী শোন দিয়া মন।
মদন হৈল ভস্ম তোমার কারণ॥
দুই জনে গালাগালি বিরোধ লাগিল।
ঘরে গিয়া ফুলের সাজি চণ্ডী যে আনিল॥
একে একে ফুল যত সকল চাহিল।
খড়্গ লৈয়া ফুল তবে কাটিতে লাগিল॥
ফুল হৈতে পদ্মা তবে বাহির হৈলা।
চুলে ধরি চণ্ডি তবে মারিতে লাগিলা॥
দশ হাতে মারে চণ্ডি কুপিত হৈআ।
মহা দুঃখে কান্ধে পদ্মা ভূমিতে পড়িয়া॥

ক্রোধে চণ্ডীর মুখ অস্তগমনোন্মুখ তপনের ন্যায় রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে, দুই চক্ষু দিয়া আগুনের ফুলকি বাহির হইতেছে, বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে। কবি এই বর্ণনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

অতঃপর চণ্ডী ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে পদ্মাকে বলিতে লাগিলেন,—

"কোথাকার দুষ্ট নারী শিব ভুলাইলি।
পলাইয়া গঙ্গার ঘরে লুকাইয়া রহিলি।"

এই বলিয়া—

"নখের খোঁচা মারি, পদ্মার চক্ষু কৈল কানা॥

পদ্মা আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন—

"চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হৈয় জত দেবগণ।
সভাই হৈআ মোরে মারে অকারণ॥

* * *

শরীরে না সহে দুঃখ * * গড়াগড়ি
বিসদৃষ্টে চাহিলেক ঢলিলেক গৌরি॥

পার্ব্বতি কাতর হৈয়া পড়িল জখন।
কৈলাসে নারদ মুনি আসিলা তখন॥
ইসব দেখিয়া মুনি সিব স্থানে গেলা।
সকল বৃত্তান্ত গিআ কহিত্তে লাগিলা॥
শুনিয়া আসিলা শিব চণ্ডি দেখিবারে।
গঙ্গার তুয়ারে আসি অর্থনাদ করে (১)॥
মহামায়া বিনে স্থষ্টি হইবে সংহার।
চণ্ডিরে জিয়াস্ত পদ্মা করি পরিহার॥"

পদ্মা তখন মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন—

দশ হাতে চণ্ডি আমার হাড় চূর্ণ কৈল॥
শরীর নারিতে নাড়ি বেথা করে মোর।
চণ্ডীরে জিয়াইতে শীব ইবোলনা বোল॥
নখের আচড়ে আমার চক্ষু কৈল কানা।
শরীর আচড়াইয়া তবে রাখিল না মানা॥
মা হৈয়া বোলে মোরে সতাই সতাই।
এমন চণ্ডীরে আমি কেমনে জিয়াই॥"

বিপদ দেখিয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণ সকলে আসিয়া কৈলাসে উপনীত হইলেন। স্থষ্টি যে শক্তি-বিহীন হইয়া রসাতলে যায়? তখন—

"ব্রহ্মা আদি যত দেব স্তুতি আরম্ভিল।
সিবের বচনে পদ্মা তুর্গা জিয়াইল॥
উঠিয়া বসিল যদি জগত জননি।
দেবলোক্ নরলোক দিল জয়ধ্বনি॥
কোলে করি সিবে বোলে পার্ব্বতির তরে।
সাবধান এহি কন্যা রাখ তোমার ঘরে॥
বুকে করি চণ্ডী তবে পদ্মায়ে লইল।
স্থরলেকে নরলোকে জয়ধ্বনি দিল॥
দ্বিজ জগন্নাথ কহে মধুর পাঁচালী।
পদ্মা প্রিতে একবার বোল হরি হরি॥

বিপুলার জন্ম ও তাহার রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(১) অর্থনাদ — আর্তনাদ।

'সাহ রাজা উজানি নগর অধিকারী।
তাহার বনিতা আছে রত্নাপাটে স্মরি॥

…　　…　　…
…　　…　　…
…　　…　　…

মনসার বরে গর্ভে ধরিল সুন্দরি॥
এক দুই তিন চারি পঞ্চমাস হৈল।
পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত রত্নাবতী খাইল॥
দশমাস দশদিন হৈল উপস্থিত।
কন্যাখানি প্রসবিল দেবের গঠিত॥
কন্যা দেখি হরসিত রত্নাবতী হৈল।
নারিচ্ছেদ করি তারে স্নান করাইল॥
জয়জোকার দিয়া কন্যা লইল কোলে।
গণক আসিয়া কন্যার কেষ্ঠিখান্না তোলে॥
গুরুভঙ্গির সসি (?) সকল পূর্ন দেখে।
কোন দোষ নাহি লগ্নে কহিল গণকে॥
কন্যা দেখি রত্নাবতী সানন্দিত মন।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা করিল তখন॥
করিল অমুজ (১) অন্ত এক মাস গেল।
দিনে দিনে কন্যা তবে বাড়িতে লাগিল।
সপ্তমাসে কৈল তবে অন্ন পরাশন।
বিপুলা থুইল নাম বিধির গঠন॥
মেনকা উর্ব্বসি রতি কিংবা ত্রিলোত্তমা (২)।
বিপুলার রূপতুল্য কেহ নহে সিমা॥
খর্ব্ব খর্ব্ব চিত্র হস্ত অতি সুললিত।
নখ মধ্যে চন্দ্র যেন হৈছে উদিত॥
নাসিকা সুন্দর তার যেন গজমতি।
দশন পাতির শোভা মাণিক্যের জ্যোতি॥

---

(২) তিলোত্তমা

ইসদ ইসদ হাস বচন মধুর ।
রাজহংস গতি চলে ঝঙ্কারে নপূর ॥
উজানি নগরে তবে জন্মিলা সুন্দরি ।
রাত্রি দিনে মনসার পূজা আদি করি ॥
মনসার পদযুগ করিয়া বন্দন ।
দ্বিজ জগন্নাথে ভনে শুদ্ধ সুরচন ॥

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বারান্তরে আমরা দ্বিজ জগন্নাথের কবিত্ব সম্বন্ধে আরও পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। আজ কেবল তাঁহার বাসস্থান সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কবি নিজে বাসস্থান ও বংশ পরিচয় নিজেই তাঁহার পুঁথির শেষে প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহা সম্পূর্ণতঃ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"বিক্রমপুরেতে বাস গ্রাম পঞ্চসার। (১)
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বসতি প্রসার ॥
সেই গ্রামে দুর্লভরাম নামিক ব্রাহ্মণ।
তাহার তনয় নাম শ্রীমধুসুদন ॥
তাহার তনয় নাম থুইল কাশিশ্বর।
নিত্যাই তাহার তনয় * * * যার ॥
আপোনে রচিল তবে চণ্ডী উপখ্যান।
দেশে দেশে লোকে তারে করিল বাখান ॥
এহি যে অধম অতি দ্বিজ জগন্নাথ।
তাহার তনয় বলি দিল এহি নাম ॥"

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে কবি 'পঞ্চসার" গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতার নাম নিতাই, পিতামহ কাশীশ্বর, প্রপিতামহ মধুসূদন ইত্যাদি। ইহা হইতে আরও দেখা যায় যে কবির পিতা 'নিতাই' একখানা চণ্ডির উপাখ্যান বা চণ্ডিকাব্যের অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এইকাব্যখানার খোঁজ করিতে পারিনাই। সহৃদয় পাঠকও সাহিত্যসেবীগণ যদি ইহার খোঁজ প্রাপ্ত হন—আমাকে জানাইলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। পঞ্চসার, দেবভোগ, মুলচর ওদিকেই প্রাপ্ত হওয়ার খুব বেশী সম্ভাবনা। তবে কথা এই—তাহার অস্তিত্ব আছে কিনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দাস
সাহিত্য-রত্ন।

(১) পঞ্চসার রামপালের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

বাণীবিতান

সে

অঙ্গ যে তার আধ গোলাপী
সোণায় মোড়া কোন্ কুঁড়ি,—
নিঝুম ঘুমে অপ্‌রাজিতার—
অফুট আলোর ফুলঝুরি।
জ্যোৎস্না-ঝরা রূপ বাহারে
মুখ মহলের মাঝখানে ;
প্রজাপতির হাল্‌কা পাখা
আল্‌গা বুকের নাচ আনে।
আদর রাঙা ফুল কাটা তার
অঙ্গ বোঝাই রতনচুর—
রিনি ঝিনি— সেই সুরেতে
বাঁশীর গরব হয় তা দূরে !
অঙ্গ সে তার ঘিরে ঘিরে
ভোমরা কাঁদে দিল্‌ভোলা,
ডাগর ডাগর নয়ন পাতায়
দ্যুলোক বাসের ফুল তোলা !
মতির মালা
দুল্ করবীর দোলনাতে ;
সিঁদুর শাড়ীর ঘোরণ পাকে
পরদেশিটীর মন মাতে !
দিল্‌ দরদীর পাশ নজরে
ফেনিয়ে তোলে চোখ দুটি ;
হাল্‌কা হাসি আল্‌গা খোলে
ভোর মোহানার পদ্মটি !
নটকাণে রং অধর রাগে
চুম্ ভিখিরীর মন কাঁদায়,—
জ্বলতে থাকে রৌশনী সে
পথ ভুলিয়ে কোন্ ধাঁধায় !

গামছা হাতে ঘাটে যখন
জলকে চলে ভোর বেলায়,
চল্‌তে পথে আল্‌তা ছুধের
রঙন ঢেউএর দোল খেলায়।
ফুলবাগানে ঢুক্‌লে পরে
'হুদ্দ' ডাকে বুল্‌বুলি,
আল্‌গোছা নেয় হাল্‌কা হাতে
আল্‌গা আঁটা ফুলগুলি।
ঝুঙুর ঘুঙুর তাল বেতালে
নাচ লহরের সুর তোলে,
এতই মিঠে তাই শুনে ঐ
উড়ো পাখীর মন ভোলে।
নয় মানবী এই রূপসী
সোনার পাতে ফুল্ বোনা।
সঙ্কেতে কোন মন পিয়াসী
নেশায় বাউল কল্পনা।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

অগ্রদূত

মৃত্যু গহন অন্ধকারে পথ মোচন আজ করবি কে?
দুর্দ্দিনের এই দুর্গমে আজ আলোক শিখা জ্বাল্‌বি কে?
পথ মোচন আজ করবি কে?
মরুর পথে আন্‌বি জোয়ার
কর্‌বি লোপাট বন্ধ দুয়ার
অন্ধকারার

ঝঞ্ঝামুখর নিশীথ রাতে রক্ত সাগর তর্‌বি কে
মার খেয়ে আজ মরণটাকে পায়ের তলে দল্‌বি কে ?
রক্ত সাগর তর্‌বি কে ?
মত্ত নীলের নাগর দোলায়
ছুল্‌বি কে আজ ভগ্ন ভেলায়
দোদুল দোলায়,
শবের মাঝে শ্মশান ভূমে শিবের মত জাগ্‌বি কে ?
রক্ত সাগর তর্‌বি কে ?
মরণ পথের অগ্রদূত আজ পথ দেখিয়ে চল্‌বি কে ?
দুর্যোগের এই বিপ্লবেতে দ্বন্দ্বরণে মাত্‌বি কে ?
পথ দেখিয়ে চল্‌বি কে ?
রক্ত তড়িত হান্‌বি চাবুক
জড়ের বুকে চেতন লাগুক্‌
আগুন জাগুক্‌,
কাল-বোশেখীর তাণ্ডবে আজ বীরের মতন লড়্‌বি কে ?
পথ দেখিয়ে চল্‌বি কে ?
রক্তঝরা সিক্ত কেশে বিজয় কেতন বইবি কে ?
মৃত্যু জয়ের উল্লাসেতে অচিন্‌ পথে ছুট্‌বি কে ?
বিজয়কেতন বইবি কে ?
আয় ভগীরথ ! আন্‌রে প্লাবন
ভস্ম হতে নবীন জীবন
কর্‌ আহরণ,
অন্ধ নিশায় আঁধার শেষে অরুণ-রথে হাস্‌বি কে ?
বিজয় কেতন বইবি কে ?

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

বিকাশ

চাঁপার-কলি ভাবছে বসে
সারা সকাল বেলা ;—
"আলোর সাথে—আমার সাথে
কত কালের খেলা ;
যেদিন হতে জনম আমার
আমায় বেসে ভালো ;
প্রাণের কথা কইল কত
তরুণ অরুণ আলো ;
আজ কেন সে ছুঁয়ে যখন
চাইল আমার মুখে,—
সকল হিয়া উঠল কেঁপে
কেমন সরম সুখে ?"
—"মর, নেকি তুই"…বল্লে গোলাপ
রক্ত-রাঙা লাজে,
"যৌবনেরি রঙীন নেশা
জাগছে যে তোর মাঝে !

শ্রীমুরারিমোহন দাস ।

ব্যথিত

হে ব্যথিত, এস কাছে এস
হেথা পাবে স্নিগ্ধ স্নেহছায়া ।
রৌদ্রের প্রখর তাপ হতে
পাবে শান্তি তপ্ত ক্লান্তকায়া ।
নয়নে উদাস চাওয়া তব
অধর মলিন ম্রিয়মান ।
না জানি ও-মর্ম্মমাঝে জ্বলে
কোন্ দুঃখ বহ্নির সমান ।

একেলা পথিক তুমি পথে,
সাথী তব কেহ সাথে নাহি
আলোকে আঁধারে দিনে রাতে
চলিছ সমুখ পানে চাহি।
কোন সে দুরূহ দীক্ষায়
ভুলি নিজ সুখ ভালবাসা
তেয়াগিলে গৃহ, ধন, জন,
বক্ষে বহি দুর্গম দুরাশা।
বহুদূরে কোন্ পরপারে
শুনি কোন্ অজানা বাঁশরী,
হে তরুণ, জীবনের মায়া
সবি তুমি গেলে কি পাশরি!
কোথা তব যাত্রা শেষ হবে
কোন্ স্বর্গে মঙ্গল সঙ্গীতে।
জানিনা তা! শুধু তব ব্যথা
চক্ষে দেখে পারিনা সহিতে!
হে ব্যথিত, এস কাছে এস
ক্ষণতরে লহ গো বিশ্রাম,
তারপরে আপনার পথে
যেয়ো তব যেথা মনস্কাম।
বুঝিতে না পারে এই হিয়া
ও-হৃদয় অসীম অপার,
বিরাট আদর্শে কোন্ জাগি
সঁপিয়াছ জীবন তোমার।
তোমার ও শুষ্ক শুষ্ক মুখ
দেখে মোর প্রাণ শুধু কাঁদে,
নিঃসঙ্গ ও কঠিন জীবন
মন চাহে স্নেহডোরে বাঁধে!
অন্যমনে কি জানি কি ভাবি
ছিনু আমি চেয়ে পথ পানে
সহসা হে তরুণ সন্ন্যাসী

তার পরে জীবন জুড়িয়া
কোন্ আলো,—না, না, কাজ নাই
কিবা লাভ শুধু কথা বলে ?
দণ্ড দুই হেথা লও ঠাঁই।
খররৌদ্র ম্লান হয়ে এলে
যেয়ো চলি করিব না মানা।
স্বপ্ন কেন আসে কেন যায়
এ জগতে কার আছে জানা

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অভিসার

তোমায় আমায় মিলন হবে
সারাদিনের খেলার শেষে,
খেলার বাঁশী একলা রবে,
বাজবে না গো বাজবে না সে।
(আজ) বেসুরধ্বনি করছে সেতার
হেথা সেথা সকল খানে,
হারিয়ে ফেলে সুরটি তাহার
কাঁদে শেষে নীরব গানে।
(তার) কাঁপন ভরা কান্না শুনে,
করুণ সাড়া দেয় যে বীণা,
বাঁধন ছেঁড়া মুক্তপ্রাণে
পড়লো ছায়া কার জানি না।
সোহাগ ভরা বীণার তানে
বেদন কেন উবছে উঠে ?
(হ'য়ে) ব্যথার ব্যথী আমার গানে
(শুধু) হৃদয় কিগো তারই টুটে ?
সুর হারায়ে একটি সুরে
গাইছে বাঁশী বীণা সেতার—

সাঁঝের তরী আস্‌ছে দুরে
এনো ওগো পরশটি তার।
বিদায় বেলার ঘণ্টা যখন
শেষ কথাটি ব'লবে তার
সাঁঝের সাথে ছুটবো তখন
রাখ্‌বো বুকে পরশ তার।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু।

মুর্শীদ্যা গান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মুনার গান।

(১২)

গুণের বাই মোনাইরে তুমি জঞ্জালে নারে দিও মন।
জঞ্জাল বেশম জঞ্জাল, জঞ্জাল বড়রে জ্বালা
জঞ্জালে না দিয় মন সোণার শরীল করলাম কালারে,—জান্ মোনাইরে।
ফিরাও এ পাগলের মনরে পাপের পথরে হইতে
ও যেমন রাখালে ফিরাইছে ধেনু পরের শস্য খাইতে রে,—জান্ মোনাইরে।
ঘরখানি বানছাও মনাভাই বসত করবাররে আসে
কোন দিন যেন দারুণ যম তোমার টানবে ধইরে ক্যাশেরে জান্ মোনাইরে।

গায়ক = জনৈক ঘরামী বয়স = ৫০
পদ্মাপার, ঢাকা।

এই গানের শেষের পদটী আরও অনেক গানে পাওয়া যায়।

(১৩)

চল যাইরে—আমার দোরদীর তালাসেরে মন চল যাইরে।
ইস্ত্রী হৈল পায়ের বেড়ী পুত্র হৈল কাল
এড়াইতে না পারলামরে আমি এই ভব জঞ্জালরে মন চল যাইরে।
হালবাও হালুয়া বাইরে হস্তে সোণার নড়ী
এই পথখানি যাইতে দেখছাও আমার শানাল চান সন্ন্যাসীরে,—মন চল যাইরে।
দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা শানাল চান সন্ন্যাসী

ও তার গলায় মালা কান্দে ঝোলা করে মোহন বাঁশীরে, মন চল যাইরে।
জালবাও জালুয়া বাইরে হস্তে সোণার ডুরি
এই পথখানি যাইতে দেখছাও আমার শানাল চান সন্ন্যাসীরে, মন চল যাইরে।
দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা শানাল চান বেপারী,
ও তার গলায় মালা কান্ধে ঝোলা করে মোহন বাঁশীরে।

এই গানটী বোধ হয় গৌরাঙ্গদেবকে লক্ষ্য করিয়া তৈয়ারী হইয়াছিল। পরে মুর্শীদা-গায়কেরা শানালের নাম ইহাতে জুড়িয়া লইয়াছে। এই 'কান্ধে ঝোলা গলায় মালা' পদ অনেক বৈষ্ণব গানে পাওয়া যায়। অন্তরের দোরদীর তালাস করিতে গ্রাম্য কবি আকাশের মেঘকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। তমালগাছকে জড়াইয়া ধরে নাই। বাড়ীর ধারে হালুয়া ভাই হাল চাষ করে, সোণার ডুরি হাতে জালুয়া ভাই জাল বায়। সরল অন্তরে তাদের কাছে যাইয়া আপন বাঞ্ছিতের সন্ধান তারা লইয়াছে। এই হালুয়া ভাই ও জালুয়া ভাইর কথা অনেক গানেই পাওয়া যায়। ভাদ্রের "ভারতী"তে আমরা এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি।

(১৪)

হারে যদি যাবারে ছাড়িয়া আর হবেনা মানব জনম রে
ডাক আল্লা রাছুল বইল্যারে ও ভাই মনাইরে।
ও ভাই মোনারে…
এই বড় বাড়ীর বড় ঘররে মোনা ভাই বড় করছাওরে আশা
রজনী প্রভাতের কালে পক্ষী ছাড়ে বাসারে ও ভাই মোনা রে।
ও ভাই মোনারে—
সমুদ্দুরি ওঠে ডেউ ওরে মোনা ভাই হারে কুলে আইস্যারে ঠেকে
ভাল ঘর বাইন্দ্যাথাও অহে রে মোনাভাই হারে চেকন দিছাওরে সলা
আমার আল্লাজীর বানাইন্যা ঘরের মোনা ভাই মাটীর বাঙ্গলারে ও ভাই মোনারে।
ও ভাই মোনারে—
আমার অন্তরে উইঠ্যাছে ঢেউ ওরে মোনা ভাই আজ কেবা তারে দেখেরে
ও ভাই মোনারে।
ও ভাই মোনারে
সাইল সম্বীর ডুভী পাখীরে মোনা ভাই হারে গম্ভীর নীচেরে চলে
স্যাও সম্ভীর শুকাইয়্যা গেলেরে মোনা ভাই অমনি উড়্যাল ছাড়েরে ও ভাই মোনাইরে।

১। ডুরি = ডোর, জালের দড়ী। বোধ হয় জালুয়া ভাই খেপলা জাল বহিতেছিল।
২। নড়ী = লাঠী।

ও ভাই মোনাইরে—
তালাপেতে নাইক্যা জলরে মনা ভাই হারে পাও কেন রে ডোবে
বাসায় ত নাইক্যা ছাওরে মোনা ভাই ফইড় কেন ওড়ে রে ও ভাই মোনাই রে।

গায়ক = ছাহের মণ্ডল, বয়স = ৩৫
গালভাঙ্গা, ফরিদ পুর।

এই গানের দ্বিতীয় পদটীর অনুরূপ বেদের মেয়ের এক উদাসী গানে পাওয়া যায়। সেখানে আছে—

জাইত গ্যাল কুল গ্যাল রৈল কুলের খোটা,
রজনী প্রভাতের কালে পক্ষী ছাড়ল বাসা। *

সংসারের অনিত্যতা দেখিয়া মন আজ ধর্ম্মের সহজ পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে কি। রজনী প্রভাত হইলেই পাখী বাসা ছাড়িয়া যায়। তাই চেকন সলা লাগান বড় ঘর হইতে আল্লাজীর দেওয়া মাটীর বাঙ্গেলা মানব দেহের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। আজ অন্তরের নিভৃত কোণে প্রেমের ঢেউ দোলা দিয়া উঠিয়াছে, "কিন্তু সমুদ্‌রে ঢেউ উঠিলে কূলে আসিয়া তার বেদনা জানায়। হায় অন্তরের এই গোপন ব্যাথা আজ কে দেখিবে প্রেমের ছোঁয়া লাগিয়া আজ যে সব ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। 'তালাপেতে' জল নাই তবুও পা ডুবিয়া যায়। আর "বাসায় ত নাইক্যা ছাও ফইড় কেন ওড়ে।" মনে হয় এই ব্যথাই প্রকাশ করিতে রবীরন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন'—

"কেন অকারণে ঝরে আঁখিধারা?

(১৫)

আমার আল্লাজীর নাম আমার মুরসীদির নাম
ও নাম দমে দমে লইওরে বাই মনরায় রে।
ডুবিল ডুবিল রে নাও ডুইব্যা গেল ব্যালা
এমনি হাট আর মিলবে নারে নামভী ছিরি খোলা রে বাই মনরায় রে।
ছিরী খোলার হাটেরে ভাই কিসের বৈছ বাজে
অই আল্লাজীর নিজ নাম বাই গুরু দিছে কইয়ারে বাই মনরায় রে।
যখনে দারুণ যমরে ঘাটায় দিব পাঁড়া
তন্ ছাড়িয়া ওই মনুয়া সামনে ঐব খাড়া রে, বাই মনরায় রে।

---

* গত কার্ত্তিকে প্রকাশিত "বেদের মেয়ে" কাহিনী দ্রষ্টব্য।

সাইল সখীর = পাখী দুটির কোন পরিচয় আমরা জানিনা। কেহ বলিলে ধন্য হইবে। ফইড় = পালক।

মইরা যায়রে আল্লার বান্দা শব্দ যাইব দূর
ডুরাই তেনে কাইন্দে আছে ইষ্টি আর কুটুম রে, বাই মনরায় রে।

গায়িকা = হাসুইন্তার মা বয়স = ৫০
রাজার চর ময়মনসিংহ।

(১৬)

ইরে কালা অল্প বয়সে লাগাই দাওরে ঘুন
হারে মন ভাবিয়া দেখ তোর সঙ্গেরে যাবে কেহ ?
সবে বলে কালারে কালা আমি বলি শ্যাম
কোন জাগাতে আছে আমার কালার নিজ নাম।
এক কালা দতের কালী যাস্থা কলমা লেখে,
আরেক কালা চোখের মণি যন্থা দৈন্যা দেখে।
এক কালা দুইও কালা, কালা তিন জন
এই যে মথুরাতে কৃষ্ণ কালা কালা নিরাঞ্জন।
এক কালা দিছে দোকান আরেক কালা নিছে
দেহের মধ্যে বইসে কালা বাদ্য বাজাইছে।
লাহুত লাছুত মালকুত জবরুত চাইর মোকাম দিয়া
কোন মোকামে ওঠে জিকীর আল্লা রছুল বইল্যা।

গায়ক = কোরমান ফকীর
উজানচর, ফরিদপুর।

এই গানে অনেক তত্ত্বকথা বলিবার প্রয়াস হইয়াছে। যে কালা কাঁচা বয়সে প্রেমের ঘুণ লাগাইয়াছে তাহার সন্ধান করিতে করিতে কবি দেখিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু বড় তার সবই কাল। দোয়াতের কালী কাল। এমন কি যে চোখ দিয়া পৃথিবী দেখি তাহাও কাল মথুরায় কৃষ্ণ কাল। অসীম অনন্তময় যে নিরঞ্জন তিনিও কালার অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই চির রহস্যময় কালর দেশে যাইয়া কবি বুঝিতে পারিলেন স্রষ্টা ও সৃজিত চিরদিন এই ভবের হাটে বেচা কেনা করিয়া কালো হইয়া গিয়াছে। আর কালর দেহের মধ্যে বসিয়া এক কাল' সর্ব্বদা বাদ্য বাজাইতেছে। (শরৎ চন্দ্রের শ্রীকান্তের ভ্রমণ কহিনীর অন্ধকার বর্ণনার কথাটী

১। বৈন্ম = বাদ্য। ২। তন = দেহ, ৩। ঐব = হবে ৪। মনুয়া = মন ৫। ডুরাইতেনে দূর হইতে ; এই গানটীর সুরে এই একটা বিশেষত্ব যে নির্জ্জন কোন স্থানে একমনে ঘণ্টাখানেক গাহিলে শরীরে একটা কম্পন অনুভব হয়। সমস্ত সুরখানিই কাঁপিয়া কাঁপিয়া চলে।

এখানে মনে পড়িয়া যায়।) তাই কবি ভাবিতেছে তাহার দেহের কোন মোকামে এই বাদ্য বাজে ? লাহুত লাছুত মালকুত জবরুত দেহের মোটামুটী এইচারিটী মোকাম। ফকির-বিলাস কেতাব হইতে আমরা ইহার অর্থ করিতে প্রয়াস পাইব।

(১) লাহুত মোকাম নাসিকায় অবস্থিত। এখানে এস্রাফিল ফেরেস্তা বাস করেন। তাঁর রং সবুজ চেহারা বাজের মত। ২। লাছুত মোকাম চক্ষুতে, এখানে বাস করেন মেকাইল তার রং 'ছফেদ' এবং চেহারা গৃধিনীর মত। ৩। মালকুত মোকাম হইল কাণ, বাঘের মত চেহারা সিয়া রঙের আজরাইল ফেরেস্তা এখানে বাস করেন। (৪) সাধকের বিশ্বাস জর্দ্দ রঙের ময়ূরের মত চেহারা জিব্রিল জিহ্বায় বাস করেন জবরুত মোকামে লাহুত মোকামে—নাসিকায় আল্লারছুল এই শব্দ সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে। যথা

"লা মোকামে লায়লাহা
উঠিছে হরদম্।"

(কোন দেহ তত্ত্বের গান হতে)

জসীম উদ্‌দীন।

(ক্রমশঃ)

তক্ষশিলার ইতিবৃত্ত।

প্রাচীন কালে তক্ষশিলা মহানগরীর জ্ঞান সৌরভে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব বিনিময়ে জগত মুগ্ধ ছিল। তখন মিশর—বাবিলন, সিরিয়া ফিনিসিয়া, আরব, চীন, প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের পণ্ডিতগণ শিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে তক্ষশিলা শিক্ষা মন্দিরে সমবেত হইতেন। এই বিদ্যালয়ের বিষয় ছিল "তিন বেদ অষ্টাদশ বিদ্যা। অষ্টাদশ বলিতে —বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তাহা ছাড়া ঋক্ সাম্ ও যজুর্ব্বেদ, এই তিনটী স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত হইত।

তৎকালে তক্ষশিলা শিক্ষা মন্দিরে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে কাহারও উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত হইত না। সুতরাং গ্রীকেরা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য তক্ষশিলায় আগমন করিতেন। তাহা ছাড়া বারাণসীর কুমারগণ ও মিথিলা, ইন্দ্রপ্রস্থ, মগধ, কোশল, উত্তর ও দক্ষিণ দেশ প্রভৃতির রাজপুত্রগণ এবং পুরোহিত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্রগণ তক্ষশিলার শিল্প বিদ্যা এবং বেদশাস্ত্র অধ্যপনা করিবার জন্য তথায় আগমন করিতেন। ক্ষত্রিয়বংশজাত পুত্রগণও বেদশিক্ষা করিতেন। শিষ্যেরা আপাততঃ গুরু গৃহে

বাস করিতেন। যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা কেবল শুশ্রূষা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিতেন, ছাত্রগণের নিকট হইতে মাসিক এক যোগে বহু অর্থ গ্রহণ করিতেন।

মনু বলিয়াছেন—

গুরু শুশ্রূষা বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা
অথবা বিদ্যায়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে,

অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় চতুষ্পাঠিতে গুরু শুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা লাভ হয়। কিন্তু তক্ষশিলায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ছাত্র গণকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। প্রাচীন কালে শ্রমণ ও পরিব্রাজকগণ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া আপাততঃ গুরু গৃহে বাস করিত। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান ছিল; শিক্ষার্থীগণ নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া তক্ষশিলা শিক্ষা মন্দিরে সমবেত হইতেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া শাস্ত্রের বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। তর্কে যাঁহারা পরাস্ত হইতেন তাঁহারা বিজেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অপর দলভুক্ত হইতেন। এইরূপ নীতি তখনকার যুগ ধর্ম্ম ছিল। দেশবাসীগণ ব্রহ্মচারীগণের ভরণ পোষণের সাহায্য করিতেন। উৎসবাদিতে শিক্ষাচার্য্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত গুরু দক্ষিণা প্রদান করিতেন; সেই সময়ে স্থানীয় শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। স্থানীয় নৃপতিগণের প্রদত্ত ব্রহ্মদানের উপর স্নাতক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজস্ব আয় হইতে এই সমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

তৎকালে মহামতি জীবক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিলেন। মহামতি জীবক অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায়ে চতুর্দ্দশ বৎসরের শিক্ষনীয় বিষয় সাত বৎসরেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এবং উদ্ভিদ বিদ্যায় মহামতি জীবক অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসারের রাজত্ব কালে অথবা ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের সময়কালে মহামতি জীবকের রাজ চিকিৎসক ও ভগবান বুদ্ধের এবং ভিক্ষু সঙ্ঘের চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি ছিল। প্রাচীন প্রাচীন কালে তক্ষশিলা ভারতবর্ষের প্রধান শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল; মহর্ষি পাণিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চাণক্য পণ্ডিত পুষ্পপুরে আগমনের পূর্ব্বে—তক্ষশিলায় বিদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের স্কুল ও কলেজে নানা বিষয় শিক্ষা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা প্রণালী ধর্ম্ম ও নীতিরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষা কেন্দ্রগুলি আশ্রম বা তপোবনে এবং বারাণসীর ন্যায় বহির্দ্দেশে ও জনপদের বহুদূরে নির্জ্জন বনপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আশ্রমসমূহে বালকবালিকা প্রভৃতি বিদ্য শিক্ষা করিতেন। শিক্ষক ব্রহ্মচারিগণ পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। দেশবাসীগণ, শিক্ষার্থীদের মাতা পিতা চাউল লবণ ঘৃত নবনীত ও অন্যান্য রন্ধন সামগ্রী গুরু গৃহে

ছাত্রগণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন। তৎকালে শিক্ষার্থী পাঠ শেষ করিয়া দেশাচার শিক্ষা করিবার জন্য দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তখনকার সময়ে দেশাচার শিক্ষা না করিলে কাহারও উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। এখন আমাদের সেই প্রথা ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত আছে দেখা যায়।

বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক "ফাহিয়ান" খ্রীষ্টিয় চারি শত শতাব্দীতে তক্ষশিলায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি উক্তনগরের নাম চু-সা সিলো বা খণ্ডিত মস্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্ব জন্মে অপরকে নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত চতুঃশিব কথা হইতেই চু-সা সিলোর উৎপত্তি।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে তক্ষশিলা তক্ষশির নামে বর্ণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টিয় ৫১৮ অব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে, ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরীতে পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত পর্য্যটন ,কাহিনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময় মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারাদিতে নগর পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু সকলেই সংস্কারাভাবে ধ্বংসাবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। প্রাচীনতত্ত্ববিদ্ প্লিনির মতানুসারে প্রাচীন পুষ্পলাবতী বা হস্তনগর হইতে ৫৫ মাইল পূর্ব্বদিকে তক্ষশিলা মহানগর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কনিংহামপ্রমুখ তত্ত্ববিদ্গণ যুক্তিসঙ্গত ইহা বলিয়া একেবারে মনে করেন না।

বিখ্যাত বৌদ্ধ চৈনিক ফাহিয়ান সংগুণ ও হুয়েনসাং প্রভৃতি ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদগণ এক মতে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে সিন্ধুনদী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন দিবসের পথ অগ্রসর হইলেই প্রাচীন তক্ষশীলানগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ইহা যদি ঠিক হয়, কালকা সাইয়ের অনতিদূরে সাদেরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তক্ষশীলার প্রকৃত স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই মতের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া থাকেন। আরিয়ান, ষ্ট্রাবো ও প্লিনি প্রভৃতি তত্ত্ববিদগণ তক্ষশিলার গৌরব ও সমৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সাদেরীর ভগ্নাবশেষই প্রাচীন তক্ষশীলার স্থান।

রাজা জন্মেজয় তক্ষশীলা জয় করিয়াছিলেন। ইহা মহাভারতের আদিপর্ব্বে উল্লিখিত আছে। এবং ইহাও প্রবাদ আছে যে, সেই সময়ে সর্প সত্রের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। পাশ্চাত্য তত্ত্ববিদগণ বলেন, "তক্ক" জাতি কর্ত্তৃক তক্ষশীলা স্থাপিত হইয়াছিল। তক্কজাতির পূর্ব্বপুরুষের নাম তক্ক ছিল, তাঁহারা নাগ পোষক ছিলেন। ইহাও প্রমাণিত আছে যে তক্ষশীলা নগরে ধর্ম্ম সর্পবিগ্রহের পূজা হইত সম্রাট কনিষ্ক

গ্রীক ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদগণ উহাকে টেক জিলা নামে বর্ণনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে তক্ষশীলা নগরের বিশেষ সমৃদ্ধির বিষয় উল্লিখিত আছে। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে অগ্রসর হন গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাস তক্ষশিলা প্রদেশ অধিকার করেন; তৎকালে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুতা ছিল। সেই বন্ধুতা সূত্রে সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তের নিকট হইতে কতকগুলি হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন। এবং তাহার বিনিময়ে তাঁহাকে তক্ষশীলা প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মগধ সামাজ্য চারিদিকে বিভক্ত ছিল। তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, তোষালি ও সুবর্ণগিরি। তক্ষশীলা গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল।

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের পঞ্চাশ বৎসর পরে রাজা বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা সুসীম তথাকার শাসন কর্ত্তা ছিলেন। রাজা বিন্দুসারের মধ্যম পুত্র অশোক তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক তথায় শান্তি স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই উহা মৌর্য্য সম্রাট অশোকের রাজধানীর মধ্যে পরিগণিত হয়। তাঁহার পুত্র কুণাল ঐ প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। মৌর্য্য বংশের অধঃপতনের পর তক্ষশীলা বাকৃত্রিয়ার রাজা ইউক্রেটাইউসের হস্তগত হয়। ১২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকদিগের হস্ত হইতে উক্ত প্রদেশ শক জাতির মুস বা আবাস অধিকার করেন। এবং পরিশেষে কুসান বংশীয় শকগণ তক্ষশিলা হস্তগত করেন। তৎকালে সম্রাট কনিষ্ক উক্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করেন যে পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাওলপিণ্ডি প্রদেশ প্রাচীন তক্ষশীলার স্থান ছিল। মৌর্য্য রাজাদের রাজত্বকালে ঐ প্রদেশ একজন শাসন কর্ত্তা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। তিনি পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশ শাসন করিতেন। উজ্জয়িনী নগর অবন্তীরাজ্যের রাজধানী ছিল। এবং মৌর্য্য সম্রাটগণের রাজত্বকালে এই স্থান হইতে পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত শাসন হইত।

সুবর্ণগিরি কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে খান্দেশ জেলার সোনাগিরিকে প্রাচীন সুবর্ণগিরি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত আবার বরদা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী সোনাগড়কেও উক্ত স্থান বলিয়া কেহ বিবেচনা করেন। কিন্তু মহিশূর প্রদেশস্থ চিত্রশেগড় জেলায় প্রাচীন সুবর্ণগিরির স্থান বলিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন।

মৌর্য্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। খৃঃ পূর্ব্ব ১৭২ অব্দে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলিঙ্গপ্রদেশ তোষালী হইতে শাসিত হইত; সেই সময়ের সহিত গ্রীক ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদগণের বর্ণিত বৃত্তান্তের ঐক্য দেখা

করিবার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে খৃঃ পূঃ ২৯৬—৩—২৭২ অব্দ সম্রাট অশোকের সিংহাসন অধিরোহণের কাল। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের পিতামহ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২১ হইতে ২৯৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। মৌর্য্য সম্রাট অশোক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন, ভৈষজ্যাগার নির্ম্মাণ এবং ভৈষজ্য গুল্ম লতাদি সংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পশু চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে বিনামূল্যে চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, এই প্রথা বৌদ্ধ যুগের পরম্পরা চিকিৎসার প্রচলন ও ধর্ম্মনীতি। মগধ সাম্রাজ্যে চিকিৎসকের অভাব ছিল না, ভিষককুলতিলক মহামতি জীবক মগধ সাম্রাজ্যে চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র ছাত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়া দেশ দেশান্তরে পাঠাইতেন। পরিব্রাজক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরাইয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তক্ষশিলা শিক্ষামন্দির নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা প্রাচীন। এক সময় মহর্ষি আত্রেয় ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও আলোচিত হইত, বৌদ্ধ পালিগ্রন্থে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিণি ব্যতিত মহাভাষ্যকার পাতঞ্জলী বৌদ্ধ বিহারে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনা হইতে প্রকাশিত হয় যে, বৌদ্ধ যুগে শিল্প ধর্ম্ম চিকিৎসা শাস্ত্র এক অভেদ্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল। মৌর্য্য সম্রাট অশোক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সাধারণের মধ্যে এই শিক্ষা বিস্তার বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধ জাতকে বর্ণিত আছে যে রাজগৃহ, বর্ত্তমান রাজগিরির, প্রাচীন নাম গিরিব্রজ বা কুশাগরপুর। পাটনা জিলা মগধের প্রাচীন রাজধানী, মগধাধিপতি বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এইস্থানে বাস করিতেন। রাজগৃহের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চ পর্ব্বতের নাম বিপুলগিরি রত্নগিরি, উদয় গিরি,সোনাগিরি, বৈভার গিরিই সুপ্রসিদ্ধ সপ্তপানি গুহা নামে পরিচিত।

বর্ত্তমান রাজগৃহের আড়াই মাইল ব্যবধানে উত্তর পূর্ব্ব গৃধকুট, মৌন গিরি নামে সুপরিচিত। রাজগৃহে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ দ্বিতীয় বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। বণিক অনাথ পিণ্ডিকগণ, একদা ভগবান বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাবস্তী নগরে গিয়াছিলেন, কোশল রাজ্যের অধিপতি রাজা প্রসেনজিতের রাজত্বকালে অথবা গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহ রাজা প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল। তৎকালে ভগবান তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরে গমন করেন। এই প্রদেশ কাশীর উত্তর পশ্চিম বাপ্তী নদীর উপকূলে অবস্থিত ছিল। শ্রাবস্তীর জেতবন উদ্যান বণিক ও অনাথপিণ্ডিক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জমি ক্রয় করিয়া স্বর্ণ ও মুদ্রা দ্বারা স্তূপাকারে ভূমি খণ্ডকে

বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী বর্ষাবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং ভারত পর্য্যটনে যখন আসিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত স্থানের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। প্রচীন তত্ত্ববিদ ফাহিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন যে রাজা প্রসেনজিত ভগবান বুদ্ধের এক প্রকাণ্ড চন্দন কাষ্ঠের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, শরিপুত্র মৌদ্গালায়ন সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া জেতবন বিহারে বর্ষাবাস করিতেছিলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধঘোষ মগধ সাম্রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৪৫০ অব্দে সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সিংহল হইতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিয়া ব্রহ্মদেশে গমন করেন। তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার করেন, পরে তিনি শ্যামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য গমন করেন। শ্যাম রাজ্য হইতে সুমাত্রা পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছিল। এই সকল প্রদেশে হীনযান ধর্ম্মের বিস্তার হয়। খৃঃপূঃ প্রথম শতাব্দীতে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত মহাযান ধর্ম্ম প্রচলিত হয়।

মৌর্য্য সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালে মগধ রাজধানীতে বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করিবার জন্য এক মহতী সভায় এক হাজার ভিক্ষু সঙ্ঘদিগকে আহ্বান করা হয়। সঙ্ঘরাজ তির্ষ্য এই সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শী অশোক উক্ত সভায় প্রশ্ন করিলেন, ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের প্রদর্শিত ধর্ম্ম কি! এবং তাঁহার সদুপদেশের সংখ্যা কত? ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে? সঙ্ঘরাজ তির্ষ্য তাঁহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, ভগবান বুদ্ধের উপদেশের সংখ্যা অসমাপ্ত কিন্তু মানবের মঙ্গলার্থে চুরাশি হাজার সদুপদেশ বাণী জগতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে সম্রাট তাঁহার ধর্ম্মের সুন্দর ব্যাখ্যা ও বৌদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মানস পটে ভগবান তথাগতের চিত্র সমুদিত হইল। বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের ব্যাখ্যাশ্রুতিতে তাঁহার হৃদয় কোমল হইল, নূতন ভাবস্রোত অন্তরে বহিতে লাগিল। সুতরাং ভগবান তথাগত বুদ্ধের চুরাশি ধর্ম্মোপদেশ বাণী এইক্ষণে জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। মৌর্য্য সম্রাট অশোক মানবের মঙ্গলার্থে তাঁহার সাম্রাজ্যে সহস্র ২ বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে তাঁহার অমর কীর্ত্তি ঘোষণা এখনও করিতেছেন।

সম্রাট অশোকের এই সংকল্প শ্রবণ করিয়া এই মহাসভার সঙ্ঘগণ আনন্দিত হইয়া বলিলেন ভগবান তথাগত বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পর মগধ সম্রাট অজাতশত্রু ভগবান বুদ্ধের শরীর ধাতু রাজগৃহে মন্দিরাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ আপনার নির্ম্মিত অশোরামে বুদ্ধের শরীর ধাতু প্রতিষ্ঠিত করিলে মানবের অশেষ কল্যাণ হইবে।

করিলেন।

রাজগৃহের চতুষ্পার্শ্বে একে একে বুদ্ধের ধাতু অনুসন্ধান করিয়াও সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সম্রাটের আদেশে চুরাশি হাজার মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সহসা সমাধা হইল, কিন্তু ভগবান তথাগতের শরীর ধাতুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সম্রাট অবশেষে পাটলিপুত্রের নগরে নগরে হস্তী পৃষ্ঠে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া, এক বাণী প্রচার করিলেন যে কেহ অজাতশত্রুকর্ত্তৃক প্রাপ্ত বুদ্ধের শরীর ধাতু উদ্ধার করিতে পারিবেন কিম্বা উহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন তিনি এই পুরস্কার লাভ করিবেন।

পাটলিপুত্রের নগরে নগরে এই ঘোষণা বাণীর প্রচার হইল। সপ্তাহের মধ্যে জনৈক উপাসিকা উক্তস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবান তথাগতের শরীর ধাতু প্রাপ্ত হইয়া মগধ সাম্রাজ্যে এক কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল। বুদ্ধের শরীর ধাতু মন্দিরে সমান ভাবে প্রতিষ্ঠা করিলেন। উক্তস্থানে জলাশয় ও কূপের এবং চুরাশী হাজার চৈত্যের যথা সময়ে নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইল। সম্রাট মগধ সাম্রাজ্য মধ্যে সপ্তাহ কাল উৎসব কার্য্যে কৃতসঙ্কল্প লাভ করিলেন। প্রবাদ আছে যে মার কর্ত্তৃক অনেক সময়ে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ঋদ্ধি শক্তি সম্পন্ন উপগুপ্তের দ্বারা মারকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করেন।

সদাশয় গবর্ণমেণ্টের সাধু চেষ্টায় প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রাচীন তীর্থ সমূহ পুনঃ উদ্ধার লাভ করিতেছে। আমাদের সেই কুশী নগর, ঋষিপত্তন, উরুবিল্ব, পাটলিপুত্র এখন লোক-লোচন গোচরীভূত হইয়া অতীত কীর্ত্তিতে পুনঃ জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছে। প্রাচীন তক্ষশীলাও ভূগর্ভ ভেদ করিয়া বৃক্ষলতাদিতে গঠিত সুদৃঢ় আবরণজাল ছিন্ন করিয়া আবার আমাদের পুণ্য তীর্থরূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং যে সকল অমূল্য রত্নরাজি গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আবার সে সকল রত্ন আমাদের বিতরণ করিতেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তা স্যার জন মার্শালের চেষ্টায় তক্ষশিলায় প্রোথিত ভগবান বুদ্ধের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কৃত ধাতুর মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট মহাবোধি সোসাইটীকে দুইটী তক্ষশিলায় প্রাপ্ত ধাতু প্রদান করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ত্রিপিটকের অন্তর্গত প্রাচীন বৌদ্ধ জাতক সুত্তপিটকের অংশ বিশেষ। ইহা একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ৫৫০টী জাতক কথা ইহাতে সন্নিহিত আছে। কোন কোন গল্প অতি বিস্তীর্ণও আর অন্যান্য গল্প গুলি ছোট। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতবর্ষের নানা তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। এই গুলি অতি প্রাচীন প্রবন্ধমূলক। এই জাতক গুলির কথা বা কাহিনী হইতেও প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের সমাজ শিল্প আবার বাণিজ্য প্রভৃতির বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ ইহা পাঠে অবগত হওয়া যায়; প্রাচীন জাতকে অঙ্গু অঙ্গ মগধ রাজগৃহ, ইন্দ্রপ্রস্থ পাটলিপুত্র, কাশী কোশল ও শ্রাবস্তী নগরের ও জনপদের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিব তক্ষশিলা সম্বন্ধে জাতকউদ্ধৃত কথা!

জাতকে বর্ণিত আছে যে বারাণসী হইতে দুই হাজার যোজন ব্যবধানে তক্ষশিলা মহানগরী অবস্থিত, ইহা গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। বারাণসীর সুসীম রাজার পুরোহিত পুত্র এক দিবসে বারাণসী হইতে তক্ষশিলায় উপস্থিত হন। এবং আচার্য্যের নিকট প্রণিধানের সহিত পাঠ গ্রহণে প্রবৃত্ত হন, এবং অরুণোদয় হইতে না হইতেই বেদত্রয় ও হস্তীসূত্র সমূহ শিক্ষা করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাগমন করেন। (সুসীম জাতক)

প্রাচীন কালে গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বোধিসত্ত্ব একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। পঞ্চশত শিষ্য তাঁহার নিকট বিদ্যাভাস করিত। (বরুণ জাতক)

বোধিসত্ত্ব যখন বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কোন রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে তিনি তক্ষশিলায় বেদত্রয় এবং অষ্টাদশ কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। (দুর্মেধো জাতক)

ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্ব জন্মে বোধিসত্ত্বরূপে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশীলা শিক্ষা মন্দিরে গমন করেন। তথায় তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সেই সময় হইতে তিনি "চুল্ল ধনুগ্রহ" পণ্ডিত উপাধিতে বিভূষিত হন। (ভীমসেন জাতক) সুতরাং প্রাচীন কালে তক্ষশিলাই ভারতের প্রাচীন শিক্ষার কেন্দ্রস্থল।

প্রাচীন কালে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা মহানগরে একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার নিকট পাঁচ শত ব্রাহ্মণ বালক বিদ্যাভাস করিত। (নামসিদ্ধি জাতক)

বারাণসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়কালে বোধিসত্ত্ব উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশিলা মহানগরে সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; তিনি ধন সম্পত্তির মমতা ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা, ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবং পাঁচটী অভিজ্ঞ ও আটটী সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতেন। তথায় পঞ্চাশ তাপসগণ তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। (পর সহস্র জাতক)

জাতকে বর্ণিত আছে যে প্রাচীন কালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অগ্র মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তিনি যখন বয়স্ক হন, তখন তক্ষশিলায় সর্ব্ববিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। উত্তর দেশীয় বহু ছাত্রেরা তক্ষশিলা শিক্ষা মন্দিরে গমন করিয়া বিদ্যাভাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব উত্তর প্রদেশে উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি তক্ষশিলায় কোন সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট তিন বেদ ও আঠার প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অন্ধ্রদেশে গমন করেন। কোন কোন শিষ্য পাঠ শেষ করিয়া দেশাচার শিক্ষা করিবার জন্য দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তৎকালে দেশাচার শিক্ষা না করিলে কাহারও উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত হইত না। (আশাতরু জাতক) আরও একটী উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে একদা বোধিসত্ত্ব কোনও ধনবান ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশিলায় মন্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে বারাণসীতে প্রসিদ্ধ আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে বারাণসীর কুমারগণ, মিথিলা ইন্দ্রপ্রস্থ, মগধ, কোশল, উত্তরদেশ, দক্ষিণদেশ

প্রভৃতির রাজপুত্রগণ পুরোহিতপুত্রগণ ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্রগণ তক্ষশিলায় শিল্পবিদ্যা এবং বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তখন ক্ষত্রিয়বংশজাত পুত্রগণ বেদশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন বলিয়া জাতক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা গমন করিয়া তথাকার অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, বহু রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণ পুত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন; বোধিসত্ত্ব সামুদ্রিক বিদ্যায়ও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

কৌশল অধিপতি রাজা প্রসেনজিতের রাজত্বকালে অথবা ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের সময়ে কৌশলরাজ্যের পুরোহিত পুত্র অঙ্গুলিমালা বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তক্ষশিলা গমন করেন। গুরুর নিকট প্রনিধানের সহিত পাঠে ব্যাপৃত থাকিয়া অল্প সময়ে বিদ্যা আয়ত্ত করিতেন। উক্ত পাঠাগারের অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করিয়া তদীয় আচার্য্যের নিকট তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়াছিল। তদীয় আচার্য্য বলিয়াছিলেন, বৎস! অহিংসক অতঃপর তুমি যদি বনে গমন করিয়া এক সহস্র লোকের প্রাণ বধ করিয়া প্রত্যেকের চিহ্নস্বরূপ একএকটি অঙ্গুলি আমায় প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে সর্ব্ববিদ্যা দান করিব; নচেৎ তোমাকে এই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই বালক বিদ্যা শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে এই ভাবিয়া বনপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক ৯৯৯ জনের প্রাণ বধ করিয়া প্রত্যেকের একএকটী অঙ্গুলী কাটিয়া লইতেন বলিয়াই, অঙ্গুলীমালা ব্যাধ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীধরবড়ুয়া।

লা-ব্রেতোন।

(Andre' Theuriet)

একদিন নভেম্বর সায়াহ্নে "সেন্ট ক্যাথারিন্" পর্ব্বের পূর্ব্ব দিন "ওভ্রিভ্" জেলখানার ফাটক খুলিয়া দেওয়া হইল- একটি স্ত্রীলোক ফাটক দিয়া বাহির হইয়া গেল। রমণীর বয়স ৩০ বৎসর, একটা বিবর্ণ পশমী গাউন পরা, মাথায় অদ্ভুত ধরণের একটা ছাল্‌টি কাপড়ের টুপি। পাণ্ডুবর্ণ ফুলো ফুলো মুখ। জেলের নির্দ্দিষ্ট আহারের ফলে, একটা অস্বাস্থ্যকর চর্ব্বি জমিয়া মুখের এইরূপ বিকৃতি হয়। সে এক-জন কয়েদী এই মাত্র মুক্তিলাভ করিয়াছে; অন্য কয়েদীরা উহাকে "লা ব্রেতোন্" এই বলিয়া ডাকিত।

ঠিক ৬ বৎসর হইল, শিশু হত্যা অপরাধে জেলের গাড়ী করিয়া তাহাকে এই গ্রামের বড় জেলখানায় আনা হইয়াছিল। এখন সে খালাস পাইয়া, তার পূর্ব্বকার কাপড় পরিয়াছে, পকেটে কিছু পয়সার পুঁজি আছে; 'লাঙ্গর গ্রামে যাইবার পথের ছাড় পত্র ও পাইয়াছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, লাঙ্গরের ডাকগাড়ী বহুপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল। কি করিবে, উপায় নাই, ঐ অঞ্চলের প্রধান পান্থশালার দিকে সে হোঁচট খাইতে খাইতে চলিতে লাগিল। সেই খানে পৌঁছিয়া, কম্পিতকণ্ঠে রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিল। তখন পান্থশালায় খুব ভীড়। তাছাড়া "কারাপিঞ্জরের পাখিকে" স্থান দিতে পান্থ-শালার কর্ত্রীর ভাল না লাগায়, সে গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী পান্থশালায় যাইতে আগন্তুককে পরামর্শ দিল।

লা ব্রেতোন, কাঁপিতে কাঁপিতে স্খলিত চরণে পথ চলিতে লাগিল। তার পর একটা পান্থশালায় পৌঁছিয়া, দরজায় ঘা দিল; আসলে এই পান্থশালাটা মজুরদের একটা শরাপখানা। শরাপখানার মালিক আড়চোখে আগন্তুকের পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া বুঝিল বড় জেলের একজন মুক্ত কয়েদী। তাই একটা ছুতা করিয়া শেষে তাহাকে বলিল, "এখানে আর শয্যা নাই।"

লাব্রেতোন্ জেদ করিতে সাহস পাইল না। নতশিরে আবার পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। জগৎ হইতে তাড়িত হইয়া, জগতের উপর তাহার মনে একটা অপরিস্ফুট বিদ্বেষবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল।

নিরুপায় হইয়া লাঙ্গরের দিকে সে পদব্রজেই চলিতে লাগিল, নভেম্বরের শেষ ভাগে, শীঘ্র রাত্রি আসিয়া পড়ে। শীঘ্রই সে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অরণ্যের দুইভাগের মধ্য দিয়া একটা ধূসর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উত্তুরে হাওয়া ভীষণভাবে শোঁ শোঁ শব্দে বহিতেছে, ধুলায় যেন তার দম আটকাইয়া যাইতেছে। বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পাতা তাহার উপর সজোরে নিঃক্ষিপ্ত হইতেছে।

৬ বৎসরকাল অলস নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া তাহার পা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বরাবর কাঠের জুতা পরা তার অভ্যাস ছিল। এখন চামড়ার চটিজুতায় তার পা ব্যথিত হইতে লাগিল। দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তার পায়ে ফোস্‌কা পড়িল। পথের ধারে একটা পাথরের গাদা ছিল তার উপর সে বসিয়া পড়িল। থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, আর ভাবিতেছে, এই আঁধার রাত্রিতে অনশনে ও ঠাণ্ডায় বুঝি তার প্রাণ বাহির হইবে। হাওয়া বরফের মত ঠাণ্ডা, হাড়ভাঙ্গা শীতে তার রক্ত যেন জমাট হইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ শুনিতে পাইল, সেই বিজন রাস্তায় কে যেন গান গাহিতেছে; কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার জন্য মায়েরা যেরূপ সুর করিয়া

ছড়া বলে, সেই একঘেয়ে রকমের একটা "ঘুমপাড়ানে" সুর।

তবে তো সে একলা নহে, আরও কেহ সেখানে আছে। যে দিক হইতে ঐ গানের সুর আসিতেছিল, সেই দিকে সে চলিতে লাগিল। একটা ছোট বাঁকে আসিয়া দেখিল, ডালপালার ভিতর দিয়া একটা লাল্‌চে আলো আসিতেছে। আর পাঁচ মিনিট পরে, সে একটা মাটির দেওয়ালওয়ালা একটা কুটীরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। কুটিরের ছাদ কাদা মাটিতে আচ্ছাদিত। কুটীরটা শৈল গাত্রের উপর ঠেস দিয়া আছে ; কুটীরের জানলা দিয়া পূর্ব্বোক্ত আলোক রশ্মি আসিতেছিল।

আকুল চিত্তে সে কুটিরের দ্বারে ঘা দিল।

তখনই গান থামিয়া গেল ; একজন রমণী দরজা খুলিয়া দিল—সে কৃষক রমণী। বয়স্ লা ব্রেতোন্ অপেক্ষা বেশী নহে। খাটুনির দরুণ শরীর জীর্ণ হইয়াছে—বুড়াইয়া গিয়াছে।

কাঁচুলির কাপড় স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে—তাহার ভিতর হইতে তাহার রোদে পোড়া ময়লা গা দেখা যাইতেছে। মাথায় ময়লা একটা কাপড়ের টুপি, সেই টুপী হইতে তাহার লাল চুল এলাইয়া পড়িয়াছে। রমণী আগন্তুককে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিল।

আগন্তুকের মুখে কেমন একটা মর্ম্মস্পর্শী নিঃসঙ্গ অসহায় ভাব ছিল।

"তেল ঝরা একটা লম্প চাষানীর হাতে ছিল—সেই লম্পটা আরও উঠাইয়া ধরিয়া চাষানী বলিল :—

"ওগো ! তুমি কি চাও ?"

"লা-ব্রেতোন গদগদ কণ্ঠে বলিল;—"আমি আর চলতে পার্‌ছি নে। শহর অনেক দূরে। আজ রাত্রে তুমি যদি আমাকে থাকতে দেও, তাহলে আমার বড় উপকার হয়।···আমার সঙ্গে পয়সা আছে—আমি পয়সা দেব।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া চাষানী উত্তর করিল :—

"ভিতরে এসো। সন্দিগ্ধভাবে নয় কিন্তু কৌতূহলের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল। "ওবরিভের" পান্থশালায় কি ঘুমোও নি?"

"ওরা আমাকে থাকৃতে দিলে না।" তার পর তার নীল নেত্রনত করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল—"কারণ—কারণ—আমি জেলখানা থেকে আস্‌ছি।"

তাই না কি ! তা হোক ভিতরে এস, আমি কিছুতেই ভয় পাই নে, আমি চিরকাল কষ্ট পেয়েছি। তাছাড়া, এই আঁধার রাতে কাউকে দরজা থেকে বের করে দিতে আমার মন চায় না। আমার ধর্ম্মে বাধা দেয় ; আমি তোমাকে শোবার জায়গা দেব আর এক চাক্‌লা পণির দেব।" এই কথা বলিয়া সেই কৃষক রমণী,

শয্যা রচনা করিল।

লা-ব্রেতোন্ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল :—

তুমি কি এখানে একলা থাক?"

"হাঁ, আমার বাচ্চাটির সঙ্গে; এখন ওর ৭ বৎসর চল্‌ছে।"—আমি বনে কাঠ কুড়িয়ে কোন রকমে সংসার চালাই।"

"তাহলে তোমার মিন্‌সে বুঝি মারা গেছে?"—সে চট করিয়া বলিল :—"হাঁ বাচ্ছার বাপ নেই। আমাদের দুঃখের সংসার।" তা হোক্, দেখ তোমার জন্য বিছানা পাতা হয়েছে। আর, দুই তিনটে আলু ছিল এই যা তোমাকে আমরা খেতে দিতে পারি—"

ঘরের একটা অন্ধকেরে কোন—তক্তা দিয়া অড়াল করা সেই কোনটি হইতে শিশুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

"গুড্ নাইট, আমার্ বাচ্চা কাঁদ্‌ছে—আমি চল্লুম তুমি ভাল করে ঘুমোও!" লম্পটা হাতে করিয়া, কৃষক রমণী সেই কোণের ঘরে গেল। লা-ব্রেতোন অন্ধকারের মধ্যে একলা জড় সড় হইয়া শুইয়া রহিল।

আহারান্তে সেই তৃণ শয্যায়, সে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসিল না। সেই পাতলা কাঠের বেড়ার ভিতর দিয়া সে শুনিতে পাইল, কৃষক রমণী তার ছেলেটির সঙ্গে আস্তে আস্তে কথা কহিতেছে। আগন্তুকের আগমনে শিশুটি জাগিয়া পড়িয়াছে—আর ঘুমাইতে চাহিতেছে না।

তার মা কত মিষ্টি কথা বলিয়া তাকে আদর করিতেছে;—শুনিয়া কেন কে জানে, লা-ব্রেতোনের হৃদয়ে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সে ইতিপূর্ব্বে তার নব জাত শিশুকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিল বলিয়া জেলে যায়; মনে হইল, ঐ চাষানীর সরল স্নেহের উচ্ছ্বাস, উহার মনে একটা অপরিস্ফুট মাতৃভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। লা-ব্রেতোন মনে মনে ভাবিল,— আমার যদি অদৃষ্ট মন্দ না হত, আমার ছেলেটিও এত বড়টিই হত।"

এই কথা ভাবিয়া ও শিশু কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মর্ম্মদেশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পাষাণ হৃদয়ে একটা স্নেহরসের সঞ্চার হইল। অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাহার হৃদয়ভার লাঘব করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। মা বলিল :—

"নে, নে, বাছা, ঘুমিয়ে পড়। যদি তুই লক্ষ্মী ছেলে হোস্ তা হলে কাল তোকে "সেন্ট-ক্যাথারিনের মেলায় নিয়ে যাব। (ক্যাথলিক ধর্ম্মের মা ষষ্ঠী")।

"মা, সেই ছোটছেলেদের পরব? আমাদের পরব!"

"সেই দিন সেণ্টক্যাথেরিন ছেলেদের জন্ত খ্যালনা আনেন—না মা ?"

"হাঁ—কখন কখন।"

"তা হলে তিনি আমাদের বাড়ীতে খ্যাল্‌না আনেন না কেন মা ?"

"হয়ত আমরা খুব দূরে আছি বলে'—তা ছাড়া আমরা যে গরীব।" তিনি শুধু ধনী ছেলেদের খ্যাল্‌না দেন ? তা কেন করেন মা, তা কেন করেন ? খ্যাল্‌না আমার এমন ভাল লাগে" "আচ্ছা বেশ ! যদি তুই লক্ষী হোস, একদিন তা পাবি হয়ত আজ রাত্রেই পাবি; যদি ভাল ছেলে হোস্, আর শীগগির যদি ঘুমিয়ে পড়িস্।" "আচ্ছা মা, আমি তাহলে এখুনি ঘুমোবো; তাহলে তিনি তো কাল আমাকে খ্যাল্‌না দেবেন ?"

শিশুর কণ্ঠস্বর থামিয়া গেল। একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতা আসিল।

ক্রমে শিশু ও মা দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কেবল লাব্রেতোনের চোখে ঘুম ছিল না! একটা তীব্র ও কোমল আবেগে তার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। যে ছেলেকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তার নামে দোষারোপ হয়, সেই ছেলেটির কথা তার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল...ভোর পর্য্যন্ত সে এই কথাই ভাবিতেছিল।

মা ও ছেলে তখনও নিদ্রামগ্ন। লা-ব্রেতোন উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ওভরীভ গ্রামের দিকে চুপিচুপি যাত্রা করিল। গ্রামের প্রথম বাড়ীগুলি দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, পায়ের চাল একটু কমাইয়া আনিল।

গ্রামে পৌছিয়া সেই গ্রামের রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে, রাস্তার দোধারি দোকানগুলি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা দোকানের উপর তার নজর পড়িল। জানালার খড়খড়িতে ঘা দিল, খড়খড়ি খুলিয়া গেল। সেটা একটা কাপড়ের দোকান, কিন্তু সেখানে কতকগুলা ছেলেদের ছোটখাট খ্যালনাও ছিল নিতান্ত টুকিটাকি রকমের। যথা :—

পীস্‌বোর্ড কাগজের পুতুল, নোয়ার জাহাজ, একটা ছোট পশমের ভেড়া।

লা-ব্রেতোন সবগুলি খরিদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দোকানদার বিস্মিত হইল। সে আবার সেই কুটীরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। হঠাৎ তার কাঁধের উপর একটা শক্ত হাত সজোরে পড়িল। দেখিল তার সম্মুখে একজন পুলিশ জমাদার। অভাগিনী ভুলিয়া গিয়াছিল, বড় জেলখানার আশপাশে ঘুরঘুর করা মুক্ত কয়েদীদের পক্ষে নিষিদ্ধ। পুলিশ জমাদার কর্কশস্বরে বলিল ;—এখানে ঘুরঘুর কচ্চিস্ কেন ? এতক্ষণে লাঙ্গরে পৌছান তোর উচিত ছিল।"—দূর হ ? এখান থেকে ! রাস্তায় চল রাস্তা দিয়ে চল্ বলছি।"

সে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সবই বৃথা হইল। একটা ...

সেখান দিয়া যাইতেছিল, সেই গাড়ীর ভিতর তাকে পুরিয়া দিয়া একজন পাহারাওয়ালার জিম্মায়, লাঙ্গরের দিকে তাকে চালান করিল।

বরফে জমাট রথ্যার উপর দিয়া, গাড়ী ক্যাঁচকোঁচ শব্দে গদাইলস্করি চালে চলিতে লাগিল, লা-ব্রেতোন বেচারী হতাশভাবে তার থ্যাল্‌নার বাণ্ডিলটা তার শীতে আড়ষ্ট হাতে কোনপ্রকারে ধরিয়া ছিল।

রাস্তায় একটা বাঁক ফিরিয়াই, হঠাৎ সেই কুটীরের পথটা তার নজরে পড়িল। তার বুকটা উল্‌সিয়া উঠিল; সে পাহারাওয়ালাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য গাড়ী থামাইতে অনুরোধ করিল। বলিল, একজন স্ত্রীলোক এইখানে থাকে—তার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে!

সে এরূপ আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিল যে ভাল মানুষ পাহারাওয়ালাটা রাজি হইয়া গেল। উহারা সেইখানে থামিল, ঘোড়াকে একটা গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া ঐ পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

সেই কৃষক রমণী জ্বালানী কাঠের জন্য বন হইতে কাঠ কুড়াইয়া তার দরজার সম্মুখে কুঠার দিয়া চ্যালা করিতেছিল। পূর্ব্ব পরিচিত আগন্তুককে একজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লা-ব্রেতোন বলিল:— 'চুপ! চুপ্! সেই বাচ্চাটি এখনো ঘুমচ্চে?"

"হাঁ—কিন্তু—"

"তাহার, এই থ্যালনাগুলো নেও; আর এইগুলো তার বিছানার উপর রেখে তাকে বল যে, সেণ্টক্যাথারীন তার জন্য এনেছে। আমি এই থ্যাল্‌না আন্‌তে ওভরভ গ্রামে ফিরে গিয়েছিলুম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সেখানে থাকায় আমার অধিকার ছিল না। এখন এরা আমাকে লাঙ্গরে নিয়ে যাচ্চে।"

কৃষকরমণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল:—ঈশ্বর-জননী 'মেরী মা' তুমিই ধন্য!

"চুপ! চুপ! কথা কয়ো না।"

এই কথা বলিয়া লাব্রেতোন্ পাহারাওয়ালার সঙ্গে, শিশুর শয্যার পাশে গিয়া, থ্যালনাগুলা তার গা-ঢাকা কম্বলের উপর ছড়াইয়া দিল। এবং শিশুর অনাবৃত হাতটি ধরিয়া আস্তে আস্তে পশমি ভেড়ার উপর স্থাপন করিল—শিশুটি অজ্ঞাতসারে উহা মুঠাইয়া ধরিল। তখন লাব্রেতোন হাসিমুখে সেখান হইতে ফিরিল। তারপর, জ্যাকেটের কফ্ দিয়া চোখ রগড়াতে রগড়াতে, পাহারাওয়ালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার চোখে বালী পড়েছিল"—"এখন আমি প্রস্তুত; এখন আমরা যেতে পারি!"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি প্রশস্তি

সমসাময়িকেরা তোমার প্রতিভার বিকাশকে হতাদর করিয়াছিল বলিয়া তুমি বিমর্ষ হও নাই—কারণ তুমিত প্রভাত কালের কুন্দ কুসুমের মত শিথিলবৃন্ত ছিলেনা—তুমি বনান্তরের কুরবকের মত গৌরবান্বিত ছিলে—তুমি জানিতে যে তুমি অমর.........তাই, তুমি যখন প্রত্যাখ্যাত হইলে তখন দক্ষিণবায়ুদোলায়িত কুরবকের মত উচ্চশিরে বলিলে—কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী......এই যে আত্মপ্রত্যয় ইহার জন্য তুমি চিরপূজিত—চিরজীবি।

তোমার কণ্ঠস্বর যদি অকালে থামিয়া যাইত—ব্যাধের ভয়ে যদি পিক কলরব ত্যাগ করিত, তাহা হইলে কি যে মহান অনর্থ ঘটিত, তোমার উত্তরাধিকারীগণ আজ তাহা সম্যক অনুভব করিতেছে। অন্য কবিরা যখন ফুলের পরাগে ধূসর ভ্রমর ও উটজাঙ্গনের মৃগশিশু লইয়া' ব্যস্ত, তখন, তুমি থুৎকারক্ষেপক ভল্লুক ও মহাকায় অলস অজগর দ্বারা পরিপূর্ণ জনস্থানের ভীষণ অথচ মহিমময় চিত্রোদ্ঘাটনে কৃতোৎসাহ......তোমার প্রতিভা আমনোঃ বর্ত্মন্ এর অনুসারী নয়; এক অভিনব নূতন পন্থা ইহা সাহিত্য জগতে সৃজন করিয়াছে। হে সাহসিন্; গদ্গদ নদী গোদাবরীর গতিভঙ্গীরই ন্যায় তোমার ভাষা আর তোমার বর্ণনা—তোমার বর্ণনার বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়—তোমার বর্ণনা অন্তহীন সাগরেরই মত—যাহা "যাদঃ" সংযোগে ভীতিপ্রদ হওয়ায়ও মনিসংযোগে মনোহারী।

হে আত্মীয়, তুমি আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ—তোমাকে আমরা অন্তরঙ্গ বলিয়া গৌরব করি। হে কাশ্যপকুললাঞ্ছন্—শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত-ছন্দে চিরন্তন নারীর যে মহিমা তুমি উদ্ঘোষণ করিয়াছ, সেই বিরাট কীর্ত্তনে তোমার কণ্ঠ আমাদের চির-পরিচিত হইয়াছে......হে মর্ম্মজ্ঞ, ক্রৌঞ্চমিথুনের একতমকে বধ করিবার অপরাধ যে কি গুরুতর, তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে—তাই বিরহ-বিক্লব রামভদ্রের সহিত নির্ব্বাসিতা রাজলক্ষ্মীর পুনর্ম্মিলন ঘটাইয়াছিলে—এখানেও তোমার অননুকারিণী প্রতিভা দৃষ্ট হয়—হে অপূর্ব্ব, তোমাকে, আমরা সম্বর্দ্ধনা করি অভ্যর্থনা করি—আত্মার আত্মীয় বলিয়া গণ্য করি......

হে যুগল দেব—ভারতবাণীর যুগ্ম চরণপদ্মে তোমরা জন্মিয়াছিলে ...... আমাদের দেশের উন্নত কপালে তোমরা দুটি শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ফোঁটা—তোমরা না জন্মিলে আমরা গৌরব করিতাম কাহাকে লইয়া? দেশ বিদেশের বিবুধ সভায় কাহাকে আমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করিতাম?

অপর কালে জন্মিয়া ও অন্য ভাষার ভাষী হইয়াও—তোমার কাছে যে আমরা নির্ভয়ে যাইতেছি তাহার কারণ—হে লোকোত্তর চরিতবান্, স্থল বিশেষে তুমি বজ্রের ন্যায় সুকঠিন হইলেও, স্বভাবতঃ তুমি কুসুমের চেয়েও মৃদু.....আমাদের এই অ-সংস্কৃত অভিভাষণ তুমি কুসুম-কোমলতার সহিত গ্রহণ কর—এই প্রার্থনা।

শ্রীফণিভূষণ রায়।

বাজীকর

(আনাতোল ফ্রান্সের Our Lady's Juggler হইতে)

(১)

তখন লুই ছিলেন ফ্রান্সের রাজা। বারনেবী বলিয়া কোন এক দরিদ্র বাজীকর সেই সময়ে ফ্রান্সের সহরে সহরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বাজী দেখাইয়া দু পয়সা উপায় করিত। সে ছিল কাম্পেনের একজন অধিবাসী।

দিনের আব্‌হাওয়া ভাল থাকিলে সে একখানি পুরানো জীর্ণ কার্পেট পথের উপর বিছাইয়া একটী ছোটখাট মজার বক্তৃতা দিত। বক্তৃতাটী সে মান্ধাতার আমলের এক বাজীকরের নিকট হইতে শিখিয়াছিল, আর প্রতিবার সে একই ভাবে ইহার আবৃত্তি করিত। এই সময়ে তাহার আশে পাশে নিকর্ম্মার দল ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া জমা হইত। আর, সেও নানা রকম অদ্ভুত ভাব ভঙ্গী সহকারে তাহার নাকের উপর একখানি টিনের প্লেট রাখিয়া খেলা দেখাইত। দর্শকেরা প্রথমে ঔদাসীন্যের ভান করিত।

কিন্তু যখন সে দুই হাতের উপর ভর রাখিয়া মাথা নীচু করিয়া ছয়টী তামার বল উপরে ছুঁড়িয়া দিত, আর বলগুলি রৌদ্রের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করিতে করিতে তাহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িত, অথবা যখন সে পিঠের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পায়ের সহিত তাহার মাথা ঠেকাইয়া বারোখানি ছুরি লইয়া খেলা করিত, তখন দর্শকদের মধ্য হইতে প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইত, আর পয়সাও অজস্রধারে তাহার কার্পেটের উপর আসিয়া পড়িত।

তাহার এত কৌশল জানা থাকিলেও তাহাকে অন্যান্য বাজীকরের মতই অতিকষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইত।

অ্যাডামের অপরাধে তাহার অভিশপ্ত সন্তানদের এই একজন হতভাগ্য বাজীকরকে

সে পরিশ্রম করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক ছিল কিন্তু তাহা সম্ভব হইত না। কারণ, বৃক্ষের ফল পাইতে হইতে হইলে, রৌদ্রের তাপ ও দিনের শুভ্রোজ্জল আলো যেমন তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য, তেমনই তাহার ক্রীড়ার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইতে হইলে রৌদ্র ও দিনের আলো উভয়েরই সমান প্রয়োজন। শীতকালে, পত্রবিহীন পাদপ যেমন বিশুষ্ক ও মৃতপ্রায় দেখায়, তাহাকেও সেইরূপ বোধ হইত। শীত পড়িলে মাটী কঠিন হইয়া উঠিত, আর বাজীকর বেচারার পক্ষে খেলা দেখান দুঃসাধ্য হইত। সুতরাং শীত ও ক্ষুধা এই উভয়ের নিষ্পেষণে সে অত্যন্ত কষ্ট পাইত। কিন্তু তাহার প্রকৃতি ছিল অতি সরল, তাই সে সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করিত।

সে অর্থের উৎপত্তির বিষয় কখনও চিন্তা করিত না, বা মানুষের অবস্থাগত বৈষম্যও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না। সে তাহার সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিত যে ইহলোকে কষ্ট পাইলেও পরলোকে সে নিশ্চয়ই সুখে থাকিবে; আর, এই বিশ্বাসই তাহাকে সব রকম প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করিত। যে সব দুষ্টেরা চুরি করিয়া বা অন্য কোন অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত, সে তাহাদের একজন ছিল না। তাহার দুর্ভাগ্যের জন্য ভগবানকে কখনও নিন্দা করিত না, আর সে অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। তাহার নিজের স্ত্রী ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া সে কখনও অপরের স্ত্রীর প্রতি লুব্ধভাবে চাহিত ন, কারণ, সে জানিত যে নারী চিরকালই দেলিলার মতন পুরুষ সামসনের সর্ব্বনাশ করে।

প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পাশবিক আনন্দের বিরোধী ছিল; পান-পাত্রবাহিনী সুন্দরী রমণীর চেয়ে তাহার হস্তস্থিত সুরার পাত্র সে অধিক পছন্দ করিত বটে কিন্তু সে কখনও অপরিমিত পান করিত না। আর ভগবানকে সে ভালবাসিত এবং কুমারী মেরীকে অতিশয় ভক্তি করিত।

সে নিয়মিত সময়ে গির্জ্জায় গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া খৃষ্টমাতা মেরীর নিকট প্রার্থনা করিত।

"হে দেবি, যতদিন আমি এ পৃথিবীতে জীবিত থাকিব, তুমি আমার সমস্ত কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখ, আর, আমার মৃত্যু হইলে, স্বর্গের সব আনন্দ উপভোগ করিতে দিও।"

(২)

সন্ধ্যাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; বারনেবী তাহার বল ও ছুরির পুঁটলীটী জীর্ণ কার্পেটখানিতে জড়াইয়া তাহা হাতে লইয়া রাত্রে থাকিবার জন্য কোনও আবাস স্থানের অনুসন্ধানে চলিয়াছে, এমন সময় সে দেখিতে পাইল, যে, একজন ধর্ম্মযাজকও তাহার গন্তব্য পথের দিকেই যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া, বারনেবী অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তারপর পথে যাইতে যাইতে উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল।

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "তুমি সবুজ পোষাকে নিজেকে আগাগোড়া মুড়িয়াছ কেন? তুমি কি নাটকে কোনও হাস্যরসিকের অভিনয় করিবে?"

তদুত্তরে বারনেবী বলিল, "না তা' নয়। আমি একজন বাজীকর, আমার নাম বারনেবী। বাজি দেখাইয়া যদি দুবেলা দুমুঠো জুটাইতে পারা যায়, তবে এর চেয়ে আনন্দের ব্যবসা আর কি থাকিতে পারে ?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "বন্ধু বারনেবী, একটু ভেবে চিন্তে কথাগুলো বোলো। এটা ঠিক জেনো যে, ধর্ম্মযাজকের কাজের চেয়ে অন্য কোনও কাজ এত মধুর নয়। যারা এই জীবন যাপন করে, তাদের কাজ হচ্ছে ভগবানের জয়গান করা, কুমারী মেরীর পূজা করা, এবং সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। ধার্ম্মিকের জীবন যেন সত্যই ভগবানের একটানা জয়গান !"

বারনেবী বলিল, "সদাশয় পিতা, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আপনার সহিত এই ক্ষুদ্র বাজীকরের তুলনাই চলিতে পারে না। ছড়ির উপর একটী পেনী রাখিয়া সেই ছড়ি নাকের আগায় দাঁড় করাইয়া খেলা দেখানয় কিছু প্রতিভা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ইহা আপনার প্রতিভার কাছে কিছুই নয়। আমার খুব ইচ্ছা যে, আপনার ন্যায় আমিও ধর্ম্ম-জীবন যাপন করি ও মেরীর গুণগান করিয়া দিন কাটাই। আপনাদের পবিত্র জীবন লাভ কর্ব্বার জন্যে আমি এই সব বাজী দেখানো ছেড়ে দিতে রাজী আছি। অথচ এই খেলা দেখাইয়াই আমি কত সহর ও গ্রামের কত লোকের কাছ থেকে প্রশংসা পাইয়াছি !

ধর্ম্মযাজক বারনেবীর সরলতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল, যে এই সব লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্মপুস্তকে বলা হইয়াছে, যে, "যাহারা পবিত্র, কলঙ্কশূন্য ও সরল তাহারা পরিণামে শান্তি পাইবে।" তাই তিনি বলিলেন, "বন্ধু বারনেবী তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি যে মঠের অধ্যক্ষ সেই মঠে তোমাকে স্থান দিব। যিনি ইজিপ্টের মেরীকে মরুভূমের মধ্যে পথ দেখিয়েছিলেন, তিনিই আবার আমাকে তোমার মুক্তির জন্যে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

বারনেবী এইরূপে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। যে মঠে সে স্থান পাইল সেখানে তাহার ধর্ম্মভ্রাতারা কুমারী মেরীর পূজায় পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। তাঁহার উপাসনায় তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়োজিত করিতেন।

মঠের অধ্যক্ষ যিনি, তিনি অতি সুন্দরভাবে খ্রীষ্টমাতার গুণকীর্ত্তন করিয়া পুস্তক লিখিতেন।

ভ্রাতা মরিস সেই পাণ্ডুলিপিগুলি যত্নের সহিত ভাল কাগজে পুনরায় লিখিয়া রাখিতেন।

ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার লিখিত কাগজের পৃষ্ঠাগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া ভরিয়া তুলিতেন। কোথাও তিনি সলোমনের সিংহাসন অঙ্কিত করিয়াছেন, আর, সেই সিংহাসনের উপর স্বর্গের রাণী বসিয়া আছেন। তাঁহার পদতলে চারিটী সিংহ যেন প্রহরা দিতেছে। তাঁহার মস্তক হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতির্গোলকের চতুষ্পার্শ্বে সপ্ত পারাবত

ভগবানের সপ্ত দানের প্রতীকরূপে উড়িয়া বেড়াইতেছে। এই পারাবতগুলি যথাক্রমে, ভয়, বিশ্বাস, করুণা নিষ্ঠা, বিবেক, বোধশক্তি ও জ্ঞানের মূর্ত্ত বিগ্রহ। ছয়জন স্বর্ণাভ অলকদাম সমন্বিতা কুমারী, দেবী মেরীর সঙ্গিনীরূপে রহিয়াছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে, নম্রতা, অভিজ্ঞতা, সাধনা, আত্মদান, পবিত্রতা ও বশ্যতা।

তাঁহার পদতলে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারশুভ্র নগ্নমূর্ত্তি করজোড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন তাহাদের আত্মার মুক্তির জন্য সর্ব্বশক্তিমতী মেরীর নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

পুস্তিকার অপর পৃষ্ঠায় ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার মানবের পতন ও মানবের মুক্তি এক সঙ্গে দেখাইবার নিমিত্ত ঈভ ও মেরীর ছবি পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়াছেন। মানবের আদিমাতা ঈভের অবাধ্যতার শাস্তি আজিও তাঁহার সন্তানসন্ততি ভোগ করিতেছে আর মেরী এমন তনয় প্রসব করিলেন, যিনি জগতে মুক্তির বার্ত্তা লইয়া আসিলেন।

শিল্পী কোথাও অনন্ত জীবনের প্রস্রবণ আঁকিয়াছেন। কোথাও বা পদ্মফুল, কোথাও চন্দ্র, কোথাও সূর্য্য, কোথাও বা স্বর্গের দ্বার অথবা স্বর্গরাজ্য আঁকিয়াছেন। কেন না, এ সমস্তই যে রাণী মেরীর ঐশ্বর্য্য!

ভ্রাতা মার্ব্বোডও মেরীর প্রিয়তম সন্তানদের একজন ছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন ভাস্কর। প্রস্তরের উপর নানা রকম মূর্ত্তি খোদিত করাই তাঁহার একমাত্র কাজ ছিল। তাঁহার মস্তকের কেশগুচ্ছ এবং চক্ষুর ভ্রূযুগল প্রস্তরের ধূলায় শুভ্র হইয়া থাকিত। বয়সে বেশী হইলেও তাঁহার দেহের সামর্থ্য কিছুমাত্র কমে নাই, বা তাঁহার প্রফুল্লতারও অভাব ছিল না। সিংহাসনের উপর মেরী বসিয়া আছেন আর তাঁহার মহিমময় ললাটদেশ ঘিরিয়া মুক্তার মালা জড়িত রহিয়াছে, ইহাই হইল শিল্পী মার্ব্বোড পরিকল্পিত মেরীমূর্ত্তি।

কখনও বা তিনি মেরীকে সরলতার আধারস্বরূপ সুন্দরী বালিকারূপে প্রস্তরে খোদিত করিয়া যেন জানাইতে চাহিতেন, "আমার শৈশব হইতেই আমি তোমায় দেবী বলিয়া ভালবাসি"। ইহা ব্যতীত, মঠেতে সন্ন্যাসী ভ্রাতাদের কেহ কেহ মেরীর প্রসংসা করিয়া সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। কেহ বা সঙ্গীতের সহায়তায় তাঁহার জয়গান করিতেন।

(৩)

মেরীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পরস্পরের এই ক্লান্তিহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করিয়া বারনেবীর অন্তঃকরণ নিজ অজ্ঞতার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। মঠের নির্জ্জন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে সে ভাবিত, "কত হতভাগ্য আমি! বিশ্বমানবের পরিত্রাতা যিনি, তাঁহার চিরপূজ্য মাতাকে আমি আমার সমস্ত জীবন দিয়া ভালবাসিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অথচ তাঁহার প্রিয় কোনও কার্য্যই সাধন করিতে পারি না। আমি শিল্প

সংবন্ধে কিছু জানি না, উপদেশ লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতাও আমার নাই, মনোমুগ্ধকর ছবিও আঁকিতে পারি না কিম্বা প্রস্তরের মধ্যে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবারও আমার সামর্থ্য নাই। হায়, আমার যে কোন গুণই নাই!"

এই ভাবে সে দুঃখ প্রকাশ করিত ও সর্ব্বদা বিমর্ষ হইয়া থাকিত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন ধর্ম্মযাজকেরা অবসর সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন এই বলিয়া একটী গল্প করিলেন, যে, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি, "মেরী, আমি তোমায় অভিনন্দিত করি" এই কয়টী কথা ভিন্ন অন্য কথা বলিয়া প্রার্থনা করিতে পারিত না। বেচারার এই অজ্ঞতার জন্য লোকে তাহাকে ঘৃণা করিত। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর যখন ঐ পাঁচটি কথা বলিয়া প্রার্থনা করিবার জন্য পাঁচটী গোলাপ ফুল তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, তখন তাহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া সকলে সম্মানিত করিল।

বারনেবী এই গল্প শ্রবণ করিয়া কুমারী মেরীর অপূর্ব্ব দয়ার কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু ভগবান যে ভক্তের ক্ষুদ্রতম উপহারও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই শিক্ষা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। সে কি করিয়া তাহার উপাস্য দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে, ঐই চিন্তায় তাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বক্ষণ ভরিয়া থাকিত।

কেমন করিয়া তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, ইহা সে দিবারাত্র ভাবিল, কিন্তু কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইল না। শেষে একদিন প্রাতঃকালে সে অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া দ্রুত গতিতে উপাসনার স্থানে গমন করিল। সেখানে সে একাকী একঘণ্টা রহিল। মধ্যাহ্নে ভোজনের পর সে পুনরায় তথায় যাইল।

সেই দিন হইতে সে প্রত্যহ নিয়মিতভাবেএমন সময়ে গির্জ্জায় যাইত, যখন তাহার অপর কোনও ধর্ম্মভ্রাতা তথায় থাকিত না। এখানে সে অনেকক্ষণ সময় অতিবাহিত করিত।

ইহার ফলে দেখা গেল যে তাহার সমস্ত ক্ষোভ অন্তর্হিত হইয়াছে ও তাহার পূর্ব্ব প্রসন্নতা সে ফিরিয়া পাইয়াছে।

বারনেবীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন কিন্তু অপর সন্ন্যাসীদের মনে কৌতূহলের উদ্রেক করিল। বারনেবী প্রতিদিন গির্জ্জায় যাইয়া কি করে ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা উদ্গ্রীব হইয়া উঠিলেন।

মঠের অধ্যক্ষ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন যখন বারনেবী তাহার প্রথামত গির্জ্জায় যাইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়াছে তখন অধ্যক্ষ মহাশয় অপর দুইজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত তথায় গমন করিয়া দুয়ারের ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতর বারনেবী কি করিতেছে দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন যে বারনেবী মেরীর বেদীর সম্মুখে তাহার মাথা নত করিয়া পদদ্বয় উপরে তুলিয়া দিয়া ছয়টী তামার বল ও বারোখানি ছুরি লইয়া খেলা করিতেছে।

দেবীর সন্তোষের নিমিত্ত সে খেলা দেখাইতেছে, আর এই খেলাই একদিন তাহার যশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। দেবীর প্রসাদের জন্য সে যে তাহার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি নিয়োজিত করিতেছে, ইহা না বুঝিয়া, বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদ্বয় গীর্জ্জার পবিত্রতা নষ্ট হইতেছে মনে করিয়া বারনেবীর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন।

বারনেবী কিরূপ নির্ম্মলচিত্ত, অধ্যক্ষের তাহা জানা ছিল, কিন্তু তিনি এইসব দেখিয়া স্থির করিলেন, যে বারনেবীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া বারনেবীকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দিতে যাইবেন এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন যে, করুণাময়ী মেরী বেদীর সোপান দিয়া নামিয়া আসিয়া তাঁহার নিজ পরিহিত পরিচ্ছদের প্রান্তভাগ দিয়া বারনেবীর ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু মুছিয়া দিতেছেন।

অধ্যক্ষ মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "সরল-হৃদয় ব্যক্তিরা ধন্য, যেহেতু তাঁহারা ভগবানের দেখা পাইবেন।"

"তথাস্তু" বলিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীদ্বয় নত হইয়া ভূমি চুম্বন করিলেন।

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

একটী নীরব কর্ম্মবীর।

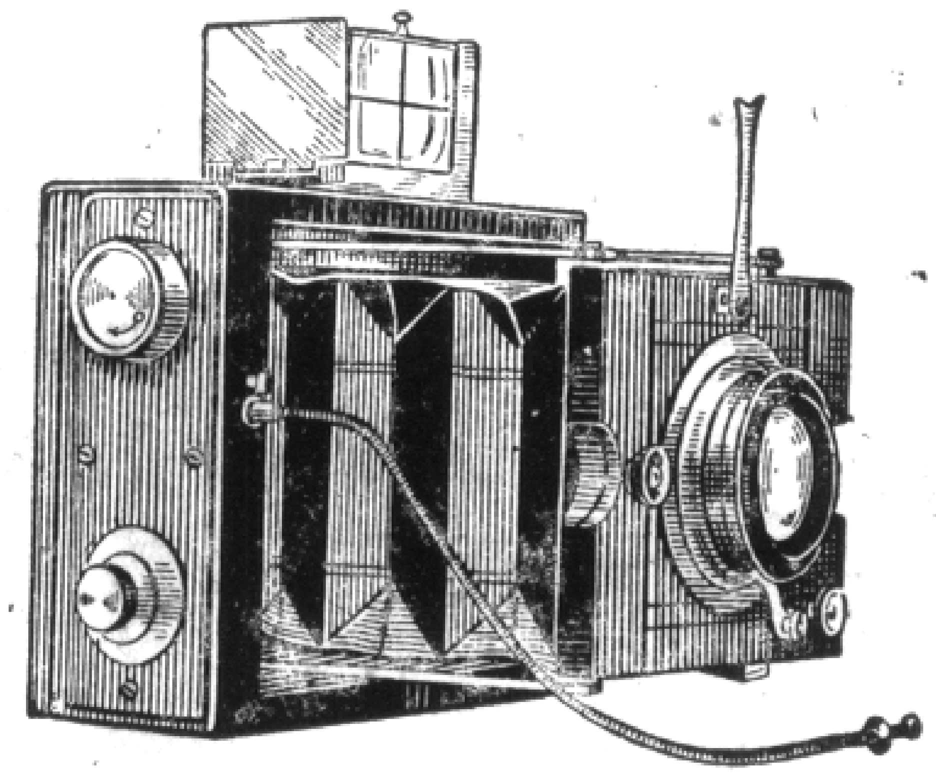
নদীয়া গ্রামের অন্তর্গত আবুরী গ্রামে শ্রীযুক্ত হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রীমতি ত্রৈলোক্যতারিনী দেবী মহাশয়ার কনিষ্ঠ সন্তান রূপে এই নীরব কর্ম্মাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় পাঁচ জনে যেমন খেলা ধূলা করে ইনি তার উল্টা ছিলেন। ইনি পকেটে কতকগুলো বাজে কাগজ পুরে ডাক পিওনের মত বাড়ীর নানা জায়গায় বিলি কর্ত্তেন। যিনি উত্তরকালে জগৎকে নূতনবার্ত্তা শুনাবেন এইভাবেই বাল্যে তাঁর প্রথম সম্ভাবনীয়তা জেগে উঠেছিল। এঁর খেলাধূলার দ্বিতীয় অঙ্গ ছিল একটী 'ডগর':— পাড়া গাঁয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ড্রামকে ডগর বলে। বয়স যখন তিন বর্ষ সাতমাস, তখন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরদিনের মত এঁর একটী

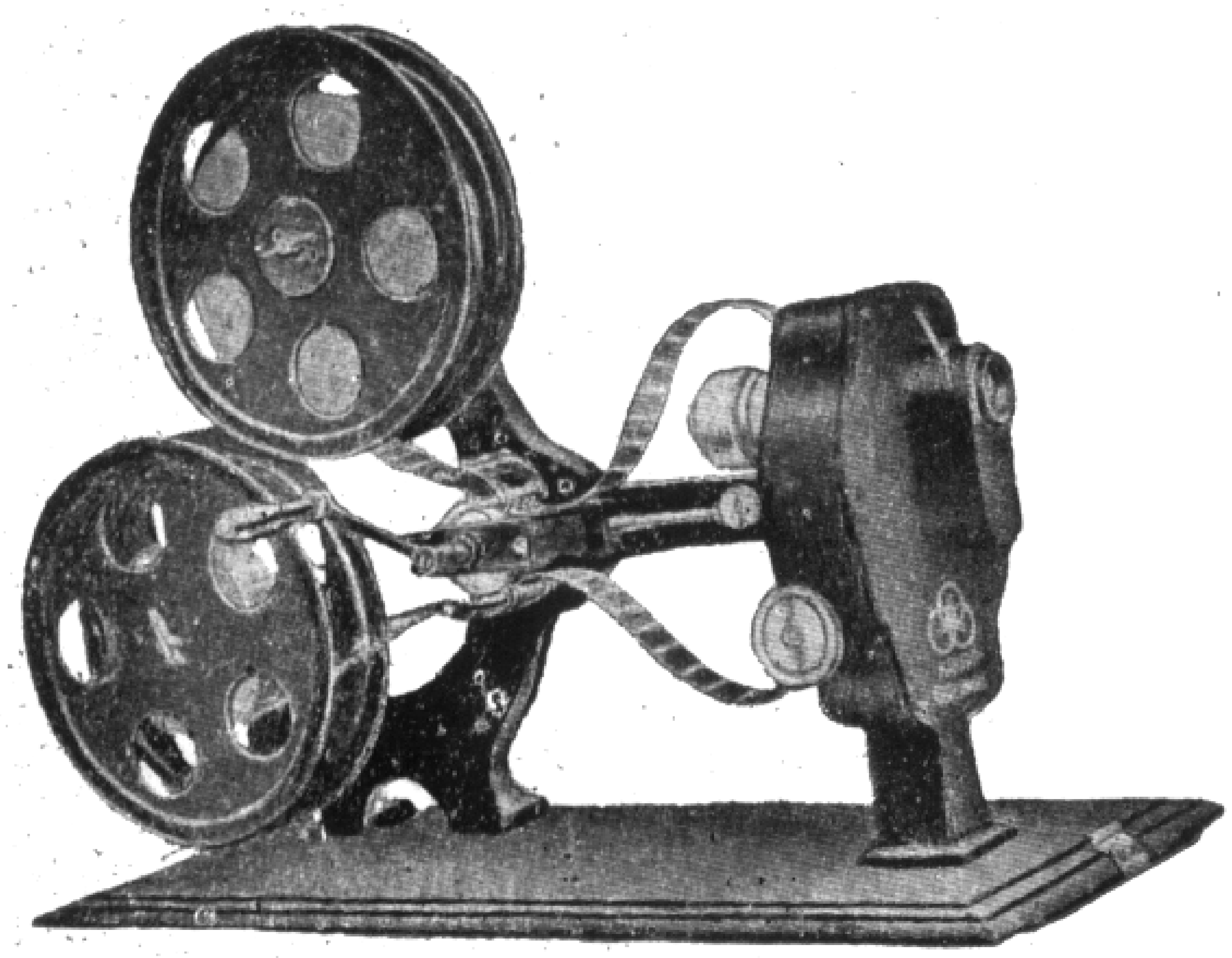
পা' একদম অবশ হয়ে যায় এবং প্রকাণ্ড এক বংশদণ্ড ভিন্ন ইনি মোটেই চল্‌তে ফিরতে পারেন না। ইনি লেখা পড়ায় অত্যন্ত অমনোযোগী এবং পূজা তর্পণ লিপ্ত এক অন্তর্মুখী ধরণের ছেলে বলে বয়সের প্রথম ভাগটাতে নীরেট মূর্খই ছিলেন বল্‌তে হয়, ইংরাজী পড়ার নাম শুনে এঁর গায়ে জ্বর আস্‌তো। পিতার স্নেহে ও আদরে কয়েক খানি বাংলা বই পড়ে প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রসর হন কিন্তু পড়াশোনার চেয়ে পূজা অর্চ্চনাতেই মত্ত থাকতেন। এঁর পিতামহ বল্‌তেন, ওর জীবনটা বৃথাই গেল, ওটা অপদার্থ ইত্যাদি। এমনি করে বয়স বেড়ে চললো—বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকলো, ক্রমে এই কর্ম্মবীর বুঝতে পারলেন বিদ্যাচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সময় হ'তে জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং দ্রুতগতি অগ্রসর হ'য়ে যান্‌। মাঝে দিন কতক এক সন্ন্যাসীর সহিত মিশে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন এবং সন্ন্যাসীর সম্পাদিত "শ্রীসজ্জনতোষণী" পত্রিকায় অজস্র কবিতা লিখে শক্তিমত্তার পরিচয় দেন্‌, এই কালে বিদ্যাচর্চ্চাই এঁর জীবনের ব্রত হ'য়ে ওঠে। এই সময়ে ষোল, সতের বৎসর বয়সে গোটা দুই লায়েব্রেরী হজম ক'রে এবং কবিতা লিখে স্বীর গতিতে ক্রমে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন;—কিন্তু সময়ে সময়ে এঁর মনটা কেঁদে উঠ্‌তো নিজের পল্লীজীবনের শান্ত নিবিড় মাধুর্য্যের জন্য, জননীর কারুণ্য ঘন অপর্য্যাপ্ত স্নেহের স্মৃতি তাঁর বৈরাগ্যের কঠোরতাকে হাল্কা করে তুলতো। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা এই রূপ দাঁড়ালো যে সন্ন্যাস আর সংসার দুটোই পাশাপাশি এঁকে ঘিরে দাঁড়ালো আলো ছায়ার মত। বয়স যতই বাড়ে ইনি ভাবেন জীবনে অন্ততঃ ভালো রকম কিছু ক'রে যেতেই হবে, যাতে বিশ্বমঙ্গল ও জনসেবা যুগপৎ সাধিত হয়। চিরদিনই এই কর্ম্মী আত্মস্থ এবং অটল অধ্যবসায়ী। সন্ন্যাস গ্রহণ অপেক্ষা সেবাবৃত্তি অবশ্য কর্ত্তব্য মনে হওয়ায় সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছেড়ে দিলেন এবং আত্মজ্ঞান লাভার্থে নির্জ্জনে ধ্যান করতে লাগলেন। ভক্তবৎসল বিশ্বদেবতার পবিত্র প্রেরণায় ইনি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পালেন সংযম মন্ত্র প্রচার এবং প্রকৃষ্টভাবে ছাত্রী ও ছাত্রবৃন্দের চিত্তে ব্রহ্মচর্য্য-মাহাত্ম্য অঙ্কিত ক'রে দিতে না পারলে ভারতবর্ষ উন্নতির সম্মুখীন হ'তে পারিবে না। সংযম এবং ধর্ম্মভাব, অসংকীর্ণ বিশ্বমৈত্রী অতি বাল্যকাল থেকেই ছেলে মেয়েদের পবিত্র মনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই এজন্য ইনি এণ্টেন্স স্কুলের হেডমাষ্টারদের প্রেরণা দিতে থাকেন, ছাত্রদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মভাব শিক্ষা দিবার জন্য এই কর্ম্মীর মতে ব্রহ্মচর্য্য বল্‌তে ঈশ্বর পরায়ণতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা এবং স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেশার মধ্য দিয়া পরিব্যক্ত তেজস্বী সচ্চরিত্রতা বুঝা যায়। অনেকে তর্ক করেন স্ত্রী পুরুষের বাধাহীন সম্মেলন দোষাবহ কিন্তু আমরা মনে করি অবাধ সম্মেলন ব্যাহত ও প্রতিরুদ্ধ হয়, সেইটাই দোষের,—সেই লজ্জাকর সংকীর্ণতা

জগতের যিনি বিধাতা তিনি সকলকে একই প্রকাশু বিশ্বপ্রাঙ্গনে বসবাসের অধিকার দিয়াছেন, সেই দেব-দত্ত জন্মগত অধিকারকে দেশাচারের উর্দ্ধে যদি না রাখি, দেবতার বিধানকে নিজের ক্ষুদ্রতার দ্বারা লজ্জা দেই, তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় কি আছে জানিনা। এই নীরব কর্ম্মবীর শ্রীমৎ নারায়ণ ভারতী সেই ক্ষুদ্রতার প্রতিবিধানে স্বতঃপরতঃ যত্নবান হয়েছেন। ইনি বলেন,—"পাপকে ঘৃণা করিতে পারি, পাপের বিষময় প্রতিক্রিয়ার কথাও জানি কিন্তু যে সমাজ, পাপকে পুণ্যের মুখোস পরিয়ে গিল্‌টী করা পাপের পূজা করাকেই পুণ্য বলে প্রচার করছে, জানিনা এই অসহ্য প্রতারণার মধ্যে পুণ্য দেবতা কি ভাবে অবস্থান করেন। বিধবা যদি একাদশীতে জলপান করে তবেই পুণ্য গেল, একজন মেথরের ছেলে যদি ছুঁয়ে ফেলে অমনি পুণ্য গেল, বিদেশে গেলেও পুণ্য নষ্ট হলো,—অন্য জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণের পরিণয় হলেই গেল! হায়রে সমাজ! পুণ্য কি এতই হাল্কা?" এই কর্ম্মী অনেকগুলো এণ্ট্রেন্স স্কুল নিয়ে কার্য্যারম্ভ করেছেন এবং ইনি বিশ্বাস করেন ব্রহ্মচর্য্য আর ভগবদ্বিশ্বাস ছেলে মেয়েদের মধ্যে জেগে উঠলে অধোমুখী হিন্দুত্ব প্রকৃত হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রীমৎ নারায়ণ ভারতী বলেন, "শাস্ত্রের প্রত্যেক লাইন থেকে ব্যাকরণের ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বিধি বিধানের টুকরো উদ্ধার করে কি হবে জানিনে, শাস্ত্র হতে খাঁটী জিনিষ টুকু বেছে নিলেই তো বেশ হয়। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি" এই মহাবাক্যই যথেষ্ট কিম্বা অভীঃ এই মহামন্ত্রই যথেষ্ট। সারা জীবন দিয়ে ঐ বাক্য নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করো,—দেশ বিদেশে যাও, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধ হও, পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করো।—কামনাও গ্রহণ করতে হয় আবার ত্যাগও চাই, সন্ন্যাসও ভাল আবার সংসারও উত্তম; ত্যাগ, ভোগ দুটোই প্রার্থনীয়। সংসারে থাকতে হ'লে বন্ধু, পদস্খলনও হয় আবার উঠেও দাঁড়াতে হয়। মানুষ তো যন্ত্র নয়, মানুষের মন বড়ই যে দুর্ব্বল, পূর্ণব্রহ্মের পবিত্র ওঙ্কারময় নাম স্মরণ করতে করতেই মনও সবল হ'য়ে উঠে, পাপীও পুণ্যবল পায়। ত্যাগেও সেই পিতা ভোগেও সেই পিতা, সুখে সম্পদেও পিতা, কষ্ট বিপদেও পিতা,—আমরা আমাদের চিত্ত মন্দিরে সংযমের শুভ্র বেদিকায় সত্য ও অনন্ত কল্যাণময় পরমগুরুকে প্রতিষ্ঠিত যতক্ষণ না করতে পারছি তাবৎ ত্যাগ ভাল কি ভোগ ভাল এই মোহেই ঘুরে বেড়াব। পিতাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান অতএব সংসারে থেকে সহস্র সহস্র বিপদে অমুহ্যমান হও, জগতে আত্মশক্তির দ্বারা লোককল্যাণবিধায়ক কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে যাও।" উক্ত কর্ম্মীর জীবনেও বহুপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণার ঝড় বয়ে গেছে, খঞ্জত্বের জন্য কত সময় রাস্তায় চলতে আছাড় খেয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন,—হাঁটু কেটে রক্ত ঝরতো, বস্ত্র ছিঁড়ে যেত, তবু ইনি বৎসরের পর বৎসর এত কষ্ট সহ্য করেও জ্ঞান দেবতার পূজায় কখনও বিরত হন নাই। এমন দিন গেছে, একখানি পোষ্টকার্ডের অভাবে চিঠি লিখতে পারেন নাই, আজ যদিও এঁর অনুগত অসংখ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু কোন বিষয়েই ইনি কাহারও

সহায়তা পারৎ পক্ষে চান্ না। ব্রহ্মচর্য্য প্রচারই ইহার জীবন ব্রত এবং এজন্য ইনি পরিশ্রমও করেন অপরিমিত। আদর্শ খুব উচ্চ, তাই বোধ হয় যে কোন বিঘ্ন বিপদ এঁর কাছে তুচ্ছ। ইনি বক্তৃতা দিয়ে প্রচার করেন না প্রাণ দিয়ে প্রচার করছেন।

শ্রীশুদ্ধচৈতন্য।





ভারতের গৌরব-যুগের সুগন্ধি

‘অগুরু’



সর্ব্বজাতির নিকট সমান আদরণীয়। আদর ইহার স্নিগ্ধ
মনোরম দীর্ঘকালস্থায়ী সুগন্ধের জন্য আর
ইহার স্বল্প মূল্যের জন্য।

বড় শিশি ১।০ বেঙ্গল কেমিক্যাল

ছোট শিশি ॥৵০ * কলিকাতা *